# ভারতী।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নবম খণ্ড।

১৮০৭ শক।

১২৯২


কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

# সূচীপত্র

বিষয় ... পৃষ্ঠা।

# আমরা।

দেখিতে দেখিতে একবর্ষ গত হইল,—ভারতী অষ্টম বর্ষ হইতে নবমে পদার্পণ করিল। এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না—তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে আমরা উক্ত গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শ্রম ও যত্নের ত্রুটি করি নাই।

আমরা এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি—যে এই কার্য্যে আমরা সমালোচক-মহোদয় গণের নিকট হইতে প্রচুর উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে মনে হইতেছে, আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনে আমরা সম্যক কৃতকার্য্য হই বা নাই হই, আমাদের যত্ন একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যে সকল খ্যাতনামা ও প্রতিভাশালী লেখকদিগের যত্ন ও সাহায্যে ভারতী এইরূপে গত বৎসরে ও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি,—বলিতে কি তাঁহাদের জন্যই আমরা হাসিতে হাসিতে বর্ষ সমুদ্রের পরপারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, গত বৎসর যখন ভারতী গ্রহণ করি তখন এতদূর আশা করি নাই;—কিন্তু এ বৎসর আমাদের হৃদয় সমধিক আশাপূর্ণ। গত বৎসর যাঁহারা ভারতীর সহায়তা করিয়াছেন—এ বৎসর তাঁহাদের সহিত আবার যখন-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত, বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক-মহোদয়গণ পর্য্যন্ত ভারতীতে লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—তখন আমাদের উৎসাহ ও আশা যে কতদূর বাড়িয়াছে—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহাঁদের এই সহৃদয়তায় আমরা কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি, কিরূপ সম্মানিত হইয়াছি—কিরূপ কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি তাহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য।

এ বৎসর যে ভারতী কিরূপ প্রণা[illegible] সম্পাদিত হইবে—কি কি বিষয় ই[illegible] আলোচিত হইবে, অর্থাৎ ভারতীর [illegible] উদ্দেশ্য, তাহা [illegible] বিস্তারিত রূপে [illegible] করিয়া বলিবার আবশ্যক করে না; [illegible] বৎসরের প্রবন্ধ সকল হইতে তাহা [illegible] কগণ বুঝিয়াছেন। সংক্ষেপে এই [illegible] বলিব—

সংসারের কঠোর কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শারীরিক বিশ্রামের সহিত যাহাতে পাঠকগণ মনের তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন এইজন্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও

সরস কবিতার সহিত, রহস্য-জনক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইব।

আজকাল আমাদের সমাজের এই বিপ্লবের অবস্থায় সামাজিক বিষয়-গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য, আমরা সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

ভারতের পুরাতন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শনের মতামত এবং অধুনা ইয়োরপ, আমেরিকায় মানসিক-শক্তি সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে,—যে সকল বিষয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পাঠোপযোগী ও আনন্দদায়ক—সে সকলই সাধারণের-পাঠোপযোগী সরল ভাষায় ভারতীতে প্রকাশিত হইবে। ইহার জন্য কয়েকজন পারদর্শী লেখক ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এক কথায়, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, উপন্যাস রহস্য, কবিতা প্রভৃতি যাহা কিছুতে সাধারণের জ্ঞান-শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়, যাহাতে সাধারণের উন্নতিসাধন রুচি মার্জ্জিত হইতে অন্যান্য বারের ন্যায় তাহার প্রতিই [illegible]র লক্ষ্য থাকিবে। এইখানে একটি [illegible]মাদের সমাজ উন্নত-অবস্থা হইতে [illegible]প্ত হইয়া আবার [illegible] পথে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ সময় যাঁহারা সামাজিক মীমাংসায় ব্যাপৃত থাকেন তাঁহাদের সত্য ও ন্যায়ের প্রতি প্রধান লক্ষ্য স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করা—এবং [illegible]রণের ক্ষণস্থায়ী মতের স্রোতে না ভাসিয়া যুক্তিদ্বারা সামাজিক গতিবিধি নির্ণয় করা। অতএব এইরূপ প্রশ্ন মীমাংসা কালে কালে আমরা যদি কোন কোন সময় কোন সম্প্রদায় বিশেষ কি কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত একমত না হইতে পারি,—আশা করি তাহাতে আমাদের কেহ দোষ গ্রহণ করিবেন না। আরো একটি কথা, প্রবন্ধ লেখকের মতামতের জন্য আমাদের কেহ যেন দায়ী না করেন। আমাদের মতের সহিত মিল থাক্ আর নাই থাক্, প্রবন্ধ যোগ্য হইলেই তাহা ভারতীতে স্থান পাইবে। আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি ও জ্ঞানের পুষ্টিসাধনের জন্য এক একটি প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে, নানারূপে দেখা আবশ্যক।

উপসংহারে, ভারতীর লেখক মহাশয়দিগকেআমরা একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যিনি আপনার প্রবন্ধে নাম দিতে না চাহেন তিনি তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইলে আমরা সেই অনুসারে কার্য্য করিব;—অন্য সকল স্থলে আমরা যেখানে যেরূপ ভাল বুঝিব—তাহাই করিব। কেবল অন্য লেখকদিগের সম্বন্ধেই যে এই নিয়ম করা হইল কিম্বা ইহা যে আমাদের নূতন নিয়ম এমন নহে,—আমাদের নিজের সম্বন্ধেও এই নিয়মে গত বৎসর কার্য্য চলিয়াছে—এবং ভবিষ্যতেও চলিবে।

---

# নূতন।

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার, রাতে,
দারুণ অশনি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—

বিশাল পর্ব্বত-কেটে,
পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি,
বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে
ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়
ভাঙ্গা পাষাণের বুকে
খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়!

হের হের, হায়, হায়,
যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণ জাল!
লতাগুলি লতাইয়া,
বাহুগুলি বিছাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের—
নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,—
ফুল এসে, পাতা এসে
কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস!

এরা সব কোথা ছিল!
কেই বা সংবাদ দিল!
গৃহ-হারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে,
অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান,
আনেরে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায়
এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া
ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারি দিক হতে তারে
ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল,
দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এই খানে ছিল "পুরাতন,"
এক দিন ছিল তার
শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল,
সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে
রেখে তবে গেল পিছে
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুল দল!
সে কি চায় শুষ্ক বনে
গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন?

আগেকার মত ক'রে
স্নেহে তার নাম ধ'রে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন?
নহে নহে, সে কি হয়!
সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়,
সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুল চয়,
ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্,
সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।

এ কি ঢেউ-খেলা হায়,
এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষতান
না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয়রে কাঁদিয়া লই,
শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি,
ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না'রে, করিব না শোক,
এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা!
সেও চলে যাবে কবে,
গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# পুষ্পাঞ্জলি।

## প্রভাতে।

সূর্য্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্ খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁই-ফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্ খানে রজনীগন্ধ ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? সেখানে ত মা আছে—তাহারা কি তাহাদের ছোট ছোট শিশুগুলিকে

চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া, চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে? কত শত সেখানে কুটীর গাছ পালার মধ্যে, নদীর ধারে, পর্ব্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে অরণ্যের প্রান্তে আপনার আপনার স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সেখানে আমাদের কোন অজ্ঞাত একটি পাখী এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখ দুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখীর গান মিশিয়া যায়। তাহাদের দেশে যে সকল কবিরা বহুকাল পূর্ব্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের পরে শুইয়া এই পাখীর গান শুনিত ও গান গাহিত। সে হয়ত আজ বহুদিনের কথা—কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও ত সহসা এই পাখীর স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখীর গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত ঠিক আমাদের মত করিয়াই খেলিত, এম্নি করিয়াই কাঁদিত;—তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না। তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্ত ভাবেই লাগিত—তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত;—তাহারা এককালে বালক বালিকা ছিল—যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত, তখন মনে হইত না তাহারাও বড় হইবে! কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারিদিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে "নাই" হইয়া গেল! বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ বকুল গাছটি দেখিতেছি—একদিন কোন্ সকাল বেলায় কি সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপন করিতেছিল—সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর্ ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর্ তাহার নাম করে না, তাহারা আর্ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না—যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে এম্নি ভান করে—যেন তাহাদের সহিত কাহারও যোগ ছিল না!

---

কিন্তু, এই বুঝি এ জগতের নিয়ম! আর, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে! যত দিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর্ কোন কাজ

পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অম্নি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে—তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়—তোমাকে এই জগৎ দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়। খরতর কালস্রোতের মধ্যে তোমাকে খরকুটার মত ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হুহু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিন দুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্ম্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালবাসার এই পুরষ্কার! কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এইত চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এইত চিরদিন হইবে! তাই যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না! আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই—তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তাহারা হয়ত আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয় ত আমাকে চাহিতেছে! এককালে এ জগৎ তাহাদেরি আপনার রাজ্য ছিল—কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছে—কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না! আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক! বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্ত-কালের বাসা হয় আর্ স্মৃতি যদি কেবল মাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাইনা কেন! সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙ্গিয়া লইয়া গেছে—যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে—যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে এই জগতের মধ্যাহ্ণ কিরণে কি তাহার সেই ভালবাসার উপহার প্রতি মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে, তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালবাসার পরিণাম স্বরূপ আর্ কিছুই থাকিবে না, আর্ কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না! কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে

বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার এক্‌টিও কাহারও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার এক্‌টি দুটী কথা ভালবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে সব লেখা তুমি এত ভালবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর্ কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার এক্‌টি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর্-এক দেশে আর্-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

---

আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্না রাত্রির এক্‌টা অর্থ আছে—বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এম্‌নিতর দেখিতে হইয়াছে—নহিলে তাহারা যেন আর্-একরকম দেখিতে হইত! তাই যখন একজন প্রিয়ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন এক্‌টা মরুর বাতাস বহিয়া যায়—মনে আশ্চর্য্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না! যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য্য যেন আমাদের প্রিয়-ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালবাসার চারিদিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কি মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে, প্রভাতে চারিদিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্য্য সাগরেও তাহারই একতালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে—কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান! কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না! অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্য্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও তাহার সৌন্দর্য্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব মিলন হইল! একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না!

---

যখন আমাদের প্রিয়-বিয়োগ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয় অথচ সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে; যেমন নিতান্ত কোন অভূত পূর্ব্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে জিনিষ থাকে তাহা ভালকরিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ সমস্ত সত্য কিনা; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায়, তখন

আমরা জগৎকে চারিদিকে স্পর্শ করিয়া দেখি—ইহারা সব ছায়া কি না, মায়া কি না, ইহারাও এখনি চারিদিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কি না! কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে, তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরও দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে ফুলেরা বলিত সে না থাকিলে ফুটিব না, যে জ্যোৎস্না বলিত সে না থাকিলে উঠিব না, তাহারাও আজ ঠিক তেম্‌নি করিয়াই ফুটিতেছে, তেম্‌নি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনও ঠিক তত খানি সত্যই আছে—একচুলও ইতস্তত হয় নাই!—

এই জন্য সে যে নাই এই কথাটাই অত্যন্ত বেশী-করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর সমস্তই অতিশয় আছে।

---

আমাকে যাহারা চেনে সকলেইত আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-এক জনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এই জন্য, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত;—আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শত সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতের বৎসরের খেলা ধূলা, সতের বৎসরের সুখ দুঃখ, সতের বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতের বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর্ কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর্ কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর্ কোন সম্বন্ধই রহিল না—সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল,—এ-জন্মের মত আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন ত আরো সতের বৎসর যাইতে পারে! আবার ত কত নূতন ঘটনা ঘটিবে কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার ত কোন সম্পর্কই থাকিবে না! কত নূতন সুখ আসিবে, কিন্তু তাহার জন্য তিনিত হাসিবেন না—কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি ত কাঁদিবেন না। কত শত দিন রাত্রি একে

এক্‌কে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়—তাঁহারও কত নূতন সুখ দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোন যোগ নাই। যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক!

---

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কি উৎসবময় বলিয়া মনে হইত! বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকুমাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কি মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্য পরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয় পরিজনের আনন্দ, আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা—এমন কত-কি দৃশ্য সূর্য্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম! এখন আর তাহা হয় না! আজি ঐ বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক-জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়! তখন আর বাঁশি বাজে না! বাপ মায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়—একদিন সকালে মধুর সূর্য্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলে মানুষ ছিল, মনে কোন দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না! বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারিদিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে সেই ছোট মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল। অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যে রূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কি খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল! সে দিনও প্রভাত এম্‌নি মধুর ছিল!

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কি করিয়া! সে কেন চোখের জল ফেলিল! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্ম কা-

লের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গেল কোথায়! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাই বোনদের সঙ্গে চির-দিন খেলা করিল না! সে আপনার সা-ধের জিনিষ সকল ফেলিয়া, আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড় ভালবাসার লোক-দের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া—যে কোলে ছেলেরা খেলা করিত, যে হাতে সে রোগীর সেবা করিত, সেই স্নেহমাখান কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্য সত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল!

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল? এমন রোজই কোন-না-কোন জায়গায় বাঁশি ত বাজিতেছেই। কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরু-ভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণ কাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষত বি-ক্ষত হইয়া যাইতেছে—অথচ একটি কথা বলিতেছে না, কেবল চোখে তাহাদের কা-তরতা, এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তু-ষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নহে কিন্তু সকলেরইত পরিণাম আছে! পরি-ণামের অর্থ—উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যা-ওয়া, বিসর্জ্জনের পর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা! পরিণামের অর্থ—সূর্য্যালোক এক মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া—সহসা জগতের চারিদিক সুখহীন, শান্তি-হীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া! পরিণামের অর্থ—হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে সমস্তই শেষ হইয়া গেছে অথচ চারিদিকেই তাহার প্র-মাণ পাওয়া;—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে—আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয়! সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্র পাষাণময় "নয়" নামক প্রকাণ্ড লৌহ দ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে এক তিল উদ্ঘা-টিত হয় না!

---

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চির দিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশী গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি-দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কো-থায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয়, সে হয়ত সেই খানেই রহিয়া গেল! এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়া-ইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মত অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত-স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশেপাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি! সকল সময়ে তাহাদের বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। সারাদিন আঘাত ত

করিতেছিই, আঘাত ত সহিতেছিই, কিছু-তেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না! তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না—দেখিতে পাই না—কোন্ খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈল-শিখর-চ্যুত পাষাণ-খণ্ডের মত। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে—আ-বার, হয়ত আমরা কাহার সুখের কুটীরের উপর অভিশাপের মত পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি! ইহার কোন উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু না কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু না কিছু পীড়া দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈব ক্রমে তাহাদের ভার সহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না! যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙ্গিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।

---

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়! এমন কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়! নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাস গুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত, আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে-বিতর্কে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়-বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে—"এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ঐ খানিকটা ভস্ম! কখনই নহে!" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে—"আশ্চর্য্য কি! তেমন সুন্দর মুখখানি,—কোমলতায় সৌন্দর্য্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহ-খানি সেও যে,—আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে এই বা কে হৃদয়ের ভি-তর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত! বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কি!" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে চায় না! তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকী কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক্। কিন্তু সমস্তটাত যায় না আমরা নিজেই বাকী থাকি যে! তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মত নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি? হৃদ-য়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরো বেশী করিয়া ধরি না কেন? এ সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না! সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আ-মাকে আশ্রয় দিবেই! যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক্ আর সমুদ্রের পারেই হউক্—মরিয়াই হউক্, আর বাঁচিয়াই হউক্! মিছামিছি আর ত ভাবা যায় না।

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাকা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এতবড় যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে সে কি সত্য সত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্য্যতৎপর, দুঃখে ভাবনায় ভারাক্রান্ত দীনহীন গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে! সে টাকা কি কোথাও ভাঙ্গাইতে পারা যাইবে না! এখানে না হয়, আর কোথাও! এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এতবড় মহত্ত্ব ও এতবড় স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতর অসীম ব্যাপার নির্ম্মিত হইতে পারিত। কেবল মাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শতবর্ষটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কার স্বরূপ কেবল মাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল লইয়া সকলকেই মরণের মহামরুর মধ্যে নির্ব্বাসিত হইতে হয়—তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্ কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারেনা, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়—এমন কি পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্য্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমনস্থলে প্রকৃতি যে চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে, তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে রজনীগন্ধার গাছ রোপন করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে, তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে বুঝি তাহারই পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশী করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে—তুমি এস, তোমাকে রোজ ফুল দিব! হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না—আর্ যখন সে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যায়, এজন্মের মত দেখা ফুরাইয়া যায়—তখন আর্ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কি হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি—কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে!—আর সকলেই ইচ্ছা করিলে এ ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে—কেবল তোমা-

রই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না!

---

তোমার ফুলবাগানে যখন চারিদিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্ত্তি, তখনও যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে—হৃদয়ের সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড় ভালবাসিতে সেই ছোট মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে—তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে! এখন আর্ কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত-প্রীতি স্নেহ-সান্তনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল—এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল!

---

যাহারা ভাল, যাহারা ভালবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মত, বীণার মত—তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়—তাহাদের বিলাপ ধ্বনি রাগিনী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না! তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর্ বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না আহা!—তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়! হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে তোমার কাছে লুকাইয়া রাখ না কেন—ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন—তোমার স্বর্গলোকের সঙ্গীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও—পাষণ্ড নরাধম পাষাণ-হৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্ ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে—খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণের সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না! এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না—তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে—এই জন্য কখন বা উপহাস করিয়া কখন বা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে, সঙ্গীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।

# একটি প্রস্তাব।

দেশের স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে যে দেশের উন্নতি হইতে পারে না, ইহা আজকাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটি গাছের এক-দিকে সূর্য্যকিরণ পড়িলে যেমন গাছটির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি বিকাশ হয় না, তাহার একদিক দুর্ব্বল, একদিক সবল, একভাগ ফলবান, অপর ভাগ নিষ্ফল হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে জাতির এক ভাগ শিক্ষিত, অন্য ভাগ অশিক্ষিত, একভাগ মাত্র সুস্থ, অন্য ভাগ রুগ্ন,সে জাতির পূর্ণ শ্রীকোথায় ? একথা কে না বলিবেন, কিন্তু আমি ইহা হইতেও অধিক বলিতে চাহি। বাস্তবিক পক্ষে যেমন দেহের একভাগ রুগ্ন হইলে অন্য ভাগের স্বাস্থ্য অটুট্ থাকিতে পারে না— দেহের সহিত সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের এমনি যোগ আছে —যে উহাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যথিত হইলে সমস্ত দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সেইরূপ জাতির এক অংশের সহিত অপর অংশের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটিকে অশিক্ষিত রাখিয়া অপরটির শিক্ষা কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা সুশি-ক্ষিত না হইলে সমাজ যে আধাআধি রকমে ক্ষতি-গ্রস্ত হইল এমন নহে, জাতির স-ম্যক উন্নতিই স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে অশি-ক্ষিত রাখিয়া পুরুষেরা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারেন না। স্ত্রীলোক দিগকে নীচে রাখিয়া তাঁহাদের উচ্চে থাকিবার আশা করা বৃথা, তাঁহারা স্বর্গের যত উচ্চ-ধাপেই থাকুন না কেন,, তাঁহাদের স্বর্গ হইতে রসাতলে তাহা হইলে নামিতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাই কি পুরুষদের একমাত্র শিক্ষা। ঘরের শিক্ষা কি তাঁহাদের জীব-নের উপর কোনই কার্য্য করে না ?

মাতার দুগ্ধের সহিত, ভগিনীদের খেলা ধূলার সহিত, আত্মীয় সম্পর্কীয় মহিলাদের কথাবার্ত্তার সহিত, স্ত্রীর গল্পের সহিত কি পুরুষদের শিক্ষা জড়িত নহে? কিন্তু যেখানে এই দুই রূপ শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সেখানে শিক্ষার কি পরিণাম? যেখানে ঘরে মা শেখান একরূপ, বাহিরে মাষ্টার শেখান অন্যরূপ, হৃদয় একরকম বুঝিয়াছে, স্ত্রী-বোনরা আর একরকম বুঝাইতে চাহেন, যেখানে বাহিরের শিক্ষার সহিত, স্নেহ মমতার শিক্ষার আদপে মিল নাই সেখানে কি শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে? যদি এই দুই শিক্ষায় সাম্য থাকে তবেই সে শিক্ষা যথার্থ কার্য্যকরী হইতে পরে, নহিলে পুরুষেরা কি শিখিতেছেন আর কি না শিখিতেছেন তাহাত বুঝিয়া উঠা যায় না, তাই বলিতেছি ঘরের শিক্ষা প্রকৃত যত দিন না হইতেছে ততদিন পুরুষদেরও প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে না, একজন অসংখ্য উপা-

ধিধায়ী হইলেও তাঁহার শিক্ষার অভাব থাকিয়া যাইতেছে। এখনকার এই কেন্দ্র-হীন, টলমলে; বিকল শিক্ষা, শিক্ষার দিকে বেশী ঝুঁকিতেছে কি অশিক্ষার দিকে বেশী ঝুঁকিতেছে তাহা ঠিক করা বড়ই কঠিন। এখন সমাজের অন্য সকলবিষয়ের ন্যায় এ শিক্ষাটাও যেন খেচুড়ি পাকাইতেছে, যতদিন মা সন্তানদিগকে শিক্ষা না দিতে পারেন, স্ত্রী সঙ্গিনীর উপযুক্ত না হন ততদিন এ শিক্ষার ডালে চালে আর মিশিবার আশা দেখিতেছি না। সেরূপ শিক্ষার মত শিক্ষা পাইলে কি আর সেদিন সামান্য একটু সুবিধারজন্য কলেজের ছাত্রগণ স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা কহিয়া,দেশের মাথা হেঁট করিতে পারে—না আত্মসম্মানের মাথাখাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকগণ শ্বেত হস্তের লগুড় খাইয়া ম্লান শুষ্কমুখে গৃহে ফিরিয়া আসেন?

যদি আত্মসম্মানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতেন, ইহা রক্ষার জন্য যত কিছু কষ্ট, অসুবিধা, ত্যাগস্বীকার সামান্য বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা পাইতেন—তাহাহইলে কি আর এরূপ কষ্টকর, হাস্যকর অপমান-জনক ব্যাপার ঘটিতে পারিত? যদি আত্মসম্মান হারাইয়া গৃহে আসিলে মা বলিতেন, 'এমন পুত্র আমার সন্তান নহে, দেশের কলঙ্ক,' স্ত্রী বলিতেন 'স্বামি তোমার এ নিন্দা শুনিবার আগে আমি মরিলাম না কেন'—তাহাহইলে কি আর দেশের এ ভাব থাকে? কিন্তু কুন্তীর মত মাতারই ভীমার্জ্জুনের মত সন্তান হইতে পারে, আর বীরাঙ্গনা রাজপুত-ললনারই যশোবন্তের ন্যায় বীর স্বামী শোভাপায়—যিনি পরাজিত স্বামীকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিতে পারেন—"আমার স্বামী নাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, আমি অনুমৃতা হইব—আমার স্বামী শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন—ইহা নিতান্ত অসম্ভব—"

আর এদেশের মাতাদের গর্ব্বে ভীমার্জ্জুন হন ত সে ভারতউদ্ধারের বিপিন ও কামিনী কুমার। সে ভীমার্জ্জুন অন্ধকার রাত্রে একাকী—"দ্রৌপদী পরাক্রমে" ("মা সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম পরাক্রম") "বামজুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ" করিয়া, 'বিষম বাহু তুলাইয়া,' 'দন্ত কিটিমিটি করিয়া' 'সঘনে ইংরাজ বঁটাইয়া' ভারত উদ্ধার করিতে পারেন বটে—কিন্তু বাতাসের শব্দে ভয়ে পলাইয়া যান। ইহা না করিয়াই বা পুরুষেরা কি করেন? এমন রুগ্ন দুর্ব্বল জাতির নিকট ইহা হইতে অধিক সাহস কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

যেখানে আপনার বলের উপর বিশ্বাস নাই, বরং বিপরীত বিশ্বাস, সেখানে কাজেই নীতির আদর্শ স্বরূপ হইয়া, এক গালে চড় মারিলে আর একটি গাল পাতিয়া দিতে হয়, তবে দুঃখ এই,সে সততার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না, বীর সবল পুরুষের সেরূপ ব্যবহার দুর্ব্বলের হৃদয় স্পর্শ করে, কিন্তু সবলের প্রতি দুর্ব্বলের ওরূপ নিষ্ঠতাচরণ হাস্যজনক হইয়া দাঁড়ায়।

একমাত্র শরীরের বলের অভাবেই যে এরূপ হইয়া থাকে তাহাও নহে, মনের বল

থাকিলে ভাঙ্গা শরীরও তাজা হইয়া উঠে, সাহসী তেজস্বী দুর্ব্বল-কায়ের নিকট একজন ভীরু ভীম-মাংসপেশী পালোয়ানেরও অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। শরীরের বল থাকিলে স্থল বিশেষে মনের বল বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনের বলের নৈতিক সাহসের প্রভাব আরো অধিক,—তবে যেখানে এ উভয়েই পূর্ণ বিকাশ সেখানে মণিকাঞ্চন-যোগ! বাঙ্গালী জাতির এই দুই রকম বলেরই অভাব। বাল্যকাল হইতে এ জাতির মনের স্বাস্থ্য ও শরীরের স্বাস্থ্যকে রীতিমত উপায়ে এমন পিশিয়া ফেলা হয় যে পরে যত্ন করিলেও সেই ভাঙ্গা শরীর, ও নিস্তেজ মনকে আবার গড়িয়া তোলা একরূপ অসাধ্য। বঙ্গদেশের ভদ্র পরিবারের মাতারা এ বিষয়ে এক রকম উ[illegible] বুঝিয়া থাকেন। ব্যায়াম প্রভৃতি কো[illegible] শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, কি[illegible]ন কোনরূপ সাহসের কাজ যাহাতে একটুও বিপদের সম্ভাবনা- তাহাতেই ছেলেবেলা হইতে তাঁহারা সন্তানদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন।

ছেলেরা ছুটাছুটি করিলে--কি গাছে চড়িতে গেলে, কি কোন রকম একটা ব্যায়ামের মত খেলা করিতে গেলেই সেটা দুরন্তপনা;—কোন ছেলে কুস্তি করিতে যদি গেল—অমনি মেয়েরা বলিয়া উঠিলেন—'ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে অধঃপাতে গেলি—আরে লেখাপড়া কর, শেষ কালে কি দরোয়ানগিরি করে খাবি নাকি" যারা চাহেন শিষ্ট শান্ত হইয়া,' ছেলেগুলি সারাদিন বই হাতে করিয়া ঘরে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে, ছেলেদের লেখা পড়া করিতে হইবে এটা তাঁরা বেশ বুঝিয়াছেন—সেইজন্য আর কিছু না হোক—বাঙ্গালা দেশে ছেলেদের লেখা পড়াটা হইতেছে, কিন্তু যে কাজে কলমের সঙ্গে যোগ নাই, তাহাই যেন অপমানের কাজ, ছোট লোকের কাজ। এরূপ শিক্ষায় ছেলেদের মান-অপমানের জ্ঞানটা কিরূপ টনটনে হইয়া উঠে—তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। একজন যুবা গল্প করিতেছিলেন—একদিন ট্র্যামগাড়ীতে যাইতে যাইতে ট্র্যামের ঘোঁড়াটা দুষ্টমি করিয়া ট্র্যামের লাইন হইতে গাড়ী খানা সরাইয়া ফেলিল—চালক অনেক কষ্টে লাইনের উপর গাড়ী আনিতে পারিতেছে না, দেখিয়া যুবক নামিয়া গাড়ী ঠেলিতে গেলেন—ভাবিলেন দেখাদেখি আরো দুই একজন যাত্রী নামিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে আসিবে। কিন্তু কেহই আসিল না, তিনি অশ্ব-চালকের সঙ্গে বহুকষ্টে গাড়ীখানি লাইনের উপর তুলিয়া যখন উপরে উঠিলেন তখন আর সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—সে হাসির অর্থ এই, এত নীচ কাজে তোমার প্রবৃত্তি হইল।—"

আর এরূপ স্থলে ইয়ৌরপের এক জন ডিউকও অপমান জ্ঞান করিতেন না, বরং অমন অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই তাঁহার লজ্জা হইত।

কেবল শরীরের বলিয়া নহে, ছেলেবেলা হইতে বালকদের মনের নিস্তেজতারও বিধিমত প্রণালীতে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়।

মা যদি জানালা হইতে একজন ইংরাজ-সৈন্যের কাছ দিয়া ছেলেকে যাইতে দেখিয়াছেন—অমনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া তবে নিশ্চিন্ত। বাহিরে কোন গোল-যোগ হইলে যুবা পুত্রকে যে মাতা দুর্ব্বলের সাহায্য জন্য পাঠাইবেন তাহা নহে—কোন মতে ছেলে যাহাতে সেখানে না যায় এই তাঁহার চেষ্টা, কি জানি যদি বিপদ ঘটে।

এইরূপ শিক্ষায় যদি বালকদের "দ্রৌপদী পরাক্রম"ও থাকে, সেও জন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলে,নহিলে ইহাতে ত পিপালিকা পরাক্রমও থাকিবার কথা নহে। কাজেই যদি এক-স্থানে একজন ইংরাজ স্বদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করে ত আর দশজন দাঁড়াইয়া একটা তামাসার মত দেখিতে থাকিবে—এমন স্থলে যদিও শরীরের বলের অভাব হয় না, কেবল সাহসের অভাব;—নানা রকমে মন এমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে এক-জনের বিরুদ্ধে দশজন অগ্রসর হইতেও যেন অপারক। ইহাতে হয় এই, স্বাভাবিক প্রতিশোধ স্পৃহাটা থাকিয়া যায়,আর নিতান্ত অনুপযুক্ত স্থানে গিয়া তাহার তালটা পড়ে। খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, ইলবার্ট বিলের হেঙ্গামার সময় দুর্ব্বল ইংরাজ স্ত্রী-লোকদের একাকী পথে হাঁটিবার যো ছিল না, স্কুলের ছোকরাদের যত রোখ ইহাদের উপর হইত। ইংরাজদের প্রচারিত ঐ সকল কথা যে-সমুদয় সত্য তাহা না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে যে কিছু সত্য ছিল না এমনও মনে হয় না। ইহা হইতে অশিক্ষা কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে? স্ত্রীলো-কের কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুর্ব্বলের প্রতি ক্ষুদ্র অত্যাচারও যেদেশে পাপ বলিয়া গণিত সেই দেশের আজ এরূপ কাপুরুষতা এরূপ নৈতিক অবনতি দেখিলে দুঃখের সীমা থাকে না।

মাতার হৃদয়ের শিক্ষা, ভগিনীর মমতার শিক্ষা,পত্নীর প্রেমের শিক্ষায় ছাড়া এ সকল নৈতিক ভাব— আর কিসে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারে? ইহাঁরা ছাড়া আর কাহার যত্নে বুদ্ধির সহিত শরীরের বল বৃদ্ধি হইবে, নীতির সহিত ধর্ম্মের বলে হৃদয় বলীয়ান হইবে? কে আর দুর্ব্বলের রক্ষক, অত্যা-চারের নিবারক হইতে শিখাইবে? যদি ঘরের শিক্ষায় এসব না হইল ত বাহিরের শিক্ষায় আর কতদূর হইতে পারে? মাতা যদি বোঝেন, পুত্রের লেখাপড়া শিখা যেমন দরকার—ব্যায়াম শিক্ষা তেমনি দরকার, তাহা হইলে প্রতি ঘরে ব্যায়াম শিক্ষা অব-শ্যই চলিবে। মাতা যদি বোঝেন—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি যেমনি আবশ্যক, নীতির বিকাশ তেমনি আবশ্যক, শরীরের বল যেমন আ-বশ্যক, মনের বল, ধর্ম্মের বল তেমনি আ-বশ্যক—তাহা হইলেই সন্তানদের যথার্থ শিক্ষা হইবে—তাহা হইলেই বঙ্গবাসীকে একদিন উচ্চজাতি হইতে দেখিবার আশা করা যাইতে পারে।

দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে অন্যায় কার্য্য করিলে যদি আত্মীয় মহিলাদের প্রাণে আঘাত লাগে যদি মহত্ব, মনুষ্যত্ব আ-ত্মসম্মান রক্ষার জন্য সহস্র বিপদে পড়িয়াও

মাতার প্রসন্নমুখ, স্ত্রী বোনদিগের উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়—তবে কোন পুরুষ কণ্টকবন দিয়া ও দ্বিগুণ বল-সহকারে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে না পারেন ? যদি পুরুষেরা জানেন, মনুষ্যোচিত, পুরুষোচিত কার্য্য করিলে তাঁহারা স্ত্রীলোকের ভালবাসার ও সম্মানের পাত্র হইবেন, এবং কাপুরুষ হইলে তাহাদের কষ্টের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হইবেন—তাহা হইলে সাধ্য কি যে তাঁহারা সে ঘৃণা—সে সন্তুষ্টির দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবেন।

কেহ মনে করিবেন না—আমি গর্ব্ব করিতেছি—তাহা নহে—তবে মনুষ্যচরিত্র দেখিয়াই একথা বলিতেছি। পুরুষের সন্তোষ সাধনের দিকে যেমন স্ত্রীলোকের লক্ষ্য, তেমনি স্ত্রীলোকদের নিন্দা প্রশংসার দ্বারা—(জ্ঞাত ভাবেই হউক অজ্ঞাত ভাবেই হউক) পুরুষদের কার্য্যও পরিমিত হইয়া থাকে। নহিলে আর দুর্ব্বলা রমণীদের অন্য উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকদের অশ্রু-অস্ত্র পুরুষদিগের নিকট শাণিত কৃপাণ হইতেও অধিক ধারাল—এ ভরসাটুকু মনে আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। তাই বলিতেছি—আমরা যদি সুশিক্ষিত হই, আমরা যদি বুঝিয়া সন্তানদের শরীর মন গঠিত করিতে পারি, ভাল মন্দ প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাহাদের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে—শিক্ষা দিই, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই কাল ফিরিয়া যায়।

এই জন্যই স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, এই জন্যই বাঙ্গালায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু জমি বাঁধিয়া না লইলে যেমন অট্টালিকা দাঁড়ায় না, তেমনি শিক্ষাকে দাঁড় করাইবার জন্য প্রথমে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করা চাই—নহিলে কাঁচা জমিতে যত কেন উঁচু করিয়া শিক্ষা নির্ম্মাণ কর না কেন—তখনি হুস করিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা! এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ না করিতেছে ততক্ষণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় হইবে না, আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার দিকে এত লক্ষ্য পড়িয়াও সে সাধারণতঃ নভেল পড়িতে শেখা মাত্র স্ত্রীশিক্ষার সীমা হইয়া দাড়াইতেছে তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল ইহাঁদের মনে শিক্ষার আবশ্যক তেমন দাঁড়াইতেছে না বলিয়া। টাকার জন্যই বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন—পুরুষানুক্রমবাহী এ বিশ্বাস তাঁহাদের মন-হইতে দূর হইতেছে না, সেই জন্যই শিক্ষার এত আড়ম্বরেও বঙ্গ-দেশে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি অল্পই হইয়াছে।

যাঁহারা 'শিক্ষিতা'নাম পাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, কেবল যে অল্প তাহাও নহে, তাঁহারা যেন বাঙ্গালায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়াছেন। ইঁহাদের শিক্ষা এতদূর ইংরাজি রকমে হইতেছে যে সাধারণ রক্ষণশীল সমাজ—কোনমতেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতে প্রস্তুত নহেন, অনেকের আবার ইচ্ছা থাকিলেও—সমাজে থাকিয়া এরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুবিধা হইয়া

উঠিতেছে না। এরূপ শিক্ষার উপকার অধিক কি অপকার অধিক দোষ অধিক কি গুণ অধিক আমি তাহার এখন সমালোচনা করিতেছি না—কিন্তু কার্য্যে সে শিক্ষার ফল অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহাই বলিতেছি। ইহাতে আর একটি মন্দ ফল এই দেখিতেছি যে স্ত্রীমহলে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, এইরূপ শিক্ষিত আর অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি পর পর ভাব আসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষিত স্ত্রীলোক শুনিলেই কি না জানি একটা অপরূপ জন্তু ভাবিয়া একজন অন্তঃপুর মহিলা তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন—শিক্ষিতারাও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদিগকে দীনহীন কৃপানেত্রে দেখিয়া ইহাদের সহিত সমক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও কুণ্ঠিত হইবেন। এইরূপে স্ত্রীসমাজের মধ্যেও পুরুষদের সমাজের ন্যায়—যা আগে কখনো ছিল না এমন একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক পর পর দলাদলি ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে—ইহাতে সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, শিক্ষাটা আদর্শ হওয়া দূরে থাকুক, বরঃ কেমন একটা গোলমেলে ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে, যেন ভালরকম শিক্ষা পাইলেই মেম সাজিতে হইবে, দেশী ভাব ধুইয়া ফেলিতে হইবে ইত্যাদি।—

এখন সুসঙ্গত রূপে স্ত্রীশিক্ষা সম্পন্ন করিতে হইলে—স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আস্থা জন্মাইয়া ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। এজন্য অনেকে অনেকরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমিও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাই, প্রস্তাবটি আর কিছু নহে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক দিগের সহিত শিক্ষিত মহিলাদের সম্মিলন।

এইরূপ সম্মিলনে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে পরস্পরের দোষগুলি ভুলিয়া পরস্পরের নিকট পরস্পরে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। অন্তঃপুরের মহিলাগণ—সমধিক বিদ্যাবতী মহিলাদিগের সহিত সমক্ষেত্রে মিশিলে কথায় বার্ত্তায় দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের কাছে অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অনেকটা শক্তি জন্মিবে, অনেক কুসংস্কার দূর হইবে, এবং এইরূপে শিক্ষার দিকে যথার্থ একটা টান হইবে। আর ইহাদের সংশ্রবে আসিয়া শিক্ষিত মহিলাদেরও অনেক ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হইবে, যাহা কিছু দেশের তাহাই যে ত্যজ্য নহে, অন্তঃপুরের খাঁটি সরলতা, দেশীয় অনেক রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন—এক কথায়, বিদেশের অনুকরণে দেশের যাহা কিছু ভাল হারাইয়াছেন—আবার তাঁহারা তাহা লাভ করিতে পারিবেন—এইরূপে উভয়তঃ উভয়ের কাছেই শিক্ষা লাভ হইবে।

আর একটি কথা কেবল লেখাপড়া শিখিলেই ত আমাদের চলিবে না, ইহার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আমাদের শিখিবার আছে। বর্ত্তমান সমাজের যেরূপ বিপ্লবের অবস্থা, কালের স্রোতে যেরূপ

দিকে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে দেশের উপযোগী করিয়া, দেশীয় ভাবের সহিত সাম্য রাখিয়া সমাজের পুরাতন আচার ব্যবহার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া পিটিয়া না লইলে চলিতে পারে না। তবে যিনি অন্ধ হইয়া নৌকায় বসিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহারও সেই ভাসিতে হইবে তবে চোখ খুলিয়া যাইতে পারিলে তিনি যেমন হাল ধরিয়া ইচ্ছামত সুপথে যাইতে পারিতেন তাহাই পারিবেন না। আজ কাল স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী অনেকে মহিলাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতে চান, অনেকে বা ইচ্ছা না থাকিলেও দায়ে পড়িয়া স্ত্রীকে বাহিরে আনেন—অথচ ইহার আগে যে সোপান দিয়া উঠিতে হইবে—এজন্য স্ত্রীদের যেরূপ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক তাহা হয়ত অনেক স্থলে হইয়া উঠে না। ইহাতে দাঁড়ায় এই, সমাজে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়—এবং সেই দৃষ্টান্তে বিপক্ষ লোকদিগের হাতে একটা অস্ত্র দেওয়া হয়। গত ফাল্গুণ মাসের ভারতীতে সমস্যাশীর্ষক প্রবন্ধে লেখক এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—আমরা তাহা এইখানে না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—পথ অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এই জন্য পুরাকালের পথিক বধূজনের বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথেও বিপদ নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজকর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রীপুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্পলোকের আছে। এই জন্য আজ কাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায় তাহা হইলে সমাজনিয়মের বাধা আর বড়কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধ প্রথা সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রেই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার একজিবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল,

বিশ বৎসর পুর্ব্বে ইহার শিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই তবে অপ্রস্তুতভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্র বেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের ভদ্রবেশ পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্র সমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সাড়ি পরিয়া ভদ্র সমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিবির্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজি-বিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভন ভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজন সমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রুপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান অভ্যাস করাও তবেই বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচকা মত বা উপস্থিত সুবিধায় খাতিরে এরূপ ভদ্রজন নিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র-বঙ্গ সমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।”

কেবল পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে—স্ত্রীলোকদিগের যদি অন্তঃপুরের বাহির হইতে হয়, জনসমাজে মিশিতে হয়—তবে আরো অনেক রূপ উপযোগী শিক্ষার আবশ্যক। যে সকল মহিলাগণ এ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ঠেকিয়া শিখিয়া ইহার মত পরণ পরিচ্ছদ চালচলনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে এ সকল বিষয়ে অন্য মহিলাগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা-পাইতে পারেন।

যাঁহারা স্ত্রীদিগকে জনসমাজে মিশাইতে চান তাঁহারা আগে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে মিশাইতে শিখাইয়া তাহার পথ সহজ করিয়া আনুন,—নহিলে ‘অসূর্য্যম্পশ্যা’ অন্তঃপুর কামিনীকে কোন মতেই শোভনভাবে বা-হিরে আনা যায় না।

এইরূপ সম্মিলনীতে যে কতদূর উপকার হইতে পারে—তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। অনেক পুরুষে চাহেন তাঁহাদের স্ত্রীরা গান করিতে এবং বাজাইতে শিখুন—কিন্তু সমাজে থাকিয়া

সেরূপ শিক্ষার উপায় নাই, এইরূপ সম্মিলনীতে তাঁহারা অনায়াসে এসাধ পূর্ণ করিতে পারেন—মেয়ে মেয়েতে গান বাজনা হইলে তাহাতে কেহই দোষ মনে করিবেন না।

আরো একটি কথা, এইরূপ সম্মিলনে নির্ব্বিঘ্নে, অনিষ্টের বিন্দুমাত্র বিনা-আশঙ্কায় মহিলাদের মনের প্রশস্ততা লাভ হইতে পারে। নিতান্ত সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবে—সংসারের অন্ধকার ভাবে ক্রমেই স্ত্রীলোকদিগের মনের আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে—তাহারা সম্মুখে যাহা দেখিতে পায় তাহাই কেবল দেখে, দূরের বস্তু তাহাদের চক্ষে পৌঁছে না, তাহাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইয়া যায়; এই সম্মিলনে তাহাদের নানারূপ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে গেলে—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সম্মিলনী দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা অন্য উপায়ে তাহা হওয়া সম্ভব মনে হয় না। স্ত্রীলোকদের এইরূপ সম্মিলনী যে বঙ্গদেশে একটা আকাশ কুসুম মাত্র একটা যে নিতান্ত নূতন কথা তাহাও নহে। কিছুদিন হইতে বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে শিক্ষিত ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের একটি সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। তবে এ সভায় পুরুষ যাইতে পারেন—এবং অন্তঃপুরের মেয়েদের লইয়া এ সভা নহে—সেজন্য এ সভার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ;—কারণ যে কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলা শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত তাঁহারা আর কয়জন—আর দেশের সমস্ত মহিলাই প্রায় অন্তঃপুর-বদ্ধা—সুতরাং যদি অন্তঃপুর ছাড়িয়া দিয়া কয়েকটি মেয়ে লইয়া সভা করা হয়—তাহা হইলে দেশ আর সে উপকার পাইল না—দেশের একটি সামান্য ভাগে মাত্র সে উপকার আবদ্ধ থাকিল। তবে ইহাতেও যে লাভ নাই তাহা বলিতেছি না, প্রথমতঃ বাঙ্গালার একটি মহিলার উন্নতি হইলেও দেশের উপকার কল্পনা করিতে হইবে, তাহার পর এমনি করিয়া—এক একটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে, এমন কি এক আধটি লোকের দৃষ্টান্তেও দেশের মধ্যে ক্রমে অনুকরণের ঢেউ উঠে।

সাধারণ মহিলা সম্মিলনী কিরূপ আবশ্যক হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে, শিক্ষিত যে সকল মহিলাগণ দেশের উপকার করিতে যত্নশীল—তাঁহারদের যত্নে যে শীঘ্রই এইরূপ একটি সম্মিলনীর উপায় হইতে পারে ইহা আমার বিশ্বাস। ইচ্ছা থাকিয়াও ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ এখন বরং তাঁহারা দেশের যতটা কাজ করিতে না পারিতেছেন তখন তাহা পারিবেন। এইরূপ সম্মিলনী করিতে হইলে একটি প্রধান নিয়ম এই করা চাই,

যে পুরুষের নাম গন্ধ সেখানে থাকিবে না, তাহাহইলেই অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ অবাধে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তারপর এখানে মহিলা দিগের নানারূপ খেলা, গান-বাজনা গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের বন্দবস্ত থাকিবে। বিজ্ঞান-শিক্ষা, কি বক্তৃতা প্রভৃতি আড়ম্বর এখানে কিছুই

থাকিবে না, তাহাহইলেই ক্রমে স্ত্রীলোক-দিগের কাছে ইহার আকর্ষণ লোপ পাইবে—কেন না বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আসক্তি জন্মিবার জন্য যেরূপ রুচির আবশ্যক আমাদের সাধারণ মহিলাদের ভিতর তাহা এখন পর্য্যন্ত জন্মে নাই, তবে ছায়াবাজি রাসায়নিক পরীক্ষা প্রভৃতি যাহা দেখিতে আমোদ হয়—তাহা কোন কোন মহিলা দ্বারা দেখান যাইতে পারে। নির্দ্দোষ আমোদ করিবার বাসনাটা মানুষের এত প্রবল—যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয়—তাহাহইলে তাহাদ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয়—হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। যদি শিক্ষিত মহিলাদিগের মনে উদ্দেশ্য থাকে যে তাঁহারা অন্য মহিলাদিগের সুশিক্ষা দিবেন তাহা হইলে তাঁহারা যে গল্প করিবেন, কথা কহিবেন তাহার মধ্যেই সেসকল থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া এইখানে মহিলারা অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারেন—কিরূপে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে, পরণ পরিচ্ছদ কিরূপ করিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার পর সম্মিলনীটা একবার দাঁড়াইয়া গেলে তখন মহিলারা কি চাহেন, কিসে তাঁহাদের যথার্থ উপকার হয়—ক্রমে বেশ বুঁঝা যাইবে এবং তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র উপায়ও বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু প্রথমেই এইরূপ সম্মিলনীর জন্য একটি সভা স্থাপন করা কিছু সহজ নহে, এবং হইলেও প্রথমেই তাহাতে তত বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না, আমাদের দেশের মেয়েদের বদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের ভাবগতিক এরূপ বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে হঠাৎ এরূপ সভাতে তাঁহারা আসিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ। এজন্যও আবার কতক পরিমাণে তাঁহাদের রুচিটাকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাহাদের এই সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে হইলে প্রথমে আর একটি কাজ করিতে হইবে, প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলা তাঁহার পিতা, ভ্রাতা এবং স্বামীর আলাপী লোকদিগের বাটীর স্ত্রী দিগকে (যাঁহারা আসিবেন) যদি তাঁর গৃহে মাঝে মাঝে বিকালে নিমন্ত্রণ করেন,—এবং নিমন্ত্রণ করিয়া সেইরূপ গল্প স্বল্প আমোদ প্রমোদ করিয়া মেশামেশি করিতে থাকেন তাহা হইলে মহিলাদিগের ক্রমে এরূপ দিকে একটি রুচি জন্মিবে এবং এরূপ স্থলে আসিবার সঙ্কোচও ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেশীয় মহিলাদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত করিবার জন্য আজ কাল কোন কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আর আমাদের ঘরে ঘরে, সদ্ভাব-স্থাপন করিতে কি দেশের শিক্ষিত মহিলাগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না? যদি প্রথমে এক একটি গৃহে ইহার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে সহর গ্রামের বহু গৃহে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মিলনী আরম্ভ হয়, তখন পরে সময় বুঝিয়া পুরুষদের ইণ্ডিয়া ক্লবের মত একটি সম্মিলনী সভা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে ত দূরের কথা—আপাততঃ সকল শিক্ষিত মহিলাগণ অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহা-

দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যদি সমস্ত বঙ্গমহিলা সমাজকে এক করিয়া ফেলিতে যত্নশীল হন—তবেই যথেষ্ট হয়।

অনেক আশা করিয়া আমি এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছি। শিক্ষিত মহিলাগণ এবং দেশহিতৈষী পুরুষগণ এ প্রস্তাবটি যদি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া—ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন তবে কতদূর আনন্দিত হইব বলিতে পারি না। অন্ততঃ বিষয়টির প্রতি একটু মনোযোগ দিয়া তাঁহারা ইহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখুন এই প্রার্থনা করি।

শ্রী— দেবী

---

# রসিকতার ফলাফল।

মাসিক পত্রে ভারি একটা মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পাঠ করিয়া আমার দুই চারি জন পরম বন্ধু অত্যন্ত হাসিয়াছেন, শত্রু পক্ষও হাসিতেছে। আমার কোন লেখায় এত গোলমাল হয় নাই।

আষ্টপাইকা, সাপ্‌টিবাড়ি ও টাঙ্গাইল হইতে তিন জন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অর্থ কি?

শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—"গোবিন্দ বাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে কি ফরাসডাঙ্গার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? মোতায়েদ্‌পুরের অশ্বিনীকুমার বাবুর যে দুইটা ষাঁড় খেপিয়া তিনটে মানুষকেজ খম করিয়াছে তাহাদের কি ইহাতে চৈতন্য হইবে? তবে অকারণে এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য কি জানিতে ইচ্ছা করি!"

অজ্ঞান তিমির নিবারণী পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে—"গোবিন্দ বাবু মনে করিয়াছেন তিনি ভারি হাসাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া আমাদের হাই উঠিয়াছিল চোখে জল আসিয়াছিল। তাঁহার লেখা রসিকতা হইতে যে কত রসি তফাতে, গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া তাহার একটা সন্তোষজনক সর্ব্বে করাইয়া লইলে স্থির জানা যাইতে পারে, আমরা নির্দ্ধারণে অক্ষম।" আমার লেখা পড়িয়া যাহারা হাসে নাই এই সমালোচনা পড়িয়া তাহারা হাসি রাখিতে পারে নাই।

জ্ঞান প্রকাশ বলিতেছেন "এই লেখার ভাবে বোধ হয়, অল্পবয়স্কা বিধবাদের দুঃখে লেখক আমাদিগকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এমন সহৃদয় যে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনিলে আমরা চোখের জল সাম্‌লাইতে পারি না অথচ গোবিন্দ

বাবুর এ লেখা পড়িয়া আমাদের কাঁদা দূরে যাউক হাসি আসিয়াছিল!"

সম্মার্জ্জনী নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রে লিখিত হইয়াছে—"হরিহরপুরের ম্যুনিসিপলিটির বিরুদ্ধে গোবিন্দ বাবুর যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু একটি কারণে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি—ইনি পরের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। একস্থলে বলিয়াছেন—"জন্মিলেই মরিতে হয়"—এই চমৎকার ভাবটি যদি গোবিন্দ বাবুর নিজের হইত তবে আমরা তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু যখন দেখিতেছি ইহা তিনি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে অকাতরে চুরি করিয়াছেন তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া ধন্যবাদের বিপরীত যদি কিছু থাকে তবে তাহাই দিতে ইচ্ছা হয়। নিম্নে আমরা বমালসুদ্ধ গ্রেফ্‌তার করিয়া দিতেছি, পাঠকেরা দেখুন্।

গিবন্ বলিয়াছেন—"রাজ্যে রাজা না থাকিলে সমূহ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।" গোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন—"একে অরাজকতা তাহাতে অনাবৃষ্টি—গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।" সংস্কৃত শ্লোকটাও কালিদাস হইতে চুরি!

রস্কিনে একটি বর্ণনা আছে—"আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে।" গোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন—"পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধন বাবুর টাকের উপরে চিক্‌চিক করিতেছে।" কি আশ্চর্য্য চুরী! কি অদ্ভুত প্রতারণা!! কি অপূর্ব্ব দুঃসাহসিকতা!!!"

সংবাদ সার বলেন—"রামধন বাবু যে কে তাহা আর বুঝিতে বাকী নাই। ইনি যে নেউগীপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণ বাবুর টাক নাই বটে কিন্তু আমরা সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়!"

আমার প্রবন্ধের বিষয় লইয়া এত তর্ক উঠিয়াছে যে আমার নিজেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। তীক্ষ্ণ যুক্তির দ্বারা "সম্মার্জ্জনী" এমনি প্রমাণ করিয়াছেন যে আমার উক্ত প্রবন্ধ হরিহরপুরের ম্যুনিসিপলিটির বিরুদ্ধে লিখিত যে আমার আর কথাটি কহিবার যো নাই। কিন্তু হরিহরপুর চব্বিশপরগণায় না তিব্বতে না হাঁসখালী সুবডিবিজনের অন্তর্গত আমি কিছুই অবগত নহি, সেখানে যে ম্যুনিসিপলিটি আছে বা ছিল বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর।

সংবাদসার অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি নেউগীপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ত্রিবেদীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছি। ইহার বিরুদ্ধে আমি কোন প্রমাণ দিতে পারি না। আমি একজন শ্যামাচরণকে চিনি বটে, কিন্তু সে ত্রিবেদী নয় সে কুণ্ডু, আর তার বাড়ী নেউগাপাড়ায় নয় ঝিনাইদহে,

আর, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় টাক থাকা চুলায় যাক্ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই নাই। দুইটি ভাগিনেয় আছে বটে।

যাঁহারা বলেন আমি বরাকরের পাথুরে-কয়লার খনির বিষয়ে লিখিয়াছি—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, উক্ত খণি আছে কি না, এবং কোথায় আছে, এবং থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি, সমস্ত যদি আমাকে সবিশেষ লিখিয়া পাঠান, তবে পাথুরে কয়-লার খণি-সম্বন্ধে আমার শোচনীয় অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়। যে যাহা বলে বলুক কিন্তু "লুনের ট্যাক্স" "বিধবা বিবাহ" "কিম্বা" গাওয়া ঘি "সম্বন্ধে" আমি যে কিছুই বলি নাই তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি!

এদিকে ঘরে-বাহিরে গোল বাধিয়া গেছে। অনেক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া আমি এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম, "এ জগৎটা পশুশালা!" ভাবিয়াছিলাম ইহা পড়িয়া পাঠকেরা হাসিয়া অস্থির হইবেন--আর কাহারও কথা বলিতে পারি না কিন্তু তিনটি পাঠক যে ইহা পড়িয়া হাসেন নাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। প্র-থমতঃ আমার শ্যালক আসিয়া আমাকে বিস্তর গালাগালি মন্দ দিয়া গেল—সে বলিল আমি তাহাকেই পশু বলিয়াছি—আমি বলি-লাম—"বলিলে অন্যায় হয় না বটে, কিন্তু তোমার দিব্য, আমি বলি নাই।" ঘরে ব্রাহ্মণী আজ তিন দিন ধরিয়া মুখ ভার করিয়া আছেন, বাপের বাড়ি যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। জমিদার পশুপতি বাবু থাকিয়া থাকিয়া রাগে তাঁহার গোঁফ-জোড়া বিড়ালের ন্যায় ফুলাইয়া তুলিতে-ছেন;—তিনি বলেন তাঁহার সহিত আমার কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকা সত্বেও আমি তাঁহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া অনধি-কারচর্চ্চা করিয়াছি—তিনি শীঘ্র আমার নামে নালিষ করিবেন, শুনিতেছি তিনটে কৌঁসিলি তাঁহার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছে। এদিকে পাকড়াশীদের বাড়ির জগৎচন্দ্র বাবু চা খাইতে খাইতে আমার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, তিনি এত হাসি-তেছিলেন যে তাঁহার চামচ হইতে চা পড়িয়া তাঁহার জামা ভিজিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যখনি পড়িলেন যে "এ জগৎটা পশু-শালা" অম্‌নি জগৎবাবুর হাত হইতে চা-সুদ্ধ চামচ ও কাগজ পড়িয়া গেল—তাঁহার স্বা-ভাবিক যক্ষ্মাকাশ দেখিতে দেখিতে প্রবল হইয়া উঠিল—কাশিতে কাশিতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার নাড়ি ছাড়িয়া গেল—আটটার সময় তিনি ইহলোক হইতে অপ-সৃত হইয়া গেলেন।

চারিদিকে আমাকে গালাগালি দিতেছে, রাস্তায় বাহির হইলে আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে। পাড়াসুদ্ধ লোকের ধারণা হইয়াছে যে আমার হতভাগ্য প্রবন্ধে আমি তাহাদের পরম পূজনীয় জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর অথবা ভাগ্নি-জামাইয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছি—তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ তাহারা কয়দিন ধরিয়া, অবিশ্রাম আমার জানলা দরজার প্রতি ইষ্টকপাত করিতেছে এবং আমার মস্তকের উপর যষ্টিপাত করিবে বলিয়া

প্রতিশ্রুত হইয়াছে। আমি ঘরবাড়ি বেচিয়া পালাইব স্থির করিয়াছি। আর যাহাই করি রসিকতা করিব না।

শ্রী [illegible] ঠাকুর।

---

# মনুষ্য স্বাধীন কি না।

আজিকালি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনাদর দেখা যায়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও দর্শন-শাস্ত্রের কতকগুলি গভীর প্রশ্ন স্বতঃই আমাদিগের মনোরাজ্যে আবির্ভূত হয়। যখনই আমরা শিশুদিগের ও অসভ্যদিগের জীবনের উপরে উত্থিত হই, যখনই আমরা আহার নিদ্রাদি নিত্যকর্ম্ম-সমাপন করিয়া গভীর চিন্তার নিমিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে অবকাশ পাই—তখনই কতকগুলি দুরূহ প্রশ্ন আসিয়া আমাদিগের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে। জ্ঞানী প্রবর সার্‌আইজাক্ নিউটন পদার্থতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুদিগকে বলিয়া গিয়াছেন 'Beware of Metaphysics' (সাবধান, দর্শনশাস্ত্রের কুহকে ভুলিও না।) কিন্তু তাঁহার এতৎ পরামর্শ সত্ত্বেও মনুষ্য উক্ত প্রশ্নগুলি হইতে উদ্ধার পায় নাই; অতি পুরাতন কাল হইতে অভিনব কাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রশ্নগুলি মনুষ্যের মন অধিকার করিয়াছে ও সম্ভবতঃ করিবে। আমরা এস্থলে যে সকল প্রশ্নের উল্লেখ করিতেছি তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—মনুষ্য স্বাধীন কি না।

মনুষ্য স্বাধীন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে এক পক্ষে কতকগুলি লোকের মত এই যে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে যাহা যাহা ঘটিবে সে সমুদয় পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত আছে আর তাহার বিপরীত পক্ষের কতকগুলি লোকের এই মত যে মনুষ্য কোন কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করে না, মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। পূর্ব্বোক্ত মতটিকে অদৃষ্টবাদ আর পশ্চাদুক্ত মতটিকে স্বাধীনতা-বাদ বলা যাইবে। আমরা প্রথমতঃ এই দুইটি অন্তিম পক্ষের মত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি; পরে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদিগের কি মত তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। কেহ কেহ এই সংসারে মনুষ্য জীবনের বিচিত্র পরিবর্ত্তন সমূহ দর্শন করিয়া, মনুষ্য জীবনের বাহ্যিক অধ্রুবতা দর্শন করিয়া মনুষ্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন। তাঁহারা দেখেন কোন ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়াও সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পান না, আর কোন ব্যক্তি অসৎপথগামী হইয়াও সাংসারিক সুখ সম্ভোগ করে, কোন ব্যক্তি অদ্য দীনদরিদ্র কল্য অপরিমেয় সম্পত্তির অধীশ্বর, আবার কোন ব্যক্তি অদ্য রাজসিংহাসনারূঢ় কল্য পথের ভিক্ষুক, কোন ব্যক্তি অশেষ যত্ন ও শ্রম করিয়াও একটি যৎসামান্য পদ পাইতেছেনা;

আর কোন ব্যক্তি অল্প আয়সেই সমাজে উচ্চ-পদ লাভ করিতেছে। শুনিতে আশ্চর্য্য কথা—তাঁহারা মনুষ্য জীবনের গতি এইপ্রকারে অনিশ্চিত দেখিয়াই, এই অনিশ্চিতকেই নিশ্চিত বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা বলেন মনুষ্যের জীবনে যাহা যাহা ঘটিবে সে সকল তাহার উপর নির্ভর করে না, সে সকল অদৃষ্ট নামক এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা এই অদৃষ্টবাদের সমর্থনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থিত করেন না; উহার সমর্থনে তাঁহা-দিগের বচন ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন প্রমাণ দেখান না--এই নিমিত্ত এইরূপ অদৃষ্ট-বাদকে আমরা বাচনিক অদৃষ্টবাদ (Dogmatic Fatalism) বলিব। লোকে আর এক প্রকারে অদৃষ্টবাদে উপনীত হইতে পারে--কিন্তু সে কেবল কল্পনা-স্রোতে ভা-সিয়া যাইয়া নহে, যুক্তিপথ অনুসরণ করিয়া। এই সংসারে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে, কি চেতনজগৎ, কি অচেতনজগৎ সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। আমরা যদি খনিজ পদার্থসমূহ পরীক্ষা করিয়া উদ্ভিদ্ সমূহ পরীক্ষা করি ও তৎপরে নিম্নতম জন্তু হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতম জন্তু (মনুষ্য) পর্য্যন্ত পরীক্ষা করি—তবে দেখিতে পাই যে ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণ নিয়ম বিরাজমান রহিয়াছে। আমরা আবার ইহাও দেখিতে পাই যে কোন একটি বস্তুর এক্ষণে যে অবস্থা তাহা উহার পূর্ব্বের অবস্থা হইতে কার্য্যকারণ নিয়মানুসারে উদ্ভূত হইয়াছে আবার পরে উহার যে অবস্থা হইবে তাহাও উহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উক্ত নিয়মানুসারে উদ্ভূত হইবে। এই সিদ্ধান্তটী জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তুর পক্ষেই যে কেবল প্রযুজ্য এমত নহে, সমুদয় জগতের পক্ষেও প্রযুজ্য। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা উহার আদিম অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আর উহার ভবিষ্যৎ অবস্থা উহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে—সুতরাং জগতের যে কোন সময়ের অবস্থা উহার আদিম অবস্থা হইতে উদ্ভূত। অত-এব মনুষ্যের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিবে পূর্ব্ব হইতেই সে সমুদয়ের সূত্রপাত রহিয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই সে সমুদয় অলক্ষিত ভাবে স্থিরীকৃত রহিয়াছে। এইরূপে অদৃষ্টবাদকে আমরা যুক্তিমূলক অদৃষ্টবাদ (Rational dogmatism) বলিব।

এই গেল অদৃষ্টবাদ—বাচনিক ও যুক্তি-মূলক। এক্ষণে যাহাকে আমরা উপরে স্বাধীনতাবাদ বলিয়াছি তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে। মনুষ্য সৃষ্টজগতের সর্ব্বপ্রধান জীব, মনুষ্যের প্রধান প্রকৃতি এই যে মনুষ্য স্বীয় কার্য্য সমূহের নিমিত্ত দায়ী। যদি আমরা বলি যে মনুষ্য বাসনার বশ-বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, তবে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণী এই দুয়ে প্রভেদ রহিল কি, মনুষ্যের তাহা হইলে আর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। আবার মনুষ্য বরাবরই যদি বাসনার বশ-বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তবে ত আর মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে বলা যায় না। মনুষ্য বাসনার দাস অতএব মনুষ্য তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী নহে। কিন্তু

আমরা বলি 'Thou must for thou canst' মনুষ্য স্বীয় কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী, কারণ তাহার স্বাধীনতা আছে। আমরা মনুষ্যকে ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করি, আমরা মনুষ্যকে তাহার কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী মনে করি; সুতরাং মনুষ্যকে স্বাধীন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। মনুষ্য বাসনার দাস নহে, মনুষ্য স্বাধীন। মনুষ্য যাহা যাহা করিবে, সে সমুদায় তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, অতএব তাহা চতুপার্শ্বস্থ ঘটনাবলী হইতে পূর্ব্বে থাকিতে গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে না। এইরূপ মতের নাম স্বাধীনতা-বাদ।

আমরা অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীনতাবাদ সংক্ষেপে এই দুয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছি; এক্ষণে উহাদিগের সমালোচনা করা যাইতেছে। অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে প্রধান এক আপত্তি এই যে অদৃষ্টবাদ সত্য হইলে মনুষ্যকে তাহার কার্য্যসমূহের নিমিত্ত দায়ী জ্ঞান করিতে পারা যায় না আর তাহা হইলে দণ্ডের কোন অর্থ থাকে না, দণ্ডের কোন ঔচিত্য থাকে না। যে ব্যক্তি অদৃষ্ট নামক এক অজ্ঞাত শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে তাহাকে কি বলিয়া তাহার কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী জ্ঞান করা যাইবে—যে বিষয়ে তাহার স্বীয় কোন ক্ষমতা নাই সে বিষয়ের নিমিত্ত কোন্ বিধি অনুসারে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে। আর সেরূপ দণ্ড দিলে লাভই বা কি হইবে—সে ব্যক্তি যে সংশোধিত হইবে এরূপও বলা যাইতে পারে না, অন্য কোন ব্যক্তি যে সংশোধিত হইবে এরূপও বলা যাইতে পারেনা; কারণ সকলই অদৃষ্টের অধীন। বাচনিক অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন আপত্তি উত্থাপিত করা যাইতে পারে না; যাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিমূলক প্রমাণ নাই তাহার বিপক্ষেও কোন যুক্তি-মূলক প্রমাণ নাই। যুক্তি-মূলক অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে মনুষ্য প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নির্জ্জীব পদার্থ নহে, চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলী যেরূপ মনুষ্যের উপর কার্য্য করে মনুষ্যও আবার সেইরূপ চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর প্রতি কার্য্য করিয়া থাকে; মনুষ্য যে কেবল নীত হয় এরূপ নহে মনুষ্য আবার নেতাও হয়। এই নিমিত্ত যাহা আমরা যুক্তিমূলক অদৃষ্টবাদ বলিয়াছি তাহাও আমরা প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যাহা আমরা স্বাধীনতা-বাদ বলিয়াছি তাহাও আমরা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না; মনুষ্যের ইচ্ছা যদি স্বাধীনতাবাদের অনুযায়ী স্বাধীনই হয়, তবে মনুষ্যের সমাজ থাকিতে পারে না। মনুষ্যের কার্য্য যদি স্বাধীন-ইচ্ছা নামক এক অজ্ঞেয় শক্তির উপর নির্ভর করে, মনুষ্য যদি সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যের অনধীন হয়, মনুষ্যের কার্য্য যদি কোন অবস্থাতেই পূর্ব্বে থাকিতে গণনা করিয়া বলিতে পারা না যায়, তবে মনুষ্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। অদ্য যাহা স্বাধীন-ইচ্ছা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল, কল্যও যে তাহা অনুমোদিত হইবে তাহার প্রমাণ কি—স্বাধীন

ইচ্ছা ত আর সামাজিক মান অপমানাদি উদ্দেশ্যের অধীন নহে। আবার মনুষ্যের ইচ্ছা যদি সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যের অনধীন হয়, তবে দণ্ডের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। মনুষ্য যাহা করিবে তাহা যদি কোন প্রকারে উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর না করে, তবে দণ্ড দিয়া কোন লাভ নাই। মনুষ্যের সমুদয় কার্য্যই যদি তাহার 'খাম্‌খেয়ালি' ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে আর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দণ্ড দেওয়ার প্রয়োজন কি। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি কি অদৃষ্টবাদ কি স্বাধীনতাবাদ এই দুয়ের কোনটিই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের কি মত তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে। আমাদিগের মতে মনুষ্যের ইচ্ছা উদ্দেশ্যের অধীন কিন্তু মনুষ্যের উদ্দেশ্য পসন্দ করিয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে আর এই ক্ষমতাই মনুষ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মনুষ্য বাহিরের ঘটনাদ্বারা কেবলই যে নীত হয় এরূপ নহে মনুষ্য স্বয়ং আবার নেতা হইতে পারে, স্বয়ং আবার বহির্জগতের উপর কার্য্য করিতে পারে। জগতের কোন এক অবস্থায় এক বিষয়ে নানা প্রকার কারণ উপস্থিত রহিয়াছে, এই সকল কারণের মধ্যে একটি মাত্র কার্য্যকর হইবে তাহা সত্য বটে; কিন্তু কোন্‌টী কার্য্যকর হইবে তাহা অনেক সময় মনুষ্যের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটিকে প্রাবল্য দেওয়াই মনুষ্যের যথার্থ স্বাধীনতা, মনুষ্যের অন্য কোন প্রকার স্বাধীনতা নাই, অন্য কোন প্রকার স্বাধীনতার প্রয়োজনও নাই। আমরা মনুষ্যের কার্য্য সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই বুঝিতে পারি যে মনুষ্য কখনও উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য করে না; শৈশব কালে মনুষ্য যে কোন কার্য্য ইচ্ছা করিয়া করে তাহার অব্যবহিত উদ্দেশ্য, হয় কোন সন্তুষ্টির সংঘটন, না হয় কোন কষ্টের নিরাকরণ। মনুষ্য যখন শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে তাহার উপায়কে উদ্দেশ্য স্বরূপ করিয়া কার্য্য করিতে শিখে। অবশেষে তাহার কার্য্যের প্রকৃতি এত জটিল হইয়া উঠে যে কষ্টের নিরাকরণ আর সন্তুষ্টির সংঘটনই যে তাহার উদ্‌যমনক্রিয়ার মূল নিয়ম ইহা অনেক সময় বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া পড়ে; কিন্তু আমরা মনুষ্যের কার্য্য-সমূহ সবিশেষ অনুশীলন করিলে এই দেখিতে পাই যে, মনুষ্য যে অভিপ্রায়েই কোন কার্য্য করুক্ না কেন, তাহার সমুদয় প্রকার অভিপ্রায়ই কষ্টের নিরাকরণ কিম্বা সন্তুষ্টির সংঘটনের সহিত মুখ্য ভাবেই হউক আর গৌণভাবেই হউক—সম্বদ্ধ। সে যাহা হউক, মনুষ্য যে উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য করে না এ কথা সহজ বুদ্ধি অনুসারে চলিলে সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অন্তিম পক্ষস্থিত অদৃষ্টবাদ ও অন্তিমপক্ষস্থিত স্বাধীনতাবাদ এই দুয়ের মধ্যে কোনটিই যুক্তিসঙ্গত নহে;

আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে উদ্দেশ্য পসন্দ করিয়া লওয়ার ক্ষমতাই মনুষ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মনুষ্য স্বীয় কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী; মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে আর সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মনুষ্য সৃষ্টজীব সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্য উদ্দেশ্যের অধীন হইয়া কার্য্য করে—সুতরাং মনুষ্যজাতি কোন স্থানে যত অধিক কাল বাস করে আর সেই স্থানের অবস্থা যত অধিক কাল একরূপ থাকে, মনুষ্যের সামাজিক নিয়মাবলী ও মনুষ্যের জীবনের গতিও তত অধিক নিশ্চিত হইয়া আইসে। মনুষ্য তাহার সমুদয় জীবনেই চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত স্বীয় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে থাকে; বস্তুতঃ এই সামঞ্জস্যীকরণই তাহার জীবন। চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলী হইতেই মনুষ্যের উদ্দেশ্য সমূহের উৎপত্তি—অতএব একইরকম ঘটনাবলী মনুষ্যজাতির প্রতি যত অধিককাল ধরিয়া কার্য্য করিতে থাকে, মনুষ্যের প্রকৃতিও সে ঘটনাবলীর তত অধিক অনুযায়ী হইয়া উঠে, মনুষ্যের জীবন স্রোতও সে ঘটনাবলীর উপযোগীতাতে তত অধিক আবদ্ধ হইয়া পড়ে। শিশুর জীবনে প্রথমতঃ নানাপ্রকার স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির জীবনেও সেইরূপ প্রথমতঃ নানাপ্রকার স্রোত দেখা যায়, কিন্তু স্থলবিশেষে অধিককাল ধরিয়া একরূপ ঘটনাবলীর অধীনে বাস করিয়া মনুষ্যজাতির প্রকৃতি সেই স্থলের ও সেই ঘটনাবলীর উপযোগী বিশেষ এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়—যেমন, পর্ব্বতবাসীদিগের প্রকৃতি একপ্রকার, নিম্ন প্রদেশবাসীদিগের আর এক প্রকার; গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসীদিগের প্রকৃতি একপ্রকার, শীত প্রধান দেশবাসীদিগের আর একপ্রকার, এবং নাতিশীত নাতি গ্রীষ্মদেশবাসীদিগের তৃতীয় আর এক প্রকার। একরূপ ঘটনাবলীর অধীনে থাকিয়া মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপে যতই অধিক কাল ধরিয়া বিশেষ একরূপ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, ততই উহার স্বাধীন বিকাশের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে, ততই উহা উক্ত বিশেষ মূর্ত্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে থাকে, একপ্রকার অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু মনুষ্য সময় সময় পুরাতন প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক প্রদেশে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, কিম্বা উক্ত পুরাতন প্রদেশেরই প্রাকৃতিক অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, আর তখন আবার মনুষ্যের প্রকৃতি নূতন করিয়া গঠিত হইতে থাকে, নূতন ঘটনাবলীর অধীনে আসিয়া মনুষ্যের পুরাতন প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে থাকে।

উপসংহারে, আমরা অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। যাঁহারা অদৃষ্টবাদ প্রচার করেন তাঁহাদিগের মতই যদি সত্য হয়, তবে তাঁহাদিগের উক্ত প্রচারের কোন সার্থকতা

সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে প্রবেশ করে, বলিতে গেলে তাহার চর্ম্মচক্ষের পাতা বন্ধ হইয়া আইসে—সে মানসচক্ষের দ্বারা বাহ্য জগৎকে মানসজগতে পরিণত করিয়া ফেলে। এই রকম করিয়া দেখিলেই বাহ্য-জগৎ দেখা হয়, শুধু চর্ম্মচক্ষে দেখিলে বাহ্যবস্তু বিশেষ দেখা হয় মাত্র, বাহ্য-জগৎ দেখা হয় না। বাহ্য-জগৎ বাহ্যবস্তুর সমষ্টি। সে সমষ্টি দেখিবার প্রকৃত চক্ষু চর্ম্মচক্ষু নয়, মানসিক চক্ষু;প্রকৃত শক্তি ইন্দ্রিয় নয়,আত্মা। ছায়াও চর্ম্মচক্ষে দেখিবার জিনিস নয়, মানস চক্ষে দেখিবার জিনিস। বৃক্ষের ছায়ায় বৃক্ষের আকার আছে মাত্র—বৃক্ষের ত্বকের ফাটাফুটো, ঢিপিঢাপি, আটাশেয়ালা, উই-পিপড়া কিছুই নাই, বৃক্ষের পাতার ভাল রঙ মন্দ রঙ কিছুই নাই, বৃক্ষের ফুলের কি গৌরব কি মলিনতা কিছুই নাই। অতএব বৃক্ষের ছায়ায় শুধু বৃক্ষের আকার আছে মাত্র—এবং সে আকার বড়ই বিশুদ্ধ, বড়ই সূক্ষ্ম, যেন একখানি ছায়া, একখানি স্বপ্ন, একটি কল্পনাময় কল্পনা, আত্মার ন্যায় শুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম। বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের আত্মা—বৃক্ষের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত—বৃক্ষের সূক্ষ্ম, সুন্দর, শুদ্ধ, স্বপ্নবৎ বৃক্ষত্ব মাত্র। সে ছায়া সূর্য্যালোকে দেখিও, যত পার দেখিও, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ লাভ করিবে। কিন্তু স্থির বায়ুতে একবার জ্যোৎস্নালোকেও দেখিও। জ্যোৎস্নালোকে সে ছায়া দেখিলে পাগল হইয়া যাইবে—সে ছায়া জ্যোৎস্নালোকে এতই কল্পনারূপী, এতই ভাবরূপী, এতই আত্মারূপী। সে আলোকে সে ছায়াকে কোন-কিছুর ছায়া বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় বুঝি সে ছায়া ইচ্ছাময়ের সাধের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সে ছায়া দেখিলে বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়। সে ছায়া না দেখিলে আধ্যাত্মিক জগৎ কাহাকে বলে বুঝিতে পারা যায় না। জড় হইতে আত্মার প্রভেদ যদি বুঝিতে চাও তবে সেই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের সেই ছায়ায় প্রবেশ করিও। ছায়া কিছুই নয় এমন কথা কি বলিতে আছে ?

যে ছায়ার কথা বলিতেছি সে ছায়া যে একেবারেই চোকে দেখিবার জিনিস নয় এমন কথা বলি না। প্রতিভা সম্পন্ন চিত্রকরের চিত্র যদি চোকে দেখিবার জিনিস হয় তবে সে ছায়াও চোকে দেখিবার জিনিস। অথচ চোকে দেখিবার জিনিস চোকে দেখিলে লোভ লালসা প্রভৃতি যেরকম চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে সে ছায়া দেখিলে সেরকম কিছু হয় না। বরং চিত্ত বিকৃতাবস্থায় থাকিলে সে ছায়া দেখিয়া চিত্ত সুস্থ সুনির্ম্মল এবং পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হয়। যে বস্তু দেখিলে চিত্ত বিচলিত না হইয়া সুস্থির ও সংযত হয় সেই বস্তুই চোকে দেখা উচিত। যে ছায়ার কথা বলিতেছি সে ছায়া সেই রকমের বস্তু। কিন্তু সে ছায়া বুঝি কেহ এখনও ভালকরিয়া দেখে নাই এবং বোধ হয় কোন দেশে প্রতিভাশালী চিত্রকর এখনও সে ছায়া মানবজাতির শিক্ষা, সুখ এবং আনন্দ বর্দ্ধনার্থ অতুল কৌশলে চিত্রিত করেন নাই। এ দেশে ভাল চিত্র বা চিত্রশালা নাই—ইউরোপে আছে। কিন্তু ইউ-

রোপের চিত্রশালায় যে ছায়ার কথা বলিতেছি সে ছায়ার চিত্র আছে কি না জানি না। বোধ হয় নাই। গুরুশ্রেষ্ঠ রস্কিণের গ্রন্থেও সে ছায়ার চিত্রের কথা পড়ি নাই। সে ছায়ার চিত্র কি হইবে না? যদি হয় বোধ হয় ভারতেই হইবে। যে দেশের লোক নির্ম্মল, নির্লিপ্ত আত্মার কথা বুঝে কেবল সেই দেশেই সে চিত্র চিত্রিত হওয়া সম্ভব।

লোকে বলে ছায়া কিছুই নয়। এক হিসাবে ছায়া কিছু নয়ই বটে, কেন না ছায়ার আকার আছে মাত্র, শরীর নাই, সৌরভ নাই, কিছু নাই। কিন্তু কিছু না হইয়াও ছায়া একটি স্বতন্ত্র জগৎ। মধ্যাহ্ন কালে যখন আকাশে প্রখর রবি, পৃথিবী সূর্য্যের শুভ্র আলোকে আলোকময়, তখন পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিও, নিশ্চয় মনে হইবে যে যে স্থান ব্যাপিয়া সেই ছায়া সেই স্থান একটি স্বতন্ত্র স্থান, সেই ছায়া-রেখার পরেই একটি স্বতন্ত্র স্থান, একটি স্বতন্ত্র জগৎ। মধ্যাহ্নকালে পথের ধারে সেই রকম বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া দেখিয়াছি। সম্মুখে দুই হাত তফাতে সূর্য্যালোকোদ্দীপ্ত পথ দিয়া কত লোক গিয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু মনে হইয়াছে আমি একটা জগতে বসিয়া আছি আর সেই সকল নরনারী আর একটা জগতে চলাফেরা করিতেছে। মনে হইয়াছে যে আমার সম্মুখের সেই ছায়া-রেখাটি দুইটি ভিন্ন জগতের মধ্যস্থিত একটা অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাকার বা প্রাচীর। মনে হইয়াছে সে ছায়ায় বসিয়া আমি ভাল কথা, মন্দ কথা, সুখের কথা, দুঃখের কথা সব কথা কহিতে পারি, কেহ আমার কথা শুনিবে না, শুনিতে পাইবে না, শুনিতে আসিবে না। এবং সেই ছায়ায় বসিয়া মনের কথা কহিতে কহিতে ইহাও দেখিয়াছি যে সম্মুখ দিয়া যে সকল নরনারী চলিয়া যাইতেছে তাহারা যেন আমাদিগকে তাহাদের জগতের কি তাহাদের মতন কেউ নয় মনে করিয়া আমাদিগকে দেখিয়াও না দেখিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই বুঝি মনের কথা কহিতে হইলে লোকে রাস্তা হইতে সরিয়া গিয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া কথা কয়। তাই বুঝি গোল্ডস্মিথ্ গাছতলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"For talking age and youth ful converse made."

ছায়া একটা স্বতন্ত্র জগৎই বটে। মানুষ খোলা জগতে বাস করিতে পারে না। খোলা জগতে বাস করিলে মানুষ সূর্য্যের তাপে পুড়িয়া মরে। তাই মানুষ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহার ছায়ায় জীবন রক্ষা করে। জড়পদার্থের ছায়া না থাকিলে মানুষ জড় জগতে থাকিতে পারিত না, থাকিলেও অশেষ এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিত। জড়পদার্থকে ছায়া-বিশিষ্ট করিয়া জগদীশ্বর একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা সেই ছায়াময় জগতে জগদীশ্বরের সুন্দর, সুশীতল, সঞ্জীবনী ছায়া দেখিতে পাই। আমরা দয়ার কাঙ্গাল, আমাদের মনে হয় সেই

ছায়াময় জগৎই দীননাথের দয়ার প্রকৃত স্বরূপ। ছায়া কিছুই নয়, কাঙ্গাল মানুষের মুখে কি একথা সাজে? মানুষের স্বভাব ভাল নয়। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান বড়ই কম!

মানুষের দেহই কি শুধু ছায়া-জগতে বাঁচিয়া থাকে ও পুষ্টিলাভ করে? মানুষের মনও ছায়া-জগতে থাকিয়া উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়। প্রথম মনুষ্যের অবস্থা মনে কর দেখি—কিছু জানে না, কিছু বুঝে না, ভয়ে আকুল, পদে পদে ভ্রমবশতঃ ভীষণ অবস্থাপন্ন, রোগে নিরুপায়, পূজায় পিশাচ-শাসিত। অনেক ভুগিয়া, অনেক সহিয়া প্রথম মনুষ্য মরিয়া গেল। পৃথিবীতে কিছু রাখিয়া গেল না—কেবল এক খণ্ড পশু-চর্ম্ম আর দুই খণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া গেল। দ্বিতীয় মনুষ্য সেই চর্ম্মটুকু এবং কাঠ দুইখানি পাইয়া যেন কতই শান্তি লাভ করিল, কত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। আতপতাপিত পথিক বৃক্ষের ছায়া পাইলে যেমন চরিতার্থ হয়, প্রথম মনুষ্যের চর্ম্মখণ্ডটুকু এবং কাঠ দুইখানি পাইয়া দ্বিতীয় মনুষ্যও তেমনি চরিতার্থ হইল। সেই চর্ম্ম-খণ্ডটুকু এবং দুই খানি কাষ্ঠে দ্বিতীয় মনুষ্য প্রথম মনুষ্যের ছায়া দেখিতে পাইল। সেই ছায়ায় বসিয়া পশু-বধার্থ সে একটি পাথরের তীর নির্ম্মাণ করিল। নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কাষ্ঠ এবং চর্ম্ম খণ্ড এবং তাহার আপনার পাথরের তীরটি রাখিয়া মরিয়া গেল। তৃতীয় মনুষ্য সেই সবগুলি পাইয়া আরো একটুবেশী সুখশান্তি-লাভ করিল, ক্লেশ হইতে আরো একটু মুক্ত হইল, তাহার জীবন-পথের যন্ত্রণা আরো একটু কমিল, তাহার জীবন-পথের উপর তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ছায়া আরো একটু প্রশস্ত আরো একটু ঘনীভূত হইল। এই-রূপে মনুষ্য-পর্য্যায় যত বাড়িতে লাগিল, মানুষের পূর্ব্ব পুরুষের ছায়াও তত বাড়িতে লাগিল, সেই ছায়ায় বসিয়া মানুষের সুখ, শান্তি, সদ্বুদ্ধি, সদাশয়, সুনীতি, সুরীত, সাত্বিকতা, সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য তত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ছায়া বাড়িয়া বাড়িয়া গাঢ় এবং গাঢ়তর হইয়া বিরাট-রূপ ধারণ করিল। সেই বিরাট ছায়ায় বসিয়া বিরাট মনুষ্য-সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুরাণে, দর্শনে, কাব্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে বিরাটকীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়া বিরাট-সভ্যতা সৃষ্টি করিল। মানুষের মন পূর্ব্ব-পুরুষের বিরাট ছায়া পায় বলিয়াই বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। নহিলে মানুষের পর মানুষ, পুরুষের পর পুরুষ, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায় পশু পক্ষীর ন্যায় সমান কাঙ্গাল সমান শোকার্ত্ত থাকিয়া যায়, জীবন-পথে সমান তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যায়। মানুষের দেহ এবং মন উভয়ই ছায়ায় থাকিয়া রক্ষিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। বাহ্য-জগতে এবং অন্তর্জগতে দুইখানা প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙান আছে। সেই দুই খানা সামিয়ানার ভিতর দুইটা প্রকাণ্ড ছায়া-জগৎ ঝোলান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একখানা ছায়া-জগতে মানুষের দেহ আর একখানা ছায়া-জগতে মানুষের মন সুখে বাস করিয়া সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। দেহ এবং মন

উভয়েই পথের পথিক—ছায়া না পাইলে কি পথে চলিতে পারে? তবুও মানুষ বলে কি না যে ছায়া কিছুই নয়! ছায়ায় থাকিয়া ছায়া চিনে না, ছায়া মানে না বলিয়া মানুষ এত চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত মহত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে মানুষ ছায়া মানে না সেখানে মানুষের সকল চেষ্টা বিফল হয়। আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ছায়ার মাহাত্ম্য মানে না। তাই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোলপাড় করিয়াও সে আজ মানুষ নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্রস্থল বিলাত দর্শন করিয়াও বিকলমতি! মানুষের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়াও মানুষ যদি মানুষের ছায়া না মানে তাহা হইলে মানুষ মানুষকে ছায়া দান করিতেও পারে না। তাই আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় কোন দেশীয় আতপতাপিত পথিককে ছায়া দান করিয়া জীবন পথের যন্ত্রণার কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম করিতে পারিতেছে না। তাই আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বলি, ছায়া মানিয়া ছায়া দান করিও, মানুষও হইবে, জীবনও সার্থক হইবে। নিজে ভক্ত এবং কৃতজ্ঞ না হইলে অপরকে কি ভক্ত ও কৃতজ্ঞ করা যায়?

ছায়া আত্মত্যাগের ফল। গাছের ছায়ায় গাছের রঙ থাকে না, গাছের দেহের পুষ্টি ও স্থূলতা থাকে না, গাছের জ্যোতি ও লাবণ্য থাকে না, গাছের তেজ থাকে না, গাছের রস থাকে না, গাছের ফুলের ও ফলের সৌরভ থাকে না, গাছের ফলের শাঁস বা সুস্বাদ থাকে না। গাছ সব ত্যাগ করিলে তবে গাছের ছায়া হয়। সব ত্যাগ করিয়া গাছ ছায়ারূপী হইলে তবে আতপতাপিত পথিকের আশ্রয় স্থল হয়। স্ত্রী পুত্র জনক জননী ভাই ভগিনী দাস দাসী বন্ধু বান্ধব সুখ সম্পদ ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ছায়ারূপী হইলে পর তবে বুদ্ধ চৈতন্য অসংখ্য আতপতাপিত অনন্তপথের পথিকের বিশ্রামস্থান হইয়াছিলেন। তুমি আমি ক্ষুদ্রলোক, বুদ্ধ চৈতন্য হইতে পারিব না। কিন্তু আমরা যেমন তেমনি ছায়ারূপী হইয়া তেমনি স্বল্প প্রাণীর আশ্রয়স্থান হইতে পারি ত। কিন্তু সেই রূপ ছায়ারূপী হইতে হইলেও আমাদিগকে আমাদের অনেক জিনিস পরিত্যাগ করিতে হইবে। বহু দিন হইল আমার একটি হিন্দু বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ মাত্র তাহার উপর আমার স্নেহ জন্মে। বালিকা তিন চারি বৎসরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দেহ যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্ণ জোয়ারে সুন্দর স্রোতস্বিনী যেন কূলে কূলে পূরিয়া উঠিল, গাঙ্-ভরা জল যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। যুবতী শ্যামাঙ্গী—কিন্তু শ্যামাঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না—শ্যামাঙ্গীর সৌন্দর্য্যের ছটা যেন চাঁদের হাসির ন্যায় হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন যুবতীর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত দেহে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হইয়াছে। অত ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন বলিয়াই যুবতী যেন লজ্জায় অত কুণ্ঠিত। এই সময় কিছু দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আবার যখন দেখিলাম, তখন

আর তাঁহাকে দেখিলাম না,দেখিলাম তাঁহার একখানি ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ ছায়া বসিয়া রহিয়াছে! তাঁহার দেহের তত ঐশ্বর্য্য তাঁহার দেহে নাই—সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শত-দল-পদ্মসদৃশ একটি শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে! ঐশ্বর্য্যরূপিণী যুবতী আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সন্তানকে দিয়া আপনি ছায়ারূপিনী জননী হইয়াছেন! তখন মনে হইল এমন করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য পরকে দিতে বুঝি বুদ্ধ, চৈতন্যও পারেন না, পরের জন্য বুদ্ধ চৈতন্যও বুঝি এত ছায়ারূপী হইতে পারেন না। যুবতীকে জননী হইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে জগতে ছায়া হইতে না পারিলে জগতে মানুষের জীবন বৃথা হয়। আর বুঝিলাম যে যুবতী অপেক্ষা জননী সুন্দর এবং বৃক্ষ অপেক্ষা বৃক্ষের ছায়া সুন্দর, কেন না জননী অন্যের জন্য যুবতীর সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপিণী হন এবং বৃক্ষের ছায়া অন্যের জন্য বৃক্ষের সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ করে। জগতে যদি সার্থক ও সুন্দর হইতে চাও তবে বৃক্ষ ও জননীর ন্যায় আপনার সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ কর। ছায়াই পৃথিবীর সার পদার্থ। ছায়ার অর্থ বুঝিয়া ছায়া হইয়া পৃথিবীর সার পদার্থ হও।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

# মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কি না।

এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের যতগুলি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য দেখা যায়; সুতরাং যদি কোন গ্রহ পৃথিবীর জীবের মত জীবের বাসোপযোগী হয় ত সে মঙ্গল গ্রহ। আমরা দেখিতে পাই, উত্তাপ আলোক, জল ও বায়ুই উদ্ভিদ হইতে পশু মনুষ্য সকল জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান কারণ। যতদূর জানা গিয়াছে এ সকল বিষয়েই মঙ্গল পৃথিবীর মতন। মঙ্গলে দিবসের দৈর্ঘ্য প্রায় পৃথিবীর সমান, এ জন্য পৃথিবী সূর্য্যের নিকট যে পরিমাণে উত্তাপ আলোক পাইয়া থাকে মঙ্গলও প্রায় সেই পরিমাণে উত্তাপালোক পায়; সুতরাং উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্য কি অপ্রাচুর্য্য বশতঃ মঙ্গল জীবের বাসানুপযোগী নহে। তবে মঙ্গলে জল বায়ু আছে কি না?

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহা স্পষ্ট রূপে দেখাইবার জন্য আমরা জ্যোতিষী প্রকটার লিখিত একটি প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

মঙ্গলে জল আছে। দুরবীন দিয়া দেখিলে মঙ্গলের দুই প্রান্তভাগ অন্য সকল স্থান অপেক্ষা শুভ্র এবং উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহা হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবীর মত মঙ্গলের দুই মেরুও বরফে ঢাকা। ম্যারাল্‌ডি প্রথমে এই বিন্দু দুইটি দেখিতে পান, এবং সেই সময় তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে উহাদের মধ্যে একটি বিন্দু ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু ইহাতেও তিনি আসল কারণটি ধরিতে পারেন নাই। সেই বিন্দু দুটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর মেরুর মত বরফাবৃত-স্থান বলিয়াই এইরূপ উজ্জ্বল দেখাইতেছে এবং তন্মধ্যে একটি গ্রীষ্মের আবির্ভাবেই আবার ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িতেছে ইহা তাঁহার মনে হইল না; তিনি যথার্থ কারণ না ধরিতে পারিয়া এইরূপ এক অদ্ভুত নিষ্পত্তি করিয়া বসিলেন—যে ঐ শ্বেত উজ্জ্বল বিন্দুটি যখন আয়তনে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে তখন ক্রমে ক্রমে একেবারেই উহা লোপ পাইয়া যাইবে—এমন কি কমিতে কমিতে কোন দিন উহা একেবারে লয় পাইয়া যাইবে তাহার দিন পর্য্যন্ত তিনি গণিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহা মিলাইয়া গেল না, ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে সার উইলিয়ম হারসেল দুরবীণ দিয়া যখন মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করেন তখনও উহা দেখা যাইতেছিল। এবং তিনিই ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করেন তাহাই এখন বিজ্ঞান সমাজে গৃহীত। সকলেই জানেন আমাদের গ্রীষ্মকালে অ্যাটল্যাণ্টিক সমুদ্রের যতদূর পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে শীতকালে বরফের জন্য ততদূর যাওয়া যায় না, সেইরূপ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনেই মঙ্গলের মেরুদেশ-বর্ত্তী বরফাবৃত স্থানের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে, কেহ বলিতে পারেন—পৃথিবীর মেরু বরফ মণ্ডিত বলিয়া মঙ্গলের মেরুও যে বরফমণ্ডিত হইবে তাহার প্রমাণ কি? উহার প্রান্তভাগস্থিত উজ্জ্বল বিন্দু দুইটির কি অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না?

ইহা মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের দেখা আবশ্যক মঙ্গলে সমুদ্র আছে কি না? আমরা সকলেই জানি মঙ্গলের আলোক অন্য সকল গ্রহ অপেক্ষা রক্তবর্ণ। অথচ দুরবীন দিয়া দেখিলে গ্রহের সমস্তভাগ লাল দেখিতে পাইবে না। তাহার দুই প্রান্তভাগে যে শ্বেত বিন্দু দুইটির কথা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া মঙ্গলের মাঝে মাঝে পৃথিবীর সমুদ্রের বর্ণের মত সবুজ নীলবর্ণের নানা অপরূপ গঠন যুক্ত স্থান দেখা যায়। এই স্থানগুলি সমুদ্র হইলে মঙ্গলের স্থল ও জলের অংশ প্রায় সমপরিমাণ, আর তাহা হইলে মঙ্গলের মেরুর বরফ-আবরণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

কিন্তু ঐ সবুজ স্থান গুলি যে সমুদ্র তাহা সপ্রমাণ করিবার উপায় কি? যখন কোন জ্যোতিষী মঙ্গলে গিয়া ইহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে অপারক—তখন এ সমস্যা

কি প্রকারে পূরণ হইতে পারে? এক উপায় আছে। বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্র দ্বারা অব্যবহিত ভাবে ইহার সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে, আর তাহাই হইয়াছে। কিরূপ পদার্থ হইতে এই সবুজ বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে—এ যন্ত্র তাহা বলিতে পারে না—কিন্তু মঙ্গলের ঐ সবুজ স্থানগুলি যদি সমুদ্র ও উজ্জ্বল স্থান দুইটি যদি বরফাবৃত স্থান হয়—তাহা হইলে উহা দ্বারা যেরূপ ফল হইবে,—সেই ফল দেখিয়াই জ্যোতিষী ও বিজ্ঞানবিদেরা ইহার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন। গ্রহে যদি দূর-বিস্তৃত সমুদ্র থাকে ও নীহারমণ্ডিত স্থান থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, যে সমুদ্র-উত্থিত-বাষ্পরাশি বায়ুআনীত হইয়াই নীহার-রূপে পরিণত হইতেছে। বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্র দ্বারা এই জলীয় বাষ্পরাশির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে আলোক প্রচুর জলীয়-বাষ্প-রাশি অতিক্রম করিয়া আসে, বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্রে তাহা নিক্ষিপ্ত হইলে সেই বিশ্লিষ্ট-বর্ণ-সমূহের (Spectrum) মধ্যে কতকগুলি বিশেষ রকমের কাল কাল দাগ পড়ে। এখন মঙ্গল হইতে আমরা যে আলোক পাই তাহা সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক মাত্র। কিন্তু পৃথিবীতে আসিবার আগে এই আলোককে দুইবার মঙ্গলের বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। একবার সূর্য্য হইতে মঙ্গল পৃষ্ঠে যাইবার সময়, আর একবার মঙ্গল-পৃষ্ঠ হইতে ফিরিয়া পৃথিবীতে আসিবার সময়। এইরূপে মঙ্গল পৃষ্ঠে গিয়া সেখান হইতে আবার ফিরিয়া আসিবার সময় সে আলোক জলীয়বাষ্প অতিক্রম করিয়াছে কি না, বর্ণ-বিশ্লেষণীযন্ত্র তাহা নিশ্চিৎরূপে বলিয়া দিতে পারে। ডাক্তার হাগিংশ্ ইহার পরীক্ষায় কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এইখানে দেখা যাউক।

তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চে বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্রে মঙ্গল আলোক বিশ্লেষণ করিবামাত্র সেই বিশ্লিষ্ট-বর্ণসমূহে উল্লিখিত প্রকার কাল কাল দাগ দেখিতে পাইলেন।

সূর্য্য যখন দিগ্বলয়ের কাছাকাছি আসিয়া জলীয়বাষ্প-ভারাক্রান্ত বাষ্পাবরণের মধ্য দিয়া আলোক প্রদান করে—তখন সেই আলোক বিশ্লেষণ করিলে যেরূপ কাল দাগ দেখা যায়, মঙ্গল-আলোক বিশ্লিষ্ট বর্ণসমূহেও সেই রূপ দাগ পড়িল। কিন্তু উহা মঙ্গলের কিম্বা পৃথিবীর জলীয়বাষ্পের চিহ্ন তাহা ঠিক করিবার জন্য তখন তিনি সেই যন্ত্র মঙ্গল হইতে সরাইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত করিলেন। তখন চন্দ্র মঙ্গল অপেক্ষা দিক্‌বলয়ের আরো কাছে ছিল—সুতরাং পূর্ব্বকার কাল দাগ পৃথিবীর বাষ্পের হইলে—চন্দ্রের আলোক-পরীক্ষার সময় আরো সুস্পষ্ট রূপে তাহা দেখা যাইত কিন্তু চন্দ্রের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া একেবারেই সে দাগ পাওয়া গেল না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল সে দাগ মঙ্গলের বাষ্প-চিহ্ন, পৃথিবীর নহে। তাহা হইলে সেই সবুজ স্থানগুলি যে সমুদ্র আর মেরু দেশের ক্ষুদ্র বিন্দু দুইটি যে হিমশৈলাবৃত-স্থান সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে এ সকল বিষয়ে মঙ্গল পৃথিবীরই মতন। মঙ্গলে পৃথিবীর মত সমুদ্র আছে, মঙ্গলে বাষ্প উঠিয়া ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেরু দেশে বরফ জমিতেছে—আবার গলিয়া সে বরফ আয়তনে ছোট হইয়া পড়িতেছে। কেবল ইহাই নহে—হাগিংশের পরীক্ষায় আর একটি বিষয় জানা যাইতেছে। মঙ্গলের সমুদ্র-উত্থিত সেই জলীয় বাষ্প রাশি এক উপায়ে মাত্র মেরু দেশে পৌছিতে পারে। যদি মঙ্গলের বাষ্পাবরণ থাকে—তাহার মধ্য দিয়াই সে জল-বাষ্প-রাশি মেরুতে পৌঁছিতে পারে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে মঙ্গলে পৃথিবীর মত বাষ্পাবরণও আছে। যদিও সে বাষ্পাবরণের প্রকৃতি ঠিক আমাদের পৃথিবীর বায়ুর মত কি না তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই, তবে যখন বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রে মঙ্গল-আলোক বিশ্লেষণ করিয়া কোন অপরিচিত দাগ এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছেনা, তখন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পৃথিবীর বাষ্পাবরণে যে সকল গ্যাস আছে তাহা ছাড়া মঙ্গলের বাষ্পাবরণে অন্য কোন গ্যাস নাই। প্রথম প্রথম দূরবীন দিয়া যাঁহারা মঙ্গল পরীক্ষা করেন, তাঁহারা মঙ্গলের বাষ্পাবরণ সম্বন্ধে এক বিষয়ে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। গ্রহটি নিরীক্ষণ কালে বহুদূর লইয়া তাহার আশপাশ চারিদিকে অন্য কোন তারা না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, মঙ্গলের বাষ্পাবরণ বহু শত শত ক্রোশ বিস্তৃত, কিন্তু উহা যে দৃষ্টিভ্রম মাত্র (Optical) সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই।

গ্রহে জীবের প্রাণরক্ষার জন্য যাহা যাহা বিশেষ আবশ্যক মঙ্গলে আমরা সবই দেখিয়া আসিলাম। এখানে প্রকটারের আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধটির উপসংহার করি। তিনি বলেন মঙ্গল গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধে শীতগ্রীষ্মের আবির্ভাব, সেখানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতি দিবসের কার্য্যফল, এমন কি প্রতি ঘণ্টায় সেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—যেমন মেঘ জমা, বৃষ্টিপড়া, রৌদ্র কিরণে কখনো মেঘ ছড়াইয়া পড়া—প্রভৃতি যে সকল পরিবর্ত্তন পৃথিবীর আকাশে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই সে সকলি একটি ক্ষমতাশালী দূরবীনের সাহায্যে মঙ্গলে ঘটিতে দেখা যায়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

---

# সংস্কার রহস্য।

## উপনয়ন।

এই প্রধান সংস্কার কোন্ সময়ের কোন ব্রাহ্মণ প্রথম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ইহা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করিবার সামর্থ নাই সুতরাং ইহা শ্রৌত কি স্মার্ত্ত তাহাও নির্ণীত হয় না। অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, শ্রৌত-

বিধি ও স্মার্ত্ত-বিধি উভয়-বিধিই আছে। শ্রুতি অনুসন্ধান করুন, "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ মুপনয়ীত" বিধান দেখিতে পাইবেন এবং স্মৃতি অনুসন্ধান করুন, তাহাতেও দেখিতে পাইবেন, "গর্ব্ভাষ্টমেহষ্টমেবাব্দে ব্রাহ্মণ স্যোপনয়নম্" বিধান আছে। এই সকল বিধান দেখিলে অনুমান করিতে হয়, উপনয়ন সংস্কারটা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের অথবা প্রাচীন আর্য্যজাতির অত্যন্ত পুরাতন ধর্ম্ম।

উপনয়ন সংস্কার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির অনুষ্ঠেয়; ভারতবাসী শূদ্রেরা ইহাতে বঞ্চিত। শূদ্রের সমস্ত সংস্কার আছে; কেবল উপনয়ন সংস্কার নাই; কেন নাই? তাহা বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণেরাই বলিয়া গিয়াছেন, "অধ্যয়নাভাবাদুপনয়না ভাবঃ।" শূদ্রদিগের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, তাই তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই। ইহাতে বুঝাগেল এই সংস্কার অধ্যয়ন-মূলক; অধ্যয়ন সাধনার নিমিত্ত উক্ত উপনয়ন রূপ দীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

আট্‌বৎসর বয়স হইলে জ্ঞান সঞ্চার হয়, সংস্কারাধিকার হয়, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া অধ্যয়ন-লিপ্ত থাকিবেক, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, কৃতবিদ্য হইলে, দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইবেক; ইহাই বোধ হয়, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। আরও দেখা গিয়াছে যে, কুমার যতদিন না উপনীত হয়, ততদিন তাহাকে কোনরূপ ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান করিতে হয় না; খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও শৌচাশৌচের বিবেচনা কিছুই করিতে হয় না। যেমন উপনয়ন হইল, অমনি তাহার হস্তে ও পদে শাস্ত্র রূপ শৃঙ্খল প্রদত্ত হইল; তখন আর সে শাস্ত্র-মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া এক পদও চলিতে পারিবেক না; চলিলে তাহাকে মহাপাতকী, ভ্রষ্ট ও পতিত হইতে হইবে।

"প্রাগুপ নয়নাং কামচার কামবাদ কাম ভক্ষ্যাঃ।"

[সংস্কার ময়ূখধৃত গৌতমস্মৃতিঃ।

উপনয়নের পূর্ব্বে যথা ইচ্ছা তথায় গমন, যাহা ইচ্ছা তাহা করা, যাহা ইচ্ছা তাহা বলা, যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ষণ করিতে পারিবেক। অনুপনীত অবস্থায় ম্লেচ্ছ দেশে গেলে দোষ হইবে না কিন্তু উপনীত হইয়া গেলে দোষ হইবে। অনুপনীত বালক কোন কিছু সদনুষ্ঠান না করিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু উপনীত হইলে তাহা করিতেই হইবেক। অনুপনীত বালক সত্য মিথ্যা উভয়ই বলিতে পারে; কিন্তু উপনীত হইলে পর, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিলে দোষ হইবে; অশ্লীলতা করিলে পাপ হইবে। অনুপনীত অবস্থায় পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পাপ হয় না; কিন্তু উপনীত হইয়া উক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য পাপী হইবেক।

"ন পাদ মূত্র পুরীযো ভবতি ন তস্যাচমন কল্পো বিদ্যতে ন তস্যোদঙ্মুখত্বং দিবা রাত্রৌ দক্ষিণামুখত্ব মিত্যাদয়ো নিয়মাঃ।" [ঐ।

অনুপনীত বালকের কথায় কথায় পা ধোয়া, অশুচি হইলে গাত্রাদি পরিস্কার করা, আচমণ করা, উত্তর মুখে অমুক কর্ম্ম, দক্ষিণ মুখে অমুক কার্য্য, দিবাতে এইরূপ, রাত্রে এইরূপ, ইত্যাদি কোনরূপ নিয়মই নাই; কিন্তু উপনয়ন হইলে পর সমস্তই আছে।

"অন্যত্রা চ মার্জন প্রক্ষালন প্রোক্ষণেভ্যো। ণ তস্য স্পর্দ্ধনাদ শৌচম্।" [ঐ।

একজন অনুপনীত বালককে অশুচি অবস্থায় স্পর্শ করিলে দোষ হয় না; কিন্তু উপনীত ব্যক্তির শৌচের অত্যল্প ত্রুটি হইলেই তৎস্পর্শে স্নানাপনেয় অশৌচ হয়। অধিক কি, আমাদের প্রধান ব্যবস্থাপক মনু বলিয়াছেন—

ন হ্যস্মিন্ বিদ্যতে কর্ম্ম যাবন্মৌঞ্জী ন বধ্যতে।
নাভিব্যা হারয়ে দ্ব্রহ্ম স্বধা নিনয়া দৃতে॥"

বালক যতদিন না মোঞ্জী মেখলা (মুজ নামক তৃণের রজ্জু) বাঁধে, ততদিন তাহার কোন প্রকার কর্ম্মাধিকার হয় না এবং তাদৃশ বালককে শ্রাদ্ধ মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বেদ কথা উচ্চারণ করিতে দিবেক না।

মোঞ্জীবন্ধন ও উপনয়ন তুল্য কথা। উপনয়ন কালে মুঞ্জ নামক তৃণের রজ্জু মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গলদেশে ধারণ করিতে হয় এবং কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পরিধান করিতে হয়। আজ্ কাল এদেশের ব্রাহ্মণেরা মুজ তৃণের পরিবর্ত্তে কুশ তৃণের রজ্জু প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞসূত্রের ন্যায় গ্রন্থি বদ্ধ করত মুহূর্ত্তমাত্র ধারণ করিয়া থাকেন এবং মৃগচর্ম্ম পরিধান না করিয়া তাহাঁর এক ক্ষুদ্রখণ্ড যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতেই ইহাঁদের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ইহা অসাধারণ বিশ্বাসের ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

আট্‌বৎসর বয়সে বেদাধ্যায়ণ আরম্ভ, সেই সময়েই আবার কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পরিধান ও তৎসঙ্গে মৌঞ্জী মেখলা ধারণ,—এতদ্রূপ বিধান ও আবহমান-কালের প্রথা সন্দর্শন করিয়া আজকালকার অনেক কৃতবিদ্য লোক অনুমান করেন, আদিম কালের আর্য্যেরা অসভ্যভাবাপন্ন ছিলেন, তাই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অর্থাৎ যখন বস্ত্র প্রস্তুত করিবার নিয়ম অজ্ঞাত ছিল তখন মৃগ-চর্ম্মই পরিধান করিতেন এবং তাহা কটি দেশে রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে উদ্দেশ্য বোধ না থাকাতে কুলাচার-প্রিয় ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অপরিত্যাজ্য বিবেচনা করিয়া ছিলেন, কাযে কাযেই সেই কটি বন্ধন-রজ্জু (কোমর বন্ধ) কালক্রমে তাঁহাদিগের স্কন্ধে উঠিয়াছে। এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম কিন্তু পারস্কর গৃহ্য সূত্রের হরিহর ভাষ্যে লিখিত আছে যে, "কটি প্রদেশে ত্রিবৃত প্রবর সংখ্য গ্রন্থিযুতং প্রাদক্ষিণ্যেন পরিবেষ্টয়তি।" কটি দেশেই প্রদক্ষিণ ক্রমে বেষ্টন করিবে। সুতরাং প্রোক্ত অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে।

উপনয়ন শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ এই রূপ—

"আচার্য্য সমীপে নয়ন পূর্ব্বকং বটো র্গায়ত্রী সম্বন্ধকরণম্।"

( সংস্কার মং। )

উপনয়ন দিবসে প্রথমতঃ বৈদিক গায়ত্রী

উপদেশ করা হয়, ক্রমে তৎপর দিবস হইতে যথোচিত বেদধ্যয়ন আরম্ভ করান হয়। আচার-ময়ূখ ধৃত মনু বচনে উক্ত হইয়াছে যে, উপনয়ন দিবসে তাহার বেদ বিষয়ে জন্ম লাভ হয় এবং এইরূপ জন্মের মাতা সাবিত্রী ও পিতা তদুপদেষ্টা আচার্য্য। যথা

"মাতুরগ্রেধি জননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চোদনাৎ॥
তত্রযদ্‌ব্রহ্ম জন্মাস্ত মৌঞ্জীবন্দন চিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাস্বাচার্য্য উচ্যতে॥"

জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বেদ মধ্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া উপনেতব্য জাতিমাত্রেই দ্বিজ, সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতিই দ্বিজ। কোন কোন স্মৃতি কার বলেন,—

"জন্ম না জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও যাবৎ তাহার উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ সে শূদ্র তুল্য থাকে। উপনয়ন সংস্কার হওয়ার পর তাহাকে দ্বিজ নামে অভিহিত করা যায় এবং বেদভ্যাস রত হইলে সে তখন বিপ্র পদ-বাচ্য হয়। অনন্তর তিনি যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, তখন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েন অন্যথা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যে ব্রাহ্মণ হইবেন এরূপ অভিপ্রায় বোধ হয় পূর্ব্বকালের ছিল না। বেদসংহিতা মধ্যে প্রমাণপুরুষসকল "কবি" "বিপ্র" "ব্রাহ্মণ" "সূরি" এই সকল জ্ঞানাধিক্য বোধক শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, "দ্বিজ" শব্দের উল্লেখ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

স্ত্রী, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই; সুতরাং তাহাদের উপনয়নও নাই। পূর্ব্বে শূদ্র জাতি যেমন শাস্ত্রাধিকার-বর্জ্জিত স্ত্রী-জাতিরাও তদ্রূপ শাস্ত্রাধিকারে বর্জিত ছিলেন, কিন্তু মহর্ষি হারীত এক স্থানে লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব কালে নারী জাতিরও উপনয়ন হইত, তাহারাও পুরুষের ন্যায় বেদ পাঠাদি করিত। হারীত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, মহাভারতাদি ইতিহাস পাঠেও তাহার অনেকাংশ জানা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী নামক পত্নী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। জটিলা নাম্নী জনৈক রমণীও তাপসী ছিলেন। ইত্যাদি অনেক আখ্যায়িকা উক্ত অনুমানের অনুকূলে দেখান যাইতে পারে। যাহা হউক, হারীত-বচনের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, অতি প্রাচীন কালে রমণী জাতির মধ্যে দুই শ্রেণীর রমণী ছিল। এক শ্রেণীর রমণীরা উপনীত হইয়া গলে যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদ-পাঠ, অগ্নিহোত্রা ব্রহ্মানুষ্ঠান করিতেন, এই শ্রেণীর রমণীরা বিবাহ করিতেন না; ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কালাতিপাত করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর রমণীরা উপনীত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্মেই নিবিষ্ট থাকিতেন। যথা;—

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মাবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নমগ্নীজনং বেদাধ্যয়নং স্ব গৃহে চ ভৈক্ষ্য চর্য্যেতি। সদ্যোবধুনাঞ্চোপ নয়নং কৃতবা বিবাহঃ কার্য্য ইতি।"

নারী জাতিরা যে উপনীতা হইয়া বেদ পাঠাদি কার্য্য করিতেন; যম স্মৃতিতেও তাহার আভাস দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুরাকল্পেষু নারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনমিচ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বাচনন্তথা॥"

পূর্ব্ব কল্পের ব্রাহ্মণেরা নারী জাতির মৌঞ্জী বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ণ সংস্কার ইচ্ছা করিতেন। তাঁহারা উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ণ করুন, অন্যকে অধ্যয়ণ করান, গায়ত্রী উপাসনা করুন; ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্যই তাহারা করুন, পূর্ব্ব কল্পের ঋষিদিগের এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি ছিল। বাধা দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে কল্প বা সেকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; রমণী জাতিরও উক্তাধিকার লুপ্ত হইল। কোন্ দুরাশয় ঋষি যে উক্ত সদনুষ্ঠানের প্রথম বাধা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন জ্ঞান-গম্য হয় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদাস সেন।

# ধরা-সুন্দরী।

বল্ ধরা-সুন্দরি, শুনি
কা'র প্রেমে তোর এত হাসি,
কা'র তরে সাজা'লি অঙ্গ
দিয়ে গুচ্ছ ফুলের রাশি!
সুন্দর 'বসন্ত-বাসে'
তনুখানি আবরিলি,
মলয় মধুর শ্বাসে
গন্ধে ভুবন ভ'রে দিলি!
সোহাগেতে দুলে দুলে
সমীর-ভঁরে এলি ধেয়ে,
মধুর কাকলী ক'রে
পাখার মুঁখে উঠলি গেয়ে!

নব-পল্লব অধরে তোর
এনে দিলে শোভা অতি,
প্রভাত-কিরণ ঢেলে দিলে
মুখে তোর সুবর্ণ জ্যোতি!
রূপ দেখে তোর মধু খেতে
প্রজাপতি জুটল কত,
ফুলে ফুলে ঘোষণা তোর
দিয়ে এল মধুব্রত!
দেখে তোর কুন্তলের শোভা
গেয়ে কোকিল অধীর হ'ল,
আকাশের চাঁদ নীরব রাতে
মুখ খানি চুমিতে এল!

মনে পড়ে দুঃখে, শোকে
বর্ষায় কত কেঁদেছিলি,
অবিশ্রান্ত চোকের জলে
বুক খানি তোর ভাসিয়ে দিলি?
এই ত দিনেক দুদিন আগে
ছিলি শীতে সঙ্কুচিত,
নিশির শিশির বুকে স'য়ে
হয়েছিলি অর্দ্ধ মৃত!
আবার এমন সঞ্জীবনী
আচম্বিতে কোথায় পেলি,
অসাড় দেহ উঠ্‌লো জেগে—
গেয়ে জগৎ ভাসিয়ে দিলি!

এই বা কেমন, সুধাই তোরে
আমার সঙ্গে এ কি খেলা—
তোয় দেখে আজ্ প্রাণের মাঝে
জাগ্‌ল কেন 'ছেলে-বেলা'!
'চিনি' 'চিনি' মন্‌টা করে—
স্মৃতি এসে পরাণ ছোঁয়,
বনে বনে, মাঠে মাঠে
কত দিন যেন দেখেছি তোয়!
খেলেছিস্ যেন কত খেলা
বনে মাঠে আমায় লয়ে,
আজ্‌ও যেন ডাক্‌তে এলি
খেল্‌বি ব'লে—অধীর হয়ে!
দুঃখ-শোকে ছিলাম আমি,
তুইও ছিলি দুঃখে, শোকে,
বল্ কে আজি স্ফূর্ত্তি এত
আচম্বিতে দিলে তোকে!
কে দিলে তোর আঁধার প্রাণে
ঢেলে এমন জোছ্‌না রাশি,
বল্ ধরা-সুন্দরি, শুনি
কা'র প্রেমে তোর এত হাসি!

শ্রী নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

---

# স্বায়ত্ত-শাসন।

লর্ড রিপণ এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের উন্নতি-পথ যে খুলিয়া দিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে। পার্লেমেণ্ট কোন কালে যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার আশা হইয়াছে—নির্ব্বাচন প্রণালী অনুসারে রাজ্য-শাসনের সূত্রপাত হইয়াছে—এক কথায় আমাদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র নগরের কাজ যদি আমরা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি—ক্রমে আমরা বৃহৎ রাজ্যশাসনের ভার লইতে পারিব তাহাতে আর সন্দেহ কি। সকল কার্য্যেরই আরম্ভ আছে, শিক্ষার স্থল আছে। স্বায়ত্ত-পৌর-শাসন (Municipal self-Government) স্বাধীনতামূলক প্রজাতন্ত্র-প্রণালীর প্রথম সোপান। এই জন্য লর্ড রিপণের এই দানটি আমরা অমূল্য বলিয়া মনে করিতেছি।

এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য যাহাতে এই অধিকারটি আমরা স্থায়ী করিতে পারি—ইংরাজেরা না বলিতে পারে যে তোমরা ইহার উপযুক্ত নও তাই রক্ষা করিতে পারিলে না।

যে দোষগুলি জাতীয় চরিত্রে থাকিলে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা দূর করা আবশ্যক এবং যে সকল গুণ থাকিলে উহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উৎকর্ষ সাধন করা চাই।

শুদ্ধ বাহ্য আকার-প্রকারের অনুকরণে কোন ফল হয় না—যে ভাব হইতে সেই সকল আকার-প্রকার প্রসূত হইয়াছে তাহা আত্মসাৎ করা চাই—তবেই তাহা জীবন্ত

হইয়া উঠে—তাহাতে প্রাণ আইসে। এক এক দেশের এক এক রকম রীতি নীতি অনুষ্ঠান, সেই বিশেষ বিশেষ রীতি নীতি অনুষ্ঠানগুলি সেই দেশের বিশেষ ভাব হইতে উৎপন্ন। এবং সেই ভাবগুলি মূলে থাকাতেই সেই সকল রীতি নীতি অনুষ্ঠান বাঁচিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অন্তরে যদি কর্ম্মিষ্ঠ ভাব না থাকে, তবে শুদ্ধ আঁটা-সাটা ইংরাজি কাপড় পরিলেই যে সে ইংরাজের মত কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে তাহা নহে।

যে কোন জাতি অন্য জাতির আন্তরিক ভাব আত্মসাৎ না করিয়া কেবল তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান অনুকরণ করিতে গিয়াছে, সেই অ-কৃতকার্য্য ও জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে। মনে কর ইংলণ্ড আর ফ্রান্স। ফ্রান্স ইংলণ্ডের স্বাধীন রাজ্যতন্ত্র অনুকরণ করিতে গিয়া কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ, মুখে ফরাসিরা যাহাই বলুক, বাস্তবিক স্বাধীনতার ভাব তাহাদিগের ততটা নাই—স্বাধীনতা অপেক্ষা যশাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্ব-লালসা তাহাদিগের প্রবল। এই-জন্য উহাদিগের এক একজন নেতা স্বাধী-নতার ধ্বজা তুলিয়া শেষে দেশকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এখনও সমস্ত ফ্রান্সের কার্য্য পারিস হইতে নির্ব্বাহ হয়। এখনও ফ্রান্সে প্রদেশীয়-স্বতন্ত্রতা নাই—সমস্ত রাজকার্য্যের সূত্র প্যারিসে কেন্দ্রী-ভূত। কোন দূর প্রদেশে একটা সামান্য সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে হইলেও তাহার জন্য রাজধানীর প্রধান কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনু-মতির অপেক্ষা করে। সকলই রাজপুরুষদিগের উপর নির্ভর—পৌরজনদিগের নিজের প্রায় কিছুই করিবার থাকে না—এইজন্য ফ্রান্সে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব—এবং তাহাদিগের প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী ইং-লণ্ডের ন্যায় দৃঢ়ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নহে; একজন ক্ষমতাশালী নেতা ইচ্ছা করি-লেই ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র স্থাপন্ করিতে পারে। বস্তুত, এক্ষণে ফ্রান্সে যে প্রণালীতে রাজ্যশাসন হইয়া থাকে উহা নামে প্রজা-তন্ত্র কিন্তু কাজে অনেকটা রাজতন্ত্রেরই অনুরূপ। এখনও সেখানে Bureaucracy অর্থাৎ রাজপুরুষ শাসনেরই প্রাবল্য। ইং-রাজদিগের ন্যায় ফরাসিসদিগের বাস্তবিক স্বাধীনতার ভাব থাকিলে এরূপ কখনই হইত না।

তাই বলিতেছি, শুদ্ধ ভাল ব্যবস্থার অনু-ষ্ঠান (Institution) প্রবর্ত্তিত হইলেই যে কাজ হয় তাহা নহে, তাহার উপযোগী জা-তীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা চাই, তবেই উহা স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট আছে বলিয়াই ইংরাজেরা এতটা স্বাধীনতা উপভোগ ক-রিতেছে—তাহাদিগের রাজকার্য্য এত ভাল চলিতেছে—তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। ইংরাজ-দিগের পার্লমেণ্ট প্রণালী নির্দ্দোষ নহে—উহাতে অনেক খুঁৎ আছে—এমন কতক-গুলি নিয়ম আছে যাহা অক্ষরে অক্ষরে পা-লন করিলে কাজের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে পারে। অনেক চিন্তাশীল ইংরাজ এ কথা স্বীকার করেন, তবে যে তাঁহাদের রাজকার্য্য এত ভাল চলিতেছে তাহা যতটা ইংরাজ

জাতির চরিত্রগুণে, ততটা ভাল ব্যবস্থার গুণে নহে। আমাদের দেখা উচিত আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি গুণ থাকিলে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন বদ্ধমূল ও সুসিদ্ধ হইতে পারে।

সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে, সাধারণের কিসে ভাল হয়—তাহাই দেখা কর্ত্তব্য—সাধারণের হিতের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইবে—আপনার ইচ্ছাকে সাধারণের ইচ্ছার অধীন করিতে হইবে। আমার যাহাতে প্রভুত্ব হয়, মান-মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, আমার আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিবার সুবিধা হয় এই জন্যই যদি আমি মিউনিসিপ্যাল কমিসনর হই, তবে আমার মতে কাজ হইল না। আমার লোককে কাজ দেওয়া হইল না, আমার মান রহিল না—এই সকল ভাবিয়া পৌর-কার্য্য নির্ব্বাহে যত্ন স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িবে। এই জন্য, "সাধারণের জন্য আত্মবিলোপ" ইহাই স্বায়ত্ত-শাসনের মূল-মন্ত্র।

যাঁহারা পৌরসভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদিগের উপর কতটা দায়িত্ব তাহা অনেকে হয়তো অনুভব করেন না। একজন কমিসনর পদ-প্রার্থী তাঁহাদের একজনের নিকট আসিয়া হয়তো বলিলেন—তিনি তাঁর এক কালে "ক্লাসিফ্রেণ্ড" ছিলেন—ভোট তাঁকে দিতেই হইবে। বাঙ্গালী ভোট-দাতা চক্ষুলজ্জার খাতির এড়াইতে না পারিয়া অতি অনুপযুক্ত এক ব্যক্তিকে হয়তো ভোট দিয়া ফেলিলেন। এই সকল স্থলে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুসরণ করা উচিত। চক্ষুলজ্জা বাঙ্গালীর প্রধান দোষ। Eye-shame বলিয়া বোধ হয় কোন কথা আর কোন ভাষায় নাই।

সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে আপোসে মীমাংসা করিয়া অনেক সময়ে কার্য্য করা আবশ্যক। আপনার জেদ্ বজায় রাখা—কিম্বা কর্ত্তৃত্ব ফলানো যদি উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে কাজের বড়ই ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ইংরাজদিগের রাজ্য তন্ত্রের যে-রূপ প্রণালী তাহাতে সকলেই যদি আপন আপন মত বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিত। তাঁহারা নাকি কাজের লোক—তাই তাঁহারা যাহাতে সহজে কাজ উদ্ধার হয় তাহাই দেখেন—কাল ও অবস্থা দেখিয়া কাজ করেন—সময় বিশেষে পরস্পরের কথা একটু মানিয়া যান—নিয়মের অক্ষরগুলি না দেখিয়া নিয়মের ভাবের প্রতি অধিক লক্ষ্য করেন। তাঁহারা ক্ষমতা ও অধিকার পাইয়া ক্ষমতা ও অধিকারের অপব্যবহার করেন না। ইংলণ্ডের রাজার অধিকার আছে যে পার্লে-মেণ্টে যাহা সাব্যস্ত হইয়াছে তিনি তাহা অগ্রাহ্য ও রহিত করিয়া দিতে পারেন কিন্তু William of Orrange-এর পর হইতে কোন রাজা এরূপ করেন নাই।—House of Commons-এর অধিকার আছে—রাজার মতের সঙ্গে কিম্বা House of Lords-এর মতের সঙ্গে মিল না হইলে—তাহারা টাকার সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে—কিন্তু এ ক্ষমতা তাহারা প্রায়ই জারি করে না—এমন কি ইহার আভাষও দেয় না।

আবার House of Lords—রাজা ও House of Commonsএর কাজে বাধা দিয়া ব্যবস্থা-প্রণয়ন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে কিন্তু কাজে সেরূপ কখনই হয় না।

পার্লেমেণ্টে যে দলাদলি আছে তাহাও নিয়মে বদ্ধ ও তাহাতে আসল কাজের ব্যাঘাত হয় না—বরং তাহাতে কাজের সুবিধাই হয়। অন্য কোন দেশের সভায় এরূপ দলাদলি থাকিলে, কয়দিন টিকিতে পারিত? ইহা যে টিঁকিয়া আছে তাহার অর্থ এই, ইংরাজেরা নিজ স্বার্থের অনুরোধে সাধারণের স্বার্থকে বিসর্জ্জন করে না।

ইংরাজদিগের আর একটি এই গুণ আছে—তাহারা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-শূন্য হইয়া কোন একটি ভাব লইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে না—এক লম্ফে চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করে না। উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাহারা সময় ও অবস্থা বুঝিয়া ধীর অথচ অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। এই জন্যই তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে। ফরাসিসদিগের পদ্ধতি ইহার বিপরীত। তাহারা "মনুষ্যের অধিকার" প্রথমে সাব্যস্ত করিয়া কাল ও অবস্থা না মানিয়া সেই সকল মূলতত্ত্ব তাঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়াছিল এবং সেই ভাবে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এই জন্য তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইংরাজদিগের এই কেজো ভাব—এই সাধারণী ভাব (Public spirit) যদি আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি—পরিপাক করিতে পারি—আমরা যদি আমাদের প্রত্যেক অভাবের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হই, আপনাদিগের কাজ যথাসাধ্য আপনারা করিতে চেষ্টা করি * তাহা হইলে এই স্বায়ত্ত শাসনই বল—আত্মশাসনই বল—স্বকীয় শাসনই বল—এই দুরন্থবাদিত কথাটি আমাদের ঘর কন্নার কথা হইয়া পড়িবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হিন্দুইজম (Hinduism)। শ্রীসুকুমার হালদার প্রণীত। প্রায় এক বৎসর হইল বইখানি আমাদের হস্তে আসিয়াছে—কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ এতদিন ইহার সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারি নাই—সে জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। নামেই সকলে বুঝিয়াছেন এখানি ইংরাজিতে

* একটি শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে—গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যমে আজ-কাল কলিকাতার স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।

লেখা। হিন্দুদিগের পুরাতন সভ্যতা, পুরাতন সাহিত্যবিজ্ঞান, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম কত কালের, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ইয়োরপীয়গণের সাধারণ মত কিরূপ ভ্রমসঙ্কুল, হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা, প্রভৃতি বিষয়গুলি অল্পের মধ্যে পরিষ্কার রূপে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এক কথায়, হিন্দুজাতির কথা বলিতে গেলে যাহা কিছু তাহার ভিতর আসিয়া পড়ে, অতি সংক্ষেপে তাহার সারজ্ঞান লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু একটি কথা, লেখক নিজের মত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ইয়োরুপীয় পণ্ডিতদিগের মতই কেবল প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে যে একেবারে কোন ফল নাই, তাহা বলিতেছি না --তবে কি শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব বজায় রাখিবার জন্যও ইয়োরপীয়দিগের দোহাই দিতে দেখিলে একটু কষ্ট হয়, তাহা ছাড়া তাহাতে এরূপ পুস্তকের যথার্থ গৌরব, যথার্থ উদ্দেশ্য অধিক মাত্রায় সাধিত হয় না। তবে ইহার আর একদিক আছে। যাহাদের নিকট সহজে প্রশংসা পাওয়া যায় না, তাহাদের নিকট প্রশংসা পাইলে সে প্রশংসার আদর অধিক, লেখক বোধ হয় এই দিক দেখিয়াই এরূপ করিয়া থাকিবেন; কেননা হিন্দুদের সম্বন্ধে ইয়োরপীয়দিগের মতের যে কিরূপ মূল্য তাহা যে লেখক বুঝেন নাই এমন নহে, তিনি নিজেই বলিতেছেন —"European scholars have very often too much confidence in their own powers of judgment. In dealing with Oriental subjects they have frequently betrayed a sad want of scholastic tact by drawing premature, illegitimate and even ludicrous inferences from half ascertained or ill-ascertained facts. For instance, what could be more ridiculous from the point of view of Hindus and Buddhists alike, than to find the priority of Hinduism to Buddhism questioned and canvassed by European scholars ?" *

* "Even such a well-informed historian as Mr. J. Talboys Wheeler in his anxiety to identify the Rakshashes of the Mahabharata with Buddhist has fallen into the unparalleled error of asserting that the Buddhist monks had no objection to flesh meat." (See his Short History of India, pp. 9-10.) Mr. Wheeler regards old Dasaratha as shamming when he is represented as giving vent to sorrow after having sentenced Rama to exile in fulfillment of a foolish vow that he had made to Queen Kaikeyi. He regards Bharat's action in following Rama into the jungle and entreating him to return, as "contrary to human nature.' Verily, the Frenchman was not far wrong, who said that the Englishman and the Hindu formed the two opposite poles of human nature."

একটি আদটি নয় হুইলারের ইতিহাস পড়িলে গণ্ডা গণ্ডা মারাত্মক ভুল পাওয়া যায়। আর ইনিই একজন Well-informed ইতিহাস-লেখক!!! ইহাদের লেখা হইতেই ইয়োরপীয়গণ আমাদের দেশ-সম্বন্ধ জ্ঞানলাভ করিয়া আমাদের মুখেই আবার থাবড়া মারিয়া থাকেন।

কেন যে ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত দেশীয়-লেখকগণ এই সকল মহা ভুলের প্রতিবাদ করিয়া ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান করেন না তাহা বুঝিতে পারি না।

ভারতীর

# ক্রোড়-পত্র।

## হুগলীর ইমাম বাড়ী।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

#### সন্ন্যাসী।

দেড়শত বৎসরেরও আগেকার কথা হইতেছে, এই সময় কোথা হইতে কেজানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া হুগলী সহরে আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহাঁর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা, ইহাঁর কৃপায় নাকি অন্ধে আঁখি পায়, খঞ্জ আরোগ্য হয়, ইহাঁর আশীর্ব্বাদে নাকি দুঃখ ক্লেশ দূরে চলিয়া যায়। লোকেরা ইহা কেমন করিয়া জানিল তাহা বলিতে পারি না, সত্য সত্য কোন কানা খোড়াকে তাহারা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছে কিনা কেজানে, কিন্তু চারিদিকে এইরূপ ত এক মহা গুজব উঠিয়াছে; হিন্দুরা তাহাকে মহাপ্রভু বলিয়া প্রণাম করিতেছে, মুসলমানেরা পীর বলিয়া পূজা দিতে যাইতেছে, ইহাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সবে দুই চারি দিন আসিয়াছেন, দুই চারি দিন হইতে গঙ্গার ঘাটে, লোকে লোকারণ্য, কানা খোড়া, দীন দুঃখীর ত কথাই নাই, কত ধনী, ক্ষমতাশালী, ভাগ্যবান তাঁহার দর্শন জন্য লালায়িত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকে, রাজদর্শনেও বুঝি এত লোকের সমাগম হয় না। আজও প্রত্যুষে নদীতীরের রাস্তায় লোক ধরিতেছে না, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে লোক জমিয়া সন্ন্যাসী দর্শনে চলিয়াছে। *সেই সময় সেই জনতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একখানি বস্ত্রাবরিত শিবিকা স্কন্ধে করিয়া সুসজ্জিত বেশভূষাধারী বাহকগণ মহা প্রতাপভরে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে আট জন প্রহরী, তাহারাও মহাদম্ভে হুঙ্কার ছাড়িয় নিরপেক্ষ ভাবে আশে পাশের ভীরু লোকদিগের উপর আপনাদিগের উদার যষ্টির করুণা বিতরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এতখানি করিবার যে বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছিল তাহা নহে, পাল্কিখানি কাছে আসিতে না আসিতে পথের লোকেরা আপনা হইতেই মহা ত্রস্তে ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। তবু সকলের অদৃষ্টে রেহাই ঘটিতেছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার এই সময়

এক জন বৃদ্ধা আসিয়া পালকীর সমুখ দিয়া রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করিল, সে সন্ন্যাসী দর্শনে যাইবে, ঘুরিয়া গেলে বিলম্ব হইয়া যায়—পালকীর কাছ দিয়াই সে ছুটিয়া যাইতে চাহে। ক্রুদ্ধ প্রহরী ভীমবলে বৃদ্ধার হস্তধারণ করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিল। বৃদ্ধা আবার সরিয়া আসিয়া অতি কাতরে কাঁদিয়া বলিল "বাবা গো তোরা ছেড়ে দে, আমার ছেলে বাঁচে না, সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলা আনতে যাচ্ছি, বাবা ছেড়ে দে" দুর্ব্বলা বৃদ্ধা প্রাণের দায়ে সেই ভীমবল প্রহরীর হস্তকে তাচ্ছিল্য করিয়া যাইবার জন্য যুঝাযুঝি করিতে লাগিল। বৃদ্ধার সেই অসীম সাহস দেখিয়া অন্য লোকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে সেই একজন অবলা রমণীকে পরাজয় করিতে আট জন প্রহরী তাহার উপর আসিয়া পড়িল, এই সময় কোথা হইতে একজন তরুণ যুবক আসিয়া বুড়িকে আশ্রয় দিয়া সমুখের প্রহরীকে পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন" অরে কাপুরুষ,একজন বৃদ্ধা নারীকে মারিয়া তোমাদের বীরত্ব, —এস বাছা এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে পহুছিয়া দিয়া আসি।"

যুবকের সেই তেজস্বী বীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহরীগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাঁহার সেই দৃষ্টিতে যেন তাহাদের মত সহস্র প্রহরী ভস্ম হইয়া যাইবে,তাঁহার বাহুর স্পর্শে যেন সহস্র তরবারী বিফল হইয়া পড়িবে। প্রহরীদের তর্জ্জন গর্জ্জন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল,সিংহের নিকট মেষের ন্যায় ভীত-প্রাণে বলহীন হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক বুড়ির হাত ধরিয়া অনায়াসে সেইখান দিয়া চলিয়া গেলেন, দর্শকেরা অবাক হইয়া রহিল, দু এক জন বলাবলি করিল "ধন্যি সাহস বলতে হবে—নবাব খাঁ তাহার লোককে হারালে গো"। যুবক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এক জন খোঁড়া বলিল "বাবা গো আমার লাঠি গাছটি এক দুষ্ট ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল—আমার হাতটি ধর বাবা,একবার প্রভু দর্শনে যাই।" একজন অন্ধ সে কথা শুনিয়া বলিল "কে তুমি গো জয় হোক্, অন্ধ ব্রাহ্মণকে ধর, কত কষ্টে আসিয়াছি বাবা, আর বুঝি পৌঁছান হয় না।"একটি ছোট ছেলে যে অন্ধের হাত ধরিয়া আনিতেছিল, বৃদ্ধার সহিত প্রহরীর গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই সে অন্ধের হাত ছাড়িয়া সেখানে দেখিতে ছুটিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই, হয়ত ভিড়ে লুকাইয়া পড়িয়াছে। যুবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খোঁড়াকে কাঁধ ধরিতে বলিলেন। খোঁড়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধ ধরিল, তিনি এক পাশে বুড়িকে লইয়া আর এক হাতে অন্ধের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, এক স্থির নিশ্চল, দেবোপম কান্তিসম্পন্ন পুরুষরত্নকে গঙ্গার ঘাটে একটি গাছের তলায় পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ইহাঁর বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নহে, এবং বেশ দেখিয়া হিন্দু কি মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।

কিন্তু যুবক তাহাকে স্বজাতি বলিয়াই স্থির করিলেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ইহাঁর দেহ অনাবরিত নহে, এক ঢিলা অঙ্গাবরণে গলদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত ইহাঁর আচ্ছাদিত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা কিম্বা স্ফটীক মালা কিছুই নাই, মুখমণ্ডল ভস্ম কিম্বা চন্দন চর্চ্চিত নহে, পৃষ্ঠ-লম্বিত কেশ জটা, ও আবক্ষ বিস্তৃত শ্মশ্রু রাশি মাত্র তাঁহার শুভ্রশ্বেত অসামান্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রশান্ত-গম্ভীর সহাসমুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত শত সহস্র অনাথা, দীন দুঃখী, রোগশোক, পাপতাপ, দুঃখজ্বালা হইতে মুক্ত হইবার কামনায় তাঁহার চরণ তলে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাহাকেও ঔষধ দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার পবিত্র হস্তস্পর্শে মাত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার রোগ শোক প্রতিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত তাহাকেও এমন স্নেহের বাক্যে ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখাইতেছেন যে সেও শান্তি সুখ অনুভব করিতেছে। এইরূপে কত নিরাশ হৃদয় আশা-পূর্ণ হই তেছে—কত রোগী, পাপী, তাপী, দীন, দুঃখীর বিষন্নমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যুবক এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই, শত শত লোকের সুখে তাঁহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তিনি পূর্ণ হৃদয়ে অভিভূত চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভক্তি উথলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীর শান্ত গম্ভীর দেবশ্রীপূর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, দ্বিপ্রহরের বড় বিলম্ব নাই; সন্ন্যাসীর ধ্যানের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি গৃহে গমন করিবেন; ভীড়ও কিছু কমিতে লাগিল, যাহারা অনেকক্ষণ আসিয়াছে তাহারা চলিয়া গেল, নবাগতেরা কেবল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব জ্যোতিশালী নয়নের দৃষ্টি তখন যুবকের উপর পতিত হইল—যুবক বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস আমার সঙ্গে আইস।" সে স্বর যতদূর গেল যেন শান্তি ঢালিয়া দিল। সন্ন্যাসী অগ্রগামী হইলে যুবক তাহার অনুসরণ করিয়া দুই জনে গঙ্গা তীরে একটি ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুবকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নীহারমণ্ডিত মহান পর্ব্বত শিখরে চন্দ্র কিরণের ন্যায়, ঈষৎ মৃদু হাস্যে আপনার বিমলপ্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "সেই বীর যে দুর্ব্বলের রক্ষক, সেই পুরুষ, যে অসহায়ের সহায়, সেই মহাত্মা যে অত্যাচারের নিবারক, আইস আমরা আলিঙ্গন করি, আজ হইতে তুমি আমার শিষ্য হইলে।" সন্ন্যাসী যুবককে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শ কি পবিত্র, কি সুখজনক, তাহাতে যেন যুবকের মোহ হঠাৎ দূরে গেল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া দিল—কি এক দিব্য স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, যেন এই মহাপুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন, কত নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনীতে, দুঃখতাপে জরজর হইয়া যখন চারিদিক শূন্য দেখিয়াছেন, ঐ মহাপুরুষ

অমৃতময় বাক্যে যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কতবার যখন মোহের ছলনে অশান্তির তরঙ্গময় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন,যেন ঐ দিব্যমূর্ত্তি দেখা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। জাগন্তে, স্বপ্নে, সুখে, দুঃখে, ঐ এক মূর্ত্তি—ঐ এক দিব্যছবি কতবার কতবার যেন—তাঁহার চোখের সমুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। যুবক পুলকে, বিস্ময়ে, নিস্তব্ধে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাহাকে নিকটে বসিতে অনুমতি দিয়া আপনি একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে তেমনি সহাস আননে বলিলেন—'বৎস, আমরা আপনারা শিষ্য বাছিয়া লইয়া থাকি, উপযুক্ত হইলে গুরুর জন্য লালায়িত হইতে হয় না, শিষ্য গৃহীত হইলে গুরুর কার্য্য তাহাকে শিক্ষা দান করা, শিষ্যের কার্য্য শিক্ষার বিষয় মনোনীত করা। কোন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিতে তোমার অভিলাষ, কোন বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে তোমার আকাঙ্ক্ষা বৎস?

যুবক অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন—"দেব, যখন অনুমতি পাইয়াছি—তখন আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব—শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে আমি পিপাসিত সত্য, কিন্তু আজ আপনার যে বিদ্যা দেখিয়াছি—তাহার নিকট শাস্ত্র জ্ঞান অতি তুচ্ছ, প্রভু সর্ব্ব প্রথমে তাহা শিক্ষা করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন—"বৎস—ঠিক বলিয়াছ, শিক্ষা দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করায় তোমার আবশ্যক কি? সে জ্ঞান তোমাতে স্বতঃই বর্ত্তমান। যাহার হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, যাহার ধর্ম্মে বিধর্ম্মে দ্বেষ নাই, যাহার প্রাণ আত্মপর সমান করিতে চায়, সে, সকল শাস্ত্রের অতীত, বেদ কোরাণ আর তাহাকে কি শিক্ষা দিতে পারে? আর আমিই বা তবে তাহাকে কি শিখাইতে পারি। তুমি কি তবে জ্ঞান ছাড়িয়া সুখশান্তি লাভের বিদ্যা অধিকার করিতে চাও? সত্য বটে তাহা শাস্ত্রের অতীত, পণ্ডিত হইলেই সকলের সুখ শান্তি মিলে না, সুখ শান্তির অন্যরূপ সাধনা করা চাই।"

সন্ন্যাসীর প্রশংসায় যুবক ম্লান হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এই পরীক্ষায় তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন' না প্রভু আমি নিজের সুখশান্তি লাভের বিদ্যা চাহিতেছি না, আর অধিক কি বলিব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ধর্ম্মই সকল সুখের মূল, পুণ্যই সকল শান্তির আধার, আর ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও পুণ্যের উত্তেজক, তোমার এ সকলি আছে, এ বিদ্যাই বা তোমার শিক্ষার কি আবশ্যক? তুমি কি তবে বৎস প্রকৃতিকে হস্তগত করিতে চাও? প্রকৃতি বশে আনিয়া তুমি কি দেবতুল্য অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে চাও?

যুবক অধোবদনে বলিলেন, "না গুরু আপনি জানেন তাহা বলিতেছি না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি জানি বটে

সত্যই যাহার ব্রত, দীনেতে যাহার দয়া, কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহার দ্বারা তিন লোক জিত হইরাছে—তাহার পক্ষে প্রকৃতি জয় করা অতি সামান্য কথা। বল বৎস, তবে তুমি কি শিখিতে চাও, আমি বুঝিতে পারিলাম না ?" যুবক বুঝিলেন পরীক্ষা শেষ হইল, তিনি সাহসী-হৃদয়ে সবল-কণ্ঠে বলিলেন—"যে বিদ্যার অদ্ভূত বলে আজ আপনি দীন দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া তিন লোক মুগ্ধ করিয়াছেন, পরকে সুখী করিবার সেই বিদ্যা আমাকে কৃপা করিয়া দান করুন। চিরদিন ধরিয়া এই এক ইচ্ছা, এই এক আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া আছে। অন্যের কষ্ট দেখিলে যখন আকুল-হৃদয়ে তাহা উপশম করিতে ব্যগ্র হই কেন প্রভু তাহাতে সফল হইতে পারি না ? আমি আর কিছু চাহি না, এই বিদ্যা আমাকে দান করুন" রোমাঞ্চিত শরীরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া যুবাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে যত দূর উচ্চ, ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহা হইতেও উচ্চ। এ পর্যান্ত এরূপ বিদ্যা আমার কাছে কেহ শিখিতে চাহে নাই। হউক, তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার প্রেমের অনন্ত ধারে পাপী তাপী সুশীতল হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কর্ম্মে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। আত্ম পর না মানিয়া ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাসে অভ্যাসে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশি স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন সেই ভালবাসায় স্বার্থের বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তখনই সুসিদ্ধ হইবে এখন নহে। যাও বৎস গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর,"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, যুবার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই—যুবক কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন "আবার কবে আসিব" সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আর আসিতে হইবে না যদি প্রয়োজন হয় আমাকে দেখিতে পাইবে" বলিয়া অতি স্নিগ্ধ স্থির কটাক্ষে যুবকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যুবার দেহ সবল হইল, প্রাণ তেজস্বী হইল, হৃদয় জুড়াইয়া গেল, ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক সেখান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### ছবি।

যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাই-

ভেছে না, প্রাসাদের আশে পাশে,ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতায় জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড় বড় বট অশ্বথের রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকূল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সুঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ-পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, 'বুঝিয়াছি মসান, চোখ ছাড়" মসীনও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি ছবি ধরিয়া বলিলেন, "কেমন বল দেখি'। এইখানে ছবির কথা একটু বলিয়া লই। মহম্মদ মসীন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, পথে একজন ছবি-বিক্রিওয়ালা তাঁহাকে মহা ধরিয়া পড়িল, তাঁহার ছবি কিনিবার কোনই ইচ্ছা কিম্বা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু যখন ছবিবিক্রিওয়ালা একখানি ছবির দুই টাকা দাম চাহিয়া, শুষ্ক মুখে মিনতি করিয়া বলিল "মহাশয় গো সমস্ত বেলায় আজ একখানা ছবি বিক্রি করিতে পারিনি, এখন যদি কিছু পাই তবেই ছেলে গুলো খেতে পাবে" তখন মসীন আর একটি কথা না কহিয়া দুই টাকার স্থলে দশটি টাকা দিয়া ছবিখানি তুলিয়া

লইলেন। ছবিওয়ালা অবাক হইয়া রহিল।

ভ্রাতার হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিল। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইঁহারা হিন্দু নহেন। মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীম ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিতেন, উঁহারা দুইজনে প্রয় সমবয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়,সেই জন্য উহাঁদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহাঁরা পরস্পরকে ভাল বাসেন। মসীন দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাবজ্যোতি পূর্ণ; নবীন শ্মশ্রু-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত। প্রশস্ত বক্ষশালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাঁহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে তিনি যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চান।

মুন্না ছবিখানি দেখা হইলে একটুখানি হাসিয়া অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল "এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?" মসীন বলিলেন, "কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?"

মুন্না। "এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না।"

মসীন। "কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না।"

মুন্না। "তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর।"

মসীন। "তুই ভাই আদরটা একবার দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, 'তোমার বেলায় ভাল জিনিসের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

মসীন। "বুঝিলে নে এই হচ্চে সেয়ানা লোকের কাজ,"

মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

মসীন। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক মেয়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।" বলিতে বলিতে মসীন একটু হাসিলেন, সে হাসিতে তাহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ সরস বিদ্রুপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি,উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।" মসীন ঘাড়নাড়িয়া বলিলেন—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর যে হাজার টাকা দাম উঠি-

য়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কে সে?"

মসীম। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি সলেউদ্দীন।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা মসিন জানিতেন, সেই সম্ভাবিত কষ্টটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়েই প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে তিনি কথা পাড়িয়াছিলেন। মুন্নাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মসীন তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে সলেউদ্দীন এইরূপ একখানিছবি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবতংযায় যায়, তুমি কি একটি কথা কহিবে না।"

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, "ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে"। সে কথায় সে স্বরে মসীনের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া মসীন বলিলেন "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধার। উলটাইয়া যাইত।"

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। মসীন তাহা বুঝিতে পারিলেন—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিলেন "কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না"—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে, যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, সে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমাম করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার

যাতনার অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মাহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভস্মীভূত করিলে, হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে. তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে. তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে মসীমকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব"—

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, মসীম বাহিরে চলিয়া গেলেন। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুকায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন—তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলাবালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাওয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্নমোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহিরের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুমঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, সলেউদ্দীনের যন্ত্র

বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাঁহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম-শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষীণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। সলেউদ্দীন অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—"মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁদিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না.—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন এ দিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল স্বর্গের একটি ছবি বুঝি তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে.—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না. তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলো কর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন, মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মুন্না।"—সলেউদ্দীনের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুন্না—তুমমি—ক্যা—আয়" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় মসীন গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সম্মুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সলেউদ্দীন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মসীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বল সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে" সলেউদ্দীন আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন"

সকালে তিনি যত কথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহার পর অপরাহ্ণে উঠিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তার পর স্বামীর নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এত সঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। সলেউদ্দীন কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া-দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া অগ্রেকার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, "কোথায় পাইলে?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল "মসীম কিনিয়া আনিয়াছেন।" তিনি আরো জ্বলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন সে ছবি একখানি মাত্র জগতে ছিল দৈবক্রমে তিনি পাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ ছবি আর যে কোথাও কিনিতে মিলিবে ইহা কষ্মিনকালেই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি সে

কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না. স্খলিত সুস্রাবা নানারূপ ভাষায় সকালবেলা উঠিয়াই সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই. সে যেখানকার সেই থানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিতে পাইবেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই থানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকাচোরা কর্কশ-স্বরে বলিলেন "তুমি কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও—চাই না, দেখিতে চাই না।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল. স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল 'আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া চরণ ধরিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না, একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।" এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতালঅবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই. সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু সলেউদ্দীনের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন, ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন. "জাহান্নম! ধন রত্ন যদি খোয়াইতাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এ অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? আমার মত দুখিনীর আবার সাজ সজ্জা কি? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরি না.—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে।"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীনের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া

গেল, তাঁহার মনে একটি অশান্তির ভাব; আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দু এক বোতল মদ আনিতে বলিলেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### তীর্থ যাত্রা।

মতাহার আগা হুগলী সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইহাঁর আর কেহ নাই, একমাত্র কন্যারত্ন মুন্নাই ইহার সংসারের বন্ধন, হৃদয়ের সম্বল। অতি শৈশবে কন্যা মাতৃহীনা হইয়াছে সেই অবধি মতাহার আর বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিলে মুন্না পাছে পর হইয়া যায়—মুন্না তাঁহার বড় আদরের রত্ন, যত্নের ধন। ক্রমে মুন্না যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার শৈশবের রূপগুণ বয়সের সহিত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, স্নেহময় পিতার মন ততই স্নেহের গর্ব্বে পূরিয়া উঠিতে লাগিল, আনন্দের উচ্ছাসে উথলিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই অহ্লাদের মধ্যেও এমন রূপগুণসম্পন্ন স্বর্গীয় রত্ন কাহাকে সমর্পণ করিবেন—কাহার কণ্ঠে ইহা শোভমানা হইবে, এই এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কত পাত্র আসিতে যাইতে লাগিল—কোনটিই আর তাঁহার মনের মত হয় না, হুগলীর নবাব খাঁজাহা খাঁ পর্য্যন্ত মুন্নার হস্ত প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকেও মতাহারের পসন্দ হইল না। মতাহার এক আধারে সকল গুণ চান, তিনি চান তাঁহার জামাতা রূপবান, গুণবান, রাজবংশীয় সকল হইবে, কেবল তাহাই নহে, মতাহারের পুত্র নাই, তাহাকে পুত্র, করিয়া সে সাধও মিটাইবেন, তাঁহার জামাতা তাঁহার ঘরে থাকিবে। খাঁজা খাঁর যদিও ধন মান বংশের অভাব নাই, কিন্তু ইহাঁর সহিত বিবাহ দিলেত কন্যাকে গৃহে রাখা যায় না, তাহার পর আবার খাঁজা খাঁর অনেকগুলি বিবাহ, নবাব হইলে কি হয়—এরূপ স্থলে কোন্ প্রাণ ধরিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার ত ধনের অভাব নাই, তিনি তাহা ছাড়া আর যাহা চাহেন, এক ঠাঁই সমস্ত পাইয়া উঠেন না।

অবশেষে মুন্নার বিবাহ হইল, ধন লোভে পারস্য রাজবংশীয় এক যুবক তাহার বংশ মতাহারকে দান করিল। মতাহার রাজবংশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি জামাতার নামে লিখিয়া দিয়া তবে এই মান তাঁহার হস্তগত করিতে হইল। ইহাতে আর মতাহারের দুঃখ কি, তাঁহার ধন সম্পত্তি সকলি তাঁহার কন্যা জামাতার, কিছু দিন পরে ত উহারাই লইবে, না হয় আগেই উহাদের দিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। মতাহার যেরূপ চাহিয়াছিলেন, তাহাই হইল, তবে ঠিক সেরূপ হইল না। জামাতা রূপবান—রাজবংশীয়, শ্বশুরালয়বাসী সকলি হইল—কেবল যেরূপ গুণবান চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল না। কিন্তু বিবাহের সময় জামাতার এ অভাব বুঝিতে পারেন নাই, তখন সকল বিষয়েই মনোমত হইবে আশা করিয়াছিলেন, জামাতার দোষগুলি ক্রমে ফুটিতে লাগিল।

পিতা এত কষ্ট করিলেন, তবু কন্যা সুখী হইল না। মুন্নাকে মতাহার বেগম করিলেন—কিন্তু সুখী করিতে পারিলেন না। জামাতা কন্যার গৌরব বুঝিল না, হস্তীপদতলে রত্ন দলিত হইতে লাগিল।

নবাব সলেউদ্দীন দিনরাত বিলাসসমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন, বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, কিছু চাহেন না। সেই অপরিসীম বিলাস-তৃষ্ণা আর তাঁহার কিছুতেই মেটে না। সে তৃষ্ণা কুবেরের রত্ন-

সমুদ্রও যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। মতাহার আগার ঐশ্বর্য্য দুই চারি বছরের মধ্যেই ফুরায় ফুরায় হইয়া আসিল। মতাহার দেখিলেন একদিন তাঁহার কন্যার বুঝি বা পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, যে কন্যা রাজ-যত্নে পালিত হইয়াছে, তাহাকে একদিন সত্যই বুঝি বা একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। মতাহারের হৃদয়ে অসীম বেদনা, কন্যার মুখের দিকে তিনি আর চাহিতে পারেন না, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এক দণ্ড যে মুখ না দেখিলে মতাহার থাকিতে পারিতেন না, সেই মুখ দেখিলেই তাঁহার নয়ন যেন আপনা হইতেই অন্যদিকে ফিরিতে চায়। মুন্না বড় বুদ্ধিমতী,মুন্না বড় স্নেহময়ী, পিতার কষ্টের ভয়ে সে তাহার হৃদয় বেদনা লুকাইয়া রাখে, হাসি দিয়া অশ্রুজল ঢাকিতে চায়। পিতাকে বিষণ্ণ দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কাছে যায়, হর্ষভরে কথা কহে, ছেলেবেলায় পিতার সহিত কোন দিন কি কথা হইয়াছিল সেই সকল সুখের কথা ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনে, পিতাকে বুঝাইতে চাহে তাহার প্রাণে কোন কষ্ট নাই, কেন তবে তিনি অসুখী হইবেন।

মুন্নার সেই হাসিতে সেই হর্ষের কথায়, মতাহারের প্রাণ আরো কাঁদিয়া উঠে, সেই হাসির আলোকে মুন্নার প্রাণের আঁধার তিনি যেন আরো সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। মতাহার মনে ভাবেন—"মুন্না ধন আমার, আমি যে তোমার সব হাসি ঘুচাইয়াছি, তবে আবার এ হাসি কেন?" ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ নেত্রে কন্যার কাছে সরিয়া আসেন, মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে পিঠে হাত রাখিয়া কি ভাবিয়া কে জানে বলিয়া উঠেন "আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিবি?"—মুন্না হাসিয়া হাসিয়া বলে—"পারিব না? পারিব বইকি" মতাহারের চোখে জল পুরিয়া আসে—"মুন্না দুধের বাছা ফুলের মেয়ে কত কষ্ট সহিতেছে—আরো কি ইহা হইতে সহিবার কিছু আছে ভগবান।"

এইরূপে দিন যায়, মতাহারের মনের স্থিরতা নাই, কন্যার দুঃখ দেখিবেন না ভাবিয়া কখনো দূরে পলাইতে চান, আবার কন্যার কাছে আসিয়া তাহার সেই মুখখানি দেখিলেই সে ভাব আর মনে ঠাঁই পায় না, তখন মনে করেন—"মাগো এ মুখখানি কি না দেখিয়া থাকা যায়, ইহাকে একাকী কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইব, যা অদৃষ্টে আছে দুজনে ভোগ করিব, ভিক্ষা করিতে হয় দুজনে হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিব।"

কিন্তু এরূপ অবস্থায় দিন কাটিল না, যে রাত্রের ঘটনাটি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই তাহা মতাহারের কাণে উঠিল, কেবল তাহা নহে, যাহা হয় নাই—এমন অনেক কথা পর্য্যন্ত তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন জামাতা মুন্নাকে মারিয়া সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার পর স্বচক্ষে যখন তিনি কন্যার সেই দীনহীন অলঙ্কার শূন্যবেশ দেখিতে পাইলেন তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যে সলেউদ্দীনের সহিত বিবাহ দিয়া কি জঘন্য কাজ করিয়াছেন, নিজের নিকট, প্রাণের কন্যার নিকট, তাঁহার দেবতার নিকট কি ঘোর পাপ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, এ পাপের শাস্তি কোথায় গিয়া অবসান বুঝিতে পারিলেন না। একদিন হয়ত বা জামাতা মুন্নাকে হত্যা করিবে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া হত্যা করিবে, আর তাঁহার তাহাই একটা রক্তমাংসহীন শবের মত বসিয়া দেখিতে হইবে, এমন বল নাই, সামর্থ্য নাই, উপায় নাই, যে তাহা হইতে কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন। মতাহার শিহরিয়া উঠিলেন—আকুল ভাবে কাঁ-

দিয়া উর্দ্ধ নয়নে বলিলেন জগদীশ্বর আমার পাপের শাস্তিতে অনাথা বালিকাকে আর বধিও না, যা কিছু তোমার দণ্ড আছে—তাহা পাপ তাপের এই বৃদ্ধ মাথায় নিক্ষেপ কর, আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহা বহন করিব—"হৃদয়ের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দারুনবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত বল দিয়া অন্তর-দেবতাকে অতি আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, সেই দিন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল যে দেবতার নিকট গিয়া তাঁহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর অন্য উপায় নাই, মুন্নার মঙ্গলের আর আশা নাই, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যে জামাতার শুভমতি ফিরাইতে পারিবে না। সেই দিন প্রাণের সহিত সবলে যোঝাযুঝি করিয়া স্নেহের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূর তীর্থে পীবের নিকট গিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। কাহাকে মনের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না—কেবল সেদিন সন্ধ্যার পর আহারান্তে উঠিয়া আসিবার সময় মুন্নাকে বলিলেন—"মুন্না আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—একবার তীর্থ করিয়া আসি। কবে মরিয়া যাইব, শীঘ্র যাইব ভাবিতেছি" মুন্না তখন পান লইয়া পিতাকে দিতে যাইতেছিল, হাতটি কাঁপিয়া হঠাৎ পানটি পড়িয়া গেল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল, বৃদ্ধ মত্তাহার সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, বাহিরে শয়নকক্ষে গিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রাতঃকালে একদিন মুন্নার চ'খের জলের কুয়াসার উপর দিয়া একখানি নৌকা ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে কত দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে দিগন্তের সীমায় মিশিয়া অদৃশ্য হইল, আর কিছুই দেখা গেল না, মুন্নার যাহা কিছু ছিল সব দিগন্তের পরপারে গিয়া হারাইয়া গেল। সত্যই পিতা মুন্নাকে ফেলিয়া গেলেন। মুন্না তাহার পরেও কিছুক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল, এখনও যেন সেই নৌকাখানি দেখিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন দেখিল, সারা রাতদিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে নৌকা আর ফিরিবে না,—যখন বুঝিল হয়ত বা এ জনমেই আর তাহা ফিরিবে না—তখন অশ্রুজলের সহিত তাহার হৃদয় যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল; কি করিবে কোথা যাইবে—ভাবিয়া না পাইয়া ছুটিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল—যে গৃহে তাহার স্বামী ঘুমাইতেছিল অজ্ঞাতভাবে সেই দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল, আস্তে আস্তে চোখের জল মুছিয়া নিঃশব্দপদনিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত বাহির বাটীতে সুরাপানে মত্ত থাকিয়া সলেউদ্দীন শেষ রজনীতে নিতান্ত বিভোর হইয়া সেই কক্ষেই শয়ন করেন, অন্তঃপুরে শুইতে আসা আর তাঁহার পোষাইয়া উঠে না। মুন্না প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার নিদ্রিত স্বামীকে দেখিতে আসে, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া সাধ মিটিয়া একবার দেখিয়া লয়, স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আবার চলিয়া যায়। আজও মুন্না সেইরূপ আসিয়া দাঁড়াইল, আজ মুন্নার শূন্য প্রাণের ভিতর দুঃখের উচ্ছ্বাস কি বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে—আর সে সামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল, স্বামীর পা দুইটি বুকের মধ্যে চাপিয়া মাথাটি নীচু করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে বলিল "মুন্নার আর যে কেহ নাই, একমাত্র স্নেহের পিতা তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। স্বামী প্রাণ সর্ব্বস্ব—তুমি এখনো কি একবার এই অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবে না?

সলেউদ্দীন ঘুমের ঘোরে পা টানিয়া লইলেন—মুন্নার মাথায় পায়ের আঘাত লা-

গিল। মৃন্না তখন অবনত মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে সেই পদে চুম্বন করিল, ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চরণ অঞ্চলে মুছিয়া একবার সমস্ত হৃদয়ভরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া, একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর মনের ব্যথা মনে চাপিয়া, চখের জল চোখে রাখিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### জাগন্ত স্বপ্ন।

মহম্মদ মসীনের সকালে সন্ধ্যার নিয়মিত দুইটি কাজ ছিল, সকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটাইতেন। কিন্তু কয়দিন হইতে এসবে তাঁহার যেন ঢিলঢাল পড়িয়াছে, ব্যায়াম করিতে ত প্রায়ই সুবিধা হইয়া উঠে না, গানের মজলিসটা, নিয়মিত বসে বটে, কিন্তু তাহাও তেমন আর জমাট বাঁধে না। গায়ক ভোলানাথ যে গান করিতে যান মসীন তাহাই অপসন্দ করিয়া বসেন। "ভোলানাথ বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারেন না," "তাঁহার বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটে না," "ইমনগুলা কড়িমধ্যমের জ্বালায় ঘ্যানর ঘ্যানর করে," এইরূপে কোন গানই মসীমের মনের মত হয় না। তাঁহার জ্বালায় ভোলানাথও ত্যক্তবিরক্ত হইয়া ক্রমে সত্যসত্যই গানের বদলে কান্নার সুর ধরিয়া বসেন, রাগ গুলায় বিরাগ করিয়া তুলেন, বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা একে একে উঠিয়া যায়, ভোলানাথও তানপুরাটাকে আছড়াইতে আছড়াইতে রাখিয়া চলিয়া যান, যত রাগ তাঁহার তানপুরার উপর আসিয়া পড়ে।

এরূপ করিয়া ত আর ভোলানাথের প্রাণ বাঁচে না। ভোলানাথের বয়স কাঁচা না হইলেও মনটা বড় কাঁচা, প্রাণটা বড় সখের, গায়কদিগের প্রাণের ধর্ম্মই বুঝি এইরূপ। বনের পাখীর মত হাসিয়া গান গাইয়াই এ প্রাণ কাটাইতে চাহে। মহম্মদের বেখোস মেজাজ, তাহার বড়ই খারাপ লাগে, মহম্মদ যে বিমন আনমনে বসিয়া বাহারকে বেহাগ বলিয়া খুৎ ধরিয়া বসেন, গান না শুনিয়া গানের সমালোচনা করিতে থাকেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভোলানাথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যতক্ষণ না ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় দেখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণটা সুস্থ হইতেছে না।

আজ আহারান্তে মসীন সন্ধ্যার পর মজলিসস্থলে আসিবামাত্র ভোলানাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাতাসটা আজ যেন দক্ষিণদিক থেকে বইতে সুরু করেছে, একট সময়-মাফিক গান গাইলে হয় না?" মসীনও হাসিয়া বলিলেন—"ওস্তাদজি দক্ষিণে বাতাস কোথায় পেলে? মহা উত্তরে বাতাস আমরাত মারা গেলেম" ওস্তাদজি মুস্কিলে পড়িয়া চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে বলেন কি? এখনো উত্তরে বাতাস? এ বুড়হাড়ে সে বাতাস লাগলে যে আর উঠতে পারব না"— মসীন বলিলেন "তোমার প্রাণের ভিতর যে সারাদিন বসন্ত বাতাস বইছে, উত্তরে বাতাস কি তোমাকে ছুঁতে সাহস করে ওস্তাদ জি" ভোলানাথ হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"বাতাস বইছে আর কই, প্রাণের ভিতর আটকা পড়ে গেছে" মসীন বলিলেন—"তা আটকা পড়বার আবশ্যক কি, বহুক না যত পারে বহুক, গান টান কি হবে চলুক"—ভোলানাথের প্রাণের মত কথা হইল, মহা আহ্লাদে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কিন্তু হুজুর

আপনার আকাশ পানে চেয়ে থাকলে চলবে না, এই দখিনে বাতাসটা গায় লাগান চাই—" মসীন বলিলেন "যে আজ্ঞে ওস্তাদজি—তাই হবে।"

ক্রমে মহম্মদের বন্ধু বান্ধবগণ একে একে মজলিসে আসিয়া বসিলেন, ভোলানাথ তানপূরা লইয়া বসন্ত বাহারের রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথ আগে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুদিন আর গান ধরিবেন না।

সপ্তসুরে ছুঁইয়া ছুঁইয়া, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে, সপ্তম হইতে সপ্তমেসে তান উঠিতে পড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে উঠিয়া পড়িয়া সুরে সুরে মিলিয়া মিলিয়া, মধুর মধুভাবে সে তান চারিদিক ভরিয়া তুলিল। সে তানে মলয়ের হিল্লোল উঠিল, কোকিলের কূজনি ছুটিল, তানে তানে, প্রাণে প্রাণে নব বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গেলেন. সুখেয় প্রবাহ ঢালিয়া অবিশ্রান্ত অবিরত সেই মধুর তান মাত্র তাহার প্রাণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, ফুলের বাতাসের মত হৃদয়কে মত্ত করিয়া দিয়া ক্রমে সে তান তাহার প্রাণের দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া পড়িল, সে তানের ঝঙ্কারও আর তিনি শুনিতে পাইলেন না। দেখার অতীত, শোনার অতীত, ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত অস্পৃষ্ট কি এক অপূর্ব্বভাবে শুধু হৃদয় পুরিয়া গেল। সহসা শত শত আলোকছটায় ফুটিয়া, চারিদিক আলোকে আলোকে ছাইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে সে ভাব তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মসীন সেই আলোক ছটার দিকে চাহিয়া রহিলেন. সেই জ্যোতির উচ্ছ্বাস মধ্যে যেন একটি ছায়া ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে সে ছায়া একটি অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করিল, মসীন অনিমেষনেত্রে সেই ছবি দেখিতে লাগিলেন, ছবি অতি অস্ফুট, অতি ভাস ভাস, তাহাকে চেনা যায় না, তাহাকে চোখে ধরা যায় না, দেখিতে দেখিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইল, সে ছবি একটি রমণী মূর্ত্তি; সে মুখে পাপ তাপের মলিনতা নাই, দুঃখ বিষাদের রেখা মাত্র নাই, স্বর্গীয় শান্তিভাবের সে মূর্ত্তি জীবন্ত প্রতিমা। মহম্মদ তাঁহাকে চিনি চিনি করিয়া আকুল হইলেন. সহসা চারিদিকের আলোকছটা ছবির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সে আলোকে মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা জ্বলিতে লাগিল। সে প্রতিমার কাছে আর একজনকে মসীন দণ্ডায়মান দেখিলেন, তিনি সেই সন্ন্যাসী।

নিস্তব্ধে স্থির কটাক্ষে মহম্মদ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সঙ্গীত থামিল, মসীনের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নিমেষে সেই আলোক সেই ছবি মিলাইয়া গেল, তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সেদিনের মত গানের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, মসীন মুন্নার কাছে গেলেন।

# আমার সে ফুল দুটি।

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি—
ধীরে ধীরে রবি উঠে, অন্ধকার পড়ে টুটে
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি।
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি—
আমার সে ফুল দুটি, কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙ্গা মাখি,
সারাদিন ঐ আশে থাকি।

হোল বেলা, চলে গেল, ধীরে ঐ সন্ধ্যা এল
আঁধার আলোকে বাঁধি বিবাহ বাঁধনে,
আধেক আঁধার ভাসে, আধেক আলোক হাসে
সব একময় শেষে মিশিয়া দু প্রাণে।
সবে প্রভাতের বেলা, ফুটেছে যে ফুলবালা
নবীন বরণ মাখা কিশলয় সাজে,
তাদের ফুরালো খেলা, সমাপন করি পালা
ঝরে ঝরে পড়ে সরে দু দণ্ডেরি মাঝে,—

—নাই সে মোহিনী সাজ প্রফুল্ল বয়ান,
বেশ ভূষা সব বাসি, মলিন সে ফুল্লহাসি
নাট্যশালা হতে সবে করিছে প্রয়াণ,
আর এক পথ দিয়ে, নূতন সৌন্দর্য্য নিয়ে
ফুটিছে তারার ফুল ঝলসি নয়ান।

এক আসে এক যায়, না ফুরাতে হায় হায়
সে 'হায়ে' নূতন হাসি অমনি ফেলেরে ঢাকি,
যে যায় সে শুধু যায়, যেমন তেমনি হায়
জগতের সব বুঝি ফাঁকি!

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি।
আসে রাত সন্ধ্যা যায়, প্রাণ করে হায় হায়
কোথায় সে হৃদয়ের আঁখি?
আমাতে যে আমি হারা, কখন আসিবে তারা
আকুল নয়নে চেয়ে দেখি।
কিছু তারা বলে নাত, ফুলের বাতাস মত
কি জানি কখন আসে—শুধু চেয়ে থাকি।

আসে তারা অতি ধীরে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ফিরে
শত ফুল সে পরশে হৃদয়ে ফুটিতে চায়,
না খুলিতে দলগুলি না চাহিতে মুখ তুলি
হাসিময় সে সমীর পলকে মিশায়ে যায়!
ফুটো ফুটো ফুলগুলি,
বিষাদের তান তুলি
একে একে পড়ে ন্যুয়ে মরমে মরম ঢাকি।
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি,—

—ধীরে ধীরে রবি উঠে, অন্ধকার পরে টুটে
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি।
আমার সে ফুল দুটি, কখন উঠিবে ফুটি
উষার বরণ রাঙ্গামাখি।
সারাদিন পথচেয়ে থাকি।

# বাঙ্গালীর আশা।

আজ বাঙ্গালার যেরূপ দুর্দ্দশা চিরদিন কিছু এরূপ ছিল না। একদিন বঙ্গেশ্বর বিজয়সেন সিংহল জয়ের জন্য রণপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন—একদিন বাঙ্গালা নিজ বীর্য্য-বলে সমস্ত গঙ্গামাতৃক প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতকে বিস্মিত করিয়াছিল। আজ বাঙ্গালার সে দিন কোথায়! বঙ্গের অতীত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার নিজের আশ্চর্য্য উন্নতির নির্ব্বাণ-প্রায় দীপালোকে আজ যাহা দেখিতে পাই তাহাতেই আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হই। আধুনিক ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, কোন জাতি উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ না করিলে—তাহার সমাজ সংগঠন-কার্য্য শেষ হইয়া সমস্ত দেশ মধ্যে শান্তি বিরাজ না করিলে তাহার শিল্পের উন্নতি হয় না। শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থার পরিমাণ করিতে পারিলে আমরা সে জাতির উন্নতাবস্থাও পরিমাণ করিতে পারি। অতএব বাঙ্গালার আর কিছু থাকুক না থাকুক, শুধু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার তাহার ঢাকাই মস্‌লিন্‌ প্রস্তুত করিবার কৌশল অথবা ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের উৎকৃষ্ট সোনা ও রূপার অলঙ্কার গড়িবার আশ্চর্য্যকৌশল দেখিলে অতীত বাঙ্গালার শিল্পের উন্নতির কথা বেশ বুঝিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। বাঙ্গালা—জাবা, বালী, সিংহল প্রভৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য অথবা জলযুদ্ধের জন্য অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিবার কৌশল জানিত। 'নটিকেল চার্ট', 'নটিকেল আলমানাক', দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, 'সেকস্‌ ট্যান্ট' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বাঙ্গালা সুদূর সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে শিখিয়াছিল। ইহা ব্যতীত যখন তাহার স্থাপত্য—মখ্‌মল, কিংখাপ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য ও সুখৈশ্বর্য্য-ভোগোপযোগী অন্যান্য বিবিধ শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তাহার আশ্চর্য্য শিল্পোন্নতির কথা মনোমধ্যে উদিত হয় তখন অতীতের অন্ধকারের সুদূর ক্ষীণালোকেও যাহা দেখিতে পাই তাহাতেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই। বাঙ্গালী-জাতি কোথা হইতে আসিল, কি রূপে এই জাতির সৃষ্টি হইল, প্রাচীন আর্য্য-জাতির সহিত বাঙ্গালীর কি রূপ সম্বন্ধ তাহা স্থির হউক না হউক, দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে—বুদ্ধদেবের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—এই বাঙ্গালা যে সভ্য ও অতি উন্নত-দেশ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু বাঙ্গালার সে সৌভাগ্যের অবস্থা অধিক দিন থাকে নাই। তাহার সে বীর্য্য, সে শিল্প, সে বাণিজ্য সে উন্নতি সকলই

গিয়াছে—সে দিন আর নাই। যে দিন প্রবঞ্চক বখ্‌তিয়ার খিলিজী সপ্তদশটী মাত্র অশ্বারোহীর সাহায্যে—বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে—বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজ লাক্ষণেয় সেনকে রাজ্যচ্যুত করিল, বাঙ্গালা অধিকার করিয়া মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপন করিল, সেই দিন বাঙ্গালার সব গিয়াছে—সেই দিন হইতে বাঙ্গালার এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর ক্রমাগত বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে। ঘোর রাজনৈতিক আবর্ত্তে বঙ্গদেশ নিষ্পেষিত হইতেছে। হিন্দুরাজত্বের পর পাঠান রাজত্ব, তাহার পর মোগল রাজত্ব, তাহার পর মুসলমানেরা ক্রমে হীনবল হইলে ইংরাজের রাজত্ব—ক্রমান্বয়ে এই সকল রাজপরিবর্ত্তনে—বাঙ্গালা কখন বিশ্রাম করিতে পায় নাই। হিন্দু রাজত্বকালে যে ভিত্তির উপর সমাজ সংগঠিত ছিল তাহা একেবারে বিচূর্ণীত হইয়াছে। হিন্দুরা আসিয়া যেমন সিন্ধু নদের নিকটস্থ প্রদেশ সকল জয় করিয়া আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। পঞ্জাব জয়ের বহুকাল পরে হিন্দুরা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ যে সকল হিন্দুরা এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, কারণ তাঁহারা এখানকার আদিমবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই, বরং আপনাদিগের কুটুম্ব বর্গের নিকট হইতে অধিক দূরে থাকায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ঐ সকল আদিম জাতির সহিত অনেকটা মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক উভয় জাতির অনেক দিন মিশামিশিতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। অধিক সভ্যজাতির সহিত অসভ্য জাতির সংঘাতে ক্রমে আদিম অসভ্য জাতিরা অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়া আর্য্যদিগের সমাজের নিম্নতম-স্তরভূত হইতে লাগিল। তাহাদের সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারও অনেকটা আর্য্যদিগের মত হইয়া আসিল এ দিকে আর্য্যরাও কতক পরিমাণে তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সামাজিক রীতি নীতির ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধেও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের কতকগুলি দেবতা লইয়া আপনাদের দেবতার দলপুষ্টি করিলেন; এদিকে অনার্য্যেরাও আর্য্যজাতির সংঘর্ষণে ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া আসিল। কতদিন পূর্ব্বে এই উভয় জাতির সম্মিলনে এই বাঙ্গালী-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্থির করা যায় না।—তবে জগতের ইতিহাস পাঠে যেরূপ বুঝা যায় এবং আর্য্যেরা যেরূপ পরিবর্ত্তন-বিমুখ, অনার্য্যেরা যেরূপ অনুকরণ-অনিচ্ছু, তাহাতে এই জাতিসম্মিলনে বহুশতাব্দী লাগিয়াছিল ইহাই অধিক যুক্তিসিদ্ধ।

এই জাতি-সম্মিলনের বহুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। এই সময় বাঙ্গালীর অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাদুর্ভাবের

সময় বাঙ্গালায় তাহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের প্রাচুর্ভাব সময়ে বাঙ্গালা ও বিহারে এত মিশামিশি ছিল (অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা ও বিহার এক রাজ্য অন্তর্গত ছিল) যে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাতেই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বলা যায়। বাঙ্গালার পাল বংশীয় রাজারা ত বৌদ্ধই ছিলেন এবং তাহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মই বাঙ্গালার রাজধর্ম্ম ছিল। একেত পূর্ব্বেই অনার্য্যধর্ম্মের প্রভাবে আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এত মিশামিশিতে আমাদের ধর্ম্মের বিশেষ রূপান্তর হইল, তাই আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালার হিন্দুধর্ম্ম পশ্চিম দেশীয় হিন্দুধর্ম্মাপেক্ষা অনেক বিভিন্ন *। একদিকে আদিম নিবাসীদের প্রভাব, অপরদিকে বৌদ্ধদের প্রভাব; অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ আর কত দিন চেষ্টা করিবে—কতদিন আর আত্মরক্ষা করিবে। তাই তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং তাহার সহিত তাঁহাদের রীতি নীতি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই জন্য মহারাজ আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হন। আদিশূর বাঙ্গালার লোক ছিলেন না। দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালার রাজা হন; সুতরাং তাঁহার স্বদেশের হিন্দুধর্ম্ম হইতে বাঙ্গালার হিন্দুধর্ম্মের অনেক প্রভেদ দেখিয়া, এ দেশের আচার ব্যবহার প্রাচীন বৈদিক আচার ব্যবহার হইতে এত বিভিন্ন দেখিয়াই বোধ হয় কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাও স্বদেশ হইতে তাড়িত, স্বদেশের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া এ দেশীয় আর্য্যদিগের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ করিলেন। সুতরাং যতদিন হিন্দু-রাজত্ব ছিল বাঙ্গালার সমাজ ততদিন স্থির ভাবে থাকে নাই। অনবরতই পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সমাজ পরিবর্ত্তন এইরূপ নানা পরিবর্ত্তনে সে সময়ে বাঙ্গালাকে অনেক পরিমাণে সতেজ রাখিয়া ছিল। পরিবর্ত্তনই সমজের জীবন। সমাজ স্থিরভাবে থাকিলেই তাহার উন্নতি হয় না বরং সচরাচর অধোগতিই হইয়া থাকে। তাড়িত-কোষ মধ্যস্থিত বিভিন্ন ধাতু দুইটির রাসায়নিক সংস্রবে তাড়িত-স্রোত প্রবাহের, ন্যায় যে দেশে দুইটি বিভিন্ন জাতির সম্মিলন ক্রিয়ার অধিক পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় সেই শক্তির প্রভাবেই সে দেশের উন্নতি হইতে থাকে। হিন্দু-রাজত্বকালে বাঙ্গালার অবস্থারও আমরা এই কারণে এত উন্নতি দেখিতে পাই। সেইজন্য বল্লালসেন কি লক্ষ্মণসেনের সময়ে আমরা বাঙ্গালাকে সমরাঙ্গনে উৎ-

* আমরা পশ্চিম দেশের আধুনিক হিন্দু-ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না। বৌদ্ধধর্ম্ম বা অনার্য্যদিগের ধর্ম্মের সহিত পশ্চিমের হিন্দুধর্ম্ম অধিক না মিশিলেও মুসলমানদের রাজত্ব কালে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত তাহার অত্যন্ত মিশামিশি হইয়াছিল। আজ কাল পশ্চিম দেশের হিন্দুরা ত অর্দ্ধেক মুসলমান। সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালায় এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই।

সাহের সহিত নাচিতে দেখিয়াছি। এই সময়েই জয়দেব, কবিরাজ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি উচ্চদরের বাঙ্গালি কবি,এবং হলায়ুধ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞগণকে আমরা দেখিতে পাই। এই সময়েই বাঙ্গালার ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। এ সময়েই রোম ফিনিসিয় প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্যের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

কিন্তু বাঙ্গালিদের এসুখের অবস্থাও অধিক দিন থাকে নাই, ক্রমে ব্রাহ্মণ যাজকগণ রাজ দরবারে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। কি কারণে জানিনা—সে সময়ের ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা এবং শান্তিই বীজমন্ত্র ছিল ; (১) বিশেষতঃ বহুকাল ধরিয়া শান্তির ক্রোড়ে লালিত হওয়ায় বাঙ্গলা আত্মরক্ষা করিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল, দেশ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিল। সেই জন্যই বোধ হয় মুসলমানেরা এদেশ অনায়াসে হস্তগত করিয়াছিল।

মুসলমানাধিকারের সময় হইতে বাঙ্গালায় অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ মুসলমানেরা বাঙ্গালা অধিকার করিয়াই বাঙ্গালায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের জ্ঞাতিবর্গ পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এদেশে ক্রমে ক্রমে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং বাঙ্গালিরা তাহাদের সমস্ত অধিকার হইতে তাড়িত হইয়া বিজিত দাসের মত দূরীভূত হইল। নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ড জয় করিলে সাক্ষণদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল মুসলমানদিগের বাঙ্গালাজয়ে বাঙ্গালির তাহা অপেক্ষাও অধিক দুর্দ্দশা হইল, মুসলমানেরা আবার ইহার উপর বিধর্ম্মীদিগকে হয় স্বধর্ম্মে থাকা না হয় ধ্বংশ করাই প্রধান ধর্ম্ম মনে করিত। এক্ষণে বাঙ্গালার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। এই মুসলমানদের প্রায় বার আনা ঐ অত্যাচারের সময় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং সমাজ সে সময়ে কি ভয়ানকরূপে আলোড়িত হইতেছিল। তাহার পর ইংলণ্ডে সাক্ষণেরা যেরূপ ধীরে ধীরে বহুদিন* পরে তাহাদের জাতি, সমাজ, ভাষা বাঁচাইয়া ছিল সেইরূপ বাঙ্গালিরাও ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্টে আপনাদিগকে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। অতএব মুসলমানাধিকারের সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর বাঙ্গালার সমাজে অনবরত পরিবর্ত্তন কিম্বা বিপ্লব হইতেছিল, দেশময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, লোকে আপনার জাতিমান রক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য এ সময়ে বাঙ্গালি জাতির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এ সময়কে আমরা বাঙ্গালার (ডার্কএজ) তমঃযুগ বলিতে পারি। এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হয় নাই অথবা যদি হইয়া থাকে

---

(১) শান্তি বীজমন্ত্র না হইলে সভ্যতার চরম উন্নতির সোপানে উঠা যায় কি ? যত কিছু বিবাদ, বিসম্বাদ, অশান্তি, বিপ্লব সে সকলি শান্তির উদ্দেশে। ভাং সং।

তাহার প্রমাণ ভালরূপ পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজত্ব কালে বাঙ্গালায় যে কি ভাষা ছিল তাহা স্থির করা যায় না। তখন এ-দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা ছিল। তখনকার রাজভাষা সংস্কৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। অথবা সংস্কৃত কখন চলিত ভাষা ছিল না, সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত কোথাও বা পালি কিম্বা গাথাই সাধারণের প্রচলিত ভাষা ছিল। যাহা হউক এদেশের অধিকাংশ লোক অনার্য্য—তাহাদের ভাষা অবশ্য অনার্য্য ছিল, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমাদের দেশের চলিত ভাষা এদেশীয় অনার্য্য ভাষার সহিত এবং তৎপরে মুসলমানদের পারসি ভাষার সহিত মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইতেছিল মাত্র। * পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ দেশের হিন্দুধর্ম্ম পশ্চিম দেশীয় হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক বিভিন্ন। বৌদ্ধধর্ম্ম ও এ দেশীয় প্রাচীন অনার্য্যধর্ম্মের সংস্পর্শেই আমাদের আদি-হিন্দুধর্ম্ম বিকৃত হইবার প্রধান কারণ। হিন্দু ধর্ম্ম বিকৃতই হউক আর যেরূপই হউক বাঙ্গালায় বরাবর যে রূপ ধর্ম্মের আন্দোলন হইয়াছে বোধ হয় এরূপ আন্দোলন কখন কোন দেশে হইয়াছে কি না সন্দেহ। প্রথমেই অনার্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণে ধর্ম্ম এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার পর বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম, বৌদ্ধদিগের দর্শন বাঙ্গালার ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন হইতেছিল। বাঙ্গালায় যেমন ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের (Phase) স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, বাঙ্গালায় যেরূপ ধর্ম্মকে দর্শনশাস্ত্র সম্মত ও সাধারণের ব্যবহার ও অনুসরণের উপযোগী করা হইয়াছে এরূপ ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, এরূপ ধর্ম্মের অসংখ্য ভাব আর কোন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাংখ্য-দর্শন ও যোগ শাস্ত্রের ভিত্তির উপর তন্ত্রের পর তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মের যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং তাহার সহিত দর্শন শাস্ত্র নূতন রূপে গঠিত হইয়া বাঙ্গালায় যে চিরস্থায়ী গগনস্পর্শী কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলিত হইয়াছিল তাহাই শুধু অতীত বাঙ্গালার উন্নত অবস্থার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্যস্বরূপ চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ধর্ম্মের যখন এইরূপ পরিবর্ত্তনের অবস্থা তখন মুসলমানেরা আসিয়া এ দেশ জয় করিল। মুসলমানাধিকারে দেশ মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ভাষা বল, ধর্ম্ম বল, সকল ভাবনা ত্যাগ করিয়া লোকে আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইল। সেই জন্য ভাষা ও ধর্ম্মের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন এত পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াও উক্ত তিন শত বৎসরের জন্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল-

---

* জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি আদি বাঙ্গালি কবিদের গ্রন্থে এইরূপ পারসি অনার্য্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে ইতিহাসে দেশের লোকের অবস্থা বর্ণনা না করিয়া কেবল রাজাদের জীবন চরিত মাত্র লিখিত হয় তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলে না।

পাঠানে রাজত্ব লইয়া মহা বিবাদ বাধিয়া গেল। কে বাঙ্গালার রাজা হয়? এই সময়ে বাঙ্গালা কতকটা হাঁপ ছাড়িতে অবসর পাইল। দেশের রাজারা তখন আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত সুতরাং এ দেশের লোকেরা তখন সময় বুঝিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই সময় মুসলমানদিগের অধীনস্থ অনেকগুলি রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ এরূপ বলীয়ান হইয়াছিল যে তাহারা প্রায় মুসলমানদের গ্রাহ্যই করিত না। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। মুসলমানেরা বিলক্ষণ বুঝিত যে শাসন কার্য্যে ও করসংগ্রহে হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক দক্ষ—এই জন্যই তখন হিন্দু-জমীদারের সংখ্যা অধিক ছিল। ইহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান, নাটোর,দিনাজপুর প্রভৃতির জমীদারগণ মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। এই সময়েই প্রতাপাদিত্য, মানসিংহকেও সমরে আহ্বান করিতে ভীত হন নাই।

এই সময়ে আবার বাঙ্গালার আর এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। ইহাকে আমরা ইউরোপের মিড্‌ল্ এজের (মধ্য যুগ) সহিত তুলনা করিতে পারি। বাঙ্গালার যে নব-উদ্যম যে উন্নতিস্রোত মুসলমানদের আগমনে রুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার দুর্দ্দমনীয় বেগভরে বহিতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা ভাষা ত এতদিন আদৌ গঠিত হয় নাই। ভাষা সৃষ্ট হইয়াই প্রথমে কাব্য লিখিত হয়। গদ্য পুস্তক অনেক পরে ভাষা সুগঠিত হইলে তবে লিখিত হয়। আমাদের ভাষার প্রথম পুস্তক বিদ্যাপতি ও তৎপরে চণ্ডিদাসের পদাবলী। প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং এই যুগ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাঙ্গালার কি অবস্থা ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। হিসাবমত সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাও সৃষ্ট হইতেছিল মাত্র। তাহার পরেই কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ আবির্ভূত হইয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কার আরম্ভ হইল। ভাষা ও ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিল। এ সময়ের কথা মনে হইলে হৃদয় এখনও আনন্দে গলিয়া যায়। কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই যে একটী ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী হইতে তিনটী শিষ্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া বহির্গত হইলেন। একজন দেশীয় লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রসকল পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, একজন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রালোচনায় বাঙ্গালাকে ভারতের শীর্ষস্থানীয় করিলেন, আর একজন ভক্তিবলে বলীয়ান হইয়া দেশের বিকৃত মৃতপ্রায় ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মে সমস্ত বাঙ্গালাদেশকে মাতাইলেন—সুধু বাঙ্গালা নহে, সমস্ত ভারতবর্ষই তিনি নব ধর্ম্মস্রোতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তির সহিত গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি-

গণ প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিলেন।

এরূপ আন্দোলন, এরূপ পরিবর্ত্তন একেবারে কোনদেশে কোনকালে হইয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ উন্নতিস্রোতে কোন দেশ কখন এককালে মাতিয়াছে কি না তাহা স্মরণ হয় না। এই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার হইল, ভাষা সংস্কার হইল, লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রসংস্কার হইল, ন্যায়ের চর্চ্চা নূতন করিয়া অপ্রতিহত বেগে আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত সমাজ সংস্কার হইল। বাঙ্গালী পদমর্য্যাদা পাইয়া বাহুবল পাইয়া বড় হইতে আরম্ভ করিল। এই মাহেন্দ্র যোগে সমাজে পুনঃসংস্কার কি বিপ্লব আরম্ভ হইল স্থির করা বড় সুকঠিন। এমন স্থিরভাবে বিনা রক্তপাতে এত পরিবর্ত্তন আর কোথাও কখন হইয়াছে কি? বলিয়াছি ত ইহার একমাত্র কারণ মোগল পাঠানে যুদ্ধ, বাঙ্গালারাজ্য লইয়া পরস্পরে বিবাদ। ইহাতে বিব্রত হইয়াই শাসনকর্ত্তারা করাল শাসনের দ্বারা উন্নতির মুখে যে ভীষণ প্রস্তর চাপাইয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাসিয়া যায়। তাই বাঙ্গালার অদৃষ্টকাব্যের এই সুন্দর চিত্র একবার দেখা গেল। যদি এসময়ের কোন তুলনা থাকে, তবে আমরা ইংলণ্ডের পিউরিটানদের প্রাদুর্ভাবের সময়ের সহিত ইহার বেশ তুলনা করিতে পারি।

কিন্তু এ সৌভাগ্যও অধিকদিন থাকে নাই। প্রায় এক শতাব্দী পরে আরঙ্গজীবের সিংহাসনাধিরোহণ সময়েই মোগল পাঠানে যুদ্ধ মিটিয়া যায়। ধূর্ত্ত আরঙ্গজীব যে জালে সমগ্র ভারতকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাকেও সেই জালে আবদ্ধ হইতে হইল। আবার বাঙ্গালার উন্নতির স্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। আবার দুর্দ্দান্ত মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের বজ্রময় শাসনে সমস্ত বাঙ্গালা দলিত, পূর্ব্বকার মত নিস্তব্ধ হইল। এই অবস্থায় দেড়শত বৎসর কাটিয়া গেল। সে সময়ে বাঙ্গালার জীবনীলক্ষণ বড় দেখা যায় না। এই ভয়ানক সময়ে ইংরাজেরা আসিয়া বাঙ্গালাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালাকে রক্ষা করিলেন বটে কিন্তু বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা ঘুচিতে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক সময় কাটিয়া গিয়াছিল। ইহার সবিস্তার বর্ণনা এস্থলে আবশ্যক নাই। ইতিহাসে বর্ণিত আছে।* সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২০। ২৫ বৎসর মধ্যেই গোলযোগ অরাজকতা সমস্তই চুকিয়া গেল—বাঙ্গালা আবার মস্তক উত্তোলন করিল, আবার সুদিন আসিল, আবার উন্নতি স্রোত বহিল।

আমরা বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থাকে ইহার নবযুগ (Modern age) বলিতে পারি। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালার যে উন্নতি, যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের সংঘর্ষে আসিয়া বাঙ্গালার যেরূপ

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে Hunter's Annals of Rural Bangal' দেখ।

উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঙ্গালার যে উন্নতি স্রোত মুসলমানের অত্যাচারে একেবারে রুদ্ধ ছিল, তাহা আবার দ্বিগুণ-বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালায় যেরূপ ধর্ম্ম পাইয়া ঢলাঢলি মাতামাতি হইয়াছে—বাঙ্গালা যেরূপ ধর্ম্ম লইয়া বিস্তার হইয়া আছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালা যখনই অবসর পাইয়াছে—যখনই মাথা তুলিতে পাইয়াছে, তখনই ধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই নবযুগের প্রারম্ভে, এই স্ফূর্ত্তির সময়ে, বাঙ্গালা যে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম লইয়া মাতিবে তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে ধর্ম্ম-সংস্কার আরম্ভ হইয়া—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া—এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সাধারণ হিন্দুধর্ম্মেরই নবসংস্কার—নবজীবন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতি এরূপ পরিবর্ত্তন আর কোন দেশে কখন হইয়াছে কি?

কে বলে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন? বাঙ্গালা দেশ প্রাচীন নহে। বাঙ্গালী প্রাচীন, পতনোন্মুখ-জাতি নহে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার জীবন যতবার স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল ততবারই করালকাল আসিয়া অকালে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। যখন হিন্দুরাজত্বকালে বাঙ্গালা প্রথম উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে যাইতেছিল তখন মুসলমানেরা আসিয়া তাহার পক্ষ বন্ধ করিল। আবার যখন মোগলপাঠানের যুদ্ধকালে বাঙ্গালা সময় পাইয়া মস্তকোত্তলন করিতেছিল মাত্র, তখনই আবার কঠোর শাসনে তাহাকে নত হইতে হইল। যখনই বাঙ্গালা সময় পাইয়াছে তখনই কিশোরজীবনের অস্থিরতা, উগ্রতা, অদম্য-উদ্যম দেখাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অদৃষ্টে কয়দিন এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে? কঠিনপাত্রবদ্ধ বাষ্পের ন্যায় বাঙ্গালীর উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি এতদিন বদ্ধ ছিল; আজ সুনিয়মও সুশাসনের বলে সে উদ্যম সে উৎসাহ দেখা দিয়াছে। নববলে বলীয়ান্ বাঙ্গালা এই মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এত দিন তাহার ইতিহাস ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে তাহার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই কিশোর বাঙ্গালার এই প্রথম উদ্যম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া উৎফুল্ল-লোচনে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি। প্রগাঢ় কুহেলিকা ভেদ করিয়া বঙ্গাকাশে—সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তে—আবার অরুণভাতি দেখা দিতেছে! দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অতি অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গালার ইতিহাস সুবর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া জগতের মধ্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

# সুদান-সমর।

## ও

## বীরভূমি বৃটেনিয়ার কুগ্রহ।

কুদিনে, কুক্ষণে ইংলণ্ড মিশরক্ষেত্রে কলঙ্কিত সমরানল প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন। এই ঘৃণিতযুদ্ধে স্বাধীনতার প্রিয়উপাসক বিশ্ববিজয়ী বৃটিশ জাতির বিশুদ্ধ যশে ঘোর কলঙ্কের কালিমা পতিত হইয়াছে। যে জাতির প্রাতঃস্মরণীয় বংশধরগণ একদিন স্বাধীনতা ও সাম্যমন্ত্রের ঘোষণা করিয়া পৃথিবী হইতে ঘৃণিত দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধনে প্রচুর অর্থব্যয় ও প্রভূত ত্যাগস্বীকার করিয়া সমস্ত সভ্যজগতের প্রাণগত ভক্তি ও প্রীতির উপহার লাভ করিয়াছেন, সেই জাতির গৌরবস্বরূপ প্রতিভাশালী মহাত্মাগণ অসহায়, দাসবৎ-ব্যবহৃত একটি অধঃপতিত, উৎপীড়িত জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতীর গৌরব পরিম্লান করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃঃঅব্দে যখন এই যুদ্ধের প্রথম আয়োজন হয়, তখন সমস্ত সভ্য জগতের চক্ষু বৃটিশ জাতির সুদক্ষ নেতা মন্ত্রী-প্রধান গ্লাড্‌ষ্টোনের কার্য্যের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বাধীনতা ও সাম্যপ্রিয় কত হৃদয় ভাবিয়াছিল, উৎপীড়িতের প্রকৃত বন্ধু, বিপন্নের প্রধান সহায়, স্বাধীনতার-পক্ষপাতী মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন পদস্থ থাকিতে কখনই তিনি এই অন্যায় যুদ্ধের সমর্থন করিবেন না। কিন্তু [illegible] ই যখন বৃটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ সার বুশাম সীমোর (Sir Beauchamp Seymour) সুসজ্জিত রণতরী-সমূহ লইয়া মিশর উপকূলে বিজয়ী বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং সামান্য ছলে বাণিজ্য-প্রধান বহুসমৃদ্ধিশালী আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া নগরে অবিশ্রান্ত ভীষণ গোলা বর্ষণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে দুর্গ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও নগর ধ্বংশ করিলেন, তখন সকলে বুঝিল, মিসর সমর অনিবার্য্য—তখন সকলে বুঝিল, সমরপ্রিয় সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় ভুলিয়া সুবিজ্ঞ গ্লাড্‌ষ্টোন্ ও তাঁহার পৃষ্টপোষক দলের পদ-স্খলন হইয়াছে!

বাস্তবিক কোন্ কূটমন্ত্রণা-প্রভাবে মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন্ ও তাঁহার সহযোগীগণ মিশরে শান্তিস্থাপনের নাম করিয়া এই ঘোর কলঙ্কিত যুদ্ধের অবতারণা করিলেন তাহা এখনও অনেকের নিকট গভীর রহস্যময় বোধ হইতেছে। যিনি ১৮৮০ খৃঃঅব্দে বৃটিশ মহাসভায় লর্ড্ বেকন্স্‌ফিল্‌ড্ অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত ক্রিমিয়া ও কাবুল যুদ্ধের সুতীব্র সমালোচনা করিয়া জ্বলন্ত ভাষায় যুদ্ধের অসারতা ও যুদ্ধনিবন্ধন নর-শোণিত-পাতের গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সভ্যসমাজের অযুত নর-নারীর আন্তরিক অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর পরেই তিনি বৃটিশ মন্ত্রীভবনের

শীর্ষ-স্থানে থাকিয়া কি বুঝিয়া কোন প্রাণে মিসরযুদ্ধে কোটি কোটি মুদ্রা ও সহস্র সহস্র প্রাণী-বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তাহার প্রকৃত উত্তর তিনি ভিন্ন আর কে দান করিতে সমর্থ? যখন এই যুদ্ধের আন্দোলনে ইংলণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল তখন বৃটিশ জাতির প্রকৃত গৌরব, ধর্ম্মবীর ব্রাইট্ এই যুদ্ধের দূষিত নীতির প্রতিবাদ ও মতের অনৈক্য নিবন্ধন স্বকীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের কি অদ্ভুত মহত্ত্ব ও অপরূপ চারুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার তদানীন্তন হৃদয়োচ্ছ্বাস * এখনও সভ্যজগতের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে গম্ভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

মহাত্মা ব্রাইট্ পদত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ড মিশরযুদ্ধে মাতিয়া উঠিল এবং বিনা কারণে আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া নগর ধ্বংশ করিয়া মিসর সমরের অবতারণা করিল। মিশরের হতভাগ্য উৎপীড়িত ফিলাহিন সম্প্রদায়ের সুদক্ষ নেতা আরবী পাশা স্বদেশের শাসনপ্রণালীর পঙ্কোদ্ধার ও স্বজাতির দুর্গতি মোচন করিবার জন্য মিশরের ভীরু ও অত্যাচারী খেদিব তৌফিক পাশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল জ্বালাইয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার আশা তিনি এক দিনের জন্যও হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই। বড় ক্ষোভেব বিষয়, বড় লজ্জার বিষয় এই যে স্বাধীনতার চিরবন্ধু বৃটিশ জাতি সে বিদ্রোহের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া, —বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, মিশরস্থিত স্বজাতীয় ও ইয়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশীয় ক্ষুদ্রচেতা অত্যাচারী উত্তমর্ণদিগের নিকৃষ্ট বাসনার চরিতার্থতা হেতু আরবীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া, কেসাসিন্ ও কেরো সমরে তাঁহার বল ও দর্পচূর্ণ এবং তেলালকবির

* The house knows that for *40 years at least I have endeavoured to teach my countrymen an opinion and doctrine which I hold—namely, that the moral law is intended not only for individual life but for the life and practice of States in their dealings with another. I think that in the present case there has been a manifest violation both of international law and of the moral law, and, therefore it is impossible for me to give my support to it. I cannot repudiate what I have preached and taught during the period of a rather long political life. I cannot turn my back upon myself and deny all that I have taught to many thousands of others during the 40 years that I have been permitted at public meetings and in this house to address to my countrymen! Only one word more: I asked my calm judgment and sound conscience what was the part I ought to take. They pointed it to me, as I think, with unerring finger, and I am endeavouring to follow it!"

যুদ্ধে বীর-প্রসবিনী ভারতের প্রবল পরাক্রমশালী শিখসৈন্যের সহায়তায় তাঁহার শেষআশা দলিত ও তাঁহাকে জন্মের মত বন্দী করিলেন। তেলালকাবিরের যুদ্ধের অবসানে লোকে ভাবিল মিশরযুদ্ধ শেষ হইল। মিশরের স্বদেশানুরাগী বীরগণ ধৃত ও শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া কেহ বধ্যভূমিতে নিহত কেহ বা প্রিয় জন্মভূমি হইতে চির-জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল। মিশরের প্রিয় সন্তান আরবী, মহাত্মা ব্রড্‌লী ও সার উইল্‌ফ্রেড্‌ব্লুণ্টের সহায়তায় ফাঁসী কাষ্ঠ হইতে জীবন রক্ষা করিয়া স্বদেশ হইতে সুদূর সিংহলে নির্ব্বাসিত হইলেন। বিজয়ী বৃটিশসেনা উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া খেদিব ও নগরবাসীগণের সমক্ষে আপন আপন রণকৌশল ও বৃটেনিয়ার বাহুবলের জীবন্ত পরিচয় দান করিয়া কতই সম্মান লাভ করিল। কত লোকে আশা করিল অতঃপর মিশরে সুশাসন ও শান্তি সংস্থাপিত হইবে! কিন্তু হায়, মিশরে আর শান্তি দেখা দিল না! মিশরের প্রজ্জ্বলিত সমরানল ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু হতভাগ্য মিশরবাসীগণের হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যে মহাঅগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল আর তাহা নিভিল না! দীর্ঘকালের ঘোর অত্যাচার ও উৎপীড়নের নিদারুণ কশাঘাতে যে অধঃপতিত জাতি একবার হৃদয়ে অসহ্য যাতনা অনুভব করিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছে—স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে একবার যাহাদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কার সাধ্য অস্ত্রবলে সে জাতির হৃদয়ের তেজ নির্ব্বাপিত করিবে? সেই স্বর্গীয় তেজ হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে পোষণ করিয়া যখন তাহারা এক-প্রাণতায় মিলিত হয় এবং অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে স্বদেশ উদ্ধারার্থে প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র ধারণ করে, তখন সেই ভীমপরাক্রমশালী জাতির ক্ষমতা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে—ভীষণ বেয়-ণেট ও বিশ্বগ্রাসী কামানের সম্মুখেও তাহাদের হৃদয়ের তেজ নিষ্প্রভ হয় না! এই মহান্ তেজ হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া আমেরিকা একদিন সমগ্র পৃথিবীর চক্ষের উপর কি ভীষণ রুদ্রতালে নৃত্য করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব-বলে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই মহান্ তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া পুণ্যভূমি ইটালী আবার সেদিন স্বাধীনতার পবিত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছে। এই মহান্ তেজে উত্তেজিত হইয়াই পদদলিত নিরক্ষর মিশরবাসীগণ ক্ষণ-জন্মা আরবীর ইঙ্গিতমাত্রে পরিচালিত হইয়া মিশরে স্বাধীনতার সমর ঘোষণা করিয়াছিল; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে অপর এক বিজাতীয় প্রবলশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া অভীষ্টলাভে সমর্থ হইল না। আরবীর দল পরাজিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় পরাজিত হইল না। তাহাদের হৃদয়-নিহিত জ্বলন্ত অগ্নি আর একটি ভীষণতর সমরানলে পর্য্যবসিত হইবার জন্য প্রচ্ছন্নবেশে প্রখর তেজে জ্বলিতে লাগিল। তাহাদের হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি বর্ত্তমান সুদানযুদ্ধের আদি-কারণ না হইলেও একটি প্রধান কারণ।

আরবী পাশা আজি তাঁহার জন্মভূমির স্নেহের ক্রোড় হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত। অনেক স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রমনা বিদেশীয় লেখক পাপ ও কলঙ্কের দুর্গন্ধময় কালিমায় তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বার্থ ও ক্ষুদ্রত্বের সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। দুর্ব্বল প্রবলের পদতলে বিদলিত, তাহার হৃদয়ের স্বাধীনতা অপহৃত, তাহার সারসর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত, সংক্ষেপতঃ তাহাকে পশুবৎ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখিলে যাঁহাদের চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রুবিগলিত হয় তাঁহারা স্বাধীনতা-প্রিয় আরবীর চরিত্রে কলঙ্কারোপ দৃষ্টে নিতান্ত ব্যথিত হইবেন। মহাত্মা ব্রড্‌লী ও বুণ্ট আরবীর চরিত্র উজ্জ্বল অক্ষরে সুরঞ্জিত করিয়া স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই প্রগাঢ় ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। আরবী একজন দরিদ্র সন্তান হইয়াও ঈশ্বরের অনুগ্রহে, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মহোচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের প্রভাত সময়ে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বজাতির কল্যাণের নিমিত্ত স্বদেশের এক সীমা হইতে সীমান্তরে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া স্বদেশবাসী অযুত নরনারীর হৃদয়ে যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ড আপনার এবং প্রতিবাসী ফ্রান্সের ক্ষুদ্র স্বার্থমোহে অন্ধ হইয়া সেই জ্বলন্ত বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; উহার ফল পরিণামে বিষময় হইয়া দাঁড়াইল! আরবীর পরাজয় ও নির্ব্বাসনে তাঁহার দল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নবতেজ ও নব উৎসাহে আর একটি নব অভিনয়ের অনুষ্ঠানে সকলে দলে দলে সূদানে একটি নূতন দলে মিলিত হইতে লাগিল। উহার পর এক বৎসর গত হইতে না হইতেই সমালোচ্য সূদান সমরের উদ্যোগ করিল। আজি সূদান সমরে তাহারাই দেশের প্রধান অবলম্বন।

ইংলণ্ড মিশরযুদ্ধের পরিবর্ত্তে যদি মিশরীদিগের প্রধান অধিনায়ক আরবী পাশা ও তাঁহার সহযোগীগণের হৃদয়ের বাসনা জানিতেন এবং তদনুসারে মিসরে সুশাসন ও শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে মিসর যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পাইত না, এবং তাহা হইলে আজি আবার এই বিষম বিপদজনক সূদানযুদ্ধের কারণ ঘটিত না। প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমরা ভারতীর প্রিয় পাঠক-সমাজে মিশরযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার দিয়াছি। আজি পুনরায় তাঁহাদিগকে সূদান সমর-বিবরণ উপহার দিতে আসিলাম। সূদান তুর্কীর সুলতানের অধীনস্থ মিশররাজের রাজ্য। প্রায় ২৫ বৎসর হইতে মিশরের অন্যান্য দেশের ন্যায় সূদানেও অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে। সুয়েজখাল-খননের অব্যবহিত পর হইতেই ইয়ুরোপীয় প্রবল জাতিগণের উৎপীড়নে মিশর গবর্ণমেণ্টের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়াছে। মিশরের ভূতপূর্ব্ব খেদিব ভীরু ইস্মাইল্ পাশার শাসন কালে মিশরের প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছিল! এই দুর্ব্বহ ঋণভার হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য রাজ্যের

সর্ব্বত্র অযথা করস্থাপন প্রভৃতি অশেষবিধ উপায়ে প্রজাপীড়ন করিয়া খেদিব সমস্ত প্রজাবর্গের অনুরাগ হারাইলেন। ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালিয়ানগণ মিশর গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কাজগুলি অধিকার করিয়া দেশীয় লোকদিগের প্রতি যথেচ্ছাচার প্রদর্শনে তাহাদিগকে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পরিণত করিলেন। নিষ্ঠুর মহাজনগণের সুদের দায়ে মিশর গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বৈদেশিক কর্ম্মচারীগণের বেতন দিতে মিশরের সমস্ত আয় নিঃশেষ হইয়া আসিল। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দিন দিন ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল। দেশীয় সাধারণ লোকসকল বলপূর্ব্বক বিনা বেতনে সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইতে লাগিল, তাহাদের সার সর্ব্বস্ব বিদেশীয়ের ভোগের ও বিলাসের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। এই সময় দেশের চারিদিকে ঘোর অশান্তি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের লক্ষণ উপস্থিত হইল। প্রবল ইংরেজের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতায় ইস্মাইল পাশা সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইলেন। দেশের দুর্গতি দূর হওয়া দূরে থাকুক বরং উহা শতশাখায় বিস্তৃত হইল—এই ভীষণ দুর্গতি দমনের জন্যই আরবী ও তালবা পাশা মিশরবাসীগণকে স্বাধীনতা-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময় সুদানেও উল্লিখিত কারণে অশান্তির স্রোত বহিতেছিল। আরবীর পরাজয়ে আস্‌মেৎ ও ওসমানের যত্নে উক্ত অশান্তি আজি কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে!—এতদিন সুদানে যে অশান্তি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল, এক্ষণে তাহা একজন সূত্রধারতনয় ফকিরের উদ্দীপনায় ভীষণ সমরে পরিণত হইয়াছে। একজন সংসার-বিরাগী স্বাধীনতা ও সাম্য-প্রিয়, ফকিরই এই যুদ্ধের প্রধান নেতা। এই ফকির বেশধারী মহাবীর কে? ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্প্রতি সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে; আমরাও এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিব।

ক্রমশঃ।

# সংস্কার রহস্য।

উপনেতব্য কুমারের শাস্ত্রীয় নাম "মানবক"। মানবক আচার্য্য সমীপস্থ হইলে পর আচার্য্য তাহাকে মৌঞ্জীমেখলা, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞোপবীত ও দণ্ড প্রদান করেন। মানবকও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করতঃ সেসমস্ত যথাবিধি গ্রহণ করেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মচারী-বেশা মানবক গুরু সমীপে "অধীহি ভো ব্রহ্ম" এই বলিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করেন। আচার্য্য তখন তাঁহাকে প্রথমতঃ সাবিত্রী উপদেশ করেন; অনন্তর শাস্ত্রোক্ত হোম কার্য্য করান। অনন্তর গুরু তাঁহাকে "ব্রহ্ম-

চর্য্যাদি, সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, মা দিবা স্বাপ্সীঃ, আপোশানং কর্ম্ম কুরু, আচার্য্যাধীনো বেদমধীষ্ব" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার অনুশাসন করিয়া সেই হইতেই তাঁহাকে প্রথমতঃ শৌচ ও সদাচার শিক্ষা করান এবং ক্রমে ক্রমে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। যতদিন না তাঁহার বেদগ্রহণ সমাপ্ত হয়, ততদিন তিনি অব্যাকুল চিত্তে গুরূপদিষ্ট ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম সকল প্রতিপালন করিতে থাকেন।

পরিধেয় ও উত্তরীয় সম্বন্ধে প্রত্যেক গ্রন্থে নিয়ম দৃষ্ট হয়। সংস্কার ময়ূখগ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটী গৃহ্যসূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা ;—

"অহতেন বা সদা সংবীতং ঐণেয়েন বা ব্রাহ্মণং
রৌরবেণ ক্ষত্রিয়ং আজেন বৈশ্যং যদি বাশংসি
বসীরন্ রক্তানি বসীরন্ কাষায়ং ব্রাহ্মণো
মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষত্রিয়ো হারিদ্রং বৈশ্য ইতি।"

ইহার সিদ্ধান্ত-অর্থ এই যে, মানবক-ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়ই হউন, ব্রাহ্মণই হউন, আর বৈশ্যই হউন, অহত-বস্ত্র ও উত্তরীয়-বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী কাষায় বস্ত্র, ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারী মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র, বৈশ্য-ব্রহ্মচারী হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র, পরিধান করিবেন। চর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী চিত্রমৃগের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারী রুরু-মৃগের চর্ম্ম, বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগ-চর্ম্ম পরিধান করিবেন। পারস্কর মুনি বলেন, এই সকল চর্ম্ম উত্তরীয় রূপে ধারণ করিবেক।

এখনকার ব্রাহ্মণেরা গোচর্ম্ম স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি অতি আদিমকালের ব্রাহ্মণেরা গোচর্ম্মকে সর্ব্ব চর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিতেন। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে মানবক ব্রহ্মচারীর গোচর্ম্মের উত্তরীয় করিবার ব্যবস্থা আছে এবং তদনুকূলে শ্রুতিও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

"সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং গব্য মজিনং বা উত্তরীয়ং ভবতি।

[ পারস্করীয় গৃহ্যসূত্র ভাষ্য দেখ।

ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, অভাবে সকল ব্যক্তিই (ব্রহ্মচারী দশায়) গোচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করিতে পারিবেন। ইহার পোষক-প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতি এই যে;

"তেবচ্ছায় পুরুষং গব্যোতাং ত্বচং অদধুঃ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনুমান হয় যে পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদিগের নিকট গোচর্ম্ম ঘৃণিত বা অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত না।

মেখলাধারণ সম্বন্ধেও নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—

"মৌঞ্জী রসনা ব্রাহ্মণস্য। ধনুর্জ্যা রাজন্যস্য। মৌর্ব্বী বৈশ্যস্য। মুঞ্জাভাবে কুশাশ্যন্তকবল্লজানাম্।

[ পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

মৌঞ্জী অর্থাৎ মুঞ্জ নামক তৃণের রজ্জু। এই রজ্জু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর ধারণীয়। ধনুর্জ্যা অর্থাৎ ধনুকের ছিলা ইহা ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারীর ধার্য্য; মুর্ব্বা একপ্রকার তৃণ-জাতীয় ক্ষুপ, তন্ময়ী রজ্জু বৈশ্য-ব্রহ্মচারীর ধারণীয়।

অভাব হইলে, ব্রাহ্মণেরা কুশ নির্ম্মিত মেখলা ধারণ করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা অমশুক তৃণের মেখলা পরিবেন, বৈশ্যেরা বল্লতৃণের মেখলা ধারণ করিবেন।

ব্রহ্মচারী হইলে দণ্ড (যষ্ঠি) গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই দণ্ড সকল বর্ণের সমান নহে; বর্ণভেদে দণ্ডভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—

"পালাশো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডো বৈল্বো রাজন্যস্য ঔডুম্বরো বৈশ্যস্য।"

[পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী পলাশদণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বিল্বদণ্ড, বৈশ্য ব্রহ্মচারী উডুম্বর (যজ্ঞডুম্বর) ধারণ করিবেন। ব্যবস্থাপক মনু বলেন,—

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈপ্পলৌডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ।"

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা বিল্বদণ্ড অথবা পলাশদণ্ড ধারণ করিবেন, ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী বটদণ্ড কিম্বা খদির কাষ্ঠের দণ্ড গ্রহণ করিবেন, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী অশ্বত্থ দণ্ড অথবা উডুম্বর দণ্ড গ্রহণ করিবেন।

"কেশসমিতো ব্রাহ্মণস্য। ললাটসম্মিতঃ ক্ষত্রিয়স্য। প্রাণসমিতো বৈশ্যস্য।"

[সংস্কার ময়ূখধৃত গৃহ্যসূত্র।

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী কেশপর্য্যন্ত অর্থাৎ পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ, এরূপ দণ্ড ধারণ করিবেন; ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী ললাট পর্য্যন্ত লম্বা দণ্ড গ্রহণ করিবেন; এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী নাসা পর্য্যন্ত লম্বা দণ্ড বহন করিবেন।

ব্রহ্মচারী-ধার্য্য যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধেও নিয়ম আছে। যথাঃ—

"কার্পাস মুপবীতংস্যাৎ বিপ্রস্যার্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণ সূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক মুচ্যতে॥"

ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞোপবীত শণ-সূত্র নির্ম্মিত, এবং বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত মেষলোম নির্ম্মিত। এই সকল উপবীত ত্রিগুণীকৃত ত্রিতন্তুর দ্বারা প্রস্তুত করিবেক এবং তাহাতে গোত্র প্রবরানুসারে গ্রন্থি প্রদান করিবেক। শাস্ত্র এই, কিন্তু এখনকার ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্পাস-সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিয়া থাকেন। কি কারণে তাঁহারা এরূপ অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

উপবীত প্রস্তুত সম্বন্ধে সংস্কার ময়ূখ গ্রন্থে অনেক নিয়ম লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

"দেবালয়েহথবা গোষ্ঠে নদ্যাং বান্যত্র বা শুচৌ।
সাবিত্র্যা ত্রিবৃতং কুর্য্যাৎ নবসূত্রস্তু তন্তুবেৎ॥"
"হরিব্রহ্মশ্বয়েভ্যশ্চ প্রণম্য বদধাত্যথ।
যজ্ঞোপবীত মিত্যাদি ব্যাহৃত্যা চাপিধারয়েৎ॥
"যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত সূত্রাণি নচ তন্তবঃ।"

[ইত্যাদি।

দেবালয়ে, গোষ্ঠে, নদীতীরে, কিম্বা অন্য পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিগুণিত করিবেক; তাহা হইলে নবগুণিত হইবেক। ধারণের সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার করিবেক এবং "যজ্ঞোপবীতং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র ও ব্যাহৃতি-ত্রয় পাঠ করিবেক।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন।

# গোঁড়গীত।

ফাল্গুণের ভারতীর পর।

## তৃতীয়ভাগ।

### লিঙ্গোর পুনর্জ্জীবন এবং গোঁড়দিগের উদ্ধার।

লিঙ্গোর শুনিয়া মৃত্যু দেব ভগবান,
দূতহাতে প্রেরিলেন অমৃত ত্বরিত।
অমৃত সিঞ্চনে লিঙ্গো পাইয়া জীবন,
জিজ্ঞাসিল দূতে,"কোথা ভাই সব মোর ?"
"সে শঠ ভ্রাতার কথা করোনা জিজ্ঞাসা ;
সাধিয়াছে নিদারুণ শত্রুতা তাহারা ;
জীবন হরিয়াছিল তাহারা তোমার ;
অমৃতের বলে প্রাণ পেয়েছ আবার।
কোথায় যাইবে লিঙ্গো বল তা এখন।"
দূতের শুনিয়া কথা বলে গুরুবর,
"যাব আমি আছে যথা বন্দী গোঁড়গণ।" *
গহন কাননে লিঙ্গো চলিতে লাগিল,
উদ্ধারিতে গোঁড়-কুল সঙ্কল্প তাহার।
আসিল রজনী ঘোর-তিমির-বসনা ;
বিচরে উল্লাসে ব্যাঘ্র খাদ্যের উদ্দেশে ;
কুক্কুট ছাড়িল ডাক, ডাকিল ময়ুর,
শৃগালের রবে বন হইল পূরিত ;
ব্যাঘ্র-ভয়ে বৃক্ষোপরে লিঙ্গোর বিশ্রাম।
নিশা অবসানে পুনঃ ডাকিল কুক্কুট ;
রক্তিমে রঞ্জিত পূর্ব্বে শোভিল অম্বর ;
বৃক্ষহতে নামি তবে লিঙ্গো নরবর,
করপুটে প্রণমিয়া জিজ্ঞাসে সূর্য়ে,—
"কারারুদ্ধ কোথা, দেব, জান গোঁড়গণ ?"
লিঙ্গোর শুনিয়া প্রশ্ন উত্তরে তপন,
"ব্যস্ত থাকি সারাদিন ঈশ্বরের কাযে,
নাহি জানি, লিঙ্গো, তব গোঁড়ের বারতা।"
চলিতে চলিতে লিঙ্গো ভেটিলেক ঋষি,
নাম কুমায়ত তার, জিজ্ঞাসিল তারে
লিঙ্গো গোঁড়ের বারতা। উত্তরিল ঋষি,—
"গদ্দর্ভ সমান গোঁড় অত্যন্ত নির্ব্বোধ,
অতি হেয়, খাদ্য যার বিড়াল মূষিক,
শূকর, মহিষ আরো নাম লব কত।
ধবলাগিরির এক গুহার ভিতর,
বন্দী এবে তারা সবে ; দৈত্য ভস্মাসুর
প্রহরী তথায় মহাদেবের আদেশে।"
গোঁড়ের উদ্ধার শুনি মহাদেব হাতে,
তুষিতে শিবেরে লিঙ্গো আরম্ভিল তপ।
সাধিল দ্বাদশমাস সে তপ কঠোর ;
নড়িল ধবলাগিরি তাহার প্রভাবে,
নড়িল কনকাসন পিনাক-পানির।
কোন্ সাধু রত হেন সুকঠোর তপে ?
চিন্তিল ধূর্জ্জটী হেন ; হইল বিস্মিত ;
নিষ্ক্রমিল সেইক্ষণে সাধু অন্বেষণে।
আসিয়া লিঙ্গোর কাছে, দেখিল তাহার
অস্থি-চর্ম্ম-সার, দেহে নাহি মাংসলেশ।

* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাদেবের আজ্ঞায় সমুদয় গোঁড় (চারিজন ব্যতীত) ধবলাগিরিতে কারাবদ্ধ।

জিজ্ঞাসিল তারে দেব, "কি তব কামনা ?"
উত্তরিল সবিনয়ে তবে গুরুবর,—
"ছাড়ি দেও গৌড়গণে, এই ভিক্ষা মোর।"
শুনিয়া গৌড়ের কথা বলে মহাদেব,
"গৌড় ছাড়া আর কিছু চাহ সাধুবর,
রাজত্ব, বিপুল ধন, যাহা ইচ্ছা যায়।"
লিঙ্গোর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রহিল অটল ;
"না চাহি কিছুই আর, চাহিমাত্র গৌড়।"
এতশুনি মহাদেব ভকতবৎসল,
গৌড়কে করিতে মুক্ত দেন অনুমতি।

পিনাকপাণির আজ্ঞা শুনি নারায়ণ, †
বিষণ্ণবদনে বলে সম্ভাষি শিবেরে ;
"ভাল ছিল, বন্দী গৌড় মরিত যদ্যপি,
হইতাম সুখী বড় আমরা সকলে।
বাহির হইলে গৌড়, আচরিবে পুন,
পূর্ব্বের মতন ; কাক, শকুনী গৃধিনী,
খাইবে অখাদ্য কত ; আবার দুর্গন্ধে
পূরিবে ধবলাগিরি।" উত্তরিল শিব,
"প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা, না হয় অন্যথা।"
এতশুনি নারায়ণ চিন্তিল উপায়,—
"বিন্দোনামে আছে পক্ষী সমুদ্রের তীরে,
আনিতে যদ্যপি পার শাবক তাহার,
পাইবেক মুক্তি, লিঙ্গো, তবে গৌড়গণ।"
"তথাস্তু" চলিল লিঙ্গো সাগর সন্নিধে ;
হেরিল তথায় পক্ষীশাবক দুইটী।
বড় ভয়ঙ্কর সেই বিন্দো বিহঙ্গম ;
বিনাশি গজেন্দ্র, চক্ষু খাইত তাহার,
মাথার মগজ আনি দিইত শাবকে।

বিহঙ্গ বিহঙ্গী গেছে খাদ্য অন্বেষণে,
কুলায় শাবকে লিঙ্গো পাইল দেখিতে ;
মনে মনে বিবেচিল ধার্ম্মিক প্রবর,—
লয়ে যাই যদি এবে বিন্দোর শাবক,
তস্করের পাপে আমি হব কলুষিত ;
অতএব যতক্ষণ বিহঙ্গ বিহঙ্গী
নাহিক আইসে ফিরি, রহিব হেথায়।
হেন কালে নাগ এক ভীষণ মূরতি,
স্থূল যেন বৃক্ষগুঁড়ী, বিস্তারিয়া ফণা,
সমুদ্র হইতে আসি হেলিয়া দুলিয়া,
ভক্ষিতে শাবকদ্বয়ে হয় অগ্রসর।
ত্রাসিত তাহারা উচ্চে করিল ক্রন্দন।
যোজিয়া ধনুকে লিঙ্গো তীক্ষ্ণ শর তবে,
নাশি নাগে সপ্তখণ্ড করিল তাহায়।
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী এমন সময়ে,
প্রত্যাগত বন হতে খাদ্য নানা লয়ে।
জননী হস্তীর ওষ্ঠ আর চক্ষুদ্বয়
সযত্নে সন্তানে দেয় ভক্ষণের তরে।
নাহি খায় বাছা কিন্তু কিছুই তাহার ;
তাহা দেখি জননীর উপজিল দুঃখ ;
সম্ভাষি স্বামীকে তবে বলিতে লাগিল,—
"না জানি খায় না বাছা কিসের লাগিয়া ;
বুঝিবা দিয়াছে দৃষ্টি কোন দুষ্ট জন।"
প্রিয়ার বচন শুনি বলে বিন্দো পক্ষী,
"দেখহ মনুষ্য এক বসি বৃক্ষতলে,
মারিলে মধুর খাদ্য হবে বাছাদের।"
শুনিয়া পিতার কথা বলিছে শাবক,—
"একাকী মোদিগে হেথা রাখিয়া তোমরা,
অরণ্যে চলিয়া যাও খাদ্য অন্বেষণে ;
কে করিবে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ?
সমুদ্র হইতে নাগ এসেছিল এক ;

† এই "নারায়ণ" বিষ্ণু নহেন। গৌড়-কবি প্রসিদ্ধ হিন্দুদেবের নামে মহাদেবের কোন সঙ্গীকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি না থাকিত অই মনুষ্য হেথায়,
যাইত নাগের হাতে জীবন নিশ্চয়।
ভোজন করাও অগ্রে জীবনরক্ষকে ;
তার পর খাদ্য মোরা খাইব হরিষে।"
বিহঙ্গিনী শুনি তবে শাবক বচন,
উতরিয়া দ্রুতগতি লিঙ্গোর সদন,
হেরিল সপত খণ্ডে নাশিত ভুজঙ্গ।
সকৃতজ্ঞে বলে তবে লিঙ্গো সাধুবরে,—
"সাতবার করিয়াছি সন্তান প্রসব,
সাতবার নিঃসন্তান করিয়াছে নাগ ;
যদি না থাকিতে আজ, নরশ্রেষ্ঠ, হেথা,
হারাইত অভাগিনী আজিকে শাবক।
উঠ, ভাই, উঠ পিতা, বল কোথা হতে •
আসিয়াছ তুমি, কিবা বাসনা তোমার"
উত্তারল লিঙ্গো "যোগী আমি শুন, বিন্দো,
শাবক লইতে তব এসেছিনু হেথা।"
লিঙ্গোর বাসনা শুনি কাঁদয়ে বিহঙ্গী,—
"যাহা চাও তাহা দিব, কিন্তু এমিনতি,
চাহিওনা বাছাদিগে লয়ে যেতে সাধু।"
বিহঙ্গীর কান্না দেখি আশ্বাসিল লিঙ্গো,
"দেখাইতে মাত্র শিবে লইব শাবক।"
লিঙ্গোর বচন শুনি আনন্দিত বিন্দো ;
"দেখাইতে মহাদেবে শাবক আমার,
সানন্দে তোমায় সঙ্গে যাব সাধুবর।"
এত বলি বিহঙ্গমী পক্ষের উপর,
লইল লিঙ্গোকে আর শাবক তাহার।
তাহা দেখি বিবেচিল বিন্দো বিহঙ্গম,—
একাকী এ শূন্য গৃহে কি ফল থাকিয়া ;
সম্বোধি লিঙ্গোকে তবে বলিল বিহঙ্গ,—
"সূর্য্যের উত্তাপে কষ্ট পাবে সাধুবর,
অতএব যাব আমি আবরি তোমায়।"
বিন্দো সঙ্গে দেখি লিঙ্গো মহাদেব বলে,
"লিঙ্গোর অসাধ্য ক্রিয়া নাহিক জগতে,
জানিতাম লিঙ্গো লয়ে আসিবে শাবক।
লয়ে যাও গৌড় তব দিনু অনুমতি।"
কারামুক্ত গৌড় তবে হইয়া বাহির,
প্রণমিয়া বলে "লিঙ্গো, গৌড়ের রক্ষক,
তোমা বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।"

## চতুর্থ ভাগ।

### গোঁড়দিগের গোত্র বিভাগ ও দেবতা পূজা।

কাটিয়া জঙ্গল গোঁড় নিরমিল গৃহ,
ক্রমশ হইল গ্রাম "নরভূমি" নাম।
ক্রমশ তথায় হাট বসিতে লাগিল ;
ক্রমশ কৃষক পায় বলদ, শকট। *
একদা লিঙ্গোকে বেষ্টি বসিয়াছে সবে,
সম্বোধি তাদিগে গুরু বলিতে লাগিল,—
"না বুঝ কিছুই শুন, হে গোঁড়, তোমরা;
না জান কে ভাই, নাহি জান পিতা কেবা ;
নাহি জান কার সনে বিবাহ বিধেয়। "
উত্তরিল নম্রভাবে সভাস্থ সকলে,—
"সত্য কথা বলিয়াছ, গুণের সাগর!
তোমার মতন জ্ঞান আছে বল কার ?

---

* অর্দ্ধসভ্য প্রদেশে রীতিমত বাজার থাকে না ; কোন বড়গোছের গ্রামে নির্দ্দিষ্ট দিনে হাট হয়। সেই হাটে নিকটস্থ পল্লী-সমূহের স্ত্রীপুরুষেরা ক্রয় বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

কৃষিকার্য্যের প্রথমাবস্থায় বলদের প্রয়োজন করে না, (গত মাঘমাসের "ভারতী" দেখ)। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল ও বলদ ব্যবহৃত হয়।

জাতিতে বিভাগ লিঙ্গো কর আমাদিগে।"
লিঙ্গোর আদেশে গোঁড় হয় অষ্ট গোত্র।
অতঃপর বলে লিঙ্গো,"শুন ভাইগণ!
"ঈশ্বরের কভু মোরা না পাই দর্শন;
অতএব এস মোরা নির্ম্মিব দেবতা,
সকলে মিলিয়া পূজা করিব তাঁহার।"
একস্বরে গোঁড় সবে দিইলে সম্মতি,
লিঙ্গো বলে, "আন হেথা ছাগের শাবক,
আনহ মোরগ এক, গাভি বৎস আর।
রচিবেক কর্ম্মকার লৌহের মূরতি,
ফর্শাপেন নাম সেই পাইবে দেবতা;
আহরি অরণ্য হতে আন কাষ্ঠখণ্ড,
কাষ্ঠদেব বলি তারে পূজিবে সকলে;
দেবতা আরেক শুন ঘণ্টার শৃঙ্খল,
চামর হইবে শুন দেবতা চতুর্থ।" †

ইহার পর দেবতাদিগের পূজা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার প্রধান অঙ্গ মদ্যপান, আমোদ প্রমোদ ও বলিদান। পঞ্চম খণ্ডে গোঁড়কবি বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। এসকল বিষয় পাঠকের নিকট সম্ভবত নীরস [বোধ হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।]

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালবাসা দিয়া জড়ান। কত যুগযুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারিদিকে তাহাদের ভালবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যে টুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সে টুকুকে কতই ভালবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারিদিকে গাছটি পালাটি, ছেলেটি, গরুটি, তাহার ভালবাসার কত জিনিষপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেইটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মত মূর্ত্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মত কেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়! ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালবাসে, প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়! যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে, দেখিতে দেখিতে সেই

† গোঁড়ের ন্যায় অসভ্য জাতির দেবতা সমূহের এরূপ উৎপত্তি কতকটা হাস্যজনক হইলেও শিক্ষাদায়ক।

স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ চলিয়া যায় কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ভালবাসিয়া যে গাছটি রোপণ করিয়াছিল সে গাছটি রহিয়া গেছে, তাহার ঘরবাড়িটি আছে, ভালবাসিয়া সে কত কাজ করিয়াছে সে কাজগুলি আছে—জয়দেব তাঁহার কেন্দুবিল্বগ্রামের, তমালবনে বসিয়া ভালবাসিয়া কতদিন মেঘের দিকে চাহিয়া গিয়াছেন, তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সেই বহুদিনসঞ্চিত ভালবাসা একটি গানের ছত্রে রাখিয়া গিয়াছেন—মেঘৈর্মেদুরমম্বর মম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শতসহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শতসহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে, আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।

২

আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত। আমাদের এক-এক জনের মধ্যে অতীত কালের কত কোটি কোটি মাতার মাতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি পিতার পিতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি মনুষ্যের প্রণয় প্রেম সৌভ্রাত্র পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কত বিস্মৃত যুগযুগান্তর আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত। তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সময়েও "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু" দেখা যাইত, তখন এমন অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করি! তখন আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনুভব করিতে পাই, তাঁহাদের সেই মেঘ-দেখার সুখ আমাদের আপনাদের মধ্যে লাভ করি, বুঝিতে পারি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা গেছেন তাঁহারাও আছেন।

৩

মানুষের প্রেম যেন জড়পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। নূতন বাড়ির চেয়ে যে বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কি মাহাত্ম্য আছে! মানুষের প্রেম যেন তাহার হঁটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহুদিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শত সহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘজীবন, আমাদের শত সহস্র বৎসর পরমায়ু।

৪

ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের কাছে ঐ প্রাচীন নারিকেল গাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখনি ঐ গাছগুলিকে দেখি তখনি উহাদিগকে রহস্য-পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহারা যেন অনেক কথা জানে! তা নহিলে উহারা অমন নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে কেন? বাতাসে অমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতেছে কেন? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সময়ে উহাদের মাথার উপরকার ডালপালার মধ্যে অমন অন্ধকার কেন? গাছেরা বাস্তবিক রহস্যময়! উহারা যেন বহুদিন দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছে! এ পৃথিবীতে সকলেই আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু আনাগোনার রহস্য কেহই ভেদ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের মত যাহারা মাঝখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাই যেন এই অবিশ্রাম আনাগোনার রহস্য জানে। চারিদিকে কত-কে আসিতেছে যাইতেছে উহারা সমস্তই দেখিতেছে, বর্ষার ধারায়, সূর্য্য কিরণে, চন্দ্রালোকে আপনার গাম্ভীর্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

৫

ছেলেবেলায় এককালে যাহারা এই গাছের তলায় খেলা করিয়াছে, যাহাদের খেলা একেবারে সাঙ্গ হইয়া গেছে, আজ এ গাছ তাহাদের কথা কিছুই বলিতেছে না কেন? আরও কত দ্বিপ্রহর রাত্রে এমনি ভাঙ্গা মেঘের মধ্য হইতে ভাঙ্গা চাঁদের আলো নিদ্রাকুল নেত্রে পরাজিত চেতনার মত অন্ধকারের এখানে সেখানে একটু আধটু জড়াইয়া যাইতেছিল; তেমন রাত্রে কেহ কেহ এই জানলা হইতে নিদ্রাহীন নেত্রে ঐ রহস্যময় বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল, সে কথা ইহারা আজ মানিতেছে না কেন? সে যে কি ভাবে কি মনে করিয়া জীবনের কোন্ কাজের মধ্যে থাকিয়া ঐ গাছের দিকে,—গাছ অতিক্রম করিয়া ঐ আকাশের দিকে—চাহিয়াছিল, ঐ গাছে ঐ আকাশে তাহার কোন আভাসই পাই না কেন? যেন এমন জ্যোৎস্না আজ প্রথম হইয়াছে, যেন এ বাতায়ন হইতে আমিই উহাদিগকে আজ প্রথম দেখিতেছি, যেন কোন মানুষের জীবনের কোন কাহিনীর সহিত এ গাছ জড়িত নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়! ঐ দেখ, উহারা যেন দীর্ঘ হইয়া মেঘের দিকে মাথা তুলিয়া সেই দূর অতীতের পানেই চাহিয়া আছে! উহাদের ধীর গম্ভীর ঝর ঝর শব্দে সেই প্রাচীন কালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে, আমিই কেবল সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখদুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে, আমিই কেবল সেই দৃষ্টির বিনিময় দেখিতে পাইতেছি না! আজিকার এই জ্যোৎস্নারাত্রির মধ্যে এমন কত রাত্রি আছে; তাহাদের কত আলো-আঁধার লইয়া এই গাছের চারিদিকে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ঐ ছায়ালোকে বেষ্টিত স্তব্ধ প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

৬

শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এতদিন জগৎসংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিষ আমাদের মাথার উপর ভারের মত চাপিয়া ছিল, আজ শোকের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া যায়। চন্দ্র সূর্য্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিষের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করি যে, আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা ত বন্ধন নহে, তাহা ত লূতা-তন্তুর মত বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখদুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারিদিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব; এত দিন আমরা বাড়ি-ঘর দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেই জন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতাম তাহারা তত পর নহে, এই জন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন আমার চারিদিকে একটা গণ্ডী আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখি সেটা কিছুই নহে, গণ্ডীর ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমনি। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

৭

সচরাচর লোকে মাকড়ষার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরাণো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেঁড়ে এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের বন্ধন জড়াইতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে সেখানকার চন্দ্র সূর্য্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখান-

কার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে আমরা মস্ত হইয়া বিরাজ করি। কাছে একটা কিছু পাইলেই হইল। এমনি আমরা মাকড়ষার জাতি!

৮

সংসারে লিপ্ত না থাকিলে তবেই ভালরূপে সংসারের কাজ করা যায়। নহিলে চোখে ধূলা লাগে, হৃদয়ে আঘাত লাগে, পায়ে বাধা লাগে। মহৎ লোকেরা আপন আপন মহত্বের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া থাকেন, চারিদিকের ছোটখাট খুঁটিনাটি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান। ক্ষুদ্র সকল বৃহৎ হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহাদের বৃহত্ব বশতঃ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন আছেন বলিয়াই চতুর্দ্দিকের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত মমতা আছে। যে ব্যক্তি সংসারের আবর্ত্তের মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে, সে কেবল আপনার সহিত পরের সম্বন্ধ দেখিতে পায়, কিন্তু মহৎ যে সে আপনা হইতে বিযুক্ত করিয়া পরকে দেখিতে পায়, এই জন্য পরকে সেই বুঝিতে পারে। কাজ সেই করিতে পারে। হাতের শৃঙ্খল সেই ছিঁড়িয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে যে ব্যক্তি সহস্র ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিতে না পারে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র উঁচুনীচুতে যাহার পা বাধিয়া যায় সে আর চলিবে কি করিয়া! সংসারের সুখে দুঃখে যাহারা ভারাক্রান্ত, সংসারপথের প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমি তাহাদিগকে মাড়াইয়া চলিতে হয়। এই জন্য ঘর হইতে আঙ্গিনা তাহাদের বিদেশ, আপনার সাড়ে তিন হাতের বাহিরে তাহাদের পর। এই জন্য তাহারা দূর দেশের কথা, জগতের বৃহত্বের কথা, সত্যের অসীমত্বের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আপনার খোলষটির মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস বদ্ধ। অসীম জগৎসংসারের অপেক্ষা আপনার চারিদিকের বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের নিকট অধিক সত্য।

শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হই। এই জন্য শোকে আমরা মহত্ব উপার্জ্জন করি। এই জন্য বিধবারা মহৎ। এই জন্য বিধবারা সংসারের কাজ অধিক করিতে পারে।

৯

মানুষের মধ্যে উদারতা এবং সঙ্কীর্ণতা দুই থাকা চাই, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। উদারতা এবং সঙ্কীর্ণতার মিলনে জগত সৃষ্ট। অসীম ভাব সীমাবদ্ধ আকারে প্রকাশ হওয়ার অর্থই জগৎ। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু, একত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ জীবন। অর্থাৎ, পঞ্চ একে পরিণত হওয়া, বৃহৎ ক্ষুদ্রে পরিণত হওয়াই সৃষ্টি। অতএব একাধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, উদারতা সঙ্কীর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রকৃতিতে আকর্ষণ বিকর্ষণ মেলামেশা করিয়া থাকে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি একসঙ্গে কাজ করে, ঐক্য

এবং অনৈক্য এক গৃহে বাস করে। দুই বিপরীতের মিলনই এই বিশ্ব। মনুষ্য এই বিশ্ব-নিয়মের বাহিরে থাকে না। মনুষ্যও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মিলনস্থল। মনুষ্য, আপনাত্ব না থাকিলে, পরের দিকে যাইতে পারে না, সীমাবদ্ধ না হইলে সে অসীমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, অনন্তকালে থাকিলে সে কোনকালে হইতেই পারিত না।

১০

আমরা বদ্ধ না হইলে মুক্ত হইতে পাই না। ইংরাজিতে যাহাকে Freedom বলে তাহা আমাদের নাই, বাঙ্গলায় যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলে। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যাহার গৃহ নাই, তাহাকে কখন গাছতলে, কখন মাঠে, কখন খড়ের গাদায়, কখন দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় লইতে হয়; যাহার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নহে; তাহার এক ধ্রুব আশ্রয় আছে। যে নৌকা হালের অধীন নহে সে কিছু স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু হিল্লোলের অধীনতায় দশদিকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব, স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নহে, স্বাধীনতার অর্থ নোঙরের শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া রাখা।

১১

যাহাদের সহিত চোখের দেখা মুখের আলাপ মাত্র, তাহাদের সহিত আমরা চিরদিন নির্ব্বিরোধে কাটাইয়া দিতে পারি বিবাদ হইলেও তাহার পর দিন আবার তাহাদের সহিত হাস্যমুখে কথা কওয়া যায়, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা যায়। কিন্তু যেখানে গভীর প্রেম ছিল, সেখানে যদি বিচ্ছেদ হয় ত হাসিমুখে কথা কহা আর চলে না, ভদ্রতা রক্ষা আর হয় না। অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর জীবের গাত্রে একটা আঁচড় লাগিলে সে মরিয়া যায় আর নিকৃষ্ট পুরুভুজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খেলাইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট প্রেমের বন্ধনও এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে।

১২

অনেক বড় মানুষ দেখা যায় তাহারা ক্রমাগত আপনাদের চারিদিকে বিপুল মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, অতিশয় স্ফীত হইয়া সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আমার ত বোধ হয় এইরূপ বিপুল স্ফীতির যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। এরূপ প্রচুর মাংসস্তূপ, প্রকাণ্ড জড়তা ও অসাড়তা এখনকার দিনের উপযোগী নহে। এককালে ম্যামথ্ ম্যাষ্টডন্, হস্তিকায় ভেক, প্রকাণ্ড-

কায় সরীসৃপগণ পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়াছিল। এখন সে সকল মাংসপিণ্ডের লোপ হইয়া গেছে ও যাইতেছে। এখন পরিমিতদেহ ও সূক্ষ্মস্নায়ু জীবদিগের রাজত্ব। এখন সুমহৎ জড় পদার্থেরা অন্তর্ধান করিলেই পৃথিবীর ভার লাঘব হয়।

১৩

সে দিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নূতন কবির আর আবশ্যক কি? পুরাতন কবির কবিতা ত বিস্তর আছে। নূতন কথা এম্‌নিই কি বলা হইতেছে? এখন পুরাতন লইয়াই কাজ চলিয়া যায়।

সকল গরুইত জাবর কাটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঘাস বন্ধ করিলে জাবর কাটাও বেশী দিন চলে না। নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করিয়া থাকে। নূতনের মধ্যেই পুরাতন বাঁচিয়া থাকে, পুরাতনের মধ্যেই নূতন বাস করে। পুরাতন বৃক্ষ যে প্রতিদিন নূতন পাতা নূতন ফুল নূতন ডালপালা উৎপন্ন করে তাহার কারণ তাহার জীবন আছে। যে দিন সে আর নূতন গ্রহণ করিতে পারিবে না ও নূতন দান করিতে পারিবে না সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যে দিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সে দিন জানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের হৃদয়ের সহিত প্রাচীন কবিতার যোগ-রক্ষা প্রবাহ-রক্ষা করিতেছে কে? নূতন কবিতা। নূতন কবিতা শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা কোন্ স্রোত বাহিয়া পুরাতনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইব? আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করিয়া রাখিতেছে কে? নূতন কবিতা।

জগৎ হইতে সঙ্গীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তের নূতন পাখীর গান বন্ধ করিতে কে চাহে! বসন্ত যদি পুরাতন গানকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না গাওয়াইত, পুরাতন ফুলকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না ফুটাইত তবে ত নূতনও থাকিত না পুরাতনও থাকিত না, থাকিত কেবল শূন্যতা, মরুভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# প্রবাস পত্র।

আমি গতবারের পত্র বাল্যবিবাহে শেষ করিয়াছিলাম এবার তাহা হইতে আরম্ভ করি। আমার লেখা শেষ হইবার পর ফাল্গুণ মাসের ভারতীতে বাল্যবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক মহাশয় বাল্যবিবাহের বিপক্ষদলের প্রতি প্রাণ-

পণে অস্ত্রচালনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হইল তিনি ব্রীফ লইয়া ব্যারিষ্টরের মত একপক্ষে কথা কহিতেছেন—তর্কের জন্য তর্ক করিতেছেন—নিরপেক্ষ ভাবে ঐ প্রথাটির দোষগুণ বিচার করেন নাই। তাঁহার চক্ষে বাল্যবিবাহের সকলি মধুময়, সুধাময়, সৌন্দর্য্যময়—তাহাতে দোষের লেশ মাত্র নাই।* একপক্ষের কথা শুনিয়া কোন বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করা দুঃসাধ্য তাই আমি আমার পক্ষের আরো দু একটি কথা বলিতে চাই।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত কিন্তু প্রচলিত বলিয়াই তাহার গুণ মানিয়া লইতে হইবে তাহা আমি স্বীকার করি না। নানান্ কারণে এই রীতিটি হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভ্রান্তিমত ও বিশ্বাসের প্রভাবে ইহা ধর্ম্মের মতে একপ্রকার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কন্যা-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, নহিলে জাতি কুল মান লইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত—এই সংস্কার হিন্দু সমাজে যতদিন থাকিবে ততদিন বাল্যবিবাহও রাজত্ব করিবে। গুজরাটে একজাতীয় চাষা আছে তাহাদের নাম কড়ুয়া কুনবী, তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা এই যে,দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাঁহাদের বিবাহ কাল উপস্থিত হয় তখন বালক বালিকার বিবাহ দিবার জন্য মা বাপ আকুল হইয়া পড়েন, কেন না সে সময়টি চলিয়া গেলে বার বৎসরের মধ্যে আর বিবাহের লগ্ন নাই সুতরাং এ জাতির মধ্যে এই নিয়মটি বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার বিবাহ ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপ অনেক কারণে বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে কিন্তু আমার মতে এ কালসর্পকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের কোনমতে রক্ষা নাই—কালক্রমে আমাদের সমাজ প্রলয়-দশা প্রাপ্ত হইবে।

রসিক বাবু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি সকল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বোধ হয় না। বাল্যবিবাহে দম্পতীর শরীর মন রুগ্ন হইয়া পড়ে এ বিষয়ের দোষটা তিনি দম্পতীর অভিভাবকের স্কন্ধে চাপাইতে চান। তাহার অর্থ স্পষ্টাক্ষরে এই বুঝা যায়—বিবাহ ও বিবাহের পরিণতি—এ দুই স্বতন্ত্র রাখা উচিত—তাহা হইলে এ প্রথার দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের অংশ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ কেবল কথার কথা, কাজে এরূপ নিয়ম হওয়া অসম্ভব। মহারাষ্ট্র ও অন্য কোন কোন দেশে এই রীতি আছে বটে যে মেয়ে বড় না হইলে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রেরিত হয় না। যে দেশে এই রীতি প্রচলিত সে দেশে বাল্যবিবাহের দোষ অনেকাংশে পরিহার হয় কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ নিয়ম নাই। যেখানে বিবাহের পরেই বৌমাকে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয় সেখানে ওরূপ ব্রতরক্ষা সুকঠিন। বালদম্পতী বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়াও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিবে এরূপ

নিয়ম জারী করা সহজ, এ নিয়ম পালন করা সহজ নহে। বর্ত্তমান সমাজে তাহা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গৃহকর্ত্তা অন্ধ অথবা দেখিয়াও দেখেন না; আর তাঁহারই বা দোষ কি? দিনের বেলায় ত নবদম্পতীর কথা কহিবার অধিকার নাই—রাত্রিকালেও কি তাহারা দুই এক দণ্ড মিলিবার সুযোগ পাইবে না? ফলে দাঁড়ায় এই, উল্লঙ্ঘনেই নিয়ম রক্ষা। More honored in the breach than in the observance।

অল্প বয়সে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে রাশি রাশি পড়িয়া আছে। 'বৌ ধরেই বই ছাড়ে' অনেক পুরুষের এরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টিগোচর হয়, আর স্ত্রী শিক্ষার ত কথাই নাই। আমাদের বালিকাগণ বড় জোর ১১, ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে কি গৃহে পাঠাভ্যাস করিতে সক্ষম—বিবাহের পর অধিকাংশ বালিকাই মাষ্টার পণ্ডিতের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য। ইহাতে আর বিদ্যা শিক্ষা কি হইবে? যে স্ত্রী ভাগ্য-বশতঃ শিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়ে—এমন স্বামী যিনি গুরুগিরি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া স্ত্রীকে আপনার যথার্থ সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী করিতে উৎসুক তাঁহারই শিক্ষা লাভ ঘটে নতুবা সংসারে প্রবেশ করিয়া বালিকা পূর্ব্বপাঠ সকলি ভুলিয়া যায়—তাহার পূর্ব্বশিক্ষার ফল সর্ব্বৈব ব্যর্থ হয়। এদেশের স্ত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে তিনি ইহার প্রমাণ পদে পদে জাজ্জল্যমান দেখিতে পান—বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার যে ভয়ানক শত্রু তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন।

বালস্ত্রী-প্রসূত সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয় এ কথা লইয়া যে তর্ক উঠিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। তর্কবলে আমরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি কিন্তু সে জাদুকারের ভেল্কীর মত চ'খে ধাঁদা দেওয়া মাত্র—প্রকৃতির নিয়ম তাহার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়। ফল ফুল পাকিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। পশু পক্ষীর যৌবনের বয়স নিরূপিত আছে, তাহার সীমা তাহারা উল্লঙ্ঘন করে না, মানবদেহও প্রকৃতির নিয়মাধীন। তাহার পরিপক্কতার বয়স নির্দ্ধারিত আছে। অকালপক্ক ফল যেমন সুস্বাদু হয় না অকাল-প্রসূত সন্তানও সেইরূপ ক্ষীণ মনঃকায় হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার নর্ম্মাণ চেসার্স্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার—ডা-ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময় আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীর-প্রকৃতি তাঁহারা যেমন ভাল বুঝেন আমরা তেমন বুঝি না। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া তাঁহারা কি

বলিয়াছেন? তাঁহারা বলেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে—মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত লওয়া যায় তাহার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এদেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া বলেন। এই সকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই যে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হইল তাহা নহে। আরো দু তিন বৎসর অতীত হইলে তবে তাহাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে আমাদের দেশের বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যে সকল স্থানে দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর একত্র সহবাসের রীতি আছে সেখানেও বাল্য-বিবাহের দোষ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় না কেন না এই সময় হইতেই যে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স তাহা নহে। তাহাদের শরীরের পূর্ণতা, যৌবনের বিকাশ আরো অধিককাল সাপেক্ষ।

বালক বালিকা অপ্রাপ্ত-বয়সে স্বামী স্ত্রার ন্যায় একত্রে সহবাস করিবে ইহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতা মাতার এত আগ্রহ কেন? অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র কন্যার উপর এইরূপ অধিকার খাটাইয়া কি তাঁহারা ভাল কাজ—মা বাপের উপযুক্ত কাজ করেন? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিস্ফুটিত হয় নাই—নিজের মতামত দিবার ক্ষমতা জন্মে নাই সে বয়সে চিরজীবনের মত তাহাকে উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কি তাঁহারা সুবিবেচনার কার্য্য করেন? আমি একথা বলিতেছি না যে পুত্র কন্যার বিবাহে পিতা মাতার কোন অধিকার নাই—মতামত দিবার ক্ষমতা নাই—হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। আমি বলি নিদান এতটুকু বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত যে বয়সে দম্পতী আপনারা জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারে—বিবাহে আপনাদের ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। যে বয়সে তাহারা বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতে ও নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ সে বয়সে তাহাদের বিবাহ ঘটাইয়া দেওয়া অন্যায়। এ কথা সত্য বটে যে আমাদের সমাজে বিবাহের স্বাধীন ক্ষেত্র নাই, স্ত্রী পুরুষের স্বয়ম্প্রণয়ের (Courtship) সুবিধা নাই— বাপ মায়ের ঘটকালী ব্যতীত চলে না, কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে বিবাহকালে আসল পাত্র পাত্রীর মুখ বন্ধ থাকিবে তাহাদের নিজস্ব মতামতের কোন প্রয়োজন নাই। স্বাধীন ইচ্ছাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাকুক না কেন তথাপি দেখিতে হইবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত ব্যবহারের জিনিস নহে। তাহার স্বাধীনতা টুকু যতদূর বজায় রাখা যাইতে পারে তাহা কর্ত্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তাহার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যাহার প্রভাবে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কদাপি হিতাবহ হইতে পারে না।

আমি বলিয়াছি অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর রাজবিধির মমতা অধিক। যেখানে অপ্রৌঢ় বালক বালিকার অনিষ্ট আশঙ্কনীয় সেখানে রাজনিয়ম হস্তপ্রসারণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাহার এক দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। মনে কর যদি কোন বারনারী তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে নিজ বৃত্তিতে নিয়োজিত করে তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হয় কি না? এদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারনারী আছে তাহারা দেবমন্দিরে নৃত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত। তাহাদের ঘরে কোন সুন্দরী ছোট মেয়ে থাকিলে তাহারা কখন কখন প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে আপনাদের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে, কিন্তু এরূপ করিয়া অনেক সময় তাহারা পীনল কোডের গ্রাসে পতিত হয়। এই প্রকার দীক্ষার বিশেষ বিধান ও অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম 'সেজ' বিধি। সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র—বরের ঠিকানায় একটা খড়্গ কি ছুরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার উপর ফুলের মালা রাখিয়া পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও মেয়ে তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্য্যে ও কুল-ধর্ম্মে তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইল। বোম্বাই হাইকোর্টের রিপোর্টে (ষষ্ঠ খণ্ড, Crown cases page 60) এ সম্বন্ধে এক মকৰ্দ্দমা দেখিতে পাইবে। আমি কারওয়ারে থাকিতে এইরূপ মকৰ্দ্দমা মাসে মাসে আমার কাছে আসিত। আসামীর বক্তব্য এই—এ আমাদের চিরন্তন প্রথা—মেয়েকে আমাদের কুলধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি? কিন্তু দেশাচার কুলাচার সত্ত্বেও আইনের অনুশাসন এই যে অপ্রৌঢ়া বালিকার উপর এরূপ অত্যাচার দণ্ডনীয়। আইন যদি এস্থলে দেশাচারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিল তাহা হইলে অজ্ঞান বালিকার হিতসাধন উদ্দেশে কি আরো কতকদুর অগ্রসর হইতে পারে না? আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই পিতা আপন অল্পবয়স্কা কন্যাকে পঞ্চ সতীনের ঘরে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে চির জীবনের মত অসুখী করিতেছেন, অর্থলোভে আপনার অষ্টবর্ষীয়ের দুহিতাকে পলিতকেশ বৃদ্ধবরের হস্তে অকাতরে সমর্পণ করিতেছেন ইত্যাদি—, এরূপ স্থলে কি রাজ দণ্ড হস্ত উত্তোলন করিবে না? বাল্য বিবাহ হইতে যেসকল মহা অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে তাহা নিবারণের জন্য সমাজ যখন নিশ্চেষ্ট অথবা সমাজ যখন আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিতে উদ্যত তখন আমার বিবেচনায় রাজ-নিয়মই তাহার উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব স্থির করিয়াছি, আমার মতে তাহা অখণ্ডনীয় ও সৰ্ব্ববাদীসম্মত বলা যাইতে পারে। প্রথম এই যে, দম্পতী যোগ্য বয়সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূৰ্ব্বক বিবাহ করিবে।

দ্বিতীয়, স্ত্রী পুত্র ভরণ পোষণের সামর্থ্য বুঝিয়া পুরুষ দারপরিগ্রহ করিবে।

আমাদের দেশের বিবাহ প্রণালী এ দুই মূল-সূত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে—তাহার ফল দাম্পত্য অসুখ,—দুঃখ দারিদ্র, হীনবীর্য্য সন্তান সন্ততি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বিধবা বিবাহ।

ফাল্গুন মাসের ভারতীতে আমরা বাল্য-বিবাহ প্রশ্নটী সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এই সংখ্যায় বিধবা বিবাহ আমাদের আলোচ্য।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এ যাবৎ বিধবা বিবাহের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে যে সমুদায় তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে সে গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—১ম নীতি মূলক, ২য় শাস্ত্র মূলক, ৩য় হিতবাদ মূলক। তর্কের বিভাগানুসারে তার্কিকগণও সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর তার্কিকদিগের প্রধান তর্ক বিধবা বিবাহ সুনীতি সম্মত কি না ; বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত কি না ইহাই দেখাইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর তার্কিকগণ অধিক যত্নবান ; আর, তৃতীয় শ্রেণীর তার্কিকগণের প্রধান আলোচনা বিধবা বিবাহ জনিত সমাজের হিতাহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধবাবিবাহ-সমর্থনকারীগণের নেতা,—এবং সাধারণতঃ টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বিপক্ষগণের মুখপাত্র। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি বিধবা-বিবাহের আদি স্বপক্ষগণ এবং আধুনিক অধিকাংশ সমাজ সংস্কারক সমিতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ;—আর তাহাদের অন্য পক্ষ, বিধবা-বিবাহের আদি বিরোধীগণ, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়, ও পাশ্চাত্য আচারব্যবহারজ্ঞ ভট্টাচার্য্যগণ। হিতবাদের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বিধবা-বিবাহের উপকারিতা এবং অপকারিতা বিচার করিতে প্রবৃত্ত এরূপ লোকের সংখ্যা এখনও অতি অল্প ; কেবল আজ কাল দুই একটী দেখা দিতেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অলোক যখন প্রথম বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল যখন প্রথম বঙ্গবাসী নূতন ধর্ম্ম, আচার, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন, সেই সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্ব্ব বিষয়েই কেবলমাত্র নৈতিক অনুমোদন লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেন। কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার উপযোগিতানুপযোগিতার প্রতি তাহাদের বড় দৃষ্টি ছিল না ; তাঁহারা কেবল দেখিতেন কার্য্যটী সুনীতি-সঙ্গত কি না। ডিরোজিওর শিষ্যগণের কার্য্য কলাপ স্মরণ করিলেই একথা সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই বিধবা-বিবাহের তর্ক যখন প্রথম উত্থাপিত হইল তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় নৈতিক-ক্ষেত্র হইতে বিধবা-বিবাহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বিধবার প্রতি সমাজের কঠোর অত্যাচার ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তখনকার জন-সাধারণ তাঁহাদের উচ্চ ধর্ম্ম-নীতি গ্রহণ করিতে ক্ষমতাবান হইল না। তাহারা শাস্ত্রাজ্ঞাই নীতি বলিয়া জানিত; শাস্ত্রছাড়া নীতি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না। এজন্য বিধবা-বিবাহোদ্যোগীদের প্রথম চেষ্টা এক প্রকার নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন অন্য ক্ষেত্র হইতে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করা আবশ্যক হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর তার্কিক-গণের আবির্ভাব। এই শাস্ত্র-শাসিত দেশে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত এরূপ প্রমাণ করিতে পারিলেই লোকে ইহা অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কুচিত হইবে না এই বিশ্বাসে বিদ্যা-সাগর মহাশয় অকূল শাস্ত্রসাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতুল অধ্যবসায় ও পরি-শ্রমসহকারে কীট-জীর্ণ গ্রন্থাদি হইতে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বচন ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে সম্যক্ প্রস্তুত হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সকলেই জানেন শা-স্ত্রীয় তর্কে তিনি বিপক্ষগণের উপর কিরূপ আশাতীত জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুগণ দেশাচার রূপ নূতন-দুর্গের আশ্রয় লইল। শত্রু-রাজ্য তাহার আয়ত্ত হইল না। দেশে বিধবা-বিবাহ আশানুরূপ প্রচলিত হইল না। আইন পাস হইল, কিন্তু আইনের সাহায্য লয় এরূপ লোক জুটিল না। যাহা হউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়ে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষগণের একটী গুরুতর লাভ হইল, বিপক্ষগণ ভীত হইল এবং বিধবা-বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে সাধারণে মনোযোগী হইল। সকলেরই এই প্রশ্নটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কোন নূতন প্রশ্ন উত্থা-পিত হইলে সাধারণের তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, দেশে বিধবা-বিবাহ আশানুরূপ প্রচলিত না হইলেও, বিধবা-বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে সেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধকটী অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়ে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষগণ নূতন উদ্যমে কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং বিপক্ষেরা তূণে কোন বাণ প্রস্তুত না থাকায়, প্রথম-বারের যুদ্ধের শরগুলিই ঘসিয়া মাজিয়া নানা রকমে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা পুনরায় নীতি-ক্ষেত্র হইতে বিধবা-বিবাহ আক্রমণ করিতেছেন। আমরা দেখাইয়াছি পূর্ব্ববারে এরূপ যুদ্ধে কোন ফল পাওয়া যায় নাই এবারও ফলের আশা নিতান্ত অল্প। কিন্তু সুখের বিষয়, আজ কাল বিধবা-বিবাহের পক্ষগণের মধ্যে কেহ কেহ নূতন ক্ষেত্র ও নূতন অস্ত্রের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং হিতবাদ অবলম্বন করিয়া সমাজের পক্ষে বিধবা-বিবাহ কতদূর উপকারী তাহা দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই নূতন যুদ্ধে এখন বিপক্ষগণকে পরাভূত করিতে না পারিলে বিধবা-বিবাহ দেশে সম্যক প্রচলিত হইবার ভরসা নাই। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষগণের এখন হইতে এই বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী হওয়া আব-

শ্যক। সমরক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা বিশদ রূপে বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ দিলাম।

দাস ব্যবসায়ের (Slave trade) বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ নীতি-মূলক। ভারতবর্ষে নব-ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা রামমোহন রায় যেরূপ নীতি-ক্ষেত্র হইতে নৃশংস দেশাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডেও মেথ-ডিষ্ট ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা ওয়েস্‌লি ভ্রাতৃদ্বয় তদ্রূপ নৈতিক যুক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে দাস ব্যব-সায়ের দোষ দেখাইয়া দেন, দাসগণের অসীম যন্ত্রণা,স্বজাতির প্রতি মনুষ্যের দায়িত্ব ইত্যাদি তর্কাবলম্বন করিয়াই তাঁহারা দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বদ্ধ-পরিকর হন। তৎপরে, দাসব্যবসা খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত কি না, ইহা লইয়া দেশে ঘোর আন্দোলন চলিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফল, উইল্‌বার্‌ফোর্‌সের দাসব্যবসা উঠাইয়া দিবার আইন। কিন্তু ইহার কোনটিতেই কার্য্য-সিদ্ধি হইল না। শেষ আক্রমণে দাসত্ব পতনোন্মুখ হইল বটে, কিন্তু একবারে উ-ঠিয়া গেল না। উপনিবেশগুলিতে দাসত্ব তখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। পরে যখন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দাসত্ব প্রথা দ্বারা ইংরাজ সমাজের যে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে-ছিল তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিলেন, যখন তাহারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন যে কৃষিকার্য্যাদিতে দাস নিযুক্ত করা অপেক্ষা চাকর নিযুক্ত করাই অধিক লাভজনক, তখন আর ইংলণ্ডে দাসত্ব তিষ্ঠিতে পারিল না। হিতবাদীদিগের জয়েই দাসত্বের মূলে সাংঘাতিক আঘাত পড়িল।

হিতবাদ-ক্ষেত্র হইতে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করার আবশ্যকতা দেখাইয়া আমরা এখন বিধবা বিবাহের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। কেবল নীতি ও হিতবাদ মূলক তর্কগুলিই আমাদের আলোচ্য। শাস্ত্রীয় তর্কের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্র লইয়া যাহা স্থির করিবার তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছেন,—তাহা ছাড়া পূর্ব্বে সমাজের উপর শাস্ত্রের যেরূপ প্রভাব ছিল এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই। নব্য যুবকগণ যখন বিনাযুক্তিতে স্বয়ং পরমেশ্বরকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিতে চাহেন না, তখন শাস্ত্রের বচনাদি তাঁহাদের নিকট কৌতূহল পরিতৃপ্তির কারণ হইতে পারে কিন্তু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের কারণ হইবে না। এমতাবস্থায় শাস্ত্রীয় তর্কের আলোচনা ছা-ড়িয়া দেওয়ায় বড় আইসে যায় না। বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনেচ্ছু মহোদয়গণ ইহার স্বপক্ষে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তর্কগুলি দর্শাইয়া থাকেন।

## ১। বিধবার যন্ত্রণা।

ভারতবাসী মাত্রেই বিধবাদের দুর্গতি বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাহারা রক্ত মাংসের শরীরে কিরূপে সেই কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্যব্রত পালন করে ভাবিলে শরীর কণ্ট-কিত হয়। এই কষ্টের উপর আবার চিরা-

ধীনতা। সংসারে আপন বলিবার কিছুই নাই, সর্ব্ববিষয়েই তাহারা পরমুখপ্রেক্ষী। মনুষ্যের বিপদ সময়ের স্বভাবদত্ত বন্ধু আশাও তাহাদের প্রতি বিমুখ। তাহারা অবলম্বন শূন্য, উপায় শূন্য, আশা শূন্য। ইহাতেও নিস্তার নাই—তাহাদের জীবন সর্ব্বদা শঙ্কাময়, সন্দেহ-ময়। একটু উচ্চ হাসি দেখিলেও লোকে কু-অর্থ গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় মৃত্যু কি জীবন অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় নহে? কোন প্রাণে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র রমণীকে এই বিষাদ সাগরে নিক্ষেপ করিতে চাও?

## ২। বিধবার কলঙ্ক ও সমাজের আনুষঙ্গিক অমঙ্গল।

সময় সময় হতভাগিনীগণ কুপথ অবলম্বন করে। আহা অবলা কি করিবে, সকলেরই কি আত্মশাসন,—ক্ষমতা ও ধৈর্য্য-তুল্য? তখন আত্মীয় স্বজন হইতে আত্মদোষ গোপন মানসে তাহারা কতই কপটতা, ছলনা প্রভৃতি অসদুপায়ের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীগণকেও কাপট্য, ছলনা শিক্ষা দেয়, ইহাতে সমাজের নৈতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। হতভাগিনীদের কার্য্যে সময় সময় ভয়ানক আত্মকলহ, বন্ধুবিচ্ছেদ এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সমাজের পক্ষে ইহা যে একটী ঘোর অমঙ্গল কে অস্বীকার করিবে?

## ৩। শক্তির অপচয়।

বিধবার জীবন লক্ষ্যশূন্য, উদ্দেশ্য-শূন্য। সংসারের কোন কার্য্যই প্রায় তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে তাহারা সংসারের উপকার করিতে অক্ষম আবার অনেক বিষয়ে শোকে তাপে জর্জ্জরীভূত বলিয়া উদাস। আর ঔদাস্য না থাকিলেও অবলা রমণী, পুরুষের সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে? সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় কেবল যে সাক্ষাৎ অনিষ্ট হইতেছে তাহা নহে, অনেক ইষ্ট সাধিত হইবার শক্তিরও অপচয় হইতেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে যে সমুদায় বিধবারা এখন বৃথা দিন যাপন করে তাহাদের দ্বারা সংসারের কত উপকার হইতে পারিত।

## ৪। সামাজিক অন্যান্য অমঙ্গল।

আজ কাল একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সময় সময় স্বামীর মৃতুর পর অভাগিনীদের দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত থাকে না, পিতৃ ভবনে আশ্রয় পাইলেও অনেক সময় তাহারা পিতৃসংসার দুঃখময় করিয়া তুলে। কখন কখন বা উপযুক্ত অভিভাবকাভাবে শিশু সন্তানগুলির উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান হইয়া উঠে না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় এইরূপ নানা প্রকার অসুবিধা হইতেছে।

ধীর চিত্তে এই তর্কগুলির আলোচনা করা যাউক। কে অস্বীকার করিবে যে বাস্তবিকই বিধবাদের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই; কে অস্বীকার করিবে যে সময় সময় বিধবাগণ কুপথাবলম্বন করায় সমাজের

ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, এবং কেবা অস্বীকার করিবে যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় প্রকৃতই কতক পরিমাণে শক্তির অপচয় হইতেছে। যদিও বিধবাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকারই হয় না একথা অস্বীকার্য্য। বিধবা-বিবাহ বিরোধিগণের তর্ক হইতেই ইহার বিপরীত স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে এই সমুদায় অনিষ্ট নিরাকৃত হইবে কি?

ভারতবর্ষে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা তুল্য নহে। স্ত্রীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে কিছু পুরুষের বিবাহ বাড়িয়া যাইবে না। মোট বিবাহ সংখ্যা একই রহিবে। সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেও অস্বামিক রমণীর সংখ্যা একই থাকিয়া যাইবে। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে সমুদায় তর্কগুলিরই মর্ম্ম এক—'পুরুষ সহায়তাভাব জনিত অসুবিধা'। কিন্তু অপ্রাপ্তপুরুষ-সাহায্য-রমণীর সংখ্যা যখন একই রহিল, সমাজের আশঙ্কিত অনিষ্ট নিবারিত হইল কি প্রকারে? পূর্ব্বে না হয় কেবল বিধবারা কষ্ট পাইত, এখন নয় তৎপরিবর্ত্তে কষ্টটা বিধবা ও কুমারীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে। কষ্টের আয়তন ও পরিমাণ পূর্ব্ববৎই রহিয়া যাইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অবস্থা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝা যায়। এরূপ অবস্থায় যাহারা কেবল দয়ারবশবর্ত্তী হইয়া বিধবা-বিবাহের পক্ষ গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। তাঁহারা সমাজের কষ্ট নিবারণে যত্নবান নহেন কেবল রামের কষ্ট শ্যামের ঘাড়ে চাপাইতে যত্নবান। দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে গেলে বরং বিধবা-বিবাহের প্রতিকূলে যত্ন করা উচিত। বিধবার মধ্যে অনেকেই স্বামীর ঘর করিয়াছেন কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক রমণীর চির-কৌমার্য্যে জীবন যাপন করিতে হইবে। কেবল দয়ার চক্ষে প্রশ্নটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে বিধবা-বিবাহ বাস্তবিকই প্রার্থনীয় নহে।

এখন বিধবা-বিবাহ বিরোধীগণের তর্কগুলি আলোচনা করা উচিত।

১। একবার একজনকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পুনরায় অপরকে তাহা অর্পণ করা ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

২। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে বিবাহ নামক নরনারীর পবিত্র মিলনকে উহার স্বর্গীয় ভাব হইতে বঞ্চিত করা হয়। উহার সেরূপ পবিত্রতা ও উচ্চতা আর বিদ্যমান থাকে না; উহা পার্থিব চুক্তি মাত্র হইয়া পড়ে এবং উহার সহিত পাশব মিলনের কোন প্রভেদ থাকে না।

৩। সমাজকে প্রকৃত মহত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া অন্যান্য উন্নতির জন্য প্রস্তুত করা মাত্র। বিবাহ সম্বন্ধে সমাজের যে একটী পবিত্র ও মহৎ ভাব আছে উহার অপচয়ে সমাজের মহত্ত্ব-শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। তজ্জন্য সমাজের উন্নতি সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে বাধা পড়িবে। বঙ্গ গৃহের পবিত্রতা বিধবাগণের দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে। ত্যাগস্বীকার

ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ শিক্ষা বিষয়ে আমরা অনেক পরিমাণে বিধবাদের নিকট ঋণী।

উপরোক্ত এবং অনুরূপ তর্ক গুলির যে কিছু সারবত্তা নাই তাহা বলিতেছি না তবে আজকাল এই-পবিত্রতা লইয়া বড় অতিরিক্ত চীৎকার শুনা যায়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সকল বিধবাই পরিণয়-প্রার্থী হইবে এরূপ নহে। যাঁহারা প্রকৃত পতিরতা তাঁহারা এখন যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন তখনও সেইরূপ পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং তখন প্রকৃত সতীর পবিত্র দৃষ্টান্তে সমাজের যথার্থ উপকার সাধিত হইবে। বরং এখন হীরক ও কাচের মিশামিশিতে লোকে হীরককেও অবহেলা করিতেছে। অনেক ভণ্ড বিধবার দৃষ্টান্তে লোকে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীগণের প্রতিও হতাদর হইয়া পড়িয়াছে, কপট বিধবাগণের ব্যবহারে প্রকৃত সাধ্বীগণের দৃষ্টান্তও নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে কপট বিধবাগণের হাত হইতে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণা বিধবাগণ নিস্তার পাইবেন এবং লোকেও তাঁহাদের দৃষ্টান্তে মোহিত ও উপদিষ্ট হইতে থাকিবে। এখন অনেকের বিশ্বাস 'বেঁধে মারে সয় ভাল,' উপায় নাই তাই বিধবারা ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু যখন লোকে দ্বিতীয় বার পরিণীতা হইবার উপায় থাকিতেও কোন বিধবাকে মৃতপতির স্মৃতি দেবতার ন্যায় আরাধনা কবিতে দেখিবে তখনই বাস্তবিক তাহার সতীত্বের প্রকৃত মহত্ব ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

বিধবা-বিবাহ বিরোধীগণের হিতবাদ মূলক কয়েকটী তর্কও শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—

৪। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সামান্য কারণেও যদি স্বামিস্ত্রীর মধ্যে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব হয়, স্ত্রী স্বামীকে সংসার হইতে অপসৃত করিয়া তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিবে। গোপনে বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি নানা প্রকার দৌরাত্ম্যের আবির্ভাব হইবে। অন্ততঃ স্বামিস্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসের লাঘব হইবে।

৫। বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবা সংসারবন্ধন শূন্য বলিয়া অনেকেই এক মনে পরহিত ব্রতে জীবন যাপন করিতে পারিতেছেন। তাহাদের দ্বারা সংসারের কতই উপকার সাধিত হয়। প্রাতস্মরণীয়া অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে এরূপ রমণী আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হইবে না।

৬। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য লোকসংখ্যাবৃদ্ধিনিবারণের একটী উপায়। একেইত বাঙ্গালার লোক ধরে না, তাহার উপর লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নিবারণের জন্য সামাজিক যে সমুদায় উপায় আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

এই সমুদায় তর্ক সমালোচনা করিতে গেলে ইহাদের গভীরতা দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কখন কখন স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামি-হত্যার বিবরণ শুনা যায় বটে কিন্তু তাহার সংখ্যা কত অল্প। অবিবাহিতা

বিধবাগণের দ্বারাও কি আজ কাল দুই একটা ভয়ানক নরহত্যা ঘটিয়া থাকে না ? পুরুষদের ত পুনরায় দার পরিগ্রহের ক্ষমতা আছে—তাই বলিয়া কয়জন স্বামী স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ? অবশ্য স্বামীর-পক্ষে স্ত্রী হত্যা অপেক্ষা স্ত্রীর পক্ষে স্বামি-হত্যার প্রলোভন অধিক। পুরুষ স্বাধীন, স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে ; স্ত্রী পরাধীনা, তাহাকে স্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবেই হইবে। বিধবা বিবাহ বন্ধ করিলে আশঙ্কিত-অনিষ্ট আংশিকরূপে নিবারিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় স্ত্রীপুরুষকে বিচ্ছিন্ন হইবার স্বাধীনতা দেওয়া। আমাদের মতে আইন-সঙ্গত বিচ্ছেদ (Legal separation) ও প্রত্যাখ্যান (divorce) প্রথা বিধবা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

রাণী ভবানীর ন্যায় বিধবার দ্বারা সংসারের যে উপকার হয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সে উপকার হইতে সমাজ বঞ্চিত হইবে এরূপ নহে। অনেক বিধবা পুনরায় পরিণীতা হইবেন না, এদিকে আবার যে সমুদায় বিধবা পরিণীতা হইবেন তাঁহাদের স্থলে আমরা অনেক কুমারীর সাহায্য প্রাপ্ত হইব। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেলও বাঙ্গালায় দৃষ্টি গোচর হইতে পারে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলনে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কাও ভ্রান্তিমূলক। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ইহাতে বিবাহ-সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, তাহা হইলে জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে কি প্রকারে ?

বিধবা-বিবাহের অনুকূলে সচরাচর যে সমুদায় তর্ক দর্শিত হইয়া থাকে, উপরে সে-গুলি আমরা আলোচনা করিলাম। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে অধিকাংশ তর্ক গুলিরই সারবত্তা সামান্য। এখন দেখা যাউক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ নেতৃগণের এপ্রশ্ন সম্বন্ধে কোন দিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বাল্য-বিবাহ প্রবন্ধে আমরা আইন দ্বারা, অথবা হাত-গড়া উপায় দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা কিরূপ অনিষ্টকর তাহা দেখাইয়াছি। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও সেইরূপ সমাজের উপর কোন বাহ্যবল প্রয়োগ আমরা সম্পূর্ণ অনিষ্টকর মনে করি। সমাজ নিজেই নিজের ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার। সমাজকে আপনি চলিতে দাও। তবে যাহাতে তাহার গতি সরল হয়, যাহাতে তাহার পথের বাধাগুলি দূরীভূত হয় সমাজ নেতৃগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। বাল্য-বিবাহ নিবারণ করিবার জন্য আইন দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ বিষয়ে আমরা যেরূপ প্রতিবাদী, বিধবাগণের স্বাধীনতাপহারক বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মেরও আমরা সেইরূপ প্রতিবাদ করি। বিধবাদিগকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। আইন দ্বারা বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিও না ; বিধবাদিগকে যেন বাধ্য হইয়া পুনঃ পরিণীতা হইতে না হয় ; অথবা পুরুষের পক্ষেও যেন কখন বিধবা-

বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে না হয়। কিন্তু অন্যপক্ষে আবার বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান কঠোর সামাজিক নিয়মগুলি যাহাতে দুরীভূত হয় তৎপ্রতিও বিশেষ যত্নবান হও। বিধবা-বিবাহে জন সাধারণের ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব যাহাতে তিরোহিত হয় তদ্‌বিষয়ে মনোযোগী হও। লেথকের বাল্য-বিবাহ প্রবন্ধটী যাহারা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বাল্য-বিবাহ প্রবন্ধে রক্ষণশীলতার আভাস ও বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদারতার লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া লেথককে অস্থির-মতি স্থির করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে উভয় প্রস্তাবই একটী মাত্র মত (Principle) হইতে উদ্‌ভূত। এবং সেই মত অন্য কিছুই নয় কেবল এই যে 'সমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন অবস্থায় অনাবশ্যকরূপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না, এবং যতদূর সম্ভব যাহাতে বর্ত্তমান ব্যক্তিগত অধীনতার পরিমাণ ও সংখ্যা কমাইতে পার তাহার চেষ্টা কর। আজকাল সমাজনেতাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন করিতে যাঁহারা পরামর্শ দেন এই মতানুসারে আমরা তাঁহাদিগেরও বিরোধী। পাঠক দেখিবেন এই বিষয়ে ভারতীতে 'সমস্যা' নামক প্রবন্ধ লেথকের সহিত আমাদের মত ভেদ।

সমাজের এখন যেরূপ গতি তাহাতে ক্রমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবে এইরূপই ভরসা করা যায়। বিধবা-বিবাহ দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে, পসন্দ মত বিবাহের উপায়ও বর্দ্ধিত হইবে। কৃত্রিম বাধাগুলি অপসারিত হইয়া গেলে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের (Natural Selection) পথও পরিস্কার হইয়া উঠিবে, এবং ইহার ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হইতে পারে না। এখন পঞ্চাশ বৎসর বয়সের দোজ বরকে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে দেখিয়া কে ক্লিষ্ট না হন? বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে এরূপ দৃশ্য বড় দেখিতে হইবে না। পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে অনেক দোজবরই পুনর্ভূ কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। তবে যদি বলেন সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অনেক বৃদ্ধা কুমারীও দৃষ্ট হইবে—তাহার উত্তর, এ বিষয়ে মনুষ্যের হাত নাই। যখন পুরুষাপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অধিক তখন এ দুঃখ রমণীর কপালে স্বয়ং বিধাতাই লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রী রসিকলাল সেন।

---

# ভারতাক্রমণ।

প্রকৃতির বিশাল-রাজ্যে ভারতবর্ষ অতি সুন্দরস্থানে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে অপার-অনন্ত জলরাশি, আর একদিকে অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত-শোভার ভাণ্ডার অভ্রভেদী, অটল গিরিবর। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রায় চারিদিকেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সু-

রক্ষিত। স্থলপথে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, সঙ্কীর্ণ-গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় না—আর জলপথে মহাসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষোভী বারিরাশি ছাড়াইতে না পারিলে ভারতের উপকূলে পা দেওয়া যায় না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা বহু আয়াস ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ প্রকৃতির দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। এই ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করা বড় একটা সহজ কথা নহে। কিন্তু প্রকৃতি এত যত্ন করিয়া যে সোণার ভারত আগুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও চিরকাল বিদেশীজাতির আক্রমণের বহির্ভূত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন ভূখণ্ড বহুবার বহু বিদেশী আক্রমণকারীর পদানত হয় নাই। যে সুদূর-বিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভারতের শীর্ষদেশে বিরাট পুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া আপনার অপূর্ব্ব-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটি গিরিসঙ্কট আছে। এই গিরিসঙ্কট প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আফগানিস্তান হইতে উপস্থিত গিরিসঙ্কট ছাড়াইতে পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল বিদেশী লোক উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অথবা রাজ্যবিস্তার, প্রভুত্ব স্থাপন, বা সম্পত্তি লুণ্ঠনের আশায় ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতবর্ষ এই পথে দশবার আক্রান্ত হইয়াছে।

প্রথম আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ঘটনা সর্ব্বপ্রধান হইলেও উহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে আর্য্যজাতি প্রথমে মধ্য-আশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। মানচিত্র সমূহে এই ভূখণ্ড স্বাধীন তাতার নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই আর্য্যজাতির এক শাখা আফ্‌গানিস্তান হইতে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য হন নাই। ভারতের আদিম নিবাসীগণ এই বিদেশী আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যে অনার্য্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বেদে এই আর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্যসম্প্রদায় দস্যু বা দাস নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহামতি শাক্যসিংহের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়। এই সময়ে পারস্যের অধিপতি দরায়ুস হিস্তাস্পেস্ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। দরায়ুস আর্য্যদিগের অবলম্বিত পথেই বোধ হয় ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী আক্রমণ মাসিদনের অধিপতি

সুপ্রসিদ্ধ শেকন্দর শাহ কর্ত্তৃক হয়। এই আক্রমণ প্রসঙ্গেই প্রতীচ্য জগতে ভারতবর্ষের কথা লইয়া আন্দোলন ঘটে। ভারতবর্ষ এই সময় হইতেই ইউরোপীয়দিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে থাকে।

শেকন্দরের পর আফগানিস্তানের উত্তরে বলকের অধিপতিগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া ছিলেন। বল্‌ক্ তখন গ্রীস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানের গ্রীক ভূপতিগণের কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ গ্রীক ভূপতিগণ কর্ত্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণেরও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। পাণিনীর ভাষ্যকার পতঞ্জলির "অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্, অরুণৎ যবনোমাধ্যমিকাম্" বাক্যে বোধ হয় এই আক্রমণ লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

ইহার পর গজনির সুলতান মহমুদের আক্রমণ। মহমুদ খৃীঃ ১৮৮১ অব্দে প্রথম বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। আর্য্যদিগের ভারতাক্রমণ ইতিহাসের মধ্যে একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু ইহাতে ভারতের সভ্যতার বিকাশ হয় ধনসম্পত্তির উন্মেষ হয়, জ্ঞান গরিমা পরিস্ফুট হয়, সংক্ষেপে ভারত ভূমি বিদ্যা সভ্যতার প্রসূতি বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচিত হইতে থাকে। সুলতান মহমুদের ভারতাক্রমণও একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু ইহাতে ভারতে আসিবার পথ বিশেষরূপে সাধারণের বিদিত হয়, সাধারণে ভারতবর্ষ সহজে আক্রম্য ও সহজে অধিগম্য বলিয়া মনে করিতে থাকে। একবার দুইবার নয়, সুলতান মহমুদ উপর্য্যুপরি অনেক বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইরূপ বারংবার আক্রমণে খাইবার-গিরিবর্ত্ম সাধারণের নিকট অনায়াসগম্য-পথ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। কলম্বসের পর হইতে নবাবিষ্কৃত ভূমণ্ডলে যাওয়ার পথ যেমন সকলে সহজ বলিয়া মনে করিতে থাকে, সুলতান মহমুদের পর হইতে বিদেশী জিগীষুগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাও তেমনি সহজ ভাবে। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে যেমন কলম্বস্ ভারতবর্ষের পক্ষে তেমনি সুলতান মহমুদ। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেই অনেকে আতলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় ফল-সম্পত্তিশোভিত প্রকৃতির সেই রমণীয় রাজ্যে যাইতে থাকেন। বিদেশীদিগের এইরূপ আক্রমণে আমেরিকদিগের স্বাধীনতারত্ন অপহৃত হয়। আর সুলতান মহমুদ ফিরিয়া গেলেই অনেকে খাইবার-গিরিসঙ্কট পার হইয়া ভারতে আসিয়া পড়িতে থাকেন। বিদেশীদিগের এই সঙ্ঘর্ষে বিদেশীসৈন্য-প্রবাহের এই ভীষণ অভিঘাতে ভারতের স্বাধীনতা ভাসিয়া যায়।

সুলতান মহমুদের পর মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই আক্র-

মণের ফল—ভারতে পরাধীনতার সূত্রপাত। সুলতান মহমুদ ভারতের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, কিন্তু মহম্মদ গোরী ভারতে মুসলমান-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া যান। দৃশদ্বতীর তীরে—মহাযুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পতন হইলে মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস ও সেনাপতি কোতবদ্দীন দিল্লির সিংহাসন গ্রহণ করেন। ভারতে মুসলমান আধিপত্য কোতোবদ্দীন হইতে আরম্ভ হয়।

মুসলমান রাজ্যাধিকারে যে সকল বিদেশী লোক ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন আমরা বারান্তরে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া, ভারতাক্রমণের সহিত যে রাজ-নৈতিক ফলের সংস্রব আছে, তাহার আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

# হুগলির ইমাম্‌বাড়ী।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ। (ভাই বোন।)

মুন্নার পিতা গিয়া পর্য্যন্ত মুন্না বড় মুষড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার সুখশান্তি যেটুক অবশিষ্ট ছিল, যেন সকল চলিয়া গিয়াছে। মুন্নার জন্য মহম্মদ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কি করিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি দিবেন ভাবিয়া পাননা, কতবার কাজকর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে আসেন, না খাইলে জোর করিয়া খাওয়াইতে বসেন, বিষণ্ণ দেখিলে হাসাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহার অসীম স্নেহে মুন্নার প্রাণের যত অভাব পূর্ণ করিতে চাহেন

তাঁহার জ্বালায় মুন্নারও না খাইলে না হাসিলে চলে না, মুন্না না খাইলে মসীন খাইবেন না, মুন্না না হাসিলে অবশেষে তিনিও বিষণ্ণ হইয়া পড়িবেন। এইরূপে জোর করিয়া কষ্টের ভাব তাড়াইতে গিয়া শেষে মুন্নার বিষণ্ণ প্রাণেও যখন প্রফুল্লতার ছায়া আসিয়া পড়ে, মসীনের অনন্ত স্নেহের ছায়ায় তাহার প্রাণের শ্রান্তি যখন মুহূর্ত্তের জন্য দূরে চলিয়া যায়, তখন মসীনের হৃদয় আনন্দে এতদূর উথলিয়া উঠে, যে তাঁহার হৃদয়ের সেই আনন্দতরঙ্গ মুন্নার হৃদয় পর্য্যন্ত আসিয়া স্পর্শ করে, মসীনের অকৃত্রিম, পূর্ণ-মমতার সেই প্রশান্ত-আনন্দালোক প্রভাত সূর্য্যের রশ্মীর মত ছড়াইয়া পড়িয়া মুন্নার শুষ্ক ম্লান মুখেও তখন ধীরে ধীরে হাসি ফুটায়।

রাত্রে প্রতিদিন মুন্নাকে বিছানায় যাইতে দেখিয়া তবে তিনি চলিয়া যান, কি জানি তাহা না হইলে মুন্না যদি না শুইয়াই রাত কাটায়। মুন্না বিছানায় শুইলে তিনি দ্বারে আসিয়া খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকেন, যতক্ষণ না মনে হয় মুন্না নিদ্রার কোলে বিশ্রাম পাইয়াছে ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। স্তব্ধ নিশীথিনী ঝাঁঝাঁ করিতে থাকে, খোলা বারান্দা দিয়া তাঁহার চোখের উপর রাশি রাশি তারা জ্বলিতে থাকে, তিনি তাহার দিকে চাহিয়া তখন মনেকরেন যদি সকালে উঠিয়া মুন্নার মুখখানি ঐ তারাগুলির মত

হাসি হাসি দেখিতে পান। ঐ ইচ্ছায় তাঁহার নিরাশ-হৃদয়ও তখন আশা পূর্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু সকালে আসিয়া যখন আবার মুন্নার সেই একই রকম শুষ্ক-মলিন ভাব দেখিতে পান, তখন অতি কষ্টে তাঁহার চোখের জল থামাইতে হয়। কাজকর্ম্মে শয়নে স্বপনে মসীনের কেবল যেন এই এক ভাবনা কিসে মুন্নাকে সুখী করিবেন, কি করিয়া মুন্নার মুখে হাসি ফুটিবে। তাই বুঝি আজ সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া জাগিয়া মসীন সেইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, বাসনার-মায়ায় মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা তাঁহার চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, স্বপ দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় আশায় সতেজ হইয়া উঠিল, তিনি আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মুন্নার সেই ছবি দেখিতে আসিলেন—কিন্তু আসিয়া কি দেখিলেন, যেন মুন্না কাঁদিতে ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিল। মসীনের নিরাশ হৃদয়ের অন্তস্তলে তখন এই কথাগুলি ধ্বনিত হইল—"ভগবান, বিশ্বপাতা, এখনো কি এ হৃদয় স্বার্থ শূন্য হয় নাই? এ ভালবাসায় একজনেরও অশ্রুজল মুছাইতে পারিলাম না প্রভু।"

একটি কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে মসীন মুন্নার কাছে আসিয়া বসিলেন—অন্যদিন হাজার কষ্ট থাকিলেও না হাসিতে হাসিতে মসীন গৃহে প্রবেশ করিতেন না, আজ আর তাহা পারিলেন না, বড় আশা করিয়া ছিলেন, তাই নিরাশ হইয়া প্রাণে বড় ব্যথা বাজিয়াছে।—তাঁহার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুন্না আস্তে আস্তে বলিল—"মসীন কিছু কি হয়েছে"—মসীন হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "না মুন্নি, কিছু না" মুন্নার সে কথায় বিশ্বাস হইল না, মুন্না বুঝিল মসীনের কি কষ্ট, মুন্নার প্রাণের ভিতরহইতে আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, মুন্না চুপ করিয়া রহিল।

সংসারে এমন হৃদয় ঢালা নিঃস্বার্থ স্নেহ কে কাহাকে দিয়া থাকে, এমন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী কে কাহার আছে? এ অকৃত্রিম স্বর্গীয় স্নেহের প্রতিদান মুন্না কি দিল। মসীন তাহার কাছে আর কিছু চাহেন না, তিনি কেবল তাহার হাসিমুখ দেখিতে চান, কিন্তু অভাগী মুন্না এমনি সুখশান্তিহীন হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছে যে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু মসীন যাহা চান তাহা দিতে পারে না। যদি সংসারে সে একজনকেও সুখী করিতে পারিল না, কেন তবে মুন্নার মরণ হয় না, বিধাতা কেন তবে, কি উদ্দেশে তাহাকে তুমি এ সংসারে পাঠাইলে?"

মুন্না দেখে মসীনের স্নেহ অসীম, তাহার স্নেহ অতি ক্ষুদ্র, মসীনের হৃদয় নিঃস্বার্থ, তাহার হৃদয় স্বার্থভরা। ক্ষুদ্র প্রেম-হৃদয় ধরিয়া সে তবে অনন্তপ্রেমের প্রতিদান কি করিয়া দিবে; স্বার্থভরা হৃদয় লইয়া নিঃস্বার্থ হৃদয়কে সুখী করিবে কি করিয়া? সে আরো মসীনের শুভ্র নির্ম্মল প্রাণের সুখ আপনার স্বার্থের মলিনতা দিয়া দিন দিন ঢাকিয়া দিতেছে, তাহার অশান্তির আঁধার দিয়া মসীনের চিরহাসিময় প্রাণের শান্তি নষ্ট করিতেছে। মুন্না যতই এইরূপ

করিয়া ভাবিয়া দেখে তাহার আপনার উদ্দেশ্যহীন ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি ততই বিষম ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়, বাঁচিতে আর একটুও ইচ্ছা হয় না।

ভাইবোনে দুজনে মনে আঁধার লইয়া নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে মসীন বলিলেন "রাত হয়েছে মুন্না শুবিনে ?" মুন্না বলিল "হাঁ যাই" সে আর যেন কিছু বলিতে পারিল না, একটু পরে উঠিয়া শুইতে গেল, মসীন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহির বাটীতে আসিয়া আর মসীনের শুইতে ইচ্ছা হইল না, তখন রাতও অধিক হয় নাই, তিনি রাস্তায় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### শান্তি।

রাস্তার জীবন্ত ভাব একেবারে নিভিয়া যায় নাই, পথ ঘাট এখনো জনশূন্য হয় নাই, দোকানে এখনো কেনা বেচার গোল-মাল চলিয়াছে, রজনার শান্তপ্রাণ শিহরিয়া দিয়া রাস্তার ধারের এক একটা বাড়ী হইতে থাকিয়া থাকিয়া পৈশাচিক হাস্যধ্বনি সবলে উত্থিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এমনি উচ্চরবে কুকুর কতকগুলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে—যেন তাহাদের পশু প্রাণে সেই ভীষণ হাস্য-চীৎকার আর সহে না। দু একজন ভিকারী রাস্তায় ভিক্ষা মাগিয়া যাইতেছে, দু একজন বা গাছ তলায় বসিয়া হাত পাতিয়া করুণস্বরে পথিকের দয়া-উদ্রেক করিতেছে।

মসীন চারিদিকে চাহিয়া কোথায় শান্তি দেখিলেন না, গৃহে যে অশান্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখানেও যেন তাহাই বিরাজ করিতেছে—যেন—

সেই সব সেই সব—"সেই হাহাকার রব,
সেই অশ্রু বারিধারা হৃদয় বেদনা।"

তিনি ভাবিলেন—যদি চারিদিকেই দুঃখ—তবে কোথায় সুখ ? যদি সুখ কোথায় নাই, তবে লোকে সুখ চাহে কেন ? জীবনই যদি দুঃখময় তবে লোকে দুঃখে কাতর কেন ? সংসার যখন দুঃখময় হইয়াছে তখন কি সুখময় হইতে পারিত না ? যিনি ইচ্ছায় কীট পতঙ্গ, পশু মনুষ্য, সূর্য্য নক্ষত্র, দ্যুলোক ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি সংসার দুঃখহীন হইত না ? তাহা হইল না কেন ? এ দুঃখের কি তবে গূঢ় উদ্দেশ্য ? কিম্বা এ দুঃখ তিনি দেন নাই, আমরা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত বিপথে গিয়া দুঃখকে ক্রমাগত সুখ বলিয়া ধরিতে যাইতেছি। হয়ত বা সুখ দুঃখ কিছুই নাই, আমরা মনে মনে নিজে নিজে সুখ দুঃখ গড়িয়া লইতেছি মাত্র। আমরা নিজে নিজে! সে আবার কি ? আমার নিজত্ব কি সেই বিশ্বপাতা হইতে স্বতন্ত্র ? তাঁহা হইতে আসিয়াছি, তাঁহাতে রহিয়াছি, তাহাতে যাইব, যদি তাঁহাতেই যাইব—তাঁহাতেই ছিলাম, আর তাঁহাতেই রহিয়াছি—তবে এ স্বতন্ত্র-জ্ঞান কেন ? তবে স্রষ্টার একি লীলা খেলা ? কেন তবে এ কিসের মায়া ? এ মায়ার উৎপত্তির কি আবশ্যক, স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির

কি স্বতন্ত্র আবশ্যক ? কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই জন্ম, এই মৃত্যু এই সুখ এই দুঃখ ? কেন এ পাপ তাপ, শোক মোহ—কেন এ সব, কেন সংসারের এই অনন্ত চক্রে এই নিদারুণ পীড়ন ?

সেই গম্ভীর তারকা খচিত নভোমণ্ডলের নীচে দাঁড়াইয়া মহম্মদ এই প্রশ্ন মীমাংসায় আকুল হইয়া বুঝিলেন—উহা তাঁহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত, ঈশ্বরের অনন্ত পূর্ণ নিয়মের কাছে—কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক তাহা অপূর্ণ জ্ঞান দিয়া কে বুঝিতে পারে ? কে বলিতে পারে—এ সৃষ্টির আবশ্যক ছিল না, মঙ্গলময় পরিণামই এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে, কে বলিতে পারে এই দুঃখ তাপ সেই অনন্ত সুখ মঞ্চে উঠিবার এক একটি সোপান নহে।

মসীন গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া ভিকারীদের ভিক্ষা দিতে দিতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, একটী গাছ তলায় একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যাইতেছেন—দেখিলেন—একজন মলিন বসনা স্ত্রীলোক সেই ভিক্ষুকের কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"কিছু কি পেলে ? না আজও উপবাসে যাবে ?

অন্ধ ভিক্ষুক তাহার ভিক্ষার ঝুলিটি স্ত্রীলোকটির হাতে প্রদান করিল। সে শশব্যস্তে তাহার ভিতরে হাত দিয়া নাড়িয়া যখন আন্দাজ দুই তিন কুনকা চাল আর কতকগুলি কড়ি মাত্র দেখিতে পাইল তখন হাড়ে জলিয়া উঠিয়া বলিল—"এই তুমি পেয়েছ বটে, এতে ১০। ১২ টা আণ্ডা বাচ্ছার পেট ভরবে ?—খাওয়াতে পারবিনে—তবে বিয়ে করলি কেন ? ভগবান, এমন অদৃষ্ট করেও জন্মেছিলুম।"

বলিয়া সে অদৃষ্টকে গালি পাড়িতে পাড়িতে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল, অন্ধ বলিল—"দোহাই তোর, কাঁদিসনে যখন বিয়ে করি, তখন কি আর কানা হব জানতুম ছাই। তবে আর একটু বসে থাকি—"

মহম্মদের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল—এ কি সংসার ! এই বিশাল সংসারের কোথাও কি প্রেম নাই, কোথাও শান্তি নাই ! কোথাও দুঃখে দুঃখ নাই, কষ্টে মমতা নাই—কেবলি যন্ত্রণার প্রতি দারুণ উপহাস, ন্যায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, এ কি এ গূঢ় রহস্য লইয়া, যন্ত্রণা বেদনার অট্ট হাস লইয়া পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে"।

মহম্মদ তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকটির হাতে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বলিলেন—বাছা-এই লও, এবার হইতে তোমাদের ভরণ পোষণের ভার আমি লইলাম।

সে কথা অন্ধের কাণে সঙ্গীতের ন্যায় প্রবেশ করিল, সে স্বর অন্ধ ভোলে নাই, আর একদিন এই স্বর তাহার কাণে গিয়াছিল—এই স্বর তাহার কাণে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সে মহম্মদকে চিনিতে পারিল, আহ্লাদে কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পুরিয়া গেল—সে বলিল "জয় হোক—জয় জন্ম কার হোক। একবার তুমি বাবা, বাঁচাইয়াছিলে ভগবান আবার তোমাকেই পাঠাইয়া দি-

লেন”—ব্রাহ্মণীও পূর্ণ হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সেই গরীব অনাথাদিগের সুখের আশীর্ব্বাদে মসীনের হৃদয় এত উথলিয়া উঠিল, তাহাদের শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইতে পারিয়া তিনি আপনাকে এত ধন্য মনে করিলেন, এত আনন্দিত হইলেন, যে এক-জন সম্রাটের আলিঙ্গনেও তিনি সেরূপ কৃতার্থ হইতেন না।

মহম্মদের হৃদয় বিমল-করুণায় পূর্ণ, নিঃস্বার্থ প্রেমের আধার। ভালবাসা ছড়াইয়া করুণা বিলাইয়া সে করুণার সে প্রেমের আর তাঁহার ক্ষয় হয় না, দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তিনি যত প্রেম ঢালেন ততই তাহা আরো বেগে উথলিয়া উঠে, আকাশের মহা-সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের প্রেম ভাণ্ডার যেন অক্ষয় অনন্ত, দান করিয়া বিতরণ ক-রিয়া তাহা ফুরান যায় না। এ পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়া অন্যের কষ্ট দূর করিয়া তাঁহার আশ মিটে নাই। তিনি চান অন্যের সমস্ত দুঃখ ঘুচাইয়া ফেলেন, কিন্তু যখন দেখেন তাহাতে তিনি অক্ষম—তিনি জীবন দিলেও কাহাকে পূর্ণ সুখী করিতে পারিবেন না, তিনি ত অতি তুচ্ছ, কত শত পুণ্যাত্মা মহাত্মা অকা-তরে আত্মদান করিয়াও মানুষের পূর্ণ সুখ ফিরাইতে পারেন নাই—তখনই মহম্মদের যেন শান্তি চলিয়া যায়। অন্যের সুখ দুঃখে তিনি এতটা আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়েন—যে সে সমুদ্রে নিজের সুখ দুঃখ একটি জল-বিম্বের মত মিলাইয়া যায়।

মহম্মদের চিন্তা সহসা ভঙ্গ হইল—অদূরে কাহার ক্রন্দন-শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া একটী কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন—দ্বার খোলা দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, একজন রোগীর শিয়রে বসিয়া একজন বৃদ্ধা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। মহম্মদকে দেখিয়া বৃদ্ধার কান্না থামিল—ব্যগ্রভাবে বলিল—“তুমি কি ডাক্তার গো, আমার ছেলেকে দেখতে এলে। একবার ফকীরজির পায়ের ধূলা নিয়া বাঁচিয়েছি, এবার তুমি বাঁচাও গো” মহম্মদ বৃদ্ধাকে চিনিলেন। বৃদ্ধার কান্নায় রোগী বিরক্ত হইয়া বলিল—“কেবল সেই অবধি মরব মরব করতে লেগেছে—আ-মাকে না মেরে ফেলে কি ছাড়বি নে—” বৃদ্ধা বলিল, বালাই ও কথা বলিস কেন।” মহম্মদের চিকিৎসাবিদ্যাও কিছু কিছু আ-সিত, গরীব দুঃখীদের দেখিবার জন্যই তিনি ইহা একটু শিখিয়া রাখেন। মহম্মদ রোগীর কাছে আসিয়া তাহার মাথায় গায় হাতদিয়া দেখিলেন। তাহার পর অঙ্গাবরণ হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া তখনি তাহাকে এক মোড়ক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, আর পরে কখন কিরূপে খাওয়াইতে হইবে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ঔষধের কৌটাটি বৃদ্ধার হাতে দিলেন। তাঁহার এরূপ সাহায্য এই প্রথম নহে, অনেক দিন হইতে গরীবদিগকে এইরূপে তিনি সাহায্য করিয়া আসিতে-ছেন। কিছু টাকা ও অল্প স্বল্প ঔষধ সঙ্গে না লইয়া মহম্মদ রাস্তায় বাহির হইতেন না। কৌটাটি বৃদ্ধাকে দিয়া বলিলেন” ভয় নাই, সামান্য রোগ মাত্র। এই ঔষধেই আরাম

হইবে—আমি কাল সকালে আবার ডাক্তার পাঠাইয়া দিব—”

বুড়ি বলিল—“আহা তাই বল বাছা তাই বল। আহা কি দয়ার শরীর গো আর এক-বার এমনি একজনের দয়া দেখেছি” বলিতে বলিতে বুড়ি যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল —আহ্লাদে চীৎকার করিয়া তাঁহার পদ-তলে পড়িতে গেল, মহম্মদ হাত ধরিয়া উঠা-ইয়া লইলেন। বুড়ি বলিল—বাবা তুই এসে-ছিস বাবা, আমার অকুল পাথারের কাণ্ডারী বাবা, তুই এসেছিস—” আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক ছিল না, বৃদ্ধার সেই সরল হৃদয়ের সুখপূর্ণ কৃতজ্ঞতাউচ্ছ্বাস মহম্ম-দের প্রাণে সুখের ঢেউ তুলিল। বৃদ্ধার ভগ্ন প্রাণ সবলে বাঁধিয়া যখন মহম্মদ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন তখনো তাঁহার সেই সকল দৃশ্য মনে জাগিতে লা-গিল, অন্ধের সেই কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস মনে পড়িতে লাগিল,—একটি অপূর্ব্ব শান্তির ভাবে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল, এ-কটু একটু করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়ি-লেন।

বৃদ্ধা রাত্রে আর একবার ঔষধ খাও-য়াইবার জন্য যখন কৌটা খুলিল তখন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল ঔষধের সঙ্গে কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা।

---

# নিরামিষ ভোজন।
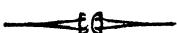
ছাত্র। মহাশয় মাংস ভোজন করাটা ভাল না মন্দ।

শিক্ষক। সিংহ ব্যাঘ্রের পক্ষে ভাল কিন্তু গরু ছাগলের পক্ষে ভাল নয়।

ছা। আমি পশুদের কথা কহিতেছি না, মনুষ্যের পক্ষে উহা উপযোগী কি না?

শি। যেমন পশুজাতির সকলের পক্ষে এক নিয়ম খাটে না সেই রূপ মনুষ্যদের সক-লের জন্য এক নিয়ম খাটে না। মাংস ভো-জন কাহারো পক্ষে ভাল আবার অন্যের পক্ষে মন্দ। যে সকল মনুষ্য এখনও অসভ্যাব-স্থায় আছে তাহারা মাংস ভোজনেই দিন পাত করে, কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জের উপর দিন পাত করিলে তাহাদের শরীর ধারণ করা কষ্টকর হয় সুতরাং মাংস ভোজন তাহাদের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে নিরা-মিষাশী হইয়াও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যায় সে অবস্থায় মনুষ্য মাংস ভোজন করিয়া উদরকে কবরস্থান রূপে পরিণত করিবে ইহা আমি ভাল বিবেচনা করি না। যাঁহার মাংস ভোজনে প্রয়োজন আছে তিনি মাংস ভক্ষণ করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহার জীবন ধারণের জন্য মাংস ভোজন প্রয়োজনীয় নহে, তিনি যদি রসনা তৃপ্তি করিবার জন্য আমিষাশী হন তবে তিনি তাঁহার উন্নতির পথে কণ্টক দেন।

ছা। আমি বিলাতী ডাক্তারদের নিকট

হইতে জানিয়াছি যে মাংসে পুষ্টিকর নাই-ট্রোজিন্স পদার্থ বেশী আছে, এবং সেই জন্য মাংস ভোজনে শরীর পুষ্ট ও সবল হয় সুতরাং শরীরে উপযুক্ত সামর্থ্য রক্ষার জন্য উহা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়।

শি। নাইট্রোজিন্স পদার্থ শরীরে প্র-বেশ করাইলেই যদি দেহের পুষ্টিসাধন হইত তবে আদত নাইট্রোজন আর অক্সিজন যা লইয়া নাইট্রোজিন্স পদার্থ নির্ম্মিত, তাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারিলেই শরীরের পুষ্টি সাধন হইতে পারিত। অস্থিতে চুন আছে, খানিক চুন খাইলেই কি অস্থির পুষ্টি সাধন হইতে পারে। শরীরের ভিতর যদি এমন ক্ষমতা থাকিত যে তদ্দ্বারা ঐ চুণকে অস্থি-সূত্র পদার্থে পরিণত করিতে পারিত তবেই চুন খাইলে অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। সেইরূপ মাংস ভোজন করা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে গেলে মাংসে কি কি, কেমিক্যাল এলিমেণ্ট' আছে তাহার অন্বেষণের বেশী দরকার নাই। যিনি ভোজন করিবেন তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শ-ক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। গরুকে মাংস খাওয়াইলে সে কখন বলিষ্ঠ হইবে না! কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে। আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই জন্য যাহার মাংস ভো-জন প্রয়োজন তাহার পক্ষে মাংস ভোজন বিধি আর যাহার তাহা প্রয়োজন নাই তাহার পক্ষে অবিধি।

ছা। আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

শি। মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু শরীর-সঞ্চালন বা মন চালনা দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাই মনুষ্যের জীবন। যেমন বাষ্পের তেজ-শক্তি কলের গাড়ীর গতিরূপ কর্ম্মে পরিণত হয় সেইরূপ মনুষ্য বা জীবজন্তু যে সকল কর্ম্ম করে তাহা দ্বারা আভ্যন্তরিক শক্তির (energy) ব্যয় হয়। এই ব্যয় পূরণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন। ভোজ্য দ্রব্য শরীর যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা রূপ শারীরিক রসাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় পরে নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত অম্লজান বাষ্পের সহিত রাসায়নিক সংযোগে এবং তড়িত, আকর্ষণ ইত্যাদি শক্তির বশে সম্পূর্ণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে কাষ্ঠ যখন পূর্ণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তখন যেমন তাহা হইতে তেজশক্তি নির্গত হয় ভুক্ত দ্রব্যও সেইরূপ যখন নানা-রূপ পদার্থের সংযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তখন সেই ভুক্তদ্রব্যস্থ অন্তর্নিহিত শক্তি (Potential energy) বাহ্যে (Kinetic energy) প্রকটিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই শরীরের তাপ, ম্যাগনেটিজম ইলেক্‌ট্রিসিটি ইত্যাদি স্থূলজাতীয় শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি, কল্পনা শক্তি ইত্যাদি সূক্ষ্ম-শক্তিও উদ্ভূত হইয়া থাকে। স্থূল জাতীয় শক্তির সাহায্যে আমরা স্থূলজাতীয় কর্ম্ম অর্থাৎ শরীর সঞ্চালনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির সাহায্যে মানসিক কর্ম্ম করিয়া থাকি। যাহাকে যেরূপ কর্ম্ম

করিতে হয় সেই কর্ম্মে যে শক্তির ব্যয় হয় যেরূপ আহার দ্বারা সে ব্যয় সহজেই পূরণ করা যায় তাহাই জীবের পক্ষে প্রশস্ত আহার।

ছা। আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা বড় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

শি। বহির্জগতে যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাও তাহা যেমন সকলই এক প্রকারের নয় অর্থাৎ কোন শক্তি তেজরূপ, কোন শক্তি তড়িৎরূপ, কোন শক্তি ম্যাগনেটিজম রূপে কোন শক্তি রাসায়নিক আকর্ষণরূপে প্রকাশ পায় আমার ভিতরেও যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় তাহাও এক রকমের নহে। যে জাতীয় শক্তির বশে হাত নাড়া যায়, যে জাতীয় শক্তির বশে প্রাণ বহিতে থাকে, যে জাতীয় শক্তির বশে ইচ্ছা জন্মে, যাহার সাহায্যে কল্পনা করা যায় ইহারা সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। বহির্জগতে রাসায়নিক শক্তি হইতে যেমন উত্তাপ জন্মে আবার তাপশক্তি হইতে আলোক শক্তি উদ্ভূত হয় কখন বা তাড়িত শক্তি উদ্ভূত হয় আবার সেই তাড়িত হইতে ম্যাগনেটিজম-শক্তি জন্মিয়া থাকে সেইরূপ দেহের ভিতরেও অন্নগত-অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই অবস্থা ভেদে নানারূপ শক্তির উদ্ভূত হয় এবং সেই এক এক প্রকারের শক্তির সাহায্যেই এক এক জাতীয় কর্ম্ম করা যায়। যেমন যে জাতীয় শক্তি দ্বারা রক্ত সঞ্চালন হইতেছে এবং যে জাতীয় শক্তির দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইতেছে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়।

মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের ক্লান্তি যে ভাবের হয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের ক্লান্তি সে ভাবের হয় না ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা বুঝিলে তুমি ইহাও বুঝিতে পারিবে যে মানসিক শ্রমদ্বারা সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির ব্যয় হয় এবং শারীরিক শ্রম দ্বারা স্থূল জাতীয় শক্তির ব্যয় হয়।

এখন আহারের উদ্দেশ্য জীবন ধারণ করা, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহাকে সেইরূপ শক্তি দান করা। সুতরাং যে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা যেরূপ শক্তির ব্যয় করিয়া থাকে যেরূপ আহার করিলে সেইরূপ শক্তি সহজেই উদ্ভূত হইতে পারে সেইরূপ আহারই তাহার পক্ষে প্রশস্ত। সুতরাং ভোজন সম্বন্ধে সকলের পক্ষে এক নিয়ম খাটা সম্ভব নয়।

খড় স্থূলপদার্থ আর ধান শস্য, সূক্ষ্মপদার্থ। মাংস স্থূল পদার্থ আর দুগ্ধ সূক্ষ্মপদার্থ। সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি সূক্ষ্মপদার্থ হইতে যত সহজে পাওয়া যায় স্থূল পদার্থ হইতে তত সহজে পাওয়া সম্ভব নহে। গরুকে সূক্ষ্মজাতীয় কর্ম্ম মানসিক চিন্তাদি কাজ করিতে হয় না কিন্তু মানুষকে তাহা করিতে হয় এই জন্য মনুষ্যে খড় খাইয়া থাকিতে পারে না, চাল খাইতে হয়। ব্যাঘ্র কেবল মাংস ভোজন করিয়া দিনপাত করিতে পারে কিন্তু মানুষে তাহা পারে না, কেননা কেবল মাংস ভোজন করিয়া থাকিলে মাংসের ন্যায় স্থূল জাতীয় দ্রব্য হইতে মানসিক চিন্তার অনুকূল সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি উদ্ভাবন করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

# সিদ্ধি।

নদীতীরে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম, তরঙ্গগুলি কতনা আকুল ভাবে তীরে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাহাদের প্রাণের দুরন্ত বাসনা ঐ শ্যাম-সুন্দর দুর্ব্বাময়-তীরে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া থাকে, নিষ্ঠুর চরণ আঘাতে উপকূল তাহাদিগকে যতই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, ততই আবার আবার, ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই চরণে আসিয়া তাহারা মাথা কোটাকুটি করিতেছে, আর অটল গম্ভীর ভ্রুক্ষেপ-হীন নেত্রে নিষ্ঠুর উপকূল তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে, কটাক্ষে শত শত তরঙ্গ-হৃদয় চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া আপনার মহিমায় আপনি অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। আমিও অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম; প্রাণের এ দারুণ বাসনা কেন উহাদের পূরে না, কত যুগযুগান্তর হইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণপণ করিয়াও কেন তবে উহাদের ইচ্ছা সফল হয় না? সেই দিন বুঝিলাম ইচ্ছা কথাটার অর্থ আমরা ভুল বুঝি, যাহা বাসনা তাহা ইচ্ছা নহে, ইচ্ছায় আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি কিন্তু বাসনায় তাহা পারি না।—অনেক দিন পূর্ব্বে ফরাসিস দার্শনিক এলিফাশ লিবাইএর এই কথাগুলি পড়িয়াছিলাম, The will accomplishes everything which it does not desire. সেই দিন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল, সেই দিন ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, পূর্ব্বে ঐ কথাগুলি একটা যেন অর্থ শূন্য হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আগে যখন সকলের মুখে শুনিতাম ইচ্ছাই সিদ্ধি লাভের উপায়—তখন ভাবিতাম—সত্য বটে ইচ্ছা না থাকিলে কিছু হয় না, কিন্তু ইচ্ছা থাকিয়াই বা আমরা কয়টা কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করি? কিন্তু সেই দিন বুঝিলাম, প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব, তবে যে অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখি—সে কেবল বাসনাকে আমরা ইচ্ছা বলিয়া ভুল বুঝি এই জন্য। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা যেমন দারুণ ভ্রম বাসনাকে ইচ্ছা মনে করা তেমনি দারুণ ভ্রম। বাস্তবিক পক্ষে ইচ্ছা ও বাসনা দুইটি প্রতিদ্বন্দী শক্তি। ইচ্ছার সহিত বাসনা মিশাইয়া দেখ—তখনি সে ইচ্ছার কার্য্যকারিতা কমিয়া যাইবে। যেখানে বাসনার যত প্রভাব সেখানে ইচ্ছার বল তত অল্প। তাই বলিতেছি, সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে ইচ্ছা-হীন ইচ্ছা করা চাই, না চাহিয়া চাহা চাই। কথাটা শুনিতে বিপরীত শুনায় বটে কিন্তু আমার কাছে সেই দিন ইহা অঙ্কশাস্ত্রের সমস্যার মত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখন বলিতে হইবে—ইচ্ছা যদি বাসনা না হয় ত কি? আমিত বলি ইচ্ছা আর কিছুই নহে, কেন্দ্রাকর্ষণী শক্তি, যাহাতে নিজের দিকে আমরা সকলকে টানিতেছি; আর বাসনা কেন্দ্রাতিগ শক্তি, যে শক্তি আমাদিগকে নিজের কাছ হইতে অন্য দিকে লইয়া যাইতেছে, কাজেই ইচ্ছার ও বাসনার সংগ্রাম মধ্যে—যাহার বল অধিক সেই জয়ী

হইবে। যখন বাসনার বিন্দুমাত্র না রাখিয়া আমরা ইচ্ছা করিতে পারিব, তখনই আমরা ইচ্ছামাত্রে সিদ্ধি পাইব।

বাসনা—অর্থাৎ আমি টানিতেছি না—আমাকে অন্যে টানিতেছে। আমি ধনের বাসনা করি, অর্থাৎ ধন আমাকে তাহার দিকে টানিতেছে। আমার প্রতি তাহার এই আকর্ষণের যতই প্রভাব বাড়িতেছে, অর্থাৎ আমার ধনের বাসনা যতই বাড়িতেছে, ততই আমার নিজের তাহার উপর আকর্ষণশক্তি কমিয়া পড়িতেছে—অবশেষে সূর্য্যাকৃষ্ট একটা শক্তিহীন গ্রহের মত তাহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সবলে যখন তাহার উপর ছুটিয়া আসিয়া পড়িতেছি—তখনও সে আমাকে গ্রহণ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে—ঘৃণার সহিত আবার দূরে ফেলিয়া দিতেছে।

প্রকৃতির এই এক মহা নিয়ম—যে যতটা বলে আকৃষ্ট হইবে—ততটা বলে যদি সে আকর্ষণ করিতে না পারে—ত তাহার দুঃখ অনিবার্য্য। তাই ঐ তরঙ্গগুলর মত কত শত হৃদয় তাহাদের নিষ্ঠুর প্রণয়ীর চরণে সমস্ত হৃদয় বলিদান দিয়াও কেবল মাত্র ভ্রুকুটী উপহার পাইতেছে, কত দুরাকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষার আরাধনা করিয়া তাহার পদতলে শুধু দলিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা যে পথে যাইতে চাহে তাহার উলটাই চলিতেছে—যাহার নিকট প্রতিপদে অগ্রসর হইতে চাহে প্রতিপদে তাহার নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে। যে নিয়মে ধূলাটি হইতে সূর্য্য নক্ষত্র পরিচালিত, সেই নিয়মেই এইরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্যকে তুমি দোষী করিতে পার না, নিজের অক্ষমতা, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অজ্ঞতাই তোমার এ কষ্টের কারণ। সেই জন্য বলিতেছি যাহা চাও তাহা চাহিও না তাহা হইলেই তাহা পাইবে—অর্থাৎ যাহা সিদ্ধি ইচ্ছা কর—তাহা কামনা পরবশ হইয়া ইচ্ছা করিও না, অথবা যা একই কথা—যাহা চাও তাহাকে আকর্ষণ কর—তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইও না—তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিবে। এক আকর্ষণেই বিশ্বসংসার চলিতেছে,—তুমি এই যে ক্ষুদ্র—তুমি বিশ্বসংসারকে আকর্ষণে বাঁধিয়াছ, এমন কি একটা অতি ক্ষুদ্রতম অণুও প্রতিক্ষণে সমস্ত বিশ্বের উপর আকর্ষণ বল নিক্ষেপ করিতেছে—তবে কি না বিশ্বসংসারের একত্রীভূত বল এত অধিক যে তাহার নিকট তোমার আকর্ষণ অতি সামান্য হইয়া পড়িয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি অন্যের আকর্ষণের অতীত হইতে পারিবে—সেই মুহূর্ত্তে তোমার আকর্ষণ বল বিশ্বসংসার ছাড়াইয়া উঠিবে। তখন তোমার আকর্ষণের যে কত প্রভূত ক্ষমতা হইবে—তাহা এখন কল্পনাতেও আনা যায় না। এই আকর্ষণাতীত অবস্থাই—যোগী ঋষির সমাধি অবস্থা, কৈবল্যাবস্থা; তখনি পূর্ণ জ্ঞানের উদয়,—যাহার অতীত কোন লাভ নাই—তখনি সেই পরব্রহ্ম লাভ হয়। সংযম—কাহাকে বলে? যখন আমার আকর্ষণ বল বিশ্বসংসারের উপর অধিক—অর্থাৎ বিশ্বসংসার যখন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না আমি তাহাকে আকর্ষণ করিতেছি তখনি আমি সংযত। সুতরাং সংযত অবস্থাতে যে ইচ্ছার প্রভূত শক্তি হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সেই জন্যই স্বার্থ যথার্থ স্বার্থের প্রতিবন্ধক, বাসনা ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী, সিদ্ধিলাভের বিঘ্ন। এই জন্যই আর্য্য মহাত্মাগণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন—কেন না নিষ্কাম না হইলে ধর্ম্ম লাভই ঘটে না।

শ্রী——দেবী।

## প্রয়োনীয় বিজ্ঞাপন।

## হ্যারল্‌ড কোম্পানির

### উন্নতি-সাধিত হার্ম্মণীফ্লুটের মুল্য

অনেক  হ্রাস

করা হইয়াছে।

এই সুমধুর ও চিত্তবিনোদক যন্ত্রের প্রতি সাধারণের আদর দেখিয়া হ্যারল্‌ড কোম্পানি ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অভিনব যন্ত্র বহুল পরিমাণে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইক্ষণে হ্যারল্‌ড কোম্পানি সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছেন যে সেইগুলি এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বরযুক্ত যন্ত্র। ইহা টেবিলের উপরে কিম্বা হাঁটুর উপরে রাখিয়া বাজান যায়। এই যন্ত্র অতিসহজে যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং যেরূপ সহজে শিখিতে পারা যায় তাহাতে সকলেরই ইহার একটি একটি গ্রহণ করা উচিত।

## মুল্য।

৩ অক্টেভ ও একষ্টপের ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কেল যুক্ত বাক্‌স্ হারমনি ফ্লুট নগদ মূল্য ... ... ৩৮৲ টাকা
ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ... ... ৫০৲ টাকা
তন অক্টেভ তিন ষ্টপযুক্ত বাক্‌স হারমনি ফুলট নগদ মূল্য ... ৭৫৲ টাকা
৩½ অক্টেভ এক ষ্টপ যুক্ত... ৯০৲ টাকা
৩½ অক্টেভ তিন ষ্টপ যুক্ত ... ৯৫৲ টাকা

হ্যারলড কোম্পানি এই যন্ত্র বাজাইতে শিখিবার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। সংবাদ পত্র সকল ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এই পুস্তকের নাম "কিরূপে শিক্ষক ব্যতিরেকে হ্যারল্‌ড কোম্পানির হার্ম্মণী ফ্লুট বাজাইতে শিখা যায়" ইহার মূল্য ৩ । এই পুস্তকে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী গত-সকল বিবৃত আছে। ইহাতে যন্ত্রের একটি প্রতিকৃতি ও স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যে কোন সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পক্ষণ অভ্যাস করিয়া এই যন্ত্রের যে কোন গত-বাজাইতে পারেন।

কেবল মাত্র হ্যারলড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হ্যারলড কোম্পানি ৩ নং ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা।

# নিরামিষ ভোজন।

(জ্যৈষ্ঠ মাসের পর।)

ছা। সকল ভোজ্যপদার্থেই ত অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এবং সেই শক্তি ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রূপে পরিণত হইতে পারে, তবে স্থূলপদার্থ হইতে সূক্ষ্মশক্তির প্রকাশ হওয়া কি অসম্ভব?

শি। অসম্ভব নহে, কিন্তু দুরূহ। চুম্বকের নিকট লোহা রাখিলে তাহাতে চৌম্বকীয় শক্তির প্রকাশ হয় কিন্তু কয়লা রাখিলে হয় না। কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি চৌম্বকীয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে না এমন নহে। সেইরূপ আমাদের দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধস্থ শক্তি যত সহজে সূক্ষ্মশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে মাংসস্থ-শক্তি তত সহজে সূক্ষ্মাবস্থা পায় না।

মাংস ভোজন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে মাংসভোজনে স্থূলকর্ম্মের অনুকূল-শক্তির বেগ যেরূপ বেশী হয়, নিরামিষ ভোজনে সেরূপ হয় না। ব্যাঘ্রের শক্তির বেগ আর হস্তীর শক্তির বেগ তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। ব্যাঘ্রের বল হস্তীর বল অপেক্ষা বেশী নহে, কিন্তু উহার বেগ বেশী। ব্যাঘ্রের নিশ্বাস যেরূপ খরতর বহে তাহা তুমি দেখিয়াছ। মাংস ভোজনে নিশ্বাসের বেগ খরতর হয়। যুদ্ধাদি কর্ম্মে শারীরিক স্থূল শক্তি বেগবান্ হওয়া প্রয়োজন, যুদ্ধাদি কার্য্যে-লিপ্ত-যোদ্ধার শ্বাসও খর বহিতে থাকে এই জন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাঁহারা স্থূলজাতীয় শক্তির বেগ কমাইতে ইচ্ছুক, যাঁহারা তাঁহাদের অভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবাপন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশে যত্নবান্ হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন করা শ্রেয় নহে।

দেখ কোন দ্রব্য ভোজন করা কাহার পক্ষে ভাল আর কাহার পক্ষেই বা মন্দ তাহা স্থির করিবার জন্য আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে একটি যন্ত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু আমরা আপনাদের দোষে সেই যন্ত্রটি এমনি খারাব করিয়া ফেলিয়াছি—যে তাহার সাহায্যে আহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বড় ঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ছা। সে যন্ত্রটি কি?

শি। সে যন্ত্রটি আমাদের রসনেন্দ্রিয়। দেখ পশুদের রসায়নশাস্ত্রও নাই এবং তাহাদের মধ্যে এমন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও কেহ নাই যে খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে কোন খাদ্য দ্রব্য তাহাদের পক্ষে ভাল আর কোনটিই বা মন্দ অথচ তাহারা আপনাদের রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য-

সম্বন্ধে যেরূপ [illegible] বিচার করিয়া লয় সে বিচারে ত ভুল হয় না। কিন্তু মনুষ্য আপন দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ সেই যন্ত্রটির কল বিকল করিয়া ফেলিতেছে। অনন্ত প্রকৃতি মনুষ্যকে ইন্দ্রিয় সকল যে কারণে দিয়াছেন মনুষ্য সে কারণে তাহার ব্যবহার করে না বলিয়াই মানুষ এত গোলে পড়িতেছে।

বাহ্যজাতীয় পদার্থের অন্তঃস্থলস্থ শক্তির সৌন্দয্য বিচার করিয়া কিরূপ পদার্থ কাহার উপযোগী ইহা স্থির করিবার জন্যই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল মনুষ্য আপাত-সৌন্দর্য্যে, উপরের চাকচিক্যে এত মুগ্ধ হইয়াছে যে তাহারা স্বভাবজাত-বাহ্যজাতীয় পদার্থ কুৎসিত হইলেও তাহার উপর অন্য একটা সুন্দর আবরণ দিয়াই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কুৎসিত রমণীগণ অলঙ্কারের সাহায্যে মুখে পাউডার মাখিয়া মানুষের মন হরণ করিতে সমর্থ হইতেছে; যে সকল স্বভাবজাত-পদার্থ স্বভাবতঃ মনুষ্য রসনার উপাদেয় নহে তাহাই নানাবিধ মসলা প্রভৃতির সহযোগে সুন্দর সুখাদ্য হইয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতেছে। মনুষ্যরসনা এইরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্য কৃত আপাত-তৃপ্তিদায়ক সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আস্বাদন লইতে আর ব্যস্ত নহে তাই এখন কেমিষ্ট্রির সাহায্যে মানুষকে বিচার করিতে হয় কোন্ আহার ভাল আর কোন আহার মন্দ। সে দিন একখানা ইংরাজী কাগজে দেখিতেছিলাম যে একজন ডাক্তার অস্থির অভ্যন্তরস্থ কেমিক্যাল এলিমেণ্ট সকল পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে জানাইতেছেন যে অস্থিতে যে সকল পদার্থ আছে দেখা যাইতেছে তাহাতে অস্থিভোজনে মনুষ্যদেহ বিশেষ পুষ্ট হইতে পারে। কাগজখানি পড়িয়া আমার বড় হাসি পাইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভাবিয়াছিলাম হায় কতদিনে এই রকম ডাক্তারের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

কোন খাদ্য দ্রব্য খাওয়া উচিত আর কোনটিই বা উচিত নয় তাহা বিচার করিতে গেলে কি করা উচিত বলি শুন। স্বভাবজ যে সকল খাদ্যদ্রব্য অতি সামান্য রকমে রন্ধন করিয়া রসনা তৃপ্তিকর হয় তাহাই প্রশস্ত আহার জানিও। আর পঞ্চাশ রকম মসলা দিয়া নানারূপ কারখানা করিয়া হালের পাকপ্রণালী নামক অপদার্থ সেই বই খানা হাতে করিয়া দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া মুখরোচক আহার প্রস্তুত করিলে তোমার রসনা তোমার খাদ্যের গুণাগুণ বলিয়া দিবে না।

এখন দেখ মাংস ভোজন কখন ভাল। ব্যাঘ্রের নিকট কাঁচা চাল রাখিয়া দাও ও মাংস রাখিয়া দাও ব্যাঘ্র তাহার রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার উপযুক্ত যে আহার তাহাই বাছিয়া লইবে। কাঁচা মাংসে তাহার দুর্গন্ধ ঠেকে না সেই দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য সে মাংসে পেঁয়াজের রস ঢালে না, ক্ষুধার চোটে অতি সুস্বাদু জ্ঞানে সে সেই কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। একজন ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কাছে কাঁচা চাল দাও

আর কাঁচা মাংস দাও। সে কোনটা খায় দেখ। যদি সেই কাঁচা মাংস খাইতে তাহার অধিক প্রবৃত্তি দেখ তবেই জানিও যে তাহার পক্ষে মাংস চাউল অপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যদি কাঁচা মাংসে বড়ই ঘৃণা হয় তবে নিশ্চয় জানিও যে প্রকৃতি তখন এই উপদেশ দিতেছেন যে দেখ ক্ষুধার্ত্ত, এই মাংসে যে শক্তি এখন রহিয়াছে সেই শক্তিকে তোমার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তোমার উপযোগী কার্য্যকারী-শক্তিতে পরিণত করা তোমার পক্ষে দুরূহ ও ক্লেশদায়ক হইবে, কেন না ঐ উভয়বিধ শক্তিতে সামঞ্জস্য নাই সামঞ্জস্য থাকিলে তুমি উহাকে ঘৃণা করিতে না।

আসল কথাটি এই যে যদি কাঁচা মাংস খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে অথবা শুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া কোন মসলা না দিয়া মাংস খাইতে কাহারও ভাল লাগে তবে মাংস তাহার পক্ষে উপযোগী।—

ছা। শুদ্ধ সিদ্ধ মাংস মসলা না দিয়া আমি ত সাতজন্মেও খাইতে পারি না।

শি। মাংস তবে তোমার খাওয়াই উচিত নহে। বিশেষতঃ মানসিক শক্তির ক্রিয়াই যখন তোমাকে বেশী করিতে হয় তখন তোমাকে আমি মাংস খাইতে নিষেধ করি।

মাংস ভোজনের একটি মহৎ দোষ আছে সেইটি তোমায় বলি শুন। বেশী মিষ্ট খাইলে যেমন জল খাইতে ইচ্ছা করে যাহারা মাংস খায় তাহাদের সেই রূপ মদ্য সেবনে ইচ্ছা হয়। এইজন্য মাংস আর মদ্য এ দুইটি সদাই একসঙ্গে বেড়ায় ইহাই দেখা যায়। মনুষ্যকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে হয় মাংস ভোজনে তাহার অনুযায়িক সূক্ষ্ম শক্তির প্রকাশ দুরূহ হওয়াতেই মদ্যের সাহায্য লওয়া মনুষ্যের প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অতীতকালের মনুষ্যজাতি এবং বর্ত্তমানের মনুষ্যজাতির মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে যেখানে মাংস, মদ্যও সেইখানে আছে। এমন অনেকে থাকিতে পারেন যে যাঁহারা মাংসাশী অথচ মদ্যপ নহেন কিন্তু মদ আর মাংসের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার এতদূর দৃঢ় প্রত্যয় যে আমার বোধ হয় যাঁহারা মাংসাশী অথচ নিজেরা মদ্যপ নহেন তাঁহাদের সন্তান সন্ততির অন্তরে মদ্যপানের স্পৃহা প্রকাশ হইবে।

আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্য ও মাংস সেবনে কাটাইয়া ছিলেন। শরীর নানা প্রকার রোগে রুগ্ন হওয়ায় তিনি মদ্যসেবন ত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু মাংসভোজন ত্যাগ করিলেন না। ইহাতে এই ফল ফলিল যে তিনি মদ্যসেবনের স্পৃহা কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইল না। পরে এক দিন মদ্য ও মাংস উভয়ই পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মাংস ভোজন না করায় মদ্যসেবনের স্পৃহাও ক্রমে কমিয়া আসিল। এইবারে তিনি প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হইলেন। আমি জানি মাংস ভোজন বন্ধ করিয়া অবধি তিনি এক ফোঁটাও

কত হতভাগ্য নর নারী
হৃদে পুষি দারুণ হুতাশ,
কাটাইছে দিবস যামিনী
নাহি তার বাহিরে প্রকাশ।
প্রলয় ঝটিকা ধরি মনে
নাহি ফেলে একটি নিশ্বাস,
আঁধার মরম অতি ঘোর
অধরেতে হাসির বিকাশ।

তব সম কত অশ্রু সিন্ধু
লুকায়ে রয়েছে ধরি বুকে
এক ফোঁটা জল তার তবু
উথলে না নয়নে সে দুঃখে।
জলধিগো,
দুঃখনাই জ্বালা নাই তবে
কেন কাঁদ সারাদিন ধরে
কিছুরি অভাব নাই তব—
কেন কাঁদ কাঁদিবারি তরে ?

---

# সুলোচনা।

আমার অনেক বন্ধু ছিল—অনেক বন্ধু অনেক রকমের। কিন্তু সকলেরই সহিত আমার সমান সদ্ভাব ছিল। সকলে আমায় ভালবাসিত আমি সকলকে ভাল বাসিতাম। কাহারও সহিত শ্মশ্রুপক্ক হইবার দশবৎসর পরে প্রণয়; কাহারও সহিত আমি বালককালাবধি খেলিয়া আসিয়াছি; পরস্পরের মায়ের বক্ষে পরস্পরে স্তনপান করিয়াছি; পরস্পরের মাকে পরস্পরে মা বলিয়া ডাকিয়াছি; পরস্পরের মায়ের আদর পরস্পরে পাইয়াছি; পরস্পরের মাতার চুম্বনে পরস্পরের কপোল পবিত্র এবং প্রফুল্ল হইয়াছে। আবার কাহারো সহিত বৃদ্ধবয়সে দাবাবড়ে টিপিতে টিপিতে আলাপ, গুড়ুক্ ফুঁকিতে ফুঁকিতে আলাপ, মাঘমাসে গঙ্গাস্নান কালে "শীতটা এবার বড় পড়িয়াছে মহাশয়" বলিতে বলিতে কাহারো সহিত সখ্যভাবে বদ্ধ হইয়াছি অথবা গ্রীষ্মকালে পোড়া দেবতাকে গালি দিতে দিতে চিত্ত বিনিময় করিয়াছি।—

এইরূপ অনেকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। অনেকেই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতি এবং চিন্তা এক এক সময়ে কতই মধুর! আর তোমরা যে গল্প শুনিবার নিমিত্ত আমাকে ঘেরিয়া বসিয়াছ তাহার স্মৃতি! তাহা থাক্—শোন গল্প বলি। কপোলে তোমাদের ঈষৎ হাসি—নয়নে তোমাদের আলোক—গলে তোমাদের পুষ্পমালা—তোমাদের গল্প বলিতেছি শোন।

প্রথম হইতেই আরম্ভ করি—শৈশব হইতে। আহা, সেই মধুর বালককাল!—স্মৃতির আকাশপটে সেই মধুর তারকা! বর্ত্তমান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু স্মৃতিপটে তেমনি শোভন—তেমনি উজ্জ্বল তেমনি মধুর! তদপেক্ষা শোভন—

তদপেক্ষা উজ্জ্বল—তদপেক্ষা মধুর! হারাণ মাণিক—যখন ছিল তখন ছিল বলিয়া আদর পায় নাই। মৃত বন্ধু!—কে তাহার দোষ স্মরণ করিবে? শৈশব সময় স্মরণ করিতেছি। রাজদণ্ডে চিরনির্ব্বাসিত ব্যক্তি—বিদেশে, বিভূমে, বিভাষীলোকমণ্ডলী মধ্যে—যেমন স্বদেশ স্মরণ করে—সেই নীল আকাশ স্বচ্ছসলীল সংসার কাননে প্রেম-মলয়ে দোদুল্যমানা স্নেহময়ী ভার্য্যা—পুত্র কন্যাদিগকে যেমন স্মরণ করে এবং শিহরিয়া উঠে (পাপী, সেই সকল পদার্থে তাহার আর কি অধিকার? সাবধান চিন্তাও যেন তাহাদের কলুষিত না করে) সেই রূপ আমি স্মরণ করিতেছি। বাইবেলে বলে ঈশ্বর সৃষ্টিকালে আদিপুরুষকে সুরম্য উদ্যান মধ্যে স্থাপনা করিয়াছিলেন। সে উদ্যানে অভাব নাই—সে উদ্যানে ক্লেশ নাই! এই কথার গভীর মর্ম্ম। সকলেই আমরা সেই উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছিলাম, সকলেই সেই সুখসদন হারাইয়াছি। শৈশবকাল—ইদন কানন! সে উদ্যানে অভাব নাই—সে উদ্যানে ক্লেশ নাই। এখন আমার লোলিতমাংস, পলিতকেশ, সেই চঞ্চল ক্রীড়াশীল বালককে স্মরণ করিতেছে। আমার পাপকলুষিত মন সেই সরল সহাস বালকাত্মার ধ্যান করিতেছে। লবণাক্ত সাগর গর্ভে নিমগ্না নদী সেই পর্ব্বতবিহারিণী নির্ঝরিণীকে গভীর কল্লোলে ডাকিতেছে। কিন্তু সেই পর্ব্বতবিহারিণী নির্ঝরিণী পর্ব্বত বিহারী পবন সনে খেলিতেছে; মৃদুস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছে, তীরস্থ প্রসূনমালে শ্যামকেশ বিনাইয়া নাচিতেছে, ভানুকিরণে ঈষৎ হাসিতেছে। সমুদ্র-কন্দর হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া নদী ডাকিতেছে। নির্ঝরিণী খেলিতেছে, নাচিতেছে, মালা পরিতে পরিতে গাহিতেছে। হায় বালক কাল তোমাকে আর পাইব না। তবে স্মৃতি সতি, কাল-নদীতীরে তোমার রাঙা চরণ স্রোতে অবগাহন করিয়া তরুণারুণাভ করপল্লবে বংশী ধরিয়া মধুর অধরে মধুর ধ্বনি কর ত। মধুর নাদে মধুর শৈশব কালকে ডাক ত। মধুর রবে কে আসিল?—মধুর রবে, শৈশব মধুরিমা

## সুলোচনা!

তখন আমার বয়স পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর; রথের দিন, মামার বাড়ী গিয়াছিলাম। একখানি লালপেড়ে কোর-মাথান কাপড় পরিয়া পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। ছোট হাতে একটা বড় ভেঁপু অপর হাতে সন্দেশ কি আর কি ছিল স্মরণ হয় না। এই মাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গাছের ভিজাপাতাগুলি সূর্য্যের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর্দ্র পল্লব হইতে রামধনুক কাটিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে। নীল আকাশখানি—দিগন্তে শাদা মেঘগুলি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বর্ষাবারি নিষিক্ত পৃথিবীর হৃদয় হইতে আনন্দ বাষ্প উঠিতেছে। আমি সেই স্বচ্ছসলিলা পুষ্করণীর ধারে দাঁড়াইয়া আছি। পুকুরের জলে নীল আকাশ কেমন হাসিতেছে। ওমা জলের ভিতর ও

গুলি কি! পায়ের কাছে দুই একটা বেঙ থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইতেছে। নিকটে দুই একটা গেঁড়ি সিং বাহির করিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছে সম্মুখে ফড়িং প্রজাপতি উড়িতেছে। আমি ছোট হাতে একটা বড় ভেঁপু ধরিয়া গাল ফুলাইয়া বাজাইতেছি। ধীরে তখন বাতাস বহিতেছে; ধীরে তখন পুকুরের জল নড়িতেছে; ধীরে তখন লোক কোলাহল কানে আসিতেছে। আমি তখন সব ভুলিয়া গিয়াছি—কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ঠাকুরমাকে যে বলিয়া আসিয়াছিলাম তোমাদের বাড়িতে আর আসিব না তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। আমি কেবল সেই ফড়িং প্রজাপতি দেখিতেছি। আমি কেবল সেই পুকুর গাছ লতা পাতা দেখিতেছি। আমি কেবল সেই প্রাসাদ-বিরহিত-হরিদ্বর্ণ-ভূমি-পরিসর দেখিতেছি।

তখন সে ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়িগুলিতে নামিতেছে। আমি প্রায় যেখানে জল সেইখানে দাঁড়াইয়া আছি। সে দুটি সিঁড়ি উপরে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তাহাকে চিনি না—সে আমাকে চিনে না। বাম হস্তে তাহার একটি নূতন রংচঙ্গে কাঠের পুতুল—দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ কর্ণের উপরিস্থ কেশে আবদ্ধ। কপোলে শিশু যেমন শিশু দেখিয়া হাসে সেই হাসি। দুটি সিঁড়ি উপরে দাঁড়াইয়া—ডাগর নয়ন দুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ছোট হাতে বড় ভেঁপু ধরিয়া গাল ফুলাইয়া বাজাইতেছি।

## সেই স্থলোচনা!

নিকটে একটা বড় প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিল। আমি ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। স্থলোচনাও দৌড়িল। প্রজাপতি পুকুরের এধার ওধার করিয়া উড়িতে লাগিল। আমি সর্ব্বত্র ভয়ে যাইতে পারিলাম না। স্থলোচনা এ গাছটি সরাইয়া, ও গাছটি নাড়িয়া, বেড়ার মধ্যদিয়া গলিয়া, ঝোপের আড়াল হইতে উঁকি মরিয়া প্রজাপতিটি ধরিয়া আনিয়া আমাকে দিল।

পরণে একখানি ডুড়ে শাড়ী; হাতে দুগাছি সোনার বালা; পায়ে ছোট ছোট দুগাছি মল; নাকে একটি জল্‌জলে নোলক দুল্‌দুল্ করিতেছে। আসিয়া আমাকে বলিল "এই ধরিয়াছি—প্রজাপতি নাও"। "পদ্মপুকুরে আরো ভাল অনেক প্রজাপতি আছে—ফড়িং আছে চল ধরিগে" পদ্মপুকুরে গিয়া কত প্রজাপতি কত ফড়িং কত বিবিধ বর্ণের কীট পতঙ্গাদি দেখিলাম; কত পদ্মের ফোঁপল খাইলাম। কত দোয়েল পাপিয়ার মিঠা গান শুনিলাম। "স্থ" আমাকে কত ফুল তুলিয়া দিল।

অয়ি বর্ষা-সমাগম-প্রফুল্ল-হৃদয়া-বন্নদেবি, তোমার অঙ্কে আর এমন দুটি আনন্দ বিহ্বল চিত্ত ছিল না। তোমার কলকণ্ঠ-পক্ষীদিগের মধ্যে কোন দুইটি এমন আনন্দ ধ্বনি বিকীর্ণ করে নাই। তোমার কপোলে এমন দুটি স্থরভি বারিবিন্দু ছিল না যাহারা পরস্পরে আমাদের সরল হৃদয় দুটির মত এমন তরলভাবে মিলিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সুলোচনা আমার সঙ্গে। রাত্রি হইল, সুলোচনাকে বাড়ী যাইতে দিব না। "সু"র মা ছিল না। "সু" জন্মিবার দুই তিন মাস পরে তাহার মা মরিয়া যায় এবং সেই অবধি তাহার ঠাকুরমাই তাহাকে মানুষ করিয়া আসিতেছে। তাহারা আমার মামাদের কাছাকাছি জ্ঞাতি, এবং রথোপলক্ষে আমার মামার বাড়ী আসিয়াছিল। আমার কান্না দেখিয়া সুলোচনার ঠাকুরমা তাহাকে আমার মার কাছে রাখিয়া গেল। 'সু' রহিল। আমরা একত্রে শয়ন করিলাম, কত গল্পই 'সু' জানে! তাহাদের বাড়ীর কত কথাই বলিতে লাগিল! তাহাদের পুকুর আছে; গরু আছে, হাঁস আছে, বাবুয়ের বাসা, বাবুই আছে। আমি সেই সকল শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে 'সু'র সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যাইলাম। সেইখানে সমস্ত দিন রহিলাম এবং তাহার খেলেনা, পুতুল, পাখী সব দেখিলাম। সন্ধ্যাকালে আবার তাহাকে সঙ্গে লইয়া মামার বাড়ী আসিলাম। তারপর একদিন অপরাহ্নে 'সু'র গান ও গল্প শুনিতে শুনিতে বেলা থাকিতে থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম মামার বাড়ীর সেই সুমন্দ পবনবাহিত মশারি-বিহীন রম্য শয়ন নাই। আবদ্ধ-গৃহমধ্যে সঙ্কীর্ণ শয্যায় শুইয়া রহিয়াছি; আর সুলোচনার মধুর আলাপের পরিবর্ত্তে হারু গুরু মহাশয়ের শুষ্ককণ্ঠের কঠোর সম্ভাষণ শুনিতেছি। হায় দীর্ঘজীবনে কতবারই না এরূপ নিদ্রাভঙ্গে কত কি হারাইয়াছি।

ক্রমশঃ।

---

# মনুষ্যে নিঃস্বার্থ ভাব আছে কি না।

আমরা জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিয়া থাকি তাহা সকলই কি স্বার্থসাধন অভিপ্রায়ে করি, না তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন টী নিঃস্বার্থ ভাবে করা হইয়া থাকে—মানব প্রকৃতি স্বার্থময়, না তাহাতে নিঃস্বার্থভাবের অঙ্কুর আছে—মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে এই একটী গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর মনুষ্যের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গতিবিধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে: মনুষ্য-সমাজের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, মনুষ্য-সমাজ অদ্যাবধিও সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থা হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত—যে উহার গঠন সমাপন করিতে, উহাকে প্রকৃত সভ্যতায় উন্নত করিতে, এখনও অনেক চিন্তার অনেক যত্নের অনেক শ্রমের প্রয়োজন, অর্থাৎ এখনও অনেক নিঃস্বার্থ লোকের প্রয়োজন। সত্য বটে, শেষ পক্ষে ব্যক্তিগত-মঙ্গল ও জাতিগত-মঙ্গল একই বিষয়, যাহাতে জাতির প্রকৃত মঙ্গল তাহাতেই

ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গল আর যাহাতে ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গল তাহাতেই জাতির প্রকৃত মঙ্গল, জাতি ও ব্যক্তি একে অপরের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। কিন্তু এই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত এবং উহা আমাদিগের জীবনে ফলবতী করিবার নিমিত্ত আমাদিগের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; আমাদিগের উচ্চতম স্বার্থ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আমাদিগের নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক, স্বার্থের নিমিত্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি দেওয়া আবশ্যক। জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাব যেখানে এতই প্রয়োজনীয়, সেখানে মনুষ্যে নিঃস্বার্থভাব আছে কি না এই প্রশ্নটী যে অতীব গুরুত্বশালী সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা যে সকল কার্য্য স্বকীয় উদ্দেশ্যে করি, তাহাদিগের কোনটীই যে নিঃস্বার্থ নহে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অন্ততঃ একজন পণ্ডিত (বট্‌লার) অন্যপ্রকার মত প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন আমরা যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্নভক্ষণ করি তখন আমাদিগের কার্য্য স্বার্থময় নহে, নিঃস্বার্থ। অর্থাৎ আমরা যতক্ষণ সুখ সংঘটন কিম্বা দুঃখ নিরাকরণ অভিপ্রায়ে কার্য্য করি, ততক্ষণই আমরা স্বার্থের অনুগমন করি—অন্নভক্ষণ করিবার সময় আমরা অন্নের উদ্দেশেই কার্য্য করি ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত নহে; সুতরাং তখন আমাদিগের কার্য্য স্বার্থময় নহে। কিন্তু এইরূপ মতের সহজেই খণ্ডন হইতে পারে; সত্য বটে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আমরা অন্নভক্ষণ উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করি, কিন্তু তখন অন্নভক্ষণই কি আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য? অবশ্য না; অন্নভক্ষণ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মাত্র, ক্ষুধা নিবারণই প্রথম ও মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্নভক্ষণের নিমিত্ত আমরা যে শক্তি প্রয়োগ করি, তাহা শেষ পক্ষে ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্তই প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্নভক্ষণ কালে আমাদিগের কার্য্য নিঃস্বার্থ নহে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্বকীয় উদ্দেশ্যে আমরা যে সকল কার্য্য করি, সে সকল স্বার্থময়। এক্ষণে দেখা যাউক আমরা পরকীয় উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করি, তাহাদিগের মধ্যে কোনটী নিঃস্বার্থ হইতে পারে কি না। কেহ বলিতে পারেন মনুষ্যের কোন কার্য্যই নিঃস্বার্থ নহে আর ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী যুক্তি উত্থাপন করিতে পারেন ঃ—

(১) আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করি, তখন আমাদিগের মনে প্রকাশ্যভাবেই হউক আর অপ্রকাশ্যভাবেই হউক এই চিন্তা বর্ত্তমান থাকে যে আমাদিগের আবার প্রয়োজন হইলে সে ব্যক্তি কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ আমাদিগকে সাহায্য করিবে, অথবা সমাজে আমরা প্রশংসা ও সম্মানের পাত্র হইব, অথবা পরলোকে কিম্বা ইহলোকে সুকৃতের নিমিত্ত সুখভোগ করিব।

(২) সাহায্য দ্বারা অন্যকে সুখী করিলে

তাহার সুখ দেখিয়া আমরা সুখী হইব এই অভিপ্রায়ে আমরা সাহায্য করি।

(৩) দয়ার যোগ্য পাত্রে দয়া না দেখাইলে আমরা সমাজ কিম্বা বিবেকের নিকট নিন্দার ভাজন হইব এই আশঙ্কায় আমরা সাহায্য করি।

(৪) অন্যের কষ্ট দেখিয়া আমাদিগের কষ্ট হয় আর এই দ্বিতীয় কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত আমরা কষ্টাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করি।

এক্ষণে আমাদিগের দেখিতে হইতেছে এই সকল যুক্তিদ্বারা মনুষ্যের কোন কার্য্যই নিঃস্বার্থ নহে ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে কি না; আর সেই উদ্দেশ্যে যুক্তি গুলি ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা যাইতেছে। প্রথম যুক্তিটীর সম্বন্ধে আমরা এই বলি যে আমরা অনেকে অনেক সময় প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশায় উপকার করিয়া থাকি, কিন্তু অনেক সময় আবার এমন কোন কোন ব্যক্তিকে আমরা সাহায্য করি যাহাদিগের নিকট হইতে কোন প্রত্যুপকার আশা করা যাইতে পারে না; ইহা ভিন্ন আবার কেহ কেহ সাধারণের অগোচরে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন—অতএব আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি যে অনেক স্থলে প্রত্যুপকার আশা না করিয়াও আমরা সাহায্য করি। সমাজে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্তির আশা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সে আশা সকল-মনুষ্যের মধ্যে দেখা যায় না; মনুষ্যজাতির ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে এখনও অনেক মানুষ আছে যাহারা সমাজে প্রশংসা বা সম্মানের নিমিত্ত লালায়িত নহে। পুণ্যসসঞ্চয় উদ্দেশ্যে পরোপকার সম্বন্ধে আমরা এই বলি যে সকল লোকেই যে সেই উদ্দেশ্যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহা বলা যাইতে পারে না; আর যাহারা পুণ্যসঞ্চয় জীবনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য করে তাহারাও যে তাহাদিগের সমুদয় সৎকার্য্য সেই উদ্দেশ্যে করে তাহা সত্য না হইতে পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটী আমাদিগের কোন কোন কার্য্য সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু সকল কার্য্য সম্বন্ধে নহে। আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি কিম্বা যাহাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমাদিগের বিশেষ আগ্রহ আছে তাহাদিগকে সুখী করিয়া আমরা সুখী হইব এই অভিপ্রায়ে আমরা কোন কোন সময় কার্য্য করি বটে, কিন্তু আমরা নিজে সুখী হইব এই চিন্তা আমাদিগের সমুদয় কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যমান নহে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

তৃতীয় যুক্তিটী বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে এ যুক্তিটীও আমাদিগের সকল কার্য্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। যে সকল স্থলে সাহায্য না করিলে আমরা সমাজ বা বিবেকের নিকট নিন্দার পাত্র হইতে পারি সে সকল স্থলের সংখ্যা অতি বিরল। সুতরাং উক্ত প্রকার নিন্দার পাত্র হওয়ার আশঙ্কাই যে আমাদিগের পরোপকারক-প্রবৃত্তির সার্ব্বভৌমিক কারণ তাহা হইতে পারে না। আমরা সংক্ষেপে প্রথম তিনটী যুক্তি পরীক্ষা করিলাম আর

তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে অন্ততঃ উক্ত তিনটী যুক্তিদ্বারা মনুষ্যের কোন কার্য্য নিঃস্বার্থ নহে ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে না। এক্ষণে আমরা চতুর্থ যুক্তিটী পরীক্ষা করিতেছি, এই যুক্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সারবান্; এই নিমিত্ত আমরা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেছি। আমরা প্রথমতঃ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে কি কারণে অন্যের সাহায্য করিয়াছিল; মনুষ্য মনেকর আদিম অবস্থায় রহিয়াছে, তখনও উপকার প্রত্যুপকার, সামাজিক সম্মান, পুণ্য সঞ্চয়, অন্যকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইবার অভিলাষ, সমাজ কিম্বা বিবেকের নিকট নিন্দার আশঙ্কা এই সকল বিষয় তাহার উপর কার্য্য করিতেছে না—তখন সে একজন অনন্যাশ্রয় ব্যক্তিকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া কেন সাহায্য করিল। অন্যকে কষ্ট পাইতে দেখিতে পাওয়ায় সে নিজে পূর্ব্বে সে কষ্টের অনুরূপ যে কষ্ট পাইয়াছে তাহার কথা তাহার মনে হইল, সে পূর্ব্বে যেরূপ উপায়ে সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইয়াছে সেই উপায়ের কথাও তাহার মনে পড়িল—অবশেষে সে এখন যে ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে তাহাকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সেই উপায় অবলম্বন করিল। এইরূপে পরোপকারের সূত্রপাত হইল; ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কল্পিত প্রথম মনুষ্য আরও অন্যান্য স্থলে পরোপকার করিল; তাহার ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া এবং তাহাকে অনুকরণ করিয়া অন্যান্য মনুষ্যেরাও পরোপকার করিল; ক্রমে ক্রমে পরোপকারে মনুষ্য এত অভ্যস্ত হইল, যে তাহা তাহার সমাজে একটী অনুষ্ঠান বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল—ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের মনে পরোপকার বৃত্তি গঠিত হইল। সমাজের ও ব্যক্তির জীবনের প্রথমাবস্থায় পরোপকার করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের মনে প্রতীকার্য্য বিষয়ের পূর্ণায়তন চিত্র গঠিত হওয়ার আবশ্যক, পরে সে নিমিত্ত আংশিক চিত্র মাত্রই যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ উপকার করিবার সময় যে কষ্টের নিমিত্ত সাহায্যের প্রয়োজন সে কষ্টের প্রায় সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু শেষে কেহ কষ্ট পাইতেছে ইহা শুনিবামাত্রই অনেক স্থলে আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই, সে ব্যক্তি কি রূপে কি কষ্ট পাইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইলাম যে পরের কষ্ট দেখিয়া কষ্ট পাওয়াই (পূর্ব্ব কষ্ট স্মরণ হওয়াই) মনুষ্যের সর্ব্বপ্রথমে সাহায্য করার কারণ; আর এখনও যে যে স্থলে আমরা স্বার্থমূলক কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করি সে সকল স্থলে উক্ত কারণ প্রকাশ্যভাবেই হউক কি অপ্রকাশ্যভাবেই হউক আমাদিগের পরোপকার ক্রিয়ার প্রণোদক। এরূপ স্থলে আমাদিগের কার্য্য বাস্তবিক পক্ষে কি স্বার্থমূল বলিতে হইবে—আমরা যদি আমাদিগের স্মৃতিজাত কষ্টের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে পরোপকার করিতাম, তাহা হইলে বটে আমাদিগের কৃত পরোপকার নিঃস্বার্থ হইত না, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইত না; কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে আমরা অন্যের কষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়েই শক্তি প্রয়োগ করি আর সেই নিমিত্ত আমাদিগের কার্য্য নিঃস্বার্থ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ফলতঃ অন্যকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া আমরা এমন অনেক স্থলে সাহায্য করি, যে সকল স্থলে স্মৃতিজাত কষ্ট সহজেই দূর করা যাইতে পারে—দৃষ্ট কষ্ট ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে যাইয়া, দৃষ্ট কষ্টের কথা না ভাবিয়া (অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া)। এরূপ স্থলেও যদি আমরা সাহায্য করি আর আমাদিগের মনে প্রত্যুপকার প্রভৃতি উপরে লিখিত প্রথম তিনটী যুক্তির অন্তর্গত কারণগুলি কার্য্য করিতে না থাকে তবে তখন পরকীয় উদ্দেশ্যে আমরা যে কার্য্য করি তাহা কি নিঃস্বার্থ বলিব না? আর এমনই যদি হয় যে কোন ব্যক্তি আত্মীয় কিম্বা বন্ধু নহে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির কষ্ট এত অনুভব করিতেছে যে সে কোন মতেই তাহা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছে না আর সে নিমিত্ত সে পরোপকারে প্রবৃত্ত হইতেছে—তাহা হইলে সে ব্যক্তির কার্য্য স্বার্থমূল বলা প্রকৃতপক্ষে কতদূর সঙ্গত হইবে সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে; আমরা অন্ততঃ ইহা বলিতে পারি যে সে ব্যক্তির স্বার্থ আর একজন পারিষদের স্বার্থ এই দুয়ের প্রকৃতিতে অনেক বিভেদ—তাহার দুই জনেই সাহায্য করিবে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে, পারিষদ উদরান্নের নিমিত্ত প্রভুর সাহায্য করিবে আর সে ব্যক্তি অন্যের কষ্ট সহিতে না পারিয়া অন্যের সাহায্য করিবে।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে মনুষ্যের মনে নিঃস্বার্থ ভাবের অঙ্কুর আছে। এই অঙ্কুর কাহাতেও বা স্বল্প বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কাহাতেও বা উহা স্ফুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখায় জগৎ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, জগজ্জনের মন তাহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়াছে। এই যে নিঃস্বার্থ ভাব, সামাজিক মঙ্গলের সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত যাহার এত প্রয়োজন, তাহা যাহাতে মানবজাতিতে ক্রমান্বয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারে তদুদ্দেশে আমাদিগের সকলেরই সযত্ন হওয়া উচিত। প্রথমতঃ আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে উক্ত ভাবের প্রাবল্য দেওয়া আবশ্যক, পরে আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকেও সেই রূপ করিতে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। ভাবিয়া দেখিলে, পরের কষ্ট আপনার কষ্টের ন্যায় অনুভব করা, সমাজের হিতের নিমিত্ত আপনার জীবন উৎসর্গ করা, ইহা ভিন্ন আমাদিগের এই মানব জীবনের কি আর চরমোৎকর্ষ হইতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

—*—

# সুদান সমর।

আজি সুদান বীর মেহিধির নাম জগতের কোটি কোটি নরনারীর রসনায় ক্রীড়া করিতেছে—ইঁহার অসাধারণ শৌর্য্য ও অতুলনীয় সাহসে আজি চারিদিক বিস্মিত ও

স্তম্ভিত হইয়াছে। ইনি একজন সামান্য সূত্রধারের সন্তান। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ আস্‌মৎ। ডঙ্গোলার পূর্ব্ববর্ত্তী আর্ত্তিদ্বীপ ইঁহার পিতৃভূমি। স্বদেশে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সহজ না হওয়ায় ইহাঁর পিতা মহম্মদ আবহুল্লাহি ১৮৫২ খৃঃ অব্দে তিন পুত্র ও এক কন্যা লইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বারবারের দক্ষিণ সীমান্তর্ব্বর্ত্তী নীল নদীর প্রান্তস্থিত সিন্ধি প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। আস্‌মৎ বাল্যকালে পৈতৃক ব্যবসা শিক্ষার্থ জেনারের পরবর্ত্তী সাকাবে নামক স্থানে স্বীয় পিতৃব্য ভবনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহাকে অমনোযোগী দেখিয়া একদিন তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে নিতান্ত ভৎর্সনা ও সামান্য রূপ প্রহার করায় অভিমানী বালক সেই দিনেই পিতৃব্য-ভবন হইতে পলায়ন করিয়া খার্তুমে আসিলেন, এবং তথায় এক সংসারবিজয়ী ফকিরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন। আস্‌মৎ লেখাপড়ায় কিছুই উন্নতি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তঃকরণে প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ ও জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ আস্থা জন্মিল। এই স্থানে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি বারবারে আসিয়া তাহার নিকটস্থ গুবাস নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা ফকিরের শিষ্য হইলেন। তাঁহার নিকট ছয়মাস ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি কাণার দক্ষিণবর্ত্তী আরাহুপ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ২৮৭০ খৃঃ অব্দে আর একজন সুবিখ্যাত ফকিরের শিষ্য হইলেন, এবং অল্পকাল পরেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া ফকির উপাধি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি শ্বেত নীল-তটবর্ত্তী আব্‌বা দ্বীপে বাসস্থান মনোনীত করিলেন। তথায় ভূগহ্বরে বিজন সমাধি স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লোক চক্ষুর অগোচরে জপ, তপ, উপবাস ও কঠোর সাধনা দ্বারা ইষ্টদেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। দিন দিন তাঁহার সুবিমল যশের সৌরভ দিক্‌দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল—দিন দিন তাঁহার চরণপ্রান্তে রাশি রাশি ধন-রত্ন অজস্র ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি অনেকগুলি রূপসী ললনার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর ১৮৮১ খৃঃ অব্দে মেমাসে তিনি তাঁহার সম্প্রদায়স্থ ফকির-মণ্ডলী ও শিষ্যসমাজে প্রচার করিলেন যে তিনি ঈশ্বর আদিষ্ট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই কোরাণ-বর্ণিত ঐশীশক্তিসম্পন্ন ইমাম মেহিধি। সনাতন মুসলমান ধর্ম্মের সংস্কার ও গৌরব বিস্তার, স্বাধীনতা ও সাম্য প্রচার, সুশাসন ও শান্তি সংস্থাপন এবং অবিশ্বাসী-বিধর্ম্মীদিগের দমনের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বদেশের দুর্গতি নাশ ও স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধন করাই তাঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাঁহার এই মহা ঘোষণায় ডঙ্গোলার শাসনকর্ত্তা রিয়ুফ পাশার হৃদয় ভীত ও কম্পিত হইল। তিনি খেঁদিবের প্রধান মন্ত্রী সেরিফ পাশার সহিত পরামর্শ করিয়া এই রাজনৈতিক-সন্ন্যাসীর শক্তি

দমনের জন্য ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ৩রা আগষ্ট তারিখে ইঁহার বিরুদ্ধে একদল সমরনিপুণ সেনা প্রেরণ করিলেন। তাহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বে কে কোথায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল! এই সময় মিশরের চারিদিকেই আগুণ জ্বলিয়াছিল। এই সময় স্বদেশানুরাগী মিশরবীর আরবী স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য ভীষণ অনল-ক্রীড়ার আয়োজন করিতেছিলেন। আরবী ও তদীয় মন্ত্রশিষ্যগণ পরাজিত হইলে পর তাঁহাদের মন্ত্রণা-পরিচালিত জাতীয়দল স্দানে মেহিধির পতাকার মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেহিধির তেজ দিন দিন ভীষণতায় পরিণত হইল। স্বার্থানুরাগী ইংলণ্ড আরবীর ন্যায় মেহিধিকে ভয়ের কারণ মনে করিয়া অস্থির হইলেন এবং অনতিবিলম্বে খেদিবকে উত্তেজিত করিয়া মেহিধির দর্পচূর্ণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রণায় ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মিশরের বিখ্যাত সেনাপতি হিক্স্ পাশা বিস্তর সৈন্য লইয়া মেহিধি দমনে খার্তুমে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইনি তথায় উপস্থিত হইতে না হইতেই মেহিধির সুদক্ষ সেনাপতি ও প্রিয় সহচর ওস্মান্ দিগ্‌মার রণকৌশলে সসৈন্যে নিহত হইলেন। পাঠক! এক্ষণে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য স্দানের অদ্বিতীয় সাহসী ও সমরনিপুণ বীর এই ওস্মানের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপদার দিব—যাঁহার রুদ্রতেজে মেহিধি তেজীয়ান, যাঁহার বিপুল বাহুবলে মেহিধি বলীয়ান, যাঁহার অদ্ভুত সামরিক প্রতিভায় মেহিধি গর্ব্বিত, যাঁহার মন্ত্রণায় মেহিধি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়াছেন, সেই মহাবীর ওস্মানের জীবনী পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

আরবীর শৈশব সহচর, মেহিধির দক্ষিণ হস্ত ওস্মান্ দিগ্‌মা একজন ফরাসিস্ সন্তান ইনি ১৮৩২ খৃঃ অব্দে রাওয়েঁ নগরের এক পান্থ-নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় দুই বৎসর বয়ক্রম কালে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইঁহার জননী ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ওস্মান দিগ্‌মা নামক একজন ধনশালী মিশর বণিকের সহিত পুনরায় বিবাহিত হয়েন। ওস্মান এই পিতৃহীন বালককে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। শৈশবে বালকের নাম আল্‌ফান্সো ভিনে ছিল। ওস্মান স্বীয় নামানুসারে তাঁহার নাম ওস্মান দিগ্‌মা রাখিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে এই পিতার মৃত্যুকালে বালক ওস্মান পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রার অধিকারী হইলেন। অনন্তর বালকের আলিখানা নামক একজন সঙ্গতিপন্ন মুসলমান বন্ধু তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার জননী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে আলি ইঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন এবং তথায় অপত্যনির্ব্বিশেষে ইঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বাল্যকালে খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার আস্থা না থাকায় তিনি সহজেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আলি ইঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন; কিন্তু ইঁহার হিতের নিমিত্ত ইঁহাকে কঠোর শাসনে রাখিতেন। শৈশবে বিবিধ বিষয়ে যথারীতি সুশিক্ষা দানের জন্য আলি

অনেকগুলি সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আপনার সম্মুখে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করাইতেন। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ওস্‌মান ইয়ুরোপীয় প্রথানুসারে যথারীতি সামরিক বিদ্যাশিক্ষার্থ কেরো নগরে কাপ্তেন সিরাই নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস সেনাপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সেনাপতির নিকট ৫০ জন বালক নিয়মিতরূপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত। ইহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বাগ্রগণ্য—যিনি স্বকীয়-অদ্ভুত-শৌর্য্য ও অসাধারণ স্বদেশানুরাগে জগতের ইতিহাসে অমরতা লাভ করিয়াছেন। এই ক্ষণজন্মা-বীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ আরবী পাশা। ওস্‌মান আরবীর শৈশব-সুহৃদ। উভয়ে উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগা ও স্নেহভাজন ছিলেন। এই দুইজনে সিরাইএর সাময়িক বিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য আদর্শ যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত তাহাতে দুইজনেই সমান রণকৌশল, অতুল সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন। সিরাইএর আন্তরিক যত্নে ইঁহারা সামবিক নীতিতে অত্যল্পকাল মধ্যেই সুদক্ষ হইয়া নিজ নিজ জীবনের প্রভাত সময়ে বীর উপাধি লাভে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ওসমানের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই ইঁহার অবিভাবক আলি স্বীয়কার্য্য সিদ্ধির জন্য ইঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি দুই বৎসর কাল অত্যন্ত জাঁক জমকের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, ফরাসীরা তাঁহাকে একজন পূর্ব্বদেশীয় রাজা বলিয়া সম্মান করিত! দুই বৎসর পরে ১৮৬৬ খৃঃঅব্দে তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা হইয়া মিসরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ তাঁহার সৌজন্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তির সহিত প্রাণভরিয়া ভাল বাসিত। তিনি যখন যে লোকের সহিত ক্ষণকালের জন্য মিলিত হইয়াছেন সকলেই তাঁহার চরিত্রের মধুরতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভাল বাসা উপহার দিয়াছে। ১৮৬৮ খৃঃঅব্দে তিনি মিশরের ভূতপূর্ব্ব খেদিবের কোন অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ভীষণ ক্রোধের পাত্র হয়েন এবং খেদিবের আজ্ঞানুসারে হৃতসর্ব্বস্ব ও মিশর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সোয়াকিম নগরে যাইয়া বাস করেন। তথায় আত্মনাম গোপন করিয়া অপরিচিত নামে আপনার পরিচয় দিয়া কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে একদল ভ্রমণশীল আরব তাঁহাকে ধৃত করিয়া মেহিধির নিকট বিক্রয় করিল। মেহিধি এই ক্রীতদাসের অসাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে এই যুবকের নেতৃত্বে তাঁহার অসংখ্য অনুচরবর্গ যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইবে। অত্যল্পকাল মধ্যে মেহিধি ওসমানের বিবিধ সদ্‌গুণরা-

জির যথাযোগ্য পুরস্কার স্বরূপ স্বীয় পরমরূপ-লাবণ্যবতী প্রিয়তমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। ওসমান একদিন প্রকৃত সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য ঘটনা বশে দুর্ম্মতি খেদিবের কোপে পতিত হইয়া তাঁহার সুখের দিন অস্তমিত হইয়াছিল। সৌভাগ্য বলে আবার তাঁহার সুখের দিন ফিরিল। তিনি মেহিধির ক্রীতদাস হইয়া স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রভাবে তাঁহার স্নেহাস্পদ জামাতা হইলেন। মেহিধি স্দানের সর্ব্বত্র দেবতার ন্যায় পূজ্য ও সহস্র সহস্র অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত। মিসর রাজের প্রতি সকলেরই জ্বলন্ত ঘৃণা। খেদিব ওসমানকে যেরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মর্ম্মভেদী অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি স্পর্দ্ধার সহিত স্বহস্তে মেহিধির গৌরব পতাকা ধারণ করিয়া স্দানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া জ্বলন্ত ভাষায় প্রতিশোধ গান গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণ-উন্মাদিনী বক্তৃতায় ও বিপুল উৎসাহে স্দানবাসীগণ অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতা দেবীর পূজা করিতে শিখিল এবং অচিরকাল মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ হইয়া দুর্ব্বৃত্ত খেদিব ও তাঁহার অনুচরবর্গকে স্বাধীনতা সমরে আহ্বান করিল। যে সময় আরবী ও তালবা পাশা মিশরে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন সেই সময় ওসমান স্দানবাসী দিগকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বীরত্ব শিক্ষা দিতেছিলেন। আরবীর পরাজয় হইতে না হইতেই তাঁহার দল ওসমানের দলের সহিত যোগদান করিল। আজি তাহারা সকলে রুদ্র তেজে মাতোয়ারা হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আজি স্দান সমরে ওসমান দিগমা প্রধানতম যুদ্ধবীর।

১৮৮৩ খৃঃঅব্দে হিক্‌স্‌পাশা সসৈন্যে নিহত হইলে মেহিধির সৈন্যগণ রণোৎসাহেমত্ত হইয়া দিন দিন একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের সমরসাধ এতই প্রবল হইল যে তাহারা প্রকাশ্যভাবে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি আক্রমণ ও খার্তুমবাসী ইয়ুরোপীয় ও খেদিবভক্ত মিশর বাসীগণের প্রতি বিশেষ উপদ্রব ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। খার্তুমস্থ দুর্গবাসীগণের আত্মরক্ষা ক্রমশঃ বিষম শঙ্কটময় হইয়া উঠিল। খার্তুমের এই শোচনীয় সংবাদ যথা সময়ে বৃটিশ পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হইলে স্থিতিশীল ও উদার-নৈতিকদলে কিছুদিন ধরিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। সমর-প্রিয় নর-শোণিত-লোলুপ স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা সার্ ষ্ট্যাভোর্ড নর্থ্‌কোট্ ও তাঁহার প্রধান সহযোগী লর্ড্ সলস্‌বেরী প্রভৃতি কূট রাজনৈতিক বীরগণ গম্ভীরভাবে মিসর যুদ্ধের ন্যায় স্দান যুদ্ধের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে গ্লাড্‌ষ্টোন্-প্রমুখ উদারনৈতিক সম্প্রদায় যুদ্ধের অসারতার বিষয় চিন্তা করিয়া প্রথমতঃ বিনাযুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের উপায় উদ্ভাবন করিতে একান্ত

যত্নবান হইলেন; কিন্তু কোন সহজ উপায় নিরূপণ করিতে পারিলেন না।

যখন খার্তুমের চারিদিকে ঘোর বিদ্রোহ ও অশান্তি বিরাজমান এবং বৃটিশ মন্ত্রণা-ভবন সুদানযুদ্ধের বাদানুবাদে আন্দোলিত, তখনই ইংলণ্ডের প্রিয়সন্তান বীর-রত্ন গর্ডনের হৃদয় কাঁদিল। তিনি ভ্রান্ত ও বিপন্ন সুদানবাসীদিগের জন্য একান্ত ব্যথিত হইয়া ইংলণ্ডের সমর বাসনা নিবারণ করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় প্রস্তাব করিলেন যে তিনি সুদানে প্রেরিত হইলে বিনাযুদ্ধে, বিনা শোণিত পাতে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইবেন। বীরচূড়ামণি গর্ডন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়-পরতা ও অকৃত্রিম চারুতার উপর নির্ভর করিয়াই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি খেদিব ইস্মাইল্ পাশা কর্ত্তৃক সুদানের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাবে এবং আশ্চর্য্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া খেদিব তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। সুদানবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। মহামতি গ্লাডষ্টোনের প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল যে কৌশলে মেহ্দিকে বশীভূত করিয়া সুদানে শান্তি ও সুশাসন সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে গর্ডনের প্রস্তাব সুসঙ্গত বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য করিলেন এবং তাঁহাকে এই উপদেশ দান করিলেন যে তিনি তথায় কোনরূপ যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া কৌশলে খার্তুমস্থিত মিশর ও ইয়ুরোপীয় অধিবাসীগণকে নগর হইতে মিশরে আনিবেন, এবং তাহারা সকলে কেরোনগরে উপস্থিত হইলে তথায় শাসন প্রণালীর সুব্যবস্থা করিবেন। এই দুরূহ কার্য্য সংসাধনের জন্য তিনি ইংলণ্ড হইতে সৈন্য বা অর্থের সাহায্য পাইবেন না। বীর গর্ডন্ এই সকল উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অল্পমাত্র অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে সুদানে যাত্রা করিলেন, এবং ১৮৮৪ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে খার্তুমে উপনীত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

---

# সমস্যা পূরণ।

আজকাল সমাজ সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মুখে সামাজিক কথা—সকলেই সমাজ লইয়া ব্যস্ত। নব্যসম্প্রদায় পুরাতন প্রথাসকলের কুফল ঘোষণায় ও সমাজ নূতনরূপে সংস্করণের নিমিত্ত সরোষে কণ্ঠ-পরিচালনায় নিযুক্ত। বাল্য-বিবাহ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্যপালন প্রথার বিষময় ফল দেখিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, প্রাণপণ যত্নে সমাজ-সংস্করণে

উদ্ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সকল প্রথা প্রচলন থাকা হেতু আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, যে যুবকদিগের স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভার মস্তকে লইয়া সংসারসমুদ্রপারে গমন করিতে হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ও কাতরোক্তি, এবং বিধবাদিগের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনহেতু চিরবৈধব্য যন্ত্রণার অবিশ্রান্ত ক্রন্দনরোল শুনিয়া, ভারতের অপর পার্শ্বস্থ বিজাতীয় ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী সহৃদয় তরুণ "যোদ্ধৃ"-পুরুষেরাও জাগিয়া উঠিয়া সোৎসাহে এ সকল কুরীতির প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন! কেহ আবার কাঁদিয়া করজোড়ে রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু বিজাতীয় রাজার সামাজিক বিষয়ে হস্তপ্রসারণের বিশেষ সুযোগ নাই দেখিয়া রাজপুরুষেরা হিন্দু অহিন্দু, দেশীয় বিদেশীয়—সম্ভ্রান্ত-সকলেরই নিকট হইতে এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিতেছেন।

বৃদ্ধেরাও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া নাই, তাঁহারাও নব্যদিগের মস্তকে প্রশস্ত স্থান থাকিতেও একালে তরুশাখা বা লৌহশলাকার উপর বজ্রপতন দেখিয়া,দেবতাদিগের জাগরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অস্থিরচিত্ত অসহিষ্ণু কেহ কেহ

"এখন সেদিন নাহিকরে আর,
দেব আরাধনে ধর্ম্মেরসংস্কার
হবেনা হবেনা, চল রাজদ্বার,
এসব দৈত্য নহেরে তেমন"

এই পতাকা উড়াইয়া, সমাজ ও শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া "রাণীর চরণে কররে পূজা" এই রবে গগনভেদ করিতেছেন। তাঁহাদের সমাজ তাঁহাদেরই থাকুক, জন কয়েক নাস্তিক আর "খৃষ্টানের" কথা শুনিয়া মহারাণী যেন তাঁহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপন না করেন এই তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নব্যেরা বলিতেছেন,

"বালকদিগের বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলে দেশ ক্রমশ নির্ধনত্ব প্রাপ্ত হয়—স্বর্ণ-প্রসবা ভারত-মাতার বর্ত্তমান দারিদ্রের উহাই এক প্রধান কারণ। তরুণ বয়সে সংসারের বক্ষে ঝাঁপ দিলে মানসিক শক্তিগুলির পূর্ণ উন্মেষণ হয় না; তন্নিমিত্তই লোকের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান লোপ পাইতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে ইচ্ছানুরূপ বিদ্যানুশীলন ঘটিয়া উঠে না। স্ত্রীজাতির মস্তিষ্ক পরিচালনার সুযোগ না থাকায় তাঁহারা একপ্রকার সজ্জিত সজীব-পুত্তলিকার মধ্যে গণ্য হইয়া পড়েন, এবং পুরুষদিগকে দুই মুষ্টি অন্নের জন্য স্কেভিঞ্জরের ঘোটকের ন্যায় সমস্তদিন দুর্ব্বিসহ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কি কখনও বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? বিবাহ ত আর অপর কিছুর জন্য নহে, বিবাহ মনুষ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক-বৃত্তিগুলির সুচারু অনুশীলন ও জ্ঞানের আদান প্রদানের নিমিত্ত। এই স্থলে বঙ্গকবির এই উৎকৃষ্ট পংক্তিগুলি পাঠকেরা স্মরণ করিবেন :—

পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয়?

* * *

আগে যারে ভাল বাসিনে কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গলে? ইত্যাদি।

মানসিক আনন্দের ন্যায় কি আর এ জগতে সুখ আছে ? উদ্বাহ বন্ধন (উদ্বন্ধন ?) যখন সেই সুখই দিতে না পারিল, বিবাহ করিয়া আমরা যদি সে সুখ হইতেই বঞ্চিত রহিলাম তবে বিবাহ করা কি কেবলমাত্র সংসারের দুঃখভোগের নিমিত্ত ? তোমরা যে বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেছ, বাল-বিধবাদিগকেও যে ঐ কঠোর ব্রতপালন হইতে অব্যাহতি না দিয়া তাহাদিগকেও চিরজীবন বৈধব্যানলে দগ্ধ করাইতেছ, উহা কি ঘোর নিষ্ঠুরতা নহে ? তোমরা যে না বাছিয়া না বিচার করিয়া তাহাদের মত-সাপেক্ষ না করিয়াই, তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর অনুশাসন সকল প্রতিপালন করাইতেছ উহা কি যুক্তি সঙ্গত ? উহাতে কি হৃদয়-বিহীন পৈশাচিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় ? তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে না দিয়া আচার ও সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাহ—কিন্তু তাহারা তোমাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমাজ-নিগড় দূরে ফেলিয়া, অবাধে জঘন্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, এবং নানারূপ গর্হিত পাপাচরণে সদাই রত হইয়া সমাজকে পাপগ্রস্ত করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বঙ্গবাসীরা কি জাগিবে না ? এই সকল কুরীতি ও কুপ্রথা কি অবাধে সমাজ মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইতে দিবে ? সমগ্র হিন্দুজাতির অবনতি অবরোধ করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া চিরকালই কি প্রাচীন কুসংস্কার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে! সমাজ সংস্করণে কিছুমাত্র যত্নশীল হইবে না ? তোমাদের হৃদয় কি এমনই পাষাণময় যে ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্য তোমাদের প্রাণ একবারে কাঁদে না!" এই ত গেল নব্যদের বক্তব্য।

বৃদ্ধেরা ইহার উত্তরে বলেন যে,এ সকল প্রথার যেরূপ বিষময় ফল ঘটিতেছে বলিয়া নব্য-বাবুরা সপ্রমাণ করিতে ব্যগ্র, যথার্থ পক্ষে তাহার শতাংশের একাংশও ঘটে না, উহা অনেকাংশেই বাড়ান কথা। অসাধুতা ও অনৈতিকতা আজকাল সকল সমাজেই বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়াই কি সমাজ সেই সকল কার্য্যের অনুমোদন করিবে ? এরূপ করিলে ত সমাজ ক্রমশই অধোগমন করিতে থাকে। নব্যেরা এই সকল কদর্য্য অসাধুতার প্রতিকারের যে উপায় করিতেছেন তাহা কি সম্যক প্রকারে উপযুক্ত ও কার্য্যকারী হইবে ? যৌবন বিবাহেও কি অনেক দোষ ঘটিবার কথা নাই ? যুবক যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইলেই যে তাহারা সুখে জীবনতরী বাহিয়া যাইতে পারিবেন তাহা কে বলিতে পারেন ? এবং তাহাদের মধ্যে মনের অমিল হইবারও ত বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিবাহ হইবার কিছুকাল পরেই অনেক শিক্ষিত পতি সুশিক্ষিতা ভার্য্যা হইতে আর বিশেষ আনন্দলাভ করেন না; মানসিক আনন্দ তখন কোথায় থাকে ? ইহার ফল বাল্যবিবাহ

হইতে কি সহস্রগুণে অধিকতর শোচনীয় নহে! বাল্যকাল হইতে একত্র অবস্থান হেতু অশিক্ষিতা বালিকা ভার্য্যাও তোমার নিকট আদরের হয় সে কখনই তোমাকে ত্যাগ করে না, তরুলতার ন্যায় চিরজীবন তোমাকেই বেষ্টন করিয়া থাকে এবং বাল্য-সখিত্ব প্রযুক্ত তোমারও কেমন এক প্রকার মায়া বসিয়া যায় যে তুমিও সেই অসহায় সুকোমল লতাটিকে কোনক্রমেই একেবারে হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পার না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য—ইহাতে দেশে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাহা হইলে সকলেই দানব-সুখের মোহে ভুলিয়া গিয়া সমাজকে অবনত করিতে থাকিবে এবং সেই সঙ্গে পুরাতন আদর্শ-বিধবাও কাল-সহকারে সমাজের ক্রোড় হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। বিধবারা আমাদিগের গৃহের লক্ষ্মী, আমাদের সমাজের আদর্শ—তাঁহাদের পবিত্রভাব ও আচরণের উপর দোষ সংস্পর্শনের প্রয়াস পাওয়া কি ঘোর নীচতা নহে? অবশ্য বিধবা কুলেরও কলঙ্কিনী আছে তেমন বিবাহিতাদের মধ্যেও কি পতি-পিতৃকুল-কলঙ্কিনী দুশ্চরিত্রা নাই? তবে ইহারও কি প্রতিবিধান আবশ্যক নহে?—ইচ্ছাক্রমে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে পতিত্বে বরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়াও কি উচিত নহে? আর তাহা হইলেইবা বারাঙ্গনাদিগকে নীচ ঘৃণ্য মনে করিয়া সমাজচ্যুত করি কেন? তাহারা উদরান্নের জন্য নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, যাঁহারা তাহা হইতেও হীন অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছেন, অথবা পিতৃকুলে কলঙ্কদিতেছেন নব্য-সমাজ তাহাদিগকে ক্রোড় পাতিয়া লইতে উদ্যত কিন্তু এই দুরদৃষ্ট অভাগিনীদের বেলাই তাঁহাদের এই সার্ব্বভৌমিক ভাব কচ্ছপের ন্যায় মুখ গুটাইয়া লয়। তখন তাঁহাদের সহৃদয়তার মৌখিক আস্ফালন স্পষ্টই বুঝা যায়।

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উভয়-পক্ষেরই কিছু বলিবার আছে, নব্যেরা যাহা বলিতেছেন তাহাই যে অখণ্ডনীয় যুক্তি তাহা নহে, বৃদ্ধদিগেরও বিলক্ষণ বলিবার কথা আছে। এইরূপ বাদানুবাদে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প দেখিয়া, এবং সমাজে তাঁহাদের মত প্রচলনের বিশেষ সুবিধা নাই দেখিয়া নব্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ আইন দ্বারা সে সকলের পোষণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাদের চরণ ধারণ করিয়া বলি ওরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। তাঁহারা দেশে যৌবন বিবাহ বা বিধবা বিবাহ প্রচলনে কৃতকার্য্য হউন বা নাই হউন সাধ করিয়া যেন হিন্দুসমাজের গলে, অধীনতা-নিগড় না পরাইয়া দেন কর-যোড়ে এই আমাদের প্রার্থনা। একে আমরা বিদেশীয় জাতির অধীন তাহাতে পূর্ব্ব আর্য্যভাবচ্যুত হইয়াছি—তাই তাঁহাদিগকে বলি যে সমাজকে বিজাতীয় বিধর্ম্মীদিগের করতলস্থ করিয়া সমস্ত হিন্দুজাতিকে কৃত-দাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিও না।

সত্য সত্যই দারিদ্র্য বাল্য-বিবাহের অ-

সুচর। সত্যই বাল্যবিবাহে মানসিক শক্তি সকলের পূর্ণোন্মেষণ হয় না এবং অল্প বয়সে সংসারেরভার মস্তকে পড়ায় সমাজে বিশেষ পরিমাণে দুঃখ ও অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সভ্যতা সহকারে আমাদের ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রজাবৃদ্ধিরত কোন অংশেই হ্রাস হয় নাই। লোককে সভ্য নামধেয় হইতে হইলে নিজ পরিবারের জন্য তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের অপেক্ষা অন্যূন বিশগুণ অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং দায়ে পড়িয়া লোককে স্বার্থপর হইতে হয়, ইহার উপরে আবার বাল্যকালে বিবাহ করিলে নিজ পরিবারের উন্নতি নিমিত্তই লোকে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, নিঃস্বার্থ পরোপকার বা স্বদেশের হিতসাধন আমাদিগের পক্ষে বড়ই কষ্টকর, অথবা এমনকি একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু কথা এই, যৌবন বিবাহ প্রচলিত হইলেই কি এ সকল দোষ একেবারে সম্পূর্ণরূপে সমাজ হইতে বিলোপ পাইয়া যাইবে। যৌবনকালে বিবাহ হইলেই কি এই সকল দোষ একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে? পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উদ্বাহ শৃঙ্খল পরিলেও, আজকাল চাকরির বাজার এমনই গরম এবং উমেদার এত অধিক যে ইউনিবর্সিটি তকমা থাকিলেও ভদ্রোচিতরূপে স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। অর্থই বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ, গাড়ী-ঘোড়া যেরূপ বাবুগিরি, ধন ব্যতিরেকে রাখা চলে না বিবাহও সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চাঙ্গের বাবুগিরি। কিন্তু ধনাঢ্যের পুত্রের পক্ষে অর্থত কোনই কথা নহে। সে এক বিংশতি বর্ষে বিবাহ না করিয়া যদি উনবিংশতি বর্ষে বিবাহ করে তবে তাহাতে কাহার কি বলিবার আছে? সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের ভার তাহাকে বহন করিতে হয় না তবে তাহার বিবাহে আর বাধা কি? নব্যদিগের ইহার উত্তরে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কারণ বিবাহ করিলেই যে (যদি নৈতিক নিয়ম পালন করিয়া চলি) আমাদের মানসিক শক্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না এরূপ নহে? বিবাহ না করিয়াও কি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার কোনও সুযোগ নাই। তবে উপরোক্ত রূপ আত্মসংযম বা নৈতিক নিয়ম প্রচলন করিবার উপায় কি? সে বিষয়েও যদি মনুষ্যকে সামাজিক বা ব্যবস্থাপকীয় নিয়মাধীন করিতে চাহ তবে তাহাতে কি কখন ও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে? ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কি কখনও লোককে নিয়মাধীন করিতে সমর্থ হইবে? যেখানে অন্য কারণেও বাল্যবিবাহ দোষাবহ নহে, সেখানেও ইহার পক্ষে উপরোক্ত গুরুতর আপত্তি দেখিতেছি, যদি নৈতিক শিক্ষার ( ব্যবস্থাপকীয় নিয়মে নহে ) দ্বারা চরিত্রের মূল সংশোধিত করিতে পারি তবেই এই আপত্তিটি থাকে না। বাল্যবিবাহ প্রচলিত রাখিতে হইলে এ সকলের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বিধবা বিবাহে সমাজে স্ত্রীর আদর্শ

নিম্নগামী হইতে থাকে সত্য বটে, কিন্তু সমাজ কতকাংশে দুরাচরণ ও জঘন্য কুরীতি হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ইহাদের মধ্যে কোনটির অপেক্ষাকৃত উত্তম ফল হইবে, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যথার্থরূপে নিরূপণ করাও নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। কেহ বলিতেছেন যৌবন বিবাহে সমাজে অধিক মঙ্গল ঘটিবে,কেহ বলিতেছেন তাহাতে হিন্দু সমাজের বিশেষ দুর্গতি ঘটিবে, ভারতের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু যখন উভয় পক্ষ রহিয়াছে, যখন দুইদলে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা চলিতেছে ও এতদূর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে,—তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে উভয়েরই বিলক্ষণ আবশ্যকতা রহিয়াছে। এইরূপে এ সকল সামাজিক সমস্যা পূরণ করা নিতান্ত দুরূহ দেখিয়া কেহ কেহ অবস্থা বিশেষে কোথাও ভাল কোথাও মন্দ বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, তবে যিনি যেরূপ বুঝিবেন তিনি সেইরূপ করিলেন, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অখণ্ড রহিল বটে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে সমাজ-গ্রন্থি বিশেষরূপ শিথিল হইয়া পড়িতে চলিল। এরূপ ব্যবস্থায় মনুষ্য সমাজ বিশৃঙ্খল বন্য পশু-সমাজ হইতে কোন অংশেই উত্তম না হইয়া বরং অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাবান হওয়ায় তাহাদের অরণ্যবাসী আদি-পুরুষদিগের হইতে অধিকতর অবনতি সাধন করিতে থাকে। সমাজ দুর্নীতি ও দুরাচরণের আকর হউক তথাপি তাহা সুসংস্কৃত করিতে কেহই প্রয়াস পাইবেন না, এ বড় সুন্দর প্রকারের সমাজসংস্কার!

তাহার পর—বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে,—পুরুষদিগের পক্ষে পর্য্যায়ক্রমে লক্ষ বিবাহও দোষাবহ নহে, কিন্তু স্ত্রী লোকেরা একবার বিধবা হইলে পুনর্ব্বার আর বিবাহ করিতে পারিবেন না ইহা কিরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা! রাজা সহস্র মিথ্যাকথা কহিলে তাহাতে কোনই অপরাধ হয় না, কিন্তু গরিব কোন ব্যক্তি প্রাণেরদায়ে যদি একটা মিথ্যাকথা বলিল তবে আর তাহার রক্ষা নাই, তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া দাও, জোর করিয়া তাহাকে সহস্র মিথ্যা বলাইয়া, চিরজীবনের জন্য তাহাকে এক প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী করিয়া তুল। তাহাদের ইহকাল ত গিয়াছে, পরকালও তোমরা বিলক্ষণ রূপ চর্ব্বণ করিয়া উদর পূরণ কর। এরূপ স্বার্থপর হইলে কি সমাজ চলে! পূর্ব্বকালের আচার ও হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকল কথাতেই বাঁচিয়া যাইতে চাহ, কিন্তু পূর্ব্বেকার আচার ও প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম কি এখন তোমাদের আছে? এ কালের গৃহস্থেরা যেরূপ শাস্ত্র-ভক্ত এখনকার গুরুপুরোহিতেরাও তদুপযোগী। মজার জন্য বা পূর্ব্বপুরুষেরা করিতেন বলিয়া, অথবা মেয়েদের জেদ বজায় রাখিবার জন্যই ইঁহাদের পূজাকরা, আর ব্রাহ্মণদিগেরও অর্থের জন্যই (আজকাল আর চাল কলার লোভে ভোলেন না,সে সব দিন গিয়েছে!) সমস্তদিন উপবাস ও একসন্ধ্যা আহার। পূর্ব্বকালে

আর্য্যগণ যে অধিক বয়সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাহাতে তাহাদিগকে যৌবনে আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হইত এবং প্রৌঢ়বয়সে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইত। তাঁহারা সংসারকে মায়ামোহ বলিয়া চিরকালই জানিতেন এবং যৌবনে গুরুর নিকট হইতে বিদ্যার সহিত ইন্দ্রিয়সংযমন শিক্ষা করিতেন। এই শিক্ষার বলেই আর্য্যেরা তাঁহাদের সমাজকে এতদূর উন্নত করিতে পারিয়াছিলেন। সংসারের সুখে ভুলিয়া নহে, অপর আশ্রমবাসীগণের হিতসাধনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহারা সংসার ধর্ম্মপালন করিতেন। একালে যখন সে সকল নাই, যখন আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষাকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা মনে করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগমন করিতেছি তখন পুরাতন প্রথাকেও সেই সঙ্গে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। বিধবা বিবাহ যৌবনবিবাহ ও তাহার আনুষঙ্গিক বিলাতী কোর্টশিপ প্রথাও দেশে আনয়ন করিতে হইবে। যদি এ সকল না করিতে চাহ, বা যদি এসকলকে কদর্য্য বিবেচনা কর তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যদিগের ন্যায় সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইতে তৎপর হও। নব্য সম্প্রদায়কে বলি, তোমরা যদি আর্য্যজাতির গৌরব রক্ষা করিতে চাহ, যদি স্বদেশের নাম পুনর্জ্জীবিত করিতে চাহ, যদি তোমাদের কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগ থাকে—তবে তোমরাও সেই পথ অনুসরণ কর। কখনও সংসারের মায়ায় জীবনের পথ হারাইয়া প্রবৃত্তির দাস হইও না, বিষয়সুখে ভুলিয়া গিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইও না। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি যে আমরা কেবল জীবিত থাকিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিব? (to live and to multiply)? আমরা যে পুত্র কন্যাগুলিকে অকাতরে পৃথিবীতে আনিতেছি, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখসচ্ছন্দতার উপায় করিয়াছি কি—সংসারের সহস্র দুঃখের প্রতিবিধানের উপায় করিয়াছি কি? নীতি ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মনুষ্য নামোপাধির উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছি কি? এ সকল কি আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? আমরা কি সন্তানগুলিকে পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াই খালাস, কাকের ন্যায় প্রকৃতিদেবী আমাদের কোকিলশাবকগুলিকে পালন করিবেন? এবড় সুন্দর কথা! পৃথিবীতে যদি এরূপে নিজ কর্ম্মের দায়িত্ব অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পার, তাহা হইলে আর আমাদের বিবেচনা করিয়া চলিবার আবশ্যক থাকে না। প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীন হইতে দিলে আর আমাদের পৃথিবীর নিমিত্ত কিছুই ভাবিবার প্রয়োজন থাকে না, দুই দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র মরুর ন্যায় বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকিবে। সুখের বিষয় এই যে, আমাদের শারীরিক দায়িত্বের ন্যায় মানসিক দায়িত্বও আছে। একটু শারীরিক অত্যাচার করিলে যেরূপ শারীরিক ক্লেশ-ভোগ করিতে হয় সেইরূপ মানসিক প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য করিলে তাহারও ফলভোগ করিতে হয়।

আমরা আপনাদিগকেই যেখানে দুঃখ কষ্ট

হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারিতেছি না সেই অনিত্য পাপময় পৃথিবীতে আমরা অকাতরে অপর জীবন আনিব? আমরা সন্তানগুলিকে স্নেহ ও আদরের সহিত লালন পালন করিব কি বড় হইলে দুঃখের কবলে তুলিয়া দিবার জন্য? যদি এ ছার সংসারসুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য না মনে করিতাম, প্রবৃত্তির দাস হইয়া যদি তাহার মোহে আত্মাহারা না হইতাম, তাহা হইলে কি এই দুর্জ্জয় দুঃখক্লেশ, এই ভীষণ দায়িত্ব কখনও নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে যাইতাম! এই কারণেই আমরা এখন এরূপ নীচ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি।

Yes, self-abasement leeds the way,
To villain-bonds and devil's sway.

স্ত্রী পুরুষের একত্র মিলন না হইলে যদি মনুষ্য সম্পূর্ণতা লাভ না করিতে পারে, তবে তোমরা বিবাহ না করিয়া কেন ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় মিলিত থাক না। তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মিলন হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কেবল মাত্র এইটুকু চাই, যে নীচ প্রবৃত্তি গুলি সম্যক্‌রূপে তোমার নিজ বশ্যতায় আনিবে। আমরা যখন মনুষ্য বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, তখন যে জ্ঞান দ্বারা আমরা সেই নামের উপযুক্ত হইতে পারি, এরূপ করা কি উচিত নহে? আমরা ক্ষমতাবান্ বলিয়া কি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম, এ সকল কি নামে মাত্র আম্মাদিগের নিয়ামক! আমরা এ সকলের পবিত্র সূক্ষ্ম বন্ধন ছিন্ন করিয়া পশু পক্ষীদিগের ন্যায় প্রবৃত্তির দাস হইয়া দানব সুখের জন্য লালায়িত হইব? সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া নিতান্ত দুরূহ বিবেচনা করিয়া, কেহই কি এ পবিত্র পথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না! আমাদের চক্ষুর সমক্ষেই সমাজ যেরূপ অধঃপথে গমন করিতেছে, তাহা দেখিয়াও কি তোমাদের প্রাণপণ যত্নে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। আপনাদের জলবিহনে-শুষ্কপ্রায় সুন্দর গোলাপ গাছগুলিকে উবড়াইয়া, অতি সন্তর্পণে তাহার স্থানে হিন্দুসমাজ বিলাতী সমাজের চাকচিক্যময় কাঁটাগাছগুলি রোপণ করিতেছেন! আমরা যে উপায়ে সমাজ সংস্করণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহাতে শীঘ্রই হিন্দুজাতি লোপ পাইয়া গিয়া কৃষ্ণচর্ম্ম "মেটেফিরিঙ্গি" বলিয়া এক নব্য সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইবে। গলায় কলসি বাঁধিয়া গঙ্গায় ভাসিলে আমাদিগের যে অবস্থা ঘটে, ইহাতেও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে সমাজবারিও সেই সঙ্গে শুকাইয়া আমাদের সহিত সমতল হইতেছে। মাঝে মাঝে ইংরাজী সভ্যতার ছিটাফোঁটা পড়ায় আমাদের দেশের অবলা-লোকেরা উচ্চ-সভ্যতাস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে ভাবিয়া মনে মনে বড়ই স্ফীত হইতেছেন। কিন্তু এই ভ্রমে পতিত হইয়া যে অজ্ঞানঠুলি দ্বারা আমাদের জ্ঞান-চক্ষুকে আবরণ করিয়া রাখিতেছি তাহা কেহই একবার মনে ভাবেন না! এই আবরণ খুলিয়া জ্ঞানচক্ষুকে বিমুক্ত করিয়া দিতে পারিলেই পবিত্র স্বর্গীয় জ্ঞানালোক

তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকিবে। এই মনুষ্যত্ব যদি পাইতে চাহ, এই স্বর্গীয় ভাবের অধিকারী হইবার যদি বাসনা থাকে, তবে কখনও বিবাহ করিও না, তোমার নীচ পাশব-বৃত্তি গুলিকে তোমার স্বর্গীয় পবিত্র ক্ষমতার অধীন কর। আমাদের এখন এই সংস্কারেরই বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি মস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, অনেকে বলিতে পারেন আমি সৃষ্টিনাশা বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছি—কিন্তু যিনি চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে চাহেন এ ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সে ব্রত ভাঙ্গিতে হইবে না,—কেননা পৃথিবী পৃথিবীই থাকিবে সকল মনুষ্য কিছু আর একেবারে দেবতা হইতে পারিবে না, সুতরাং সে ভয় নিতান্ত বৃথা। তবে যদি যথার্থ এমন সুদিন হয়, জগতের সমস্ত মনুষ্যই যদি এই দেবভাবে উত্তেজিত হইয়া প্রকৃতির এই পথ দিয়া গমন করে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি না তাহা আমাদের ভাবিবার আবশ্যক নাই,—যদি ভাবিতেই হয় ত সে ভাবনা প্রকৃতি নিজেই ভাবিবেন। কিন্তু আপাততঃ সকল মনুষ্য পশুত্ব ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছে না, বলিয়াই যে, প্রত্যেকের পশুত্বকে পশুত্ব বলিব না, এমন হইতে পারে না—মিলটন যেমন বলিয়াছেন—Tyranny there must be though to the tyrant thereby no excuse তেমনি আমরাও এই বলিব Beastliness there must be, though to the beast thereby no excuse.

শ্রীসত্যব্রত উপাধ্যায়।

# হিন্দুধর্ম্মের রহস্যবিজ্ঞান।

## প্রথম প্রস্তাব।

হিন্দুদিগের "ধর্ম্মদীপিকা" নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে আজ আমরা সার-সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠক পাঠিকাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মের রহস্যবিজ্ঞান প্রদান করিবার ইচ্ছা ধারণ করিলাম।

হিন্দুধর্ম্ম বলিবার পূর্ব্বে, তৎসম্বন্ধে একটী "পাতনিকা" অর্থাৎ ভিত্তি স্থাপন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম কি? কোন্ বা কিরূপ জিনিসের নাম ধর্ম্ম? পূর্ব্বকালের হিন্দুরা কি সত্য সত্য কেবল মাত্র অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া সমূহকে ধর্ম্ম বলিতেন? না সে সকলকে ধর্ম্মের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর করিলে আপনা হইতেই পাতনিকা সংস্থাপিত হইবে, অনন্তর তদুপরি আমরা অতি সহজেই ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থন করিতে সমর্থ হইব।

তন্ন তন্ন করিয়া দেখুন, পরীক্ষা করুন, দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্ম আর কিছুই না, উহা এক প্রকার বুদ্ধি বিশেষ। বুদ্ধির অন্যতম অংশই ইহ জগতে ধর্ম্ম নামে

বিখ্যাত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, কেহই এ লক্ষণের ব্যভিচার দেখাইতে বা এ লক্ষণ অতিক্রম করিতে পারিবেন না। যতই ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক সম্প্রদায় থাকুন, ধর্ম্মের মূলভাব এক ভিন্ন দুই নহে; ইহা উল্লিখিত ধর্ম্মলক্ষণটী সপ্রমাণ করিতে সমর্থ।

একজন পুরাতন ঋষি, ধর্ম্মের উপকরণ উপদেশ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ প্রকৃতির প্রস্ফুরণ বিশেষকে "বুদ্ধি" আখ্যা প্রদান করিয়া, অবশেষে শিষ্যদিগকে তাহারই অবান্তর-প্রভেদকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করাইয়াছিলেন। যথা—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। সোঽধ্যবসায়ো গবাদিষু দ্রব্যেষু যা প্রতিপত্তিরেবমেতন্নান্যথা, গৌরেবাঽয়ং নাশ্বঃ, স্থাণুয়েবায়ং ন পুরুষঃ, ইত্যেষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। তস্যাশ্চাষ্টৌ রূপাণি ভবন্তি ধর্ম্মোজ্ঞানং বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্য মিতি। তত্র ধর্ম্মো নাম শ্রুতি স্মৃত্যাদি বিহিতঃ শিষ্টাচারাবিরুদ্ধঃ শুভলক্ষণঃ শুভহেতুশ্চ। জ্ঞানং নাম তত্বভাবভূতানাং যঃ সম্বোধঃ।

বৈরাগ্যং নাম শব্দাদিবিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ। ঐশ্বর্য্যং নাম অণিমাদ্যষ্টৌ গুণাঃ। এতানি সাত্বিকানি চত্বারি। অধর্ম্মোঽজ্ঞান মবৈরাগ্য মনৈশ্বর্য্যমিতি তদ্বিরোধীনি। তত্র অধর্ম্মোনাম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ শ্রুতিস্মৃত্যাদিবিরুদ্ধোঽশুভলক্ষণোঽশুভহেতুশ্চ। * * * ইত্যাদি।

এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় বুঝাইতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়। হিন্দুদিগের বুদ্ধি লক্ষণ বুঝিতে হইলে অগ্রে সাঙ্খ্য শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি ও মহত্তত্ব এই দুই পদার্থ বুঝিতে হয়। ঐ দুই পদার্থ বুঝিলেই বুদ্ধিনামক আন্তঃকরণিক পদার্থটী বুঝা যায়, অন্যথা ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

প্রকৃতির অন্য নাম অব্যক্ত ও মূল কারণ। প্রকৃতি কি? তাহা ঐ দুই নামের দ্বারা অত্যল্পমাত্র বুঝা যায়। এই মাত্র বুঝা যায় যে, যাহা এই ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত অবস্থা, যাহা এই দৃশ্য জগতের মূল কারণ অর্থাৎ আদি বীজ, যাহা এই স্থূল জগতের সূক্ষ্ম আদর্শ, তাহাই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি এবং অন্য শাস্ত্রের সৃজন-শক্তি ও ঐশী-শক্তি। বস্তুতঃ প্রকৃতি এক প্রকার মূলা শক্তি, এবং বিচিত্রাকার জগতের অবয়ব-ভুক্ত বহুশক্তির একীভাব বা অবিবিক্ত অবস্থা।

প্রোক্তলক্ষণ-প্রকৃতিতে প্রথমে (যখন এ সকল দৃশ্যের কিছুই ছিল না,অর্থাৎ আদি সৃষ্টিকালে) স্ফুরণ নামক বিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। প্রকৃতির সেই প্রাথমিক প্রস্ফুরণ বা প্রথম বিকাশ মহত্তত্ব নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মহত্তত্বের অন্য নাম সমষ্টি বুদ্ধি; সুতরাং বুঝা গেল, ব্যষ্টি বুদ্ধিও (যাহা সমষ্টি নহে, ভিন্ন ভিন্ন, স্বতন্ত্র) ব্যষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ অন্তঃকরণ নামক অন্তরস্থ প্রাকৃতিক পদার্থের প্রথম প্রকাশ, জ্ঞান-নামক স্ফূর্ত্তি বিশেষ বুদ্ধি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

সম্প্রতি আমরা অধ্যবসায় নামক পরিষ্কার মনোবৃত্তিকে বুদ্ধি বলিয়া জানি। আমাদের শাস্ত্রও তদ্দৃষ্টে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিকে বুদ্ধি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

বস্তুতঃ অন্তঃকরণের প্রস্ফুরণ বা প্রথম বিকাশ আর নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি তুল্য কথা। এইটী গো, অশ্ব নহে, এটী স্থাণু, মানুষ নহে, এতদ্রূপ নিরবশেষ স্ফুরণ বা নিশ্চয় নামক পরিষ্কার মনোবৃত্তি উদিত না পর্য্যন্ত বুদ্ধি নাম স্বীকার্য্য নহে। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে, চিত্তের নিরবশেষ স্ফুরণ আর নিশ্চয় নামক মনো বৃত্তি তুল্য কথা। যাবৎ না আমাদের অন্তঃকরণ নামক প্রকৃতিতে নিরবশেষ বিষয় স্ফূর্ত্তি হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত বস্তুজ্ঞান পরিসমাপ্ত হয় না।

কথিত হইল, দ্রব্য সন্নিধান উপলক্ষে যে অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি বিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারই অন্য নাম বুদ্ধি। ঈদৃশী বুদ্ধি আট প্রকার আকারে বা আট প্রকার ক্ষমতাশালী হইয়া উদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্তঃকরণজন্মা বুদ্ধির আট প্রকার স্বরূপ আছে। যথা—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই সকল বুদ্ধি-রূপের মধ্যে প্রথমোক্ত রূপচতুষ্টয় সাত্ত্বিক নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ সত্ত্বাংশের প্রস্ফুরণ বা নির্ম্মল বিকাশ হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈ-রাগ্য ও ঐশ্বর্য্য নামক বুদ্ধিবিশেষ উৎপন্ন হয়। আর যাহা এই সকল সাত্ত্বিক বিকাশের বিপ-রীত অর্থাৎ যাহা অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈ-রাগ্য নাম ধারী তাহা তামস; অর্থাৎ অন্তঃ-করণস্থ তমোভাগের প্রাবল্যে ধর্ম্ম বিপরীত বুদ্ধি সমুপস্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তমঃ প্রাবল্যকালেই অধর্ম্মাদি বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অন্য সময়ে নহে, ইহা অনুভব সিদ্ধ কথা।

জানা গেল যে, বুদ্ধি বিশেষই ধর্ম্ম এবং তাহা অন্তঃকরণ নামক প্রকৃতির সত্ত্ব নামক বিভাগের প্রস্ফুরণ বা নির্ম্মল বিকাশ বি-শেষ। এই বিকাশ প্রায়শঃই ইন্দ্রিয়পরিচালন ও ধ্যান জ্ঞানাদির সংঘর্ষ জনিত, অর্থাৎ উহা শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ, জ্ঞান বিশেষ, ধ্যানবিশেষ ও চিন্তাবিশেষ দ্বারা জন্মে। কিরূপ ক্রিয়া কিরূপ জ্ঞান কিরূপ ধ্যান ধর্ম্মবিকাশের কারণ? কিরূপ ইন্দ্রিয় পরি-চালন হইতে ধর্ম্ম নামক বুদ্ধি (শক্তি বিশেষ) উৎপন্ন হয়? এ প্রশ্নের যথার্থ প্র-ত্যুত্তর দেওয়া মানবমণ্ডলীর অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন বৃদ্ধ হিন্দুরা বলেন, কেবলমাত্র ঈশ্বরের আদেশ বচন ও পরীক্ষক সাধু-লোকের উপদেশ বাক্য ঐ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ। সেই জন্যই তাঁহারা বলি-য়াছেন,—

"বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং-
গুণোমতঃ।"
[মীমাংসা দর্শন।

অর্থাৎ বেদবিহিত, স্মৃতি প্রতিপাদিত ও সাধু সম্মত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তরাত্মায় যে ভবিষ্যৎ শুভ পরিণামের বীজ অথবা হেতুশক্তি আবির্ভূত হয়, তাহাই আমাদের যথার্থ ধর্ম্ম এবং যেহেতু বেদ-বিহিত, স্মৃতিপাদিত ও সাধু সম্মত কর্ম্মকলাপ হইতে উক্ত বিধ শুভশক্তির উৎপত্তি হয় সেই হেতু উহা বুদ্ধিরূপের নিমিত্ত কারণ; তবেই জানা হইল যে, পূর্ব্বতন ঋষিরা কেবল মাত্র অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া কলাপকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন না, ধর্ম্মের উপলক্ষক

বা নিমিত্ত-কারণ বলিয়াই জানিতেন। যেরূপ বলিলে, যেরূপ করিলে, যে প্রকার ধ্যান করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের শুভজনক বুদ্ধির স্ফুরণ হইতে পারে, বিকাশ হইতে পারে, উৎকর্ষ হইতে পারে, ঋষিরা তাহা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ও পরীক্ষা করিয়া সবিশেষে তাহা লোকহিতার্থ প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশ ও সেই সকল প্রচার্য্য-বিষয় এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে বিরাজ করিতেছে।

অতএব, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলে যথোচিত কালে শুভ-বুদ্ধির স্ফুরণ হইতে পারে এবং অধর্ম্মরত থাকিলে ক্রমে অধোগতি অর্থাৎ অজ্ঞানাদি অশুভবুদ্ধির দ্বারা মলিন হইয়া পশুর তত্তুল্য হইতেও পারি।

ধর্ম্মবুদ্ধি দৃঢ় হইলে, প্রবল হইলে, জীবের অথবা আত্মার ক্রমোৎকর্ষ হয়। ধর্ম্মরূপ নিমিত্তের দ্বারা শক্তি বিশেষের দ্বারা জীব ভবিষ্যৎ জন্মে ধর্ম্ম বল, যোগ্য, শরীর স্থান ও অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহারই অন্য নাম ঊর্দ্ধ গতি, স্বর্গ ও আত্মোৎকর্ষ। জ্ঞান নামক বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলে কোন গতি লাভ হয় না বটে; কিন্তু তদ্বলে আত্মার মোক্ষ অর্থাৎ বিকার সংযোগের নাশ অথবা জড় সম্বন্ধ-রাহিত্যরূপ মুক্তি (বন্ধনচ্ছেদ) জন্মে। মুক্তি আর নির্ব্বিকার অবস্থা-লাভ তুল্য কথা।

এতদূরে আমাদের ব্যাখ্যাতব্য ধর্ম্মদীপিকার পাতনিকা পরিসমাপ্ত হইল। পাতনিকার সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে; নচেৎ ভবিষ্যতে যাহা বলিব তাহা ভালরূপে বুঝা যাইবে না। পাতনিকার এই মাত্র বলা হইল যে, পূর্ব্বকালের ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা আত্মসন্নিহিত অন্তঃকরণের নির্ম্মল বিকাশ বিশেষকে, বুদ্ধির প্রকার বিশেষকে বা সামর্থ্য বিশেষকে ধর্ম্ম সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই গুণটী স্বতঃ প্রকাশ্য নহে, উপায় বিশেষ অবলম্বন ব্যতীত তাহা লাভ করিবার আশা করা যায় না। উপায়গুলি বেদে, স্মৃতিতে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। "বেদে ধর্ম্মলাভের উপায় বর্ণিত আছে।" ইহা শুনিয়া হয়ত অনেকেই হাস্য করিবেন। করেন, করিবেন, ফল, হাস্যের কারণ কিছুই নাই। বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম লাভের উপায় উপদিষ্ট আছে তাহা সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই; বাছিয়া লইতে হইবে। বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে স্বাস্থ্যের উপায় বর্ণিত আছে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সামাজিক নিয়ম উপদিষ্ট আছে, প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিবার জন্য কতকগুলি মিথ্যা গল্প অর্থাৎ কল্পিত কথাও সন্নিবেশিত আছে। সেই সকলের মধ্য হইতে ধর্ম্মজনক উপায়গুলি বাছিয়া লইতে পারিলে, অবশ্যই তাঁহাদের হাস্য সম্বরণ হইবে, বিশ্বাস ও আস্থা জন্মিবে।

হিন্দুশাস্ত্র অত্যন্ত জটিল। কোন বিষয়ের পরিষ্কার উপদেশ নাই। পূর্ব্বে গুরুশিষ্য প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, সেই কারণে সেকালের শাস্ত্র সকল সংক্ষিপ্ত বা অবিস্তীর্ণ। তাঁহারা মনে করেন নাই যে, কলির

লোকে বিদ্যাকে গুরুমুখী করিতে চাহিবে না, পুস্তক দেখিয়া আপনা আপনি দীক্ষিত হইবে। যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র জটিল হইলেও, সঙ্কীর্ণ হইলেও,—শরীর, সমাজ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিষয়ে জড়িত হইলেও, তাহা পৃথক করিয়া বুঝিবার উপায় একবারে নাই এরূপ নহে। কি উপায়ে ঐ সকল তত্ত্ব পৃথক হইতে পারে? তাহা কোন এক আগামী মাসের ভারতীতে ব্যক্ত করিব।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

---

# জর্জ্জ এলিয়ট।

সুকবি ভাবুক মায়ার্স বলেন যে বর্ত্তমানকালে তিন জন ইংরাজ, আধ্যাত্মিক-আচার্য্য (prophet) শ্রেণীর মধ্যে গণ্য—কার্লাইল, জর্জ্জ এলিয়ট ও রসকিন। বর্ত্তমান কালে চিন্তার অরাজকত্ব সর্ব্বত্র প্রবল ও মনুষ্য-স্বভাব চিরকাল অনুকরণ-শাল, এ জন্য মায়ার্সের উক্তিতে লোকে বিশেষ আপত্তি না করিতে পারে, কিন্তু বস্তুত পক্ষে মনুষ্য চরিত্রের উন্নত আদর্শের বিচারালয় সমক্ষে আনীত হইলে মায়ার্স অধ্যাত্মিক-বিদ্রোহ অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। কার্লাইল, জর্জ্জ এলিয়ট ও রস্‌কিন কলাবিদ্যায় * পারদর্শী ও সমসাময়িকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না; উহাঁরা সাধারণের শিক্ষক ইহা ইয়ুরোপে সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এ তিন জনের মধ্যে কেহই আধ্যাত্মিক অধ্যাপনার অধিকারী নহেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁদের জীবনে আধ্যাত্মিক নেতার ছায়ামাত্র নাই। যে সকল আধ্যাত্মিকবীর জগতে স্থির সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহাদের পবিত্র নামোচ্চারণ করিলে অদ্যাপিও মনুষ্যের আত্মা উন্মত্তপ্রায় হয়, ও হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া সমগ্র ধরা আলিঙ্গন করে তাঁহাদের শুভ্র জ্যোতিতে কলঙ্ক দিয়া তুলনায় প্রবৃত্ত হইব না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহাই স্মরণরাখা যথেষ্ট যে আধ্যাত্মিক-চিন্তা ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্ত করাই আধ্যাত্মিক-বীরত্ব। কার্লাইল বলিয়াছেন, সরলতাই (Sincerity) বীরের লক্ষণ, এবং ইহা সর্ব্বজন-সম্মত। রাজার সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন ও ভিক্ষুকবেশে অধ্যাপনা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। কার্লাইলের সরলতা কতদূর? উত্তপ্তভাষায় বৈরাগ্য স্তোত্র লিখিয়া স্বার্থপরতার দ্বারা স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের জীবন বিষাক্ত করিয়া কার্লাইল সরলতার পরিচয় দিয়াছেন। *

*নৃত্য-গীত-নাট্যাদি সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

* লেখক কার্লাইলকে আধ্যাত্মিক অধ্যাপনার অনধিকারী বলিয়াছেন। লোকের

জর্জ এলিয়টের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী (লুইস্ স্বামীর মধ্যে গণ্য ) ক্রশ সম্প্রতি তাঁহার জীবনী প্রচার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১০০০ পৃষ্ঠ জীবনীতে জর্জ এলিয়টের একটীও মহৎ কার্য্য দৃষ্ট হয় না। যত্রতত্র স্ত্রীজনসুলভ আদর-আকাঙ্খা ও (কবিদিগের জাতীয় পাপ) যশোলিপ্সা প্রকাশিত। আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহত্ব জর্জ এলিয়ট অনবগত ছিলেন না, তাহার প্রমাণ-স্থল মিল্ অন্ দি ফ্লসে ম্যাগি টলিয়ারের চরিত্র। কিন্তু জর্জ এলিয়টের এজ্ঞান পুস্তকে ভিন্ন কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, জর্জ এলিয়টের নৈতিক জ্ঞানের সারবত্তা ক্রমশঃ বিচার্য্য।

---

মধ্যে একটা কথা চলিত আছে যে নিজের উপদেশ আগে নিজে প্রতিপালন কর, তাহার পর অন্যকে উপদেশ দিও—লেখক এস্থলে ঐ কথার অনুসরণ করিয়াছেন। এই কথাটী সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। সত্য বটে, নিজের জীবন উন্নত করিতে পারিলে অন্য লোকে তাহা অনুকরণ করিয়া বাস্তবিক পক্ষে উপদেশ লাভ করিতে পারে—কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কয়জন লোক নিজের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত করিতে পারে, কয়জন লোক মনুষ্যের সেই আদিম অসভ্যতার ভাব মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারে। আমি চিন্তার বলে এমন একটী মহৎ বিষয় আয়ত্ত করিলাম যাহাতে মানব চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে—এক্ষণে যতদিন পর্য্যন্ত আমি উক্ত বিষয়টী স্বীয় জীবনে প্রোথিত করিতে না পারি ততদিন কি আমি উহা জন সমাজে প্রচার করিতে অধিকারী নহি। এমনও হইতে পারে যে আমি কখনই তাহা কার্য্যে দেখাইতে পারিব না, কিন্তু অন্য লোকে (বিশেষতঃ আমার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা) চেষ্টা করিলে সেরূপ করিতে সমর্থ হইতে পারে। সুতরাং যাহা সত্য যাহা উচ্চ তাহাই জনসমাজে প্রচারের উপযুক্ত, আর যে ব্যক্তির মনে তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাসিত হয় সেই তাহার প্রচারে অধিকারী। কার্লাইল আধ্যাত্মিকবীর না হইতে পারেন কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দানে অধিকারী নহেন ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কার্লাইল সম্বন্ধে একটী কথা পাঠকের স্মরণ রাখিতে হইবে—তিনি সামান্য অবস্থা হইতে কঠোর পরিশ্রমগুণে সমাজে একটী অগ্রগণ্য পদ লাভ করিয়াছেন—সে শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর কি ফল দাঁড়াইয়াছিল তাহা তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়। অনেক সময় তাঁহার রাত্রে ঘুম আসিত না, শব্দ তাঁহার কাণে সহিত না, ইত্যাদি—ইহার অর্থ এই যে তাঁহার স্নায়বীয় প্রণালী অন্ততঃ শেষ দিকে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং এরূপ লোকে যদি সকল সময় বুঝিয়া কার্য্য করিতে না পারে তবে তাহাতে আমাদিগের অসন্তুষ্ট না হইয়া দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করাই উদারতার কার্য্য। আর একটি কথা, মনে কর্ম্মে এক হইতে না পারিলেই সকল সময় অসরল বলা যায় না,—মনের বিশ্বাস একরূপ কথার ভাণ অন্যরূপ হওয়াই প্রকৃত কাপট্য, অসারল্য। অনেক লোকে বাধ্য হইয়া অবস্থাচক্রে পড়িয়া তাহার মনের বিশ্বাসের মত কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাকে দুর্ব্বল বলিতে পারি—কিন্তু অসরল বলিতে পারি না এখানে লেখকের সমালোচ্য বিখ্যাত জর্জ এলিয়ট যাহা বলিয়াছেন তাহা কি সুন্দর—"Many Theresas

রস্‌কিন জীবিত। তাঁহার চরিত্র আ-লোচনা সাহিত্য জগতের নীতিবিরুদ্ধ। রস্‌কিন সৌন্দর্য্য-শিক্ষক। বর্ত্তমান ইয়ুরোপে সৌন্দর্য্য-ভাব বুদ্ধির অধীন, হৃদয়-রাজ্য-চ্যুত। লণ্ডনের পূর্ব্বাংশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সৌন্দর্য্য অশ্রুত। পশ্চিমাংশে সৌন্দর্য্য স্বর্ণ-পিণ্ডে বুদ্ধির দ্বারা খোদিত। গ্রোভ-নার স্কোয়ারের মধ্যে বা বেলগ্রেভিয়ার প্রা-সাদ শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সৌন্দর্য্যে চোক ঠিকরিয়া যায়। তবে কি না এ সৌ-ন্দর্য্য অর্থদ্বারা সঞ্চিত ও বুদ্ধিদ্বারা প্রস্তুত। এরূপ বিপরীত-রুচি দেশে যে রস্‌কিনের আদর হইবে ইহা বুঝা কঠিন নয়, নচেৎ লেসিং রসকিনকে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-বাজারে কেহ বুঝিবে না যে সৌন্দর্য্য বস্তুগত নহে ব্যক্তিগত—"প্রিয়েষু সৌভাগ্য শীলোহি চারুতা।" ইয়ুরোপে "সুবিধার রাজত্ব" (Conventionality) সর্ব্বত্র বলবান ও প্রচলিত-বিধি-সম্মত সৌন্দর্য্যে প্রীতির ভাণ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এবং সম্প্রতি কলা-বিদ্যার আধ্যাত্মিক অধ্যা-পনার নিয়োগ সর্ব্বত্র বিস্তারিত।

কলা বিদ্যা যথার্থ আধ্যাত্মিক শিক্ষণে অক্ষম। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য-গণের মত সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন। বিষয়ং বিষবৎ ত্যজ ইহা সকলেরই উক্তি। য়ুরো-পীয় জাতিগণের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-রসজ্ঞ। তথাপি প্লেটো বলিয়াছেন যে সক্রেটীসের মতে কবিতা কেবল অশিক্ষিত মনুষ্যের উপযোগী। স্বকল্পিত রিপাবলিক হইতে প্লেটো কবি-গণের নির্ব্বাসনের বিধান করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক যে উৎকট বৈরাগ্যভাব হইতে এরূপ বলিয়াছেন তাহা প্লেটোক্ত ব্যক্তি মাত্রেরই অস্বীকার্য্য। সত্য মঙ্গল ও সৌ-ন্দর্য্য বিচারে প্লেটো সৌন্দর্য্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আসল কথাটা এই যে অসম্পূর্ণতা দোষ কলা-বিদ্যা হইতে অবিচ্ছেদ্য। চিত্তের নির্ব্বিবাদ স্ফূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যানুভূতি। এই মানসিক অবস্থার সহিত সম্বদ্ধ বস্তুই সুন্দর। কিন্তু কলা-বিদ্যার মূলে এ ভাব নিহিত নহে। ভুক্ত সৌন্দর্য্যের পুনরাবৃত্তি কলা-বিদ্যার জীবন। সুতরাং চঞ্চল জগতে অচলত্ব আরোপ করিয়া কলা-বিদ্যা সত্য দ্রোহী এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের বিরোধী। কলা-বিদ্যা অশি-ক্ষিতের শিক্ষার সোপান হইতে সক্ষম কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তাশীল আধ্যাত্মিক দার্শনিকের

---

have been born who found for them-selves no epic life wherein there was a constant unfolding of far-resonant action; perhaps only a life of mistakes, the offspring of a certain spiritual grandeur ill-matched with the meanness of opportunity. * * With dim lights and tangled cir-cumstance they tried to shape their thought and deed in noble agreement; but after all, to common eyes their struggles seemed mere inconsistency and formlessness,

ভাং সং।

উন্নতিরোধক, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা সঙ্কেত-চিহ্ন—রূপক মাত্র, তাহাকে দেবতা বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে, Symbols should not be made idols। যাহাহউক সৌন্দর্য্যের তত্বানুসন্ধান বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আধ্যাত্মিক দার্শনিকের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা বিশুদ্ধ সত্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে না। কার্লাইল, জর্জ্জ এলিয়ট বা রস্‌কিন আধ্যাত্মিক-শিক্ষক (prophet) নহেন। এ সম্বন্ধে জর্জ্জ এলিয়টের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"মনুষ্য হৃদয়ে সুরুচি-সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত করাই আমার কার্য্য, ইহা ছাড়া কোন বিশেষ তত্ত্বের আমি শিক্ষক নহি। যে সকল উদার বৃত্তি, মনুষ্য-জাতির মধ্যে সামাজিক নীতির উন্নতি-আকাঙ্খা জন্মায় আমি সেই সকল বৃত্তির উত্তেজনায় প্রবৃত্ত, কোন বিশেষ বিধি প্রণয়ণে প্রবৃত্ত নহি। ইত্যাদি— *

জর্জ্জ এলিয়টের যথার্থ নাম মেরিয়্যান্। ২২ নবেম্বর ১৮১৯ খৃঃঅব্দে ওয়ারবিক প্রদেশ-অন্তর্গত আয়বরিগ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। রবর্ট এভ্‌ন্‌সের, ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। রবর্ট এভ্‌ন্‌স্ সর ফ্রান্সিস্ নিউডিগেট ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর সরকারে ভূমি সম্পত্তির তত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। উক্তগ্রামে গ্রিফ নামক ক্ষুদ্র বাটীতে (cottage) মেরিয়্যানের ৪ মাস বয়স হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। এই বাটি উপলক্ষ করিয়া জর্জ্জ এলিয়ট একস্থানে বলিয়াছেন—The warm little nest where her affections were fledjed. জর্জ্জ এলিয়টের পিতা ধর্ম্ম ও রাজ-নীতি সম্বন্ধে অচলমতি ছিলেন। রাজ্যতন্ত্রে স্থিতিশীল (Conservative) পক্ষাবলম্বন রবর্ট এভ্‌ন্‌স্ ধর্ম্ম প্রতিপালনের মধ্যে গণনা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জর্জ্জ এলিয়ট তাঁহার পিতার যে পত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক খানিতেও রাজনীতির উল্লেখ নাই। ইহাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী জর্জ্জ-হেনরি লুইস্ রাজনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন ছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানই এ দম্পতির উপাস্য দেবতা ছিল।

শিশু কালেই জর্জ্জ এলিয়টের ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কালক্রমে তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন গণ্য ব্যক্তি হইবেন। ৪ বৎসর বয়সের শিশু বাড়ীর দাসীর নিকট নিজের মর্য্যাদা প্রচার অভিলাষে পিয়ানো বাজাইতেন। বলা বাহুল্য তৎকালে পিয়ানোবাদনে মেরিয্যানের কিছুমাত্র পারদর্শিতা ছিল না। মেরিয়্যান্ বড় ভায়ের বড় অনুকরণ-প্রিয় ছিলেন। বড় ভাই

* "My function is that of the aesthetic not doctrinal teacher—the rousing of the nobler emotions which make mankind desire the social right, not the prescribing of special measures, concerning which the artistic mind, however moved by Social sympathy, is often not the best to judge."

Vol iii p. 330.

যাহা করিবেন মেরিয়্যানো তাহাই করিবেন এবিষয় কোন নিষেধ মানিতেন না। মেরিয়্যান্ অকালে পরিপক্ক হন নাই। ইনি অতি কষ্টে লেখা পড়া শিখেন। ইহাঁর ভ্রাতা বলেন বুদ্ধির জড়ত্ব ইহার কারণ নহে। মেরিয়্যান পড়ার চাহিতে খেলিতে ভাল বাসিতেন। সে যাহা হউক, পরিণত বয়সেও যে মেরিয়্যান চটুল-বুদ্ধি ছিলেন এমন বলা যায় না। ইহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ক্রস বলেনঃ—

"তাঁহার স্বভাব মহৎ, কিন্তু আস্তে আস্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—অন্তত এইটুক নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, তাঁহার স্বভাবে অল্প বয়সে পরিপক্কতার কোন চিহ্ন ছিল না। অতি অল্প বয়স হইতে সমস্ত জীবনে তাঁহার স্বভাবে একটি এই বিশেষ লক্ষণ ছিল—যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা ঢালিতে পারেন—প্রাণ ভরা ভালবাসা পাইতে পারেন—ছুজনে ছুজনের সর্ব্বস্ব হইতে পারেন, এইরূপ একজন হৃদয়ের লোক তাঁহার জীবনের আবশ্যকীয় মনে করিতেন। স্বভাবতঃ অভিমানী, ভালবাসায় সন্দেহ মাত্র সহ্য করিতে পারিতেন না—অল্পেতেই হাসিতেন অল্পেতেই কাঁদিতেন। অত্যল্প স্থান-আবদ্ধ-হৃদয়দিগের (exclusive) যেরূপ হইয়া থাকে—তিনি যেমন তীব্ররূপে সুখ অনুভব করিতেন, তেমনি তীব্ররূপে দুঃখ অনুভব করিতেন। তাঁহার গর্ব্বিত প্রেমপূর্ণ হৃদয় সামান্য আঘাতও সহিতে পারিত না। *

আমরণ জর্জ এলিয়টের এই চরিত্র অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত। অন্য-ত্যাগী (exclusive) চরিত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষণের কিরূপ উপযোগী তাহা দুর্ব্বোধ্য নহে।

জর্জ এলিয়টের জীবনী বিবৃত করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তৎসংক্রান্ত কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রচারিত নীতির পর্য্যালোচনাই সম্প্রতি এখানে লক্ষ্য। ১৯ বৎসর বয়সে জর্জ এলিয়ট প্রথম লণ্ডন দর্শন করেন। এ সময়ে তাঁহার মন বৈরাগ্যে কিরূপ পরিপূরিত ছিল নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে প্রকাশিত আছে।—

For my part when I hear of the marrying and giving in marriage that is constantly being transacted

---

* Hers was a large, slow-growing nature, and I think it is at any rate certain that there was nothing of the infant phenomenon about her. In her moral development she showed, from the earliest years, the trait that was marked in her all through life—namely, the absolute need of some one person who should be all in all to her, and to whom she should be all in all. Very jealous in her affections, and easily moved to smiles or tears, she was of a nature capable of the keenest enjoyment and the keenest suffering, knowing "all the wealth and all the woe" of a pre-eminently exclusive disposition. She was affectionate, proud and sensitive in the highest degree."—Vol I, p. 15.

I can only sigh for those who are multiplying earthly ties which, though powerful enough to detach their hearts and thoughts from heaven are so brittle as to be snapped asunder at every breeze.……Oh that we could only live for eternity! that we could realize its nearness! I know you do not realize love quotations so I will not give you one; but if you donot distinctly realize it, do turn to the passage in Young's 'Infidel Reclaimed," beginning "O vain, vain, vain all else eternity" and do love the lines for my sake."

ইহার স্থূলমর্ম্ম এই "আমি যখন শুনি যে লোকে বিবাহ করিতেছে ও বিবাহ দিতেছে তখন আমি তাহাদের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারি না—সাংসারিক বন্ধন স্বর্গরাজ্য হইতে চিন্তা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে বটে কিন্তু তাহা কি ক্ষণস্থায়ী,—হায়! আমরা যদি অনন্তের চিন্তায় জীবন যাপন করিতে পারিতাম!"

এস্থলে বক্তব্য এই যে, কালক্রমে জর্জ এলিয়টের বুদ্ধিগত-ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহার মনোভাব অটুট ছিল। ক্ষীণ-দৃষ্টি দর্শকের চক্ষে জর্জ এলিয়টের জীবনী দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু বস্তুতঃ জর্জ এলিয়ট ও অন্য অন্য মহৎ চরিত্র ব্যক্তিগণের পূর্ব্বাপর অব্যবস্থিতি-দোষ অধিকাংশ দর্শকের চক্ষু-জাত। অভাগিনী ওফিলিয়ার নিম্ন লিখিত কাতরোক্তিটি আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, বুদ্ধি বশীভূত করে না— Alas! we know what we are but we know not what we may be:—"হায়! আমরা জানি আমরা কি—কিন্তু জানিনা পরে কি হইব।" কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে যদি আমরা বর্ত্তমানে কি তাহা সুন্দররূপে অবধারিত করিতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি হইব তাহা জানা দুঃসাধ্য নহে। লর্ড ম্যাকলে গ্ল্যাডষ্টোনকে উল্লেখ করিয়া বলেন—The rising hope of sturdy Toryism। আজ গ্ল্যাডষ্টোন the realized hope of unbending liberalism! কিন্তু যাঁহারা গ্ল্যাডষ্টোনের জীবন প্রবাহ পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কারণে তিনি টোরী পক্ষ অবলম্বন করেন সেই সব কারণেই আবার লিবারল পক্ষ সমর্থন করেন। গ্ল্যাডষ্টোনের মানসিক অভিমত স্থির-প্রবাহ। যেমন অগ্নি নানা জাতীয় ইন্ধন ভস্ম করিয়া নিজে অচল থাকে মহৎ-চরিত্র সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকল্প। আত্মদ্রোহী পর মুখ প্রত্যাশী কাপুরুষ যাহা স্থিরতা সত্ত্বেও পূর্ব্বাপর অনবস্থিত। অন্তরে বাহিরে এক হওয়া মনুষ্য নামোচিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

জর্জ এলিয়ট আজীবন বৈরাগ্যের পক্ষ সমর্থিনী। ওয়েষ্টমিনষ্টার রিভিউ সম্পাদন কালে Worldliness and other worldliness নামক প্রবন্ধে এ বিষয় স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। লুইসের অবিবাহিত স্ত্রীত্বকালে-লিখিত অমর উপন্যাস মালায় উহাই ব্যক্ত আছে।

Spanish gipsy নামক নাটকেও বৈরাগ্য প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। বন্ধুদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাকেও ঐ স্বর বাজিতেছে। অথচ কার্লাইল ও জর্জ এলিয়ট উভয়েই কথার বৈরাগী কাজে নহেন। ইহাঁদের বৈরাগ্যের বুদ্ধিগত মূল্য ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

# হুগলির ইমাম্‌বাড়ী।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### খাস-মজলিস।

সলেউদ্দীন খাঁর বৈঠকখানার সাজ-সজ্জার সরঞ্জামের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। মেজিয়ায় মসনদ-শয্যা, দেয়ালে ছবি, কড়িতে ঝাড়—এই সব যেখানকার যা তা সকলি আছে—তবে কিনা কিছু দিন আগে যেমন মাস না যাইতে নূতন মসনদ আসিয়া পড়িত—দিন না যাইতে নূতন ছবির ফরমাস হইত—সপ্তাহ না যাইতে দেয়ালে নূতন রং চং আরম্ভ হইত—এখন সেই সবের মাত্র অভাব হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য এখন গৃহের শোভাও কিছু অন্যরূপ। ঘর-জোড়া বিছানার জরিগুলি চারিদিক্ হইতে ঝুল ঝুল করিতেছে, তাকিয়া গুলির তুলা বাহির হইয়া চারিদিকে ফুল ফুটাইতেছে। ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগিরির অর্দ্ধেক খসিয়া গেছে—বাকী যা আছে তাহাতে এত ঝুল পড়িয়াছে—যে তাহার মধ্য হইতে জিনিস গুলির আকৃতি সহজে চিনিয়া লইতে পারা যায় না। দেখিলেই মনে হয় গৃহটিতে মান্ধাতার আমল হইতে সম্মার্জ্জনীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গৃহের কিরূপ অবস্থা ছিল—আজ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। এ গৃহটি দেখিলে আর লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যে বিশ্বাস করিবার জন্য—পার্থিব সুখের অনিত্যতা ধারণ করিবার জন্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ঘোর ঘন বক্তৃতাচ্ছটা শুনিবার আবশ্যক করে না।

এইরূপ সুসজ্জিত বিলাস গৃহে—ছিন্ন মসনদের উপর পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন বন্ধুবর্গ লইয়া মজলিসে বসিয়াছেন। সুরার গন্ধের সহিত ফুলের গন্ধ মিশিয়া—একটি নূতনসৃষ্ট অভূত-পূর্ব্ব বাসে—চারিদিক আমোদিত করিতেছে। বোতলের কাক খুলিবার মুহুর্মুহুঃ মধুর পটাশ পটাশ-তাললয়ে মিশিয়া মিশিয়া 'লাও লাও হিঁয়া লাও' এই চীৎকার সঙ্গীত সবলে সঘনে সুকর্কশ সুভগ্ন কণ্ঠে অনবরত উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে নানা সুরে নানা তানে—লয়ে বিলয়ে ছাঁদে বিছাঁদে সরুতে মোটাতে হাঃ

হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হোঃ হোঃ হোঃ ই-ত্যাদি হাসির অপরূপ সমতান সেই নিশীথের প্রাণ ফাটাইয়া অর্দ্ধক্রোশ মাৎ করিয়া তুলিতেছে। মজলিসের সবে আরম্ভ বলিলেই হয়—এখনো সকলে ভরপূর হইয়া উঠে নাই, এখনো সকলে দিকবিদিক হারাইয়া ফেলে নাই—গৃহে সুরাদেবীর পূর্ণ আবির্ভাব হইতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। সলেউদ্দীনের সবেমাত্র চক্ষুদুটি ঈষৎ ঢুলিয়াছে,—কথাগুলি এখনো এড়ায় নাই,—প্রাণটা মাতিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু জ্ঞানটা এখনো টলে নাই। ইহাঁর ডাহিনে বামে দুইজন খাসবন্ধু—একজনের নাম আমির একজনেব নাম কাসিম। কিন্তু নাম যাহাই হোক মজলিসে নামের সঙ্গে তাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক নাই—দোস্ত বলিয়াই ইহারা এ মজলিসে বিশেষ পরিচিত। আমির একটু লম্বা আর সলেউদ্দীনের একটু প্রিয়ও বেশী; ইহার নাম বড় দোস্ত কাসিমের নাম ছোট দোস্ত। অন্য বন্ধুগণ যে যেখানে পাইয়াছে বসিয়াছে। সলেউদ্দীন একবার করিয়া সুরা পাত্রে মুখ দিতেছেন —আর একবার ডাইনে বড় দোস্তের প্রতি ও একবার বামে ছোট দোস্তের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন,—বন্ধুরা যাহা বলিতেছে তাহা শুনিয়া আহ্লাদে গড়াইয়া পড়িতেছেন। একবার আহ্লাদের এত আতিশয্য হইল যে হস্তস্থিত পাত্রের সুরা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া পাত্রটি ভূমিতে রাখিয়াই বড় দোস্তের পৃষ্ঠে হস্তের জবর আদর ঝাড়িয়া বলিলেন "দোস্তজি দিল খোয়া গেল আর সবুর, কত"

খানসামা তখন দোস্তজির সুরাপাত্রে সুরা ঢালিতেছিল—দুগ্ধ দর্শনে বিড়ালের ন্যায় দোস্তজি অতি তৃষিত নয়নে সেই পাত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন, প্রাণটা সেই পাত্রে পড়িয়া রহিল—দোস্ত বলিল—"নবাব শা কুছ পরোয়া নেই—সে সব—বান্দ—া" ইহার মধ্যে পাত্রটি পূর্ণ হইল—আর কথা শেষ করিবার সময় হইল না,—তাড়াতাড়ি তাহা লইয়া দোস্ত উদরসাৎ করিলেন। ছোট দোস্ত ইত্যবসরে বুকে ঘা মারিয়া বলিলেন—"হুকুম হইলে গঙ্গাটা পায়ে হাটিয়া মারিয়া লই—আর একটা দুলীন ঠিক করা কি ভারী কথা" সলেউদ্দীন ঢুলু ঢুলু নয়নে বাঁকাহাসি হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—"ক্যাবাৎ—আল হমদো লিল্লা (আল্লার তারিফ)।"

এদিকে আজিমগঞ্জ (আর একজন বন্ধু) দেখিল উহারা দুই জনেই সমস্ত বাহবাটা পাইয়া যায়—সে হোসেন খাঁর গা টিপিয়া বলিল—"আর দেরি করিলে ফাঁকে পড়িবি।" পাত্র শেষ করিয়া হোসেন খাঁ মস্ত একহুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল "নবাব শা, কথাটা পাড়িয়াছি আগে আমি—সেটা মনে রাখিবেন" "নবাব শা বলিলেন—"বটে হা হা হাঃ।"—

বড় দোস্ত চোখ রাঙ্গাইয়া হোসেনকে বলিল "আজ্ঞে বলিলেন কি"?—হোসেন খাঁ বলিল "আজ্ঞে হাঁ—যা বলিলাম তাই। নবাবশার সাদির পয়গাম টা (প্রস্তাব) আমা হতেই হয়েছে"। বড় দোস্ত রাগিয়া সলেউদ্দীনের দিকে চাহিয়া বলিল "ও কথা শুনিবেন না— ও—ওকি কথা" ছোট দোস্ত আরো কিছু

অধিক সেয়ানা সে মুচকি হাসিয়া চোখ টিপিয়া সলেউদ্দীনের কানের কাছে সরিয়া আসিয়া আগ্রহ-তরঙ্গিত মৃদুস্বরে বলিলেন—"কিন্তু আসল ঘটকটা কে তা বুঝিয়াছেন—সেটা আর বোধ করি বলিতে হইবে না"—তাহা শুনিয়া সের বলিল—"না না আমি" আলি বলিল—'আমি—আলফু বলিল 'আমি' আবদুল বলিল—'আমি'। ঘর শুদ্ধ সকলেই বলিয়া উঠিল—'আমি আমি।' এই আমির মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র আমিগুলি মহা কোলাহল করিয়া একেবারে ডুবিয়া গেল। তখন সকলে নিঃস্তব্ধ হইল—সলেউদ্দীনও আল্লা বলিয়া বাঁচিলেন। তৎক্ষণাৎ এই ঝগড়া চীৎকারের তালটা গিয়া মদের উপর পড়িল—দ্বিগুণ বলে দ্বিগুণ বেগে লাও লাও চীৎকার উঠিল, তাহার পর মহা আক্রোশ ভরে পাত্রস্থিত সুরার উপর সকলের ঘন ঘন আক্রমণ আরম্ভ হইল—এ যুদ্ধে সকলে অন্য কথা ভুলিয়া গেল। উপরি উপরি তিন চার পাত্র টানিবার পর সলেউদ্দীন বলিলেন—"কেবল তসবীর দেখিয়া ত আর প্রাণ বাঁচে না—আসল রূপ দেখাইবে কবে? বড় দোস্ত বলিল—"রূপ—অমনরূপ—জগৎ ভরা রূপ" ছোট দোস্ত বলিল—"রূপ—সেত নূর-মহল—মহল রোসনাই করে থাকে—লাও লাও—আর এক পেয়ালা খানসামা জি"—

"বড় দোস্ত বলিল" নূর-মহল কি রে ক্ষেপা—নূরআলম—জগৎভরা রূপ"—হোসেন বলিল—"দোস্তরে বলিস কিরে—নূর-জেন্নত—স্বর্গের আলো" সলেউদ্দীন গলিয়া ভাবে ভোর হইয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মেরা নূরজাহান, আমার প্রাণ রোসনাই কর্ দিয়ারে,—লাওরে লাও সিরাজ লাও"

এখন নেশা একটু পাকিয়াছে মজলিসটা কিছু জমিয়াছে—খানসামা মদ আনিয়া ঢালিতে লাগিল, সলেউদ্দীন বলিলেন—"বলি দোস্ত জি এ সাদির কথাটা ত প্রকাশ হয়নি"—দোস্ত বলিল "তোবা তোবা, তাও কি হয়—কেউ ভাংচি দিলে জবাব দিহি করবে কে?" নবাব শার প্রাণটা বড় হালকা হইল—তাঁহার বড় ভয় ছিল পাছে এ বিবাহের কথা কেহ শুনিলে বিবাহটা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি আহ্লাদে বলিলেন—ক্যাবাৎ দোস্ত জি—এমন সরেস আক্কেল আর দেখিনি। তবে এখন সাদির দিনটা হয়ে যাক"—

খানসামা সিরাজ দিয়া গিয়াছিল—তাহা এইবার পান করিলেন কিন্তু পান করিয়া তাঁহার মনে হইল তাহা সিরাজ নহে—অন্য মদ। কিন্তু এ শুভ সময়ে প্রাণ সিরাজ চাহিতেছে—তাহা না পাইলে সব যেন ব্যর্থ হইয়া যায়, তিনি লাল চোখ আরো লাল করিয়া "সিরাজ সিরাজ করিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, চাকর গতিক মন্দ দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"সিরাজ নাই ফুরাইয়াছে"—

সলেউদ্দীন 'জাহান্নম' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দোস্ত বলিল "নবাব শা কুছ পরোয়া নেই—দুরোজ যাক্ সিরাজে ঘুমাইয়া থাকিবেন।"

ঘরের কথা যদিও অনেক দিন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, খানসামার ওকথায় তবু এখন সলেউদ্দীনের একটু লজ্জা হইল। একটু হাসিতে তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"দোস্তজি যেখানেই স্ত্রীলোক সেইখানেই হিংসা বুঝলেত? হজরৎ হাসেনকে এই হিংসার বিষে মরতে হয়েছিল আমি ত আমি। ঘরের স্ত্রীলোকটা এ বিয়ের কথাটা শুনেছে—তাই এসময় সিরাজটা আটকে প্রাণটা দমাতে চায়—তা কদিন দমাতে পারিস—দমা—তুই,—তোকে ফাঁকি দিলুম বলে—" দোস্ত বলিল—হাঃ হাঃ—এই—দুদিনের মধ্যে নবাবজি আমাদের নূতন হুলীনের পাশে বসবে, তখন তোর দমবাজি কোথায় থাকবে—"

হোসেন খাঁ আজিমের কানে কানে বলিল—"এইত দশা—এখানে, মদের পালা ফুরালো বলে; শীঘ্র সাদিটা দিয়ে দেওয়া যাক—তাহলে কিছু দিন আমাদের প্রাণভ'রে মদের যোগাড় হোল।"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### উপায়।

ভোলানাথ কেমন করিয়া শুনিলেন, সলেউদ্দীন মুন্নাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া আর একটা বিবাহ করিবেন। ভোলানাথ দেখিলেন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; মুন্নার আর তাহা হইলে কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না, মহম্মদেরও প্রফুল্ল মুখের হাসিটুক চিরকালের জন্য তাহা হইলে অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িবে, এ গৃহের আমোদ হাসিখুসী চিরদিনের মত লোপ পাইবে, সোনার লঙ্কা শ্মশানপুরী হইবে। সমস্ত দিন শেলের মত ঐ কথা ভোলানাথের প্রাণে বিঁধিতে লাগিল। সন্ধ্যা বেলা গান গাহিতে আসিয়া মহম্মদকে দেখিবা মাত্র সে কষ্ট আরো উথলিয়া উঠিল, বৃদ্ধ ভোলানাথ যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কিরূপে কি করিয়া আত্মসংবরণ করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি তানপূরাটা লইয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন। তানপূরাকে দিয়া তিনি সকল কাজই চালাইতে চাহিতেন, গৃহিণী মুখ ভারী করিলে তানপূরা তাঁহার হইয়া মানভঙ্গ করিবে; রাগ কিম্বা বিরক্তি বোধ হইলে তানপূরাকে লইয়া টানাটানি করিবেন, মনের ভাব লুকাইবার সময় বা আহ্লাদে, বিষাদে তানপূরায় দ্বিগুণ ঝনঝনানি উঠিবে, এইরূপে সুখে দুঃখে কাজে কর্ম্মে যত ঝোঁক বেচারা তানপূরাটির সহ্য করিতে হইত। কিন্তু আজ তানপূরাটা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল—কিছুতেই আজ সে সুরে মিলিতে চাহিল না, ক্রমাগতই তিনি কান ধরিয়া তাহাকে সুরে আনিতে চাহেন, ক্রমাগত ঘ্যানর ঘ্যানর করিতে করিতে তাহার তারগুলা পট পট করিয়া ছিড়িয়া পড়ে—তবু সে সুরে মেলে না। সেই শব্দে চমকিয়া ভোলানাথ সলজ্জে সকলের মুখ পানে চাহিয়া আবার শশব্যস্তে তার চড়াইতে থাকেন। কিন্তু এরূপে আর বেশীক্ষণ চলিল না, দেখিলেন—চারিদিকে হাসির একটা রুদ্ধ উচ্ছাস জমা হইতেছে, এখনি মহাবেগে তাঁহার উপর আসিয়া প-

ড়িবে। তরবারি অপেক্ষা এই হাসির আক্রমণকে তিনি বেশী ডরাইতেন, তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে সুরে বেসুরে কোন রকমে তানপূরাটাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া গান গাহিতে গেলেন। কিন্তু গাহিতে গিয়াও গাহা হইল না, মুখ খুলিয়া হাঁ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—দৃশ্যটা এমন অদ্ভুত হইয়া পড়িল—যে মহম্মদ ভোলানাথের কাতরতা অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া হাসিয়া উঠিলেন—তখন ভোলানাথও হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাঁর মনে হইল হয়ত মহম্মদের এমন হাসি আর তিনি দেখিতে পাইবেন না। ক্রমে চারিদিক হইতে রুদ্ধ হাসির উৎস খুলিয়া গেল। বন্ধু বান্ধবেরা ঘর ফাটাইয়া হাহা করিয়া উঠিল, ভোলানাথ শশব্যস্তে তানপূরাটা ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, উঠিয়া দাড়াইলেন, তারপর হোঁচট খাইতে খাইতে তানপূরায় কাপড় ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসির অট্টরবের মধ্যে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার খানিকক্ষণ পর পর্য্যন্ত মজলিসে হাসির গড়রাটা বিলক্ষণ চলিল; এরূপ ব্যাপার আজ নূতন নহে, ভোলানাথ মধ্যে মধ্যে এমনি এক একটি হাসির কারখানা করিয়া থাকেন।

ভোলানাথ এদিকে বাড়ী আসিয়া খানিকটা তার ঝন ঝন করিয়া, খানিকটা মাথায় হাত বুলাইয়া খানিকটা গৃহিনীর সহিত বকাবকি করিয়া খানিকটা শুইয়া খানিকটা বসিয়া, সমস্ত রাত ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কোন উপায়ে যদি সলেউদ্দীনের বিবাহটা বন্ধ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর অনেক মাথা খাটাইয়া একটা উপায় ঠিক হইল, প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমীরখাঁর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বারবন্ধ দেখিয়া মহা ডাকাডাকি হাঁকাহাকি আরম্ভ করিলেন, অনেকক্ষণ পরে একজন স্ত্রীলোক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দ্বার খুলিয়া উত্তম মধ্যম নানা কথা শুনাইয়া বলিল—"মরতে কি আর জায়গা ছিল না—এত সকালে এখানে কেন—" ভোলানাথ অবাক হইয়া দশবার অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া দশবার হাত রগড়াইয়া শেষে মাথায় হাতটি রাখিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী মেয়ে মানুষ, রাগ করিও না, বড় দরকার একবার আমীরের সঙ্গে দেখা করিব"—স্ত্রীলোকটা একটু নরম হইয়া বলিল—"সাহেবকে কি এখন দেখা পাবে, তিনি সেই ১০টার সময় উঠিবেন"—ভোলানাথ বলিলেন—"আমাকে যদি একটু বসবার জায়গা দাও আমি সেই ১০টা পর্য্যন্তই বসিয়া থাকিব"—স্ত্রীলোকটা বলিল—"তবে এস"। তিনি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া একটি ঘরে গিয়া বসিলেন।—কষ্টে স্রষ্টে এক প্রহর কাটিয়া গেল—আরো কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে ভাবিতেছেন—কাসীম আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার আমীরের সঙ্গে কি দরকার ছিল, একটু পরে আমীরও আসিয়া দেখা দিলেন।

ভোলানাথকে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন—অভিবাদন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "ওস্তাদজি যে, মেজাজ সরীফ ত!" ভোলা-

নাথ বলিলেন—"আর দোস্ত জি তোমরা পাঁচ জনে মিলে মেজাজের দফা রফা করলে, তা আবার সরীফ।" আমির বলিলেন,"কেন কেন? এমনো কথা আমরা আল্লার কাছে চার বেলা এজন্য নেমাজ পড়ছি" ভোলানাথ সে কথা কানে না করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলি মীরসাহেব পরকালটা মানা হয়ত" আমির বলিল, "পরকাল? হাঁ শাস্ত্রে ও কথাটা লিখ্‌ছে বই কি? কিন্তু সে কথাটা এখন কেন? কাসিম ছোট ছোট চোখ দুটা অর্দ্ধেক বন্ধ করিয়া হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওস্তাদজির বুঝি যাওয়ার বন্দবস্তটা হয়ে এসেছে।"

ভোলানাথ বলিলেন,—"আরে ভাই আমার একার নয়, সে বন্দবস্ত সবার জন্যই হয়ে আছে,—তাই বলছি দোস্তজি—এরূপ কাজ কি করতে আছে, জবাব দিহির কথাটা কি ভুলে যাও।" আমির বলিল—"কি কাজটা ওস্তাদজি? জবাব দিহি কিসের?

ভোলানাথ, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন— "এই যে নবাব সাহেবকে মুন্না বিবির কাছ হতে ছিঁড়ে এনে আর একটা বিয়ে দেবার যোগাড় করছ—কাজটা কি ভাল হচ্ছে"— কাসীম খাঁ কর্কশ তীব্র কণ্ঠে হাসিরস্বর বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই ওস্তাদজি অমন বদনাম দিওনা—আমরা ছিঁড়িনি ও অনেক দিনের ছেঁড়া" আমির আর এক দিক হইতে বলিয়া উঠিল—"এই দোষের জবাব দিহি করিতে হইবে? শাস্ত্রেত আছে সাদি যতটা পার কর" ভোলানাথের কথা বন্ধ হইল—বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল—কেমন করিয়া উহাদের মাথায় এদোষের গুরুত্ব প্রবেশ করাইবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। কাসীম বলিল—"কেন ওস্তাদজি তোমাদের শাস্ত্রে কি এরূপ সাদি লেখে না নাকি?" ভোলানাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তা কে বলছে—কিন্তু এতে যে একজনকে খুন করা হচ্ছে—সেটাকি ভাবা হয়েছে।"

কাসিম সেইরূপ নীরস কণ্ঠে হাসিয়া বলিল—"এমন খুনত আথসারই হয়ে থাকে, সেটা আল্লার বলাই আছে। কত পাখী পখালি গরু ছাগল রোজ জবাই হচ্ছে, সে খুনটা কি আর খুন নয়? তোমরাই কি সব চুপ করে আছ"।

ভোলানাথ গরুর নাম শুনিয়া শিহরিয়া রাম রাম বলিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন—"এরা সব একেবারে পাষাণ রে— এদের কাছেও আবার আসা—হা ভগবান।"

আমির দেখিল 'বুড়াকে কিছু অতিরিক্ত রকম চটান হইতেছে, অতটার কোনই আবশ্যক নাই, ভাবিল তাহা থাক্ বরং বুড়ার মনের মত কথা কহিয়া একটু মজা করা যাক, সে আস্তে আস্তে বিনাইয়া বলিল—"ওস্তাদজি বাস্তবিকই কি এ বিবাহে ক্ষতিটা বড় বেশী? তা বুঝিলে কি আমি এমন কর্ম্মে হাত দিই?" ভোলানাথের তখন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে— সামলাইয়া কথা কহিবার সময় নাই—তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ক্ষতিটা বড় বেশী! এমন ক্ষতি এ পর্য্যন্ত কখনো কোথায় ঘটে নাই?" আমির বলিল—"তাইত সত্য নাকি? তাহলে কোন মতেই আমি এ

বিবাহে থাকতে পারিনে, বলুন বলুন ক্ষতিটা কি শোনা যাক।”

ভোলানাথ যেন আশ্বস্ত হইলেন—তাঁহার মনে হইল—তবে এখনো আশা আছে, তিনি বলিলেন—“দেখ—বিবিজি তাহা হইলে আর বাঁচিবেনা”—কাসীম বলিল “আরে তুমি যে বিবিজি বিবিজি করে পাগল হলে—মেয়েমানুষ গুলার কথা আবার কথা! শাস্ত্রে কি বলে সেটা একবার বলতে হোল, মেয়েমানুষ আর পশু সমান—”

ভোলানাথ তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“রেখেদাও তোমার শাস্ত্র; অমন শাস্ত্র আমাদের হলে আমি পুড়িয়ে গঙ্গার জলে ফেলি। আমাদের শাস্ত্র কি বলে শোন—স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন! স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপ স্ত্রীতে আর শ্রীতে বিশেষ নাই’। আদ্যাশক্তি ভগবতী স্ত্রীলোকে অধিষ্ঠান—যে ঘরে স্ত্রী নাই সে ঘরে সুখ-শান্তি নাই—স্ত্রীলোকই এই কঠোর সংসারের জীবন।” আবার ছোট দোস্তের খনখনে হাসির সুর বাহির হইল,—তারপর বলিল “বাবা! মেয়েমানুষের জ্বালায় সুখশান্তি সব হারিয়েছি, আমি একলা না সমস্ত পৃথিবী; ও কথা আর বলো না—”

ভোলানাথ দেখিলেন তিনি উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন, তাঁহার শাস্ত্র উহারা বুঝিবে না—এমন স্থলে ও সব কথা না বলাই ভাল—তিনি বলিলেন—“আচ্ছা বিবিজির কথা ছাড়িয়া দাও—মেয়েমানুষের কষ্ট না হয় নাই বুঝিলে; কিন্তু অন্যদিক ভাবিয়াছ? বিবিজির কষ্ট দেখিলে মসীন সাহেব কি আর বাঁচিবেন,” আমীর-মুখটা গম্ভীর করিয়া ছাগলের মত ছুঁচলো দাড়ী দুলাইয়া বলিল “তাইত ও একটা বিষম কথা” সে সহৃদতায় ভোলানাথ গলিয়া গেলেন,—আমীরকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন “তাহা হইলে দেখ কতদূর সর্ব্বনাশ! মহম্মদ অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু,—মহম্মদকে হারাইলে পৃথিবী একটি মহারত্ন হারাইবে? আমির বলিল “এমন রত্ন হারাইলে আর কি পাওয়া যাইবে”—ভোলানাথ আহ্লাদে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন “তাহার পর মহম্মদের কিছু হইলে—ভোলানাথ যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না—তাহার মৃত্যুও নিশ্চয়। এ বৃদ্ধ মরিলে বাঙ্গালা দেশ হইতে রাগরাগিণী একরূপ লোপ পাইল—বাঙ্গালার বহুদিন কার একটা স্তম্ভ পড়িয়া গেল—এখন বুঝিতেছ কি, এ বিবাহের ক্ষতিটা কি ভয়ানক”

আমীর শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া মুখহেঁট করিয়া রহিল, তাহার পর অতি করুণস্বরে গম্ভীর ভাবে বলিল “পৃথিবীর নেমক খাইয়া এমন নেমকহারামী সয়তানের কাজ। কি কাজেই হাত দিয়াছিলাম—ওস্তাদজি কথাটা আগে বলিতে হয়—”

কাসীমও হাসি চাপিয়া বলিল “ওস্তাদজি আজ হইতে তুমি আমার গুরু হইলে তোমার নামে দুই বেলা খোৎবা পড়িব।—কাহারো উপদেশ এমন হৃদয় স্পর্শ করে

নাই—" আমির বলিল—"যা হবার হইয়াছে ভাই এস এখন হাত উঠান যাক—উঃ ওস্তাদজির পর্য্যন্ত প্রাণের উপর ঘা পড়ে—কালই বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দিব,—এমন কাজও করে—" ভোলানাথের সরল প্রাণ তাহাদের কথায় একবার মাত্র অবিশ্বাস করিল না—ভোলানাথ জানেন মানুষ না বুঝিয়া দোষ করে, ভোলানাথ জানেন মানুষ যত কেন নিষ্ঠুর পাষাণ পাপী হউক না তাহাদের হৃদয়ের এমন কোন না কোন ভাল অংশ আছে যেখানে ঘা দিতে পারিলে—পাষাণও কোমল হয়—পাপীও অনুতপ্ত হয়,—ভোলানাথ ভাবিলেন—তিনি আজ তাহাদের সেই নিভৃত তারে ঘা দিয়াছেন। ভোলানাথ আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিলেন—তাঁহার বক্তৃতা শক্তি যে এতদূর কাজ করিবে—তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না,—তিনি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ইহার পর ঝাড়া একঘণ্টা ধরিয়া জন্ম মৃত্যু পাপ পুণ্য—ইহকাল পরকাল লইয়া বক্তৃতা দিয়া তাহাদের অনুতাপ-দগ্ধ ভষ্মীভূত হৃদয়কে পুনর্জীবিত করিয়া সেখান হইতে তখন আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজের উপর তাঁহার তখন এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে—প্রাণ এতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—যে পথে যদি কোন পাপী তাপীর উপর বক্তৃতা ঢালিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন এই ইচ্ছায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, গান করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ নহে তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আশাটা পূর্ণ করিবার কোনই সুযোগ দেখিতে পাইলেন না। তখন যদি এখনকার মত খবরের কাগজের ধুম থাকিত তাহা হইলে অতি সহজেই এ আশাটা মিটিতে পারিত। কিন্তু এখন অগত্যা তাঁহার উপস্থিত বক্তৃতা-উৎস পাপী তাপীর ভবিষ্যতের পরিত্রাণের জন্য হৃদয়ে রুদ্ধ রাখিয়া, বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী পা দিয়াই মনে পড়িল—আসিতে যে বেলা হইয়া গিয়াছে গৃহিনী না জানি কিরূপ ভাবে বসিয়া আছেন। তখন বক্তৃতার কথা মন হইতে একেবারে ধুইয়া গেল,—আস্তে আস্তে গৃহিনীর মান ভাঙ্গান সাধের টপ্পাটি গাহিতে গাহিতে ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

কত দূরে থেকে অধীর হয়ে,
　　ছুটে এল মলয় বায়।
কেন গো, গোলাপ কলি, মুখটি তুলি,
　　তার পানে না ফিরে চায়
　　আসছে বায়ু সাড়া পেয়ে,
　　বোঁটায় সে যে পড়লো নুয়ে
হাসিটি ফুটতে গিয়ে কেন হোল অশ্রুময়,
　　মলয় তার কাছে এসে,
　　আদর করে হেসে হেসে,
　　উঠলো না সে, সে পরশে
　　ঝরে ঝরে পড়ে যায়।
আকুল প্রাণে তারে বালা
ডেকেছে সারা-বেলা
এল বায়ু সাঁজের বেলা—
সে—অভিমানে মরে যায়।
ছিল বালা ফোটার আশে,
ফুটতে ফুটতে ফুটলো না সে
মলয় বায়ু আকুল-প্রাণে করে শুধু হায় হায়!

# কুমারের দোকান।

পৃথিবী আমার বোধ হয়, যেন একটা কুমারের দোকান। আর মানুষ গুলো তার হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি আসবাব। কতকগুলি মানুষ হাঁড়ী আছেন যাহাদিগকে একবার বাজিয়ে দেখিলেই ভাল কি মন্দ জানা যায়। মানুষের মধ্যে যাঁহারা জালা অর্থাৎ জ্ঞানী বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাদিগকে বাহির হইতে দেখিয়া ও লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়াই আমরা ভাল বলি। যতক্ষণ প্রত্যক্ষে জল না চুচাঁইয়া পড়ে ততক্ষণ জালাকে খারাপ বলিবার জো কি? এমন অনেক অনেক জালা আছে যাহাদের ভিতর কখনই জল পোরা হয় না কাজেই তাহাদের ভাঙ্গা আর কখন ধরা পড়ে না। ইয়োরোপ হইতেই বিশেষতঃ আমাদের দেশে জালার আমদানি। সে যাহ'ক প্রকাণ্ডকায় জালার বেশী দর বটে কিন্তু অল্পমূল্য কূজোর কাছথেকে আমরা কাজ পাই বেশী। মহাপুরুষ জালা মহামান্যের সহিত দালানেই কেবল রক্ষিত হয়, কিন্তু সদা-সর্ব্বদা শোবার বসবার ঘরে কূজা না রাখিলে চলে না। বড় বড় জালার জল কম পড়িলে তাহার নাগাল পাইতে ধড়ে প্রাণ থাকা দায় হয়। কূজার সুবিধা এই যে যতটুকু জল থাকে তাহাই কাজে লাগান যায়। জালার সঙ্গে প্রায়ই, একটা ভাঁড় রাখিতে হয়, তাহা নহিলে জালায় জল থাকিয়াও না থাকা হয়। তাহা আর কারো কাজে লাগে না। মানুষের মধ্যে যাহারা ভাঁড় তাহাদিগকে অত হীন মনে করা হয় কেন? অনেক সময় ভাঁড় না থাকিলে অনেক জ্ঞানী জালা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিত। ভাঁড় দরকার মত জালা হইতে থিতনে জলটুকু আস্তে আস্তে আনিয়া দেয়, ভিতরের কাদা আর কাহারো নজরে পড়ে না। কিন্তু রং-চঙ্গে ভাঁড়গুলি কেবল ঘরের শোভার জন্য সিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। বিয়ে পার্ব্বণ না হইলে এসকল ভাঁড় দরকারে লাগে না, কিন্তু তবুও ইহাদের দর ভারী। যেমন-তেমন ভাঁড় হ'ক না কেন একবার য়ুনিবর্ষিটির হাট হইতে চিত্রিত হইয়া আসিলেই ছোট ছেলেদের কাছে বিশেষ মেয়েদের কাছে বেশী দামে বিক্রী হয়। বাছিয়া লইতে পারিলে কিন্তু ইহাদের ভিতরও এমন অনেক পাওয়া যায় যাহারা দেখিতেও যেমন কাজেও তেমন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহারা সঙ্গদোষে মারা যান।

প্রেমিকেরা পৃথিবীতে কূয়ার ভাঁড়—তাঁহারা একবার এ দিকে একবার ওদিকে কেবল ঘা খাইতেছেন। যিনি রসি টানিতেছেন তাঁহার ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক প্রেমিকের কপালে ঘা আছেই। নিতান্ত দুপোড়নের পাকা ভাঁড় না হইলে এরকম ঘা খাইয়া ঠিকিয়া থাকা দায়। অনেকের ঘা খাইয়া একেবারে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়া দড়ীতে কাণা মাত্র লাগিয়া থাকে কিন্তু তাহাতেই লোককে এমনি কাণা করিয়া দেয়

যে সে ভাঙ্গা উপর হইতে অল্প লোকেরই চোখে পড়ে।

গামলার কপাল খারাপ তাহার গায়ে ময়লাই জোটে, যতরাজ্যের ময়লা জল গামলার বক্ষঃভূষণ। মানুষ গামলা দু একটা কাছে থাকা ভাল যাহার উপর তুমি মনের সব ময়লা জল ঢালিতে পার। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মিষ্ট কথার দ্বারা গামলা আবার পরিষ্কার না করিলে তাহা একেবারে কাজের বার হইয়া পড়ে। গামলা অনেক রকমের যথা, স্ত্রী, ছাত্র, চাকর ইত্যাদি। মানুষ-রূপী তিজেল-গুলা প্রতিবাদের আগুণ না ছোঁয়াইতে ছোঁয়াইতেই চটিয়া যায় কিন্তু ইহাদের ভিতরে একটু খোষামোদ বা মিষ্ট কথায় তৈল লেপিয়া লইলে ইহাদের দ্বারা অনেক রন্ধন হয়। সরা, খুরী, প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র সকল দেখিয়া দেখিয়া আমরা একরকম হতাদর করি কিন্তু সে সকল না থাকিলে একদিনও সংসার চলা ভার হয়, আমাদের দেশে ইহারা প্রায়ই স্ত্রীজাতীয়। কলসী আমাদের মধ্যে বিশেষ কাজে লাগে কিন্তু ভাল মানুষকলসী পাওয়া বড় দুর্ঘট। কলসী জলে তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করে ( কখন কখনো মৃত্যুর উপায় করিয়াও দেয় ) স্থলে পিপাসা নিবারণের উপায় করিয়া দেয়। উৎসবের সময় কলসী মঙ্গল ঘট, তাহার পর যখন শ্মশান হইতে অন্য সকলে বিমুখ হন তখন কলসি তোমার জ্বলন্ত ভস্মরাশি শীতল করে। কলসি সচরাচর বন্ধুনামে অভিহিত।

---

# ফুলের প্রতি।

বাগানের ফুল! গোলাপ! বেল। তোমার হাসিতে তত আহ্লাদ হয় না। তাহাতে কেমন যেন কিসের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। সে হাসি, কাষ্ঠ হাসি; তাহাতে মধুরত্ব নাই, রস নাই। বাগানের ফুল! হাস তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে। আমরা তোমায় হাসাই জোর করিয়া—আমাদের সুখের জন্য। তোমার হাসি অতিশয় কৃত্রিম; তাই হৃদয়ভরা নহে; তাই তাহাতে আনন্দ পাই না।' যে হাসিতে বাধ্য, তার হাসি কাহাকে উল্লসিত করে? জন্ম যার কেবল আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তার প্রীতিকর কার্য্যে কে বিশেষ প্রীত হয়? চিরভৃত্যের প্রভুচর্য্যা কোন প্রভুকে হৃদয় ভরিয়া সুখ দেয়?

বাগানের ফুল! তুমি দাস, চিরদাস। তোমার জীবন মরণ আমাদের হাতে। মানুষ যদি তোমায় আজ ত্যাগ করে, কাল তোমার দশা কি হইবে? শুকাইবে, মরিয়া যাইবে। যাহারা পরাধীন, চিরভৃত্য, পরের সাহায্য ব্যতীত অনন্যগতি, পরিণাম তাহাদের বুঝি এই প্রকারই হইয়া থাকে!

বাগানের ফুল! কাল নাই, অকাল নাই, সাজিয়া থাক বারমাস! তোমার অতুল সৌন্দর্য্যের ছটা দিক্ আলো করে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইবে কি, দুঃখ হয়। তোমায় আমরা সাজাইয়াছি তোমার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের হানি করিয়া,—হানি কেন, প্রায় লোপ করিয়া। অই যে তোমার পাপ্‌ড়ির উপর পাপ্‌ড়ি, তার উপর পাপ্‌ড়ি, কত দল পাপ্‌ড়ি শোভা পাইতেছে। ঐ শোভা কি তোমার বাঞ্ছনীয়? উহা কি তুমি কামনা কর? স্বাধীনতা থাকিলে কি উহা ধারণ করিতে? না। তুমি ঐ পাপ্‌ড়ির বাহার পাইয়াছ কেশরের বিনিময়ে। কেশর পুষ্পের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, পুষ্পের পুষ্পত্ব। তাহা তুমি হারাইয়াছ যে সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত, সে সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই তোমার চক্ষের শূল। পাপ্‌ড়ির কাজ মুকুলে কেশরকে রক্ষা করা, বিকসিত কুসুমে, নিষেক ক্রিয়ার সহায়তা করা। যখন তোমার কেশর বিনষ্ট হইল, নিষেক ক্রিয়া বন্ধ হইল, তখন পাপ্‌ড়ির শোভা বৃদ্ধি তোমার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা, হৃদয়ভেদী বিদ্রূপ। স্বাধীনতার বিনিময়ে, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে কে বহুমূল্য, চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদের প্রার্থনা করে? বেশভূষা যার জন্য, তাহাই যদি না থাকিল, তবে বেশভূষা নিঠুর উপহাস মাত্র।

সহরের ফুলে, বাগানের ফুলে, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটে না। সে পিপাসা মিটে, কোথায়? অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হয়, কোথায়? বনে, প্রকৃতির রাজ্যে। বাগানের ফুল মানুষের। বনের ফুল প্রকৃতির। বাগানের ফুল সাজে মানুষের ইচ্ছায়, মানুষের সাধে। বনের ফুল সাজে প্রকৃতির আজ্ঞায়, প্রকৃতির জন্য। তাই বনফুলের শোভা এত ভাল লাগে। তাই বন্যবৃক্ষ, বন্যলতা, বন্যফুল, বন্য-যাহা কিছু-সুন্দর তাহাই দেখিতে এত ভালবাসি। সে দৃশ্য পুরাতন হয় না। যত দেখিবে, ততই দেখিতে ইচ্ছা বাড়িবে।

বন্য গোলাপ! প্রকৃতির গোলাপ! বাগানের গোলাপের ন্যায়, মানুষের গোলাপের ন্যায়, দেখিতে তুমি তত সুন্দর নও, সত্য। তোমার একদল বই পাপ্‌ড়ি নাই, তাও আবার ছোট ছোট। বাগানের গোলাপের কতদল পাপ্‌ড়ি—বড় বড় পাপ্‌ড়ি। কিন্তু, বনগোলাপ! তুমি স্বাধীন। সকল প্রাণীই যাহার অধীন সেই প্রকৃতি ব্যতীত আর কাহারও অধীনতা মান না। তোমার হাসিতে কেমন যে একটু স্বাস্থ্যব্যঞ্জক লালিত্য, স্বাধীনতা-সুলভ মাধুর্য্য এবং মহত্ব আছে, তাহা অবক্তব্য। সে লালিত্য, সে মাধুর্য্য, সে মহত্ব, পরাধীনে, চিরদাসে, কারারুদ্ধে সম্ভবে না। বন্যফুল! তোমার সৌন্দর্য্য যে চক্ষুর ক্ষণিক প্রীতি উৎপাদনের জন্য, তাহা নহে। সে সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তুমি নানা বর্ণে রঞ্জিত, চিত্রিত বিচিত্রিত হও—হরিদ্রা, সাদা, নীল, লাল, বেগুনে, কত বর্ণের নাম করিব? মানুষের ভাষা হার মানে। বাগানের ফুলেরও ঐরূপ বিবিধ

বর্ণ দেখিতে পাই। কিন্তু সে বর্ণের অর্থ নাই—কেবল নয়নরঞ্জক শোভা, কেবল বাহার! বন-ফুল! তোমার বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থ আছে, গভীর তত্ত্ব আছে, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আছে। সে অর্থ বুঝিতে, সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সে ইতিহাসের কল্পনা করিতে কি সুখ হয়!

পলাশ! তোমার গাঢ় লাল ফুল বন আলো করিয়াছে। সৌখীন পতঙ্গাদি আকৃষ্ট হইতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে; মধুপান করিতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিষেকক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে। পলাশ! তোমার শোভা সার্থক। কারণ তাহাতে ফল হয়; সেই ফলে বীজ জন্মে; সেই বীজে বংশবৃদ্ধি হয়। বাগানের ফুলের শোভা নিরর্থক, নিষ্ফল। যে ফুলের ফল হয় না, তার কি দুঃখ, তার ফোটাই বৃথা, তার জীবনে ধিক?

বন-মল্লিকে! তোমার একদল বই পাপ্‌ড়ি নাই। বেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র; তার কতদল পাপ্‌ড়ি! সৌরভেও তুমি বেলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার সৌরভ, সার্থক। কারণ, তোমার কেশর আছে, নিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

বন ফুল? কত বিপদ আপদ অতিক্রম কর, বাধা প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া উঠ, নিজের বলে। বাগানের ফুলের তাহা করিতে হয় না, সে শক্তিও নাই। সার দিয়া, জল দিয়া, কত যত্ন করিয়া, তাহাকে বড় করিতে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। তাই, সে এত দুর্ব্বল; তাই, একটু অযত্নেই তাহার আয়ুঃশেষ হয়। বন ফুল! তোমার জীবন সংগ্রাম কি ভয়ানক ব্যাপার? বাগানের ফুলের সে সংগ্রাম নাই, সে সংগ্রামজনিত শক্তি এবং বলও নাই। দুঃখ কষ্টে না পড়িলে, যন্ত্রণা ভোগ না করিলে, শত্রুর সহিত না যুঝিলে কি কাহারও বল হয়? বন ফুল? তোমাদের প্রত্যেকের কত শত্রু! তোমাদের প্রত্যেককে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই, এত তেজ, এরূপ কান্তি, এমন স্ফূর্ত্তি।

সৌন্দর্য্যশালি, সুরভি বন-কুসুম! তোমার সৌভাগ্য। কত শত বনের মক্ষিকাদি তোমার কাছে পালে পালে আসিতেছে। তোমার অপর্য্যাপ্ত বীজোৎপাদনের উপায় করিতেছে। জীবন সমরে তোমার জয়ের আশা বাড়িতেছে।

কিন্তু, বীজোৎপাদন সংগ্রামের শেষ নহে। চারা জন্মিল, অন্যান্য ফুলের চারা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। বন্য জন্তু আসিয়া তাহার সুকোমল অঙ্গে আঘাত করিল। এত বিঘ্ন সত্ত্বেও যে কতকগুলি সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, সে নিজের গুণে, নিজের বলে। এত ফাঁড়া কাটিয়া যে বাঁচিয়া উঠে, প্রকৃতির এরূপ কঠোর পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, তাহার বল, তেজ, না হইবে কেন?

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বাসুদেব বিজয়। রাম নাথ তর্করত্ন প্রণীত, মূল্য ২ টাকা।

আমরা মনে করিয়া ছিলাম সংস্কৃত ভাষার সমাদর আর নাই এবং এই সমাদর না থাকাতে এই ভাষায় গ্রন্থও প্রকাশ হইতেছে না। কিন্তু বড় সুখী হইলাম এই মৃতপ্রায় দেবভাষাকে জীবন দান করিতে এই ভারতবর্ষে এখনও লোক আছেন। ইহাঁদের চেষ্টা সফল হউক বা না হউক কিন্তু ইহাঁদের উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বাসুদেব বিজয় নামক একখানি মহাকাব্য উপহার পাইয়াছি। মনে হইয়াছিল মৃতভাষায় মহাকাব্য রচনা অসম্ভব, সম্ভব হইলেও সুপাঠ্য হইবে না, কিন্তু বাসুদেব বিজয় পাঠে আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে পাঠমাত্রেই অর্থ প্রতীতি হয় এবং ইহা শ্রুতিমধুর। আমরা সুন্দর দেহে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতস্থান অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি না। মহাকাব্যে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হয় ইহাতে তাহার অসদ্ভাব নাই। স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহার ভাষাই বিশেষ প্রশংসনীয়। এখনকার দিনে ভাষাগত প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া কেহ যে এতবড় একখানি কাব্য লিখিবেন ইহা আমাদের বোধ ছিল না। সে বিষয়ে তর্করত্ন কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বাসুদেব বিজয়ের ভাষা মধুর ও প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেক আধুনিক বিষয়ের বর্ণনা ও আধুনিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু ভাষার গুণে তাহা কিছুতেই আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। তর্করত্নের লেখনী যমক রচনায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে আমরা মহাকবি কালিদাসের পর এরূপ আর দেখিতে পাই না। সর্ব্বান্তঃকরণে তর্করত্নকে কহিতেছি তিনি চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক হইবেন। আমরা তাঁহার বাসুদেব বিজয় পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

---

কৃষি গেজেট। এখানি কৃষিবিষয়ক নূতন মাসিক পত্রিকা। রাজা প্রজা জমীদার সকলকেই কৃষি পদ্ধতির মর্ম্ম অবগত করাইয়া যাহাতে স্বদেশের কৃষি পদ্ধতির উন্নতি হয় এবং কৃষিকার্য্যের সহজ উপায় শিক্ষা দিয়া যাহাতে দীন কৃষকদিগের দারিদ্র দূর হয় এ পত্রিকা খানির তাহাই উদ্দেশ্য। ইহার উদ্দেশ্য যে অতীব প্রশংসনীয় এবং এ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে যে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য, এবং যেরূপ সুশিক্ষিত ও উপযোগী ব্যক্তিগণ ইহার তত্ত্বাবধারণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এই পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে। আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া পত্রিকা খানি দীর্ঘজীবি হউক এই আমাদের বাসনা।

# ভারতাক্রমণ।

## (জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীর পর)

ভারতে পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তিমুরলঙ্গ ১৩৯৮ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তগলক বংশীয় মহম্মদ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবর্ষ অধিকার করা তিমুরলঙ্গের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—সর্ব্বধ্বংশ ও সর্ব্বনাশ। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। তিমুর শতদ্রুর তটদেশ হইতে পথবর্ত্তী দেশ সকল লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হন। মহম্মদ তগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলুণ্ঠিত, ও দগ্ধ হয়। অধিবাসীগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। এইরূপে বিপ্লবময় উদ্দেশ্য সাধনের পর তিমুর কাবুল দিয়া আপনার দেশে ফিরিরা যান।

ক্রমে পাঠান রাজত্বের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আইসে, ক্রমে পাঠান রাজগণ ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়েন। বাবরসাহ এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদগোরী যাহার সূত্রপাত করেন, বাবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারী গণ তাহা সম্প্রসারিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন। ভারতে মোগল-রাজত্ব পাঠান রাজত্ব অপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত। প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ ঘটনা বিশেষে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, আকবরও কিয়দংশে সেইরূপ বাধ্য হইয়া ভারতে উপনীত হন। পশুপালক ও কৃষিজীবী আর্য্যসম্প্রদায় মধ্য-আসিয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্রমে আফগানিস্থানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। বাবরও আপনার মধ্য-আসিয়ার রাজ্য হারাইয়া কাবুলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘোরতর আত্মবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কৃষিজীবী আর্য্যগণ শান্তিলাভের আশায় দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন, বাবরও আত্মবিগ্রহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শান্তিলাভ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আশায় পঞ্জাবের মুসলমান শাসনকর্ত্তার পরামর্শে আফগানিস্তান হইতে খাইবার-গিরিপথ অতিবাহন করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রতিদ্বন্দী শূন্য হন নাই, অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাধান্য স্থাপন ও বসতি বিস্তার করিতে হয়। বাবরও ভারতবর্ষে অসিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি পানিপথের মহাযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দী এব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আর্য্যশাসনে ও আর্য্যসভ্যতায় যেমন বিজিত অনার্য্যদিগের অনেক উপকার হয়, মোগল রাজত্বের পূর্ণবিকাশে তেমনি নিপীড়িত ভারতবর্ষীয়দিগের অনেক অংশে উপকার ও শান্তিলাভ

হইয়া থাকে। বাবরের রোপিত বীজ আকবরের সময়ে ফলপুষ্প-যুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়। প্রখরতাপ্রপীড়িত ভারতবর্ষীয় গণ এই তরুবরের শীতল ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা এই আশ্রয় স্থলে সমবেত হইয়া, শান্তিলাভে হতাশ হয় নাই। ইহাদের অনেকের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়—অনেকে কৃতজ্ঞতার আবেশে —বাসনার পরিতৃপ্তিতে বিভোর হইয়া "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা'' ধ্বনিতে চারি দিক মাতাইয়া তুলে। সুতরাং বাবরের আক্রমণে ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হয়—ইহাতে আপাততঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার অবিচারের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। পাঠান রাজত্বে ভারতবর্ষীয়েরা যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, আকবর বা সাহজাঁহার রাজত্বে সে শৃঙ্খল শিথিল হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অনেকাংশে স্বাধীনতার সুখভোগ করিতে থাকে। পরজাতির অধীন হইলেও আকবর-শাসিত ভারতবর্ষকে স্ব-তন্ত্র বলা যাইতে পরে।

পাঠান রাজত্বের ভগ্নদশায় যেমন তিমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন মোগল রাজত্বের ভগ্নাবস্থায়ও তেমনি আর দুইজন আক্রমণকারী আফগানভূমি হইতে ভারতে সমাগত হন। ইহাঁদের একজন নাদির শাহ; অপরজন অহম্মদ সাহ দোরয়ানী। নাদির পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, আর অহম্মদ শাহ আফগানিস্তানের দোরয়ানীদিগের অধিনায়ক হইয়া ১৭৬৯ অব্দে ভারতে উপনীত হন। এই দুই আক্রমণও তিমুরলঙ্গের আক্রমণের ন্যায় সর্ব্বস্বান্তকর। সুতরাং ইহাতে ভারতবর্ষের কোন উপকার হয় নাই।

ভারতবর্ষকে এই সকল প্রধান প্রধান আক্রমণের গুরুতর ভার—সময়ে সময়ে অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে। হিন্দু আর্য্যগণের ভারতাক্রমণে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে যে ভারতবর্ষ সমগ্র সভ্য জগতের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূজা পাইয়াছে, তাহার মূল এই আক্রমণ। রাজনৈতিক বিষয়ে বাবরের আক্রমণেও ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হইয়াছে। যেহেতু ইহাতে জেতৃ-বিজিত সম্বন্ধ অনেকাংশে শিথিল হয়। আকবরের রাজত্বে এই সম্বন্ধ প্রায় উঠিয়া যায়। বিজিতহিন্দু বিজেতামোগলের সমকক্ষ হইয়া সৈন্য পরিচালন—রাজ্য শাসন ও গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণা দান করিতে থাকে। যাহা হউক, ভারতবর্ষ স্থলপথে এইরূপ বহুবার আক্রান্ত হইলেও আক্রমণকারীর গতিনিরোধে সমুচিত ক্ষমতা প্রদর্শন করে নাই। সুলতান মহমূদ মধ্য-আসিয়ার সম্মুখে ভারতবর্ষ-আক্রমণের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। এই দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ার পর ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণকারীর নিকট সর্ব্বদা অবনত থাকিতে হইয়াছে। সুলতান মহম্মদ ও মহম্মদ গোরীর সময়ে ভারতবর্ষ হিন্দু-প্রধান ছিল। স্বাধীন

হিন্দুরাজগণ ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সমগ্রভারত একতাসম্পন্ন বা জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না। এসময়ে ভারতে কোনও পরাক্রান্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের উপকার হইয়াছিল। যেহেতু তখন বাহ্লীকের গ্রীক ভূপতিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। সুলতান মহম্মদ বা মহম্মদ গোরীর সমকালে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন রাজ্যের উপর কোন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তখন ভারতের দেহ পরস্পর বিযুক্ত ছিল। সুতরাং অভিনব আক্রমণকারার প্রয়াস সফল হয়। মুসলমানগণ ভারতের রত্ন সিংহাসন অধিকার করিলেও সমুদয় স্থলে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। ইহাদের অনেকে বিলাসসুখে প্রমত্ত থাকিতেন, অনেকে অত্যাচার অবিচারে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। এজন্য অন্তর্বিদ্রোহে রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ঘটিত। সুতরাং এসময়েও ভারতবর্ষে একতা ছিল না, ভারতবর্ষ এসময়েও বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে প্রয়াস পায় নাই। লোদীবংশের শেষ রাজা এব্রাহিমের সময়ে ভারতবর্ষের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তখন স্থানান্তরের তাতার ভূপতিও মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলতখাঁর আহ্বানেই বাবর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। মুসলমান ভূপতিগণের আক্রমণেই ভারতে মুসলমান রাজত্বের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ইহার সংঘাতে শিবজীর মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত মরহাট্টাদিগেরও অধঃপতন হয়। ভারতে প্রবেশের সেই অদ্বিতীয় দ্বার—খাইবার গিরিবর্ত্ম ইহাঁদের আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। প্রধানতঃ দুই আক্রমণে প্রথমে ভারতের দুইটি প্রধান মুসলমান শক্তির অধঃপতন ঘটে, ইহার পর আর দুই আক্রমণে ভারতের শেষ মুসলমান রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাজয় হয়। এই সকল আক্রমণের স্রোতও আফগানিস্তান হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ঔরংজেবের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির দোষেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, মোগলের শাসন ও মোগলের আধিপত্যের ক্রমে বলক্ষয় হইতে থাকে। এই সময়ে নাদের শাহ আফগানিস্তান হইতে প্রবলবেগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। দিল্লী বিধ্বস্ত ও রাজকীয় ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়। নাদিরের আক্রমণের পর আর দিল্লীর সম্রাটগণ মাথা তুলিতে পারেন নাই। যে শরীরী রোগ-জীর্ণ হইয়া শোচনীয় ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, তাহা এই আক্রমণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল প্রতাপ। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তাঁহাদের বীরদর্পে কাঁপিতেছিল। এই প্রবল প্রতাপ ও এই বীরদর্পের অধঃপতন অহম্মদ শাহ দোর্-

য়াণীর আক্রমণে ঘটে। অহম্মদ শাহ আফ্‌গানিস্তান হইতে আসিয়া ১৭৬১ অব্দে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্য পরাজিত করেন। এই সময় ইংরেজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন। এই দুই মুসলমান আক্রমণে যেরূপ মোগল ও মর্‌হাট্টার বলক্ষয় হয় সেইরূপ পূর্ব্বে আর দুই মুসলমান আক্রমণেও দুইটি মুসলমান শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। তিমুরলঙ্গের আক্রমণে মহম্মদ তগলকের রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং বাবরশাহের আক্রমণ প্রবাহে লোদী বংশের রাজত্বের শেষ চিহ্ন প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সুতরাং মুসলমান ভারতে কেবল হিন্দু শক্তিই সঙ্কুচিত করে নাই, মুসলমানশক্তিও বিনষ্ট করিয়াছে।

সুলতান মহমূদ যেমন উত্তরদিক হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত করেন, ভাস্‌কো ডি গামা তেমনি ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতে আসার পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন। সুলতান মহমূদ মধ্য-আসিয়ার সহিত ভারতবর্ষ সংযোজিত করিয়াছিলেন, সেকন্দর শাহের পর ভাস্‌কো ডি গামা ইউরোপের সহিত ভারতের সংযোগ সাধন করেন। সুলতান মহমূদ মহা পরাক্রান্ত দিগ্‌বিজয়ী ভূপতি—ভাস্‌কো ডি গামা একজন সামান্য নাবিক। সুলতান মহমূদ সৈন্য সামন্ত লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ভাস্‌কো ডি গামা বাণিজ্য ব্যবসায় প্রসঙ্গে ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই সামান্য নাবিকের আবিষ্ক্রিয়ায় কোন রূপ রাজনৈতিক ফলের উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু শেষে এ অবস্থায় পরিবর্ত্ত হয়। শেষে এই আবিষ্ক্রিয়া হইতে ভারতে তুমুল রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতের বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজের প্রতিদ্বন্দী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ ভাস্‌কো ডি গামার আবিষ্কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের উপকূলে উপনীত হন। এসময়ে ওলন্দাজদিগেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত ওলন্দাজের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ভাস্‌কো ডি গামার আবিষ্ক্রিয়ার যেরূপ ফলভোগ করিতে ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরেজ ও ফরাসী সেইরূপ ফলভোগে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষ অরাজক অবস্থায় ছিল। নাদিরশাহের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হীনবল হইয়া পড়িয়া ছিল। মোগল্ সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট—ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়া, ঘোর অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অরাজকতা, ইংরেজ ও ফরাসী, উভয়কেই ভারতে আত্ম প্রাধান্য স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপে দুইটি প্রবল বণিক-সম্প্রদায় ভারতের রত্নসিংহাসন লাভের আশায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দী ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এ প্রতিদ্বন্দী-

তায় ফরাসীর পরাজয়র হয়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারত ইংরেজের পদানত হইয়া উঠে।

ভাসকো ডি গামার আবিষ্ক্রিয়া হইতে এইরূপ মহাব্যাপার সম্পন্ন হয়। সামান্য নাবিক যখন ঘোরতর কষ্ট ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর যে পথ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি মনেও ভাবেন নাই যে, এই পথই এক সময়ে সুদূর বিস্তৃত ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। সুলতান মহমূদের উদ্‌ঘাটিত পথ অপেক্ষা ভাসকো ডি গামার আবিষ্ক্রিয়ায় ভারতে গুরুতর রাজ-নৈতিক ফলের বিকাশ হইয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই—ভারতে আপনার রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার মানসে সৈন্য সামন্ত লইয়া মহাসাগর অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন নাই। সুলতান মহমূদ বা মহম্মদগোরী প্রভৃতির সহিত ইংরেজকে একশ্রেণীতে নিবেশিত করা যায় না। বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া প্রধানতঃ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যেই এদেশের শাসন-দণ্ড অধিকার করিয়াছেন। সময় ও অবস্থা, উভয়ই ইংরেজের অনুকূল হইয়াছিল। এই অনুকূলতায় ইংরেজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। ইংরেজ ভারতের আক্রমণকারী না হইলেও ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। আয়তনে পরিমাণে ইহাঁদের ভারতসাম্রাজ্য আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রা-জ্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে।

এখন ভারতাক্রমণের স্থলপথ ও জলপথ উভয়ই জিগীষু জাতির সুপরিচিত হইয়াছে। রুসিয়া ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের সীমা-ন্তভাগে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সুলতান মহমূদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিবেন কি না, সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিতেছেন। জলপথে ফরাসীদিগের উপর অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনন্তকালের অভিঘাতে ভারতের অবস্থা আবার পরিবর্ত্তিত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যদ্দর্শীই অবগত আছেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

---

# সুলোচনা।

দিন যায়; বর্ষের পর বর্ষ আসে—রথের পর রথ আসিল। আমাদের দুইটি হৃদয় আবার সেই আকাশতলে—সেই মনোহর বিপিনে—সেই বর্ষাবারি-প্রফুল্ল দুইটি কদম্ব পুষ্পের মত ফুটিতে লাগিল।

মলিন সন্ধ্যার তারাগুলি মলিন। রাত্রি যত বাড়িতে থাকে তাহাদের দীপ্তিও সমু-জ্জ্বল হয়। প্রতিপদের মলিন চন্দ্রমা, কলার পর কলা লইয়া গগন-প্রাঙ্গণ কিরণে প্লাবিত করে। আমাদেরও দুটি শিশু হৃদয় দিনে

দিনে বাড়িতে লাগিল, এখন পরস্পরের প্রীতি সাধন করিতে পরস্পরে কতই না উৎসুক। ওগো তোমাদের সুখের ধরা বুঝি ভালবাসিবার নিমিত্তই গঠিত হইয়াছিল। তোমাদের এই প্রীতি-প্রফুল্ল কুসুমিত ভূঅঙ্ক বুঝি শিশুদিগের খেলিবারই প্রাঙ্গণ।—পল্লিগ্রামে স্বভাবের কি মধুর উচ্ছ্বাস! তরুরাজির কেমন বিচিত্র শ্যামল শোভা! তাহাতে কেমন কমনীয় সুরভি-কুসুমকান্তি! কেমন কলকণ্ঠ বিহগ সম্প্রদায়। কেমন সুরচিত কুলায় শ্রেণী! সে সকলি কলিকাতায় আমার বাটীতে কেন?

নগরে কেমন বিবিধ চারু শিল্পনির্ম্মিত মনোহারী পদার্থ নিচয়! কেমন সুচিত্রিত সুন্দর-কল্পনা-গ্রথিত পুস্তক সমূহ! কেমন সুকবির হৃদয়োন্মাদক কাব্যোচ্ছ্বাস, সে সকল সুলোচনার ক্ষুদ্র কুটীরে কেন?

এখন যে কেবল রথোপলক্ষেই আমাদিগের সন্দর্শন তাহা নহে। নিদাঘ সায়াহ্নে তটিনী-বক্ষে নৌক্রীড়া কেমন! শীতকালে প্রদোষ বা প্রভাতে ঘোটকারোহণে ভ্রমণ কেমন স্বাস্থ্যকর! বর্ষাকালে স্কুল পালাইয়া ভিজিতে ভিজিতে পাটীগণিত খানি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়া গাছে গাছে নীড়ান্বেষণ কেমন! আর মধ্যাহ্ন সময়ে পল্লব-বহুল বৃক্ষতলে শয়ান থাকিয়া সুলোচনার মুখ হইতে বিদ্যাপতির কান্তপদাবলি শ্রবণ বড়ই মধুর! কখন দেখি সুলোচনা কোন বালিকার কেশ রচনা করিয়া দিতেছে; কখন দেখি কোন বৃক্ষের ডালপালা কাটিয়া দিতেছে; কখন দেখি বৃদ্ধ পিতামহীর কাছে বসিয়া রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিতেছে; কখন বা কোন দুঃখীর সন্তানকে খাদ্য বা বস্ত্র দিতেছে। ফলতঃ সর্ব্ব সময়েই সেই প্রীতিময় সরল স্বচ্ছভাব। সীতাদেবী ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া ছিলেন, আমার সুলোচনাকে বোধ হয় কোন লাবণ্যময়ী তরল-প্রাণা শিশির-বিধৌতা উষা কোনদিন একটি বৃক্ষতলে প্রসব করিয়া গিয়াছিল।

দিন যায়, বর্ষার পর বর্ষা আসে। প্রতিবৎসরই রথ হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই কেবল রথ দেখা চলে না। তোমার দুঃখের পৃথিবীতে পীড়া আছে, মৃত্যু আছে, পাঠশালা রাক্ষসী আছে, পরীক্ষা আছে, আর প্রবাস আছে।

জ্যামিতি পড়িতে পড়িতে, কি সুলোচনে, তোমাকে স্মরণ করিতাম? পুস্তকের শিরোভাগে ও পদদেশে এই সব বৃক্ষলতার চিত্র দিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিয়া দিবে। বিদেশে পড়িবার সময় উত্তরোত্তর দুই বার কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, জিজ্ঞাসা কর জানিতে পারিবে।

দিন যায়—সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসে, মাসের পর মাস। কত সপ্তাহ!—কত মাস! বর্ষের পর বর্ষ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। কত বর্ষ!

আজি কত বৎসর পরে আবার সেই পুকুরের ঘাটে বসিয়া আছি। চারিদিকে আবার সেই পূর্ব্বকার প্রাবৃট শোভা! নীল জলে আবার সেই নীল-আকাশ। আর্দ্র রৌদ্রে আবার সেই কীট পতঙ্গাদির

কোলাহল। ধীরে আবার সেই বাতাস বহিতেছে। ধীরে আবার পুকুরের জল কাঁপিতেছে, ধীরে আবার জন কোলাহল কানে আসিতেছে। মানব-হৃদয় কে বুঝিতে পারে? প্রকৃতির মহিমা কে কবে জানিয়াছে? কত বৎসর পরে আমি আবার সেই সুপরিচিত পুষ্করিণী-তীরে। নয়নে অশ্রুজল কেন? ধীরে ধীরে হৃদয়ের কোন স্থান হইতে বলিতে পারি না অশ্রুরাশি উত্থিত হইয়া গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতেছে। সেত শোকের অশ্রু নয়। সেত বিরহ সন্তাপের অশ্রু নয়। জানিয়া হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থান হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুরাশি উঠিয়া আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে।

সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছি। ধীরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা পুকুরে নামিতেছে। হরিণ শিশুর মত চকিত দৃষ্টি। কুসুমকল্প-দেহলতা। দাও না, আমাকে একটি কেঁপু দাও না, গালফুলাইয়া বাজাই।

"একি "সু" কি মন্ত্রবলে তুমি আবার সেই শিশু হইয়াছ"?

পশ্চাদ্ভাগে—অতি নিকটে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম একটি শীর্ণকায়া বৃদ্ধা আস্তে আস্তে ঘাটে নামিতেছে। চিনিলাম ঠাকুর মা—তাহার ঠাকুর মা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সু" কোথায়?" শুনিলাম;

""সু'র যা কিছু আছে বাবা, ওই মেয়েটি। আয় মা জলের ধারে যাস্‌নে পড়ে যাবি"

ওগো তোমাদের ক্রূর পৃথিবীতে বাল্য-বিবাহ আছে—মাদকসেবন আছে—স্বার্থ-পরতা আছে—স্বেচ্ছাচারিতা আছে। তোমাদের পৃথিবীতে রমণীর আদর নাই। সৌন্দর্য্যের পূজা নাই। ভালবাসা নাই। ভালবাসিবার নিমিত্ত এ পৃথিবী গঠিত হয় নাই।

তারপর রৌদ্র বৃষ্টি লইয়া—ছায়া আলোক লইয়া—হর্ষ বিষাদ লইয়া এ জীবন কতদূর কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন আবার শৈশব জীবনের সেই সুদূর অভিনয়টি স্মরণে আমার হৃদয় যে বিকল হইয়া যাইতেছে। সেই আবেগ—সে উন্মত্ততা—সেই দুঃখস্রোত আবার আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। স্মৃতির উজান ঠেলিয়া যে আর ফিরিতে পারিতেছি না। সংসারকে যে আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছি না। যাই আমি—আমি বৃদ্ধ, লোল মাংস, পলিত কেশ। আমি যাই—আমাকে ছাড়িয়া দাও।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

---

# জিজ্ঞাসা।

আমরা ফাল্গুনের ভারতীতে বাল্য বিবাহের পক্ষে এবং জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে ঐ বিষয়ের বিপক্ষে, এই দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি *। প্রথম প্রবন্ধের লেখক রসিক

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত প্রতিবাদটির পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরকালী সেন

বাবুকে দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক সত্যেন্দ্র বাবু এক-দেশদর্শিতা দোষে দোষী করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সত্যেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত এবং বহুদর্শী ব্যক্তিও নিতান্তই ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে লেখনীধারণ করিয়াছেন, তখন এবিষয়ে একটা মীমাংসা হইয়া যায়, আমাদের একান্ত ইচ্ছা। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে কত বাক্‌বিতণ্ডা, তর্ক বিতর্ক, বক্তৃতা লেখা, কত কি হইয়া গেল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এবিষয়ে সকলের গ্রাহ্য এবং কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এমন একটি মীমাংসা হইল না। কলমে এবং জিহ্বায় ইহার উৎপত্তি, বিকাশ ও লয় হইতেছে।

সত্যেন্দ্র বাবু নিজপক্ষ হইতে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে; সেগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলে আমরা তাঁহার প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিব এবং তাঁহার প্রতি আমাদের বরাবর যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে।

তাঁহার প্রধান আপত্তিগুলি এই :—(১) অল্প বয়সে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। (২) বালস্ত্রী প্রসূত-সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয়। দেশীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ডাক্তারগণের মত আমাদের দেশে সচরাচর যে বয়সে সন্তান হইয়া থাকে, তদপেক্ষা ৪।৫ বৎসর পরে হইলেই সন্তান সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ হইবে। (৩) বালক বালিকা অপ্রাপ্ত বয়সে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় একত্রে সহবাস করিবে ইহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত ইত্যাদি। এক্ষণে এই আপত্তিগুলি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিতেছি।

সত্যেন্দ্র বাবুর ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তি নিশ্চয়ই উত্তমরূপ অবগত আছেন, যে স্ত্রীলোকদের স্মরণ শক্তি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ এবং কয়েকটি বিষয় তাঁহারা অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ন্যায় পরিণামদর্শী ব্যক্তি বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর প্রকৃতিগত ভয়ানক দোষ সকলও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ শিক্ষা পাইলে উপকারের পরিবর্ত্তে শত শত অপকার ঘটিবে কি না? এরূপ শিক্ষার পরিবর্ত্তে চিরকাল ঘোর অজ্ঞানে ডুবিয়া থাকা কি প্রার্থনীয় নহে? কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র বাবু আদৌ এই নীতি বিবর্জ্জিত শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। প্রাচীন কালে, আমাদের দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত যাহার মূলভাব নীতি ও ধর্ম্ম, সত্যেন্দ্র বাবু সেইরূপ শিক্ষায় নারীগণকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য অধিকবয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিতে চান। আমরা বলি চারি বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা, বঙ্গমহিলাগণের পক্ষে যথেষ্ট। ৮।৯ বৎসরে

---

চৈত্রমাসে উঁহার আর একটি প্রতিবাদ করেন। ভাং সং

লেখাপড়ায় স্বভাবতঃ প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। তাহার পর অন্যের সাহায্যের উপর তাহাদের নির্ভর করিয়া থাকিবার কোন আবশ্যক হয় না। অগ্রে কর্ত্তব্য সংসারিক কার্য্য করিয়া এরূপ শিক্ষিতা রমণী ২।৪ ঘণ্টা বিদ্যালোচনা করিবার সময় করিয়া লইতে পারেন। যখন বালকগণ ৮।১০ বৎসরে শিক্ষাবিষয়ে আত্মনির্ভরপর হইতে পারে, তারপর শিক্ষকের সাহায্য সামান্যই আবশ্যক হয়, অপেক্ষাকৃত স্মরণশক্তি প্রভৃতির অধিকারিণী হইয়া বালিকাগণের শিক্ষার কি ব্যাঘাত হইতে পারে? আরও দেখুন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা বালকদের অপেক্ষা অনেক অধিক। বালকগণ কেবল বিদ্যালয়েই শিক্ষা পায়, কিন্তু বালিকাগণ অহরহঃ মাতা, ভগিনী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অধিক কি ক্রীড়াপ্রসঙ্গেও গৃহস্থালী প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারে। আমাদের দেশে বালিকাগণের প্রচলিত খেলায় এবং 'পুণ্যিপুকুর' প্রভৃতি ব্রতে যে সকল মহতী শিক্ষা অজ্ঞাতসারে দেওয়া হয়, বালিকাগণ সে শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বয়স্থা হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। সে সকল শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান ছার শিক্ষার কি তুলনা হয়? এছাড়া কেন যে আমরা শিক্ষার জন্য অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখার বিরোধী তাহা পরে বলিব।

সত্যেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি, বালস্ত্রী প্রসূত-সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয়, ইত্যাদি। অপূর্ণ-দেহ পিতামাতার সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হইবে, একথা স্বতঃসিদ্ধ। বাস্তবিক ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না, এবং এ বিষয়ে কোনও তর্কও উঠিতে পারে না। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু যদি নিরপেক্ষভাবে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের সন্তান সন্ততির রোগ ও দৌর্ব্বল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বাল্যবিবাহকে কখনই ঐ অনর্থের হেতু বলিতেন না। ভিন্ন দেশের জলবায়ু, তথাকার অধিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের দেশের কোন বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যে দেশে ব্যায়াম করা ঘোর অসভ্যতা, যে দেশে ভূমিষ্ট হইয়া অবধি কেবল 'পুস্তকে মুখে' থাকিতে পারিলে চতুর্দ্দিকে যশঃ সৌরভ বিকীর্ণ হইতে থাকে, সে দেশের লোকের শরীর কি কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে? যে বয়সে জন্মাক না কেন, তাহাদের সন্তান সন্ততি দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইবেই হইবে। ইহাত সাত কোটি বাঙ্গালীর কয়লক্ষ ব্যক্তির কথা হইল। বাকি সমস্তের অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। বঙ্গদেশ আজ পঁচিশ বৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে প্রপীড়িত; ম্যালেরিয়া বঙ্গবাসীর দেহ খাক্ করিয়া ফেলিতেছে, ইহার দৌরাত্ম্যে বঙ্গদেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাজধানীর বাহিরে সমস্ত দেশে শারীরিক পরিচালনা থাকিলেও ম্যালেরিয়ায় তাহার ফল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ২০ বৎসর দূরে থাক, ৪০ বৎসর বয়সে বিবাহিত হ-

ইলেও বাঙ্গালী কখনই সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে না। ইহার উপর ঘোর অন্নাভাব। একে রোগের জ্বালা, তাহাতে উদরে অন্ন নাই। বাঙ্গালীর পূর্ণদেহ কে আশা করিতে পারেন? তাই প্রার্থনা করি, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বিজ্ঞ ডাক্তারগণ ভাবিয়া দেখিবেন, বাল্যবিবাহ আমাদের শরীর ও মন নষ্ট করিতেছে না, উক্ত সকল বিষম অনর্থ আমাদের অপূর্ণতার প্রধান কারণ। চিরকাল এবং সর্ব্বত্র আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে এবং ব্যায়াম চর্চ্চা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, ম্যালেরিয়া দেশ ব্যাপিবার পূর্ব্বে, এবং বর্ত্তমান সভ্যরাজার অনুগ্রহে দেশে অন্নকষ্ট হইবার পূর্ব্বে বাল্যবিবাহের কোন কুফলের কথা কেহ উল্লেখ করিয়াছিলেন কি? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের বলবীর্য্যের কথা, কেহ কি অবগত নহেন! অধিকদিনের কথা ছাড়িয়া দিন, আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি যে প্রকার বলিষ্ঠ, সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবি ছিলেন, আমরা কি তাহার শতাংশের একাংশ বলশালী ও সুস্থশরীর এবং তাহার অর্দ্ধেক কালও জীবিত থাকি? এদিকে তাঁহাদের বিবাহ আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্প বয়সে হইয়াছিল। আমাদের দেশ যেরূপ উষ্ণ প্রধান, বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক্ষণে আমাদের দেশে ঠিক বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে, প্রতীত হইবে। বালিকাদের পাঁচ হইতে দশ বৎসরের পরিবর্ত্তে, দশ হইতে বার বৎসর এবং বালকদের তের হইতে সতের বৎসরের পরিবর্ত্তে আঠার হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ, যোগ্য সময়ে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৩য় আপত্তি—বালকবালিকা অপ্রাপ্ত বয়সে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় একত্রে সহবাস করিবে ইহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা যে বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি, সে বয়সে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় একত্রে সহবাস করাও কি সত্যেন্দ্র বাবুর অমত? একটি নিয়ম condition রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের প্রস্তাবিত বয়সে বিবাহ দেওয়া যুক্তি ও নীতিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। পুরুষদের বাল্যকাল হইতে রীতিমত ব্যায়াম প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলন আবশ্যক, এবং বালিকারা যাহাতে সর্ব্বদা উচিতমত অঙ্গপরিচালনা করিতে পারে, এ প্রকার কার্য্য শিক্ষা এবং তাহার ভার তাহাদের প্রতি দেওয়া কর্ত্তব্য।

তারপর সত্যেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন, 'যে বয়সে তাহারা বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতেও নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, সে বয়সে তাহাদের বিবাহ ঘটাইয়া দেওয়া অন্যায়। ইহার উত্তর আমাদের দিবার আবশ্যক নাই। বঙ্গদেশে যাঁহার মত বিজ্ঞ, পণ্ডিত এবং বহুদর্শী ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন, আমরা এস্থলে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া সত্যেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিব।' "বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরস্পর স্বভাব

চরিত্র বুঝিয়া যুবক যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটী কথা আছে, উটি কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ঐ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯।২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪।২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পর স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্য প্রায় থাকে। একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, একটী মৃদু মধুর হাস্য, একটী অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়, স্বভাব, চরিত্র, রুচি পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না। দেখ যে দেশে অধিক বয়সে পরিণয়ের নিয়ম, সেই দেশেই পরিণয়োচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত। যদি প্রকৃতরূপে স্বভাবাদির পরীক্ষা হইতে পারিত, তবে ওরূপ হইবে কেন? ফলতঃ অন্ধ অনুরাগ প্রণোদিত উদ্বাহ বন্ধনে প্রকৃত প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা বিরল।

সামাজিক কোন রীতিনীতির উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কতদূর অন্যায় এবং অনিষ্টকর, মালাবারির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মতে তাহা প্রকাশ হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবুর ন্যায় ব্যক্তি পুনরায় এ প্রস্তাব কেন করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

পরিশেষে বক্তব্য যে,যে একটী অবক্তব্য কারণে বাঙ্গালী বালকদিগের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করিতেছে, সত্যেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বাল্য-বিবাহে তাহার সহস্রাংশের একাংশও শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করিতে পারে কি না। বিবাহের বয়স কয়েক বৎসর বাড়াইয়া এই ফল দাঁড়াইয়াছে, বাল্যবিবাহ একবারে উঠিয়া গেলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা একস্থলে বলিয়াছি, নারীগণের অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা অন্যায়। ইহার এক কারণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; দ্বিতীয় কারণ আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ; ৩য়, বর্ত্তমান নীতি বিবর্জ্জিত শিক্ষার কুফল; ৪র্থ, সমাজ মধ্যে দিন দিন শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব।

জনৈক মীমাংসা প্রার্থী।

---

# POSITIVISM কাহাকে বলে?

## প্রথম প্রস্তাব।

অগস্ট্ (এস্থলে লোকে ঐ মহাত্মার নাম যে প্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, আমি সেই আকারে লিখিলাম। কিন্তু যদি কাহারো বিশুদ্ধ রূপে ও ফরাশী রীতি অনু-

সারে ঐ নাম উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি 'ওগৃৎকোঁত্' এইরূপে উচ্চারণ করিবেন) বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে তিনি Positivism নামে একটী দর্শন (Philosophy) এবং ধর্ম্ম (Religion) আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা সমাজের এক নূতন উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাস কতদূর যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে আমি অধিকারী নহি। আমি দেখিতেছি যে, যদিচ অদ্য ২৮ বৎসর হইল ঐ মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, যদিচ ইয়োরোপে তাঁহার মত ক্রমশ অধিক পরিমাণে লোকের পরিচিত হইতেছে,—কিন্তু লোকের নিকট সমাদৃত হইতেছে কি না সন্দেহ। অতএব ভবিষ্যতে কম্‌টের প্রচারিত দর্শন ও ধর্ম্মের যে কি গতি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের লোকে জানিতে পারিবেন। ইহা খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় অতিদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য বিদ্বান বুদ্ধিমান ও প্রতিভান্বিত ব্যক্তিবর্গের নিয়ামক হইবে, কি এককালে অদর্শন হইয়া যাইবে, তাহা বলিবার উপযুক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আমি নহি। আপামর সাধারণ দূরে থাকুক এখন পর্য্যন্ত বিদ্বান লোকেরাও কম্‌টের মতের সমাদর করিতে প্রস্তুত নহেন। মাস দুই হইল, ম্যাথিউ আর্নোল্‌ড্, যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ ও প্রধান লেখক, তিনি কহিয়াছেন যে, 'কম্‌ট্ একটা ফ্রান্সদেশের বুড়ো জ্যেঠা' (an old French pedant)। যখন ম্যাথিউ আর্নোল্‌ড্রের তুল্য লোকে এখন পর্য্যন্ত কম্‌ট্‌কে এই ভাবে নিরীক্ষণ করেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, যদি কখন কম্‌টের মত বিস্তার লাভ করে, তবে তাহাতে বিস্তর বিলম্ব হইবে। অদ্য ২৮ বৎসর হইল কম্‌টের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। যদিচ কম্‌ট্‌কে আমার ভাল লাগিয়াছে একথা স্বীকার করিলে কোন পাঠকেরই কম্‌টের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবার সম্ভাবনা দেখি না এবং আমার সে প্রকার অভিমানও নাই, আমি এ বিষয়ে একজন প্রামাণিক লোক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে ইচ্ছাও করি না, অহঙ্কারও করি না,—তথাপি এই বিগত ২৮ বৎসর সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য [illegible] এই ২৮ বৎসরের মধ্যে যেমন অন্যান্য লোকেরো ঘটিয়াছে, তেমনি আমারো জীবনের বিস্তর পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। শোক দুঃখ মনস্তাপ বুদ্ধি বিভ্রম চপলতা দুঃশীলতা দৌরাত্ম্য নৃশংসতা প্রভৃতি যে সকল কাণ্ড লইয়া সামান্য ব্যক্তিদিগের জীবন গঠিত হয়, এই ২৮ বৎসরের মধ্যে আমারো তাহা বিস্তর ঘটিয়াছে। কত প্রকার মত ভাল লাগিয়াছে, কত প্রকার মত অগ্রাহ্য বোধ হইয়াছে, একই মত আমার চক্ষে কত ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু কম্‌টের বিষয়ে যে শ্রদ্ধা ভক্তি, তাহা পূর্ব্ববৎ অবিচলিত রহিয়াছে। যখন যে অবস্থায় কম্‌টের গ্রন্থের যে ভাগ হউক না কেন উদ্ঘাটন করি না, দশ বার পংক্তি পাঠ করিলেই বুদ্ধি যেন তাজা হইয়া উঠে, যেন মনের মধ্যে কোথাও

অন্ধকার বা ছায়া পড়িয়াছিল, খানিকটা আলো লাগিল এবং অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইল। যেন কত দূরবিস্তারিত চিন্তার পথ খুলিয়া দেওয়া হইল, যেন কত উপকারী ও কার্য্যোপযোগী জ্ঞান লাভ করিলাম, এই প্রকার বোধ হইতে থাকে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার এপ্রকার হয় বলিয়া কিছুই সপ্রমাণ হইতেছে না। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে না যে, কম্‌টের মতের মধ্যে কোন পদার্থ বা সার আছে। কিন্তু সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অপর ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, কম্‌ট্ অধ্যয়নে আমি কেন অত দূর আপ্যায়িত হই, তাহা হইলে কিছু কাজ হইলেও হইতে পারে। যাঁহারা কম্‌টের বিষয়ে কিছু অবগত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যে তিনি ঘোর নাস্তিক ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে লোকে নাস্তিক হয়, কিছুই মানে না, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার করে না, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গোপনে পাপ করে, দুশ্চরিত্র হয়, পরকালের ভয় রাখে না, লোকে ভাল বলিবে কি মন্দ বলিবে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে না ইত্যাদি। কিন্তু কম্‌টের গ্রন্থে এ প্রকার উপদেশ কিছুই নাই। বরঞ্চ তিনি লোকদিগকে যেরূপ ধার্ম্মিক ও সদাচারী হইবার বিধি দিতেছেন, কোন পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সেরূপ কঠিননিয়ম প্রচার করেন নাই। অতি প্রধান প্রধান পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপদেশের সারাংশ বলিতে গেলে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, যে কাহারো মন্দ করিও না, ভগবানের প্রতি মনকে রাখিয়া দাও, তাহা হইলে পরকালে অনন্ত সুখ পাইবে। এই উপদেশ অনুসারে চলিয়া যদি কেহ সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া ক্রমাগত ভগবানের ধ্যান করে, তাহার প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু কম্‌টের মতে সে আচরণ দোষাশ্রিত। তিনি বলিবেন, যে তুমি তোমার নিজের বস্তু নহ, তুমি তোমার আপনাকে যথা ইচ্ছা বিনিয়োগ করিতে পার না, তাহা করিলে তোমার অধর্ম্ম হয়। তোমার পিতা মাতা তোমাকে সংসারে আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের কৃপায় তুমি বিস্তর আনন্দ এবং স্বচ্ছন্দ অনুভব করিয়াছ, তাঁহারা তোমা উপলক্ষে বিস্তর ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মনে দুঃখ দিয়া তুমি যদি নিজের পরকালের চিন্তায় রত হও, তবে তোমার অসংগত কার্য্য করা হয়। যদি কেহ আর একজনের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিপদের সময়ে তাহাকে পবিত্যাগ করে তাহা হইলে ভদ্রলোকে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কি মনে করে? কৃতঘ্ন ও নরাধম মনে করে না কি? পরকালের চিন্তায় পিতা মাতাকে ত্যাগ করাতেও সেইরূপ কৃতঘ্নতা আছে। কম্‌টের উপদেশ এই প্রকার। এ উপদেশের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা। মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক আচরণের বিষয় কম্‌ট্ এই রূপে বিবেচনা করিবেন।

কম্‌ট্‌কে বলা হয় যে তিনি নাস্তিক অর্থাৎ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং ইহাও মানেন না যে মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে। আস্তিক লোকেরা মনে করেন যে পরমেশ্বর এবং পরলোক না মানিলে লোকে অধার্ম্মিক হয়, কারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তেজস্বিনী নহে, তাহারা আপনা হইতে ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে না। কাম ক্রোধ বা লোভের বশীভূত হইয়া তাঁহারা যখন কুকর্ম্ম করিতে যান, তখন অনেক সময় পরমেশ্বরকে স্মরণ হয়, বিশ্বের একজন নিয়ন্তা আছে, এপ্রকার মনে হয় এবং পরলোকে ক্লেশ পাইতে হইবে এই ভাবিয়া কুকর্ম্ম-প্রবৃত্ত লোকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যদিচ সকল সময়ে কুকর্ম্মপ্রবৃত্ত লোকে ঐ ভয়ে কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে না বটে, তথাপি কেহ কেহ কখন কখনত বিরত থাকে, অতএব ঐ বিশ্বাসের উপকারিতা আছে ইহা মানিতে হইবে। যাহা দ্বারা লোকের মনে ঐ বিশ্বাসের লাঘব হয়, অর্থাৎ আস্তিকতা নষ্ট হইয়া নাস্তিক মতের প্রতি অনুরাগ জন্মে, সে প্রকার দর্শন কখনই সমাজের উপকারী নহে। ইহাও না মানিয়া থাকা যায় না যে, কম্‌টের গ্রন্থ সর্ব্বদা অধ্যয়ন করা অভ্যাস থাকিলে পরলোকে বিশ্বাস ও পরমেশ্বরের প্রতি ভয় এই দুই মনোবৃত্তি ক্রমে অন্তর্ধান হয়। কিন্তু ঐ দুই মনোবৃত্তি অন্যান্য কারণেও অনেক স্থলে লোকের মন হইতে তিরোধান হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ত কখন কম্‌ট্‌ অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কিছুই মানেন না। তাঁহারা বাহ্যিক লৌকিক রক্ষা করিয়া চলেন বটে, কিন্তু অনেকে এরূপ আছেন যে এমন কুকর্ম্ম নাই যে তাহা তাঁহারা করিতে পরাঙ্মুখ। সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্ম করিবার অবসব সকলের উপস্থিত হয় না। যেমন মনে কর, যদি অন্যে তোমার হাতে বিশ্বাস করিয়া টাকা রাখে, তবেত তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পার। কিংবা যদি খুন করিবার মত তোমার রোক্ থাকে অথবা নির্ভয়তা থাকে, তবেত তুমি খুন করিতে পার। অতএব এরূপ স্থলে বিশ্বাস-ঘাতকতা কর নাই বা খুন কর নাই বলিয়া তোমাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না। সুতরাং আমি যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কহিলাম, তাঁহারা খুনকারী বা বিশ্বাসঘাতক না হইলে না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদেব মধ্যে অনেকে যে ঘোরতর লম্পট, মিথ্যাবাদী ও অন্যান্য বিষয়ে যথেচ্ছাচাবী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের নিকট তুমি পরমেশ্বর বা পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে এমন কোন যুক্তি বা তর্ক উপস্থিত করিতে পারিবে না, যাহা তাঁহারা বাক্য বিস্তার করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারেন? অথচ হিন্দুসমাজে তাঁহারাই শিক্ষক ও ব্যবস্থা দাতা, বিষয়ী-লোকে তাঁহাদের কথা শুনে ও তাঁহাদের আচরণ দেখে। সুতরাং বিষয়ী লোকে নিজে তর্ক করিতে না পারুক,

কাজের সময় পরকালের ভয় বড় একটা রাখে না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের বড় একটা বিবিধ প্রকারের কুকর্ম্ম করিবার অবসর হয় না, কিন্তু বিষয়ী লোকগণ মনে করিলে অসংখ্য প্রকার কুকর্ম্ম করিতে পারেন। বিষয়ী লোক যদি জমীদার হন, তিনি প্রজার নামে জাল কবুলতী বা জাল জমা-বন্দী প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনি অবাধ্য প্রজাকে বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া বিলক্ষণ প্রহার দিয়া পরে মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা অব্যাহতি পাইতে পারেন। তিনি যদি ব্যবসাদার হয়েন, কম্ ওজনের বাট্ খারা রাখিবেন, বাজারদরের অপেক্ষা বেসী দরে মাল বিক্রী করিবেন, খারাপ মাল ভাল বলিয়া বেচিবেন। তিনি যদি গোয়ালা হন, প্রাণান্তে খাঁটী দুধ দিবেন না। তিনি যদি স্বর্ণকার হয়েন, ভরিকে দুই আনা চুরি না করিয়া গহনা গড়িবেন না। এইরূপে যেদিকে কেন দৃষ্টিপাত কর না, কটা লোক ধর্ম্ম বা পরমেশ্বরের ভয় বা পরলোকের ভয় ভাবিয়া কাজ করিতেছে? তাহার কারণ কি? আমাদের দেশে ত রামায়ণ মহাভারত সকলেই কিছু কিছু জানে, অনেকে পড়ে, বিস্তর লোকে কথকের মুখে শুনে। ঐ দুই গ্রন্থে পদে পদে লেখা আছে, পাপ করিলে নরকে যাইতে হয়, পরলোকে শাস্তি পাইতে হয়। এই পাপে আর জন্মে কানা হয়, অমুক পাপে কুষ্ঠরোগী হয় ইত্যাদি। কিন্তু কাজের বেলা দেখিতে পাওয়া যায় যে বিস্তর লোকে পাপ করিয়া স্বার্থসাধন করিতেছে। ইহার কারণ বোধ হয় পরস্পর দেখাদেখি। বিষয়ী লোকে দেখিতেছেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মুখে যাহা বলুন, কাজে কিন্তু তাঁহাদের অনেকের মতে মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। বিষয়ী লোকদিগের দেখাদেখি সামান্য লোকেরাও পাপাচরণ বিষয়ে নির্ভয় হয়। তবে আমি অবশ্য স্বীকার করি যে শতকরা দশ পনর জন লোক যথার্থ পরকালের ভয় করিয়া কাজ করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কম্‌ট্ পরকালের ভয় উঠাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে কিছুই নূতন কথা নাই। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই ফ্রান্স্ দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। 'বুদ্ধির পূজা' (worship of reason) নামক মত প্রচার হইয়া ছিল। তাঁহার যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন তিনি চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, ইয়োরোপের বিদ্বান্ লোকদিগের মধ্যে পরলোকের প্রতি ভয় প্রায় লোপ পাইয়াছে, পূর্ব্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিতান্ত খাট হইয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, কেহই কিছু মানে না। 'পাপ করা কেন উচিত নয়' এ বিষয়ে কেহই কিছু স্থির করিয়া বলিতে পারে না। যদি বল যে পাপ করিলে পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে, এ কথা তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। যদি বল যে পাপে সমাজের অনিষ্ট হয়, তাহারা বলিবে যে সমাজের অনিষ্ট হয়, ত আমার কি? যদি বল যে, পাপীকে লোকে নিন্দা করে, তাহার উত্তরে তাহারা কহিবে,

নিন্দাতে 'গায়ে ফোস্কা পড়েনা,' অথবা তাহারা কহিবে যে, লোকের জানিবার দরকার কি? গোপনে কেন পাপ করনা? যদি বল যে পাপ করিলে মনের প্রসাদ নষ্ট হয়, অন্তঃকরণে অসুখ হয়, তাহাতে তাহারা কহিবে, যাহার অন্তঃকরণে অসুখ হয়, সে না করুক। কিন্তু অনেক পাপে আমোদ আছে, কিঞ্চিৎ অসুখের ভয়ে বিরত হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। কম্‌টের পূর্ব্বে এই সকল মত বিলক্ষণ প্রচার লাভ করিয়াছিল। লোকে স্পষ্ট করিয়া ঐ প্রকার না বলুক, তাহারা যেরূপে চলিত, তাহাদিগের মত যে ঐ প্রকারের ছিল, ইহা না ভাবিয়া থাকা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলি কুকর্ম্ম এপ্রকারের আছে, যে পীনালকোডের দ্বারা সাজা না দিলে সমাজ রক্ষা হয় না। সুতরাং যখন লোকে অত দূর ঘোর নাস্তিক হয়, তখনও তাহারা পীনালকোডের ভয়ে সেই সকল কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। কিন্তু লোকে কি কেবল পীনাল কোডের ভয় করিয়া চলিলেই মনুষ্য সমাজ সুস্থির থাকিতে পারে? পীনাল কোডের ভয় করিয়া চলিবার জন্য যতটুকু ভদ্রতা আবশ্যক করে, ততটুকু ভদ্রতা দ্বারা সমাজের তেমন উপকার হয় না। বিশেষতঃ প্রমাণ না হইলে সাজা দেওয়া যায় না। কিন্তু সংসারে অনেক অত্যাচার করা যাইতে পারে, যাহা প্রমাণ করা ভার। সে সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় কি? যত প্রাচীন প্রাচীন ধর্ম্ম, তাহাতে নরকের ভয় দেখাইয়া সেই সকল দুষ্কর্ম্মের পথে কণ্টক দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন কম্‌ট জ্ঞানাপন্ন হইলেন, তখন নরকের ভয় ইয়োরোপে অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। এ অবস্থায় স্বভাবত কম্‌টের মনে এই ভাবনা উদয় হইয়াছিল যে, যাঁহারা নরকের ভয় বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিবার আর কোন উপায় হইতে পারে কি না? তাঁহাদিগকে এমন কোন কথা বলা যায় কি না, যাহা শুনিয়া তাঁহারা নিরুত্তর থাকিবেন; যাহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিতে হইবেক, যে কুকর্ম্ম করা ঠিক আপনার নিজের পক্ষে লাভদায়ক নহে। এই নিমিত্ত জ্ঞানাপন্ন হইয়াই কম্‌ট্ সকল বিষয়ের সকল প্রাচীন মত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যেমন জ্যামিতি বা বীজগণিত বা জ্যোতিষের তত্বগুলি কেহই 'মানিনা' বলিতে পারেন না, তেমনি ধর্ম্মনীতিও এমন প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া যায় কি না, যে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, 'মানিনা'। খৃষ্টধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম বা মহম্মদী ধর্ম্ম, ইহারা ধর্ম্মনীতিকে (Morals) পারত্রিক ভয় স্বরূপ বনিয়াদের উপর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকের মন হইতে সেই বনিয়াদ উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা বিজ্ঞানশাস্ত্র লইয়া বেশী আন্দোলন করিয়া থাকে, তাহারা অনেকেই এককালে নরকের ভয় প্রভৃতি ধর্ম্মনীতির প্রাচীন অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়াছে। এ অবস্থার জন্য কম্‌ট্ দায়ী নহেন। তিনি কেবল ধর্ম্মনীতির পুরাতন আশ্রয়ের স্থলে নূতন আশ্রয় সংলগ্ন করিয়া

দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা তাঁহার কত দূর ফলোপদায়ক হইয়াছে তাহা আমি মীমাংসা করিতে উদ্যত হই নাই। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই চেষ্টার জন্য তাঁহাকে নাস্তিক বা ধর্ম্ম-বিপ্লাবক বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবার কারণ নাই।

আরো এক কথা এই, যে সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্ম পারত্রিকভয়কে আশ্রয় করিয়া সমাজবন্ধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিসংবাদ। এই উপলক্ষে খৃষ্টানে ও মুসলমানে কেবল কথার তর্ক হইয়া থামে নাই, কত যুদ্ধ কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের প্রাণবধ করা অনেক সময়ে ধর্ম্মের কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টানেরা—অজ্ঞান বালককে পিতামাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াকে ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে। এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টানদিগের মধ্যে এ প্রকার বিশ্বাসও কেহ কেহ ধারণ করেন, যে কাফ্রি প্রভৃতি নির্ব্বুদ্ধি নরজাতিগণ ইয়োরোপীয় বুদ্ধিমান্ জাতিদিগের দাসত্ব করিবার জন্য ভগবানের অভিপ্রেত, এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টানেরা ব্রাহ্মদিগকে দ্বেষ করে; যদিচ উভয়েই এক ঈশ্বর মানিয়া থাকেন, কিন্তু খৃষ্টান জানেন যে যিশুর আশ্রয় না লইলে নিস্তার নাই। রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মত্যাগীদিগকে এবং প্রটেষ্টাণ্টদিগকে পুড়াইয়া মারিতেন। অদ্যাপি রুশিয়াতে ইহুদীদিগের প্রতি অত্যাচার করা ধর্ম্মানুগত কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কাথলিকদিগকে নানা কঠিন রাজনিয়মের অধীন হইয়া বাস করিতে হইত এবং ইহুদীদিগের রাজকার্য্য পাইবার অধিকার ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পারত্রিক বিশ্বাসকে ধর্ম্মনীতির মূলীভূত করিয়া স্থাপন করিলেও অনেক প্রকার ধর্ম্ম বহির্ভূত-কার্য্য লোকে ও সমাজবিশেষে দল বাঁধিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইদানীন্তন কালে পূর্ব্বাপেক্ষা এ বিষয়ে অনেক শৈথিল্য হইয়াছে, অর্থাৎ এক ধর্ম্মের লোকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে বা যন্ত্রণা দিতে বা তর্জন গর্জনের দ্বারা স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে পূর্ব্ববৎ চেষ্টা পায় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কম্‌ট্ যে সম্প্রদায়ের শিক্ষক সেই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় ও মত-সমুদায় ক্রমশ বহুল প্রচার হওয়াতেই পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম্মের মতগুলি এখন আর ততদূর তেজস্বী নাই, তাহাদিগের শক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। যদি রোমান্ কাথলিক ঠিক জানিত যে প্রটেষ্টাণ্ট্ মাত্রেই নরকে যাইবে, তাহার বাঁচিয়া থাকাতে আরো পাঁচজনকে সে ভ্রষ্ট ও নরকগামী করিবে, তাহা হইলে রোমান্ কাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রকে মারিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত বা পরাঙ্মুখ হইত না। কিন্তু ঐ মতটী তাহার মনে এখন আর তত শক্তিযুক্ত নাই। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সে আর পূর্ব্ববৎ ক্যাথলিক নাই, ক্যাথলিক মত বিষয়ে তাহার কিছু

দ্বিধা জন্মিয়াছে। কিন্তু মুসল্‌মানদিগের মধ্যে কোন কোন দলের লোক এখনো মনে করে যে, কাফর মারিলেই ভগবান কাফরনিধনকারী মুসলমানকে স্বর্গধামে স্থান দিবেন, সে পরমরূপবতী হূরী মণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া নিরুপম সুখে কালযাপন করিবে। তাহাদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস নামমাত্র নহে। এখনো সময়ে সময়ে পেশোয়ার অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত পাঠানদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথা ভাবিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। হঠাৎ এক দিন তরবারি হস্তে করিয়া 'গাজী থিন্দী' ১ এই কথা উচ্চারণ, করিয়া কোন নিরীহ হিন্দুর বা অসতর্ক ইংরাজের প্রাণ বিনাশ করিয়া বসে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পারত্রিক বিশ্বাস সত্ত্বেও ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ থাকানিবন্ধন সমাজের যে গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় না। কম্‌ট্‌ ভাবিয়াছিলেন যে, এমন কোন ধর্ম্মপ্রণালী গঠন করা যায় কি না, যাহাতে সমস্ত নরপরিবার বিনা ক্লেশে বিশ্বাস ধারণ করিতে পারে এবং ধর্ম্মপ্রণালী-ঘটিত বিবাদ বিসংবাদ সংসার হইতে অন্তর্ধান হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বসিয়া তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার মীমাংসা করা ভবিষ্যতের হস্তে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না! কম্‌ট জ্ঞানাপন্ন হওয়া অবধি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে প্রকার অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনাদি করা সংগত বোধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই তাঁহার মহৎলোকের মত কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই। যত প্রাচীন ধর্ম্ম আছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ধর্ম্মই পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা করিবার দিকে মনঃসংযোগ দেয় নাই। মুসলমানেরা সে বিষয়ে মনঃসংযোগ করা দূরে থাকুক, বরং কাফরদিগের সহিত যুদ্ধ করা ধর্ম্মানুগত বলিয়া বিশ্বাস করে। হিন্দুধর্ম্মে মনুর মতে ক্ষত্রিয় রাজা মাত্রেরি যুদ্ধ একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কেবল খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে বটে যুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা আছে। Peace and goodwill towards men. কিন্তু খৃষ্টানেরা কার্য্যে এতদূর যুদ্ধানুরাগী, যে তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকের সেই অংশটুকু থাকা না থাকা সমান হইয়াছে। কম্‌টের জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি ক্রমাগত এই বাক্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, ইয়োরোপ এক্ষণে সভ্যতার যে সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে এক্ষণে আর কোন মতেই ইয়োরোপীয়দিগের যুদ্ধ করা সাজে না। তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যত তত্ত্ব কথা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে সমুদায়ের সার সংকলন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে স্বদেশকে

---

১ 'গাজী থিন্দী' অর্থাৎ 'আমি গাজী হইব।' কাফর মারিয়া স্বর্গে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত পুরুষকে 'গাজী' কহে।

পরের হস্ত হইতে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে যুদ্ধ করাই অবৈধ ও ধর্ম্ম বহির্ভূত। এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা কম্‌ট করিয়াছেন। এ অংশেও তাঁহার কতদুর সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, ইহা বিচার করা ভবিষ্যতের হস্তে। কিন্তু কম্‌টের কৃতকার্য্যতার পরিমাণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবেক না, তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবেক।

এস্থলে অনেকে বলিবেন যে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে কোনটীই নূতন নহে। কম্‌টের পূর্ব্বেও অনেক বড় বড় লোক ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই সকল উদ্যমের দ্বারা অদ্যাপি কিছুই ফল দর্শে নাই। অদ্যাপি ধরা পাপে পরিপূর্ণ, যুদ্ধ ল্যাঠালাঠি বিবাদ বিসংবাদ, জুয়াচুরি অত্যাচার পূর্ব্ববৎ সংসারে বিরাজ করিতেছে। কম্‌ট সে সম্বন্ধে এমন কি নূতন প্রতীকারের উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহাকে বড় করিয়া মানিতে হইবেক? তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, কম্‌টকে বড় করিয়া মান আর না মান, তিনি যে প্রতীকারের পথ বাহির করিয়াছেন, সেটী পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহার স্বপক্ষেই বা কি যুক্তি আছে, বিপক্ষেই বা কি তর্ক উপস্থিত হয়। তোমার প্রীতিভাজন কোন একটী মতের সহিত তাঁহার মত মেলে না, কেবল এই কারণে চট কেন? তুমি হয়ত পরকাল বিশ্বাস কর, কম্‌ট হয়ত বলেন যে ঐ বিশ্বাস বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কেবল এই জন্যই মুখ ফিরাইয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে চলিয়া যাও কেন? পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকা ভাল কি, উঠিয়া যাওয়া ভাল, এ বিষয়ে তোমার মত কি, আমি জানি না। হয়ত তুমি ম্যাল্‌থসের শিষ্য; হয়ত তুমি মনে কর যে, মধ্যে মধ্যে লড়াই না হইলে নরপরিবার এত বৃদ্ধি পাইবে, যে সকলের আহার জুটিয়া উঠা ভার হইবে। হয়ত তুমি মনে কর যে লড়াই না থাকিলে সংসারে সাহস বীরত্ব লোপ পাইবে। কম্‌ট তোমার ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করিবেন। অতএব তোমার কি দেখা উচিত নয় যে, যুক্তি দ্বারা কম্‌ট প্রতিবাদ করিতেছেন, সেগুলি সংগত কি অসংগত? তুমি হয়ত ইংরেজীতে কৃতবিদ্য হইয়াও বলিতে শিখিয়াছ যে জাতিভেদ একটা বড় অন্যায় ব্যবস্থা নহে; যে সর্ব্ব দেশেই কোন না কোন আকারে জাতিভেদ আছে; যে হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ জাতিভেদ থাকাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে না। কম্‌ট্ বোধ হয় সে কথা বলেন না। সেই নিমিত্ত চটিয়া যাওয়া উচিত নয়। তিনি হয়ত বুঝাইয়া দিয়াছেন যে জাতিভেদ সংসারে কি গতিকে প্রচলিত হইয়াছে। নিজে নূতন কিছু না বলুন, অপরাপর তত্ত্বকথার সহিত জাতিভেদের হয়ত একটা নূতন সম্পর্ক দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ সম্পর্কে কোন কিছু নূতন জ্ঞান পাওয়া যায় কিনা, ইহাও ত দেখা উচিত।

ফলত Positivism পদার্থ কি, এটী স্বদেশীয়দিগকে যদি আমার বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি বলি যে, যেখানে যত প্রকারের উন্নত মত আছে সেই সমুদায়ের একত্র সংগ্রহের নাম Positivism, বাঙ্গালায় ইহার নাম পাওয়া ভার; সংস্কৃততে এরূপ একটী শব্দ পাওয়া ভার, যাহাকে গড়িয়া পিটিয়া ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যও নহে;— ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগ অতীত হইবার পর Positivism এই বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপের একটী প্রধান ব্যক্তির মনে স্ফুরিত হইয়াছে। বাঙ্গালার তুল্য অল্পবয়স্ক ভাষাতে তাহার নাম কিরূপে পাওয়া যাইবে? সংস্কৃতের তুল্য বহুকাল মৃত একটী ভাষাতে ঐ ভাবপ্রকাশক শব্দ কিরূপে থাকিবে? আমি এক সময়ে ভাবিয়া ছিলাম যে Positive বলিতে 'ধ্রুব' বলিলে চলে; কারণ ইহা নিশ্চিত, অর্থাৎ কালে কালে বদল হইবার নহে। সময়ান্তরে ভাবিয়া ছিলাম যে প্রামাণিক অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ এই নাম দিলে চলে; কারণ জ্যামিতি বীজগণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি যেমন প্রমাণসিদ্ধ, ঐরূপ প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে positive এই নামের যোগ্য হয় না। কিন্তু Positive বলিতে ধ্রুবও বটে, প্রামাণিকও বটে; অতএব একটী মাত্র নাম দিলে আর একটীর ভাব পাওয়া যায় না। অতএব দেশীয় ভাষাতে Positiveকে কি বলা উচিত, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। যাহা কিছু উন্নত, ধরাধামের উন্নতির অনুকূল, বিশেষত নরজাতির বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপযোগী, তাহা জ্ঞানরূপই হউক, আর ক্রিয়ারূপই হউক, তাহা যদি সুবিচার-সমর্থিত ও যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহাই Positivism এর অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

---

# জর্জ্জ এলিয়ট।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত অর্থ বর্ণনকালে কার্লাইলের ভাষার প্রজ্জ্বলিত-তরলতার মধ্য হইতে সত্যের নীরবগুণ্ঠিত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। যথা,

There is in man a higher than Love of happiness: he can do without happiness, instead thereof find blessedness. ইহার মর্ম্ম এই,

"সুখাভিলাষ অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে, সুখবাসনা ত্যাগ করিলে তিনি শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন।

অন্যত্র বলিয়াছেন, "এই ক্ষুদ্র মনুষ্য জীবন একটি ভগ্নাংশ মাত্র, এই ভগ্নাংশটিকে যদি বাড়াইতে চাও ত ইহাঁর ভাজ্য বাড়াইলে চলিবে না—ইহার ভাজক কমাইতে

হইবে—(অর্থাৎ আপনাকে—আপনার সুখাভিলাষকে না বাড়াইয়া আপনাকে কমা ইতে হইবে।) গণিত শাস্ত্রে আছে যে এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে অসীম ফল পাওয়া যায় তোমার বাসনাকে শূন্য কর তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী তোমার পদানত হইবে। আমাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—আত্ম বিসর্জ্জনেই যথার্থ জীবনের আরম্ভ।" *

অপর স্থানে লিখিত আছে "তুমি যে ছেলেবেলা হইতে ক্রমাগত কাঁদুনি গাহিয়া আসিতেছ—কিসের জন্য? তুমি সুখী নহ, ইহাই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? মনের মত সম্মান, মনের মত ধনরত্ন, মনের মত আদর যত্ন পাও নাই ইহাই কি তাহার কারণ নহে? হা নির্ব্বোধ! এমন কি কোন লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছ যে সুখ পাইবেই পাইবে? মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি ছিলে না, তুমি বলিয়া কাহারো থাকিবারও অধিকার ছিলনা। যদি সুখী না হইয়া দুঃখের জন্য যদি জন্মিয়া থাক—তাহাতেই বা কি? তুমি কি তবে একটি শকুনি বই আর কিছু নহ—যে কেবল মাত্র আহার আহার করিয়া এই বিশ্বসংসারে উড়িয়া বেড়াইতেছ এবং খাইবার জন্য মৃতদেহ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইয়া এইরূপ হাহাকার করিতেছ? তোমার বায়রণ এখন রাখিয়া দাও—গেটে খোল। †

এরূপ উক্তির পরে যখন আমরা দেখি যে কার্লাইল পরনিন্দা, গোড়ামি, অসার-গর্ব্ব ও স্বার্থপরতার দ্বারা বন্ধু উৎপীড়নে তুলনা-বিহীন, তখন আমাদের শ্রদ্ধা অবজ্ঞায় পরিণত হয়। যাহারা কেবল মাত্র ব[illegible] করিয়া বেড়ান তাহারা কখনই [illegible]

* So true it is, what I then said, that the fraction of life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give infinity. Make thy claim a zero, then; thou hast the world under thy feet. Well didst the wisest in of our time write: "It is only with Renunciation that life properly speaking begins."

† What is this that, ever si[illegible] liest years thou hast been [illegible] and fuming, and lamenting [illegible] tormenting on account of? in a word: is it not because [illegible] not happy? Because the tho[illegible] gentleman) is not sufficientl[illegible] ed, nourished, soft-bedde[illegible], lovingly cared for! Fooli[illegible] What Act of Legislature w[illegible] that thou shouldst be happy? A little while ago thou hast no right to be at all. What if thou wert born and predestined not to be happy, but unhappy! Art thou nothing other than a vulture, then, that fliest through the universe seeking after somewhat to eat; and shricking dolefuly because carrion enough is not given thee? close thy Byron and open thy Goethe—

শিক্ষক নহেন। বলবান প্রলোভন সত্যেও আমরা যথার্থ বৈরাগীগণের উল্লেখে এস্থানে বিরত হইলাম।

অনেক বিষয়ে কার্লাইল ও জর্জ এলিয়টের বৈরাগ্য এক বিষয়ে নির্ব্বিভেদ— উভয়েই মুখে যেমন কাজে তেমন নন। জর্জ এলিয়ট কার্লাইল অপেক্ষা উচ্চদরের শিল্পী। জর্জ এলিয়টের ন্যায় কার্লাইলের শিল্পে শিল্পীর আত্ম-লোপ দৃষ্ট হয় না। জর্জ এলিয়টের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত এস্থানে বলা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

"একদিন প্রাতঃকালে ভাবিতেছিলাম কি বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া আমার প্রথম উপন্যাসটি লিখিব—ভাবিতে ভাবিতে আমার একটু তন্দ্রা উপস্থিত হইল। আমার তখন মনে হইল আমি একটি উপন্যাস লিখিতেছি এবং তাহার নাম "বার্টনের দুরদৃষ্ট। তখনি জাগিয়া উঠিলাম—এবং (জি) কে (লুইসকে) সকল কথাই বলিলাম। তিনি বলিলেন, বড় ত সুন্দর নাম। সেই দিন হইতে স্থির করিলাম আমার প্রথম উপন্যাসের এই নাম হইবে"।

আত্মলোপ ভিন্ন মহৎকার্য্য কদাচ সাধিত হয় না। জর্জ এলিয়ট মিষ্টর ক্রশকে বলিয়াছিলেন যে, নিজের যে লেখা-গুলিকে তাঁহার ভাল বলিয়া মনে হয় সে-গুলি লিখিবার সময় একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব তাঁহাকে অধিকার করিয়া ফেলিত। তখন তাঁহার মনে হইত, 'তিনি না' (not herself) এমন একটি কেহ যেন তাহাকেদিয়া লিখাইতেছে। মিড্‌লমার্চ্চ নামক পুস্তকে ডরোথিয়া এবং রোজামণ্ডের একটি সাক্ষাৎ পরিচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়াই বিশেষরূপে তিনি এই কথাটি বলেন। তিনি বলেন যদিও তিনি জানিতেন যে উহাদের দুই জনের কখন না কখন সাক্ষাৎ হইবেই হইবে, কিন্তু ডোরোথিয়াকে রোজামণ্ডের ঘরে আনিবার পূর্ব্বে—তাহাদের কি কথোপকথন হইবে তাহা একেবারে ভাবিতেন না। কিন্তু তাহাদের যখন সাক্ষাৎ হইল তখন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উক্ত দুই জনের মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া একটি কথা না বদলাইয়া না কাটিয়া একটানে সমুদায় পরিচ্ছেদটি লিখিয়া ফেলেন, এবং সেই অবস্থাতেই উহা মুদ্রিত হইয়াছে। *

---

*She told me (Cross) that, in all that she considered her best writing there was a "not herself" which took possession of her, and she felt her own personality to be merely the instrument through which this spirit as it were, was acting. Particularly she dwelt on this in regard to the scene in Middle-March between Dorothea and Rosamond. Saying that although she know they had sooner or later, to come together, she resolutely kept the idea out of her mind until Dorothea was in Rosamond's drawing room. Then, abandoning herself to the inspiration of the moment, she wrote the whole scene exactly as it stands without alteration or erasure, in an intense state of excitement and agita-

পূর্ব্বোক্ত 'তিনি না' 'not herself' যাহাই হউক না কেন—অজ্ঞাত মস্তিক সঞ্চালন (unconscious cerebration) বা আধ্যাত্মিক কার্য্য—যাহাই বল না কেন, আসলকথা আত্মলোপ ভিন্ন মহৎকার্য্য কদাচ সাধিত হয় না। সম্প্রতি প্রায় সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকার আবালবৃদ্ধ বনিতার উৎসাহ-ভাজন গর্ডনের জীবনীতে তাঁহার উক্তি দেখা যায়—Iam as nothing, Iam the strw in the hands of my Maker. He does his will with a straw as with a mountain. আমি কিছুইনই, আমার নির্ম্মাতার হস্তে একটি তৃণমাত্র। তাঁর ইচ্ছা একটী তৃণের উপরও যেমন একটি পর্ব্বতের উপর তেমনি"

নিম্নের পুরাতন বাক্যে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।—

জানামি ধর্ম্মং ন তু মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন তু মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

অভিমানহীন কর্ম্মই আদরণীয়। আমাদের পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এই সত্যটি সকলের হৃদয়ে অচলরূপে মুদ্রিত করিতে নিরবচ্ছিন্ন অশিথিল-যত্ন ছিলেন। অকর্ত্তাহমভোক্তাহং।

জর্জ এলিয়ট জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে খৃষ্টীয় সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট জীবনে নিঃসম্প্রদায়িক ভাবে সাধারণের হৃদয় বৃত্তি-সংস্করণব্রত প্রতিপালন করেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে কণ্ট-সম্প্রদায়ের সহিত জর্জএলিয়টের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে ফ্রেডরিক্ হ্যারিসন, বেসলি, কনগ্রীব এখনো কণ্টের পতাকা বহন করিতেছেন। আমাদের সিবিল সর্বিসের মৃত গেডিস্ জর্জএলিয়টের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ক্ষণেকের জন্য বিবৃত্তি-সূত্রচ্ছেদ করিয়া জর্জএলিয়টের বঙ্গীয়গণের ইংরাজি ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"এ দেশীয় সংবাদপত্রের প্রধান প্রধান প্রবন্ধ লেখকেরা যেরূপ ভাষা লিখিয়া [illegible] ইংরাজি বলেন—একজন সুশিক্ষিত [illegible] প্রায় সেইরূপ ইংরাজি লিখিয়া [illegible] নিজের বিশ্বাস কিম্বা মতের [illegible] সম্পর্ক নাই, কেবল কতকগুলি [illegible] কিম্বা গালাগালি এক রকম যো[illegible] বসান"।*

সর্ব্বত্র বিশেষতঃ আমাদের [illegible] বর্ত্তমান কালের অসারবত্তার একটি [illegible] স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে—ভান,বৃথ [illegible]

---

tion, feeling herself entirely possessed by the feelings of the two women— Vol. III. pp 44-45.

* After all, I think th[illegible] vated Hindoo, writing what he calls English, is about on a par with the authors of leading articles on this side of the globe writing what they call English—accusing or laudatory epithets and phrases, adjused to some dim standard of effect quite aloof from any knowledge or belief of their own.

অন্যের চক্ষে প্রশংসনীয় হইবার সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্খা, এক কথায় অসরলভাব (insincerity)।

মনুষ্য মাত্রেই অপূর্ণ-জ্ঞান সুতরাং যদি সাধারণের নিকট কোন কথা বলিবার থাকে প্রাণের কথা খুলিয়া বল। তুমি কে যে তুমি অন্যকে শিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কিরূপে জানিলে যে তোমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান হয় অন্যেরও তাহাই হইবে। ভাল, ইহাও যদি মানা যায় যে তুমি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর তাহাই সত্য, কিন্তু সত্য তোমার মনে যে আকারে অবস্থিত, অপরের নিকট অবশ্যই তাহার রূপান্তর হইবে। দুজনের চক্ষে এক বস্তু সমান রূপে প্রতিভাত হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখ তোমার নিজের মনে একই সত্য কত মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হয়। সুতরাং অন্যের স্কন্ধে তোমার ক্ষণিকস্থায়ী মত কোন সাহসে চাপাইতে উদ্যত হইয়াছ? জগৎশুদ্ধ লোক যদি সত্য সমান ভাবে দেখিত তাহা হইলে লোকবহুলত্বের সম্মুখে প্রকৃতির দান ব্যবহার অর্থাৎ যোগ্যতানুসারে দান-নিয়ম (Lx parsimonioe) ভস্মীভূত হইত!

যদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে চাও, যদি প্রকৃতির সহকারী হইতে চাও, তবে ঋজু ভাবে প্রাণের কথা খুলিয়া বল তাহাতে অনেক হৃদয় অনুকম্পিত হইবে। অন্তর জগতের নিয়মাবলী বাহ্য জগতের অনুযায়ী। প্রকৃতির রাজ্যে কখনও অরাজকত্ব ঘটে না। যেমন একটী সঙ্গীত যন্ত্রে সা বাদিত হইলে অন্য যন্ত্রেও সা বাদিত হয় সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়ও অনুকম্পনশীল। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রতি যন্ত্রের শব্দ-রস (timbre) বিভিন্ন। বীণ যন্ত্রের সা ও বেহালার সা, উভয়েই সা বটে কিন্তু উভয় যন্ত্রোত্থিত শব্দ এক নহে। ইহাই যথার্থ শিক্ষাদান। অন্য হৃদয়ে সুষুপ্ত-ধারকে জাগরিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য, অন্য প্রসঙ্গে হারবার্ট স্পেনসর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—Thou shalt do it, তোমার ইহা করিতেই হইবে—একথা রুষের বাদসাই বলুন আর ইটনের বেয়াড়া ছোকরাই বলুক—ইহা বর্ব্বরোচিত।

বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ পত্র লেখকগণ এইরূপ দোষ হইতে দূরে নহেন। সাধারণের নিকট ইহাঁরা পরামর্শের ঝুলি লইয়া উপস্থিত হন কিন্তু ঝুলি শূন্য গর্ভ। উক্ত শ্রেণীর লেখকগণের প্রাণোত্থিত কোন কথাই নাই—থাকিবার মধ্যে আছে কেবল কথার পুঁটলি। গ্রীস দেশে সক্রেতীসের উদয়কালে সোফিষ্ট নামক বহ্বাড়ম্বীগণ মরিয়া সংবাদপত্র লেখক হইয়া জন্মিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা আশ্চর্য্য নহে। যে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হউক না কেন সোফিষ্ট-প্রবর উত্তর লইয়া প্রস্তুত আছেন। এই ক্ষমতার মূল কেবল অলঙ্কার শাস্ত্র জ্ঞান মাত্র। আমাদের দেশে অনেক সম্প্রদায়ের প্রতি একথাগুলি সুপ্রযুক্ত, কেবল লেখক বলিয়া নহে। সোফিষ্টদিগের দর্প চূর্ণ করিতে কবে সক্রেতীসের আবির্ভাব হইবে! কবে আমরা বুঝিব যে আমাদের জীবনের দ্বারা অন্যের বিনাড়ম্বরে শিক্ষা হয় বাক্যের দ্বারা কদাচ হয় না।

জর্জ এলিয়টের জীবন-নীতি-প্রবাহ খৃষ্ট-ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া কণ্ট-সাগরে পতিত হয়। কণ্টের নিম্ন উদ্ধৃত বাক্য জর্জ এলিয়টের গ্রন্থ সমূহের সার কথাঃ—স্পৃহা-শূন্য কর্ম্ম-নিষ্ঠাই আমাদের যথার্থ নিয়তি।—হিন্দু সন্তানের নিকট ইহা নূতন কথা নহে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন—কর্ম্মাণ্যেবাধিকারস্তেমা ফলেষু কদাচনং। কিন্তু এ-শতাব্দীতে প্লাটা, কার্লাইল, জর্জ এলিয়ট য়ুরোপে যে চিন্তা স্রোত বহাইয়াছেন তাহার যথার্থ মূল্য সেখানে চিরাদৃত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

# ঠগী-রহস্য।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার নরঘাতক সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছিল ও এখনও হইতেছে কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই ঠগদিগের ন্যায় প্রকৃত সমাজ বন্ধন করিয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের সামাজিক-কার্য্যপ্রণালী, নানাবিধ নিয়মাদ্বারা পরিচালিত হইত। এই সাম্প্রদায়িক-কার্য্যপ্রণালী এত দূর রহস্যপূর্ণ, ও এতাদৃশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ও এত ভীষণ ভাবে জড়িত, যে সে বিষয়ে রহস্যোদ্ভেদ করিবার জন্য মনে স্বতই একটু কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। আমরা সাধ্যমতে এই রহস্যোদ্ভেদ করিয়া পাঠক বর্গের সেই কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিব।

ভারত, আজ বিট্রিশ সিংহের শাসনের প্রভাবে শান্তির ক্রীড়াভূমি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই শান্তির পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রকার শান্তির চিত্র কেহ কল্পনার চক্ষে দেখিতেও সাহসী হয় নাই। লর্ড বেণ্টিকের সুশাসন প্রভাবে, ঠগী সম্প্রদায়, বলিতে [illegible] কিন্তু [illegible] কাঁপিয়া [illegible] বিদায় লইবার কালে বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিত, পরিজন বর্গের মন সর্ব্বদাই ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কায় আকুলিত থাকিত, কিন্তু আজ কাল শান্তির প্রভাবে, এ সকল চিত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঠগী সম্প্রদায় ভারতের বক্ষে পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ভারতীয় জন সাধারণের যে প্রকার ক্ষতি সংসাধন করিয়াছে, সুপ্রসিদ্ধ, সুলতান মামুদ ও নাদির সাহের, নৃশংস আক্রমণে তাহার এক চতুর্থাংশও ক্ষতি হয় নাই।

ঠগী সম্প্রদায়ের প্রথম উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে, ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহা সম্যক রূপে স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। ভারতে ইহা অতি প্রাচীন কাল

হইতে প্রচলিত; হিন্দু রাজত্বে ছিল কিনা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু মুসলমান রাজত্বে ইহার প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থলে, এমন কি দিল্লী ও আগরার সান্নিধ্যেও ইহাদের সর্ব্বদাই গতিবিধি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Thevonot ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আইসেন। তাঁহার লিখিত ভারতসম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর মধ্যে ঠগীর বিষয়ে দুই চারটী কথা আছে*। তিনি ঐ পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন, "They (the thugs) use a certain rope, with a running noose which they can cast in so much sleight about a man's neck that they never fail. তৎকালে ঠগী যে দিল্লী ও আগরার অতি সন্নিহিত স্থানে প্রবল ছিল তাহাও তাঁহার লিখিত অন্যান্য ঘটনা হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

ঠগী ভারতবর্ষে যে প্রথম উৎপত্তি হয় নাই, তদ্বিষয়ে দুই একটী প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। Strabo প্রভৃতি গ্রীসিয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে পারস্য ভূমিতে xerxes এর সৈন্যদলে ঠগজাতীয় এক প্রকার সৈন্য ছিল। ইহারা ফাঁস লইয়া যুদ্ধ করিত। ফাঁস পাকাইয়া তাহা এত দূর কৌশলের সহিত, বিপক্ষের অশ্ব ও অশ্বারোহীকে এককালে ধরাশায়ী করিত, তাহা শুনিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ঘটনা ও মেজর শ্লিমান কথিত কাহিনী অনুসারে আমরা কতকাংশে স্থির করিতে পারি যে ভারতের অপর পার্শ্বস্থ দেশ হইতে ইহা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া এত দূর পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ও মুসলমান সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক ঠগী এ দেশে প্রথম প্রচলিত হইয়াছে।

সুদক্ষ শ্লিমানের মন্তব্য লিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে ভারতের উত্তরহিমাচল হইতে, সুদক্ষিণে, কন্যাকুমারিকা, ও পশ্চিমে কচ্ছ হইতে, পূর্ব্ব আসাম পর্য্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশেই ঠগীর প্রাদুর্ভাব ছিল। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, রাজপুতানায় ও বেহার ও বাঙ্গালায়, ইহাদের প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন এই সকল নৃশংস নরঘাতকদিগের দ্বারা সমস্ত ভারতে বোধ হয় ৪।৫ শত নরহত্যা হইত। ইহারা এই সময়ে এতদূর উপার্জ্জন করিতে ছিল যে দাক্ষিণাত্যের কেবল খান্দেশ ও কর্ণাট প্রদেশেই ১৮২৬ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ইহাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।* বস্তুতঃ এ সমস্ত বিষয় কল্পনার চক্ষে দেখিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে, আতঙ্কে হৃদয়ের আমূল কম্পিত হয় এবং পুণ্যভূমি ভারতে যে এই নৃশংস নরঘাতক সম্প্রদায় এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া ঘোর অনিষ্ট সংসাধন করিয়াছিল, ও কেহই

* Vide—Thevonot's works translated into English by Dr sherwood Page 41. Pt. 111.

* See—Govt Records on Thugee, chapter I and the Introduction.

তাহাদিগকে উন্মূলিত করিতে পারেন নাই, ইহাতে ভারতীয় রাজগণের অক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হয়। মুসলমান সম্রাট, ও ভারতীয় সামন্ত রাজগণ কেহই এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতেন না। সামন্ত রাজগণ ও তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, ঠগেদের সময়ে সময়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন ও প্রশ্রয় দিতেন। অনেকে হয়ত ইহাদিগকে ঠগ বলিয়া জানিতেন, আবার অনেকে না জানিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় ইহাদের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন। এই প্রকার অমনোযোগীতা ও শিথিলতা নিবন্ধন ভারতে ঠগীর অতি বিস্তৃতি হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে কেবল পুণ্যাত্মা আকবার সাহ দিল্লীর ও আগরার সান্নিধ্যে কতকগুলি ঠগ ধরিয়া প্রাণ দণ্ড করেন, ও তাহাদের আড্ডা গুলি, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। যদিও রাজধানীর নিকটে তখন হইতে ঠগীর প্রতাপ কমিল তথাপি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

ঠগীর দল বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সাধারণতঃ প্রধান—। প্রথমতঃ—তাহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য দিয়া সামন্ত রাজগণের ও মোগল রাজের প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদিগকে বশীভূত করিত। প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য বহু মূল্য মণি মুক্তাদির লোভে তাঁহারাও ঠগদিগকে কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতেন না। সুতরাং তাহারা বিনা বাধায় ও বিনা আপত্তিতে স্বকার্য্য সাধন করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ—মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে, সামন্ত রাজগণ কেবল স্ব স্ব রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ, ও সন্নিহিত রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে পরিব্যাপ্ত থাকিতেন। বাহ্যিক বিষয়ে তাঁহাদিগকে অধিকতর ব্যস্ত থাকিতে হইত। এবং কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের কর্ম্মচারিরা যাহা করিত তাহাই হইত। ইহাতে যে নরঘাতক ঠগসম্প্রদায় পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? চতুর্থতঃ—তৎকালে ভারতের কোন প্রদেশেই গতায়াতের সুবিধা [illegible] স্থানে লৌহবর্ত্ম বা অন্য [illegible] শকটাদি চলিবার সুবিধা [illegible] মেণ্টের মালামাল যে [illegible], সে রাস্তা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল বটে, কিন্তু তাহা দিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইত। অপ্রশস্ত বন পথ দিয়া যাইলে দূরত্বের ও পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইত, এমন কি ইহা দ্বারা অর্দ্ধেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত সুতরাং যাহারা পদব্রজে গমন করিত তাহারা প্রায়ই বনপথে গমন করিত। বনপথে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাহারা অনেক সঙ্গী পাইত। এই সঙ্গীদের মধ্যে অনেকগুলিই ব্যবসাদার ঠগ। ইহারা সুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে সেই বনপথেই বিনাশ করিত, ও সেই মৃতদেহ সমাধি করিয়া কোন

ক্রমেই সে কথা বাহিরে যাইতে দিত না। ইহাতে যে ঠগীসম্প্রদায় ক্রমশ স্পর্দ্ধাবান ও নিরাতঙ্ক হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ? সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শোচনীয় কারণ এই, যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, জমীদার, ও বড় বড় ব্যবসায়ীগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে ইহাদিগকে সাহায্য করিতেন। যাহারা রক্ষক, তাঁহারা ভক্ষক হইলে আর অন্য উপায় কি আছে ? ইহাদের জোরে ঠগ সম্প্রদায় এক স্থানে বহুকাল নির্ব্বিঘ্নে বাস করিত ও এতদ্ পরিবর্ত্তে উক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগকে অসংখ্য ধন প্রদান করিত। নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠকরিলে প্রতীয়মান হইবে যে তখন সদাগর ও রাজকর্ম্মচারিগণ [illegible] ত ভাবে ইহাদিগকে [illegible] রিয়া ইহাদের কার্য্যে [illegible]।” হরিসিংহ নামে [illegible] অতিশয় ধনসম্পন্ন ও প্রকারান্তরে এক ঠগাদলের নেতা ছিলেন। কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্যসহ একজন সওদাগর, বন্দর পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাণিজ্যার্থে আগমন করিতেছে হরিসিংহ বিশ্বস্ত সুত্রে ইহা অবগত হন। তিনি রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় সহজে একখানি ছাড় (পাশ) বাহির করিলেন যে তাঁহার কতকগুলি দ্রব্য শীঘ্রই সেই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। হরিসিংহ এ দিকে লোক পাঠাইয়া, সেই সওদাগর ও তাহার সঙ্গের সমস্ত লোককে নিহত করিলেন। এ কথা কেহই জানিতে পারিল না। পরের দ্রব্য এই প্রকার অমানুষিক উপায়ে লাভ করিয়া তিনি হিঙ্গলী ক্যাণ্টনমেণ্টের বাজারে প্রকাশ্যরূপে সেই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলেন। কেহই ঘুণাগ্রে সত্য ঘটনা কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু হরিসিংহ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে ধৃত হইলে মেজর শ্লিমানকে এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলেন। শ্লিমান শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সুসভ্য ব্রিটিস শাসনে তখন ভারতের এই প্রকার ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

সন্ন্যাসী ও ফকির দিগের নিকট হইতেও ঠগেরা অনেক সাহায্য পাইত। দো-[illegible]ানার ও সরাইয়ের অধিকারীরাও ইহাদি[illegible]কে সাহায্য প্রদান করিতেন। এমন কি সরাইয়ের মধ্যে হত্যা করিয়া প্রকাশ হইবার ভয়ে নিহত পথিককে সেই পান্থশালার মধ্যেই সমাধিস্থ করা হইত। কি নৃশংস ব্যাপার ? স্মরণেও হৃদ্‌কম্প হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে বনপথের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন মঠধারী সন্ন্যাসী বাস করিত। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফলপূর্ণ বৃক্ষ ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খণন করিয়া সুমিষ্ট জল সর্ব্বদা রক্ষা করিত। নিদাঘার্ত্ত পথশ্রান্ত, ক্লান্ত পথিক উপস্থিত হইলে অতিথি বলিয়া তাহাকে সমাদরে ভক্ষ্যদ্রব্য ও পানীয় জলধারা সেবন করান হইত। এ প্রকার সদাশয়তায় কে না ভুলিয়া যায় ? হতভাগ্য পথিক তাহার সুমিষ্ট কথায় ভুলিয়া গল্প করিতে করিতে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলে। এবং এই অবসরে সেই মঠধারী

সঙ্কেত দ্বারা ঠগদিগকে আহ্বান করেন। তাহারা আসিয়া অনতিবিলম্বে সেই পথিককে নিহত করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। ধর্ম্মের পবিত্র-আচ্ছাদনে ধর্ম্মানুমোদিত অতিথিসেবার ছলে, কতশত লোককে যে এইরূপে হত্যা-করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই প্রকার নানা কারণে, বহুল রূপে প্রশ্রয় পাইয়া ভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে চারিদিকেই ঠগী সম্প্রদায় উচ্ছলিত অর্নব প্রবাহের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অকারণে কত শত নিরীহ প্রাণী, যে এই নরঘাতিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিদিন নিহত হইত, তাহা কল্পনার চক্ষে দেখিলেও, শরীরের রক্ত শুখাইয়া যায়। শ্রীরঙ্গপত্তন জয়ের পূর্ব্বে (১৭৯৯ খৃঃ অব্দ) ইংরাজেরা ভারতে ঠগী বলিয়া এক প্রকার নরঘাতক সম্প্রদায় বাস করিতেছে ইহার কিছুই জানিতেন না। শ্রীরঙ্গ পত্তন জয়ের পর ঘটনাক্রমে কতকগুলি ঠগ ধরা পড়ে। কিন্তু তাহাদিগকে সামান্যরূপ শাস্তি দিয়াই এবারকার কার্য্য শেষ হয়, ও দাক্ষিণাত্যের মিত্র রাজগণকে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। * সে উপদেশের কিছুই ফল ফলিল না। প্রায় ১০।১১ বৎসর পরে লেফ্‌টেলাণ্ট মন্সেল সাহেব ঠগীদিগের দ্বারা ঘটনাবশে নিহত হন। ইহাতে অনুসন্ধানের জন্য পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ হয়। মাজিষ্ট্রেট্‌ Hal head একদল সৈন্য পাঠাইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্যস্থ একদল ঠগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা প্রতি বৎসর সিন্ধিয়াকে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা কর স্বরূপে প্রদান করিত। সিন্ধিয়ার রাজ্যে তখন প্রায় [illegible] শত ঠগ একত্রে বাস করিতেছিল। Hal head সাহেবের তাড়নায় তাহারা ইতঃস্তত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই [illegible] হইতেই ঠগীর বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত রূপে মনোযোগ প্রদান করেন।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে, Sherw[illegible] মান্দ্রাজের কোন সংবাদ পত্রে [illegible] অনেক রহস্য প্রকাশ করিয়া [illegible] বন্ধ লিখেন। ইহাতে ঠগী সম্ব[illegible] গুপ্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই সময় ঠগীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আরও আকৃষ্ট হয়। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে [illegible]মেণ্ট কতকগুলি ঠগকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড [illegible]ন। কিন্তু তৎপর বৎসর ইহারা আরও প্রতাপশালী হইয়া উঠে। এই ভয়ানক সময়ে চারিদিক হইতে স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাদের নিকট, শত শত অভিযোগ আসিতে লাগিল। নিহত ব্যক্তিদিগের, পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ আসিয়া অশ্রুসিক্ত আবেদন পত্রগুলি স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্‌কে দিয়া অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রজার ক্রন্দনে

* দেশীয় রাজগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হায়দার আলি ও তাহার পুত্র টিপুসুলতান ঠগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি নিজ রাজ্য মধ্যে কতকগুলি ঠগকে নাসা, কর্ণ, ও হস্ত, পদ বিহীন করিয়া ছাড়িয়া দেন। দেশীয় রাজাদের মধ্যে সেই সময়ে আর কেহই এ বিষয়ে যত্নশীল হন নাই।

ও আবেদনের জ্বালায় ব্যস্ত হইয়া Smith stockwill, Borthwick, প্রভৃতি সিবিলিয়ান গণ কতকগুলি ঠগকে ধৃত করেন ও তাহাদের নিয়মিত রূপে বিচার হইতে আরম্ভ হয়। এই বিচারের মুখে অনেক রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। "সত্য ঘটনা প্রকাশ করিলে খালাস দেওয়া যাইবে" এই প্রলোভন দেখাইয়া আরও অনেক রহস্য বাহির করা হইল। অবশেষে উপযুক্ত সময়ে শ্লিমান কর্ত্তৃক এক ঠগী ধরিবার সমিতি সংগঠিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করা হইল।† জেলায় জেলায় সমিতি সংগঠিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেশীয় রাজগণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কার্য্যের ফলও শীঘ্র ফলিল, মোটে এই সময়ে অনুসন্ধান দ্বারা ৩১৬৬ জন ঠগ্ ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে ১০৫৯ দ্বীপান্তরিত ও ৪১২ জনের ফাঁসি হয়। অবশিষ্ট দিগকে "ঘরসন্ধানী" (Approver) বলিয়া লওয়া হয়।

ঠগীর সম্বন্ধে উপক্রমণিকা স্বরূপে যাহা কিছু বলা হইল বোধ হয় তাহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এই ভয়ানক প্রথা ভারতের কতদূর অনিষ্ট সংসাধন করিয়াছিল এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

[illegible] র বিষয়ে প্রথমে [illegible] ন যখন নর্ম্মদাবিভাগের কমিসনর ছিলেন তখন Faringea নামক একজন ঠগ ইহাকে ঠগীসম্বন্ধে অনেক কথা ভাঙ্গিয়া বলে। এমন কি শ্লিমানের তাঁবুর দশ হস্ত দূরে, এক ক্ষুদ্র আম্রকানন মধ্যে প্রায় ১০১১২ বিকৃত মৃত দেহ, কবর খুঁড়িয়া বাহির করা হয়। শ্লিমান ইহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ছিলেন। ইহার পর হইতে এই প্রথা উন্মূলিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

---

# দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুধাংশু গগনবুকে শীতাংশু ঢালিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়, দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে;—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে!

স্বভাবের ভাবে ভোর, স্বপনে ছুটেছে জো'র,
পরাণ হৃদয় মন কত স্রোতে ডুবিছে;
অসাড় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, বিশ্ব-প্রাণে যুড়ে প্রাণ
মধুর মুরলী গান যেন শুধু শুনিছে!—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সে স্বপ্ন মুরলীধ্বনি　　সহসা ভুলি তখনি,
রমণী-কণ্ঠের স্বর　　কাণে যেন পশিল—
"শেষ দেখা এইবার,　এবে সে ব্রত উদ্ধার,
এখন বৈরাগ্যপথে সখী তব চলিল।"—
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল।

নয়নে ঝরিল বিন্দু—কোথা বা কিরণ ইন্দু!—
যৌবনলীলার সিন্ধু　স্মৃতিপথে খেলিল,
মনে হল সমুদয়—এইরূপে চন্দ্রোদয়,
যবে এই তরুতলে আমারে সে বলিল—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল!

বলিল "কপালে লেখা হবে পুনঃ হবে দেখা,
আজি হ'তে শেষ এই" ব'লে ফিরে চলিল।
ফুরায়েছে যত বর্ষ　　যত খেদ যত হর্ষ
সে দিন—সে সব(ই) আজ্ স্মৃতিপটে জ্বলিল।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

যে ছবি হৃদয়ে ধ'রে　ফিরেছি ভুবন' পরে,
এসেছি—বসেছি ঘরে,ক'টী তার জাগিছে?
আশার মোহের ছল　বাহুতে দিয়াছে বল—
এবে তার আছে ক'টী—ক'টী তার ফুটিছে?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে!

উদাসে দেখিনু তায়,সে কান্তি কোথা রে,হায়,
যে কান্তি কল্পনা-পথ আঁলো ক'রে শোভিছে!
এই কি সে নিরুপমা প্রতিমা জিনিয়া রমা—
কিম্বা এ তরুর(ই) ছায়া—প্রতিবিম্বে ছলিছে?
সে যে এই—দ্বিধা হৃদে কিছুতে না ঘুচিছে!

চেয়ে দেখি যতবার হিয়া কাঁদে তত বার—
সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে!
"যাও"—বলিবারে তারে রসনা জুয়াতে নারে,
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোধিছে!
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় "যাও"—শেষে দিনু সায়,
অমনি নয়ন তটে বারিধারা বহিল,
ক্ষণেক না থাকে আর "এই শেষ—শেষ বার"
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল!

পুরুষ রমণী ছাঁচে　প্রভেদ কি এত আছে?
একি সাধ দু'জনার হৃদিতল মথিছে,
এক বাঁচে মরে আর, একি লীলা বিধাতার—
পাষাণে কুসুমহার কেন বিধি গাঁথিছে,
দূর কাননের কোলে পাখী এক [illegible]

যার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে　জগতের সু[illegible]
জেগেছি জগতীতলে—সে কোথায় [illegible]
আমি সেই তরুতলে　ভ্রমি সেই ভ্রম[illegible]
হিয়া মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

আবার গগন-বুকে　　সুধাংশু উঠিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়,　　দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে,
কঠিন পুরুষ-প্রাণ　সকলিত সহিছে :—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# হুগলির ইমাম্‌বাড়ী।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### কথাবার্ত্তা।

নিস্তব্ধ নিশাকালে জ্যোৎস্নাময়ী তটিনী-তটে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী মহম্মদের কথার উত্তরে কহিলেন—"ইহজন্মের কর্ম্মেই যে কেবল এখানকার সুখদুঃখ-ভোগ এমন নহে। একটি হিন্দু শাস্ত্রের কথা মনে পড়িল—"কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ" কর্ম্মবীজ দুই প্রকার—এক বর্ত্তমান-শরীর দ্বারা কৃত, অপর জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত।"

[illegible] প্রশস্ত ললাটে সহসা রেখা [illegible] হম্মদ মুসলমান, [illegible] স্ত্রের একটা অ-[illegible] য়া আসিয়াছেন, [illegible] হইতে এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে—সহসা সন্ন্যাসীর মুখে—যাহাকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে দেবতুল্য বলিয়া জানেন-তাহার মুখে একথা শুনিয়া সেই জন্য আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন—কেবল আশ্চর্য্য নহে, হৃদয়ে যেন আঘাত লাগিল। এ আঘাতের অনুভব স্থূল মনুষ্যের হৃদয় নহে, মনুষ্যের অহঙ্কার, এ বেদনার জন্মস্থান মনুষ্যের অজ্ঞতা। আমি যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানি সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি না—তাহা সত্য হইতে পারে মনে করিতেও বুঝি মনে আঘাত লাগে। বুঝি মহম্মদের সেইরূপ মনে হইল; বুঝি যাহা মিথ্যা বলিয়া জানেন—তাহা সত্য হইবার একটা সম্ভাবনা অজ্ঞাত ভাবে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-বিশ্বাসের মূল সহসা নড়াইয়া দিল—তাই এই আঘাত অনুভব করিলেন। তাহা নহিলে কথাগুলি তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত—হৃদয় স্পর্শই করিত না। আসল কথা সন্ন্যাসীর মুখে এ কথা না শুনিলে মহম্মদ এ বিষয় চিন্তারও অযোগ্য মনে কল্পিতেন। মহম্মদ কিছু এত কথা তলাইয়া বুঝিলেন না—তিনি তাঁহার বিস্ময়-স্থির বৃহৎকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট নেত্রযুগল সন্ন্যাসীর প্রশান্ত নেত্রে বদ্ধ রাখিয়া বলিলেন "আপনি কি হিন্দু? হিন্দুরা একথা বলিয়া থাকে বটে—কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেত একথা নাই।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন"—এক-কালে হিন্দু ছিলাম বটে কিন্তু আমাকে এখন হিন্দু মুসলমান সবই বলিতে পার। কিন্তু সে যাহোক, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন আর কোথায় কি সত্য, থাকিতে পারে না? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই যে সকলরূপ সত্য থাকিবে এমন কথা কি। শাস্ত্র এক একজন মহাত্মার ধ্যান-চিন্তার ফল মাত্র—সুতরাং সকল মহাত্মার চিন্তার বিষয় যে এক হইবে—এমন নহে, এবং এক হইলেও সকলে যে সমান ফল পাইবেন তাহাও নহে। চিন্তাশীলতা ধ্যানশীলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি যেপথ দিয়া

সত্যকে ধরিতে পারাযায়—সকল শাস্ত্র-প্রণেতার পক্ষেই কি তাহা সমানরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব? সুতরাং শাস্ত্র-প্রণেতামাত্রেই যে অভ্রান্ত বা পূর্ণ-সত্যের অধিকারী এরূপ বিশ্বাস অসংগত। ইহার উপর আবার শাস্ত্রে অনেক সত্য এরূপ রূপক-অবস্থায় আছে—যে সাধারণের পক্ষে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাও সহজ নহে। যেমন দেখ কোরাণে বর্ণিত আছে—সকল মনুষ্যকে একদিন আবার সশরীরে তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার জন্য গোর হইতে উঠিতে হইবে—ইহার যথার্থ অর্থ যে পুনর্জ্জন্ম তাহা কয়জন বুঝিয়া থাকে"—

ম। "যাহা বলিলেন—তাহা সত্য হইতে পারে, একশাস্ত্রে যাহা নাই অন্য শাস্ত্রে তাহা থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু কেবল শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়াই ত কিছু বিশ্বাস করা যায় না—বাস্তবিক পক্ষে জন্ম-পুনর্জ্জন্মের যুক্তি কোথায়? যাহার যুক্তি দেখিতে পাই না, যাহার কোন প্রমাণ নাই তাহা বিশ্বাস করিব কি রূপে?" লোকের দুর্ব্বলতা দেখিয়া যদি সন্ন্যাসীর হাসি আসা সম্ভব হইত তবে একথায় হাসিতে পারিতেন। এই মাত্র মহম্মদ বলিতেছিলেন—মুসলমান শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা কি করিয়া সত্য হইবে কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের বেলায় তাঁহার মনে হইল—শাস্ত্রে যাহা থাকে তাহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে" সন্ন্যাসী বলিলেন—"ইহার যুক্তি অবশ্যই আছে—তাহা দেখাইতে আমাকে দূরে যাইতে হইবে না। ভাবিয়া দেখ একেবারে 'কিছুনা' হইতে 'কিছু' হইতে পারে না,—সুতরাং যে তুমি আজ আছ কাল অবশ্যই ছিলে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।—বিশ্বের নিয়মই এই, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা কোন কালেই ছিল না, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না, এবং যাহা সৎ, যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই, এক কথায় প্রকৃতির শক্তি-পুঞ্জের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, রূপান্তর হইতে পারে মাত্র—সুতরাং বস্তু মাত্রেই অনন্ত-অতীত অনন্ত-ভবিষ্যতের সহিত বাঁধা ইহার অন্যথা নাই। এই খানে আর একটি হিন্দু শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করি। অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম। যাহাকে আমরা যথা ক্রমে অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে নষ্ট হইয়াছে এবং হইবে ও জন্মিবে বলিয়া উল্লেখ করি—বাস্তবিক পক্ষে তাহার প্রকৃত রূপ যাহা তাহা [illegible] তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থা [illegible] হয়।"

ম। "তাহা আমি অবিশ্বাস করি না, আজ আমি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন সেই শক্তি যে অনন্তকাল বিরাজিত তাহার সন্দেহ নাই—কিন্তু এই সুখ দুঃখ অনুভবশীল জীববেশধারী আমি যে আগেও ছিলাম তাহা কি করিয়া জানিব।"

স। "প্রকৃতি পাঠ করিয়া দেখ শক্তি কি নিয়মে কাজ করে, তাহাহইলে আপনা হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। শক্তি যেমন অবিনশ্বর—শক্তির কার্য্যও তেমনি নিয়মাধীন। কোন বিশৃঙ্খল অনিয়মে শক্তি কার্য্য করিতে পারে না—যে নিয়মে শক্তি কার্য্য করে—তাহার নাম ক্রমবিকাশ, ক্রমো-

রূতি। আকৃতিও এই নিয়মের অধীন, প্রজাপতি একটি ইহার সামান্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিলে বুঝিতে পারিবে জগতের সমস্ত পদার্থেরই এই এক লক্ষণ। নিকৃষ্ট সোপান দিয়া না উঠিয়া একেবারেই উৎকৃষ্ট জীব উদ্ভাবন হইতে পারে না। এই নিয়ম স্থূল সূক্ষ্ম উভয় জগতের পক্ষেই এক, কারণ প্রকৃতির মূল নিয়ম বিশ্বব্যাপী, তাহা একটিতে একরূপ—অন্যটীতে অন্য-রূপ হইতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে স্থূল সূক্ষ্মের বস্তুগত প্রভেদ নাই—একই-শক্তি স্ফূর্ত্তির তারতম্য হেতু তাহা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহাতেও চৈতন্য আছে—তবে সে-[illegible] ফুটিয়া উঠে নাই—মানুষে ফুটিয়া [illegible] গোলাপ কলি ও [illegible] ফুল, সেইরূপ জড় [illegible]। সুতরাং একটির শরীরগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর-নিহিত চৈতন্যেরও ক্রম-বিকাশ চলিয়াছে—নহিলে কেবল আকৃতির উন্নতিতে কি তা-হাকে যথার্থ উন্নত-জীব বলিতে পারিতে? এই উন্নতির সোপানে উঠিবার জন্যই—গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লোক হইতে লোকান্তরে আকৃতির পর আকৃতি—জন্মের পর জন্ম, অবস্থার পর অবস্থা। এ নিয়মের অন্যথা করিয়া কোন শক্তিপুঞ্জ একেবারে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য রূপে বিকাশ পাইতে পারে না। হিন্দু-শাস্ত্র পড় দেখিতে পাইবে উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী সমস্ত জাতি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে। এক শ্রেণীর পদার্থের উন্নতির শিখরে আর একটি উন্নততর পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহিলে প্রকৃতির নিয়মের যেমন সাম্য থাকে না—সৃষ্টিরও তেমনি পূর্ণ অর্থ থাকে না” বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী এক মুষ্টি ধূলি হাতে লইয়া বলিলেন “এই যে দেখিতেছ ধূলিরাশি, তুমি মনে করিতেছ ইহা হইতে তুমি কত উচ্চ—তোমার মত জীবের পদতলে থাকিয়া তোমার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করাই এধূলার উদ্দেশ্য। কিন্তু গর্ব্বিত মানব তুমি কি ভ্রান্ত! এই প্রত্যেক ধূলি-কণা তোমার মত উচ্চ মানব হইবার জন্য অপেক্ষা করি-তেছে, আর এইরূপ এক একটি ধূলিকণা হইতেই তোমার আমার জন্ম হইয়াছে। প্রত্যেক মৃত্তিকা-অণু, উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষীর অন্তর নিহিত চৈতন্যের বা শ-ক্তির উন্নতির সোপানে তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমিই উন্নত হইয়াছ আর সকলে পড়িয়া থাকিবে তাহা মনে করিও না, তাহা হইলে এ সকল সৃষ্টির অর্থ থাকে না—যখন যুগযুগান্তর পরে তুমি মা-নুষ হইতে উচ্চ জীবে পরিণত হইবে, তখন হয়ত, আজিকার এই ধূলিমুষ্টি মনুষ্যের প্রথম সোপানে পদবাড়াইবে”—কথা শেষ করিয়াই সন্ন্যাসী বুঝিলেন তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ততা হইতে উৎসাহে কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন—মুহূর্ত্তে আত্ম সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—“দেখ বৎস সংসার পানে চাহিয়া দেখ জীবনের অপরূপ বৈচিত্র দেখিতে পাইবে। কেহ জন্মাবধি কুসুম শয্যায় লালিত পালিত কেহ এক মুষ্টি অ-

ন্নের জন্য লালায়িত, কোন সুকুমার রূপগুণশালী জগৎ মোহিত করিতেছে, কোন বিকৃত-কায়মন অন্যের ঘৃণা উদ্রেক করিতেছে—পাপের মধ্যে কাহারো জন্ম বৃদ্ধি, কেহ পুণ্যময় গৃহে পুণ্যময় জীবন লইয়া জন্মিয়াছে। দেখ এক পিতামাতার সন্তান হইয়া একরূপ অবস্থায় লালিত পালিত হইয়াও দুই জনের স্বভাব কত স্বতন্ত্র, তাহার মধ্যে একজন রূপেগুণে বিদ্যাবুদ্ধিতে জগৎপূজ্য হইয়া উঠিল, আর একজন সকল বিষয়ে নিম্নে পড়িয়া রহিল। ইহারা ত কেহই নিজের দোষে বা গুণে এরূপ কষ্টের বা সুখের অধিকারী নহে—কেন বৎস তবে এরূপ ঘটনা? যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল না মান তবে আর ইহার কি কারণ দেখাইতে পার? অনেক স্থলে আমরা পিতা মাতার কর্ম্মফল সন্তানে অর্পণ করিয়া দোষীর শাস্তি নির্দ্দোষীর ঘাড়ে ফেলিয়া এই রহস্যের ভেদ করিতে যাই,—কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা দূরে থাক আরো দুর্ভেদ্য করিয়া তুলি—প্রকৃতির নিয়মকে ঈশ্বরের বিচারকে কেবল অনিয়ম ও অবিচার করিয়া তুলি। সংসারের সর্ব্বত্রই আমরা কার্য্য কারণের নিয়ম দেখিতেছি, মনুষ্যসম্বন্ধেই বা তাহার ব্যভিচার কেন হইবে? বাস্তবিক পক্ষে জগতে দৈবনির্ব্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই—কঠোর অব্যভিচারী সূক্ষ্ম নিয়মের বশীভূত হইয়াই সংসার চলিতেছে, সে নিয়ম অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী রুচি বাসনা ও প্রবৃত্তি সমূহের আকর্ষণ বশে লোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম লইয়া থাকে। যেমন চৈতন্য একটি শক্তি তেমনি কর্ম্মফলও শক্তি। সুতরাং ইহার মধ্যে কাহারো বিনাশ সম্ভবে না। তবে ইহার রূপান্তর বা ব্যয় হইতে পারে মাত্র। যেমন কাষ্ঠের অন্তর-নিহিত উত্তাপ শক্তির ব্যয় দ্বারা ইন্ধন ভস্ম ও ধূমরূপে পরিণত হয় সেইরূপ এই কর্ম্মফলরূপ শক্তির কার্য্য কারিতা একমাত্র ভোগ দ্বারাই ব্যয়িত হইয়া তাহার রূপান্তর হইতে পারে মাত্র। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্য মাত্রেরই নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ নিমিত্ত আবার জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে।” মহম্মদের হৃদয় স্তম্ভিত হইল—তাঁহার বহুদিনের বিশ্বাস যে নড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা যেন প'ড় প'ড় হইয়া উঠিল, সত্য-অসত্য মিশিয়া [illegible] ভিতর যেন তোলপাড় ক[illegible] তিনি বলিলেন—“তবে পৃথি[illegible] দের পরলোক, পৃথিবীতেই অ[illegible] কর্ম্মের ফলভোগ,—স্বর্গনরক সকলি তবে মিথ্যা।”

স। “না তাহাও নহে। কর্ম্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। আমি শরীর দ্বারা যাহা করি তাহাও কর্ম্ম—মনের দ্বারা যাহা করি তাহাও কর্ম্ম—আমাদের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক চিন্তা, ধ্যানটি পর্য্যন্ত কর্ম্ম। তবে শরীর জাতকর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা বাহ্যজগতের উপর কার্য্য করে তাহা স্থূলকর্ম্ম—এবং চিন্তা কল্পনা ইচ্ছা ধ্যান প্রভৃতি, যাহা সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করে তাহা সূক্ষ্ম কর্ম্ম। এখন দেহ স্থূল, সুতরাং এই দেহ লইয়া পৃথিবীতে স্থূল কর্ম্মের ভোগ যেমন

কড়ায় গণ্ডায় হইতে পারে সূক্ষ্ম কর্ম্মের ভোগ তেমন গভীররূপে হইতে পারে না। সেই জন্য যে সকল শাস্তি পুরস্কার পৃথিবী দিতে অপারক—মৃত্যুরপর আত্মরূপী সূক্ষ্ম-অবস্থায় তাহা কর্ম্মকর্ত্তা অতি গভীররূপে ভোগ করে। প্রকৃত পক্ষে স্বর্গ নরক কোন স্থান নহে—আত্মার একটি আত্মগত তীব্রসুখ অথবা দুঃখময় বিভোর অবস্থা মাত্র—সেই সুখ বা দুঃখ ভোগের ক্ষমতার অবসান হইলে আবার তখন পুনর্জ্জন্ম। এইখানে আর একটি শ্লোক মনে পড়িল—

পাপ ভোগাবসানে তু পুনর্জ্জন্ম ভবেদ্বহু,
পুণ্য ভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং।

পাপ ভোগের অবসানে কর্ম্মানুসারে [illegible] জীবের বহু পুনর্জ্জন্ম হয়, সেই [illegible] চ্যুত পুণ্যকৃত পুরু- [illegible] কে—তাহার অন্যথা

ম। "তবে ইহলোক পরলোক সকলি স্বপ্ন—উচ্চ লোক উন্নত লোক, সকলি আকাশ কুসুম?"

স। "না বৎস প্রকৃত পরলোক উন্নত লোক—কেবল আকাশ কুসুম নহে। যতদূর উন্নতি করিতে পারিলে যতদূর বিকশিত হইতে পারিলে উন্নতির সোপান গুলি উত্তীর্ণ হইয়া একটি উচ্চলোকে পৌঁছান যায়—এক ক্ষুদ্র জন্মে তাহা আয়ত্ত-সাধ্য নহে। জন্ম পুনর্জ্জন্মে আমরা একটু একটু করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—একটু একটু করিয়া মাত্র উঠিতে পারিতেছি। মনুষ্য অসম্পূর্ণ জীব, প্রতিপদে পদস্খলন করিয়া তবে একটু জ্ঞান লাভ করিতেছে, উন্নতির সোপানে একপদ অগ্রসর হইবার মধ্যে দশপদ পিছাইয়া পড়িতেছে—সুতরাং এরূপ স্থলে এক জন্মে মাত্র যদি উঠিতে হইত তাহা হইলে কোন কালেই তাহার উঠিবার আশা থাকিত না। কিন্তু অজস্র বার পড়িয়া পড়িয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাহাতে দুর্ব্বল ক্রমে বলবান হইয়া উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে এই জন্যই প্রকৃতিদেবী তাহাকে এই অগণিত সময় প্রদান করিয়াছেন। আজ যাহাকে পড়িতে দেখিতেছ এখনো তাহার সে অভিজ্ঞতা টুক লাভ হয় নাই এই মাত্র, একদিন তোমার আমারও ঐরূপ দশা ছিল। সুতরাং পাপীতাপী দেখিয়া ঘৃণা করিও না, সেই পাপী তাপীতে তোমারই অতীত ইতিহাস আবদ্ধ রহিয়াছে, তুমিও সেই পাপী তাপীর মধ্যে একজন,—আর কে বলিতে পারে—ঐ পাপী তাপী একদিন তোমা হইতেও উচ্চে উঠিয়া যাইবে কি না।" মহম্মদের সম্মুখে যেন এক নূতন প্রশস্ত সত্য রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার হইতে আলোতে আসিলে যেমন চোখে ধাঁধাঁ লাগে সেইরূপ আলোকের বিস্তৃত রাজ্যে দাঁড়াইয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন—সন্ন্যাসীর কথা ধারণা করিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—সন্ন্যাসী বলিলেন—

"যেমন অগণিত যুগযুগান্তরে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে—অসংখ্য জীব রূপে ভ্রমণ করিয়া এই মনুষ্য হইয়াছ, তেমনি আবার

কত যুগযুগান্তরে অল্পে অল্পে উন্নতির ক্ষুদ্র সোপানাবলীতে উঠিতে উঠিতে অন্য উচ্চ লোকের উপযোগী উন্নত অবস্থায় পৌছিবে তাহা ধারণা করাও অসম্ভব। প্রকৃত কথা এই, এই পৃথিবীর স্থূল বাসনার আকর্ষণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নত দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইবে—ততদিন অবশ্যই সেই স্থূল তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া স্থূল কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত আমাদের এই স্থূল পৃথিবীতে আসিতে হইবে।

মহ। "কিন্তু কর্ম্মবিরহিত হইবার উপায় কি প্রভু।"

স। "নিঃস্বার্থ নির্লোভ হইয়া কেবল কর্ত্তব্য মনে করিয়া কর্ম্ম করিলেই মানুষ কর্ম্ম বিরহিত হইতে পারে—তৃষ্ণা-পরবশ বাসনা-পরবশ হইয়া কর্ম্ম করিলেই তাহা সকাম কর্ম্ম। যখন প্রত্যেক চিন্তাটি পর্য্যন্ত কর্ম্ম-তখন একেবারে কর্ম্মহীন হওয়া মানুষের অসম্ভব—এবং তাহা প্রার্থনীয়ও নহে, কেন না তাহা যথার্থ পক্ষে কর্ম্মহীনতা নহে—কেবল জড়তা মাত্র, তাহাও একরূপ কর্ম্ম—তাহা অকর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "কদাচিৎ কোন অবস্থায় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না—অতএব সম্পূর্ণ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি পর্য্যন্ত জাতি এবং আশ্রম বিহিত কর্ম্মসকল অবশ্যই কর্ত্তব্য—নতুবা চিত্ত শুদ্ধির অভাব হেতু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।" উন্নতি লাভ করিতে গেলে কর্ম্ম করাই আবশ্যক—তবে সে কর্ম্ম নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক। তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ, উন্নতির প্রতিরোধক, তৃষ্ণা-বিরহিত কর্ম্মই অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্ম্মই মুক্তির উপায়। কামনা পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেও তাহার ভোগের জন্য আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখ ক্লেশে পড়িয়া, নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয়।"

কথা কহিতে কহিতে সন্ন্যাসী দেখিলেন তাঁহাদের দিকে কে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলিলেন—"আজ আমি চলিলাম বৎস, আবশ্যক হইলে আবার আসিব। তাহার জন্য আর ব্যাকুল হইও না, দুঃখই অনেক সময় সুখের কারণ ইহা মনে রাখিও। আর একটি কথা, যে জন্য তোমার কাছে আসি[illegible] বলি নাই তোমার পিতা এখ[illegible] এদিকে আসিয়াছেন—তিনি [illegible] চীতে।"

দেখিতে দেখিতে একখানি ছায়ার মত সন্ন্যাসীর সে দেবমূর্ত্তি দিগন্তের কোলে যেন মিলাইয়া পড়িল।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### পরিত্যাগ।

মহম্মদ মসীন চালানের বাণিজ্য করিতেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার প্রধান দুইখানি জাহাজের আর কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে না, মাঝে ভারত উপসাগরে বড় একটা ঝড় হইয়া গিয়াছে সকলের ভয়

হইতেছে হয়ত বা মসীনের জাহাজ দুখানি মারা গেল। তাহা হইলেই মসীনকে এক রকম সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, এত দেনা হইয়া পড়িবে যে অন্য জাহাজ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে আর সে দেনা শোধ হইবে না। মসীনদের যেরূপ অসময়, তাহাতে জাহাজ ডোবাই তাঁহার যেন অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। এখনকার মত তখন সম্ভাবিত-লোকসান বাঁচাইবার আশায় আগে থাকিতে কোন রূপ বন্ধক (Insure) দেওয়া রীতি ছিল না। বন্ধকের মধ্যে তখনকার লোকেরা এক জীবনটা বন্ধক দিতে জানিত বটে—কিন্তু তাহাও জীবনের বদলে—টাকার বদলে নহে, তখনকার [illegible] বোধ করি টাকা [illegible] ছিল,—যাহা হউক [illegible] সে লোকসান কোন [illegible] তাহার উপায় ছিল না। অথচ এই কারবারেই তাঁর বুক বাঁধা, সলে উদ্দীন এক পয়সা রাখুন আর নাই রাখুন—তাহার উপর যে মুন্নার নির্ভর করিতে হইবে না, মসীমের এতদিন এই একটা মনে বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ যেন সে বিশ্বাসটায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহার এক দিক সামলাইতে গিয়া অন্যদিক খসিয়া পড়িতেছে, মহম্মদের সরলনির্ভীক প্রাণও ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে একটা মস্ত ঘরের এক কোণে একটি ক্ষীণালোক মিট মিট করিতেছে, বিকালে বৃষ্টি হইয়াছিল, মাঝে মাঝে ভিজা ঠাণ্ডাবাতাসের এক একটা দমকা আসিয়া প্রদীপের সেই ক্ষীণ প্রাণটাকে দারুণ বেগে কাঁপাইয়া চলিয়া যাইতেছে। বাহিরের ব্যাংগুলার ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ আর ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত সমতানে কেমন একটা বিষাদময় ভাবে কক্ষটা পুরিয়া উঠিয়াছে। মুন্না এই নিস্তব্ধ নিঃশব্দবিলাপিত গৃহের একপাশে একটা ভগ্ন বাদ্য যন্ত্রের মত পড়িয়া আছে। এই ভাঙ্গা বাজনার তারে যতবার ঘা পড়িতেছে কেবলি যেন বেসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, মুন্নার মনে যাহা কিছু ভাবনা আসিতেছে সকলি যেন কষ্টের। আজ যেন আবার কি এক অস্বাভাবিক, কি এক অপরিচিত-নূতনতর যাতনায় তাহার হৃদয় মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর মহম্মদের গানের মজালস বসে নাই, সন্ধ্যা-হইতেই তিনি মুন্নার কাছে বসিয়া আছেন, মুন্নার সেই মর্ম্ম পীড়া অনুভব করিয়া তিনি আর সকল কথা ভুলিয়া গেছেন, সংসারের আর সকল বিপদ তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভাবিতেছেন মুন্নার হাসিমুখ দেখিতে পাইলেই তিনি যেন শত রাজত্ব অবাধে লাভ করিতে পারেন, সংসারের সমস্ত বিপদ দুই পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মহম্মদ জানেন না কি করিয়া মুন্নার সেই মনোভার লাঘব করিবেন, মাথার কাছে বসিয়া সস্নেহে কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে দুই একবার দুই একটি কি কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু যখনি দেখিলেন মুন্নার তাহা

ভাল লাগিতেছে না তখনি আপনা হইতে আবার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল, মহম্মদ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কি ভাবিয়া তাহার পর ঘরের কোণ হইতে একটি সেতার আনিয়া বাজাইতে বাজাইতে আস্তে আস্তে গান করিতে লাগিলেন, তাঁহার বুঝি মনে হইল ক্রমে ক্রমে গানের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া যদি মুন্নার কষ্ট কমিয়া আসে। তিনি সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিলেন মুন্না তাঁহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মনে হইতে লাগিল "লোকে কি করিয়া গান করে, আমোদ করে? উহাতে বাস্তবিক তাহারা কি সুখ পায়—ও ত সকলি ছেলে মানষি" একদিন ছিল বটে, যখন মুন্নারও গান শুনিতে ভাল লাগিত, সঙ্গীতের মধুরস্বরে মুগ্ধ হইয়া পড়িত, একটা সামান্য কথায় তখন প্রাণের ভিতর কিরূপ সুখের উচ্ছাস বহিয়া যাইত, কিন্তু এখন যেন সে সকল ভাব ঘুচিয়া গিয়াছে, পুরাণ স্মৃতিতে যদি বা মুহূর্ত্তের জন্য একটা সুখের ভাব মনে জাগিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর কেমন একটা মোহের ভাব আসিয়া অধিকার করিতে যায়—তখনি যেন তাহা মিলাইয়া পড়ে—তাহারপর সে সকলি যেন একটা হাসির কথা বলিয়া মনে হয়। একটা গান শুনিয়া একটা শ্লোক পড়িয়া, একটা কথা কহিয়া কেন যে এক সময় প্রাণ উথলিয়া উঠিত তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। কাহাকে যখনি হাসিতে আমোদ করিতে দেখে—মুন্নার পুর্ব্বের মনের ছায়া যখন কাহারো হৃদয়ে দেখিতে পায়—তখন অমনি অবাক হইয়া ভাবে, সবই ছেলে খেলা,—চিরদিন কি সকলে এইরূপ খেলিবে? মুন্নার বয়স কুড়ির অধিক নহে, মুন্না ইহার মধ্যেই জগৎ সংসারকে ছেলে খেলা ভাবিতে শিখিয়াছে। মুন্না যে প্রতিদিন সাংসারিক কাজ করে, খায়, শোয়, বেড়ায়, কখনো বা হাসে কখনো কাঁদে—তাহারো যেন সে সকল সময় কোন কারণ কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পায় না। যেন কাজ করিতে হয় তাই করে—হাসি আসে তাই হাসে, কান্না থামাইতে পারে না তাই কাঁদে—কিন্তু এ সকলি যেন উদ্দেশ্য হীন, অর্থ শূন্য, সকলি যেন ছেলে খেলা বলিয়া মনে হয়, মুন্নার প্রাণের ভিতর এক এক সময় এই রকম একটি [illegible] গাম্ভীর্য্যের ভাব আসিয়া [illegible] রূপ ভাবের ভিতর দিয়া বিশ্ব [illegible] চাহিয়া দেখিতেছে। কিন্তু ক্র[illegible] যখন মসীনের সেই সুমিষ্ট সঙ্গীতের এক একটি সুর তাহার হৃদয়ে গিয়া আঘাত দিতে লাগিল, প্রতি আঘাতে আঘাতে তাহার প্রাণের ভিতর সঙ্গীতের ভাবটুকু অল্পে অল্পে রাখিয়া রাখিয়া যাইতে লাগিল, তখন অতি ধীরে ধীরে কেমন অজ্ঞাত ভাবে মুন্নার প্রাণের ভার যেন একটু একটু করিয়া খসিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল—যেন মসীনের সেই গানের ইচ্ছা শক্তিতেই উত্তেজিত হইয়া মুন্নার মুখে ক্রমে একটা হাসির রেখা পড়িয়া আসিতেছিল—কে জানে কেন বুঝি বা সহানুভূতি ভাবে বুঝি বা মসীনের সুখ মনে ভাবিয়া, মুন্নার

বিষণ্ণ প্রাণের ভিতর একটা সুখের ছায়া নির্ম্মাণ হইতে ছিল—একদিন সেও যে মসীনের মত ছেলে মানুষ ছিল—স্মৃতির এই মোহে—মুহূর্ত্তের জন্য যেন সেই বাল্যকাল ফিরিয়া আসিতেছিল—সেই সময় তখনি কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল "তিনি চলিয়া গেলেন,গো,আর আসিবেন না" চকিতের মধ্যে সেতার বন্ধ হইল, গান থামিয়া গেল, স্তব্ধ গৃহের শিরায় শিরায় তখনি এই আকুল কথাগুলি চমকিয়া উঠিল—"কে গেল—কোথা গেল—কে আসিবে না" ? দাসী বলিল "নবাবশা চলিয়া গেলেন, বিবাহ করিবেন আর এখানে আসিবেন না।"

একটি পাষাণভেদী করুণ-ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে একবার মাত্র এই অস্ফুট কথা গুলি শোনা গেল—"গেলেন তিনি! চলিয়া গেলেন! একবার চাহিয়া গেলেন না! একবার দেখিয়া গেলেন না।" তাহার পর মন্ত্রস্তব্ধ ভীষণ নিস্তব্ধতা গৃহ-মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল।

# সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

[illegible] সাকার নিরা-[illegible] ত্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এম্‌নি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্ম্মের শিরোভূষণ যাঁহারা,আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুল্‌বুলের লড়াইয়ে যেমন পাখীতে পাখীতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয় পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও, আঁচড় পড়ে না, আমি বোধ করি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয় পক্ষীয় মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনও স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁওকষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎ পরিমাণ মাত্র স্থানের বেশী অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন চারি হাত জমির বেশী তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা-জনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞব্যক্তি যদি বলেন—এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কি! কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র এক্‌টা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লওনা কেন?—তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মত কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগ্লাস জল খায় তাহার সহিত, সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাৎ কি? আমি যেন বলপূর্ব্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম—কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটাত আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চ্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই—আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ ব[illegible] আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহা[illegible]কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্ত্তমা[illegible] দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিও না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর সমস্তই পথ—অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিও না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের

সেই সাকার বাহ্যস্ফূর্ত্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা ও ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলঙ্কারশাস্ত্রসর্ব্বস্ব পদ্যরচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই [illegible] স্তকবরের [illegible]। কল্পনা [illegible] মূর্ত্তি গড়া [illegible] নকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্ত্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্ত্তিটাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না—মনুষ্য প্রকৃতিরই এই ধর্ম্ম।

যেখানে চক্ষুর কোন বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারিদিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণ কাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম—তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না! কিন্তু আমি না কি স্বাধীন ভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেই জন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্ত্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য, বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায়

হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস—ব্যবধান দূর করিয়া অনন্ত-সৌন্দর্য্য স্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক্, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিণত হউক্। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখশান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস কর অসীমে বিচরণ কর, পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, আচ্ছন্নকারী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিও না। সূর্য্যকিরণের অধিকাংশই সৌরজগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্য্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভাল! মুক্ত সূর্য্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্রবিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লই—দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোট দেখি মনে তাহাকে বড় করিয়া লই —চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের অক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্ব্বতোরূপে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা চাঁদকে যত বড় দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড় আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না—তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদিবা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ

জ্ঞান, সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্ব্বে কিম্বা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এই জন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য বা অলক্ষ্য ভাবে সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে করুন, আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে, এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে—কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্দ্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।—সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূল-কিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এই জন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্র-মণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য—এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মত বিশ্রাম স্থল; শিশুর মত আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিরাম লাভ করি;—সেখানে সকল চেষ্টার অবসান—সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবল মাত্র পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসামকে বলপূর্ব্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তুলা অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাঁহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়া আবার তর্ক করিব কি! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এই

জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্ত্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসামতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম! বস্তুগত (Realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধূলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে,—আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ কর, আমাকে স্পর্শ কর, আমাকে ভক্ষণ কর, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ কর। কিন্তু ভাব প্রধান (Suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবল-মাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইসারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা গণ্ডী হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্য-স্বভাববশতঃ সহজেই বলিতে পারে "আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি" তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দ্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোন আবশ্যক নাই;—কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

"চরণচ্ছায়ায় আছি" বলিতে গেলেই অমনি যে রক্ত মাংসের একযোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোন কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মত টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোন মহা পণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোন বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, এক যোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন! কিন্তু কবি যদি কেবল ইসারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশী ঝোঁক দিতেন; যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়াবুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গীর সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক যোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মত একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না—কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মত মুখ ও পদ্মের মত করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন উপায় থাকে না। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শাল প্রাংশুর্মহাভুজঃ" ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোন তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্ত্তি কল্পনা করেন না; কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্ত্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর একটি কথা। কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিস্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলঙ্কারশূন্য। অলঙ্কারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিস্ন্ একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন তাহাতে আছে—মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া নায়ক লান্স্লট্ কুমারী গিনেবীব্‌কে মহারাজের সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন—কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্ম সমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না; এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের

সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই, ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি—অবশেষে ভ্রম ভাঙ্গিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে, অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এই জন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া কোনমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য্য হই, সুচতুর ব্যাখ্যার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্ম্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখি এবং তাহার চাক্‌চিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা, কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা ত ধর্ম্মের সহিত চালাকী করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্য্যেরা অভিমানী, উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্ম্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়—ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক্, যদি কোন ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোন মতেই গৃহকার্য্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি, তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচ জনকে বলে গৃহকার্য্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। এক জন বালিকা

যখন পুঁতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুঁতুলকে সে নিতান্তই মৃৎ-পিণ্ড মনে করে না—তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমত পুঁতুল দুটিকে সত্যকার কর্ত্তা গৃহিনী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্য্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার এই সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়-গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তি সাধন, আরেকটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপন করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য্য ভালরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুঁতুল লইয়া খেলা কর। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা কর। যতটা পার তাই ভাল, কারণ ইহা জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যান হীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোন ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিষ্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোন পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এই জন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন, আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই?

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না সহজ-বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কি করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কি করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই। সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যাণ্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যাণ্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেই টুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক—তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙ্গালী, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্য্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য—তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র, ইত্যাদি—এক কথায়, তিনি যে কত কি তাহার ঠিকানা নাই—কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা কাহাকে বলে তাহাও সে ভাল করিয়া জানে না)—শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে; ইহাতে ক্ষতি কি! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যে রূপ সত্য ইহাও সেই রূপ সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি—এই জন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি—ন্যায় দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙ্গিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমা-

বদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কি করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান্ বলিয়া জানি তবে আ-মরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বই কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি "ভূমৈব সুখং" ভূমাই সুখ স্বরূপ, কোন সীমা কোন ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই—তা হইলে অনর্থক পর্য্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# শান্তি।

থাক্, থাক্, চুপ কর্ তোরা,
ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে,
আবার্ যদি জেগে ওঠে বাছা
কান্না দেখে কান্না পাবে যে!

কত হাসি হেসে গেছে ও,
মুচে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমোলো
ও'রে তোরা কাঁদাস্ নে আর।

কত রাত গিয়েছে এমন
বয়েছিল বসন্তের বায়,
পূবের জানালা দিয়ে ধীরে
চাঁদের আলো পড়েছিল গায়।

কত রাত গিয়েছে এমন
দূর হতে বাজিত রে বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে কেঁদে ফেরে
বিছানার কাছে কাছে আসি।

কত রাত গিয়েছে এমন
কোলেতে বকুল ফুল রাশ
নতমুখে উলটি পালটি
চেয়ে চেয়ে ফেলেছে নিঃশ্বাস।

কত দিন ভোরে শুক তারা
উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সুমুখের কুসুম কাননে
ফুল ফুটেছিল থরে থরে।

ছেলেদের কোলে তুলে নিয়ে
বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভাল বেসেছিল
পেয়েছিল কারো ভালবাসা।

হেসে হেসে গলাগলি করে
খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা কোথা খেলা করে
ও'র খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।

সেই রবি উঠেছে সকালে,
চারিদিকে ফুটে আছে ফুল,
ও কখন্ খেলাতে খেলাতে
মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।

শ্রান্ত দেহ, মুদিত নয়ন,
ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে—
থাম থাম হেসনা, কেঁদনা।

---

# ঠগী-রহস্য।

দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর পশ্চিম-প্রদেশেই ঠগীর প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকছিল। বেহার-বঙ্গে যদিও ঠগী ছিল তথাপি ইহাদের পরিব্যাপ্তি ততদুর অধিক ছিল না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কেবলমাত্র স্থল-পথেই ঠগীর ভয় ছিল বাঙ্গালার স্থল ও জল উভয় স্থানেই ঠগীর ভয় ছিল।

এই প্রকার জীবন-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি প্রকারে একতা সংস্থাপিত হইয়াছিল কিপ্রকারে তাহারা দৈনিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিত কি প্রকার নিয়মানুমোদিত হইয়া তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারই চিত্র আমরা সাধ্যমতে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয়-ঠগ-সম্প্রদায় যদিও জীবন হনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তথাপি লোক ভুলাইবার জন্য ইহারা সাধারণ প্রজার ন্যায় জমাদারের নিকট হইতে জমী জমা করিয়া লইয়া চাষ বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আহার ও ঔষধ দুইএরই সংকুলান হইত। চাষ বাসের উপলক্ষ থাকাতে হঠাৎ কেহ তাহাদিগকে কিছু বলিতে বা সন্দেহ করিতে পারিত না। বীজ বপন, শষ্য রোপণ ইত্যাদি ইহারা নিজে করিত, পরে যখন দল বাঁধিয়া দলপতির অধীনে ঠগীবৃত্তি করিতে যাত্রা করিত তখন ইহাদের স্ত্রীপুত্রের হস্তে এই সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া যাইত।

ঠগীদের মধ্যে এক গোপনীয় সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সমস্ত ঠগ-সম্প্রদায়ই সেই ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিত, ইহাকে ঠগেরা "রামাসিয়ানা" বলিত। এ সমস্ত ভাষায় যে সমস্ত শব্দ আছে তাহা হিন্দী, বাঙ্গালা বা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষার অন্তর্গত নহে। এ ভাষা ঠগ ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিত না। শ্লিমান সাহেব ঠগেদের সাহায্যে এই ভাষার অনেক তথ্য অবগত হন—আমরা ক্রমে পাঠকবর্গকে তাহা জানাইব।

ঠগেদের বিশ্বাস, যেমন ব্যাঘ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু জীবনধারণ জন্য জীবহত্যা করে অথচ তাহারা জগদীশ্বরের নিকট দোষী হয় না—তাহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এক জন ঠগ শ্লিমানের সম্মুখে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিল যে "আদমিকো মারনেসে কোই মরতা ?" "অর্থাৎ পরমেশ্বর নামারিলে মানুষে কখনো মানুষ মারিতে পারে না" এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে অন্ধ হইয়াই তাহারা কতশত নির্দ্দোষীকে অকালে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয়

ঠগই কালিকাদেবীর উপাসক। মুসলমান ঠগেরা অসংকুচিত চিত্তে কালিকার পূজাতে যোগ দিত ও তাঁহাকে উপাস্যদেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। অথচ জাতীয় ধর্ম্মেও তাহাদের আস্থা ছিল। * ঠগেদের বিশ্বাস যে দেবী কালিকার আদেশেই তাহারা এই কার্য্য করিতেছে। এ বিষয় একটী গল্প তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই গল্প তাহারা সকলেই সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিত।

প্রথমে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা হত্যাকরা ঠগেদের নিয়ম বহির্ভূত ছিল। একেবারে নিহত না করিয়া তাহারা কখনও কোন দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত না। তাহারা এই নিধন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, রুমাল, ফাঁস-সংযুক্ত রজ্জু, বা চাদর ব্যবহার করিত। রজ্জু ও রুমাল অপেক্ষা চাদরেরই প্রচলন অতিশয় অধিক ছিল। ঠগেরা বলিয়া থাকে যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে স্বয়ং ভবানী এই প্রকার ফাঁস প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের আপামর সাধারণের বিশ্বাস যে এক সময়ে বিন্ধ্যাচলে, দেবী কালিকা, রক্তবীজ বধ করিবার উদ্দেশে আগমন করেন। অনেক যুদ্ধ করিয়া যখন সেই দুর্দ্দান্ত অসুরকে তরবারি দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন ও যখন তাহার মৃতদেহ-নির্গত রক্তধারা ভূমিতে পতিত হইল, তখনই আবার সেই সমস্ত রক্তবিন্দু-সমূহ হইতে শত শত রক্তবীজ উৎপন্ন হইল। দেবী সমস্ত রক্তবীজকে আবার বধ করিলেন আবার ধরণীতে রক্ত পতিত হইয়া বিন্ধ্যাচলের প্রান্তরভূমি রক্তবীজে প্লাবিত হইল। দেবী ক্রমশ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাহার শরীর হইতে অজস্রধারে স্বেদরাশি নির্গত হইতে লাগিল অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই উদ্ভূত-স্বেদ-রাশি হইতে দুইটী বিকটাকার মূর্ত্তি সৃজন করিলেন ও তাহাদিগকে ছিন্নবস্ত্র খণ্ড প্রদান করিয়া বলিলেন "তোমরা এই বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে ভূমিতে রক্ত পাতিত না করিয়া ইহাদিগকে বধ কর। তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্য শেষ করিল ও দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের দুই জনকে সেই দুই খণ্ড বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন তোমাদের কার্য্যে প্রীত হইয়া এই বস্ত্র তোমাদিগকে দিলাম তোমরা ও তোমাদের বংশাবলী অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে"। সেই বীর পুরুষদ্বয় হইতে তাঁহাদের বংশাবলীতে সেই প্রথা বিস্তীর্ণ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

উপরোক্ত ঘটনাটী,প্রত্যেক ঠগের নিকট অতীব বিশ্বাস্য ও এই জন্যই তাহারা বলিয়া থাকে যে ভবানীদেবীর, আদেশানুসারেই তাহারা হনন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

* মুসলমান ঠগেরা ভবানীদেবীকে মহম্মদের কন্যা, ফাতেমা, ও আলির স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। অনেক ঠগ আবার অন্য প্রকারও ভাবিত। যাহারা এই কথায় বিশ্বাস করিত তাহারা বলে যে মহম্মদের কন্যা ফাতিমা তাহাদিগকে এইপ্রকার রুমাল বা ফাঁস ঠগীবৃত্তি করিবার জন্য দিয়াছিলেন। আমরা ভবিষ্যতে এবিষয় আরও বিশদরূপে বুঝাইব।

স্লিমানের মতে এক এক দলে প্রায় ৩।৪ শত ঠগ থাকিত। ইহারা যাত্রাকালীন পথিমধ্যে ৫।৭ জন করিয়া দল বাঁধিয়া বিভিন্ন ভাবে পথ চলিত। যেন আগেকার দলের সহিত পশ্চাতের দলের আলাপ নাই, বা তাহাদিগকে কখনও তাহারা দেখে নাই, এই প্রকার ভান করিয়া তাহারা পথিকদিগের সঙ্গ লইত। শ্রান্ত পথিক একাকী পথ চলিতেছে, নির্জ্জন বনপ্রদেশ এবং সেও প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে ক্লান্ত, পথভ্রান্তিও এ সময়ে অসম্ভব নহে, সুতরাং দুই চারি জন সঙ্গী পাইলে তাহার সহিত আনন্দে গমন করিতে থাকে। সেই সময়ে নানাবিধ গল্প ও গন্তব্যস্থানের বিষয়ে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়। ঠগেরা এই সব বিষয়ে [illegible] ও সন্দেহ উৎপাদন না করিয়া এমন সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন করে—যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কথায় কথায় সেই পথিককে ব্যস্ত রাখিয়া তাহার গন্তব্যস্থান ও অর্থাদির বিষয় জানিয়া লয় ও সুবিধা বুঝিয়া "ঝিরণী" দেয়। ঝিরণীর সঙ্কেত বাক্যের পরই হত্যাকরা হয়। *

হত্যার প্রণালী অতিশয় ভয়ানক. ইহা ভাবিলে হৃদকম্প হয়, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তীব্রবেগে রক্ত ছুটিতে থাকে, জগদীশ্বরের সৃজিত শ্রেষ্ঠ জীবের দ্বারা যে এতদূর নৃশংস ও লোমহর্ষণ কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে ইহা ভাবিয়া মনে মনে বড় আক্ষেপ হয়। নির্দ্দোষ ও নিরীহ প্রাণীকে পশুবৎ হত্যা করিতে যে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না—ইহা ভাবিয়া মনে বিজাতীয় যাতনা উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ সুবিধা হইলেই ইহারা হত্যা-সঙ্কেত দিয়া থাকে যখন দেখে যে হত্যার স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে, অন্য পথিক নিকটে নাই ও সমস্ত ঘটনাই অনুকূল-জনক, তখন আবার সঙ্কেত দেওয়া হয়। সঙ্কেত ধ্বনি শুনিবামাত্র সেই হতভাগ্য পান্থের পার্শ্বস্থ এক জন ঠগ তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিলেই ফাঁস গলায় লাগাইয়া দেয়। ও অপর ব্যক্তি সেই বস্ত্র খণ্ডের অপর দিকে ধরিয়া ক্রমশঃ সজোরে টানিতে থাকে। দুই দিক হইতে দুই জনে টানাতে পথিকের মুখ মাটীর দিকে ঈষৎ ঝুকিয়া পড়ে ও এই অবসরে আর একজন পশ্চাৎ হইতে সেই পথিকের পদদ্বয় ধরিয়া টান দেয়। তাহাতে সেই হতভাগ্য পথিক তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হয় ও ইহাদের মধ্যে একজন তখন বিদ্যুৎবৎ তাহার পৃষ্ঠের উপরে বসিয়া ফাঁস জোরে টানিয়া কার্য্য শেষ করে। তৎপরে মৃত পথিকের বস্ত্রাদি অন্বেষণ করা হয়, যদি তাহারা সেই পথিকের নিকট হইতে অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তবেই বড় সন্তুষ্ট নচেৎ নিরাশার বিষম দংশনে কাতর হইয়া সেই হতভাগ্য মৃতপথিককে পদাঘাত ও অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করে। কি নৃশংস ব্যাপার। কি ভয়ানক কাণ্ড! ইহা-

---

* ঝিরণী নিহত করিবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিক বাক্য। "আইয়ো হো তো ঘরে চল" "হুক্কা ভর লাও" এই দুইটী হত্যা করিবার প্রচলিত শব্দ। এতদ্ভিন্ন বধার্থ জ্ঞাপক আরও শব্দ আছে।

কেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বলিয়া থাকে।

হত্যার পর মৃতদেহটীকে সন্নিকটস্থিত কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যায়। সেই স্থান যদি বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় তবে তথায় সেই মৃতদেহটীর সমাধি করে। সমাধির স্থান প্রায়ই হত্যার পূর্ব্বে স্থির হইয়া থাকে। হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সাঙ্কেতিক বাক্যানুসারে একজন গোর খননের সুবিধা জনক স্থান দেখিতে যায়।* এই সমাধি প্রায় ৫ ফুটের বেশী কখনও চওড়া হয় না। এই গোরের ভিতর মৃত দেহটীকে উবুড় করিয়া শোয়াইয়া তাহার হস্ত পদগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়। গোর খনন, ও মৃতদেহ চ্ছেদন—দেবী-মন্ত্রে-উৎসর্গীকৃত কুঠার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার উৎসর্গীকৃত কুঠার ঠগে-দের নিকট অমূল্য দ্রব্য; সেই কুঠারছিন্ন-মৃতদেহ অবশেষে, মাটী দিয়া চাপিয়া তাহার উপর, ঘাস বসাইয়া দেওয়া হয়।

কখনও বা হত্যা করিয়া গোর দিবার পূর্ব্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহ গোপন করে। একটী ক্ষুদ্র বস্ত্রের কাণাত করিয়া তাহার মধ্যভাগে সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। অপরে জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা বলে যে এই কানাতের মধ্যে আমাদের পরিবারেরা আছে। হত্যা ঘটনা প্রকাশ হইবার কোন উপক্রম হইলে ঠগদিগের মধ্যে একজন যেন যথার্থ পীড়িত হইয়াছে—এইরূপ ভান করিয়া সেই খানে পড়িয়া যায়, ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকে—উপস্থিত পথিকেরা তাহা-দের যন্ত্রণা না দেখিতে পারিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলে ইহারা তখন সুবিধামতে নিহত পথি-কের শেষ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কখনও কখনও পথিক সংগ্রহ করিবার জন্য বা হত-পান্থের মৃতদেহ গোপন করিবার জন্য আর একটা উপায় অবলম্বন করে। সুবিধা দেখি-লেই—"গান করনা" এই সঙ্কেত-শব্দ উচ্চারিত হয়। "গান করনা" শব্দটা একটী ভয়াবহ সাঙ্কেতিক শব্দ; এই দুটা কথা দলপতির মুখে হইতে উচ্চারিত হইলেই একজন পীড়ার ভাণ করিয়া ভূতলে পতিত হয় ও ছটফট করিতে থাকে। যদি সেই সময়ে দুই একজন পান্থ ঘটনাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া জোটে, ও ইহারা সুবিধা দেখে—তবে তৎক্ষণাৎ আর এক নূতন ফিকির বাহির করে। ভূপতিত রোগী যন্ত্রণায় এই সময়ে, খুব ছটফট্ ক-রিতে থাকে—ও কেবল যাতনা-ব্যঞ্জক স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে; দলের মধ্যে একজন উঠিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলে, ভাই সকল, ইহাকে ভূতে পাই-য়াছে—তোমরা যদি একটু কষ্টস্বীকার কর ত আমি রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিব। রোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া উপস্থিত পান্থদিগের মনে করুণার সঞ্চার হয়। তাহারা তখন সেই ব্যক্তির কথামতে

---

* "বিলিয়া মাজনা" অর্থাৎ পাত্রটি মাজিয়া আন, বলিলেই খনক-ঠগ, সমাধি খনন জন্য স্থানান্বেষণে যাত্রা করে।

উপরোধানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হয়। তখন সেই ব্যক্তি সেইখানে একখানি আসন পাড়িয়া বসে ও আর আর সকলে তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসে—তাহার উপদেশানুসারে সকলেরই মুখ আকাশের দিকে—তাহারা একমনে উহার কথামত আকাশের তারা গুণিতে থাকে, ইত্যবসরে চারি পাঁচজন ঠগ হঠাৎ উঠিয়া—তাহাদের গলদেশে ফাঁস প্রদান করে—ও তৎক্ষণাৎ বিনা আয়াসে কাজ নিকাস করিয়া ফেলে। এই রূপে একটী মৃহদেহ গোপন করিবার জন্য ইহারা কখনও কখনও ৫।৭টী ব্যক্তিকে উল্লিখিত উপায়ে নষ্ট করিয়া থাকে। ঠগেরা যাহার এক বার সঙ্গ লয় তাহাকে শীঘ্র ছাড়ে না। এমন দেখা গিয়াছে যে স্থবিধা ঘটে নাই কিম্বা পথিকদের দলে অনেক লোক আছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া ইহারা একাদিক্রমে ৫।৭ দিন সঙ্গ লইয়া চলিতে থাকে। পরে স্থবিধা বুঝিয়া এমন ভাবে হত্যা কার্য্য সমাধা করে, যে তাহার সহগামী পান্থদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না। পরে স্থবিধা বুঝিয়া, উপযুক্ত স্থানে মৃতদেহ ভূমধ্যে প্রোথিত করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—এক এক দলে শতাধিক লোক থাকে, কিন্তু ইহারা সন্দেহ নিবারণার্থ ৫।৬টী ক্ষুদ্র দল সংগঠন করিয়া পথিকদের সঙ্গ লয়। রাস্তায় যাইতে যাইতে এমত ভান করে—যেন তাহার অপরাপর সঙ্গীদিগের সহিত সে কখনও পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। রাস্তার মধ্যেই তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। ক্রমে মিষ্টকথায়, সৎব্যবহারে, সকলের নিকট হইতে সমস্ত কথা বাহির করিয়া লয়। পথিক যদি নিকটস্থ সরাইয়ে রাত্রি-যাপন করিতে চাহে—তবে তাহারাও ইহার অনুসরণ করে। সরাইয়ে একত্র আহারাদি ও আমোদাদি করে। পরে সেই পথিক নিশ্চিন্ত হইয়া, নিদ্রাগত হইলে, গভীর রাত্রে স্থবিধা বুঝিয়া সর্পভয় দেখাইয়া তাহাকে হঠাৎ জাগরিত করে। সর্পভয়-ভীত-পথিক ত্রাস্ত ভাবে উঠিয়া বসিবা মাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুৎবৎ তাহার গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া হত্যাকাণ্ড সমাধা করা হয়, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে, অবিমর্ষ ভাবে,—সেই পান্থশালার মধ্যদেশ খনন করিয়া সেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া মাটী পিটিয়া সমতল করিয়া দেওয়া হয়। পান্থশালার অধিকারীর সহিত ইহাদের পূর্ব্বাবধিই বন্দবস্ত থাকে স্থতরাং এ বিষয়ে আর কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় না।

ঠগেরা সমস্ত বৎসরই যে হত্যা কার্য্যে অতিবাহিত করিত তাহা নহে। বৎসরের মধ্যে একটী নির্দ্ধারিত সময় থাকে, সেই সময়ে তাহারা দলপতির অধীনে গৃহ হইতে শুভদিনে শুভক্ষণে, দিন দেখিয়া যাত্রা করে। প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালীর সহিত, ইহারা ধর্ম্মের সংশ্রয় করিয়া চলে। স্থতরা যাত্রার পূর্ব্বে অতিশয় সাবধানতার সহিত পূজা কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করে। প্রাচীন হিন্দু যেমন কোন দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে স্বস্ত্যয়ন ও দেবতাদিগের নাম করিয়া যাত্রা করেন ইহারাও সেইরূপ করে। বিদেশ

গমন করিবার শুভদিন নিরূপণ করিবার জন্য একজন বিজ্ঞ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়া আনে, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুথি খুলিয়া যাত্রার দিক, ও সময়, ঠিক করিয়া দেন। একখানি বিস্তৃত কম্বলে দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে সযত্নে বসাইয়া অপরাপর সমস্ত ঠগ, দলপতির সহিত, কম্বলের বাহিরে বসে। পরে দলপতি কর্ত্তৃক সাদরে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি আবার পঞ্জিকাদি দেখিয়া দিন, ক্ষণ, ও দিক নির্ণয় করিয়া দেন। গণনার সময় দলপতি, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সমুখে একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ চাউল, ও গম ও দুইটী পয়সা রাখিয়া দেন। গণনা কার্য্য সমাধা হইলে দলপতি একটী লোটা জলপরিপূর্ণ করিয়া ঝুলাইয়া লয়েন। লোটাটী দক্ষিণ হস্তে ঝুলিতে থাকে, ও বামহস্তে একখানি শ্বেতবর্ণ রুমালে * পাঁচগাঁট হলুদ একটী তাম্রমুদ্রা একটী রৌপ্যমুদ্রা ও উৎসর্গীকৃত কুঠার বাঁধা থাকে। দলপতি ইহা বাম হস্তে ধরিয়া বক্ষের উপর, রাখেন। তখন গ্রাম হইতে, অদূরস্থ একটী সুবিধা জনক উদ্যান, বা, প্রান্তরোদ্দেশে, অতি ধীর-পদবিক্ষেপে, দলপতি সমস্ত দলের সহিত চলিতে থাকেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া তিনি দৈবজ্ঞ-কথিত দিকে মুখ ফিরাইয়া, বাহ্যজগত ও পৃথিবীর অন্যান্য চিন্তা হইতে মন সংযত করিয়া, উর্দ্ধনেত্রে, স্পষ্টস্বরে নিম্ন লিখিত কথাগুলি বলেন—"মা, জগন্মাতা, মহাকালি! আমরা যে উদ্দেশ্যসাধন জন্য অদ্য যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া এই দিক ও সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি তাহা তোমার অনুমোদিত কিনা চিহ্ন দ্বারা আমাদিগকে দয়া করিয়া জানিতে দাও"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পিলাও "কিম্বা" থিবাও † দ্বারা শুভচিহ্ন পরিব্যক্ত হইলে দলপতি ধীরে ধীরে লোটাটী মাটীতে রাখেন। দলপতির হস্ত হইতে লোটা পড়িয়া যাওয়া অশেষ অমঙ্গল জনক—এমন কি ইহাদের বিশ্বাস মতে সেই বৎসরেই দলপতির মৃত্যু ও সমস্ত দল ধৃত হইতে পারে। লোটা নাবান হইলে—দলপতি গন্তব্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সপ্তঘণ্টা কাল সেইখানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন; ও ক্রমশঃ প্রকাশিত চিহ্নাদির দ্বারা ঘটনার শুভাশুভ অনুমান করিতে থাকেন। ইত্যবসরে দলের অন্যান্য লোক যাত্রার আয়োজন ও দলপতির জন্য আহারাদির বন্দোবস্তে ব্রতী থাকে। পরে সেই দিবস বেলা থাকিলে যাত্রা পুনরায় আরম্ভ করা হয়। কিন্তু দিবাবসান হইলে সেইখানে রজনী যাপন করিয়া পর দিবস পুনরায় যাত্রারম্ভ করা হয়। কিয়দ্দূর গমন করিয়া

---

*ঠগেদের মতে শ্বেত ও পীতবর্ণ দ্রব্যাদি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়। ফাঁস কার্য্যে যে চাদর বা বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করা হয় তাহা প্রায়ই শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

† পিলাও "বামদিকে শুভচিহ্ন,—ও থিবাও" দক্ষিণদিকে শুভচিহ্ন। প্রথমটীর প্রকাশে তাহারা ভাবে যে দেবী তাহাদের ডানহাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। দ্বিতীয়টীর দ্বারা ভাবে তাহাদের বামহাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন।

তাহারা প্রথমে যে পুষ্করিণী প্রাপ্ত হয় তাহার তীরে বসিয়া দলপতির সংগৃহীত, ছোলা বা অন্য প্রকার শস্য বা "তুপোনী" উৎসর্গীকৃত গুড়, ভক্ষণ করিয়া জল পান করে। এই প্রকার অবস্থায় সাত দিন চলিতে থাকে। সাত দিনের পর ইহারা কিঞ্চিৎ কাঁচা ডাল ভক্ষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্নাহার করিতে থাকে। এই সময়ে, এক মাস ধরিয়া তাহারা ঘৃত মাংস ভক্ষণ করে না। কোন প্রকার বেশ পরিবর্ত্তন, বা বস্ত্র রজকালয়ে প্রেরণ, শ্মশ্রুক্ষেপণ এবং স্ত্রীসংসর্গ এই সময়ে নিষিদ্ধ। কেহ দাতব্য স্বরূপে তিলমাত্র দ্রব্যও এই সময়ে প্রদান করিতে ক্ষমতাবান নহে। এমন কি উচ্ছিষ্ট, ও পরিত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জনও এই সময়ে ইহারা কুকুর বিড়ালকে প্রদান করে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতকাল ইহারা কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে বাহিরে বেড়ায় (এমন কি এক বৎসর পর্য্যন্ত) দণ্ড-ধারণ ও দুগ্ধ পান করে না।

ঠগেরা চারিদিকে (ইহাদের বিশ্বাস মত) শুভচিহ্ন প্রকাশিত না হইলে যাত্রা করে না। কোন বাধা পড়িলে পুনরায় ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অতি সাবধানে যাত্রা করা হয়। যাত্রাকালে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে, শৃগাল গমন করিলে—আকাশ হইতে চিল শ্বেতবর্ণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, ভিন্নগ্রামস্থ শবদেহ দর্শন করিলে—অতিশয় শুভ ফল লাভ হয়। শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় কন্যাদির ক্রন্দন শ্রবণ অতিশয় শুভ চিহ্ন। ছুতার, কুম্ভকার, ফকির, তৈলিক, প্রভৃতি জাতির মুখ দর্শন যাত্রাকালে অতি নিষিদ্ধ।

যদি সেই যাত্রায় বিশেষ ফল লাভ হয়—তবে পূর্ব্ব কথিত বস্ত্র খণ্ডে নিবদ্ধ দ্রব্যাদি দরিদ্রদিগকে বিতরণ না করিয়া পরের যাত্রার জন্য রাখা হয়।

শব চ্ছেদনকার্য্য, ও সমাধি খনন নির্ব্বাহার্থ ইহারা যে ক্ষুদ্র কুঠার ব্যবহার করে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কুঠার উৎসর্গ প্রণালী আবার কতকগুলি নিয়ম ও রহস্যজালে জড়িত। ধরিতে গেলে এই তীব্র-শাণিত, উৎসর্গীকৃত, দেবী-প্রসাদিত কুঠার,—ও রজ্জুই ইহাদের প্রাণ অবলম্বন, ও পূজার্হ বস্তু। কুঠার উৎসর্গকার্য্য অতি মহৎ ব্যাপার। 'কোটীর (দেবী পূজার) ন্যায় ইহারও সম্বন্ধে, কতকগুলি ভয়ানক নিয়ম আছে। যাত্রার পূর্ব্বে গোপনে দলপতি কর্ম্মকারের গৃহে একদিন শুভদিন দেখিয়া গমন করে। তাহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া তাহাকে কতকগুলি টাকা দিয়া দিব্য একখানি শাণিত ক্ষুদ্র কুঠার গঠন করাইয়া লয়। কামারও এই কার্য্য শেষ না করিয়া অন্য কার্য্যে হাত দিতে পায় না। পরে সেই কুঠারখানি গোপনে ঘরে আনা হয়। শুভদিনে শুভক্ষণে, তাঁবুর ভিতরে, বা গৃহের অন্তর্ভাগে, কুঠারোৎসর্গ কার্য্য সমাধা করে। পাছে মানুষের বা অন্য বস্তুর ছায়া পড়িয়া এই কুঠার অপবিত্র হইয়া যায়—এই ভয়ে ইহারা কুঠার খানিকে অতি নিরাপদ স্থানে রাখে। পরে একখানি পিতলের পাত্রে কুঠারখানি

স্থাপন করিয়া একজন উৎসর্গ কার্য্য-দক্ষ ঠগ, পশ্চিমমুখে—আসনে উপবেশন করে। আসনে উপবিষ্ট হইয়া সে কার্য্য আরম্ভ করিতে থাকে। নিকটে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করা হয়। নিকটস্থ পাত্র হইতে কুঠারটী হাতে লইয়া অতি ধীরভাবে ও সন্তর্পণে সেই গর্ত্তের উপর ধরিয়া রাখা হয়। প্রথমে গঙ্গাজল তৎপরে চিনির জল দিয়া সেই কুঠার খানিকে ধৌত করা হয়। সর্ব্ব শেষে দধি ও ময়দা দ্বারা ধৌত কার্য্য বা স্নান শেষ করিয়া সেই শাণিত ও স্নাতঅস্ত্র খানিকে একটী পিতলের পাত্রে রাখিয়া সাতটী সিন্দুরচিহ্নে চিহ্নিত করান হয়। ধৌত জল সমস্তই সেই গর্ত্তমধ্যে পড়ে। আর একটী পাত্রে অতি নিকটে, লবঙ্গ, পান, শ্বেত চন্দনকাষ্ঠ, চিনি তিল ও পিতলের বাটীতে ঘৃত ও একটী আস্ত নারিকেল রাখা হয়। পরে শুষ্ক গোময় রাশি দ্বারা অগ্নি-প্রজ্জলিত করিয়া—তাহাতে খানকতক শুষ্ক আম্রকাষ্ঠ প্রদান করে। অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিলে সাতবার সেই অস্ত্রখানি আগুণের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ও সেই পিত্তল পাত্রের সমস্ত দ্রব্যাদি ( নারিকেল ছাড়া ) একটু করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে আর একজন সহকারী ব্রাহ্মণ সেই নারিকেলটীকে ইত্যবসরে ছাড়াইয়া হস্তে করিয়া ধরে ও অপর ব্যক্তি, সেই তীব্র শাণিত কৃপাণ, উত্তোলিত করিয়া "নারিকেল তবে দেবীর আজ্ঞায় বিভক্ত করা হউক" বলিয়া সেই কুঠারের অশাণিত ভাগ দ্বারা এক আঘাতেই, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। পরে সকলেই "দেবীর জয় হউক" ঠগেদের জয় হউক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। নারিকেলের মালা হইতে কিঞ্চিৎ শাস ছাড়াইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহাদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে সেই কুঠার খানিকে সাবধানে বাঁধিয়া—ও প্রণাম করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া সেই উৎসর্গীকৃত, নারিকেলের শস্য ভক্ষণ করে। এই তরবারিকে তাহারা ইষ্টদেবতার সমান ভক্তি করিয়া থাকে। দলের জমাদারের হস্তে বা খুব বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ ঠগের নিকট ইহারা এই কৃপাণ খানি রাখিয়া দেয়। মৃতদেহ ছেদন করিবার পর ও বহুদিন ধরিয়া কোন শীকার না জুটিলে ইহারা প্রতিদিবস এই তরবারিকে পূজা করিয়া থাকে।* কৃপাণ উৎসর্গ সময়ে শুভ চিহ্ন

* ঠগেদের বিশ্বাস মতে পূর্ব্বে দেবী কালিকাই, নিহত ব্যক্তির শেষ কার্য্য করিতেন। এক দিন কোন দলস্থ একটী ঠগ নিহত-পথিক-দেহ মাটীতে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সন্দেহক্রমে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখাতে এক ভয়ানক ব্যাপার তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। সে দেখে যে দেবী সেই নিহত ব্যক্তিকে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছেন। দেবীও ইহা দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন—এখন হইতে তোরা ইহাদের শেষ কার্য্য করিবি—এই অস্থিখণ্ড দিলাম, ইহাতে তরবারি বা কুঠার প্রস্তুত করিয়া শবদেহ এই কৃপাণ-খনিত সমাধিতে সমাধি করিবি" এই সময় হইতে কৃপাণের ব্যবহার চলিতেছে। কর্ণেল শ্লিমান, অনেক বদমায়েস ঠগকে এই কুঠার স্পর্শ করাইয়া

দেখিতে পাইলে ইহারা বড় আহ্লাদিত হয়। যদি কৃপাণ ধারীর হস্ত হইতে কুঠার ভূপতিত হয়, তবে তাহাকে দলচ্যুত করা হয়। কোন ঠগের দলই এ বিষয় জানিতে পারিলে তাহাকে গ্রহণ করে না। তাঁবুর মধ্যভাগে, যাত্রাকালে ইহারা এই অস্ত্র সন্তর্পণে পুঁতিয়া রাখে ও ঠগ ভিন্ন কেহ ইহা দেখিতে পায় না। এই প্রকার উৎসর্গীকৃত, নর-বিঘাতী, সুশাণিত লৌহময় কৃপাণকে ইহারা "কাশী" বা "মাহী" আখ্যা প্রদান করে।

# পজিটিভিজম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

গত শ্রাবণ মাসের ভারতীতে পজিটিভিজমের পক্ষ সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে গুটিকতক কথা আমি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইহা বলিতে আমি আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করি যে তিনি আমার একজন পরম সহৃদয় বন্ধু; এবং তাঁহার লেখা দৃষ্টে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।—তাঁহার মত যাহাই হোক না কেন, তিনি বাহিরের লোকের কটাক্ষের প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যেরূপ অকৃত্রিম সরল ভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যথার্থ পুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এখনকার কালে অনেকে যেরূপ না ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা যে-সে সিদ্ধান্ত জোরের সহিত স্থাপন করিয়া লোকসমাজের বিরুদ্ধে আপনার পুরুষত্বের পরিচয় দেন, এ তাহা নহে। এই প্রবন্ধটিতে তাঁহার বহুদিনের চিন্তা ও প্রাণগত অনুরাগ সুস্পষ্ট মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে—ঠিক যেন তাঁহার মন প্রাণ অবিকৃত ভাবে কাগজে উথলিয়া পড়িয়াছে,—ইহাতেই তাঁহার ভাষা আরো সুন্দর হইয়াছে; এমন চমৎকার ঝর্ঝরে' বাঙ্গালা অতি অল্পই দেখা যায়।

তিনি যে কি চক্ষে কমট্‌কে দেখিয়াছেন—অন্যেরা পাছে সে চক্ষে না দেখে—এই তাঁহার ভয়, ও সকলেই কমট্‌কে সেই চক্ষে দেখুক এই তাঁহার মনের আগ্রহ, এই-দুইটি ভাব তাঁহার প্রবন্ধটির প্রাণ; আর যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা তাহারি টানে বলিয়াছেন। কমটের প্রতি তাঁহার এই যে প্রগাঢ় ভক্তি—ইহার প্রতি কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তি তাঁহার চক্ষের সমুখে এমনি-এক যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে যে, পর-পক্ষের ধর্ম্মের সার-আদর্শ তাঁহার

---

দিব্য করাইয়া অনেক কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। পিতার পদস্পর্শ অপেক্ষা কুঠার স্পর্শ করিয়া দিব্য করা তাহাদের নিকট আরো ভয়ানক। See—Gort Records about Thugee. Chap 11.

চক্ষু হইতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য আমরা সে আদর্শটি তাঁহার নিকট যথা সাধ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।

তিনি এইটি বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরলোকের ক্লেশ-ভয়েও সুখ-প্রলোভনে ধর্ম্মকার্য্য করা—পিতামাতাকে ছাড়িয়া বনে যাওয়া—কমটের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—প্রকারান্তরেই বা কেন—লেখক স্থানে স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আর আর ধর্ম্মের সারমর্ম্ম উহা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর আর ধর্ম্মের কথা বলিতে আমি অনধিকারী কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ—ব্রাহ্মধর্ম্ম—আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহার আদর্শ উহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কমটির প্রতি ভক্তির আতিশয্যে কৃষ্ণকমল বাবু তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। আমাদিগকে যে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে হইতেছে—ইহাই আক্ষেপের বিষয়! ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে যে স্বর্গলোভে কিম্বা নরকের ভয়ে কর্ম্ম করা কেবল নাম-মাত্রেই ধর্ম্ম;—ঈশ্বরেতে কর্ম্মফলের সন্ন্যাস পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। আমরা শাস্ত্রাদির সার সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের যে আদর্শ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি; কমটের ধর্ম্মের আদর্শ কি, তাহা যদি কৃষ্ণকমল বাবু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন,—সে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি—মর্ম্ম কি—তাৎপর্য্য কি—তাহা যদি খুলিয়া বলেন, তবেই আশা করা যাইতে পারে যে, পাঠকগণ নিম্ন প্রদর্শিত আদর্শের সহিত তাহার তৌল করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

মনুষ্য তিন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; প্রথম, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া; দ্বিতীয়, স্বার্থের উদ্দেশে; তৃতীয়, পরমার্থের উদ্দেশে।

প্রবৃত্তির অধীনে কার্য্য করা এইরূপ,—যেমন—কোন ব্যক্তি ক্রোধন-স্বভাব, কোন ব্যক্তি লোভী, যাহার যে প্রবৃত্তি বলবান অনেক সময় তাহার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে নিজের স্বার্থ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। লোভী ব্যক্তির কার্য্যসমূহের কেন্দ্র বা প্রধান-প্রবর্ত্তক লোভ। ক্রোধী ব্যক্তির কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক তাহার ক্রোধ ইত্যাদি।

এই তো গেল প্রবৃত্তি,—এখন স্বার্থ কি রূপ দেখা যাউক। যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে তাহারা উপস্থিত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যেমন—কোন কার্য্য-নিপুণ ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ হইলেও স্বার্থের খাতিরে অনেক সময় ক্রোধকে দমন করিতে হয়,—অর্থ-উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় ভোগ লালসাকে দমন করিতে হয় ইত্যাদি। প্রবৃত্তি-মূলক কার্য্যের কেন্দ্র যেমন উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনা, স্বার্থের কেন্দ্র তেমনি সমস্ত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য-সাধন, এক কথায়—আপনার ভাল। এখন পরামর্থ কি তাহা দেখা যাউক। এটি একটু অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয়,—এটি

ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ব্বের ঐ দুটি কার্য্য-প্রবর্ত্তকের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। স্বার্থের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য, কতক-না-কতক পরিমাণে প্রবৃত্তি-সকলের সামঞ্জস্য সাধনকরা তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়ে—সে সামঞ্জস্য সাধক কে ? না বিষয় বুদ্ধি। বিষয় বুদ্ধি প্রবৃত্তির ন্যায় অন্ধ নহে। অন্ধ ভাবে উপস্থিত প্রবৃত্তি চরিতার্থকরা স্বার্থ সাধন নহে, দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে আপনি সুখ উপভোগ করিব ইহাই প্রকৃত স্বার্থ। এই লক্ষ্য সাধন করিতে গিয়াই, স্বার্থ, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি-সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে;—এখন জিজ্ঞাস্য এই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে কে সামঞ্জস্য সাধন করিবে ? প্রতিবেশীর ভূমি কাড়িয়া লওয়া আমার স্বার্থ, সেই ভূমি দখলে রাখা তাহার স্বার্থ, এই দুই স্বার্থের সামঞ্জস্য কে করিবে ? ধর্ম্ম বুদ্ধিই তাহা করিতে পারে। এস্থলে এই এক কথা উঠিতে পারে যে, অন্যের স্বার্থ না মানিয়া চলিলে আপনার স্বার্থ রক্ষা করা যায় না দেখিয়া—আপনার স্বার্থের অনুরোধেই লোকে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয় বুদ্ধিই আপনার স্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, তাহার জন্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে ডাকিয়া আনিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে—Honesty is the best policy, সদাচারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নয়-কৌশল;—ইহা আমরা অস্বীকার করি না—কিন্তু যাহারা স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে (Policyর খাতিরে) সৎ হয়, তাহাদিগকে আমরা প্রকৃত সজ্জন বলি না। ইহা এত স্পষ্ট সত্য যে, ইহার ব্যাখ্যা-বাহুল্য-দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটিকে ভারাক্রান্ত করিব না।

তাহা হইলেই—কেবল 'আপনার ভাল' এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলের অভিপ্রায়কে অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে,—সেই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই স্বার্থগণের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ। ইহাকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে না—ইহাই ধর্ম্ম বুদ্ধি। বিষয় বুদ্ধির লক্ষ্য শুদ্ধ কেবল আপনার মঙ্গল, এক কথায়—স্বার্থ; ধর্ম্ম বুদ্ধির লক্ষ্য আত্মপর-নির্ব্বিশেষ অনিরুদ্ধ মঙ্গল, এক কথায়—পরমার্থ।

আপনার প্রবৃত্তিগণের সামঞ্জস্যকরী কেন্দ্র-স্বরূপে আপনাকে না দেখিলে যেমন স্বার্থ সাধনের কোন অর্থ থাকে না, তেমনি সকল স্বার্থের সামঞ্জস্য-কারী কেন্দ্রস্বরূপে পরমাত্মাকে না দেখিলে পরমার্থের বা ধর্ম্মের কোন অর্থ থাকে না। জগতের প্রকৃত মঙ্গল একটা আছে এবং সে মঙ্গল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তোমার আমার জ্ঞানেতে পাওয়া যায় না—তাহা জগতের মূলস্থিত জ্ঞানেতেই প্রকাশিত আছে। সেই মূল জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, ধর্ম্ম-রাজ্য, প্রবৃত্তি এবং স্বার্থের রাজ্য হইতে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। একই কার্য্য প্রবৃত্তি অনুসারে, স্বার্থ অনুসারে, পরমার্থ

অনুসারে, কৃত হইতে পারে; কিন্তু সেই কার্য্যের মূল্য অবধারণ করিতে হইলে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করা চাই যে, তাহার মূল-প্রবর্ত্তক উহাদের কোনটি? প্রবৃত্তি, স্বার্থ না পরমার্থ? মনে কর কোন ব্যক্তি এক-জন ইংরাজের দোকানে একটা স্বর্ণ ঘটিকা ক্রয় করিল; ঘড়ির চাকচিক্যে মোহিত হইয়া সে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও উহা কিনিতে পারে; আর, পরমার্থের বি-রোধী স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কিনিতে পারে, কাহাকেও উৎকোচ দিয়া ভুলাইবার জন্য কিনিতে পারে; আবার, পরমার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যও কিনিতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে অন্ধ উত্তেজনার কার্য্যকেই আমরা বলি প্রবৃত্তির কার্য্য; শুদ্ধ কেবল আপনার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া যে কার্য্য কৃত হয় তাহাকে আমরা বলি স্বার্থ; পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কোন কার্য্য করা হয় তাহাকেই বলি পরমার্থ। আপনাদের নিজের মঙ্গল-অভিপ্রায়ের সজ্ঞান-মূলাধার যেমন আমরা আপনারা, তেমনি সমস্ত জগতের মঙ্গল অভিপ্রায়ের সজ্ঞান মূলাধার পরমাত্মা। "স্বার্থ" এই একটি কথার মধ্যে কতগুলি কথা আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; প্রথম, আপনার ভালো'র দিকে লক্ষ্য; দ্বিতীয়, সে লক্ষ্য প্রবৃত্তির ন্যায় অন্ধ লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাহার মূলে জ্ঞান আছে; তৃতীয়, সেই জ্ঞানটিকে ছাড়িয়া দিলে সে লক্ষ্যের কি-ছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; চতুর্থ শুধু যে আ-মার জ্ঞান না থাকিলে আমার লক্ষ্য থাকে না তাহা নহে, কোন স্থলেই জ্ঞান ভিন্ন লক্ষ্য থাকিতে পারে না, ইহা একটি ধ্রুব মূল তত্ত্ব; তেমনি "পরমার্থ" এই কথাটির মধ্যেও আর কতকগুলি কথা আছে; প্রথম, আত্মপর নি-র্ব্বিশেষ সমস্ত জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য; দ্বিতীয়, সে লক্ষ্য অন্ধ লক্ষ্য নহে; তৃতীয়, তাহা স্বার্থের ন্যায় অল্পজ্ঞানের ক্ষুদ্র লক্ষ্য নহে, তাহা পূর্ণ জ্ঞানের মহান্ লক্ষ্য। এই যে পারমার্থিক ধ্রুব মঙ্গল, ইহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রাণ, এইরূপ শ্রদ্ধার বলেই আমরা বলি যে কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করিতেছি। কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করার অর্থ ইহা নহে, যে তাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। সে উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাইয়া আছে, সেই জন্য সে কথাটী মুখে বলা কেবল বাচালতা বলিয়া মনে হয়। যেমন আমরা বায়ুর ভার বহন করা সত্বেও ভার-হীন হালকা শরীরে আছি, তেমনি কর্ত্তব্য-বোধে কার্য্য করিবার সময় উদ্দেশ্য-সাধনের ভারে আমরা আ-ক্রান্ত হইয়া পড়ি না। প্রবৃত্তির অতীত নিষ্কাম কার্য্য ও স্বার্থের অতীত নিঃস্বার্থ কার্য্য ক-রিলে তাহাতেই বুঝাইয়া যায় যে, জগতের মঙ্গলের জন্য, পরমার্থের জন্য, কার্য্য করি-তেছি; এই জন্য সে কার্য্য করিবার সময় আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। অনেক সময় অজ্ঞানবশতঃ মনে করি বটে যে তাহা নিষ্ফল হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই নিষ্ফল হই-বার নহে, কেন না তাহার মূলে ধ্রুব মঙ্গল রহিয়াছে। কমটের শিষ্যেরা বলিতে পা-

রেন যে, ধ্রুব মঙ্গলের প্রতি ঐ যে তোমার বিশ্বাস উটি অন্ধ বিশ্বাস। তাঁহার জানা উচিত যে আপেক্ষিক সত্য ও মঙ্গলের মূলে পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ মঙ্গল বর্ত্তমান আছেই আছে—এ বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে, ইহা একটি গভীর নিগূঢ় তত্ত্ব,—এটি দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান-মূলক পাকা সিদ্ধান্ত, অন্ধ-ভক্তি-মূলক কাঁচা সিদ্ধান্ত নহে। স্পেনসরের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের ঐকান্তিক পক্ষপাতী ব্যক্তিকেও অগত্যা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে যে, সকল আঁপেক্ষিক সত্যের মূলে পরাকাষ্ঠা মূল সত্য বর্ত্তমান—এ তত্ত্বটি, তাঁহার মতে, যৎপরোনাস্তি ধ্রুব, অভ্রান্ত এবং অকাট্য সত্য। আমরা আরো বলি যে, জগতের মূল উদ্দেশ্য জগতের মঙ্গল, এবং সে উদ্দেশ্য মূল সত্যেতেই ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে—তিনিই ধর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক।

এইটুকু বলিয়াই আমরা এখানে ক্ষান্ত হইলাম। এ প্রস্তাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের নিজের আদর্শ কি তাহাই বলিলাম; কমটের কিরূপ আদর্শ তাহার যদি একটি সংক্ষিপ্ত অবয়ব কৃষ্ণকমল বাবু পরে প্রকাশ করেন ত তখন আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ আরো খুলিয়া বলিবার চেষ্টা পাইব; আর, আমাদের এই আদর্শ সম্বন্ধে যদি তাঁহার কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিলে আমরা অতি আহ্লাদের সহিত তাহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিব।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# উত্তরার অনুরোধ রক্ষা।

---

উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।

ধনঞ্জয় হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্যবসন সকল আনয়ন করিব।

মহাভারত।

ধীরে তবে হাসি পার্থ মহারথী *
বিপুল গাণ্ডীবে পূরিলা টঙ্কার,
দিকে দিকে ছুটে গেল প্রতিধ্বনি
রিপুকুল হৃদে ধ্বনিল আবার;
বৃহন্নলা রূপী পুরন্দর সুত
সম্মোহন শর নিক্ষেপিলা তবে,
গাণ্ডীবে আবার তেয়াগি তখন
নিনাদিলা শঙ্খ ঘন ঘোর রবে;—

* গোহরণ যুদ্ধের পূর্ব্বাংশ, অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির দ্বৈরথ যুদ্ধ মহাভারতে বর্ণিত আছে।

আচম্বিতে হেথা গান্ধারী তনয়
শুনিলা আকাশে অপ্সরা সঙ্গীত,
হেরিলা চৌদিকে—কোথা রণস্থল ?
মুরজ মন্দিরা হতেছে বাদিত।
হেরিলা আকাশে নামিছে সুধীরে,
আলো করি দিকে অমর রমণী,—
করে বিজয়ের পারিজাত মালা,
শিরে স্বরগের মরকত মণি ;
বেণু বীণা সম সুমধুর বাণী,
খসিয়া খসিয়া ঝরিল গগনে,
যশো গীতি সুধা সৌরভ পূরিত
কুসুমের সম পরশে শ্রবণে ;
"জয় জয় জয়," গাহিল রমণী,
"জগতের তুমি রাজ-অধিরাজ—
কুরুকুল পতি জগতের পতি
বিঘোষিবে সবে ভুবনের মাঝ !"
আলস আবেশে মুদিল নয়ন
শিথিল হরষে পূরিল তনু ;
মুরছি পড়িল রাজা দুর্য্যোধন,
ভূতলে খসিয়া পড়িল ধনু।

হোথা সূর্য্যসুত কর্ণ মহাবীর
নেহারি সম্মুখে মানিলা বিস্ময়,
পরাজয় মানি পৃষ্ঠ দিয়া রণে
রণস্থল ত্যজি যায় ধনঞ্জয় !
ধর ধর বলি হাসিলা রাধেয়,
রথ ছাড়ি চাহে পার্থে ধরিবারে ;
সম্মোহন শরে হারায়ে চেতন
মূরছি পড়িল রথের মাঝারে।
পরম কৌতুক হেরে ভারদ্বাজ,
কিরীটী আসিয়ে পূজিছে চরণ,
পাতাল ভেদিয়ে বহে ভোগবতী,
দেবগণ করে ফুল বরিষণ !
পাণ্ডব কৌরবে মিটেছে বিবাদ
শান্তির আলয় হাসিতেছে কাছে,
নিস্তব্ধ নীরব বিস্তারি চৌদিকে,
মুনিগণ যোগে মগ্ন হয়ে আছে ;
যোগাসনে বসে কুরুকুল গুরু
করিতে লাগিলা বিভুর ধেয়ান—
বিশ্ব চরাচর পশিল অনন্তে,
ধীরে মুদে এল যুগল নয়ান।
বিশাল জলধি সম কুরুসেনা
পশিল অতল নিদ্রার সাগরে ;
কোথা কোলাহল—কোথা হুহুঙ্কার ?
রণভূমে শুধু নিস্তব্ধ বিচরে।
শান্তনুতনয় একা মহাবীর
মোহ প্রতিঘাত জানেন সন্ধান,
সম্মোহন শরে রহিলেন স্থির,
নিশীথের মাঝে শশাঙ্ক সমান।

হাসি ধনঞ্জয় কহিলা উত্তরে,
"উত্তরার বাক্য আছেত স্মরণ ?
মোহ নিদ্রামগ্ন বীরগণ এবে
এই বেলা কর বস্ত্র আহরণ ;
লোহিত তুরঙ্গ দেখ যেই রথে
নীল ধ্বজা শোভে রথের উপর,
শুভ্র বাসধারী কৃপাচার্য্য উনি,
উত্তরীয় হরি আনহ সত্বর ;
স্বর্ণ কমণ্ডলু ধ্বজদণ্ড পরে
শিরে শুভ্র কেশ অঙ্গে শুভ্র বাস,
কৌরব পাণ্ডব দুই কুল গুরু,
ত্বরিতে যাইবে দ্রোণাচার্য্য পাশ ;

অদূরে তাঁহার হেরিছ যে রথী,
কোদণ্ড লম্বিত রথের ধ্বজায়—
গুরুপুত্র উনি বীর অশ্বত্থামা,
নীল বাস তাঁর হরিবে ত্বরায় ;
মহারথীগণ ঘিরেছে যাঁহারে
ধ্বজাগ্রে শোভিছে কাঞ্চন কুঞ্জর,
রণ-রঙ্গ-মদে মত্ত দুর্য্যোধন,
নীল বস্ত্র দেখ শোভিছে সুন্দর ;
পার্শ্বেতে তাঁহার—শোভিছে ধ্বজায়
লম্বমান রজ্জু মাতঙ্গবন্ধন—
দুর্য্যোধন সখা কর্ণ মহাবীর,
পীত বাস তাঁর করিবে হরণ।
এ সবার বস্ত্র লয়ে সাবধানে
শীঘ্রগতি হেথা কর আগমন,
সৈন্য দল মুখে আছে যেই বীর
নিকটে তাঁহার করোনা গমন ;
নক্ষত্রলাঞ্ছিত কেতন রাজিছে,
শুভ্র আতপত্র শোভিতেছে শিরে,
চন্দ্র সূর্য্য সম স্বর্ণ শিরস্ত্রাণ,
স্বর্ণবর্ম্মধারী দেখিতেছ বীরে—
এই সৈন্য দল মোহিত এ শরে,
নারিনু এ শূরে করিতে অস্থির,
কুল-পিতামহ ভীষ্ম মহামতি
কুরুকুলে কেহ নাহি হেন বীর !

শুনি পার্থবাক্য বিরাট তনয়
বামপার্শ্বে রাখি ভীষ্ম মহাবীরে
উত্তরীর বস্ত্র করি আহরণ
দ্রুতগতি রথে আসিলেন ফিরে ;
পুন ধনঞ্জয় কহিলা উত্তরে,
"বৃথা সৈন্যবধে নাহি আর কাজ ;
পশুকুল দেখ গেছে গৃহ পানে—
দীর্ঘ অপমান মিটে গেল আজ।
কর্ণের সম্মুখে লয়ে চল রথ,
মোহময় শর করি সম্বরণ ;
দেখুক সকলে চাহিয়ে আমারে,
মেলুক কৌরব মেলুক নয়ন ;"
এত বলি বীর শঙ্খ লয়ে করে
ঘোর রবে তাহে পূরিলা নিশ্বাস,
নিদ্রা ত্যজি সবে উঠিল সত্বর
আঁখি মেলি সবে চাহে চারি পাশ ;
কর্ণ দুর্য্যোধন হেরে সবিস্ময়ে,
রণকৃত্য ত্যজি নীরব নিশ্চল
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে ধনঞ্জয়,
উত্তর সারথি হাসে খল খল !
ভীষ্মেরে চাহিয়া কহে দুর্য্যোধন,
"পিতামহ তুমি কি দেখ সাক্ষাতে—
দেখনা অর্জ্জুন দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
রথচক্রে বাঁধি লয়ে চল সাথে।"
হাসি উত্তরিলা শান্তনুতনয়,
"বাঁধিবারে কিছু সাথে আনি নাই,
উত্তরীয় তব দাও একবার,
ধনঞ্জয়ে তবে বেঁধে লয়ে যাই !"

হেথায় উত্তর পার্থের আদেশে
বাঁধে উত্তরীয় রথের ধ্বজায় ;
হেরি নিজ বস্ত্র কুরুবীরগণ
হেঁটমুখে সবে রহিল লজ্জায়।

সুগম্ভীর স্বরে কহিলা গাঙ্গেয়,
"লাজ নাহি বাস' গান্ধারী নন্দন—
ইন্দ্রের অজেয় যেই মহাবীর
সেই জনে তুমি করিবে বন্ধন !

এই পারাবার নিজ ভুজ বলে
সেই মহারথী মথিলেক একা,—
অমর সমাজ সাক্ষী রবে তার
অমর অক্ষরে রহিবেক লেখা!
পিনাকীর সনে যুঝিল যে জন,
অমর-আশঙ্কা ঘুচাল নিমেষে;
শৃগালের মত খেদাইল কর্ণে,
পরাজিল মোরে রমণীর বেশে;
সম্মোহন শরে ছিলে মৃতপ্রায়,
কোথা ছিল গর্ব্ব রাজা দুর্য্যোধন?
নাহি বধে পার্থ বিকল-রিপুরে
তাই নরপতি লভিলে জীবন;
না পার রক্ষিতে উত্তরীয় বাস—
দেখিছে আকাশে অমর সমাজ;
বাঁধিবে অর্জ্জুনে বলিতে একথা,
ছি! ছি! মহারাজ নাহি বাস' লাজ?

রোষে অভিমানে হইয়ে অধীর
রথীগণ সবে বেড়িল অর্জ্জুনে,
শৃগালের দল করি কোলাহল
বেড়ে যথা সিংহে গহন কাননে;
মৃদু মন্দ হাসি বীর সব্যসাচী
বিশাল গাণ্ডীব লইলা তুলিয়া,
কিণাঙ্কিত করে পূরিলা সন্ধান
ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণি, কৃপে প্রণমিয়া;
দিব্য শরজাল চলিল আকাশে,
উল্কাসম গতি, বিজলী বরণ,
তারা সম খসি পড়িল ধরায়,
ধীরে ধীরে ধীরে পরশি চরণ!
ক্ষিপ্রহস্তে পুন ধরিয়া কার্ম্মুক
দুর্য্যোধনে চাহি সন্ধানিলা শর,
কাটিয়া পাড়িলা কনক মুকুট,
পড়িল কুণ্ডল ধরার উপর;
উত্তরে চাহিয়া কহিলা অর্জ্জুন,
"চল রাজপুত্র বিরাট নগরে;
বৃথা প্রাণীবধে নাহি আর কাজ,
আজিকে বাসনা মিটেছে সমরে;—
আসিছে সে দিন—কৌরব শোণিতে
লোহিত হইবে সুবিশাল ধরা,
মুকুটের মত কাটি শত্রু শির
নামাইব মোরা যন্ত্রণার ভরা;
নগরের পানে চলহ কুমার,
কৌরব কখন আসিবে না পাছে,
সম্মুখে মৃগেন্দ্র হেরিয়ে কুরঙ্গ
সাধ করি কভু আসেনাক কাছে।"

শমী শাখে পুন লুকায়ে গাণ্ডীব,
সারথি সাজিল ফিরে বৃহন্নলা;
নগর দুয়ারে দেখিতে কুমারে
পুরবাসীগণ করিলেক মেলা;
একাকী কুমার জিনেছে কৌরবে—
নগরে উঠিল মহা গণ্ডগোল,
নারীগণ আসে দেখিতে কুমারে
বেজে উঠে বাদ্য করি ঘোর রোল;
উত্তরীয় বাস লয়ে বৃহন্নলা
কুমারী নিকটে যায় অন্তঃপুরে;
প্রবেশি দেখিল—চেয়ে পথ পানে
সৈরিন্ধ্রী দাঁড়ায়ে রয়েছে অদূরে।
কহিল সৈরিন্ধ্রী,—"কহ বৃহন্নলে,
অক্ষত সতত আছিলে ত রণে?
ধন্য রাজপুত্র! সুধন্য সারথি!
একা পরাজিল এত বীরগণে—

কোন মহারথী—" এমন সময়ে
সখীগণ সাথে আসিল উত্তরা ;
কহিল সর্ব্বলে, "ভাল বৃহন্নলে,
এত ক্ষণ পরে দিলে বুঝি ধরা!
সারথি হইয়া কিছু নাহি মনে,
ভুলে যেতে বুঝি হয় একেবারে !"
উতলা উত্তরা, "যাহা বলেছিলে
কি হইল তার বল তা আমারে।"
হাসি বৃহন্নলা বস্ত্র মধ্য হতে
উত্তরীর বাস করিল বাহির,
ব্যস্ত হয়ে হস্তে ধরিল উত্তরা,
হেরিল সকল বসন রুচির ;
জিজ্ঞাসে উত্তরা "শুভ্র বস্ত্র দ্বয়
কোন কোন বীর ধরিতেন অঙ্গে,
নীল বাসদ্বয় কাহারা পরিত,
রঞ্জিত কাহার বাস পীত রঙ্গে ?"
হাসি বৃহন্নলা করিলা উত্তর,
"কৃপ দ্রোণাচার্য্য শুভ্রবাসধারী,
দ্রৌণি দুর্য্যোধন ধরে নীল বাস,
কর্ণ মহাবীর পীত মনোহারী।"

"ভীষ্মের বসন রহিল কোথায় ?"
জিজ্ঞাসে উত্তরা অতি ব্যগ্র স্বরে ;
কহে বৃহন্নলা, "মহারথী তিনি
আছিলেন স্থির রাজপুত্র শরে ;
কুল-পিতামহ যশস্বী প্রাচীন,
তাই রাজপুত্র ক্ষমিলা তাঁহায়।"
সখী একজন জিজ্ঞাসে তখন,
"ছিলে কি সারথি রথের তলায় ?
ধরিবারে বর্ম্ম নাহি জান তুমি,*
যুদ্ধের নামেতে শুকাইত মুখ,
সম্মুখ সমরে রহিলে কেমনে,
শরজালে কিসে পেতে দিলে বুক ?"
কহে বৃহন্নলা, "সত্য কহি আমি
আগে ভাগে কিছু পেয়েছিনু ভয়,
রাজপুত্র মোরে দেখিয়ে কাতর
আশাসিল কিছু দানিয়া অভয়।"
হাসিল উত্তরা—"সখীগণ সবে
ত্বরা কোরে ওরে আয় চলে আয় !
মহাবীর বেশে সাজায়ে পুত্তলি,
দেখিগে সকলে কেমন দেখায় !"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

# প্রবাস পত্র।

## জ্যৈষ্ঠ মাসের পর।

বিবাহের বিষয়ে অনেক বলা হইয়াছে এখন আর কোন কথা পাড়া যাক্। সংসারের দুই দিক আছে এক উজ্জল হাস্যময়, অপর দুঃখশোকসমন্বিত অন্ধকার। একদিকে মহোল্লাস, অন্যদিকে হাহাকার। বিবাহের অভিনন্দন হইতে মৃত্যু শোকের ক্রন্দন হঠাৎ মনে উদয় হইল। আমাদের বিবাহ যেমন অনেক সময় পুতুলে পুতুলে

---

* ধনঞ্জয় পরিহাস মানসে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল।
মহাভারত।

বিবাহের ন্যায়—বিবাহের ভান মাত্র,তেমনি গুজরাটে একটা রীতি আছে তাহা শোকের ভান—পেশাদারী শোক প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রী ভাড়া করিয়া আনা হয়, তাহারা বুক চাপড়াইয়া মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। পথে ঘাটে এইরূপ শোকভানকারিণী বিলাসিনী দেখিতে পাইবে—দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের তালে তালে বক্ষাঘাত—অশ্রুহীন-বিলাপধ্বনি ও কৃত্রিম ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্রই সে ভ্রম দূর হয়। যেমন কৃত্রিম আমোদ তেমনি কৃত্রিম বিলাপ—সংসার কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ।

এ দেশের আচার ব্যবহার বর্ণন উপলক্ষে পান ভোজনের রীতি জানিতে তোমার কৌতূহল হইতে পারে। আহার বিষয়ে এখানকার ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতিদের মধ্যে মৎস্য মাংস পরিহার্য্য তবুও মাংসাশী জাতির সংখ্যা কম নয়। কোঙ্কণ ও কানাড়ার সমুদ্র তটবর্ত্তী ধীবর ও অন্যান্য নীচজাতীয় লোক মৎস্য-ভোজী। বাঙ্গালীদের মত মাছ ভাত তাহাদের উপজীবিকা। মহারাষ্ট্রী শূদ্রদের মধ্যেও আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। সেনবী নামক একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছে তাহারা আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়—তাহারা মৎস্যজীবি। কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি তাহাদের অনেকে নিরামিষ ভোজন ধরিয়াছে অথচ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য করে না। তাহাদের নাম ও আচার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে আসলে তাহারা গৌড় ব্রাহ্মণ—বঙ্গদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। গুজরাটবাসীগণ প্রায়ই নিরামিষাশী দেখা যায় তাহার কারণ সে দেশে জৈনদের বাস। যেখানে জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সেখানে জীবহিংসা নিষেধ, অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। গুজরাটে মুসলমানদের ভারি দুর্দ্দশা, কোন কোন গ্রামে হিন্দুদের দৌরাত্ম্যে কশাই টিকিতে পারে না, দায়ে ঠেকিয়া মুসলমান ভায়াদের মাংস ত্যাগ করিতে হয়, ইংরাজ বাহাদুরেরাও শীকার করিতে গিয়া এক এক সময়ে গ্রাম্য জনপদ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিপদগ্রস্ত হন। সামান্যতঃ বলিতে গেলে বোম্বাইবাসী রুটিখোর, বাঙ্গালীর মত ভাতজীবি নয়। কিন্তু এ নিয়মের অপবাদ আছে। কোঙ্কণ কানাড়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্য বশতঃ প্রচুর ধান জন্মে ভাতই সেখানকার লোকদের জীবনের অবলম্বন। তদ্ব্যতীত বাজরী, জওয়ারী গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে সেখানে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। গুজরাত ও সিন্দুদেশ বাজরী প্রধান দেশ—আমি এক্ষণে যে প্রদেশে বাস করিতেছি (সোলাপুর ও বীজাপুর) সেখানে জওয়ারীই শ্রমজীবি জনগণের আহার। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভাত সকলস্থানেই উপাদেয়, ধনী ও উচ্চ জাতীয় লোকদের ভাত ও বরণ (ডাল) ভিন্ন চলে না। অথচ এই সকল হিন্দুদের আহার প্রণালী ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। আমাদের যেমন তিক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'মধুরেণ

সমাপয়েৎ’ একটা খাবার নিয়ম, এখানে সেরূপ দেখা যায় না। মিষ্ট ঝাল কি লোন্তা যখন যাতে অভিরুচি,—তাহা গ্রহণের কোন নিয়ম নাই। মনে কর ক্ষীর লুচি হইতে আরম্ভ করিলে, পরে ঝাল তরকারী চাটনির সোপান হইতে ডাল ভাতে গিয়া পড়িলে, আবার হয়ত স্বাদ বদলাইবার জন্য মিষ্টান্নের পুনঃ প্রবেশ। মিষ্টে অরুচি হইলে টক ঝাল—ঝালে অরুচি হইলে আবার মিষ্ট; ঝালের মুখ মিষ্ট করিয়া আবার লোন্তায় আসিয়া উপস্থিত। কোন মহারাট্টা কিম্বা গুজরাতী-হিন্দুর বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে কখন্ কোনটা খাইতে হয়—কোথা হইতে আরম্ভ, কোথায় গিয়া শেষ কিছুই ভাবিয়া পাই না—মহা বিপদ! খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে তরকারী অনেক থাকে তাহা ঝাল প্রধান—মসলার মধ্যে হিঙ্গের গন্ধ আর সব ছাড়াইয়া উঠে—মিষ্টান্নে জাফরাণ। নানা রকম চাটনী—বিকট মসলার তরী তরকারী—আম্বলের জায়গায় ‘কড়ি’, সে এক প্রকার মসলাওয়ালা টক দধির ঝোল, আর ‘শ্রীখণ্ড’ যাহা মহারাট্টীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী মধ্যে গণ্য তাহা জাফরাণ ও মিষ্ট দধি দিয়া প্রস্তুত,—এতদ্ব্যতীত পূরণ পুরী—সাখর ভাত প্রভৃতি মিষ্টান্ন—এই সব এদেশীয় হিন্দুদের আহার। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল দেখিতে পাই এদেশের লোকেরা ছানা তৈয়ার করিতে জানে না, সুতরাং সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ছানার মিষ্ট নাই। কোন বাঙ্গালী ময়রা এ দেশে এই সকল জিনিসের দোকান খুলিলে বোধ করি অনেক লাভ করিতে পারে। আমার ত বিশ্বাস এই, বোম্বাই এ বিষয়ে বাঙ্গালার কাছ হইতে নূতন শিখিতে পারে। আহারের সময় এ দেশে পট্টবস্ত্র পরিবার নিয়ম আছে, সে বস্ত্রের নাম সোলা। বলা বাহুল্য যে সোলাধারী হিন্দুর পিঁড়ে আসন—কদলীপত্র বাসন ও প্রকৃতিদত্ত অঙ্গুলীই কাঁটা চামচ—এ সকল বিষয়ে আমাদের দেশ হইতে এখানে কিছুই প্রভেদ নাই।

আহার প্রণালীর উপর যাহা বলা হইল তাহা এ দেশীয় হিন্দু রীতি—পারসীদের সম্বন্ধে ও সব ঠিক খাটে না। অন্যান্য সামাজিক প্রথার ন্যায় আহার পদ্ধতিতেও তাহারা ইউরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করিতেছে। ভূ-আসন ও কদলীপত্রের পরিবর্ত্তে ক্রমে তাহারা মেজ চৌকী ও চীনের বাসন ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। মুসলমানের মত পারসীরাও মাংসপ্রিয় কিন্তু পারসীদের মাংস রান্না অপেক্ষাকৃত সাদাসিদে, ঘি মসলায় ছড়াছড়ি যায় না। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র আহার করে—স্বামীর আহার সমাপ্ত হইলে স্ত্রী কখন কখন তাহার পাতের প্রসাদ পায়। পারসী পরিবারেও স্বতন্ত্র আহারের নিয়ম, কিন্তু এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য পারসী তাহার মহিলাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করেন—ইহা উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। পরিবার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিবার নিয়ম অস্বাভাবিক ও নিন্দনীয়—তাহাদের মধ্যে যতই প্রণয় ও সদ্ভাবে মেলা মেশা হয় ততই ভাল।

আহারের পর পরিচ্ছদের বিষয় কিছু বলা যাইতে পারে। এদেশীয়দের আমাদের সঙ্গে যে যে বিষয়ে পরিচ্ছদের অমিল তাহা এই। প্রথম মেয়েদের কাপড়। মহারাষ্ট্রী স্ত্রীগণ কোনরূপ শিরোবেষ্টক ব্যবহার করে না—খোলা মাথায় বেনে খোঁপা, তার উপর ফুলের মালা ও স্বর্ণাভরণ। নাকে মুক্তা-গুচ্ছ নথ। মহারাট্টা মেয়েদের সাড়ী পরি-বার ধরণ একটু আলাদা, সাড়ী তার উপর আবার মাল-কোচা। সামনের দিকটা দেখিতে মন্দ দেখায় না কিন্তু পিছনে মাল-কোচার বাঁধন স্পষ্ট ধরা পড়ে। মেয়ে-দের উপর এ পুরুষবেশ আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, কিন্তু কাপড়ের দোষ গুণ অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর। এক কালে ছিল যখন মহারাট্টা বীরাঙ্গণাদের অশ্বারোহনে সৈন্য সহ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইত,তখনকার কালের পক্ষে মালকোচাই উপযুক্ত বেশ। এখানকার স্ত্রী লোকদের অঙ্গাবরণ আমার বেশ পসন্দ হয়—এদেশে তাহাকে 'চোলী' বলে আমরা তাহাকে কাঁচুলি বলি। কি মহারাট্টা কি গুজরাতী, মেয়েরা সবাই এই চোলী ধারণ করে। কারওয়ারে থাকিতে একজাতীয় পাহাড়ে মেয়ে দেখিয়াছিলাম তাহারা কড়ির মালা ধারণ করে। বিবাহের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসরে এক একটা মালা যোগ করিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের বয়স গণিবার বেস সুবিধা হয় কিন্তু অধিক বয়সে সেই মালার ভার দুঃসহ হইয়া পড়ে।

এখানে পুরুষদের মধ্যে শিরোমুণ্ডন ও শিখা ধারণ রীতি। সুতরাং কদর্য্য নেড়া মাথা ঢাকিবার জন্য উষ্ণীষ ধারণ প্রয়োজন হয়। এই প্রথাটিই এ দেশে আসিয়া লজ্ঘ-শির বাঙ্গালীর চক্ষে বিশেষ নূতন ঠেকে। বিদেশীগণ বাঙ্গালা ও ভারতের অন্য স্থানে এই পার্থক্য সহজে লক্ষ্য করিয়া থাকে। কেহ বলে খোলা মাথা অসভ্যতার লক্ষণ, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। তাহাদের টোগা ও মুক্তশির আমাদের বেশ হইতে বড় ভিন্ন নহে। বাঙ্গালীর খোলা মাথায় যেমন কৃত্রিম কোন শিরস্ত্রাণ নাই তেমনি প্রকৃতির শো-ভন আবরণ বিদ্যমান। এ দেশে শিরো-মুণ্ডনের রীতি সুতরাং পাগড়ী না পরিলে চলে না। বাহিরে পথে ঘাটে সমগ্র পাগড়ী-ওয়ালা মাথা। পাগড়ীর গঠন ও আকৃতি-অনুসারে জাতি ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসল-মানদের জরির বাঁধা মোগলাই পাগড়ী,—মহারাট্টাদের শ্বেত কিম্বা লোহিত বর্ণ রথ-চক্র,—গুজরাতীদের লালরঙ্গের গজমুণ্ড—পারসীদের ত্রিকোণ বিশিষ্ট লম্বাটুপী, সিন্দি-দের বিপর্য্যস্ত ইংরাজি হ্যাট।—এইরূপ লম্বা, গোল, কোণবিশিষ্ট নানা ধরণের পাগড়ী দেখা যায়। এই সকল চিত্র বিচিত্র শিরো-ভূষণ নগরবাসী পথিকদের মধ্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করে। কলিকাতায় ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আটপৌরে ভাব—বোম্বাই পোষাকী সহর।

পারসীরা একজাতীয় গুজরাতী বণিকের লম্বা পাগড়ী গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতকটা

তাহাদের জাতীয় টুপির অনুরূপ। পারসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে খোলা মাথায় অহরিমান (সয়তান) সহজে প্রবেশ লাভ করে। পারসী রমণীগণ সচরাচর সুশ্রী,সুরেখ ও গৌরবর্ণ। তাহারা গুজরাতী মেয়েদের ন্যায় রঙ্গীণ রেশমী সাড়ী ধারণ করে কিন্তু মাথায় একটা রুমাল বন্ধনে তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট। দেখিতে বিশ্রী কিন্তু রুমালের একগুণ এই যে মাথার সাড়ী চুলের তেলে ময়লা হয় না। মহারাষ্ট্রীদের মাথার রথচক্রের কথা বলিয়াছি তাহার বিস্তৃতির উপর মানমর্য্যাদা নির্ভর করে—যত বড় লোক তত বড় পাগড়ী। এই ভার মাথার উপর চাপাইয়া কেমন করিয়া যে তাহারা তাহাদের নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয় তাহা ভাবিয়া উঠা দুষ্কর। যাহাদের অভ্যাস নাই এই ভার মাথায় রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় সন্দেহ নাই। যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর—আমি বলি আমাদের খোলা মাথার নিয়ম অনেক গুণে ভাল। কিন্তু খোলামাথা ত আটপৌরে পোষাক, বাহিরে পরিবার বেশ কি? এর উত্তর দেওয়া সহজ নহে। * এখন যেমন দেখা যায় কেহ বলিতে পারে যে বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই, যাহার যেমন রুচি সে সেইরূপ কাপড় ব্যবহার করে। কোন প্রকাশ্য স্থানে যাও নানা ধরণের পাগড়ী ও পরিচ্ছদ দৃষ্টি গোচর হইবে। কিন্তু এবিষয়ে উপদেশ দেওয়া বৃথা, কালসহকারে আপনা-আপনি একটা সাম্যতা দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইবে যে সুগঠন অথচ লঘু 'বাবু' পাগড়ীর ফ্যাসন উঠিয়াছে অন্যান্য জাতিরা তাহার আদর্শ গ্রহণ করিতে তৎপর।

পারসীদের পরিচ্ছদ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখনো ইউরোপীয় ধরণে পরিবর্ত্ত হয় নাই। নীচের ভাগ যেমনই হউক পারসী-উষ্ণীষ দেখিলে তাহার বাহককে চিনিবার কোন গোল হয় না। তা ছাড়া পারসীর জাতীয় পরিচ্ছদ 'সদরা ও কুস্তি'। সদরা একটা মলমলের জামা ও 'কুস্তি' বাহাত্তর সূত্রের কটিবন্ধ, প্রত্যেক জরতোস্তবাদীর ইহা ধারণীয়। জন্দ্ অবস্তায় সদরা সুভদ্র মঙ্গল বসন রূপে ব্যাখ্যাত। কুস্তি তিন বেড়ে কটিদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চার গ্রন্থিতে আবদ্ধ। প্রত্যেক গ্রন্থি বাঁধিবার সময় এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, প্রথম মন্ত্র, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় জরতোস্ত ধর্ম্মই সত্য। তৃতীয় জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত, চতুর্থ সদাচারণ করিবে ও পাপ পরিহার করিবে। এই চারি মন্ত্র পাঠ করত সদরা ও কুস্তী পরিধান করিয়া পারসী জরতোস্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—:০:—

# মাংসাদ উদ্ভিদ।

## (প্রথম প্রস্তাব।)

বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে এমন খুব অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা এখন মাংসাদ উদ্ভিদ নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিবেন। বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই সেদিন আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি যখন উদ্ভিদে মাংস খায় ইহা একটি বিস্ময়কর কৌতূহলের বিষয় হইত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে মনে হয় উদ্ভিদ শাস্ত্রাধ্যায়ী হউন আর উদ্ভিদ শাস্ত্রানধ্যায়ী হউন কাহারো নিকট এ ঔদ্ভিদিক তত্ত্ব এক্ষণে অবিদিত নাই। তবে আমরা কি জন্য পুরাতন কথা লইয়া পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে যাইতেছি? মাংসাদ উদ্ভিদ শব্দটি পুরাতন হইতে পারে; কিন্তু বিষয়টি পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। আমরা সেই সাহসেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, মাংসাদ শব্দটি অতি সাধারণ ভাবেই উদ্ভিদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। মাংসাশী উদ্ভিদ অভিধেয় সকল উদ্ভিদই কিছু মাংসভোজী জীবের ন্যায় মাংস গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ খুব অল্প সংখ্যক উদ্ভিদই জীবজন্তুর ন্যায় পাক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারে। অনেকেই পচাশী। পোকা মাকড় আয়ত্ত করিতে পারিলে এক প্রকার তীব্র অম্লরস নিঃসরণ করিয়া উহাদিগকে মারিয়া পচাইয়া ফেলে। পরে সেই পচিত অর্থাৎ অমিশ্র মূল উপাদনে পরিণত জীবশরীরকে আপনাদের পুষ্টিসাধনের জন্য গ্রহণ করে। আর মাংসাদ বলিয়া আমাদের মতন, অথবা মাংসলোলুপ হিংস্র-জন্তুর ন্যায় মাংস ভোজন করে না। ছোট ছোট কীট পতঙ্গ-শরীরের ক্ষারদ অংশ ইহাদের ভোজ্য। গো মেষ ছাগ মাংস আহার করিবার জন্য ইহাদের লোল রসনা রসাল হয় না। এই জন্য স্বভাবতঃ সমুদয় মাংসাদ উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষে কীটাদ, পতঙ্গভোজী।

মাংসাদ উদ্ভিদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহা অতি অল্পকাল মনুষ্য জ্ঞানের সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমেরিকার উদ্ভিদ্‌বেত্তা কার্টিজ (Curtis) এবং কানবি (Canby) প্রথমে (১৮৩৪ খৃঃ অব্দে) উদ্ভিদদিগের এই জীব-সদৃশ ধর্ম্মের উল্লেখ করেন। ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পরে বিখ্যাত পণ্ডিত হুকার উদ্ভিদদিগের এই নবাবিষ্কৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিট্রিস এসোসিয়েসনে প্রথম আধিবেশনিক বক্তৃতা করেন, এবং হুকারের পূর্ব্বে পণ্ডিত গ্রে উল্লিখিত আমেরিকান উদ্ভিদবেত্তাদ্বয়ের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এতাবৎকাল মাংসাদ উদ্ভিদ একটি কৌতূহলাবহ-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যত্ন ও আগ্রহ সহকারে খুব অল্প লো-

কেই এসম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে প্রকৃতির শিশু অমর ডারউইন অবিশ্রাম পঞ্চদশ বর্ষকাল পতঙ্গভোজী কতকগুলি প্রধান প্রধান উদ্ভিদের সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, স্বীয় মত প্রকাশ পূর্ব্বক মাংসাদ উদ্ভিদ শ্রেণীকে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়াছেন।

আমাদের ভারতবর্ষ কোন মাংসাদ উদ্ভিদের জন্মভূমি নয়। * অন্ততঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তেমন কোন রাক্ষসী লতা গুল্ম ভারতের বাসিন্দা বলিয়া পরিচিত নাই। বিদেশ জাত মাংসাদ উদ্ভিদের সম-মেল উদ্ভিদ হিমালয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি মাংসাদ কি না, এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ কোন মাংসাদ উদ্ভিদের জন্মভূমি নহে বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ভারত-জাত অগণ্য উদ্ভিদ শ্রেণীর ধর্ম্ম অবগত হইয়াই এরূপ কথা বলিতেছি। ভারতীয় উদ্ভিদ রাজ্যের অধিকাংশই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনালোচিত রহিয়াছে। দু একজন বিদেশীয় পণ্ডিত ভারতজাত উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা, ভারতের অসংখ্য অপর্য্যাপ্ত লতা গুল্ম ঔষধি বনস্পতি, তৃণ শস্যের তুলনায় অতি সামান্য। অপরাপর সভ্যদেশের উদ্ভিদরাজি যাদৃশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচিত হইয়া লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত হইয়াছে, ভারতের উদ্ভিদমালা এ পর্য্যন্ত কি তাদৃশ ভাবে অধীত বা আলোচিত হইয়াছে? যেরূপ উৎসাহ অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব দেশের উদ্ভিদ শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন যতদিন ভারতবাসী সেইরূপ যত্নে ভারতের শ্যামল রত্ন ভাণ্ডার মন্থন না করিবেন, যতদিন না ভারতের ডারউইন ভারতের হুকার ভারতের মূলর আমাদের মধ্যে উত্থিত হইবেন, ততদিন ভারতীয় উদ্ভিদের অধিকাংশই চিরহিমানী মণ্ডিত হিমগিরি শিখরে, প্রচণ্ড তরঙ্গাহত বঙ্গোপসাগর কূলে এবং গর্ভে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের তড়াগে, দীর্ঘিকায়, পানাপুকুরে, শস্যক্ষেত্রে, প্রাচীন গৃহের ছাদে করণিসে ও দেয়ালের গায়ে লতা গুল্ম, তৃণ শৈবালরূপে

---

* এই প্রবন্ধটি লেখা হইয়া গেলে পর অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল হুগলীর কোন কোন স্থানে সূর্য্যশিশির (পাঠকেরা ইহার বিবরণ এই প্রবন্ধ মধ্যেই দেখিতে পাইবেন) নামক একপ্রকার মাংসাদ উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও আমরা স্বচক্ষে এখনো দেখি নাই; তথাপি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মেডিকেল কলেজের উদ্ভিদ-অধ্যাপক ডাক্তার কিং হুগলীর সন্নিহিত কোন কোন জলময় ভূমিতে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলেন। আমাদের পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ ইহা আর কোথাও দেখিয়া থাকেন কিম্বা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন জানেন তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আমাদিগকে অবগত করাইলে নিতান্ত উপকৃত ও বাধিত মনে করিব।

জন্মাইবে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্ম প্রকৃত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত থাকিবে। তাই বলিতেছিলাম ভারত মাংসাদ উদ্ভিদের জন্মভূমি নয় বলিলাম বলিয়া পাঠকেরা যেন আমাদের ভুল না বুঝেন। ইহা অসম্ভব নয়—অসম্ভব কেন—ইহা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব, ভারতীয় উদ্ভিদ ধর্ম্ম ভারতবাসী কর্ত্তৃক ভাল করিয়া আলোচিত হইলে অদূরে অনেক মাংসাদ উদ্ভিদের নাম শুনিতে পাইব। কিন্তু হায়! ভারতবাসী বা ভারতের সে গৌরবের দিন কি নিকট হইয়া আসিয়াছে!

উদ্ভিদবেত্তারা একপ্রকার কলস উদ্ভিদকে (Pitcher Plants) ভারতের বাসিন্দা বলেন। কিন্তু কৈ সেগুলি ভারতে তেমন সহজ প্রাপ্য বলিয়া ত বোধ হয় না। কোম্পানিবাগানে যে কয়েক প্রকারের কলস উদ্ভিদ আছে, সে সবগুলিই সিংগাপুর হইতে আনীত। এবং যদিও অনেক যত্নে সে গুলি Green House এ রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি তেমন সতেজভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে কচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে বাঙ্গালার জলহাওয়া কলস উদ্ভিদের পরিবর্দ্ধনের সহকারী ও অনুকূল নয়। আরো একপ্রকার ক্ষুদ্র জলজ মাংসাদ উদ্ভিদকে (ইহার বিষয় আমরা পরে বলিব) ভারতবাসী বলা হয়। কিন্তু ইহার বর্দ্ধন এত অল্প, সুতরাং এত দুষ্প্রাপ্য যে সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী কোন ভারতীয় উদ্ভিদবেত্তার চক্ষে কোনদিন পতিত হইবে কি না সন্দেহ। পরিচিত মাংসাদ উদ্ভিদের প্রায় অধিকাংশ গুলিই আমেরিকাবাসী। আমরা নিম্নে দু চারটি বিশেষ পরিচিত মাংসাদ উদ্ভিদের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। দুঃখের বিষয় বটানিকাল গার্ডেনে একটিও মাংসাদ উদ্ভিদ রাখা হয় নাই। দুর্লভগুলির কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু যাহাদিগকে অনায়াসে পাওয়া যায় এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তেমন দুটি একটির নমুনা রাখিলে দেখিবার অনেক সুবিধা হয়, কৌতূহলে পীড়িত দর্শকের অভিলাষ পূর্ণ হয়, উদ্ভিদাধ্যায়ীর নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়। জীবন্ত-গাছ দেখিলে তদ্বিষয়ে মনে যেমন একটা ধারণা হয়, তাহার অদ্ভুত ক্রিয়া চক্ষে দর্শন করিলে হৃদয়ে যেমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, পুস্তকে ছবি দেখিলে অথবা বিবরণ পাঠ করিলে কখনই সেরূপ হইবার নয়। তদ্ব্যতিরেকে, ছবি দেখিয়া কোন বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করা, আর প্রকৃত পদার্থ সম্মুখে রাখিয়া তাহা পাঠ করা এ দুয়ে অনেক তফাৎ।

মাংসভোজী উদ্ভিদেরা প্রায় সকলেই অনুর্ব্বরা জলাময় স্থানে উৎপন্ন হয়। অপরাপর বৃক্ষলতার সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে অনেকেই শিকড় বিহীন। অথবা যদি কাহারো থাকে, তাহা অপরিস্ফুট। ইহা বোধ হয় সকলের জানা আছে যে বৃক্ষলতা শিকড় বিস্তার করিয়া আপনাদিগকে কেবল সুদৃঢ় করে না, শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে জল ও যবক্ষার সংগ্রহ করে। মাংসাদ উদ্ভিদের তাদৃশ শিকড়ের অভাবই ক্ষার

সংগ্রহের জন্য ইহাদিগকে জীবন্ত পদার্থ সেবনে বাধ্য করিয়াছে! যা যৎসামান্য শিকড় মূলের সহিত সংলগ্ন দেখা যায়, তদ্দারা ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে জল শোষণ করে। এই জলই পত্র-তন্তু মধ্য দিয়া অথবা পর্ণ-গাত্রজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ সদৃশ শুয়া দ্বারা আবশ্যক কালে রসরূপে নিঃসৃত হয়। আমরা দেখিব এই জলীয় অংশই মাংসাদ উদ্ভিদের কীট পতঙ্গ বধ করিবার প্রধান অস্ত্র।

সূর্য্য-শিশির—Sundew (Drosera Rotundifolia) ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে জলাভূমিতে সচরাচর পাওয়া যায়। ইহার পত্র গুলি গোলাকার এবং ক্ষুদ্র। পাতার উপর চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আরক্ত কেশ থাকে। প্রত্যেক কেশের শিরোভাগে শীত, বা গ্রীষ্ম সকল কালেই অতি ক্ষুদ্র এক ফোঁটা শিশিরের ন্যায় পরিষ্কার জল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড আতপতাপেও উহা অদৃশ্য হয় না। এই জন্যই লোকে চলিতভাষায় ইহাকে সূর্য্যশিশির (Sundew) আখ্যা দিয়াছে। (ওয়েবেষ্টারে Sundewর ছবি আছে।) ডারউইন সূর্য্য-শিশিরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশগুলিকে উহাদের অনুভব-শক্তিবিশিষ্ট শুয়া (tentacles) বলেন। পিপীলিকা বা পিপীলিকা-সদৃশ অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবগুলির এইরূপ দুটি শুয়া থাকে। ইহাদ্বারা উহারা নিকটস্থ বস্তু-জ্ঞান লাভ করে। আমরা যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর কাঠিন্য বা কোমলতা, উষ্ণতা বা শৈত্য বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র জীবেরা শুয়া দ্বারা তদ্রূপ বস্তু-জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের সম্বন্ধে শুঁয়া আমাদের ত্বগেন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকারী। কেবল কোমলতা বা কাঠিন্য, উষ্ণতা বা শৈত্য-পরিচায়ক নয়। ত্বগেন্দ্রিয় ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সমুদায় বাহ্যজ্ঞান লাভ করি, অধিকাংশ নিকৃষ্ট জীব এক শুঁয়া দ্বারা মোটামুটি সেই সমুদয় জ্ঞানই লাভ করে। সূর্য্য-শিশিরের শুঁয়াগুলির বোধশক্তি এত তীক্ষ্ণ ও প্রবল যে, যদি ক্ষুদ্রতম মশকের ক্ষীণতম চরণ কোন একটি কেশের শীর্ষস্থ শিশির কণা স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ উক্ত কেশটি উহা অনুভব করিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে একগ্রেণের ৭৮৭০০ পরিমিত ভার—যাহা স্থূলকথায় বলিতে গেলে ভার নয় বলিলেই হয়—উক্ত চৈতন্যময় শুঁয়া কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ উহা স্বকার্য্য সাধনের জন্য কুঞ্চিত হয়। কিন্তু আবার দেখ কেমন অপূর্ব্ব নিয়ম। যদিও একদিকে এত সামান্যতম ভাবেই কুঞ্চিত হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত গুরুভার অর্পিত হইলে ইহারা বোধ শক্তিবিহীন-উদ্ভিদের ন্যায় অকুঞ্চিত থাকে। পাঠক তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ “কেন” ?

ক্রমশঃ

শ্রী শ্রীপতিচরণ রায়।

# হুগলির ইমামবাড়ি।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### একাকী।

দুই চারিদিন চলিয়া গেছে, মুন্না সেই ঘরের এক পাশে একটী বিছানায় দলিত হৃদয় লইয়া একগাছি ছিন্ন লতার মত পড়িয়া আছে। আবার সন্ধ্যা হইয়াছে, তেমনি মিটমিট করিয়া দীপ জ্বলিতেছে, মসীন চুপ করিয়া মুন্নার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাহার ম্লান, বিশুষ্ক, নিমীলিত-আঁখি মুমূর্ষু মুখ খানির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কি যেন কি একটা অব্যক্ত যাতনা ঘূর্ণ-বায়ুর মত প্রাণের মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সেই ঘূর্ণ-বায়ুর আবর্ত্তে পড়িয়া দিগ্‌বিদিক হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যাহা দেখিতেছেন যাহা ভাবিতেছেন কিছুই যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, সকলি তাঁহার নিকট একটা ঘোর ঘন অন্ধকার দৃশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি আর কিছু মনে করিতে পারিতেছেন না, কেবল মনে হইতেছে, কি যেন ছিল কি যেন নাই, কি যেন গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। থাকিয়া থাকিয়া সে ঘূর্ণ-তরঙ্গের রুদ্ধ-উচ্ছাসে তাঁহার প্রাণ যেন রোধ হইয়া আসিতেছে, বুক ফাটিয়া মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইয়া, স্তব্ধ গৃহটাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। মহম্মদের তখনি যেন চমক ভাঙ্গিতেছে, তিনি চমকিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, অস্পষ্ট ছায়া ছায়া আলোকে সেই শোকাকুল গৃহটা একটা শ্মশানপুরীর মত যেই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, আর অমনি যথার্থ অবস্থাটা তাঁহার যেন হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। সলে-উদ্দীনের নিষ্ঠুর জঘন্য ব্যবহার মনে করিয়া হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আবার রৌদ্রতাপে নীহারের ন্যায় সে ক্রোধ গভীরতম দুঃখে মাত্র পরিণত হইতেছে, চোখে জল পূরিয়া উঠিতেছে, তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবার মুন্নার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন, চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছেন—"সেদিন কোথায় গেল? যেদিন মুন্না সেই ছোট মেয়েটি—সুখের ছবিটি, বসন্তের বাতাস ছড়াইয়া, উষার আলোক সঙ্গে লইয়া, এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত; আপনি হাসিয়া পিতার মুখে হাসি ফুটাইত, মহম্মদের গলা ধরিয়া একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গল্প শুনিত গান শুনিত—সে দিন কোথায় গেল? স্নেহ প্রেম, সুখ শান্তির নির্ম্মল প্রাণের ভিতর যে দিন সূর্য্য উঠিয়া অস্তে যাইত, ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িত, পাখীরা গান গাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, সে দিন কোথায় গেল?

এমন কত জ্যোৎস্নার দিন গিয়াছে

তাঁহারা তিনজনে একত্রে বাগানে চাঁদের আলোকে বসিয়া গল্প করিতে করিতে রজনী-গন্ধা গুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দূরে নৈশগগনে বাঁশীর তান উথলিয়া উঠিয়াছে, মুন্না কথা কহিতে কহিতে তাঁহাদের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহার জ্যোৎস্না-চুম্বিত সেই ঘুমন্ত হাসিটি একটী স্বপ্নদৃশ্যের মত কতদিন ধরিয়া মসীনের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন কত দিন গিয়াছে ভাই বোনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রভাতের গোলাপ গাছে একবৃন্তে যখন দুইটি ফুল ফুটিতে দেখিয়াছেন, সন্ধ্যার আকাশে এক সঙ্গে যখন দুইটি তারা উঠিতে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইয়াছে, উহারা তাঁহাদের মত দুটি ভাই বোন—ঐ ফুল দুটির মত ঐ তারা দুটির মত তাঁহারা হাসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন—হাসিয়া ঝরিয়া পড়িবেন, কেন তাহা হইল না কেন ?”

কে জানে কেন তাহা হয় না কেন ? সুখের প্রভাত যখন আস্তে যায়, চাঁদনি রজনী যখন পোহাইয়া যায় তখন তাহারা হাস্যময়ী ফুলগুলিকে, জ্যোতির্ম্ময়ী তারাগুলিকে কে জানে কেন কাঁদাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায় ? যখন মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা করিলেও বুকফাটিয়া মরিয়া গেলেও সে ফুলের মুখে আর হাসি ফুটিবে না, সে তারার হৃদয়ে আর জ্যোতি উছলিবে না তখন সেই হাসি থাকিতে থাকিতে জ্যোতি চমকিতে চমকিতে কে জানে কেন তাহারা মরিয়া যায় না কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ স্নেহভরে মুন্নার মাথায় মহম্মদ হাত রাখিলেন,—মুন্না ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া এতক্ষণ তাহাকে তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে কথা ভুলিয়া গেলেন। হস্তস্পর্শে মুন্না চমকিয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, কত যেন নিরাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“তুমি মসীন” তাহার পর আবার বালিসে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। যেন মুন্না আর কাহাকেও দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল—তাহাকে দেখিতে পাইল না।

মসীন তাহা বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তর প্রদেশে যে আশাকণা লুকাইয়া ছিল প্রচণ্ড বাতাসে তাহা যেন নিভিয়া গেল। তিনি দেখিলেন তাহার সম্মুখে বিষাদের অনন্ত রাত্রি, সমস্ত জীবনেও তাহার আর প্রভাতের আশা নাই। তিনি বুঝিলেন তাঁহার স্নেহ-বারি সমুদ্রের আকার হইলেও মুন্নার জ্বলন্ত হৃদয় শীতল করিতে পারিবে না, তাঁহার প্রাণ দিলেও তাহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিবেন না—কষ্টের বিদ্যুৎশিখা তাঁহার হৃদয় দিয়া চলিয়া গেল।

এ কষ্টে অভিমান লুকান ছিল কি না জানিনা, যদি থাকে ত তাহা এত সামান্য যে তিনি তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে মুন্নার সুখশান্তি ফিরাইতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ—ইহা ছাড়া আর কোন কথা তাঁহার মনে নাই।

মানুষে যাহা পায় তাহা কেন চায় না ? যাহা চায় তাহা কেন পায় না ? সংসারের এ রহস্য কে বুঝাইবে ? মসীন যে মুন্নার

চোখের জল মুছাইতে জীবন দিতে পারেন—কিন্তু সে স্নেহের অসীমতায় মুন্নায় হৃদয় পূরিল না! আর যে হৃদয়ে মুন্নার জন্য স্নেহের বিন্দুমাত্র নাই—সেই হৃদয়ের এক বিন্দু স্নেহ পাইবার জন্য মুন্না হৃদয় পাতিয়া আছে!

রজনী নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতে লাগিল, বাঁশ বনে শৃগাল গুলা উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল, খাঁ জাহা খাঁর নহবৎ খানায় মুলতান রাগ বাজিয়া বাজিয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিলাইয়া গেল, মসীন অনন্য হৃদয়ে মুন্নার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি করিলে আবার সে আগের দিন ফিরিয়া আসে, মুন্নার ম্লানমুখে আবার হর্ষের হাসি ফুটিয়া উঠে"।

রজনী গভীর হইল, জানালাদিয়া যে তারাগুলি দেখা যাইতেছেল তাহারা সরিয়া পড়িল, গঙ্গার পরপারে বনানীর মধ্যে একটা কোকিল ঘুমঘোরে একবার কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মহম্মদ একই মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি করিলে মুন্না সুখী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কি ভাবিয়া একবার অতি ধীরে ধীরে ডাকিলেন "মুন্না", মহম্মদের সে আকুলকণ্ঠ স্নেহের-স্বর বুঝি বিষাদের স্তর ভেদ করিয়া মুন্নার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, মুন্না মুখ উঠাইয়া সচকিত-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল তাহার বিবর্ণ ম্লান মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে একটা অনুতাপের ভাব তাহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল, ভাবিল "ছি ছি কি করিয়াছি একবার-ও মুখের দিকে ফিরিয়া চাহি নাই, মসীনের কষ্টের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম" মুন্না বিছানায় উঠিয়া বসিল—মহম্মদ কি বলিতে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন আর বলা হইল না। মুন্না মহম্মদের দুই হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া আকুল-স্বরে বলিল

"মসীন, ভাই আমার, আমার জন্য তুমি আর কতকষ্ট পাইবে? আমাকে ছাড়িয়া দাও—কোথায় চলিয়া যাই—আমি কাছে থাকিতে তোমার নিস্তার নাই—জানিনা কি অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছি, আমার স্পর্শে হাসিও অশ্রু হইয়া পড়ে।"

মহম্মদ চোখ মুছিয়া বলিলেন—"আমার কিসের কষ্ট মুন্না? আমিত সারাদিনই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি—তবে তোর কষ্টের মুখখানি দেখিলে যদি কখনো চোখে জল আসে, তাহাকে কি তুই কষ্ট বলিবি।"

কষ্ট কি না তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

মুন্না বলিল—"আমার জন্য কেন তোমার চোখে জল পড়িবে? আমি তোমার জন্য এমন কি করিয়াছি, যে তুমি আমার জন্য কাঁদিবে ভাই? আমি প্রাণ ঢালিয়া যাহাকে ভাল বাসিয়াছি—সে যে আমার দুঃখে এক ফোঁটা জল ফেলে নাই—সে যে আমার পানে একবার না চাহিয়া চলিয়া গেল। আমিত আর কিছুই চাহি নাই—একবার দিনান্তে তাহার মুখখানি দেখিয়া আসিতাম আমার সে সুখটুকও কি তাহার প্রাণে সহিল না গো"—

মুন্না কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মসীন উত্তেজিত

স্বরে, "পাষাণ পাষাণ" বলিয়া উঠিয়া দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। মুন্না একটু পরে চুপ করিল, চোখের জল মুছিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, "না ভাই পাষাণ বলিও না, তিনি কি করিবেন? আমার এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে তাঁহার ভালবাসা জন্মাইতে পারে। দোষ তাঁহার নহে, দোষ আমার। আমি যে দুর্লভ দ্রব্যের প্রত্যাশী হইয়া কাঁদিয়া বেড়াই, সে দোষ আর কাকারো নহে আমারই—"

মুন্নার কথাগুলিতে তাহার সরল হৃদয়ের এত খানি অকপট দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাইল যে মহম্মদ সে বিশ্বাসের বিপক্ষে কিছু বলিতে পারিলেন না,—তিনি বলিলেন—"দোষ কাহারো নহে—দোষ বিধাতার। এরূপ পবিত্র কোমল হৃদয়ে কষ্ট দিয়া তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তিনিই জানেন।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। মসীন বলিলেন "মুন্না, আমি পিতাকে আনিতে যাইব" এই কথাই তিনি প্রথমে বলিতে গিয়াছিলেন। মুন্না মহম্মদের মনের ভাব বুঝিতে পারিল, তাহার দুই চক্ষু আর একবার জলে পূরিয়া উঠিল—এমন স্নেহের, এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের মর্য্যাদা মুন্না অনুভব করিতে পারিল না! এ ভালবাসায় মুন্না সুখী হইতে পারিল না! মুন্না কাতর হইয়া বলিল "ভাই পিতা কোথায়? তাঁহাকে কোথায় পাইবে? আমাদের কি আর কেহ আছে মসীন" ইহার ভিতর কতখানি নিরাশা কতদূর শূন্য ভাব? কিন্তু কেজানে কি করিয়া এই নিরাশার কথাগুলির ভিতর মহম্মদ যেন লুক্কায়িত আশার স্বর শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মনে হইল পিতাকে ফিরাইতে পারিলে মুন্নার যেন সুখশান্তি ফিরাইতে পারিবেন, মহম্মদের হৃদয় যেন সতেজ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "মুন্না পিতা যেখানেই থাকুন আমি তাহাকে লইয়া আসিব।"

মুন্না ইহা হইতে আর কি চায়? ইহা হইতে আর কোন আশা আর সে করে না—পিতার অনন্ত স্নেহের কোলে একবার আশ্রয় পাইলে দুঃখজ্বালা ভুলিয়া কতদিন কতদিন পরে—শান্তির ঘুমে একবার ঘুমাইতে পারে; কিন্তু পিতা আসিবেন কি? আর আসিলেও—আবার এই সংসারের মোহপঙ্কে পা দিয়া তাঁহার যদি শান্তিভঙ্গ হয়? আর মহম্মদ—তাহার স্নেহময় করুণাময় ভ্রাতা—তাহার জন্য কত না সহিয়াছেন,—আবার তাঁহাকে নিজের সুখ অন্বেষণে—পথে বিপথে—দূর দূরান্তরে কষ্ট ভোগ করিতে পাঠাইবে"—মুন্না—মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল" না ভাই আমি তোমাকে যাইতে দিতে পারিব না। আমার জন্য তুমি কত না কষ্ট করিয়াছ—কিন্তু আবার—"

মহম্মদ কথা শেষ করিতে দিলেন না—বলিলেন "মুন্না তাহা হইলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে, আমাকে বাধা দিস নে—আমার সুখের আশা ভাঙ্গিস-নে মুন্না" মসীন স্থির প্রতিজ্ঞ উৎসাহ-পূর্ণ, মসীন মুন্নার হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ জ্বলিতে দেখিয়াছেন, সে

আলো পথ দেখাইয়া তাঁহাকে কোথায় না লইয়া যাইতে পারে। মুন্না তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখে আহ্লাদের চিহ্ন দেখিতে পাইল, আশার বিকাশ দেখিতে পাইল, সে আশা তাহার কাছে মরীচিকা বলিয়া মনে হইল পিতা যে আবার ফিরিয়া আসিবেন—এই আঁধার গৃহ কোন দিন যে একটুও আলো হইবে—তাহা সে কোন মতেই মনে করিতে পারিল না—অথচ মহম্মদের সে আশার ঘোর ভাঙ্গাইতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। কি করিবে কি বলিবে যেন সে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

মুন্নার কাছে থাকিতে মহম্মদের সুখের আশা নাই তাহা ত মুন্না জানে, এ শ্মশানাগ্নির কাছে যে পড়িবে সেই যে শুকাইয়া যাইবে, এ অগ্নি আদর করিয়া যে ধরিবে সেই যে পুড়িয়া যাইবে ইহা ত মুন্না অনেক দিন বুঝিয়াছে, তবে কেন মহম্মদকে এই খানে ধরিয়া রাখিতে চাহে! দূর দুরান্তরে বনে গহনে যেখানেই মহম্মদ যাননা কেন সে কষ্ট কি এ কষ্টের তুলনায় সামান্য নহে? যেদিন এই অগ্নিময় মরুভূমি ছাড়াইয়া মহম্মদ প্রকৃতির শীতল শ্যামল সৌন্দর্য্য রাজ্যে পদার্পণ করিবেন সেদিন মহম্মদের নবীন হৃদয় প্রভাতের পাখীর মত যে গাহিয়া উঠিবে, নির্ম্মল আনন্দে তাহার হৃদয় যে স্ফূর্ত্তিময় হইয়া উঠিবে—তবে কেন মুন্না তাহাকে যাইতে বাধা দিবে? মুন্না যেন মহম্মদের সেই হাসিময়, স্ফূর্ত্তিময় আনন্দময়-মুখ-ছবি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মুন্নার দুঃখের প্রাণেও সুখের বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিল, মুন্নার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল, মুন্না মনে মনে বলিল "তবে তাহাই হউক—" চোখের জলের অব্যক্ত-ভাষায় মহম্মদকে কহিল "তবে তাহাই হউক"। রজনী আরো গভীর হইল আশাপূর্ণ হৃদয়ে মহম্মদ চলিয়া গেলেন, মুন্না একাকী সেই নির্জ্জন ঘরে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ প্রকৃতিকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল 'তবে তাহাই হউক', কর-যোড়ে উদ্ধদৃষ্টি হইয়া সজলনেত্রে বার বার করিয়া কহিল "তবে তাহাই হউক—ভগবান, একবার মাত্র এ দুঃখিনীর প্রার্থনা সফল কর,—তাহার নবীন প্রাণে আবার হাসি ফুটিয়া উঠুক।"

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### খাঁজাহা খাঁ।

লোকের নাম অনেক রকমে অমর হইয়া থাকে, আকবর সাহের নামও অমর, আর সিরাজউদ্দৌলার নামও অমর, ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও ভারতবাসী ভুলে নাই, আর লর্ড রিপণকেও ভুলিবে না,—আর আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন হুগলি সহরে পাশাপাশি যে দুইটি লোক বিচরণ করিয়াছিলেন—একটি লোক আড়ম্বর বিহীন ফকীরচেতা মহম্মদ মসীন, আর একটি লোক রাজক্ষমতাশালী নবাব খাঁ জাহা খাঁ, ইহাদের দুজনের নামই এখন পর্য্যন্ত হুগলীর লোকের মনে জাগিয়া আছে। তবে এ মনে থাকার মধ্যে তফাৎ এইটুকু, একজনের স্মৃতি যেন বসন্তের সুরভি-কুসুম, তাহার কথা মনে করিলেই হৃদয়ে একটি

সুখের ছবি জাগিয়া উঠে, আর একজন যেন সে ফুলের পাশে একটি কাঁটা।

কেবল হুগলি বলিয়া নহে, বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখনো নবাবের নামের উল্লেখ শুনা যায়—বুড়বুড়ীদের নিকট খাঁ জাহা খাঁর নামটাত অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা তুলনাবিশেষ, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা এই তুলনাজ্ঞানটাকে রীতিমত খাটাইতে ছাড়েন না। যদি কোন ছেলে এসেন্সটুকু মাখিয়া সাফ্ ফুরফুরে ধুতী চাদর যোড়াটি পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—অমনি বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুরমারা বলিয়া উঠিলেন—"এস এস আমাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ এস" কেহ যদি বুকফুলাইয়া একটা কথা কহিল, জোরে দুবার মাটীতে পা ফেলিল অমনি বুড়হাড়া লোকেরা বলিয়া উঠিলেন—"বেটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ"। বিলাসিতা, ক্ষমতা, অত্যাচারের সহিত নবাব জাহা খাঁর নামটি এখনো মিশ্রিত। নবাব অনেকদিন পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন একটা বিকৃত-ক্ষীণ ছায়া এখনো এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কবে সে ছায়া একেবারে মিলাইয়া পড়িবে কেজানে!

খাঁ জাহা খাঁ নবাবী আমলের একজন ফৌজদার ছিলেন। ইনি একজন জমীদার। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান রাজনীতির কড়াক্কড় শাসন প্রণালীর মধ্যেও মফঃস্বলের জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের যেরূপ প্রভাব যেরূপ যথেচ্ছাচার দেখা যায়—তাহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে—নবাবের তথন কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তখন সবেমাত্র ইংরাজেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন—সকল স্থানে এখনো শাসনের রীতিমত নূতন বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ মুসলমান আমলে যাহা কিছু শাসন-শৃঙ্খলা ছিল—এই নূতন আক্রমণে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্থানে স্থানে একটা বিষম অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে—এসময় খাজা খাঁ হুগলির সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর ভয়ে যেন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকের এভয়ের উৎপত্তি তাঁহা হইতে ততটা নহে, যতটা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ হইতে, তাঁহার শাসনে ততটা নহে, যতটা অশাসনে। অন্য কি কথা, নবাবের উপরও তাহারা একরূপ নবাব ছিল। নবাব যদি কাহাকেও দুই টাকা দান করিতে হুকুম দিতেন তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ তাহাকে এক টাকা দিত—আর একটাকা—নিঃস্বার্থতার আতিশয্যে নিজেদের পকেট-জাত করিত। তাহারা ভাবিত ইহাতেই নবাবের অধিকতর পুন্য সঞ্চয় হইবে। তবে অন্যেদের প্রতি যে দান তাহারা প্রশস্ত ভাবিত—তাহা দিতে কখনো কুণ্ঠিত হইত না। নবাব যদি কাহাকে একজুতা মারিতে হুকুম দিতেন—ত তাহারা তাহাকে দশ জুতা অবিলম্বে বিনা চিন্তায় দান করিয়া ফেলিত। এইরূপে নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া—আপনাদের অকল্যানের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া যেন তেন প্রকারে তাহারা নবাবের স্বর্গরাজ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। ইহাদের হাতে বেচারা গরীব লোকদের কিরূপ সহ্য করিতে হ-

ইত তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে প্রকাশ পাইবে।

এখন হুগলির যেখানে দেওয়ানি আদালত, মহাফেজখানা—ও ব্রাঞ্চ স্কুল তখন ঐখানে খাঁজাহা খাঁর সদর অন্দর প্রকাণ্ড দুইটি বাটী। বাটীর সম্মুখেই উদ্যান, উদ্যানের সীমানায় রাস্তার ধারে সমুখা সমুখি দুইটি দোতলা নহবৎ খানা। এক দল প্রহরী বাটীর দ্বারে, আর একদল প্রহরী এই নহবৎখানার সম্মুখে বসিয়া পাহারায় নিযুক্ত। প্রহরীদের জ্বালায় এই রাস্তাদিয়া গরীব দুঃখীরা পারতপক্ষে কেহ যাতায়াত করিতেচাহে না, কেবল যাহাদের সঙ্গে তাহাদের মাসিক বন্দ'বস্ত আছে তাহারাই মাত্র নির্ভয়ে সেথান দিয়া যাইতে পারে।

আজ নহবৎখানার নীচেতলার ঘরের মধ্যে এক গরীব বেচারা চুড়িওয়ালা আসিয়া বসিয়া আছে, তাহার আশে পাশে সমুখে পিছনে পিঁপড়ার সারির মত প্রহরীরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুড়িওয়ালার যেমন গ্রহ সে ঐ রাস্তাদিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল,—সে বুঝি শহরে নূতন বসতি করিতে আসিয়াছে—এখানকার ব্যাপার অত শত এখনো জানিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিয়াই—পূর্ব্ব রাত্রের চুড়ির ফরমাসের কথা প্রধান প্রহরীর আগে মনে পড়িয়া গিয়াছে—তাহার পর ক্রমে মিরু, মিয়া, আলি, বাকের, সাকের প্রভৃতি যত রাজ্যের প্রহরীদের জন্মান্তরের স্মৃতি পর্য্যন্ত মনে উদিত হইয়াছে; কোন দিন কাহার কোন ভাগিনির মেয়ে একযোড়া চুড়ির জন্য সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, কোন দিন কাহার প্রেয়সী তাহার ভাইঝি জামাইএর মামাত বোনের জন্য জরিবসান চুড়ি না পাইয়া সারাদিন মান করিয়া বসিয়াছিলেন—কোন দিন বা কাহার পুত্রবধূর ঠাকুরমার হাতভরা কাঁসার চুড়ি ছিল না বলিয়া গৃহিণী লজ্জায় নিমন্ত্রণে যাইতে পারেন নাই—সকলি মনে পড়িয়া গিয়া চুড়িটা তখন সকলের জীবনের পক্ষে এতটা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে—যে যেন জল না খাইয়া এক মাস থাকা যায়—কিন্তু চুড়ি না হইলে আর একদিন চলে না। এই প্রয়োজনীয় জিনিসটা বিহনে এতদিন যে কি করিয়া তাহারা বাঁচিয়াছিল তাই ভাবিয়াই তাহারা অবাক হইয়া গেছে—বোধ করি, বাঁচিয়া আছে কি না, সে বিষয়েও কাহারো কাহারো দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

সে যাই হৌক চুড়িওয়ালাকে ডাকিয়া ঘরে বসান হইলে প্রধান প্রহরী একযোড়া বেলোয়ারি চুড়ি উঠাইয়া লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে বলিতেছে—"চার আনা, মশায়, বড় শস্তা, আপনার সঙ্গে আর দরদাম করিব না, এক রকম অমনিই দিয়া যাইতেছি," চুড়িওয়ালাও ইতি মধ্যে বাতাসে প্রাসাদ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সে ভাবিতেছে এতগুলা লোক চুড়ি লইলে সেত একদিনে সদ্য সদ্য বড়মানুষ হইয়া যাইবে, কেবল একালে প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা একটা করিয়া পাওয়া যায় না, এই বড় তাহার কষ্ট হইতেছে।

হঠাৎ তাহার বাতাসের বাড়ীটা নিমেষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রহরী মির-আলি পাশেই একগাছা মোটা লাঠির উপর দুই হাতের ভর দিয়া বাঘের মত দৃষ্টিতে তাহার উপর চাহিয়াছিল—কামড়ের যেন একবার অবসরটা পাইলেই হয়। মিথ্যার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড ঘৃণা, নবাব বাটীর সীমানার বাহিরের লোকে কথা কহিলেই তাহা মিথ্যা বলিয়া তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠেন, কেন না তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা বিশেষতঃ মির-আলি নিজে কখনও খাঁটি সত্য বই কিছু কহিতে জানেন না। তবে লোকে বলে বটে, মির আলিকে কেহ এ পর্য্যন্ত ভুলিয়া কোন সত্য কথা কহিতে শোনে নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, জগৎশুদ্ধ লোক যে মিথ্যাবাদী। (মির আলি ছাড়া) ইহাতে ত বরং আরো তাহাই প্রমাণ করে।

চুড়িওয়ালার কথায় তিনি চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—বদমাস্ মিথ্যাবাদী জানিসনে দুপয়সায় ঠিক হামি এয়স্যা চুড়ি আবি মুলিয়ে এনেছি।"

হঠাৎ আবার এই সঙ্গে প্রহরী মিরুমিয়ার পরোপকার প্রবৃত্তিটাও তেজাল হইয়া উঠিল, এ প্রবৃত্তিটা প্রহরীর কোন জন্মে প্রবল ছিল কি না বলিতে পারি না, এজন্মে কিন্তু তাহার অঙ্কুরেও আভাস পাওয়া যায় নাই। তবে সময়ের গুণে সবই করে, যা নয় তাই হইয়া উঠে, যে আজন্ম কাল কখনো ভাবের ধার ধারে নাই বসন্তকালে কোকিল ডাকিয়া উঠিলে তার হাত দিয়াও হঠাৎ দুলাইন কবিতা বাহির হইয়া পড়ে, প্রহরীবেচারারই বা তবে অপরাধ কি? সেও নিঃস্বার্থ চিন্তায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল "এম্নি করে আদমি লোকদের ঠকাতা তু বাঁদিকা বাচ্ছা, কুত্তা, তেরা জান আজ হামার হাতে।"

এতক্ষণ প্রধান প্রহরী চুপ করিয়াছিলেন —কিন্তু আর পারিলেন না, ইঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিটা আবার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। প্রহরীদের মধ্যে গাজি অর্থাৎ ধার্ম্মিক বলিয়া ইঁহার একটা নামই ছিল, ইনি আপনাকে ইমাম হোসেনের বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন, দিনের বেলা চার বার নেমাজ পড়িতেন ও কাফের দেখিলেই রক্তপান করিবার জন্য লালায়িত হইতেন। প্রধান প্রহরী কেবল চুড়িওয়ালাকে গালি দিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার মোটামোটা লৌহ গাঁটওয়ালা আঙ্গুলগুলা একত্র করিয়া বিষম জোরে তাহাকে এক চড় বসাইয়া দিয়া কহিল "হামলোকদের ঠকানে এসেছিস তু কুত্তা, বিল্লি, বান্দর, গাধ্বা।" চুড়িওয়ালার পা হইতে মাথাশুদ্ধ ঝনঝন করিয়া উঠিল, সে সামলাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল "ধর্ম্মাবতার, দোহাই বলছি দু আনা আমার খরচা পড়েছে" চুড়িওয়ালাকে মারিয়া আপনার বীরত্বে স্ফীত হইয়া প্রধান প্রহরী মহা দম্ভে বড় বড় দুই জোড়া গোঁপে তা দিতেছিলেন, চুড়িওয়ালার কথায় বলিলেন "ফের ঐ বাত উল্লুক।"

চুড়িওয়ালা সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে ভাবিল এতগুলা লোক রহিয়াছে

কেহ কি তাহাকে একটু দয়া করিবে না? কিন্তু একটা করুণ-দৃষ্টির পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে বড় বড় লাল পাগড়িওয়ালা—রাক্ষসের মত কঠোর মায়া দয়া হীন মুখ গুলার মাঝখান হইতে লাল লাল ঘূর্ণমাণ চোখের রাশি যখন তাহার চোখের উপর পড়িল সে আঁতকিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল সে যমপুরীর ভিতর অবস্থান করিতেছে। দুপয়সা চুলোয় যাক, বিনা-পয়সায় চুড়ি দিয়া প্রাণটা লইয়া তখন সে পলাইতে পারিলে মাত্র বাঁচে। সে দামের জন্য পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া—'হুজুর যা বলেন' বলিয়া চুপড়ি মাথায় লইয়া উঠিতে উদ্যত হইল। একজন প্রহরী তার হাত হইতে ঝুড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল "বেআদপ, এয়স্যা কাম তোমার, আলবৎ আজ তোর শির লেগা" "চুড়িওয়ালা কাঁদিয়া বলিল" কিছুই ত করিনি, বাবা, আমায় ছেড়ে দাও বাবা, হুজুর, ধর্ম্মাবতার, যোড় হাতে বলছি ছোড়দাও বাবা।" প্রহরী মুখ ভেংচাইয়া বলিল "বাবা, বাবা, তোর বাবা কোন হ্যায় রে ইল্লৎ,ফের ও বাৎ বলবি ত মুখ তোড় ডাল্‌ব। সেলাম না করে উঠেছিস, সেটা ইয়াদ আছে, কি নেই?" তখন বাকের আলি বলিল "হাঁ এয়স্যা বেআদপী। সেলাম নেই করেছে? চল নবাবশাকা পাশ।"

চুড়িওয়ালা নবাব শাকে কোন জন্মে দেখে নাই, তিনি মানুষ কি জন্তু বিশেষ মানুষ পাইলেই উদরসাৎ করেন, ইতি পূর্ব্বে তাহার সে জ্ঞান কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন তাঁহাকে তাহা হইতেও ভয়ানক মনে হইল। ভৃত্যদিগকে দেখিয়া যেরূপ নমুনা পাইয়াছে তাহাতে প্রভুকে রক্ত-পিপাসু লোলজিহ্ব নরমুণ্ডধারী দৃষ্টি মাত্রে শত মনুষ্য ভস্মকারী ভীষণমূর্ত্তি দেব তার মত মনে হইতে লাগিল। চুড়িওয়ালার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সে বলিল "দোহাই তোমাদের, আমার যাহা আছে সব সেলামী দিয়া যাইতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।" চুড়িওয়ালা ভাবিল সেলাম আর সেলামী একই কথা ইহার জন্যই এতটা উৎপাৎ চলিতেছে।—এ অনুমানটা একেবারে বেঠিক হয় নাই, অল্পক্ষণের মধ্যে প্রহরীরা চুড়িগুলি প্রায় সমস্তই আজাড় করিয়া ঝুড়িটা পা দিয়া চুড়িওয়ালার দিকে ঠেলিয়া বলিল "তোর চিজ কোন লেবে, এই লিয়ে যা।"

ঝুড়ি লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া তখন চুড়িওয়ালা হাঁপ ছাড়িল,—চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া তখন আস্তে আস্তে একটী গাছের তলায় বসিয়া, ঝুড়ির ঢাকাটি খুলিল, যখন দেখিল—তাহার যথাসম্পত্তি সর্ব্বস্বই প্রায় অপহৃত হইয়াছে—সে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ঐখান দিয়া মহম্মদ মসীন কোথায় যাইতেছিলেন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল শুনিয়া তখনি তাহাকে সেই চুড়ির মূল্য দিলেম—এবং অনেক বলিয়া কহিয়া নবাবের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে সম্মত করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। নবাবের কাছে দরখাস্ত পাঠান হইল, কিন্তু বিচারে প্রহরীদের দোষ কিছুই প্রমাণ হইল

না। বিচারের পর দ্বিগুণ বুক ফুলাইয়া তাহারা নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিল।

এইরূপ বিচারের নামে কত অবিচার, ক্ষমতার পদতলে কত অক্ষম প্রতিদিন দলিত হইতেছে, জানিনা কবে পৃথিবী ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যেদিকে চাই চারিদিকেই প্রজ্জলিত মরুময়ী নিরাশা,—অনন্তের সীমানা পারে আশা লুকাইয়া পড়িয়াছে,—এক একবার যাহাকে আশা মনে করিতেছি—তাহা মরীচিকা মাত্র।

বিচারের দিন রাত্রে চুড়িওয়ালার খড়ের বাড়ীটি পুড়িয়া ভস্ম হইল—সে পরদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহম্মদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মহম্মদের উপর তার যত রাগ, তিনিই ত দরখাস্ত করিয়া তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন,সেত কোন মতে তাহাতে রাজি ছিল না, সেত জানিয়াছিল তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে।

মহম্মদ তাহাকে নূতন ঘর বাঁধিবার টাকা দিলেন—সে অন্য গ্রামে উঠিয়া গেল! মহম্মদ ভাবিলেন এই অত্যাচারের কথাটা একবার নিজে খাঁজাহাকে বলিবেন।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

১

এক "আমি" মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়াছে দেথ। "আমি"-কে যেমনি লোপ করিয়া ফেলিবে অমনি প্রকৃতির পূর্ব্ব পশ্চিমে, অতীত ভবিষ্যতে, অন্তর বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে। "আমি" আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি। মনে করিতেছি আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ, জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু "আমার পিঠ" ও "আমার পেট" এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। "আমি"কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে। যেখানে যত বিবাদ, যত অনৈক্য, যত বিশৃঙ্খলা, "আমি"টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।

২

উদরের ভিতরকার একটা অংশই যে কেবল পাকযন্ত্র তাহা নহে, আমাদের মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সমস্তই আমাদের পাক যন্ত্র। ইহারা সমস্ত জগৎকে আমাদের উপযোগী করিয়া বানাইয়া লয়। আমাদের যাহা যতটুকু যেরূপ আকারে আবশ্যক, ইহাদের সাহায্যে আমরা কেবল তাহাই দেখি, তাহাই শুনি, তাহাই পাই, তাহাই ভাবি। অসীম জগৎ আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় বিরাজ করিতেছে!

আমাদের যে জগৎদৃশ্য, জগৎজ্ঞান, তাহা, আমাদের ভুক্ত জগত, পরিপাকপ্রাপ্ত জগতের বিকার, তাহা আমাদের উপযোগী রক্ত মাত্র, আমাদের ইন্দ্রিয় মনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় মনের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহা প্রকৃত জগৎ নয়, অসীম জগৎ নহে।

৩

আমরা সকলে বাতায়নের পাশে বসিয়া আছি। আমরা বাতায়নের ভিতর হইতে দেখি, বাতায়নের বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই না। এই জন্য নানা লোক নানা রকম দেখে। কেহ এ পাশ দেখে কেহ ও পাশ দেখে, কাহারো দক্ষিণে জানলা কাহারো উত্তরে জানলা। এই আশপাশ দেখিয়া, খানিকটা ভুল দেখিয়া, খানিকটা না দেখিয়া যত আমাদের ভালবাসা ঘৃণা, যত আমাদের তর্ক বিতর্ক। একেকটি মানুষ একেকটি খড়খড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি, কেহবা হাসিতেছি কেহবা নিশ্বাস ফেলিতেছি। জানলার ভিতরকার ঐ মুখগুলি কেহ যদি আঁকিতে পারিত! পৃথিবীর রাস্তার দুই ধারে ঐ সকল অন্তঃপুরবাসী মুখের কতই ভাব, কতই ভঙ্গী! সবাই ছবির মত বসিয়া কতই ছবি দেখিতেছে!

৪

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর!" কারণ অনেক সত্য কথা কে বলিতে পারে! স্থূল কারাগারের ফুটাফাটা দিয়া সত্যের দুই একটা রশ্মিরেখা শুভলগ্নে দৈবাৎ দেখিতে পাই। একটুখানি সত্যের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থাকিয়া যায়। সংশয় নিশীথের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশ্বাসকে তারার মত দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনে করে সত্যকে ফলাও করিয়া তুলিতে হইবে—তাহাকে বৃহৎ করিয়া একটা বিস্তৃত তন্ত্রের মত শাস্ত্রের মত গড়িয়া তুলিতে হইবে—প্রলোভনে এবং দায়ে পড়িয়া সে ব্যক্তি একটি সত্যের সহিত অনেক মিথ্যা মিশাল দেয়। সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়। সত্য হীরার মত একটুখানি পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাই তাই ভাল। কত মূল্যবান সত্যের কণিকা সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছে।

৫

ব্যাপ্ত হইলে যাহা অন্ধকার, সংহত হইলে তাহা আলোক, আরো সংহত হইলে তাহা অগ্নি। বৃহত্বই জড়ত্ব। সংক্ষেপ সংহতিই প্রাণ। সংহত হইলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি, জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলিয়া বৃহত্বের উপাসনা করিয়া থাকি। বৃহত্ত্বে অভিভূত হইয়া যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য্য। আরম্ভ বৃহৎ পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্ত্তের মুখ অতি বৃহৎ আবর্ত্তের শেষ একটি বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে যাইতেছে কি না কে জানে! কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সর্ব্ব

হইয়া কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জ্জন করিতে যাই-তেছে কি না কে জানে!

৬

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হইতে হয়। আয়তন লইয়া আমাদিগকে কে-বল যুদ্ধ করিতে হয়। কাহার সঙ্গে? দানব-কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে—আয়তন আমার; আমার জিনিষ আমাকে ফিরাইয়া দাও। অবিশ্রাম লড়াই করিয়া অবশেষে কাড়িয়া লয়। শ্মশান-ক্ষেত্রে তাহার ডিক্রিজারি হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন মহা আয়তনে মিশিয়া যায়।

৭

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতিব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করিব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনা-পতি আছে সে দৃঢ়বিশ্বাসে যুদ্ধ করিতেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরিতেছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অনেক মরিয়া তবে বাঁচি-বার উপায় বাহির হইবে। আমরা সং-হতিকে অধিকার করিয়া ব্যাপ্তিকে জি-তিব—মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

৮

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আ-মাদের হৃদয় মন বাঁষ্পের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ—আ-মরাও তেমনি স্বভাবতই চারিদিকে বি-ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি—অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আক-র্ষণ শক্তি না থাকিলে আমার হইয়া আমরা পর হইয়া যাই। আমাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হইবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছাড়ি-য়াছেন। সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই তাঁহাদের লড়াই। তাঁহারা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করিবেন। সঙ্কীর্ণতার বলে বিকী-র্ণতা লাভ করিবেন।

৯

সংহত দীপশিখা তাহার আলোকে স-মস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কাঠে, উপকরণে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তখন গৃহই তাহাকে বধ করিয়া রাখে, সে জাগিতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হইব ততটা অধিকার করিব এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঠিক। অ-র্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হইবে তুমি ততই অধি-কৃত হইবে। কিন্তু চারিদিক হইতে আপ-নাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন বহ্নিশিখার মত স্বতন্ত্র দীপ্তি পাইবে, তখন তোমার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারি-দিক উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে পারিবে এইরূপ কাহারও কাহারও মত।

১০

য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম—ব্যাপ্তি, অ-র্থাৎ বিজ্ঞান শাস্ত্র—ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চরম—সংহতি, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। য়ুরো-পীয়েরা প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চান ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃতিকে জয় করিতে চান। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সং-হত করিতে পারিলে বিরাট প্রকৃতিকে জয় করা যায়। এই কি যোগশাস্ত্র?

১১

আমার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন—অতীতকাল অমরাবতী। আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝি যে, অতীতে যাহারা বাস করে তাহারা অমর। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত, অতীতকালে সেই মুহূর্ত্তরাশি সংহত হইয়া যায়। বর্ত্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। বর্ত্তমান বিচ্ছিন্ন, অতীত সমগ্র। যাহাকে প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যুই দেখিতে পাই, যাহাকে অতীতে দেখি তাহার অমরতা দেখিতে পাই।

১২

আরম্ভের মধ্যে পূর্ণতার ছবি ও সমাধানেই অসম্পূর্ণতা—মানুষের সকল কাজেই প্রায় বিধাতার এই অভিশাপ। যখন গড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রতিমা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, যখন শেষ করিয়া ফেলি তখন দেখি তাহা ভাঙ্গিয়া গেছে। সুদূর গৃহাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন গৃহের প্রতি এত টান যে, গৃহ যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে গৃহ আর মনে পড়ে না। যাহাকে আশা করি তাহাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হইলে তাহাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ, চাহিলে যতখানি পাই, পাইলে ততখানি পাই না। যখন মুকুল ছিল তখন ছিল ভাল, ফলের আশা তাহার মধ্যে ছিল, যখন মাটিতে পড়িয়াছে তখন দেখি মাটি হইয়াছে ফল ধরে নাই। এই জন্য আরম্ভ দিনের স্মৃতি আমাদের নিকট এত মনোহর, এই জন্য সমাপ্তির দিনে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকি, নিঃশ্বাস ফেলি। জন্ম-দিনে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি প্রতিদিন বাজে না। অশ্রুনেত্রে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে। বাঁশি গানকে বধ করিতেছে। হাতের দ্বারা হাতের কাজ আঘাত পাইতেছে।

১৩

আসল কথা, শেষ মানুষের হাতে নাই। "শেষ হইল" বলিয়া যে আমরা দুঃখ করি তাহার অর্থ এই—"শেষ হয় নাই তবুও শেষ হইল! আকাঙ্খা রহিয়াছে অথচ চেষ্টার অবসান হইল।" এই জন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সম্পূর্ণতার অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১৪

জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না—যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোট বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে-কাজ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে আপনাকে ছোট করিয়া লইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এত বড় মনে করে। মনুষ্যের পদমর্য্যাদা সে যদি যথার্থ বুঝিত, তাহা হইলে তাহার এত অহঙ্কার থাকিত না।

১৫

আমি কি জানিতাম, অবশেষে আমি খেলেনাওয়ালা হইব? প্রতিদিন একটা

করিয়া কাঁচের পুঁতুল গড়িয়া সাধারণের খেলার জন্য যোগাইব! আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ—আমারই জীবনের একেকটি দিন! দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন ত কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য্য আকারে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে আমার সমস্ত দিনটি হাতে করিয়া লইয়া তাহাকে কেবল একটি পুঁতুল করিয়া তুলিতেছি—আমি কি জানি না আমার যতগুলি পুঁতুল ভাঙ্গিতেছে আমিই ভাঙ্গিয়া যাইতেছি! অবশেষে যখন একে একে সবগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল তখন কি আমার সমস্ত জীবন বিফল হইয়া গেল না! এই চীনের পুঁতুলগুলি লইয়া আজ সকলে হাসিতেছে খেলিতেছে কাল যখন এগুলিকে অকাতরে পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিবে তখন কি সেই হৃতগৌরব ভগ্ন কাচখণ্ডের সঙ্গে আমার সমস্ত মানব জন্মের বিসর্জ্জন হইবে না! "আমি নিস্ফল হইলাম" বলিয়া যে দুঃখ সে অপরিতৃপ্ত অহঙ্কারের দুঃখ নহে। ইহা, নিজের হাতে নিজের এক মাত্র আশা একমাত্র আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণাধিকের বিনাশের জন্য শোক!

১৬

কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়। তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্ম্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্র মাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি—আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্ব্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙ্গিয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙ্গিলাম। আমি নিস্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না!

১৭

সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত্যু না হয় ত বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে, সে আগেকার মত তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে এক দিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখীর বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখীর গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।

# আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### আয়ুর্ব্বেদ প্রচারক দেবগণের বিবরণ।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং পুরাণাদির মতে দেবতাগণই আয়ুর্ব্বেদের আদি প্রচারক। এই জঘন্য যুগে দেবতত্ত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করা, বিড়ম্বনা মাত্র। আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং পুরাণাদিতে, অনুসন্ধান করিয়া এসম্পর্কে যাহা জানিতে পারিয়াছি; তাহাই কেবল এ অধ্যায়ে সংগৃহীত হইবে।—

### মহাদেব।

মহর্ষি কণাদের মতে, সর্ব্বপ্রথমে কেবল মহাদেবই আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্রাদি ইহা শিক্ষা করেন। (১)

বৈদিক সময় হইতেই মহাদেব বা রুদ্র "বৈদ্যশ্রেষ্ঠ" "বৈদ্যনাথ" প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অসংখ্য তৈল ঘৃত মোদক অবলেহ চূর্ণ তান্ত্রিক আয়ুর্ব্বেদ সম্মত পারদ ও অধিক সংখ্যক পারদ সংযুক্ত বটিকা প্রভৃতি মহাদেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বা নির্ম্মিত। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেই অসংখ্য ঔষধ তৈল প্রভৃতির তালিকা প্রদত্ত হইল না।

তান্ত্রিক ও অবধৌতিক আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধেও মহাদেবই আদিগুরু। শৈব সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অবধূত বলে। গহননাথ বা গহনানন্দ প্রভৃতি অবধূত প্রবরগণ বহুবিধ তৈল ঔষধ ও বটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের কলেবর নানা মৃতসঞ্জীবন-অমৃততুল্য ঔষধে পূর্ণ করিয়াছেন। গহননাথ নিজেকে মহাদেব-শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (২)

### বিষ্ণু।

বিষ্ণু স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদীয় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন বা আয়ুর্ব্বেদ প্রচার উদ্দেশ্যে কোন যত্ন করিয়াছিলেন কি না, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন সংহিতা ও পুরাণাদির মতে তিনি তিনবার ধন্বন্তরিরূপ পরিগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির নির্ম্মাতাদিগের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় স্বয়ং বিষ্ণুও জগতের হিতার্থে অনেক তৈল ঘৃত মোদক অবলেহ চূর্ণ আসব ও বটিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু নারায়ণ হিমসাগর অষ্টাদশ প্রসা-

---

(১) প্রমাণ ১ম অধ্যায়ে দেওয়া গিয়াছে। (অষ্টম ভাগ ভারতী—মাঘমাস)

(২) যথাস্থানে প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

রণি প্রভৃতি তৈল, কদল্যাদি ও অশোক প্রভৃতি ঘৃত, নারায়ণ চূর্ণ জীরকাদি মোদক, রস পর্প্পটী বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্র রস প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধাদি "বিষ্ণুণা পরিকীর্ত্তিতম" নারায়ণেন নির্ম্মিতং ইত্যাদি বাক্যে পরিচিত।

## ব্রহ্মা।

অথর্ব্ববেদ সর্ব্বস্ব-আয়ুর্ব্বেদকে ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোকময়ী করিয়া সরল ভাষায় নিজ নামে (ব্রহ্মসংহিতা নামে) এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। অনন্তর তিনি কার্য্যদক্ষ ও অগাধ-বুদ্ধি-সাগর দক্ষপ্রজাপতিকে সেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করেন। ঃ—

বিধাতাথর্ব্ব সর্ব্বস্ব মায়ুর্ব্বেদ প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং লক্ষশ্লোকময়ী মৃজুং॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকল কর্ম্মসু।
বিধি-র্ধীনীরধিং সাঙ্গ মায়ুর্ব্বেদ মুপাদিশৎ॥
(ভাবপ্রকাশ)

মহর্ষি কণাদের মতে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

প্রচলিত সংগ্রহ গ্রন্থাদিতে "চতুর্ম্মুখ রস" বিড়ঙ্গাদি লৌহ, বিজয়ানন্দ রস, সূতিকান্ত্র রস, বিজয় ভৈরব রস ও নীলকণ্ঠ রস প্রভৃতি ঔষধ "ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতঃ" ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা, "বিধিনির্ম্মিতং" প্রভৃতি পরিচয়ে বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সংহিতাদিতে ব্রহ্মনির্ম্মিত অনেক ঔষধাদি দৃষ্ট হয়।

## দক্ষ প্রজাপতি।

দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া স্বর্গবৈদ্য, সুবিদ্বান্, সুর প্রধান, সূর্য্যপুত্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করেন।

অথঃ দক্ষ ক্রিয়া দক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।
বেদয়া-মাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংসৌ সুরসত্তমৌ।

## সূর্য্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া, উহা সূর্য্যকে প্রদান করেন। সূর্য্য আবার নিজ নামে "ভাস্কর সংহিতা" প্রণয়ন করিয়া ধন্বন্তরি প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে উহার শিক্ষা দান করেন। ভাস্কর সংহিতা অবলম্বন করিয়া ষোলজন শিষ্য ষোল খানা তন্ত্র প্রণয়ন করেন। "সূর্য্য-প্রণীত" বা "সূর্য্যোপদিষ্ট" এই পরিচয়ে কোন আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা যে পূর্ব্বে এ-দেশে প্রচলিত ছিল প্রাচীন মধুমতীপ্রণেতা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। মধু-মতীর প্রারম্ভেই লিখিত আছে "অথঃ সর্ব্ব-রোগ নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ; ইতি হস্মাহ ভগবান্ কাশ্যপেয়ঃ।" কোন কোন টীকা-কারও কাশ্যপেয় অর্থাৎ সূর্য্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

## অশ্বিনী কুমারদ্বয়।

মৎস্য পুরাণের একাদশ অধ্যায়ে অ-শ্বিনী কুমারদ্বয়ের অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত আছেঃ—

বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের অন্য-তমা স্ত্রী ছিলেন। সংজ্ঞার গর্ভে প্রথমতঃ মনু; অতঃপর যম ও যমুনা—যমজ পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয়

দেহ হইতে ঠিক নিজের ন্যায় রূপগুণ সম্পন্না ছায়াকে নির্ব্বাণ করিয়া সূর্য্যের নিকট পাঠাইয়া দেন। এদিকে সংজ্ঞা সূর্য্য তেজ-ভয়ে অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পলাইয়া থাকেন। সূর্য্য ছায়াকেই সংজ্ঞা বিবেচনা করেন। এই সময়ে ছায়ার গর্ভে মানুষরূপী সাবর্ণ মনু, শণি, তপতী এবং বৃষ্টির জন্ম হয়। বহুদিন পরে সূর্য্য সংজ্ঞার চক্রান্ত টের পাইলেন। তখন সূর্য্যের সম্মতিক্রমে, বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্রে আরোপণ করিয়া তদীয় সমস্ত তেজ পৃথক্ করিয়া লয়েন। এই তেজ দিয়া বিষ্ণুর চক্র শিবের ত্রিশূল প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। সূর্য্য, তেজশূন্য হইয়া, অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অশ্বিনীরূপী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বরূপধারী সূর্য্যকে পরপুরুষ বিবেচনা করিয়া, তৎকর্ত্তৃক যে রেতঃ মুখ-দেশে পতিত হইয়াছিল তাহা সংজ্ঞা নাশা-যুগল দ্বারা ফেলিয়া দেন। এই নাসিকা নিঃ-সৃত দ্রব্য হইতে সঞ্জাত হয়েন বলিয়া ইঁহা-দের নাম নাসত্য ও অশ্বরূপ হইতে সমুৎ-পন্ন হয়েন বলিয়া অশ্বিনী-কুমার; তথাহিঃ—

ততঃ স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোক মমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্ত্তো মুখ এব দিবাকরঃ।
অশ্বরূপেন মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ।
সংজ্ঞাচ মনসা ক্ষোভ মগমত্ভয়-বিহ্বলা
নাসা পুটাভ্যা মুৎসৃষ্টং পরোঽয়মিতি শঙ্কয়া
তস্য রেত স্ততো জাতা বশ্বিণ্যা বিতিতৎ
শ্রুতম্
অশ্বরূপত্ব সংজ্ঞাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ।

অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের চিকিৎসা-পারদ-র্শিতা ও উচ্চপদ সম্বন্ধে চরক সংহিতায় যাহা লিখিত আছে তাহার অনুবাদ এই;

দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয় যজ্ঞভাগী হইয়া ছিলেন। (দক্ষ যজ্ঞসময়ে রুদ্র কোপে) দক্ষের মস্তক ছিন্ন হইলে তাঁহারা উহা সংযোজিত করেন। সূর্য্যের দন্ত রোগ, ভগ নামা আদিত্যের নষ্ট চক্ষু, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ রোগ এবং চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা, অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয়। চন্দ্র সৌম্যভাব হইতে বিচ্যুত হইলে তাহা-দের কর্ত্তৃক আরোগ্য লাভ করিয়া সুখী হয়েন। বৃদ্ধচ্যবণ অত্যন্ত কামুক হওয়াতে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; তিনি অশ্বিনী কুমার কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া পুনরায় বলবীর্য্য বর্ণ স্বরাদি লাভ করেন। এই প্রকার অন্যান্য বহু অসাধারণ কার্য্যে এই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদ্বয় ইন্দ্রাদি মহাত্মাদেরও পূজিত হয়েন। দ্বিজাতি কর্ত্তৃক ইহাদের জন্য গ্রহ,স্তোত্র,মন্ত্র, ঘৃত,ধূম, পশু প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সহিত ইন্দ্র নন্দন-কাননে প্রাতঃ-কালে সোমরস পান করেন। আশ্বিনদ্বয়ের সহিত ভগবান্ বিষ্ণু একত্রে যজ্ঞে আমোদ করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন—এই সমস্ত কারণেই দ্বিজগণ বেদবাক্যে ইন্দ্র অগ্নি ও অ-শ্বিনী কুমারদ্বয়কে যেরূপ স্তব করিয়া থাকেন তেমন অন্য দেবতাগণ প্রায়ই স্তুত হন না। এবং এই জন্যই সমস্ত অমর অজর দেবগণ ও ধ্রুবগণ· ইন্দ্রাদির সহিত সংযত চিত্তে চিকিৎসক অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে পূজা করেন।

ভাবমিশ্রও চকরসংহিতার এই মতগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, অশ্বিনীসুতদ্বয় দক্ষের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক-মণ্ডলীর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিজেরাও প্রশংসার যোগ্য একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভৈরবের ক্রোধে ব্রহ্মার মস্তক ছিন্ন হইলে অশ্বিনী কুমারদ্বয় তাহা সংযোজিত করিয়া দেন, এই জন্যই ইঁহারা যজ্ঞভাগী হইয়াছেন। তথাহি—
দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকল চিকিৎসক লোক প্রতিপত্তি বিবৃদ্ধয়ে
ধন্যাম্॥
স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেন রুষা যতঃ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ যাতৌ যজ্ঞ
ভাগিনৌ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে অশ্বিনী কুমারদ্বয় "চিকিৎসাসার তন্ত্র" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, একদা মহারাজ শর্য্যাতি, মানস সরোবর তীরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং চারি হাজার সৈন্য লইয়া বিহারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে, ভৃগুনন্দন চ্যবণ বহুকাল এক স্থানে বসিয়া তপস্যা করাতে লতা বেষ্টিত ওপিপীলিকাদি সমাকীর্ণ হইয়া বল্মীক সমাবৃত মৃতপিণ্ডের ন্যায় ছিলেন। তাহার চক্ষু দুইটিকে খদ্যোত বিবেচনা করিয়া সুকন্যা নাম্নী রাজতনয়া তাহাতে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিলেন। মহর্ষি চ্যবণ ব্যথিত হইয়া শর্য্যাতির সৈন্যগণের আনাহ রোগ জন্মাইয়া দিলেন। মলমূত্র রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণ বড় পীড়িত হইয়া পড়িল। রাজা কারণ অনুসন্ধান করিয়া মহর্ষি চ্যবণের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চ্যবণ বলিলেন, তোমার কন্যা মোহান্ধ হইয়া আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না। রাজা কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সুকন্যাকে চ্যবণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সুকন্যা সেই বনে মুনির নিকট রহিলেন। সুকন্যার দেবকন্যার ন্যায় অলৌকিক রূপে বিমোহিত হইয়া একদা অশ্বিনী কুমারদ্বয় তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, সুন্দরি! তুমি এরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়া কেন এই জরাজীর্ণ, পতিকে পরিচর্য্যা করিতেছ? আমাদের এক জনকে পতিত্বে বরণ কর। সতী সুকন্যা কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় বলিলেন, আমরা দেববৈদ্য-প্রধান; যদি আমাদের এক জনকে পতিত্বে বরণ কর তবে তোমার পতিকে যুবা ও রূপসম্পন্ন করিয়া দিব। সুকন্যা এই কথা চ্যবণকে জানাইলেন। চ্যবণ অমনি স্বীকৃত হইলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আদেশ অনুসারে চ্যবণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় জলে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে তাহারা তিন জনেই দিব্যরূপসম্পন্ন কমণ্ডলুধারী, যুবা, মনঃপ্রীতি-বর্দ্ধক ও তুল্যরূপ হইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। পরে সমবেত হইয়া, তিন জনেই সুকন্যাকে বলিলেন; আমাদের যাহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ কর, সুকন্যা নিজপতি চ্যবণকেই বরণ করিলেন। চ্যবণ যৌবন ও দেবোপম রূপ

প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন আমি তোমাদিগকে ইন্দ্রের সমক্ষে সোমপায়ী করিব।

জামাতার যৌবনবার্ত্তা শুনিয়া রাজা শর্য্যাতি চ্যবণকে দেখিতে আসিলেন। অনন্তর শর্য্যাতি চ্যবণের অনুরোধে চ্যবণকে দিয়াই একটি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই যজ্ঞে চ্যবণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানের অযোগ্য মর্ত্ত্য বিচরণকারী ঘৃণিত চিকিৎসক প্রভৃতি নানা প্রকার অপমানসূচক কথায় নিন্দা করিতে লাগিলেন।

চ্যবণ ইন্দ্রকে অনাদর করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্যই যথাবিধি উত্তম সোম গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যবণকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; অমনি চ্যবণ ইন্দ্রের বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিলেন এবং মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অনলে আহুতি প্রদান করিয়া মদ নামে এক মহাবীর্য্য বৃহৎকায় অসুর উৎপন্ন করিলেন। তাহার একটী হনু পৃথিবীতে ও অপরটী আকাশে সংলগ্ন রহিয়াছে। চারিটী দন্ত শত যোজন বিস্তৃত।

* * * *

নেত্রদ্বয় চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই মহাসুর চপলা সদৃশ চঞ্চল রসনাদ্বারা লেহন, ভীষণনেত্রে দৃষ্টিপাত এবং মুখ ব্যাদান করত যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভীষণ অসুর গভীর গর্জ্জনে লোকত্রয় নিনাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। তখন স্তম্ভিত বাহু ইন্দ্র মদাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া ঋষিকে বলিলেন। হে ভৃগুনন্দন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্; আমি সত্য বলিতেছি; আজ হইতে অশ্বিনীকুমারেরা সোম গ্রহণে অধিকারী হইবেন; আপনার সংকল্প কখনও মিথ্যা হইবে না, আপনি অদ্য তপোবল দ্বারা যেরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিলেন, সেইরূপ আপনার অসাধারণ ক্ষমতা ও শর্য্যাতির কীর্ত্তি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে।—

(বনপর্ব্ব ১২২শ—১২৫শ অধ্যায়)

ক্রমশঃ।

শ্রী যাদবানন্দ গুপ্ত।

---

# নক্‌সা।

(নিমন্ত্রণবাড়ী, এক কক্ষে দুইজন যুবতী উপবিষ্টা)

প্রথমা। "এমনো কালামুখী!"

দ্বিতীয়া। "মাইরি, ছিছি।"

প্র। "ছিছি না ছিছি—লাজ লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে!"

(আর এক জন যুবতীর প্রবেশ)

যুবতী। "কি হয়েছে, মেজবৌ, কার কথা বলছিস ?"

প্র। "কামিনী যে, এতক্ষণে কি আসতে হয় ? বোনঝির গায়ে হলুদ, সব করবি কর্ম্মাবি—না একেবারে বেলা ফুরিয়ে এলি যে।"

যুবতী। "কি করব ভাই—হয়ে উঠলোনা। তা কার কথা বলছিস—বলনা ?"

দ্বি। "এই বোসেদের শশীর বৌয়ের কথা হচ্ছে।"

যু। "কেন তার কি হয়েছে কি ?"

প্র। "হবে আর কি, যতদূর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে, গাউন প'রে এসেছে। মাগো! আমরা ত সাত জন্মে পারিনে। দেখে অবধি গা কেমন কস্ কস্ করছে।" (ঘাড় বাঁকাইয়া ঘৃণা প্রকাশ।)

দ্বি। "আর বল্লে কি হবে, কলি যুগ দেখছি উল্টে গেল।"

যু। "সত্যি নাকি ? বাঙ্গালির মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে ?"

প্র। "এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা,—পরণের সাড়ি খানা পর্য্যন্ত কেমন ঘেরা-ঘোরা,—মাগো ঘেন্নাই করে।"

যু। "এই যে তবে বল্লি গাউন"—

প্র। "গাউন না সে গাউনের বাবা; নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এসেছ—নীলাম্বরী পর—পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, আমার যেন দেখে অবধি লজ্জায় মরে যেতে হচ্ছে।"

যু। "তা ভাই জামা জোড়া পরেছে—তাতে আর এমনি কি দোষ।"

দ্বি। "আমিও ত তাই বলি—সেটা আর এমনি কি লজ্জার কথা।"

প্র। "তবে যা না—তোরাও বিবি সাজগে,—কুল উজ্জ্বল হয়ে যাক। আহা কি রূপখানাই খুলেছে—কি মানানটাই মানিয়েছে, মরে যাই আর কি ?"

যু। "তা আমরা যেন বিবি নাই সাজলুম, তাই ব'লে তাকে কি ভাল দেখাতে নেই ?"

প্র। "ভাল দেখানর কপালে আগুন—আহা কি বা রূপেরই শ্রী।"

দ্বি। "কেন ভাই আর যাইহোক—রূপটা তার মন্দকি, আর সেজেছেই বা কি মন্দ ?"

প্র। (মহা রাগিয়া) "কালামুখী, ধিক জীবনী, পোড়াকপাল তার রূপে, পোড়া-কপাল তার সাজায় ?"

যু। "কেন ভাই জামা জোড়া পরলেত-এক রকম বেশ মানায়। এই তুমি যদি পর ত তোমাকে বড় সরেস দেখতে হয়।"

প্র। (দেয়ালের আয়নায় একবার মুখ দেখিয়া, একটু হাসিয়া) "তা ভাই উনিও ঐ কথা বলছিলেন, যে আমাকে একদিন বিবি সাজিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা বলে রং সাফ না হলেত মানায় না।"

যু। "তা বই কি ? তোমাকেই যেন মানাল—দেশ শুদ্ধ তাই বলে জ্যাকেট প-রাটা কি সাজে।"

প্র। "কামিনি, তুই এতদিন আসিসনি

কেন, তোর জন্য ভাই আমার বড় মন কেমন করে। চল ভাই ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখতে পাবি।

(প্রবেশ করিয়া)—

প্র।"বলি ও শশীর বৌ—কতদিন এমন হোল।"

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) "কি হোল ঠাকুর ঝি!"

প্র। "এই এমন মেম সাজলি কবে? আমরা যে তোকে বড় ভাল লাজুক মেয়ে বলে জানতুম। তোর মনে এই ছিল!"

বৌ। "কি করব ভাই—তিনি এই রকম করে কাপড় না পরলে ছাড়েন না।"

প্র। "তা আরো কত হবে, এর পরে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে আর ঘোমটা পর্য্যন্ত থাকবে না।"

বৌ। "তা ভাই আমার শ্বাশুড়ী আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না—বলেন আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ের মত আমার কাছে বস, কথা কও।"

(সকলের অবাক হইয়া দৃষ্টি)—

প্র। "তবে তোর পদার্থ আর কিছুই নেই—একেবারে লোক হাসালি। আমরা কি আর কথা কইনে? সেদিন বাপেরবাড়ী যেতে ঠাকরুণ বারণ করেছিলেন, আমি যে একটু সরে এসে কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম—তাই বলে কি ঘোমটা খুলতে গিয়েছিলুম, না কাছে বসে বেহায়ার মত গল্প করতে গিয়েছিলুম? সবাই ত তাই বলে 'ওবাড়ীর মেজ বৌএর লজ্জার ভাবটা বড় বেশী'।"

বৌ। "ছি ঠাকুরঝি, তুমি শ্বাশুড়িকে অমন করে বল্লে, তাতে তোমার লজ্জা হোলনা।"

প্র। "কি লজ্জাবতী গা, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না, যত লজ্জা ওনার এর ব্যালা। তোর মত যেদিন নির্লজ্জ বেহায়া হব সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব"।

বৌ। ("স্বগতঃ) বটে, জামা পরলেই যত মেম সাজা হয়—আর উনি যে মুখে একঝুড়ি রুজ পাউডার লেপেছেন—তাতে মেম সাজা হয় না, দাঁড়াও একটু জব্দ করি। (প্রকাশ্যে) "বলি ঠাকুরঝি—তোমার গালটা অত লাল কেন দেখছি? পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ায় নি ত?—

প্র। "তোর ঠাকুরজামাইও অমনি বলে থাকে।—বলে গাল নয়ত যেন গোলাপ ফুল। কিছু কামড়ায় নি ভাই, আমার গালটা কেমন অমনি লালপানা—তোর বুঝি হতে সাধ যাচ্ছে?"

বৌ। "তা ভাই মুখে খড়িপানা তোর কি লেগে রয়েছে—"

প্র। (স্বগতঃ) "টের পেয়েছে নাকি—এখনি সব দেখছি ফাঁশ হয়ে যাবে।" (তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া, কাণে কাণে)—"চুপকর,ও ভাই একরকম গুঁড়ো, মাখলে স্বামী বশ হয়,—কাউকে বলিসনে, আমি তোকে এক কাগজ পাঠিয়ে দেব এখন, আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস, তৈয়ারি করতে দেব,—দেখিস ভুলিসনে যেন—মাথা খাস।—

# কুড়ানো।

বিলাতী সুন্দরীদের তিন কালের তিনটি ভাবনা আছে। যখন তাঁহাদের ১৫ বৎসর বয়স তাঁহারা ভাবেন—"কাহার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।" যখন তাঁহাদের ২৫ বৎসর বয়স তখন ভাবেন—"অনুগ্রহের পাত্র কই এখনো জুটিল না কেন?" তাহার পর ৩৫ বৎসর বয়সে ভাবেন,—হায়, আমাদের প্রতি এখনো কেহ অনুগ্রহ করিল না কেন?"

---

এক যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন কিন্তু কোন মতেই তাহাকে মনের কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন না। এক দিন যুবতী আপন গৃহে বসিয়া আছেন, যুবক বাহির হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আগুণ আগুণ"। যুবতী তাড়াতাড়ি জানালায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় কোথায়" যুবক আপনার বুকে হাত দিয়া বলিলেন "হেথায় হেথায়"

---

একজন লোক বাড়ীর কারনিসে শুইয়াছিল তাহার বন্ধু দেখিয়া বলিল—"এখনি যে পড়িয়া মরিবে? তোমার কি জীবন হারাইবার ভয় নাই?" সে ব্যক্তি বলিল "আমার আবার জীবন হারাইবার ভয় কি? আমার জীবন যে insure করা হইয়াছে।"

---

স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, স্বামী অত্যন্ত কাঁদিতেছেন, তাঁহার বন্ধু তাহাকে থামাইবার বিশেষ চেষ্টা করাতে, স্বামী বলিলেন "বন্ধুবর, কাঁদিবার ল্যাঠাটা এক দিনেই ভাল করিয়া চুকাইয়া ফেলি না কেন?

---

## গাহিতাম প্রেম গান।

যদি গো থাকিত মোর বীণ
গাহিতাম প্রেম গান,
সাগর ভূধর কানন কাঁপায়ে
সপ্তমে পূরিয়া তান।

যদি গো হইত মোর কবির হৃদয়
সকলি দিতাম তারে,
আকাশের তারা আর স্বরগ সুষমা
কবি কি দিতে না পারে!

যদি গো হইত মোর পটুয়ার তুলি
দেখিত সে চারি ধারে—
মোহন স্বপন সম তাহার প্রতিমা
রয়েছে ঘেরিয়া তারে।

থাকিত আমার যদি তাহার সোহাগ
আশার প্রতিমা খানি—,
আবদ্ধ হৃদয় মোর পাইত উচ্ছ্বাস
স্তবধ-হৃদয়—বাণী।

সখা, কি আছে আমার বল
কি দিব তাহারে আমি?
হৃদয় দিয়েছি তা' চরণের তলে
প্রাণ তার্ অনুগামী!

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পাঠকেরা পুস্তক খানির নামটি পড়িয়াই বুঝিয়াছেন এখানি কোন শ্রেণীর পুস্তক—এখানি গ্রন্থকারের কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মষ্টি। একদিকে "অনীশ্বররাদ ও অজ্ঞেয়তা বাদ খণ্ডন ও অপরদিকে পৌত্তলিকতার অসারতা প্রদর্শিত করিয়া" স্বীয় সত্য ধর্ম্ম প্রচারই গ্রন্থ খানির উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য যে মহৎ তাহা সত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য। যিনি যাহাকে সনাতন সত্যধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে ভক্তির সহিত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাহার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন (তাহা যেমনই হউক না কেন) তিনি যুক্তি দ্বারা তাহা সমর্পণ করিতে প্রয়াস পাইলে, অন্য ধর্ম্মের গোঁড়া লোকের যাহাই বলুন, কিন্তু সাধারণ সত্যবৎসল পাঠকের নিকট যে তাহা সম্মানের চক্ষে লক্ষিত হইবে তাহাতে আর বিশেষ সংশয় নাই। সত্য বটে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ন্যায় শাস্ত্রের দ্বারা নিখুঁত রকমে প্রমাণ করা এক প্রকার অসম্ভব, লোকের আভ্যন্তরিক ভাব ও প্রকৃতি ভেদে কোন এক বিশেষ ধর্ম্ম তাহাদের নিকট সত্য, পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হয় মাত্র। সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, তাঁহার খণ্ডন ও গঠন কার্য্য যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে তথাপি ইহা একশ্রেণীর লোককে অধর্ম্মাচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। লেখক অপর ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেন এই বিশেষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—এই তত্ত্ব—সকল হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিতে না পারুক এক শ্রেণীর মনুষ্য হৃদয়ের রহস্য বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। অপর কোন কারণে না হইলে এই কারণেও অপর সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের ন্যায় "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট আদরের সামগ্রী। গ্রন্থের আর একটি বিশেষ গুণ এই গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িক ভাব ত্যাগ করিয়া যথার্থ সত্যের অনুসরণ করিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। যথা—

"সাকার উপাসকেরা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবেন না? রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যারপর নাই উদার মত প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। আমরা কখন এমন বলিনা যে, নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী নরকগামী হইবে। মুক্তি কাহারও একচেটিয়া নহে। কর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য প্রেম ও পবিত্রতা; সেই পরিমাণে তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি মলিন চরিত্র, অভক্ত ও স্বার্থপর হয়, সে

নামে ব্রাহ্ম হইলেও, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার সম্পর্ক অতি অল্প; মুক্তির রাজ্য হইতে সে বহু দূরে। আর সাকার উপাসক হইয়াও যিনি সরল সত্যানুরাগী, প্রেমিক, পরোপকারী, ভক্তিমান্, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি রাজ্যের নিকটবর্ত্তী।"

ইহার পর পুস্তকের স্থানে স্থানে পৌত্তলিক ও অজ্ঞেয়তাবাদীর প্রতি যে একটু আদটু অযথা বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাই—সেটুক না থাকিলেই যেন ভাল হইত। যদিও বুঝা যাইতেছে, লেখক রূঢ় হইবার ইচ্ছার রূঢ় হয়েন নাই, নিজ ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হইয়া উৎসাহে দুই এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এরূপ না হইলে আরো ভাল হইত। পৌত্তলিকতার অসারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া পৌত্তলিকদের প্রতি রূঢ় হওয়া কোন রূপেই সঙ্গত নহে।

**প্রাকৃতিক ইতিহাস।** শ্রীপ্রমথনাথ বসু, বি, এস্ সি (লণ্ডন এফ, জি, এস) কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি ভূবিদ্যা এবং প্রাকৃতিকভূগোল বিষয়ক একখানি পাঠ্য পুস্তক, এবং প্রচলিত প্রাকৃতিক ভূগোল সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে লিখিত। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক অবস্থাই ইহার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ইহার প্রণালী যেমন সুন্দর—ভাষাও তেমনি সরল। কেবল বালক বলিয়া নহে অনেক বড় বালকে ইহা পড়িয়া সহজে প্রাকৃতিক রহস্যের সংক্ষিপ্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী। প্রমথ বাবুর ন্যায় অভিজ্ঞ ও কৃত বিদ্য ব্যক্তি যে এরূপ পুস্তক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আশা করি পুস্তকখানি মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে।

Grammar and composition—(ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা)। বালকদিগের ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষার সুবিধার জন্য পুস্তকখানি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত। বেশ নৈপুণ্য ও কৌশল সহকারে নূতন প্রচলিত ব্যাকরণ কয়েক খানি হইতে পুস্তকখানি সংগৃহীত। ছোট ছোট বালকদের ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে। একস্থানে অনুবাদের একটু দোষ হইয়া পড়িয়াছে—semi Vowelকে তিনি স্বামীস্বর বলিয়াছেন। যাহা হউক শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকখানি একবার দেখিলে ভাল হয়।

**রাজস্থানের ইতিহাস।** শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি টডের রাজস্থানের সংক্ষিপ্ত সার। অল্পের মধ্যে এখানি বড় সুন্দর হইয়াছে, যাঁহারা টডের প্রকাণ্ড দুই খণ্ড ইতিহাস পড়িতে না পারেন ক্ষুদ্র এই ইতিহাসটি তাঁহাদের আমরা পড়িতে বলি। আমরা এখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

**জীবনী সংগ্রহ।** শ্রী অমৃতলাল বসু প্রণীত। রামদুলাল সরকার, রামমোহন রায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণদাস পাল এই কয়জনের জীবনী ইহাতে সংগ্রহ।

ইহাঁরা সকলেই সমক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারেন—ইহা আমাদের মনে হয় না।

**নারী পূজা।** ধর্ম্ম-রহস্য। এইচ্ দে প্রকাশক। এই গ্রন্থখানি পাঠে বোধ হয় গ্রন্থকারের নারীজাতির প্রতি অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। তিনি বলিতেছেন পৃথিবীতে যদি পূজা করিবার কোন বস্তু থাকে তাহা নারী জাতি। নারী জাতিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী। নারীজাতি হইতেই সকল সুখের উৎপত্তি অতএব নারী জাতিকে সকলে মিলিয়া পূজা করা যাউক

এবং এই পূজাই যথার্থ পূজা ও সত্যধর্ম্ম। পুস্তকখানির ভাষা অনেকটা উদ্ভ্রান্ত প্রেমের ধরণের। গ্রন্থকার বুঝি কোম্‌তের শিষ্য? পুস্তকখানিতে ধর্ম্মের রহস্য কতটা ভেদ হইয়াছে বলিতে পারি না তবে গ্রন্থকারের হৃদয়ের রহস্য ভেদ হইয়াছে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়।

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।** পরম হংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য, শ্রীমদানন্দ গিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা—এবং বঙ্গানুবাদ;—শঙ্কারাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত সহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এখানি মাসে মাসে সংখ্যায় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই কয় সংখ্যায় মূল সংস্কৃত (ব্যাখ্যা ও টীকা সহিত) কিছু অধিক অষ্টম অধ্যায় এবং বঙ্গানুবাদ কিছুঅধিক-চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত আছে। অনুবাদটি বেশ ভাল হইতেছে, ভাষাটি বেশ সরল ও পরিস্ফুট। বাঙ্গলায় আর একখানি ভগবদ্গীতা আছে তাহার ভাষা এমন পরিষ্কার নহে। ইহার অনুবাদের ভাগ মূল সংস্কৃতের সমান সমান হইলে ঠিক হইত। লেখক শঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরি শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা হইলে গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ মর্য্যাদা হইবে।

**পরিণাম।** মাসিক পত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। জয়রাম পুরের ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে এরূপ একখানি মাসিক পত্র সম্পাদিত হইতেছে—ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গে লেখাপড়ার চর্চ্চা যে কতটা বাড়িয়াছে ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজখানিতে অনেকগুলি পড়িবার বিষয় থাকে। দুঃখের বিষয় ইহা নিয়মিত প্রকাশ হয় না।

**গো পালন**—অর্থাৎ গো প্রতিপালন ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত।

যাহাদের ঘরে গরু বাছুর আছে তাহাদের সকলেরি ঘরে এই পুস্তক এক এক খানি রাখা উচিত।

**সুবর্ণ বণিক।** অর্থাৎ সুবর্ণ বণিকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এবং বৈশ্যত্ব সংস্থাপন বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য উপরেই ব্যক্ত হইয়াছে। যখন সকলেই সব হইতেছেন তখন সুবর্ণ বণিকেরা বৈশ্য হয়েন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, হওয়াও আশ্চর্য্য নহে বরং সম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

**বিষাদ মুকুল।** শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। এখানি একখানি পদ্য গ্রন্থ। ইহাতে অনেক গুলি কবিতা আছে, দুই একটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

**রত্নমালা।** (নীতি)—প্রথম ভাগ শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত।

এখানি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। অতি দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি আমাদের ভাল লাগে নাই, এবং বালকদিগের ভাল লাগিবে কি না বলিতে পারি না। এরূপ পুস্তকে যে কাহারো কখনও কোন উপকার হইতে পারে এরূপ বোধ হয় না।

**বণিক-দুহিতা।** নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা। এখানি একখানি গীতি-নাট্য। ইহার মধ্যে দু একটি গান নিতান্ত মন্দ নয়। যথা—

মন যে নিল সেত ফিরে দিল না।
জনম ফুরায়ে এল ফিরে চাওয়া হ'ল না।
তাহারে হেরিলে সই,
মুখপানে চেয়ে রই,
বলি বলি ফিরে দিতে, আর বলা হ'ল না"

# সুদান সমর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ( আষাঢ় মাসের ভারতীর পর )

স্বদেশানুরাগী ন্যায়বান বীরবর গর্ডন্ খার্তুমে উপস্থিত হইলে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মঙ্গলময় উৎসবের গভীর কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র তাঁহার স্বদেশীয় ও মিসর এবং স্থদানবাসী সহস্র সহস্র নরনারী একত্র মিলিত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, এবং অনেকে একতান-প্রাণে "দয়াবান পিতা," "স্থদানের ত্রাণকর্ত্তা," "বিপন্নের বন্ধু," "স্থদানের ন্যায়বান স্থলতান" ইত্যাদি শ্রুতি-মধুর সম্ভাষণে তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিল। শত শত নরনারী তাঁহার হস্ত ও পদ চুম্বন করিয়া স্ব স্ব হৃদয়-নিহিত গভীর কৃতজ্ঞতার প্রবাহ ঢালিয়া দিল। সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ সুশোভন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মধুকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিল। দেব-ভাবাপন্ন গর্ডনের শুভাগমনে সেই ভীষণ মরুময় প্রদেশে যেন ক্ষণকালের জন্য শত শত নয়নাভিরাম জীবন্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক উল্লাসময় ও মধুময় ভাব ধারণ করিল। নগরবাসী গণের আশীর্ব্বচন ও স্তুতিবাদে পুলকিত হইয়া তিনি সমবেত নরনারী গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক একটি অনতিদীর্ঘ সুমধুর বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার আরম্ভেই তিনি প্রাণ খুলিয়া এই কয়টি কথা বলিলেন;—"আমি বিনা সৈন্যে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া স্থদানের অশান্তি দমন করিতে আসিয়াছি। আমি ন্যায় ভিন্ন অপর কোন অস্ত্রের সহায়তায় যুদ্ধ করিব না।"

"I come without soldiers, but with God on my side, to redress the evils of the soudan. I will not fight with any weapons but justice."

তিনি খার্তুমে আসিতেছেন, এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবা মাত্র ভীতিবিহ্বল নগরবাসী গণ নির্ভয়ে শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তিনি যখন খার্তুমে উপস্থিত হইলেন তখন অশান্তি যেন কিছু দিনের জন্য নগর হইতে অতি দূরে লুক্কায়িত হইল।

জানুয়ারি মাসের শেষভাগে স্থদান যাত্রাকালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই আজ্ঞা দান করেন যে তিনি কোনমতেই স্থদান জয়ের বাসনা মনে স্থান দিতে পারিবেন না। স্থদানের ইয়ুরোপীয় অধিবাসীগণ ও বিপন্ন মিসর সেনাগণ মুক্তিলাভ করিলেই তাঁহাকে স্থদান ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আ-

সিতে হইবে। যখন তিনি কেরো নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন মেজর বেয়ারিং তাঁহার সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা পাঠ করিয়াছিলেন ;—"আপনি মনে রাখিবেন যে সুদান ভূমি পরিত্যাগ পুরঃসর তত্রত্য ইয়ুরোপীয় অধিবাসীগণ ও মিসরবাসীদিগকে লইয়া মিসরে আসাই গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নয়-কৌশল policy। মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে বিশেষ বিবেচনা ও বাদানুবাদের পর মিসর-গবর্ণমেণ্ট এই নয়-কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...... আমি বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিতেছি যে এই নীতি অবলম্বনের আবশ্যকতা আপনি সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করেন।" তদুত্তরে গর্ডন বলিয়াছিলেন, "ঐ আজ্ঞা-পত্রে এই কয়টি কথা যোগ করিলে আমি বড়ই সুখী হইব ;—"কোন মতেই সুদান-পরিত্যাগ-নীতি পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।"

খার্তুমে উপস্থিত হইয়াই তিনি গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিতে একান্ত যত্নবান হইলেন। সুদানে শান্তি সংস্থাপন করাই তাঁহার তদানীন্তন জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইল। তিনি এই মহামন্ত্র সাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে মহা পরাক্রমশালী মেহিধির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন ;—"আমি আপনাকে নমস্কার করি। আসুন, আমরা আমাদের মধ্যস্থিত পথ উন্মুক্ত করিয়া লই। আপনি আপনার বন্দীদিগকে পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে পশ্চিম দারফোর ও কর্দোফাঁর সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রস্তুত আছি। আমি সুদানের অনাদায়ী রাজস্ব ও কর অর্দ্ধেক পরিমাণে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। আমি দাস ব্যবসায়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাইব না। আপনি অকারণে কিজন্য যুদ্ধ করিবেন ? যদি আপনি নিতান্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত আছি। আপনি দশমাস কাল অপেক্ষা করুন ; তখন হয়ত আমি আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিব, অন্যথা সুদান ভূমির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উহার ভার আপনারই হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যাইব"।

অনন্তর তিনি খার্তুমে যেরূপ সুশাসন ও সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহা দেখিয়া নগরবাসীগণ একান্ত মোহিত হইল। তিনি সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সর্ব্বাগ্রে উৎপীড়িত প্রজাবর্গের কর অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দিলেন, এবং অপরাধীদিগের কারামোচনের আদেশ দান করিলেন এবং মেহেধিকে কর্দ্দোফাঁর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি একটি সম্মান-সমিতি (Levee) আহ্বান করিয়া তাহাতে সমস্ত নগরবাসীগণকে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাতে সকলেই যোগদান করিয়া সম্মানিত হইয়াছিল; এমন কি খার্তুমবাসী অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল অতি দীনহীন মুসলমানও তাহাতে উপস্থিত হইয়া সাদর-সম্ভাষণ লাভ করিয়াছিল। সভাভঙ্গের পর তিনি তাঁহার প্রধান সহকারী কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের সহিত

তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট-ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় স্ব স্ব বাসস্থান মনোনীত এবং একটি সরকারী কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। তিনি স্বয়ং বিশেষ মনোযোগ সহকারে অসহায়, বিপন্ন ও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত ও তাহাদের অবেদন পত্র পাঠ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূরণ ও অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টিবিধান ও তাহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণের জন্য তিনি অনাদায়ী রাজস্ব কর ও ঋণসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিয়া একটি প্রকাশ্য স্থানে শত শত লোকের সম্মুখে সে সকল একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভষ্মীভূত করিলেন। এইরূপে শত শত লোক ঋণদায় ও কর-ভার হইতে মুক্ত হইয়া ভাবী অত্যাচার ও উৎপীড়নের কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

অপরাহ্নে তিনি স্থানীয় প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে একটি সভা সংগঠন করিলেন। তৎপরে তিনি কর্ণেল ষ্টুয়াট, কর্ণেল ডি কোয়েটলোগন্ (Colonel de Coetlogon) এবং বৃটিশ কন্সল্ ফ্র্যাঙ্ক পাউয়ারের (Mr Frank Power) সহিত চিকিৎসালয়, অস্ত্রাগার ও কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন করিলেন। কারাগারের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে সেই ভীষণ কারাগারে দুই শত বন্দী মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই নির্দ্দোষী, কেহ কেহবা সন্দেহে, কেহবা করদায়ে কেহ কেহবা যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হইয়া উক্ত কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অপরাধ পুনর্ব্বিচারের জন্য আদেশ দান করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অধিকাংশ বন্দী কারামুক্ত হইয়া স্বাধীনতালাভে অতুল আনন্দে গর্ডনের যশোগান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

নিশা সমাগমে সমস্ত নগর মনোহর সমুজ্জ্বল আলোক মালায় বিভূষিত হইল। নগরস্থ বাজার সুদর্শন চন্দ্রাতপে মণ্ডিত এবং নানাবর্ণের সুন্দর দীপ মালায় পরিশোভিত এবং গৃহাবলী নেত্রসুখকর বিবিধ পত্র, পুষ্প ও আলোকে সুসজ্জিত হইল। নগরবাসী নিগ্রোগণ রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত বাজী পুড়াইয়া গভার আমোদে মত্ত রহিল।

জেনারল গর্ডন্ ও কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট উভয়েই দিন দিন বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা বাজারের করগ্রহণ নিবারণ করিলেন এবং অসহায় দরিদ্রগণের আবেদন বা অভিযোগপত্র গ্রহণার্থে স্থানে স্থানে এক একটি পত্রাধার বাক্স স্থাপিত করিলেন। ভূতপূর্ব্ব সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন পাশা চেরিসেথ বেলুদ নামক একটি বৃদ্ধ মনুষ্যের প্রতি এরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন যে গুরুতর কোড়া প্রহারে বৃদ্ধের পদদ্বয়ের শিরা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সহৃদয় গর্ডন্ এই কথা শুনিতে পাইয়া হোসেন পাশার বেতন হইতে ৫০ পাউণ্ড

কর্ত্তন করিয়া লইবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন এবং বলিলেন যে পাশা তাহাতে কোন আপত্তি করিলে বিচারার্থে তাঁহাকে যেন তদ্দণ্ডেই খার্তুমে প্রেরণ করা হয়।

গর্ডনের সুশাসনগুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই খার্তুমে শান্তিময়-ভাব উপস্থিত হইল। গর্ডন ভাবিলেন, তিনি বিনাযুদ্ধে, বিনা শোণিত পাতে সমগ্র সুদান ভূমিতে শান্তিস্থাপন ও সুনিয়ম বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি মিসর-সেনানিবাস হইতে অনেকগুলি সৈন্য মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল। তখনও খার্তুমে, সেনার প্রভৃতিস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০০ লোক ছিল। উহাদিগকে নিরাপদে মিসরে পাঠাইতে পারিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধি হয় এই ভাবিয়া তিনি তাহাদের উদ্ধারের উপায়-চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে একখানি ক্ষুদ্রকায় মেঘ সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। এতদিন গবর্ণমেণ্ট বীর গর্ডনকে প্রত্যেক বিষয়ে উৎসাহ ও সহায়তা দান করিয়াছিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন নিজে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "মহামতি গর্ডন্ সুদানে শান্তি স্থাপন জন্য যাহা কিছু করিবেন গবর্ণ মেণ্ট কিছুতেই তাহাতে হস্তার্পণ করিবেন না।" কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সঙ্কল্পে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি ১৮ই ফেব্রুয়ারি সুদানবাসীগণের একান্ত প্রিয় পাত্র ও সুদক্ষ জীবর পাশাকে হস্তগত করিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডের অভিমত চাহিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন যে "সুদান-পরিত্যাগ কালে তাহার পদে এক জন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলে সমস্ত দেশে আবার ভীষণতর অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইবে। জীবর পাশাই সমগ্র সুদান ভূমির একমাত্র শাসনকর্ত্তা হইবার যোগ্য পাত্র। সুদান-শাসনের ক্ষমতা কেবল মাত্র তাঁহারই আছে, কারণ তিনি বহুদর্শী ও সুদক্ষ, বিশেষতঃ সুদানবাসীগণ তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত।" এই বিষয় উপলক্ষে ইংলণ্ডের তদানীন্তন মন্ত্রী-সমাজে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। অধিক সংখ্যক সভ্যের অমতে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। একদিকে খার্তুমের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও দিন দিন অত্যন্ত শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইল। গর্ডন্ ভাবিয়াছিলেন তিনি স্বীয় হৃদয়ের অসাধারণ চারুতা ও চরিত্রের মধুরতা প্রভাবে বিনাযুদ্ধে সুদানে শান্তি আনয়ন করিবেন। এই বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া তিনি খার্তুমে আসিয়াই বিদ্রোহ নিবারণ ও দেশবাসীগণের অনুরাগ ও বিশ্বাস আকর্ষণার্থে কতই কৌশলময়-হিতকর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুদিনের জন্য চারি দিকে কিছু পরিমাণে সুশান্তির মধুময় ভাব বিরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে দেশ মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব উপস্থিত হইল। জ্বলনোন্মুখ ধূমায়মান বহ্নি যেমন ঘৃত সংযোগে খরতর তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া পার্শ্বস্থ দাহ্যমান পদার্থনিচয় প্রজ্জ্বালিত করে, তেমনি এখন খার্তুমের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী

স্থানের বিকাশোন্মুখ বিদ্রোহানল ভীষণতর আকার ধারণ করিয়া থার্তুমের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। সুদানের প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ ভাবিল, অসাধারণ বুদ্ধিমান, প্রভূত ক্ষমতাশালী, কৌশলময় মহাবীর গর্ডন তাহাদের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিবার জন্য কৌশলে ছলনা-জাল বিস্তার করিতেছেন, তাহারা তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যে ভুলিয়া প্রাণান্তেও তাহাতে জড়িত হইবে না; আপাত-মধুর ও পরিণাম-বিষময় কার্য্যের মোহময় আকর্ষণে ভুলিয়া তাহারা প্রাণান্তেও "স্বর্গাদপিগরীয়সী" জন্ম ভূমির চরণে কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া জাতীয়-স্বাধীনতা বলিদান দিবেনা। এই স্থির করিয়া তাহারা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন ও তাঁহার ক্ষমতা চূর্ণ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। গর্ডন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার প্রাণের বাসনা সহজে সফল হইবে না। তিনি থার্তুমবাসী লোকদিগের কার্য্য ও ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তত্রত্য সমস্ত অধিবাসীগণকে ভয় প্রদর্শনে বাধ্য করিবার জন্য এই মর্ম্মে একখানি ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিলেন; "আমি এখানে উপস্থিত হইয়া এ পর্য্যন্ত তোমাদিগকে বিস্তর সদুপদেশ দান করিয়াছি এবং দেশ মধ্যে শোণিত-পাতের পরিবর্ত্তে সুখশান্তি বিধানের জন্য কতই সদনুষ্ঠান করিতেছি। তোমরা আমার উপদেশ গ্রাহ্য করিলে না, এই জন্য আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে বৃটিশ সৈন্য আনিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহারা ইংলণ্ড ছাড়িয়া আসিতেছে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবে। এখনও যদি তোমরা তোমাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন না কর এবং সদ্ব্যবহারের পরিচয় না দাও তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান করিতে বাধ্য হইব।"

ইতিমধ্যে গর্ডন বৃটিশ পার্লেমেণ্টে এই মর্ম্মে আর একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। "যদি আপনারা মিসরের প্রকৃত সুখ শান্তি চান তবে মেহেধির ক্ষমতা অবশ্যই চূর্ণ করিতে হইবে। মেহিধি বড়ই ভীষণ প্রকৃতির লোক। বিশেষ যত্ন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ক্ষমতা চূর্ণ করা যাইবে। আপনাদের যেন স্মরণ থাকে যে থার্তুম একবার তাহার অধিকার ভুক্ত হইলে পরে উক্ত সঙ্কল্প সাধন করা একান্ত কঠিন হইয়া উঠিবে; কিন্তু তখনও আপনাদিগকে মিসর রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া মেহিধির ক্ষমতা চূর্ণ করিতে হইবে। যদি সময় থাকিতে তাহার দর্প চূর্ণ করা আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তবে ওয়াদি হালফাদুর্গে দুই শত সাহসী ও সুশিক্ষিত ভারতীয় সেনা, ডঙ্গোলায় কতিপয় সুদক্ষ সেনাপতি এবং আর এক লক্ষ পাউণ্ড অচিরে প্রেরণ করিবেন। সোয়াকিম ও মাসোওয়ারের কথা একবারেই পরিত্যাগ করুন। আমি পুনরায় বলিতেছি যে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহা হইলে মিসরে আপনাদিগকে ইহার সমুচিত কুফল ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং তখন মিসর রক্ষার্থে আপনাদিগকে

এক মহাভয়ঙ্কর সমরে লিপ্ত হইতে হ-ইবে।”

কিছুদিন পূর্ব্বে জেনারল্ গর্ডন্ শ্বেত-নীলের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের অধিবাসী-দিগকে বশীভূত করিবার জন্য কর্ণেল ষ্টুয়া-র্টকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি অকৃত-কার্য্য হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ও প্রত্যেক জাহাজে এক একটি কামান এবং একশত দশ জন করিয়া সুদানী সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রা-মের ক্ষমতাশালী শেখদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য খার্তুম পরিত্যাগ করিয়াছি-লেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে সন্ধিসূচক একএকটি শ্বেত পতাকা ছিল। প্রথমতঃ অনে-কেই তাঁহাদিগের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিয়াছিল। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট তাহাদিগকে গর্ডনের শান্তি সংস্থাপন বিষয়ক নীতি বুঝা-ইয়া দিলেন। পরে তাঁহারা যতই কর্দোফাঁর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তত্রত্য অধিবাসীগণ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট পলায়মান লোকদিগকে আশ্বাস বাক্য দান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সহ-যোগী হোসেন বে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না। এই আশ্বাসবাক্যে ছয়জন বলিষ্ঠ শেখ তাহাদের নিকট আসিল এবং সকলেই একবাক্যে গর্ড-নের প্রস্তাব অনুমোদন ও পরদিবস প্রাতে তাহাদের দলস্থ প্রধান প্রধান শেখদিগকে আনিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তাহাদের কথা একরূপ সত্য হইল। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে শত শত শেখ নীলনদী তটে উপস্থিত হইল! ইহারা মিত্রভাবে মিলিতে আইসে নাই; কিন্তু সকলেই ভীষণ বর্ষা, দীর্ঘ তর-বারি ও বন্দুকে সুসজ্জিত হইয়া মহোৎসাহে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে এবং করধৃত বর্ষা ও পতাকা সঞ্চালন করিতে করিতে ষ্টুয়ার্টের গতিরোধ করিতে উপস্থিত হইয়া-ছিল! ষ্টুয়ার্ট জাহাজ হইতে একবারে শত শত পতাকা উত্তোলন করিয়া সন্ধির সঙ্কেত করিলেন। ভীষণাকার শেখদল তাঁহাদের কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া তথা হইতে দশক্রোশ অন্তরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের প্রধান দলপতি টেক ইব্রাহিম শেখের গ্রামে উপস্থিত হইল। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তথায় অন্যূন ১৫০০ সুসজ্জিত পদাতিক ও অশ্ব এবং উষ্ট্রারোহী সৈন্য সম্মিলিত হইল। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য সদলে নীল নদী বহিয়া চলিলেন। তাঁহা-দের গতিরোধ করিবার জন্য এই ১৫০০ সৈন্য তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট স্বহস্তে পতাকা ধারণ করিয়া সন্ধির অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। উত্তেজিত সৈন্য গণ তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি হতাশ হইয়া খার্তুমে প্রত্যাগমন করিলেন।

২রা মার্চ্চ তারিখে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য শ্বেতনীল অভি-মুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেদিনও পূর্ব্বের ন্যায় হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

১২ই মার্চ্চ মেহিধির সৈন্যগণ মহা দর্পে দলে দলে নীল নদী তটে সম্মিলিত হইতে লাগিল। এই দিন ৪০০০ সৈন্য ঘোর পরাক্রমে খার্তুম নগর আক্রমণ করিল। তাহারা সর্ব্বপ্রথমে খার্তুমের উত্তরস্থিত হালফিয়া দুর্গের ৮০০ সৈন্য কাটিয়া ফেলিল। আক্রান্ত দুর্গের রক্ষার্থ একখানি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল। জাহাজখানি যেমন বিদ্রোহীদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইল অমনি তাহারা মহাতেজে উহার প্রতি শত শত গুলি বর্ষণ করিল। গুলির আঘাতে এক জন সেনা ও একজন সেনাপতির প্রাণ বিনষ্ট হইল। জাহাজ হইতেও ভীষণ তেজে গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। মুহর্ত্ত মধ্যে বিদ্রোহী দলের ৫ জন সাহসী সেনা নিহত হইল। এই দিন হইতেই দুই দলে—ইংরেজে মুসলমানে—সভ্যে অসভ্যে—শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ে—প্রকৃত প্রস্তাবে শত্রুতা বৃদ্ধি ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল! আজি হইতে ইংলণ্ডের লীলাময়ী নীতিবালুকাময়-মরুভূমি-সমাচ্ছন্ন "সুজলা সুফলা-শস্য-শ্যামলা" সুদান অদ্ভুত, লোমহর্ষণ অনল ও অস্ত্রক্রীড়ার ক্ষেত্র হইল!!

যুদ্ধের পূর্ব্বে গর্ডনের তিন দল সেনা অসজ্জিত-অবস্থায় নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণার্থে বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বন হইতে বহির্গত হইয়া মেহিধির সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র উন্মত্ত সৈন্যগণ তাহাদিগকে একে একে বিনাশ করিল। উহারা তাহাদের সাতখানি নৌকা অধিকার ও তৎস্থিত প্রায় ১৫০ জন লোকের প্রাণসংহার ও তাঁহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া নদীতীরবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিত করিতে লাগিল, এবং শিবির হইতে অবিশ্রান্ত গোলা গুলি বর্ষণে দুর্গবাসী লোকদিগের পলায়নের পথরোধ করিয়া রাখিল। অনন্তর গর্ডনের আদেশে ১২০০ সৈন্য তিনখানি রণতরী ও কামান লইয়া শত্রুদলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা অসীম সাহস ও ঘোর পরাক্রম সহকারে মেহিধির সৈন্যদলের আক্রমণ ব্যর্থ ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অবরুদ্ধ হালফিয়া দুর্গস্থিত অবশিষ্ট ৫০০ লোকের উদ্ধারসাধন ও বিপক্ষীয় ৭০টি উষ্ট্র, ১৮টি অশ্ব এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী অধিকার করিয়া খার্তুমে উপস্থিত হইল।

মেহিধির সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াও হালফিয়া নগর অবরোধ করিতে ক্ষান্ত হইল না। এক একবার তাহারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিবার জন্য গর্ডন ২০০০ সৈন্য একত্রিত করিলেন। এই দিন প্রত্যুষে এই দুই সহস্র সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। বাসিবেজোক ও মিসরী সেনাগণ শত্রু-শিবিরের সম্মুখবর্ত্তী কৃষ্ণনীল (Blue Nile ?) তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। বামভাগে একদল সুশিক্ষিত সুদানী সৈন্য ও একটি বৃহৎ কামান স্থাপিত হইল। এই সকল সৈন্য যতই বিপক্ষ শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল বিপক্ষীয়

সৈন্য দল ততই শিবির পরিত্যাগ পুরঃসর গর্ডনসৈন্যের দক্ষিণ দিকে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল এবং এক একজন করিয়া নিকটস্থ বালুকাময় উচ্চভূমির পশ্চাৎ ভাগে অদৃশ্য হইতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা মধ্যে মেহিধির সমস্ত সৈন্য সেই সমস্ত রাশীকৃত বালি-ঢিবীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল। তাহাদের সকলের পশ্চাতে ৬০ জন ভীষণাকার বর্ষা ও বন্দুকধারী আরব সৈন্য অর্দ্ধ চক্রাকারে ব্যূহরচনা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। গর্ডনের অশ্বারোহী সৈন্যগণ সেই সকল বালি ঢিপীর নিম্নতলস্থ বন মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র বিপক্ষদল ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় গর্ডনের অশ্বারোহী সেনাদলের দুই জন প্রধান অধ্যক্ষ হোসেন ও সৈয়দ পাশা পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তন ও অদ্ভুত রহস্যময় সঙ্কেত করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে মেহিধির সৈন্যগণ ভৈরব গর্জ্জনে গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া সম্মুখস্থ উচ্চভূমি সকলের চতুর্দ্দিক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গর্ডন-সৈন্যের প্রতি ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিল। ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য গর্ডনের অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রস্তত হইয়াছিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের প্রধান গোলন্দাজ হোসেন পাশার তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন তাহারা ভীত ও চকিত হইয়া এই অদ্ভুত রহস্য-ময় সমরে বিমুখ হইয়া শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক যথেচ্ছা পলায়ন করিতে লগিল। বিপক্ষীয় ৬০ জন মাত্র অশ্বারোহী-সৈন্য বর্ষা ও তরবারির আঘাতে গর্ডনের সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় ২০০০ সৈন্য ৬০ জন অশ্বারোহীর নিকট পরাজিত হইয়া মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া এই ৬০ জন সৈন্যের আক্রমণ নিবারণ করিতে সাহসী হইল না। মেহিধির সৈন্যগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত এই সকল পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। ইহাদের বর্ষা ও তরবারির আঘাতে গর্ডনের ২০০ শত সৈন্য নিহত ও শতাধিক সৈন্য আহত হইল। মেহিধির সৈন্যগণ একক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক অগ্রসর হইয়া তথায় ছাউনি করিল এবং তথা হইতে বিপক্ষ দলের প্রতি এক একবার গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় গর্ডনের একজন মিসর সেনাপতি কতকগুলি বন্দুকধারী সৈন্য একত্রিত করিয়া বিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া তথা হইতে মেহিধির সৈন্যের উপর এক একবার গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত দুই দলে পরস্পরের প্রতি গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষের কিছুই ক্ষতি হইল না। অপরাহ্নে মেহিধির সৈন্যগণ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে প্রত্যাগত হইল। এই শোচনীয় যুদ্ধে গর্ডনের দুইটি কামান, অনেকগুলি বন্দুক ও বিস্তর গোলাগুলি বিপক্ষ দলের হস্তগত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে হোসেন

ও সৈয়দ পাশা নামক দুই জন ছদ্মবেশী মিশর সেনাপতির ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতাই গর্ডনের এই শোচনীয় পরাজয়ের প্রধানতম কারণ। গর্ডন এই দুই জনকে "কালা-সেনাপতি"(Black Generals) নামে ডাকিতেন। পূর্ব্বে একবার ইহাদের চরিত্রের উপর বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু ইহারা বিশেষ প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া সেই সন্দেহ অপনয়ন করিয়াছিল। এই কলঙ্কিত পরাজয়ের আমূল-বিবরণ গর্ডনের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বর্ষা-সমাগমে যতদিন নীল নদী জলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ না করিয়া তাহাদের আক্রমণ-নিবারণ ও আত্ম-রক্ষা করিতে থাকিবেন।

যথাসময়ে বিশ্বাসঘাতক হোসেন ও সৈয়দ-পাশার অপরাধ সপ্রমাণিত হইল। ইহাদের গৃহ হইতে অনেকগুলি বন্দুক, বর্ষা ও তরবারি এবং বিস্তর গোলাগুলি ও বারুদ বাহির হইল। ইহারা এই সকল যুদ্ধোপকরণ মেহিধির সৈন্যগণকে দিবার জন্য আপন আপন গৃহে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সামরিক আইন-অনুসারে এই দুই হতভাগ্যের বিচার হইল। বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ২২শে মার্চ্চ ইহাদের জীবন্ত-দেহ বধ্য ভূমিতে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

---

# কৃষ্ণ কালী।

কোথায় লুকালে হে বাঁশরী;
এখন অসিধরি, ভয়ঙ্করী বেশ ধরেছ শ্রীহরি।
তোমার বনমালা, মুণ্ডমালা হয়েছে বংশীধারী।
তোমার চরণ পদ্মে, রক্তপদ্ম দিতেছে—রাই-
কিশোরী।

দাশরথী।

প্রবন্ধশীর্ষে "কৃষ্ণকালী" দেখিয়াই বঙ্গীয় পাঠক নাসাগ্র কুঞ্চিত করিবেন না, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণকালী শুধু নেড়া নেড়ীর বা মুক্তকচ্ছ, মুণ্ডিত-শীর্ষ, ত্রিপুণ্ড্র ধারী, তুলসীকণ্ঠ বাবাজীর সম্পত্তি নহে। কৃষ্ণ চরিত্র সংসারের অতুলনীয় সামগ্রী; ভারতে কে না কৃষ্ণকে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলিয়া ভক্তি করে, ভাগবতের ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে কৃষ্ণ-চরিত্র যে অতি উপাদেয় পদার্থ তাহা কে অস্বীকার করিবেন। কৃষ্ণ কালীর মধ্যে বিশেষ যে একটু সৌন্দর্য্য নিহিত আছে আমরা তাহার যতদূর পারি পাঠকবর্গের নিকট উপ-

স্থিত করিলাম। কলির প্রথমে মহামতি কৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন, মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণ হইতে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণ পৃথক বস্তু। জ্ঞান ও সারবত্তা সম্বন্ধে ভারত ও ভাগবতের কৃষ্ণের অনেক সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু অনেকাংশে উভয়ের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়, এ পার্থক্যের বিশেষ কারণ আছে। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ভারতের কৃষ্ণের সহিত ভাগবতের কৃষ্ণের যে সাদৃশ্য আছে, জয়দেব বা বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের কৃষ্ণে সে সাদৃশ্যের লেশমাত্রও নাই। হিন্দু সমাজের যখন সম্পূর্ণরূপে রীতি, নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দুজীবন যখন তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু সন্তানগণ যখন আর্য্যকীর্ত্তি রক্ষণে অসমর্থ হইয়া বিলাস পরায়ণ হইয়াছেন, রাজণ্যবর্গ যৎকালে ধনুর্ব্বিদ্যার পরিবর্ত্তে গৃহিনীর অঞ্চল-কোণ্ আশ্রয় করিয়াছেন ঠিক্ সেই সময় জয়দেব সাময়িক-রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া গাহিলেন—

"বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং।" ইত্যাদি

জয়দেব, ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণজীবনীর ব্রজলীলা ভাগমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাও আবার রূপক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ প্রকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে শুধু সরস বসন্তে যুবতীগণের সহিত নাচিতে দেখিয়াছেন, আর ভক্তির আধিক্যে তাহাই দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া জগৎ মাতাইবার চেষ্টায় গীত গোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন, কৃষ্ণের রাধা প্রেম উপভোগ, উভয়ের প্রেমোন্মাদ, সখীগণ সহ কৃষ্ণের নৃত্য এই সকলই জয়দেবের বর্ণনীয় ও গীতগোবিন্দের বর্ণিত বস্তু। আবার তৎপরবর্ত্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ের অতিরিক্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা কৃষ্ণ বা রাধিকার বিরহ ব্যথায় সম্পূর্ণ ব্যথিত। তাঁহাদের-বর্ণিত কৃষ্ণে ভারতের সে মহাবাহু, কূটচক্রী, অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞের ছায়া মাত্র নাই। বিদ্যাপতির বিরহ-বিধুর কৃষ্ণ মানময়ী রাধিকার মানভঞ্জনার্থে বলিতেছেন।

"ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনী
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া নাচাহ
আমার শপথ লাগে।
জপ তপ তুঁহু, সকলি আমার
করের মোহন বেণু। ইত্যাদি

জ্ঞানদাসের রাধা, কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণন করিয়া বলিতেছেন——

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া,
পীতবাস পায় শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম,
আবার—হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়,
ছায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

বলুন দেখি পাঠক, আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ বিসমার্ক বা গ্লাডষ্টোনকে যদি স্বীয় ধর্ম্মপত্নী সত্ত্বেও একটা গ্রাম্য নারীর নিকট এইরূপ তোষামোদকারী কথা বলিতে শুনেন

তাহা হইলে তাহাদের মুখে ঐ কথাগুলি কেমন শুনায়? এবং সে কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে বুদ্ধিমান পাঠক কতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন? যে কৃষ্ণের পরামর্শ লইবার জন্য, বৈরীভাবাপন্ন কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষই ব্যস্ত, যে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, রণ-দুর্ম্মদ পার্থ, মহাবলশালী ভীমসেন চক্রবৎ পরিচালিত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ যে তরল-প্রাণা বিলাসিনীর নিকট কাতর ভাবে প্রেম ভিক্ষা করিবেন এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?* মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যে একজন দূরদর্শী রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার সন্দেহ নাই। যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও উদ্ধবের প্রতি সারগর্ভ নৈতিক উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ যে গোপবালার প্রেমে এতদূর উন্মত্ত হইবেন যে গোপবালার বস্ত্রে বস্ত্র স্পর্শ হইবার আশায় যে রজক-গৃহে রাধিকার বস্ত্র প্রদত্ত হইত, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই রজক গৃহে তিনি বস্ত্র দিবেন, অথবা সেই রাধিকাকে "দেহসার" "নয়নের তারা" বলিবেন এবং নিষ্প্রয়োজনে রাধিকার গৃহে দিনে বিশবার উঁকি দিবেন ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ও স্বভাববিরুদ্ধ। তবে ভাগবতে ব্রজলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে তাহা সত্য। ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক ভাব ও রাধা কৃষ্ণের যুগলমিলনে যে সাংখ্যের ছায়া আছে তাহা বলা বাহুল্য। †

ভাগবতে স্পষ্টরূপে কৃষ্ণকালীর উল্লেখ নাই, তবে যেরূপ ঘটনা লইয়া কৃষ্ণকালীর উৎপত্তি সেইরূপ একটী ঘটনা ভাগবতে আছে। বৃত্তান্তটী এই, আয়ানপত্নী রাধিকা সূর্য্য পূজাচ্ছলে গৃহত্যাগ করতঃ নির্জ্জনে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দোপভোগ করিতেছেন, এমন সময় আয়ান রাধিকার গৃহত্যাগ সংবাদে ব্যথিত হইয়া যষ্টিহস্তে গুপ্তকুঞ্জের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। রাধিকা প্রাণভয়ে কৃষ্ণকে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি দ্বারা সূর্য্যকুণ্ডে লুকাইয়া রাখেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে অদ্যাপিও বৃন্দাবনে সূর্য্যকুণ্ডনামে একটী কুণ্ড যাত্রীদিগকে দেখান হয়, এই ঘটনা অবলম্বনে ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত মুক্তকেশ নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকালীর বর্ণনা আছে। কবি, বৈষ্ণবগণের শক্তির প্রতি বিদ্বেষ দুর করিবার জন্যই হউক বা বৈষ্ণবদিগের আরাধিত হরিকে শক্তি মূর্ত্তিতে সাজাইবার জন্যই হউক তিনি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য বলে পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণকে প্রকৃতিরূপাকালী মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। মুক্তাফলপ্রণেতা, ভাগবতের বংশীধারী সুললিত হাস্যমুখ শান্তমূর্ত্তি কৃষ্ণকে, অসিধারিণী, অট্টহাসিনী, ভয়ঙ্করীরূপে সাজাইয়াছেন। ভাগবতের কৃষ্ণ সাংখ্যের পুরুষ, তন্ত্রের কালী সাংখ্যের প্রকৃতি। যেহেতু তন্ত্রও সাংখ্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। কৃষ্ণকালীর আয়ান ধর্ম্মজ্ঞান, জটিলা ও কুটীলা

* কেনই বা সকলে বিশ্বাস করিবে না? মহাবীর এণ্টনি কি করিয়াছিলেন? ভাং সং।

† পাঠক এই প্রবন্ধলেখক কর্তৃক প্রণীত প্রবন্ধরত্নে ব্রজলীলা দেখ। এবং বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত-গ্রন্থ সাংখ্য দর্শনের সমালোচনা দেখ।

মানস ও বিবেক। মন ও বিবেক যখন ধর্ম্ম-জ্ঞান বা ধর্ম্মের সাহায্য জন্য ধর্ম্মজ্ঞান হইতে স্বাধীন থাকিয়া, সংসার কাননের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সমাগম দেখিতে পায়, এই দৃশ্যে মানস ও বিবেক মায়াময়ী প্রকৃতির প্রকৃতি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত যখন ধর্ম্ম চক্ষুতে সংসার কাননের দিকে দৃষ্টি-পাত করে তখন ভিন্ন-দৃশ্য তাহাদিগের নয়ন-সম্মুখীন হয়, তখন মায়াময় মোহন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। যদি এই বিনাশ ব্রহ্মাণ্ডের আ-দ্যন্ত কারণ কেহ থাকেন ও তাঁহারা যদি এক হন, এবং একাধারে যদি তাঁহাদের কোনও মূর্ত্তি সংগঠন করিতে হয়, তাহা হইলে আদ্যাশক্তি কালীর ন্যায় কোন ভয়-ঙ্করী মূর্ত্তিই আমাদিগের মানস পটে সর্ব্বাগ্রে উদিত হয়। মানস ও বিবেক, ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া সংসারের অন্তঃগুণ-ভেদ করিয়া দেখিলে দেখিতে পায় যে, প্রকৃতি আর মায়া মুগ্ধা নহেন, তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সংসারের আদি কারণ মহা-পুরুষের পূজায় আর রত নহেন, পুরুষ আর মায়ার মোহনাস্ত্র বীণা বাদনে তৎপর নহেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি মায়াবিচ্ছেদ-কারী ঘোর করবাল করে ধারণ করিয়া মায়ার প্রতিমূর্ত্তি নরনারী মুণ্ডচ্ছেদন করতঃ সুন্দর বনমালার পরিবর্ত্তে, ঐ সকল রক্তাক্ত অচির-চ্ছিন্ন মুণ্ডমালা গলদেশে দোলাইয়া বিশ্বসংসারকে স্তম্ভিত করিতেছেন। তাই কবি গানের শেষে বলিয়াছেন,—

"শ্যাম আমার শ্যামা হোল।"

শ্রীজটাধারী শর্ম্মা।

---

# মাংসাদ উদ্ভিদ।

অতি অল্প—নামমাত্র ভারে সূর্য্য শিশির-কেশ কুঞ্চিত হইয়া পড়ে অথচ অধিক ভারে তাহার কিছুই হয় না, পাঠক তুমি আশ্চর্য্য হইতেছ?

বিচিত্রতাপূর্ণ বিশ্ব ভাণ্ডারে এরূপ বিপ-রীত ধর্ম্মের একাধারে অবস্থানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আর ঈদৃশ বিষম-প্রকৃতি যে উক্ত বস্তুর পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক তদ্বিষ-য়েও সন্দেহ করিবার খুব কম কারণ আছে। আমরা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিই। বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বিকাশোন্মুখ কোরক বারি-নিষেকে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু বৃষ্টি পতনে কোরকের বিকাশে ব্যাঘাত জন্মে। কোন কোন ফুটন্ত ফুল বৃষ্টির সময় আবার মুদ্রিত হইয়া যায়। একদিকে যেমন অল্প বারি সহযোগে পুষ্প বিকাশের সাহায্য হয়, তেমনি আবার অধিক বারি-পতনে পুষ্প কুঞ্চিত হয়। এরূপ সঙ্কোচন ও প্রস্ফু-টন ক্ষমতা না থাকিলে বর্ষাকালের অনেক

ফুল এতদিন লোপ পাইয়া যাইত। কে না বুঝিবে অপেক্ষাকৃত প্রবল বৃষ্টিধারায় পুষ্পের মধু ও রেণু প্রধৌত হইয়া যাওয়া নিতান্ত সম্ভব; আর রেণু ও মধু পুষ্পের অত্যাবশ্যক উদ্ভাবন। মধু না থাকিলে কোন্ প্রজাপতি ফুটন্ত ফুলের দলোপরি উপবিষ্ট হইয়া তাহার সুচারু পক্ষে বিচিত্র বর্ণজাল বিস্তার করিবে? কোন্ মধুমক্ষিকাই বা রেণু প্রধৌত হইয়া গেলে, পুষ্পান্তরে যাইবার সময় রেণু ভূষিত হইয়া যাইবে? রেণু-বিহীন মধুবিহীন-পুষ্পের পুষ্পরূপে বৃক্ষ-শিরে সুশোভিত হইবার আবশ্যকতা বা সার্থকতা ছুই নাই। সেইরূপ সূর্য্য-শিশির যদি প্রত্যেক প্রকারের আঘাতে বা স্পর্শনে আলোড়িত হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ সময়েই তাহার ক্ষমতা অযথা-ব্যয়িত হয়; শেষে সকল ক্ষমতা হারাইয়া অক্ষম য়া অচিরে বসুন্ধরাকে স্বীয় ভার হইতে অব্যাহতি দেয়। যখন দেখা যাইতেছে বায়ু-সঞ্চালনে উহার নিজেরই এক পত্র অপরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারে, অথবা সন্নিকটস্থ কোন তৃণ বা গুল্মের পত্র দ্বারা ঘর্ষিত হইতে পারে, অথবা বায়ু সহকারে কোন কুটা উড়িয়া আসিয়া শুঁয়ায় পড়িতে পারে, অথবা বৃষ্টিধারা সবেগে শিশিরকণার কোমল-দেহে সংহত হইয়া উহাকে উত্যক্ত করিতে পারে; অথবা কোন প্রবল কীট বসিতে পারে,—এইরূপে উত্যক্ত হইবার যখন সহস্র পথ উন্মুখ, আর যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ শীকার করিবার জন্যই উহার উল্লিখিত চৈতন্য শক্তির ও তদ্ক্রিয়ার প্রয়োজন, তখন যদি না সূর্য্য-শিশির মৃদুতম ধীরতম স্পর্শন ভিন্ন অপর কোন স্পর্শনে অনালোড়িত থাকিতে পারে, তাহা হইলে উহার মঙ্গল কোথায়? যদি প্রত্যেক স্পর্শনে উহা সঙ্কুচিত হয়, এবং কীট সংহারী রস উদ্গমন করে—আর যে রস অত্যধিক পরিমাণে জমাইতে ইহারা অক্ষম—তাহা হইলে উহা যে শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া মরিয়া যাইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সহজে মরিতে কে চায়? এ সংসারে সকলেই—জীব, উদ্ভিদ সকলেই, স্ব স্ব জীবন ধারণের জন্য ব্যস্ত; সকলেই তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিতেছে। তাই সূর্য্য-শিশিরও স্বীয় জীবন ধারণার্থ এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রত্যুত ওরূপ বিষম-ধর্ম্ম একাধারে অবস্থান সূর্য্য-শিশিরের জীবিত থাকিবার প্রধানতম পন্থা।

এক্ষণে দেখা যাক্ কি প্রকারে সূর্য্য-শিশির আপনার খাদ্য সংগ্রহ ও পরিপাক করে। পাঠক! লোভে মৃত্যু ইহা চির-প্রসিদ্ধ; তথাপি লোভ সম্বরণ করিতে পারে কয়জন? আমরা যে এত জ্ঞান, বিবেক, বিবেচনা প্রভৃতি লইয়া অহঙ্কার করি, তবুও কি লোভ সামলাইতে পারি? তবে জ্ঞান-বিবেক-বিবেচনা-বিহীন মক্ষিকারা কেন সূর্য্য-শিশিরের আরক্তিম কেশ-শীর্ষস্থ মুক্তা সদৃশ উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ শিশিরকণার উপর পুনরায় অবতরণ না করিবে? সূর্য্য-শিশিরের শিশির যে, প্রকৃতির জীবন-প্রদায়ী, নির্ম্মল-নেত্র-তৃপ্তিকর, কবিচিত্তহারী-নির্দ্দোষ-শিশির-কণা নয়, অবোধ মক্ষিকা

তা কি বুঝে ? হয়ত সে মনের সুখে আনন্দে যুগ্মপক্ষ বিতান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে একটি শিশিরোপরি বসিল। কিন্তু সে কি জানে যে, তার জীবলীলার এই শেষ অভিনয় ? সে বিমল জল বিন্দুটি তার মৃত্যুর অন্যতম সোপান মাত্র ? দেখিতে দেখিতে মক্ষিকাসীন কেশগাছি গোড়া হইতে বাঁকিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ শুঁয়াদিগকেও নিজের বক্রমান বা কুঞ্চমান-শক্তি-সংক্রামিত করে। তাহারা সকলেই শনৈ শনৈ দুর্ভাগ্য মক্ষিকার উপর অবনত হয়। এইরূপে প্রথম শ্রেণীর কেশ-রাজি হইতে তন্নিকটবর্ত্তী এবং তথা হইতে তৎপর শ্রেণীর কেশরাজি দ্বারা সমাবৃত হইয়া গুটাইতে গুটাইতে নির্যাসবদ্ধ মক্ষিকাটি ক্রমে পত্রের মধ্যস্থলে নীত হয়। ইত্যবসরে কোষ বা গ্রন্থি নিচয় হইতে একপ্রকার অম্লরস নির্গত হইয়া হতভাগ্য মক্ষিকার উ-পর বর্ষিত হইতে থাকে। কৈন্দ্রিক গ্রন্থি হ-ইতে একপ্রকার কেন্দ্রপ্রসারী শক্তি বহির্গত হইয়া চতুষ্পার্শস্থ সমুদয় কেশগুলিকে নোয়া-ইয়া ফেলে। সকলেই সমবেত হইয়া স্ব স্ব সঞ্চিত রস দ্বারা আবদ্ধ মক্ষিকার অভিষেক করে। এদিকে পত্রের মধ্যদেশও বাঁকিতে বাঁকিতে একটু গর্ত্তের মতন হইয়া তখনকার মত পাকস্থলীর ন্যায় হয়। এই সমুদয় ব্যা-পার ঘটিতে চার হইতে দশ ঘণ্টা সময় লাগে। অনেকে বলেন কীটেরা এই অম্লরসে নিমজ্জিত হইয়া ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায়।

বস্তু বিশেষ-অনুসারে সূর্য্যশিশিরের স-ঙ্কোচন ও প্রসারণ কালের ব্যবধানের তারতম্য হইয়া থাকে। ক্ষার-প্রদায়ী পদার্থ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেই ইহাদের সঙ্কোচন কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে দশ দিবসের মধ্যেও পুনঃ প্রসারিত হয় না। কিন্তু যদি স্পৃষ্ট-পদার্থ ক্ষার-বিহীন হয়,—যেমন অঙ্গার, শৈবাল, কাগজ ইত্যাদি, তাহা হইলে শীঘ্রই ১৭।১৮ ঘণ্টার মধ্যে আবার পাতা খুলিতে আরম্ভ করে। একবার সঙ্কোচনের পর পত্র পুনঃ প্রসারিত হইবার সময় রস নির্গমনকারী গ্রন্থি নিচয় রস নিঃসরণ করিতে নিরত হয়। পত্রপৃষ্ঠ তখন শুষ্কভাব ধারণ করে। ক্রমে যখন পত্রটি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রসারিত হয়, তখন গ্রন্থিগুলি আবার রস জমাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রত্যেক গাছি কেশের মস্তকে শিশির বিন্দুটি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যশিশির-পত্র দ্বিতীয়বার মক্ষিকা সংহারে সক্ষম হয়। কিন্তু একটি পত্র দুই চারিবারের অধিক ঈদৃশ ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। নূতন পত্র উহার স্থানাধি-কার করে। যদিও সূর্য্য-শিশিরের কীট-সং-হারী কার্য্য এত অল্পে অল্পে সংসাধিত হয় তথাপি একটি বৃক্ষ দ্বারা কম সংখ্যক কীট নষ্ট হয় না। পণ্ডিত ডারউইন একটি পত্রে ত্রয়োদশটি মক্ষিকার মৃতাবশেষ দেখিয়া-ছিলেন। আর একটি সূর্য্য-শিশিরের সচ-রাচর ছয়টি সাতটি পাতা থাকে এবং সূর্য্য শিশির প্রচুর পরিমাণেও জন্মায়। ইহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে একটি সূর্য্য শিশির কতশত কীটের জীবন-নাশক হয়!

অপরাপর মাংসাদ উদ্ভিদ হইতে সূর্য্য-শিশিরের বিশেষ প্রভেদ এই যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে মাংস অথবা ক্ষার-সম্বলিত কোন জৈবিক পদার্থ পরিপাক করিতে পারে। জীব শরীরে যে প্রণালীতে মাংস কিম্বা তৎসদৃশ পদার্থ উহার শরীর সাধনোপযোগী উপাদানে পরিণত হয়, ঠিক সেই উপায়ে সূর্য্য-শিশিরের সাময়িক-পাকস্থলীতে মাংস পরিপাক হয়। আমাদের অপেক্ষা ডাক্তার মহাশয়েরা পরিপাক প্রণালী সম্বন্ধে ভাল করিয়া বলিতে পারেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, শুদ্ধ অম্লরস (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) বা পেপসিন সহযোগে খাদ্য হজম হইবার নয়। খাদ্য ফার্মেণ্ট অর্থাৎ পাচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কলে কৌশলে বা কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্য-শিশিরকে অম্লরস নির্গমন করান যাইতে পারে কিন্তু শুদ্ধ সে রস পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন মতেই পারে না। ক্ষার-সম্বলিত পদার্থ সহ মিলিত না হইলে ফার্মেণ্ট উপজিত হইবার অর্থাৎ খাদ্য পচিবার নয়। আর অম্লরস না থাকিলে এবং খাদ্য না পচিলে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রকৃত পরিপাক ক্রিয়া সময়-সাপেক্ষ। এই জন্য ক্ষার-বিহীন পদার্থ-সংযোগে পত্র গুটাইলে শীঘ্রই আবার উন্মুক্ত হয়। কেননা সেখানে পরিপাক করিবার কিছু তেমন থাকে না। কিন্তু জান্তব পদার্থ-সহ কুঞ্চিত হইলে পুনঃ প্রসারণ বিলম্ব-সাপেক্ষ। ডারউইন সূর্য্য-শিশিরের এই ব্যবহার দেখিয়াই প্রথমে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, হয়ত সূর্য্য-শিশিরও জন্তুদিগের ন্যায় উহার আহারীয় কীটপতঙ্গকে প্রকৃত ভাবেই পরিপাক করিতে পারে। এবং বহুল পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় অনুমানকে প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাঠক! শুনিলে হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না ডারউইন তাঁহার প্রিয় সূর্য্য-শিশিরের জন্য কেমন উপাদেয় খাদ্য ব্যবস্থা করিতেন। ডিম্বের শ্বেতাংশ, অপক্ক ও পক্ক মাংস, বিড়ালের কাণের টুকরা, কুকুরের দাঁতের চোকলা, সিদ্ধ কপি, পনীর, পুষ্পরেণু, মানুষের নখের টুকরা, বেঙের অন্ত্রের ছিলকে, মানুষের মাথার চুল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্য-শিশির পণ্ডিতবর ডারউইনের হস্ত প্রদত্ত সামগ্রী বলিয়া, তাঁর খাতিরে সকল প্রকারের, আহার্য্য অনাহার্য্য পদার্থ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উদরসাৎ করিত না। অনুরোধে পড়িয়া সে আমাদের মতন (সময়ে সময়ে) কখন "ঢেঁকি" গিলিত না। যাহা তার রুচি-সংগত হইত কিম্বা যাহা তাহার শরীর সাধনোপযোগী হইত, তাহাই সে গ্রহণ করিত। অর্থাৎ ক্ষার-সম্বলিত পদার্থ ভিন্ন আর সমুদয় দ্রব্যই অভুক্ত রাখিত।

পরিপাক ক্রিয়ার মতন, জীবদিগের শরীর-ধর্ম্মের সঙ্গে সূর্য্য শিশিরের আর একটি সামঞ্জস্য এই যে, চর্ব্বি, তৈল, পত্রের সবুজ অংশ (Chlorophyll) শ্বেতসার (Starch) মূত্র প্রভৃতি ক্ষার সংযুক্ত পদার্থ যেমন জীব পাকস্থলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক সেইরূপ সূর্য্য-শিশির কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যশিশির মাংসাদ বলিয়া যে একবারেই

মাংস ভিন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কীয় কোন বস্তু গ্রহণ করে না এমত নয়। দেখা যায়, ইহা পক্ক শাক-সবজি, পুষ্পরেণু, ফলের বীজ পরিপাক করিতে পারে। সুতরাং ইহা আমাদের অনেকের মতন আমিষ ও নিরামিষ উভয়-ভোজী। অপক্ক মাংস বা পণীর অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে অতিভোজন দোষে সূর্য্যশিশির অকালে মরিয়া যায়।

কেহ কেহ বলিতেন যে সূর্য্য-শিশির হয়ত ঔষধের ন্যায় কীট পতঙ্গ ধরিয়া খাইয়া থাকে। সেই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য ফ্রান্সিস ডারউইন (মৃত মহাত্মার পুত্র) কয়েক বৎসর হইল কতকগুলি পরীক্ষা করেন। জর্ম্মণির কতিপয় পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সকলেই পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞান বলে মুক্তকণ্ঠে, সমস্বরে ও সুদৃঢ় ভাবে বলিয়াছেন সূর্য্য-শিশিরের কীট পতঙ্গ সংহার ক্রিয়া আহারের জন্য; ঔষধার্থ নহে। ফ্রান্সিস ডারউইন দুটি ঘরে স্বতন্ত্র আধারে কতকগুলি সূর্যশিশির রাখেন। দুইটি ঘর সম্পূর্ণ রূপে বস্ত্রাবৃত, পাছে কোন উড্ডীয়মান মসা মক্ষিকা বা কীট পতিত হইয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত করে। একটি ঘরের গাছগুলিকে সিদ্ধ মাংস নিয়মিত রূপে খাওয়াইতেন। অপর ঘরের গুলিকে অমনি রাখিতেন, অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত। যথাসময়ে দুই ঘরের সূর্য্যশিশির গুলি পুষ্পিত হইল। সকল গাছের সমুদয় ফল গুলিও পরিপক্ক হইল। গাছগুলির বাড় বৃদ্ধি প্রায়ই সমান ছিল। বরং অভুক্ত-মাংস সূর্য্যশিশিরের দল, ভুক্ত-মাংস-দলগুলি অপেক্ষা আকারে একটু বড়। কিন্তু ভুক্ত-মাংস সূর্য্যশিশিরের বীজগুলি অভুক্ত-মাংস সূর্য্য শিশিরের বীজ অপেক্ষা বারগুণ ভারী।

এই চরমফল দেখিয়া বোধ হয় কেহ আর সন্দেহ করিবেন না কীট-পতঙ্গ সূর্য্যশিশিরের ভোজ্য কি ঔষধ। যদি ঔষধ হইত তাহা হইলে ভুক্ত-মাংস-সূর্য্যশিশির কখনই এত অধিক পরিমাণে এবং ঈদৃশ সারবান বীজ প্রসব করিত না। আমরা যদি স্মরণ রাখি সারবান ও অধিক সংখ্যক বীজ উৎপাদন করাই প্রত্যেক উদ্ভিদ বা জন্তুর স্বভাবগত যত্ন, এ সংসারে সকলেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উদ্যোগী, ব্যস্ত হইয়াও কেবল যোগ্যতমরাই উত্তরজীবী হয় এবং আপনাদের বংশকে স্থায়ী করিতে পারে— তাহা হইলে সহজে বুঝিতে পারিব সূর্য্য শিশির কীট-পতঙ্গ বধ করিয়া আহার করে পুষ্টিসাধনের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ নহে।

শ্রীপতি চরণ রায়

# ঠগীরহস্য।

## (দ্বিতীয় প্রসঙ্গ)

ঠগদের মধ্যে আর দুইটী বিশেষ প্রচলিত প্রথার বিবরণ দিয়া আমরা ঠগী সম্বন্ধে অন্যান্য দুই চারিটী কথা বলিব। দেবীভবানী ইহাদের উপাস্য দেবতা, কিন্তু যে প্রকারে ইহারা ভবানী পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহার সহিত প্রচলিত হিন্দু প্রথার কোন বিশেষ সংশ্রব নাই কিন্তু ইহা অতিশয় রহস্য পূর্ণ। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া আমরা থাকিতে পরিলাম না।

দেবীর পূজাকে দাক্ষিণাত্যের ঠগেরা "কোট" বলিয়া থাকে। সকল দেশের সকল শ্রেণীর ঠগই বিশেষ সমারোহ, সতর্কতা ও ভক্তির সহিত এই পূজা করিয়া থাকে; অনুষ্ঠানের বা পূজার কোন অঙ্গহীন হইলে, ইহারা চিহ্নাদি অনুসরণ করিয়া দলের শুভাশুভ নির্ণয় করে। পূজার কোন বিশেষ সময় নাই, সপ্তমী, অষ্টমী নাই; মঙ্গল ও শুক্রবার হইলেই যথেষ্ট। এই দিনে দলপতি দল হইতে কতকগুলি বাছা বাছা লোক লইয়া পূজার কার্য্যে যোগ দেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা স্বহস্তে নরহত্যা করে নাই, তাহারা এ পূজায় যোগদান করিতে বিশেষরূপে অসমর্থ। দুই তিন পুরুষে ঠগ ও নরহত্যা না করিলে কেহই দেবীর পূজার প্রসাদ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। উক্ত মঙ্গল বা শুক্রবারে, দলপতি উপরোক্ত মতে নির্ব্বাচিত লোক লইয়া একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন। পূজার প্রধান অঙ্গ, একটী সুরক্ষিত গৃহ। পূজার প্রারম্ভ হইতে সেই গৃহের দ্বার জানালাদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভিতরের ঘটনা, যদি, অনির্ব্বাচিত ঠগ, বা সাধারণ লোকে তিলমাত্র দেখিতে পায়, তবে তাহাতে দলের মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে ইহাই ঠগদিগের স্থির বিশ্বাস। সেই সুসংরক্ষিত গৃহের মধ্যস্থলটী গোময় দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই মার্জ্জনা করিয়া রাখা হয়। চাউল, ঘৃত, মসলা, মদ্য, ও বলির ছাগ ইহারা পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া সেই গৃহে রাখে। পূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চূণ ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা আমাদের পঞ্চবর্ণের গুড়ির ক্ষেত্রের ন্যায় ইহারা একটী রৈখিক ক্ষেত্র অঙ্কন করে। সে ক্ষেত্র প্রায়ই সম-চতুষ্কোণ হয়। সেই চিহ্নিত ক্ষেত্রের উপর একখানি শুভ্র চাদর পাতিয়া তাহার উপর ভাত রাঁধিয়া ঢালিয়া দেয়। এই অন্নরাশি নৈবেদ্যের মত করিয়া রাখিয়া তাহার উপর একটী "চৌমুখ" জ্বালিয়া দেয়।*

* চৌমুখ চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট প্রদীপ বিশেষ। ইহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইবার যো নাই। সচরাচর নারিকেলের মালার মধ্যভাগে, দুইটী পলিতা আড়া আড়ি ভাবে রাখিয়া তাহা ঘৃতপূর্ণ করিয়া জ্বালিয়া দেয়। নারিকেল মালার অভাবে কখনো কখনো ময়দার প্রদীপেও চলিয়া যায়।

প্রদীপটী যাহাতে নিভিয়া না যায় বা সেই অন্নরাশির উপর পড়িয়া না যায় এরূপ ভাবে তাহাকে বসান হয়। সেই অন্ন-স্তূপের নিকটে উৎসর্গীকৃত শাণিত কুঠার, দুই এক খানি ছোরা ও মদ্যাদি রাখা হয়। এ পূজার ফুল নাই, বিল্বপত্র নাই, রক্তজবা নাই, হোম নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, কেবল পৈশাচিক কাণ্ডের অনুসরণে পূজার অবসান হইয়া থাকে। সময় বুঝিয়া দুইটী কৃষ্ণবর্ণ ছাগ স্নান করাইয়া সেই গৃহ মধ্যে রাখা হয়। ইহাদের মতে বলি দ্বারা পূজাই প্রশস্ত। ফলপুষ্পে পূজা হউক আর না হউক তাহাতে ক্ষতি নাই,বলি দিলেই দেবী তাহাদের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন হন। বলির পূর্ব্বে ছাগগুলিকে স্নানকরাইয়া সেই অন্নস্তূপের নিকট দাঁড়করাইয়া রাখা হয়। যদি কোন ছাগ গা ঝাড়িয়া গায়ের জল ফেলিয়া দেয়, তখন সে বলি দেবীর গ্রহণীয়, এই বিশ্বাসে তাহারা বলিকার্য্য সমাধা করে। হিন্দু ঠগেরা তরবারির আঘাতে প্রচলিত প্রথানুসারে, ও মুসলমানেরা তাহাদের নিজ ধর্ম্মানুমোদিত প্রথানুসারে জবাই করিয়া, এই কার্য্য শেষ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাগবৎসগণ, গা ঝাড়া না দেয়, ততক্ষণ কোন মতেই তাহাদিগকে বলি দেওয়া হয় না। এরূপ স্থলে তাহারা সেবার বলি না দিয়া প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও মদিরাদি পানে সংক্ষেপে পূজার কার্য্য শেষ করে। যে বারে বলি দেওয়া হয়, সেবার উৎসর্গীকৃত মাংস রন্ধন করিয়া দেবীর প্রসাদ বলিয়া মহানন্দে মদিরা সহিত তাহার ভক্ষণ কার্য্য সমাধা হয়। নিকটে আর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে সেই নিহিত পশুর অস্থি প্রভৃতি নিক্ষেপ করে, ও আহারান্তে তথায় আচমন করিয়া থাকে। নিহিত পশুর অন্ত্রাদি এরূপ সতর্কতার সহিত পুতিয়া ফেলা হয়, যে কাহারও কোন কিছু জানিবার উপায় থাকে না। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে পূজার সময়ে অন্নরাশির উপরিস্থিত চৌমুখ-নিঃসৃত-অগ্নি দ্বারা, যদি সেই অন্ন-রাখা ধৌত বস্ত্রখানি পুড়িয়া যায়, অথবা, সমাহিত অন্ত্রাদি অপর কোন বন্য জন্তুতে ভক্ষণ করে, অথবা ভিতরের আলোক বাহির হইতে কেহ দেখিতে পায়, তবে সেই বৎসরের মধ্যে দলপতির নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, ও সমস্ত দল কোন না কোন বিপদগ্রস্ত হইয়া শীঘ্রই উন্মূলিত হইবে। বস্তুতঃ এই ঘোর তামসিকতা-ময় পূজার, সুশৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য, ঠগেরা এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সতর্ক, যে যেখানে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে প্রাণান্তেও, পূজার অনুষ্ঠান করে না। পথিমধ্যে পূজা করিবার আবশ্যকতা হইলে, ইহারা বস্ত্রের দ্বারা এক সুরক্ষিত কানাত প্রস্তুত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই পূজার ব্যয়, প্রায়ই দলপতি, বা কোন সম্ভ্রান্ত, বিত্তবান ঠগ সম্পূর্ণ রূপে বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু কখনও বা সাধারণ ঠগদের মধ্যে চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। তখন ইহাকে "পঞ্চায়েতী কোট" বলে। এই প্রকার পূজা ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্ট উপায়ে সাধারণ ঠগ সম্মত কোন প্রকার কালিকা পূজার

বিধি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তবে কালীপূজার দিন রাত্রে, ইহারা সাধারণ লোকের ন্যায়, আলোকাদি দ্বারা বাটী সুশোভিত করে, ও পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; এবং কোন পীঠস্থান বা বনমধ্যস্থ মন্দিরে কালিকা মূর্ত্তি দেখিলে ইহারা প্রত্যেকে সুবিধা মত, সাধারণ নিয়মানুসারে, পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে। আমাদের কালীঘাটের কালীকে ইহারা "কলিকাতা ওয়ালী কালী" বলিয়া উল্লেখ করে—ও এই স্থান অতিশয় পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে।

আমাদের যেমন কোন মনোরথ সিদ্ধ হইলে, মানসিক করিয়া হরির লুট বা অন্যান্য দেবতার পূজা দেওয়া হয়, ঠগেদের মধ্যে প্রত্যেক বার নরহত্যার পর, কালিকার উদ্দেশে "গুড়" উৎসর্গ বা সিন্নি দেওয়া হয়। ইহাকেই সাধারণ ঠগেরা "তুপনী" বলিয়া থাকে। প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের পর এই তুপনীর অনুষ্ঠান হওয়া চাই। ইহাতে যে বেশী খরচ পত্র হয়, এমত নহে। হত্যাকাণ্ড, ও সমাধি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে, তাহারা একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরে, বা উদ্যান মধ্যে কম্বল পাতিয়া বসে। কম্বলের উপর যাহারা নিজের হস্তে, দুই চারিজন লোক হত্যা-করিয়াছে, এইরূপ লোকই বসিতে পায়। সাধারণতঃ, ফাঁসীদারেরাই—এই কম্বলে উপবিষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ, বহুদর্শী, চিহ্নাদি বুঝিতে সক্ষম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করা হয়। এই ব্যক্তি কম্বলের মধ্য ভাগে, পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বসে, ও অন্যান্য ফাঁসীদারেরা তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে। শিক্ষানবিশ ঠগ, ও গোর খনন-কারীরা কম্বলের বাহিরে ঘিরিয়া বসে। পূজক-ঠগের সম্মুখে, পিত্তলের একখানি থালে, ১।০ পাঁচসিকার মূল্যের, শুষ্ক গুড় সঞ্চিত থাকে। তিনি সেই গুড়ের থালে একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া উৎসর্গ-কার্য্য সমাপন করেন। উৎসর্গ কালে, তিনি ভক্তিভাবে, যুক্ত করে, ঊর্দ্ধনেত্রে, ভবানীর উদ্দেশে বলেন—"দেবি, আপনি "জোরানায়েক প্রভৃতিকে যেমন সহস্র সহস্র মুদ্রা দিয়াছিলেন, আমাদের উপর দয়া-পরতন্ত্র হইয়া সেই রূপে মনস্কামনা সিদ্ধ করুন" এই প্রার্থনাবাক্য সকল ঠগই, সেই দলপতির সহিত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে থাকে। পরে সকলে চুপ করিলে, দলপতি থালা হইতে গুড় লইয়া কম্বলোপবিষ্ট হত্যাকারী ঠগদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে সম্মানিত করেন। তাহারাও নিঃশব্দে ভক্তিভাবে, পদদ্বয় ঢাকিয়া, সেই গুড় হাতে করিয়া বসিয়া থাকে। পরে দলপতি সহসা উঠিয়া যেন সত্য সত্যই হত্যা করিবার সঙ্কেত করা হইতেছে, এরূপ ভাবে, এক সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করেন। এই প্রকারে ঝিরণী * দেওয়া হইলেই সকল ঠগ নিঃশব্দে, সেই হস্তস্থিত গুড় ভক্ষণ করে। একবিন্দু মাত্র উৎসর্গীকৃত গুড়

---

* হত্যার সঙ্কেত।

ইহাদের হস্তভ্রষ্ট হয় না। অনেক স্থলে, দল ও সম্প্রদায় বিশেষে হিন্দু মুসলমান, অভিন্ন ও অসঙ্কুচিতভাবে একাসনে বসিয়া এই প্রসাদিত গুড় ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি যত উচ্চ পদস্থ, সাধু, বিদ্বান, ও ধর্ম্মপরায়ণ হউক না কেন—একবার এই দেবী প্রসাদিত গুড় খাইলেই সে ঠগী দলভুক্ত হইবেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইহারা শিক্ষানবিশ ঠগদিগকে অধিক পরিমাণে এই গুড় খাইতে দেয়।

কি করিয়া ঠগেরা হত্যাকার্য্য নির্ব্বাহ করে, এবিষয়ে দুই চারিটী কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য আরও দুই চারিটী কথা বলিব। যেমন, "রামাসিয়ানা *" দ্বারা ইহারা পরস্পরে, মনের ভাব প্রকাশ করে, অথচ কোন পথিক তাহাদের সেই আশ্চর্য্য ভাষা বুঝিতে পারে না। রাস্তায় যাইতে যাইতে কোন অপরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে, সেই ব্যক্তি ঠগ সম্প্রদায় ভুক্ত, কি সাধারণ পথিক ইহা জানিবার জন্য, দল মধ্যস্থ একজন, "আউলে ভাই রাম রাম" ও "আলি খাঁ সালাম" এই দুইটী সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করে। আগন্তুক যদি মুসলমান ঠগ হয়, তবে দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক শব্দ বুঝিতে পারিয়া তাহার উত্তর দেও, ও হিন্দু হইলে কেবল "রাম রাম" বলে। এই সঙ্কেত দ্বারা কেবল যে তাহারা ঠগ ও স্বজাতি চিনিয়া লয় তাহা নহে; সেই অপরিচিত ব্যক্তি সাধারণ-যাত্রী হইলে তাহার সঙ্গানুসরণ করিয়া সুবিধামত স্থলে তাহাকে হত্যা করে। হত্যা সঙ্কেত অনেক প্রকারের ছিল, তন্মধ্যে যেন লিখিত কয়েকটী সচরাচর ব্যবহৃত হইত।

(১) "আইয়ো হো ত ঘর্‌চলো" (২) হুক্কা ভর্ লাও (৩) তামাকু পি লেও। (৪) বিলিয়া মাজনা।—ইহা বলিলেই হত্যার সুবিধাজনক স্থান অন্বেষণ করা হইত। †

এই সকল শব্দের অর্থ অতিশয় সরল, ও কোন প্রকার সন্দেহ-জনক ছিল না। পথিকদের সঙ্গে যাইতে যাইতে হত্যাকারীরা উপযুক্ত স্থান দেখিলেই—আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে উল্লেখ করিয়া তাহার এই কয়েকটী সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করিত। হতভাগ্য সঙ্গী পথিক ইহার কিছু অর্থ না বুঝিতে পারিয়া কোন প্রকার সন্দেহ করিত না। এবং পরমুহূর্ত্তেই সে আক্রান্ত হইয়া ভূপতিত হইত। তাহাদের এই গুপ্তভাষা ছাড়া আবার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল। যখন কথা কহার সুবিধা হইত না, তখন সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ইহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। চিহ্নগুলি এই; যখন হাতের চেটো উল্টা করিয়া দাড়িতে বুলান হইত, তখন বুঁঝিতে হইবে যে দলমধ্যে কোন অপরিচিত লোক ঢুকিয়াছে। কখনও প্রকাশ্যরূপে "সেখ্‌জী," "সেখ মহম্মদ"

* ঠগেদের গোপনীয় ভাষাকে রামাসিয়ানা বলে।

† "বানিজ লাধনা" ইহাও একটী হত্যার সাঙ্কেতিক শব্দ। ইহার অর্থ বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই কর, অর্থাৎ পথিককে হত্যা কর।

লছমন সিং "ইত্যাদি সঙ্কেত দ্বারা উক্তভাব প্রকাশ করিত। আবার হাতের চেটো, সোজা করিয়া আস্তে আস্তে গালের উপর ঘসিলে বুঝাইত যে বিপদ অন্তর্হিত হইয়াছে।

হয়ত আগে কতকগুলি ঠগ একটী শীকারের সঙ্গ লইয়া দূরপথে চলিয়া গিয়াছে অথচ তাহাদের দলে লোকসংখ্যা অল্প সুতরাং কিছু বেশী লোকের আবশ্যক, তখন ইহারা রাস্তার ধূলার উপর কিছু দূর পা ঘসিয়া গিয়া একটী বক্র রেখার ন্যায় সেই ধূলিরাশির উপর চিহ্ন রাখিয়া যায়। আবার কখন বা গোড়ালি দিয়া ধূলার উপর গর্ত্ত করিয়া রাখে, এবং রাস্তায় ধূলা না থাকিলে কতকগুলি প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড উপরি উপরি রাখিয়া তাহার উপর পত্রাদি চাপা দেয়। পশ্চাতের দল আসিয়া এই চিহ্ন দেখিয়া বুঝে যে শীঘ্র গিয়া অপর দলকে ধরিতে হইবে। দুই তিনটী রাস্তা একদিকে পড়িলে তাহারা সেই তেমাথা, বা চৌমাথা রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা ধরিয়া গিয়াছে তাহার নিকটে, ভগ্ন বৃক্ষশাখা, ইষ্টকখণ্ড বা ধূলিরাশি একত্রিত করিয়া রাখিয়া যায়। ইহাতে পশ্চাতের দল সেই পথ ধরিয়া গিয়া পূর্ব্বগামী দলের সহিত মিলিত হয়। এই প্রকারে চিহ্নানুসারে মিলিত হইয়া কখন কখন তাহারা ১০।১৫ পথিককে একবারে হত্যা করিয়া ফেলে।

নির্জ্জন বন প্রদেশ, অগম্য গিরি নদীতট, কোমল মৃত্তিকাময় জাহ্নবীসৈকত ও ঝোপ জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থলই সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ঠগেরা বিশেষ মনোনীত করিত। সুবিধার অভাবে, কখনও কখনও বস্ত্রে মৃতদেহ বন্ধন করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায়, দুই তিন দিন বহন করিয়া লইয়া গিয়া সুবিধাজনক স্থলে তাহাকে সমাধিস্থ করা হইত। যদি সমাধিস্থ করিবার সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা তাহাদের সম্মুখীন হইত, তখন তাহারা সহসা এরূপ কাল্পনিক ভাব ধারণ করিয়া সেই মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া ক্রন্দন করিত—যেন, যথার্থই তাহাদের আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে, ও তাহারা তাহাকে সমাধিস্থ করিতেছে। আগন্তুক সে কান্নার চোটে সেস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কখনও বা বস্ত্রাবৃত স্থলে সমাধি খনন করিয়া অপরিচিত লোক উপস্থিত থাকিলেও, নির্ভয়ে কার্য্য সমাধা করিত। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে বলিত, এই কানাতের ভিতর আমাদের পরিবার অবস্থান করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা নিহত পথিক দেহ কখনও ফেলিয়া রাখিয়া যাইত না। ইহা দেবী কালিকার নিষিদ্ধ তাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে,ঠগদের মৃতদেহ প্রায়ই কূপমধ্যে ফেলিয়া দিত। এসকল দেশে কৃষকেরা সেই সকল কূপের জল লইয়া কৃষিকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করে। সুতরাং তাহারা প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া সেই কূপ সকল মৃতদেহ পরিপূর্ণ দেখিত। বস্তুতঃ এই সমস্ত মৃতদেহ দর্শনে তাহারা এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে স্থানীয় পুলিস বা কর্তৃপক্ষকে না জানাইয়া সেই কূপের জল তুলিয়া নিজের কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইত। জানাইলেই বা কি হইবে—

আসামীকে খুঁজিয়া পাওয়া অতি অসম্ভব। দাক্ষিণাত্যে, মধ্য প্রদেশে, বঙ্গ ও বেহার ভূমিতে ঠগের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত।

গাঙ্গ প্রদেশে, স্থলে অপেক্ষা জলে ঠগীর অংশ অধিক ছিল। ঠগদের মধ্যে দুই প্রকার গোর প্রচলিত ছিল। এক প্রকার চতুষ্কোণ, ও অপর প্রকার গোল। গোল গোরকে ইহারা "গোব্বা" বলিত। চতুষ্কোণ গোর, দীর্ঘ ৩॥০ হস্তের বেশী কখন হইত না। নিহত পথিকের হস্তপদ পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গীকৃত কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পরে সেই বিকৃত দেহ সেই স্থলে সমাধিস্থ করা হইত। ও তাহার উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া চাপিয়া দিয়া যাইত। "গোব্বার" আকার ঠিক গাড়ির চাকার ন্যায় ছিল। মধ্যভাগে মৃত্তিকার একটী গোল চাপ রাখিয়া চারিদিকে গোল গর্ত্ত খোঁড়া হইত। পরে শবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই গোল থামের চারিদিকে ঘুরাইয়া বন্ধন করিয়া তাহার উপর মাটী দেওয়া হইত। মাটী চাপার পর সেই সমাধির উপর, কতকগুলি ঈশপগুলের লতা পাতা চাপা দিয়া যাইত। তাহাদের বিশ্বাস, যে ঈশপগুলের লতার গন্ধে তরক্ষু, বন্য শৃগাল, ও কুক্কুর শবদেহলোভে সমাধি খনন করিতে পারে না।

হত্যালব্ধ দ্রব্যাদি কখনও বাটীতে গিয়া ভাগ করা হইত, আবার কখনও বা পথিমধ্যে বিভাজিত হইয়া যাইত। এটী তাহাদের ইচ্ছা ও সুবিধার উপর নির্ভর করিত। যদি নিহত ব্যক্তির বাসস্থান কোন নিকটস্থ গ্রামে এরূপ ইহারা জানিতে পারিত, তবে সেখানে দ্রব্যাদি ভাগ না করিয়া দূরে লইয়া গিয়া ভাগ করিত। পথিক যে দিকের চটী হইতে আসিয়াছে সেই দিকের কোন স্থানে এই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভাগ না করিয়া বিপরীত দিকের কোন চটীতে বা গুপ্ত স্থানে ধনবিভাগ করিত। ধন ভাগ করিবার সময়, দলপতি প্রায়ই বেশীর ভাগ (Lion's share) লইতেন। ডাক্তার সেরউডের মতে—নিম্ন-লিখিত প্রকারে তাহারা লুণ্ঠিত-দ্রব্য ভাগ করিত। শাল, রুমাল, প্রভৃতি বহু মূল্য বস্ত্র, ঘোটক, হীরক, ভাল ভাল জহরাত ও প্রস্তরাদি, স্থানীয় ক্ষমতাশালী জমীদার, সওদাগর, বা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর জন্য রাখা হইত, দলপতিও ইহার ভাগ মধ্যে মধ্যে লইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর, স্বর্ণ-রৌপ্যময় মূল্যবান দ্রব্যাদি কখনও বিক্রীত হইয়া তৎলব্ধ-অর্থ ঠগদিগের মধ্যে বিভাজিত হইত, কতকাংশ বা দৈবকার্য্যে বা ধর্ম্মকার্য্যে প্রয়োজিত হইত; আবার কিয়দংশ বা ঠগদিগের বিধবাগণের ও পিতৃমাতৃ হীন সন্তানগণের প্রতি অর্পিত হইত। কখনও বা সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য একত্রিত করিয়া জমা করা হইত। দলপতি, অর্দ্ধাংশ লইতেন, ফাঁসীদার ও যাহারা হত্যাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে তাহারা এক ভাগ, যাহারা কবর খুড়িয়াছে তাহারা এক ভাগ, ও শিক্ষানবীশ ঠগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীরা অবশিষ্টাংশ পাইত। কখনও ভাগ করিবার অসুবিধা বোধ হইলে স্ফূর্ত্তি দ্বারা ভাগ করা হইত। সকল বারেই যে তাহারা বহু মূল্য

দ্রব্য পাইত এমত নহে। কখনও বা ১০।১২ হাজার টাকার সম্পত্তি পাইত, আবার কখনও বা ২।৪ টী লোটা বা কতিপয় বস্ত্রখণ্ড লাভ করিত। ঠগদের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ পদবিভাগ ছিল। দলের সর্ব্বপ্রধান অধিনেতাকে ইহারা "সুবাদার" বলিত। এক একটী সুবাদারের অধীনে ৫।৭টী দল থাকিত। সুবাদার প্রায় সাধারণ লোকে হইতে পারিত না। কতকগুলি বিশেষ গুণ, ও বিদ্যা বুদ্ধি থাকা সুবাদারের বিশেষ আবশ্যক।

সুবাদার হইতে হইলে ভদ্র-শ্রী-সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাহুবল, তর্কশক্তি ধীরবুদ্ধি ও কূটবুদ্ধি-চালনায় পারদর্শী না হইলে কেহ এই বাঞ্ছনীয় পদলাভ করিতে পারে না। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারী বা উচ্চ পদস্থ রাজকীয়-কর্ম্মচারী, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট-আফিসারের সহিত সুবেদারের আলাপ পরিচয় থাকা বিশেষ আবশ্যক। বস্তুতঃ—সকলেরই সুবেদারকে একজন বিশিষ্ট ধনী ও ভদ্রব্যক্তি বলিয়া জানা চাই। সুবেদারের নিম্নে "জমাদার"। জমাদারেরও সুবাদারের মত অনেকগুলি গুণ চাই। জমাদারেরও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বল বিবেচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্থানীয় কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় থাকা চাই। এসকল গুণ না থাকিলে কেহ জমাদার হইতে পারে না।

জমাদারের নিম্নের বিভাগ "বক্‌শী"। হত্যাকার্য্যে সমধিক পারদর্শী না হইলে কেহ "বক্সী" হয় না। সাধারণ ঠগ বক্সী হইতে পারে, কিন্তু সুবাদার হইতে পারে না। যে ঠগ অবলীলাক্রমে বিনা সহায়তায় ঘোটকের উপর হইতে আরোহীকে টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ হতজীব করিতে পারে সেইই শীঘ্র বক্সী-পদ লাভ করে। এতদ্ভিন্ন গোর খনক, (কথোয়া), সমাধি স্থান নির্ব্বাচক, গুপ্তচর, গণক, প্রভৃতি আরও পদ বিভাগ আছে। কথোয়ার কার্য্য অতিশয় গুরুত্বসম্পন্ন। ইহাকে মৃতদেহ গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, স্বল্পখনিত স্থলে, কৌশলক্রমে সমাধিস্থ করিতে হয়। এ বিষয়ে, এতদূর ক্ষিপ্রহস্ত, ও সুকৌশলী হওয়া চাই, যে আবশ্যক বুঝিয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঠগীর কর্ম্ম বংশানুগত; ঠগের সন্তানেরাই প্রায় ঠগ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঠগেরা পোষ্য পুত্র লয়। কোন নিহত পথিকের সুশ্রী ও বুদ্ধিমান, পুত্র, বা কন্যা পাইলে, দলপতি প্রায়ই নিজ সঙ্গে লইয়া থাকে। 'একজন ঠগের দোষ স্বীকার' Confession of a thug নামক গ্রন্থের আমীরআলি (একজন বিখ্যাত ঠগ) এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ভুক্ত। কন্যা লইয়া ইহারা আপনাদের পুত্রাদির সহিত বিবাহ দেয়। সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিলেই, ইহারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষানবিসীতে প্রবেশ করায়। সকল বালকের পক্ষেই এই সাধারণ নিয়ম যে শিক্ষানবীশ না হইলে ঠগ হইবার যো নাই।

ঠগদের মতে ১০।১২ বৎসরেই বয়ঃপ্রাপ্তি হয়। এই সময়ে নৃশংসেরা সেই সুকুমারমতি বালককে সঙ্গে লইয়া হনন

কার্য্যে বহির্গত হয়। বালককে একজনের খবরদারিতে রাখা হয়। বালকের যাহা কিছু আবশ্যক সে তাহার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম সেই বালককে হত্যা ঘটনা হইতে অন্ধকারে রাখা হয়। প্রথম অবস্থায় তাহাকে কেবল লুণ্ঠিত মুদ্রা, ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য খেলানাদি ও আমোদ প্রমোদে ভুলাইয়া রাখে। ক্রমে ১০।১৫ বৎসরের হইলে একটু একটু করিয়া এই ভয়ানক দৃশ্যের একাংশ তাহার সম্মুখে উ-ন্মোচন করা হয়। অভ্যাস করাইতে করা-ইতে সংসর্গ দোষে বালকের মন এই সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় ও অভ্যস্ত হইয়া যায়। তখন নিজে হত্যা করিবার জন্য তাহার প্রবৃত্তি হয়। সে গুরুর অনুমতি লইয়া একদিন রজনীযোগে, সুবিধাক্রমে, নানাবিধ দৈব-কার্য্যের পর, চার পাঁচজন ঠগের সঙ্গে বাহির হয়, ও তাহাদের সহায়তায়, কোন পথিককে বধ করিয়া গুরুকে প্রণামাদি করে ও তুপোনী ভক্ষণ করে, ও সকলকে একটী ভোজ দেয়। এই সময় কার্য্যকৌশল ও হত্যাকার্য্যে বিশেষ নিপুণতা দেখাইতে পারিলে, গুরুজি সানন্দচিত্তে তাহাকে এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেন।

চিহ্নাদির ও স্বাভাবিক ঘটনাদির, শুভা-শুভ ফলের উপর ঠগেদের অতিশয় বিশ্বাস। সকল সময়ই ইহারা তিথি, নক্ষত্র, বার, চি-হ্নাদি দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাদি মানিয়া চলে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার অশৌচ হইলে যাত্রাদি করা বন্ধ থাকে।

কোন কোন শ্রেণীর লোককে বধ করা ঠগদের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। (১) শিখ্ (২) কলু, (৩) মেথর, (৪) ভারী (যদি গঙ্গাজল লইয়া যায়) (৫) পঙ্গু (৬) অন্ধ, (৭) খঞ্জ (৮) বালক ও স্ত্রীলোক, (১০) সূত্রধর, (১১) গীত-বাদ্য-কারী, (১২) মুসলমান ফকির। এই খানেই আমরা অনিচ্ছা সত্বে প্রধান ঠগীর বিষয় শেষ করিলাম। এক্ষণে জলপন্থী ঠগের বিষয় কিছু বলিব।

আমাদের বঙ্গভূমিতে স্থলে ঠগীর সে রূপ অধিক প্রতাপ ছিল না কিন্তু জল ভাগে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গঙ্গানদীর শেষ মোহানা, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সমস্ত পথেই এই ঠগীর চলাচল ছিল। এমন কি কলিকাতার পার্শ্ববাহিনী ভাগীরথীতেও এই ঠগীর আধিপত্য ছিল। ইহারাও তাহাদের সহযোগীদিগের ন্যায় কোন বিশেষ দলপতির অধীন হইয়া চলিত। দলপতির অধীনে, প্রায়, ১৫।১৬ খানি উর্দ্ধ সংখ্যা, ও ৫।৭ খানি নিম্ন সংখ্যায় কতকগুলি নৌকা থাকিত। এই সকল নৌকা গঙ্গার উপরে যাত্রী লইয়া তীর্থ স্থানে বা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইত। তখন রেলপথ ছিল না। পথ হাঁটিবার কষ্টের ভয়ে অনেকে নৌকাদি করিয়া একস্থান হইতে অন্যান্য স্থানে যাইত। বিশেষত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুয়ানীর এপ্রকার অবস্থা ছিল না। তখন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা যুবক, যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সকলেই তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলে যাত্রা করিতেন। ইহাদের তাহাতে

বড়ই সুবিধা হইত।* কয়েকজন বিখ্যাত বাঙ্গালী, বঙ্গভূমিতে ঠগ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন। ইহারা অনেকে বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

| নাম | বয়স | বোট | ঠগ |
|---|---|---|---|
| শ্যামাচরণ সরকার | ৬০ বৎ | ২ | ২৫ জন |
| হরি সরকার | ৬৫ ,, | ২ | ৩০ ,, |
| নারায়ণ বাবু | ৩২ | ৭ | ৫০ জন |
| দিলদার আলী | ৪০ | বোট ভাড়া করিয়া লইত | ১০,, |
| নারায়ণ বাবু | ৩০ | | ৫০ † |

এই প্রকার ব্যক্তি বিশেষের অধীনে কতকগুলি করিয়া ঠগ ও নৌকা থাকিত। ইহারা আবার প্রয়োজনীয় নৌকা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ভাড়া দিতেন। ইহাদের মধ্যেও একটী বিভিন্নতর ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা ততদূর সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ বিশিষ্ট নহে। ইহাদের দলও তত পুষ্ট হয় নাই। নৌকায় দাঁড়ি, মাজি ও মাল্লায় প্রায় ১০।১২ জন লোক থাকিত, এবং কর্ত্তারাও প্রায়ই তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্যই হউক বা তীর্থ যাত্রার জন্যই হউক, যাত্রীগণ নৌকা ভাড়া করিতে আসিলে ইহারা কৌশলে স্ব স্ব নৌকায় তাহাদিগকে তুলিয়া লইত। কখন কখন বা সন্দেহ নিরাকরণার্থে, মাজী মাল্লাগণ যাত্রী সাজিয়া বাহিরে বসিত, ও কতকগুলি লোক ভদ্র যাত্রীবেশে নৌকার ভিতরে বসিতেন। যাহারা একাকী দূরদেশে যাইত, তাহারা প্রায়ই সঙ্গী লাভের আশায় এই সকল যাত্রী-পূর্ণ নৌকায় আরোহণ করিত। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া জীবলীলা সমাপন করিত।

---

* আমরা ২।৪ বৎসর হইল একজন প্রাচীন প্রতিবাসীর মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। ইহা কতদূর সত্য ও জলপন্থী ঠগীর সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা পাঠকেরা নিজেই বিবেচনা করিবেন। তবে সে সময়ে যে প্রকার অরাজকতা ছিল, তখন এঘটনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আমরা শুনিয়াছি অনেক ধূর্ত্ত ঠগ পথিক বেশে বা স্নাতকের বেশে, স্নানের ঘাটে উপস্থিত হইত। যদি কোন স্ত্রীলোক অলঙ্কারাদি শোভিতা হইয়া স্নান করিতে জলে নামিত, তাহা হইলে, সেই দুরাত্মারা সুযোগ দেখিয়া ডুবসাঁতার দিয়া সেই জলরাশির নিম্ন হইতে সেই স্ত্রীলোকের পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। ও নিকটে তাহাদের যে নৌকা থাকিত, ঠিক সেই খানে গিয়া কৌশল ক্রমে ভাসিয়া উঠিত। পরে গহনাগুলি খুলিয়া লইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া জলে ভাসাইয়া দিত। তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে কুম্ভীরে খাইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিত। শুনা যায় যে কর্ণেল শ্লিমান, নিজে একবার স্ত্রীলোক সাজিয়া ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঘোমটা দিয়া জলে নামিয়াছিলেন। যখন তাহার পায়ে টান পড়িল তিনি সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া জল হইতে ডাঙ্গায় তুলিলেন ও পুলিষ হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।

† বর্দ্ধমানের তৎকালীন সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব এই কয়েকজন ও আর ৫।৭ জনকে জানিতেন। তিনি জলপন্থী ঠগীর অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্লিমানকে পত্র লেখেন। তাঁহার রিপোর্ট হইতে আমরা এই নাম উদ্ধৃত করিলাম।

সেই হতভাগ্য পথিককে, পূর্ব্বোক্ত ভদ্রবেশী পথিকগণ ঘেরিয়া বসিয়া, নানাপ্রকার গল্প ও আমোদ প্রমোদ করিত, এবং সুবিধা দেখিলেই তাহার উপর পড়িয়া ফাঁস দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিত, ও তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া নৌকার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বস্থ ছিদ্র দ্বারা মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিত। কদাচ অস্ত্রাঘাত কিম্বা রক্তপাত করিত না। শুল্কসংগ্রাহক কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই সকল-নৌকা তদারক করিতেন, বোধ হয় এই ভয়েই তাহারা এপ্রকার করিতে সাহস করিত না। বস্তুত এই সম্প্রদায় ইহার সহযোগীদের ন্যায় ততদূর বৃদ্ধি পায় নাই ও ইহাদের সম্বন্ধে অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা কিছু ঘটে নাই; তবে ঢাকা জেলার ২১৪টী মোকদ্দামার বিবরণ পাঠ করিলে অনেক পরিমাণে কৌতূহল নিবৃত্তি হয় বটে—কিন্তু সে সমস্ত বিষয় উদ্ধৃত করিতে গেলে পত্রিকায় আর ধরে না, সুতরাং এই খানে আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

---

# জর্জ এলিয়ট।

শিশু খৃষ্টধর্ম্ম চলিতে পা বাড়াইবা মাত্র রোম-সাম্রাজ্যের লৌহ-কপাটে তাহার মস্তক আহত হয়। পুরাতন খৃষ্ট-ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়দ্বেষী। রোম-সাম্রাজ্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নাট্যশালা। কাল-ক্রমে খৃষ্টীয়-চিন্তা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রোম-সাম্রাজ্যকে বিলোপ করিল বটে কিন্তু রোম ঘটোৎকচের ন্যায় শত্রুকুল চাপিয়া পড়িল। খৃষ্টীয়-আচার্য্যগণের চক্ষে রোমের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বাহ্য-জগতে বিস্তৃত হইল। শরীর ও বাহ্যজ্ঞান উভয়ই তাহাদিগের নিকট সেই জন্য হেয় হইয়া দাঁড়াইল। রোমের ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষের স্থলে য়ুরোপে বাহ্যজগৎ-বিদ্বেষ সিংহাসনা-ভিষিক্ত হইল। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পুরস্কার স্বরূপ খৃষ্টধর্ম্ম সাধারণকে স্বর্গ-সুখ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়মানুসারে খৃষ্ট-জগৎ দারুণ আত্মনিগ্রহী হইয়া উঠিল। কিন্তু এই আত্মনিগ্রহের মূলে অহংকার, বিষয়-স্পৃহা। Thy father in heaven will reward thee—'তোমার স্বর্গের পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন'—ইহাই সকলের লক্ষ্য হইল। খৃষ্টীয়ানেরা স্মরণ করিলেন না যে খৃষ্ট নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন যে আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

"I was an hungered, and ye gave me meat: I was thirsty and ye gave me drink: I was a stranger and ye took me in: Naked and ye clothed me: I was sick and ye visited me: I was in prison, and ye came unto

me...... Lord, when saw we thee an hungered and fed thee? or thirsty and gave thee drink? or when saw we thee sick or in prison, and came unto thee?......Verily I say unto you in as much as ye have done it unto one of the least of these my brethern, ye have done it unto me." *

"আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম আমাকে অন্ন দিয়াছ, তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম আমাকে পানীয় দিয়াছ, আমি একজন অপরিচিত পথিক আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, আমি বস্ত্রহীন আমাকে বস্ত্র দিয়াছ; আমি পীড়িত ছিলাম আমাকে দেখিতে গিয়াছ—আমি বন্দী ছিলাম আমার কাছে গিয়াছ। * * * প্রভু, কিন্তু আমরা কবে তোমার ক্ষুধার সময় আহার দিয়াছি, তৃষ্ণার সময় জল দিয়াছি—পীড়ার সময় বা কারাগারে দেখিতে গিয়াছি। * * (ক্রাইষ্ট উত্তর করিলেন) ইহা নিশ্চিৎ জানিও, যখন তোমরা আমার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে অতি তুচ্ছ এক ব্যক্তিরও প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছ তখন তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।"

খৃষ্টীয় আচার্য্যগণ খৃষ্টের যথার্থ শিক্ষা ভুলিয়া দণ্ড ও পুরস্কার বিধানের উপর নীতির ভিত্তি স্থাপিত করিলেন। Sermon on the Mount অর্থাৎ খৃষ্ট পর্ব্বতের উপর হইতে তাহাদের যে উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহাদের নীতির মূলমন্ত্র। তাঁহারা দেখিলেন না যে খৃষ্ট তৎসম-সাময়িক উন্নত-শ্রেণীর-ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু ইতর-জনগণের মধ্যে নীতি-সংস্কার-কার্য্য আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রেনা ইহা সুন্দররূপ দেখাইয়াছেন। এ নিমিত্তই খৃষ্টের শিষ্যেরা খৃষ্টের উন্নত-নীতি-সম্বন্ধীয় বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। এস্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে মধ্যে মধ্যে দু এক জন খৃষ্টীয় মহাপুরুষ খৃষ্টের বাক্য—তোমার স্বর্গের পিতাকে তোমার আদর্শকরে—Be as perfect as thy Father in Heaven—ইহা লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন। গর্ডনের ন্যায় তাঁহারাও বলিয়াছেন যে স্বর্গের পিতা যে নিরবচ্ছিন্ন আমাদের কল্যাণ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে তিনি কি পুরস্কার প্রত্যাশা করেন? আমরা যদি তাঁহার ন্যায় সম্পূর্ণ হইতে চাহি তবে সর্ব্বাগ্রে পুরস্কারের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সে যাহা হউক ইহা নিশ্চিৎ যে খৃষ্টীয়-নীতি পুরস্কার ও দণ্ড বিধানের উপর অবস্থিত। এরূপ নীতির প্রধান দোষ এই যে ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কল্যাণ বিনা-যুক্তিতে মানিয়া লয়। পৃথিবীতে অকল্যাণের অভাব নাই। তবে কি নিমিত্ত স্বীকার করিব যে ঈশ্বরের ইচ্ছা কল্যাণময়। যদি বলা যায়, যাহা দৃষ্টতঃ অকল্যাণ তাহা বস্তুত কল্যাণ, তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে যাহা দৃষ্টত কল্যাণ তাহা বস্তুতঃ অকল্যাণ। যুক্তির কাঁটা উভয় দিকেই সমান ভাবে ঝুঁকিতেছে। য়ুরোপের মধ্যযুগে চিন্তার দাসত্ব

* (Matt. XXV. 35—40.)

কালে একথা কাহারো মুখে নিঃসৃত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে চিন্তা স্বাধীনত্ব লাভ করিলে, ইহা অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপীয় চিন্তার এই দ্বিতীয় প্রতিঘাত প্রধানত নীতিমূলক নহে।

খৃষ্টীয়ান দার্শনিকেরা য়ুরোপ-ইতিহাসের মধ্যযুগে বাহ্য-জগত-দ্বেষে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হন। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকলই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য। পাদরি ফেরারকে যখন তাহার শিষ্য বলিল—"গুরুদেব, দূরবীন সহযোগে আমি সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিয়াছি।" পাদরি বলিলেন, "বাবা, আমি অনেকবার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি সূর্য্যের কলঙ্কের কথা কোথাও দেখি নাই। সুতরাং কলঙ্ক তোমার চক্ষে সূর্য্যে নহে।" এদিকে সেণ্ট টমাস্ একাইনস্ সূক্ষ্ম-চিন্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে বসিলেন সূচাগ্রে কয়জন স্বর্গদূত নাচিতে পারে। এইরূপ অসার-কল্পনার প্রতিঘাতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জন্ম হয়। যথার্থতঃ দেকার্ত্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রণেতা। যদিও তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও নেতৃত্বে বিশ্বাস করিতেন তথাপি তিনি প্রথমতঃ বিশ্বসংসারের Mechanical Theoryর (বিশ্বসংসার যন্ত্রের মতন পরিচালিত হইতেছে এই রূপ বৈশ্বযন্ত্রিক-সিদ্ধান্ত) অবতারনা করেন। প্রতিঘাতের নিয়মানুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞান অন্তর-জগৎকে সর্ব্বতোভাবে অবজ্ঞা করিল এবং নীতি সম্বন্ধে Utilitarianism (সুখবাদী-নীতি-প্রসব করিল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সুখবাদীনীতির মূল্ল সত্যের উপর অবস্থিত। যাহা সুখ-করী তাহা কর্ত্তব্য—ইহা ন্যায়-দ্রোহী ভিন্ন সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে এই নীতির সকল যুক্তিগুলিই যে অক্ষুণ্ণ তাহা নহে। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সুখ মানসিক অবস্থা, উহার সহবাসী বস্তু দ্বারা উহা পরিমিত হইতে পারে না। এক বস্তুতে সকলের সমান সুখ উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহযোগে সুখকরীনীতি অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের অক্ষুণ্ণ-বিস্ফুরণই সুখ,—বাধার অভাবই সুখ। সুতরাং সুখ-পরিমিতির দুইটি অঙ্গ,—বিস্ফুরণ-কার্য্যে নিযুক্ত-বৃত্তির সংখ্যা ও তাহাদের বিস্ফুরণের সময়। সর্ব্বাগ্রে দেখা যায় যে ডার্ব্বিনের বিবর্ত্তবাদে মনুষ্য হৃদয়ের সমূহ-বৃত্তির হিসাব লওয়া হয় নাই। সুযোগ্যের সংরক্ষণ (Survival of the fittest) এই নিয়মেই যদি প্রকৃতির গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তবে অযোগ্য, বৃদ্ধ, রুগ্ন, প্রভৃতির সংরক্ষণ-বৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ে কিরূপে উদিত হইল। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানে এযুক্তিকে ভাল করিয়া ফুটাইতে পারিলাম না। ইটন্ তাঁহার Theism and Evolution গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব মানেন তাহাদের নিকট সুখকরীনীতির অপ্রশস্ততা প্রমাণ অপেক্ষা করে না।

কণ্ট ও জর্জ এলিয়ট বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পক্ষ-সমর্থক হইয়াও অজ্ঞাতসারে দেখাইয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা নীতি-সংস্থাপনে অপারগ। পক্ষান্তরে তাঁহারা মনুষ্য-

প্রকৃতির বহুকাল-সুষুপ্ত-মহত্ব জাগাইয়া স্বার্থপর, বিনিময়-মূলক নীতির পিঞ্জর ভাঙ্গিয়াছেন। গ্যাটা, কণ্ট, কার্লাইল এমার্ষণ, জর্জ এলিয়ট্—এই মহৎকার্য্য সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রদর্শিত পথ এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। ইহাঁদের প্রসাদে নীতির ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের প্রাচীন-ধর্ম্ম-অধ্যয়নব্যতীত য়ুরোপের নৈতিক প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। জর্জ এলিয়টের নীতির আদর্শ অতি উচ্চ, বিশুদ্ধ ও স্বার্থ শূন্য। কিন্তু ইহার যুক্তি-গত কতকগুলি দোষ আছে। অসার-যুক্তির উপর সত্যের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের এক দৃষ্টান্ত স্থল কমটের 'মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম' Religion of Humanity। বিনিময়-মূলক নীতির বিরুদ্ধে জর্জ এলিয়টের উক্তি নিম্নেউদ্ধৃত হইল।

তিনি বলিতেন যে মানুষের আত্মার অমরত্বের সম্ভাবনা অতি অল্প এ অবস্থায় মানুষের মনে এই বিশ্বাসটি জন্মাইতে চেষ্টা করা নিতান্ত অন্যায়—অন্ততঃ স্বজাতির প্রতি প্রেম ও করুণাই যখন সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক হইতে পারে, তখন পরকালের পুরস্কারের প্রলোভনকে এই পদে অভিষিক্ত করা নিতান্তই অন্যায়। অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, সুদূর-ভবিষ্যতের আশায়, পুণ্য ভ্রমে প্রত্যক্ষ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভাল, (যেমন স্বর্গলাভের আশায় মুসলমানদের কাফের মারা) না—ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া প্রত্যক্ষ যাহা পুণ্যময় তাহাই অনুষ্ঠেয় জ্ঞান করা, প্রত্যক্ষ যাহা পাপময় তাহাই ত্যজ্য মনে করা, প্রত্যক্ষ যাহারা প্রেম ভক্তি অনুরাগের যোগ্যপাত্র তাহাদের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করা ভাল ? *

ওয়েষ্টমিনিষ্টর রিবিউতে Worldliness and other worldliness শীর্ষক প্রবন্ধে জর্জ এলিয়ট উত্তাপ-লোহিত বাক্যে বলিয়াছেন—"যে বৃত্তি আমাদের পর কালের আশায় কার্য্য করায় সে বৃত্তি যথার্থ পুণ্যময় বৃত্তি নহে, কেননা সে বৃত্তি আমাদের স্বার্থময়; যে বৃত্তি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরের জন্য কার্য্য করায় তাহার মত ইহা উন্নত নহে। আত্মা নশ্বর, আমরা দুদিনের জন্য এখানে আসিয়াছি, দুদিন পরে লোপ পাইব, আমাদের প্রাণের ভালবাসার লোক, আর দুঃখ-তাপদগ্ধ অসংখ্য মনুষ্য—এই পৃথি-

* She held that there was so little chance of man's immortality that it was a grievous error to flatter him with such a belief; a grievous error at least to distract him with promises of future recompense from the urgent and obvious motives of well-doing—our love and pity for our followmen. She repelled "that impiety toward the present and the visible, which flies for its motives and sanctities, and its religion to the remote, the vague and the unknown" as contrasted with that genuine love which cherishes things in proportion to their nearness and feels its reverence grow in proportion to the intimacy of its knowledge.—Myers's Essay on George Eliot.

বীর জীবনে সকলেরি জীবন অবসান, এই বিশ্বাসের মধ্যে যে একটি গভীর করুণ-ভাব নিহিত আছে, পরলোকের বিশ্বাস না রাখিয়াও কেবল সেই ভাবটি হইতে যে অনেকে নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে পা-রেন ইহা মনে ধারণা করা যাইতে পারে।*

অন্যত্র এই চিন্তা অনুক্রমে জর্জ এলি-য়ট লিখিয়াছেন—

মানুষকে এমন অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, যাহার নিমিত্ত সে কখনো জীবনে পুর-স্কার পায় না এবং পাইতে পারে না, ইহা একটি মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্ম। সুতরাং এ-কষ্ট আমাদের ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু দুঃখ ভোগের প্রতিদানে সুখ পাইবে এইরূপ মিথ্যা সা-ন্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া অনেকে উক্ত শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন। এই মিথ্যা বিশ্বাস-যাহা বদ্ধমূল থাকায় আমরা পরের দুঃখের সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, তাহা যদি সমূলে উৎপাটন করা যায়, তাহা হইলে আমার মনে হয় স্বজাতি স্নেহ, স্বজাতিপ্রেম আরো বর্দ্ধিত হয়। †

একথা কণ্টের শিষ্যদিগের সর্ব্বতোভাবে সমুপযুক্ত। কণ্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—Notre vrai distince est se compose de resignation et d'activite',—কার্য্য-কারী-ভাব এবং বৈরাগ্য-ভাব এই দুই ভাব-দ্বারা আমাদের যথার্থ অদৃষ্ট গঠিত। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনং।

কণ্ট ও জর্জ এলিয়টকে তুলনা করিলে দেখা যায় যে কণ্ট, ভাষা প্রয়োগে অপ-টুত্ব-হেতু বোজাইয়া-জাহাজের মত গভীর সমুদ্রেই আবদ্ধ আছেন। জর্জ এলিয়ট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৌকার বহর লইয়া বা-ণিজ্য-দ্রব্য মনুষ্য হৃদয়ের বন্দরে আনিতে সক্ষম। উপরে উদ্ধৃত কণ্টের উক্তি কিরূপে জর্জ এলিয়ট জীবন্ত ও কার্য্যক্ষম করিয়াছেন দেখা যাউক—

This conscious kind of false

---

* The emotion which prompts it (other—worldliness) is not truly moral,—is still in the stage of egoism, and has not yet obtained the higher development of sympathy··· It is conceivable that in some minds the deep pathos lying in the thought of human mortality—that we are here for a little while and then vanish away, that this earthly life is all that is given to our loved ones and our many suffering fellow men lies—nearer the fountain of moral emotion than the conception of extended existence.

† Resignation to trial which can never have a personal compensation, is a part of our life's task which has been too much obscured for us by unveracious attempts at universal consolation. I think we should be more tender to each other while we live, if that wretched falsity which makes men quite comfortable about their fellow's troubles more thoroughly got rid of.—Cross's Life of George Eliot. Vol 1. p. 376.

life that is ever and anon endeavouring to form itself within us and eat away our true life, will be overcome by continued accession of vitality by our perpetual increase in the 'quantity of existence,' as Foster calls it. Creation is the super-added life of the intellect: sympathy, all embracing love, the super-added moral life. These given more and more abundantly, I feel that all the demons, which are but my own egotism, mopping and mowing and gibbering would vainsh away, and there would be no place for them.—

Vol 1 p. 176.

ইহার মর্ম্ম এই, আমাদের যথার্থ জীবন, অর্থাৎ জীবনের যাহা যথার্থ উদ্দেশ্য তাহার উপর একটা মিথ্যা জীবনের ভাণ গঠিত হইয়া সে জীবন ঢাকিয়া ফেলিতেছে,তাহাকে একেবারে নষ্ট করিতেছে। ক্রমাগত সৎকর্ম্ম দ্বারা আধ্যাত্মিক তেজ সঞ্চয় করাই সেই ভাণ-জীবনকে নষ্ট করার একমাত্র উপায়। সৃষ্টি অর্থাৎ বাহ্য জগৎ বুদ্ধির খোরাক, প্রেম ধর্ম্মের খোরাক। এই দুইটি আমরা যতই অধিক পরিমাণে লাভ করিব অহংকার সয়তান ততই আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে"।

হিন্দু সন্তানেরা দেখিবেন ইংরাজ-কন্যা এস্থানে কিরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছেন। শুষ্ক-জ্ঞান-সঞ্চয় মরুভূমিতে জলসিঞ্চন মাত্র। কার্য্যে-অপরিণত পরোক্ষজ্ঞান কখনো ফলবান হয় না।

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বা খিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নরাজা ভবিতুমর্হতি॥

জর্জ এলিয়টের প্রদর্শিত নীতির সম্যক অবগতির জন্য তাঁহার অনেকগুলি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু ভরষা করি কর্ম্মফল সম্বন্ধে অপর একটি উক্তির উদ্ধার মার্জ্জনীয় হইবে। তিনি বলিতেছেন।

"এই সত্য সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে কার্য্য-কারণের কঠোর অখণ্ডনীয় সম্পর্ক জানা আবশ্যক। এই নিয়মের উপর বহির্জগতের বিজ্ঞানের মূল-স্থাপিত, কিন্তু সহস্র সহস্র প্রমাণ সত্বেও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র মনোজগতকে ইহার শাসনাধীন বলিয়া মানিতে চাহেন না। যদি এ সত্যে বিশ্বাস না কর—অর্থাৎ বহির্জগতের ন্যায় মনোজগৎও কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন ইহা না মান তাহা হইলে অভিজ্ঞতার কোন মূল্য থাকে না! ঈশ্বর এই কার্য্য করিতে বলিতেছেন, এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন এইরূপ বুঝিয়া যে আমরা কার্য্য করি তাহা গ্রীক এবং হিব্রু পাঠের ফল নহে। (স্যাকসনদের ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রীক ও হিব্রু ভাষাতেই প্রথম লিখিত হয়)। ইহা কঠোর কার্য্য কারণ নিয়মে বিশ্বাসের ফল মাত্র। যতই দিন যাইতেছে ততই ইহার প্রমাণ নিস্তেজ না হইয়া বরং বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

অতএব এই নিয়ম অনুসন্ধান করা এবং এই নিয়মে কার্য্য করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাস দ্বারা ভাবী-মনুষ্য কতদূর মহৎ ও

উন্নত হইতে পারে তাহা আমাদের গোচর হয় এবং ইতিহাসের যে সমস্ত অধ্যায় পূর্ব্বে নীরস বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, নূতন আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করি—কেননা পূর্ব্বকালে মনুষ্য উন্নতির এক এক সোপানে উঠিতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে আমরা আমাদিগের ভিতর সেইজ্ঞান বর্ত্তিয়াছে দেখিতে পাই। দুর্ব্বল এবং অজ্ঞ মনুষ্য জাতির প্রত্যেক ভুলকে এক একটি পরীক্ষা বলিয়া মনে করিতে পারি—এবং সে পরীক্ষার ফল আমরা ইচ্ছা করিলে লাভ করিতে পারি। *

জর্জ এলিয়ট, কম্‌ট, ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের প্রদর্শিত নীতির দুইটি প্রধান দোষ। প্রথম, যৌক্তিক। দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক। মস্তিষ্কজাত চিন্তার বংশপরম্পরা ক্রমে ধারাবাহিত্ব-ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনশ্বরত্ব মনুষ্যের সম্ভবপর নহে—ইহাই উপরিউক্ত সুধীগণের একটী মূল মন্ত্র। এই হেতু হইতে ইহাঁরা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতি সাধনে যত্নশীলতা অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থানে সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ সত্য হইলেও হেতু ন্যায়সঙ্গত নহে। মনুষ্যজাতির সুখ বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইব কেন? দু'দিনের জন্য মাত্র এই জীবন, যাহাতে একটা দিন সুখে কাটিয়া যায় তাহাই কর্ত্তব্য। চক্ষু মুদিলে পর অন্যের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা ভাবিয়া মস্তিষ্ক ঘুরাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর পর ভাল

* The master-key to this revelation is the recognition of the presence of undeviating laws in the material and moral world—of that invariability of sequence which is acknowledged to be the basis of physical science, but which is still perversely ignored in our organization, our ethics and religion. It is this invariability of sequence which alone can give value to experience, and render education in the true sense possible. The divine yea and nay, the seal of prohibition and sanction, are effectually impressed on human deeds and aspirations, not by means of Greek and Hebrew, but by that inexorable law of consequences, of which evidence is confirmed instead of weakened as the ages advance; and human duty consists in the earnest study of this law and patient obedience to its teaching. While this belief sheds a bright beam of promise on the future career of our race, it lights up what once seemed the dreariest region of history with new interest; every past phase of human development is part of that education of the race in which we are sharing; every mistake, every absurdity into which poor human nature has fallen may be looked upon as an experiment of which we may reap the benefit—Review of Mackay's "Progress of the Intellect" (Westminister Review, January, 1851.)

মন্দ কে দেখিতে আসিবে? ইহা স্পষ্ট যে, মৃত্যুতেই মনুষ্য জীবনের শেষ এই বিশ্বাস নীতি প্রবর্ত্তনা করিতে শক্তি-হীন। পরোপ-কার-চিকীর্ষার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। সত্য বটে যে হিত-চিকীর্ষ-হৃদয় উক্ত বিশ্বাস দ্বারা অধিকতর উদ্যমে পরহিতে নিযুক্ত হইবে। কিন্তু উহাতে হিত-চিকীর্ষা উৎপন্ন হইবে না। ইহা দ্বারা নৈতিক আজ্ঞা (categorical imperative) সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে। নীতিচর্চ্চা একটা খেয়ালের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে দেখা যায় যে এক দিন না এক দিন মনুষ্যজাতির অবশ্যই বিনাশ হইবে। সর উইলিয়ম টমসনের এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত এখনও অচল রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যজাতিকে বলিদানের পশুর মত পরিপুষ্ট করিবার আবশ্যক কি? আশু বিনাশইত সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। মৃত অধ্যাপক ক্লিফর্ড এ যুক্তির উল্লেখ করিয়া—এসকল বড় মন্দ চিন্তা—these are sad thoughts—বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জর্জ এলিয়ট বলিতেছেন—

"মনুষ্যজাতির চিরজীবন এই যে দারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ইহার অবসানের একমাত্র উপায় আছে। যদিও তাহা অতি ভয়ঙ্কর, জর্জ এলিয়ট তথাপি তাহা যুক্তি-যুক্ত মনে করিতেন। সে উপায় কি—না সমগ্র মনুষ্য জাতির এক সময়ে আত্মহত্যা। †

যদি সমূলে বিনাশই মনুষ্য পরিবারের শেষ গতি—তবে যাহারা জর্জ এলিয়টের মতে আত্ম-ত্যাগী ও পরহিতকারী, তাঁহাদের এক ঘাতক-সম্প্রদায় সজ্জিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যমণ্ডলী অজ্ঞতা হেতু এই যে দুঃখের সহিত অসম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত,তাহার শেষ করিতে কাহার না বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য? বর্ত্তমানবিজ্ঞান জড়পদার্থের গতি-ভেদে চরাচর জগতের বৈচিত্র্য প্রমাণ করিতে গিয়া নীতি-তত্ব বিষয়ে আপনার অপটুত্বের পরিচয় দিয়াছে। কণ্ট,জর্জ এলিয়ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানের পক্ষ-সমর্থী হইয়াও দুর্গের ভিতর হইতে বারুদের ঘরে আগুণ দিয়াছেন। বিশ্ব-যান্ত্রিক নিয়ম (mechanical theory) দ্বারা বিজ্ঞান মনুষ্য-প্রকৃতির সম্পূর্ণ হিসাব দিতে অক্ষম, মনুষ্য-প্রকৃতির অন্তর্গত অনেকগুলি বৃত্তি বৈজ্ঞানিক শ্রেণীভুক্ত নহে, যথা সৌন্দর্য্যাভিলাষ (aesthetic sense) প্রয়োজন-বিচার (teleological sense) ইত্যাদি। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট দেখাইয়াছেন যে শুদ্ধ যান্ত্রিক-নিয়মে জগৎ-রহস্য ভেদ হয় না। কিন্তু কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনাকে, বাহ্য-জগৎ-সম্ভূত (objective) ও অপর কতকগুলিকে আত্মসম্ভূত চিন্তার কার্য্য (subjective operation of thought)

†She Saw the sombre reasonableness of that grim plan which suggests that the world's life-long struggle might best be ended—not indeed by individual desertions, but by the moving off of the whole great army from the field of its unequal war—by the simultaneous suicide of the race of Man.—Myers's Essay on George Eliot.

বলিয়া কাণ্ট যে হতাদর করিয়াছেন তাহাতে এক মত হওয়া যায় না। এই (subjective operation of thought) আত্মসম্ভূত-চিন্তার কার্য্য ব্যতীত বাহ্য জগতের পরিদৃশ্যমান অবস্থা লুপ্ত হইয়া কেবল প্রত্যাহৃত কল্পনামাত্র থাকে, সুতরাং কাণ্টকৃত প্রভেদের কোন অর্থ নাই। বাহ্য জগৎকে যত দূর সত্য বলিবে অন্ত র্জগৎকে অন্ততঃ তত-দূর সত্য বলিতে হইবে। জগৎ প্রহেলিকা ভেদ করা দর্শন-শাস্ত্রের সাধ্য সুতরাং জগতের প্রত্যেক মাল-মসলা (ingredient) দর্শনের নিকট সমান দরের। এ নিমিত্ত সাংখ্য দর্শন-শাস্ত্রের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক আমরা দেখিতেছি যে জড়বাদী-বিজ্ঞান নৈতিক-বিধাতা হইতে পারে না এবং কণ্ট ও জর্জ এলিয়ট এ বিষয়ে বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে বিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বিখ্যাত জীবিত দার্শনিক হার্টমান অন্য-দিক হইতে তূরীয় জড়ত্ববাদ (transcendental materialism) দ্বারা এক আশ্চর্য্যনীতির আবিষ্কার করিয়াছেন। জর্মান সপেনহাবর-ক্লবের ইনি নেতা। বন্ধু প্রমুখে শুনিয়াছি যে ইহাঁরা তিনটি ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম, দার-পরিত্যাগ; দ্বিতীয়, পরোপকারবিরতি, তৃতীয়, যথাসাধ্য স্থখ-সঞ্চয়। জড়ত্ববাদের ইহাই ন্যায় সঙ্গত পরিণতি। ইহার বিপরীত গতি দ্বারাই জর্জ এলিয়ট ও কণ্ট জড়বাদের অসার-বত্তা দেখাইয়াছেন।

প্রস্তাব সমাপন কালে অপর একটা কথা বলিতে হইবে। কণ্ট, কার্লাইল, জর্জ এলিয়ট ও গ্যটা, যে বৈরাগ্যের স্তব করিয়াছেন আধ্যাত্মিক পক্ষ হইতে তাহা অতিশয় ক্ষুণ্ণ। আমরা দেখিয়াছি কার্লাইল স্থখ-স্পৃহাকে পদচ্যুত করিয়া আনন্দকে (Blessedness কে) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এই (Blessedness) আনন্দ যে কি তাহার কুত্রাপি সংবাদ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কার্লাইল য়ূরোপীয় বৈরাগ্যবাদের মুখপত্র। জড়বাদগ্রস্ত য়ূরোপে কেহই বৈরাগ্যের শান্তমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। একথা কোনও য়ূরোপীয়ের মুখে শুনা যায় না যে

নিত্য শুদ্ধ বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥

*　　*　　*

শুদ্ধ চৈতন্যরূপোঽহং আত্মারামোঽহমেব চ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহং অহমেবাহং অব্যয়ঃ॥

গভীর উপনিষদ-বাণী য়ূরোপের হৃদয় আকাশে ধ্বনিত হয় নাই। দার্শনিক সপেনহাবর সত্যের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছেন মাত্র প্রসন্ন মুখ তাঁহার নিকট প্রকাশ পায় নাই। উপনিষদে গায়িত হইতেছে

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

*　　*　　*

কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষআকাশ-আনন্দোনস্যাৎ।

কিন্তু সপেনহাবরের কর্ণে এ তান পশে নাই—তিনি সত্যের আনন্দ-গীত শ্রবণে বধীর। কার্লাইলের বাক্যে ইহাঁরা চিরান্ধকার (Eternal Nay) রাজ্যে বাস করিতেছেন; অনন্তের জ্যোতি (Eternal yea) ইহাঁদের অন্ধ চক্ষে পড়িতেছে।

# আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

## ইন্দ্র।

শচী-পতি ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া, তাঁহাদের নিকট ঐ নিরুদ্বেগ-পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ যত্ন পূর্ব্বক যাচ্ঞা করিলেন। নাসত্যদ্বয় সত্যসন্ধ ইন্দ্র কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া যথা-অধীত-আয়ুর্ব্বেদ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, অতঃপর আত্রেয়-প্রমুখ বহু মুনিকে অধ্যয়ন করাইলেন।

সংদৃশ্য দস্রয়ো"রিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্।
আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥
নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ।
আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥
নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ
অধ্যাপয়ামাস বহুনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্।

(ভাবপ্রকাশ)—

প্রাচীন-সংহিতা প্রভৃতি এবং সংগ্রহ প্রভৃতিতে ইন্দ্র-নির্ম্মিত বহুবিধ ঔষধাদি দৃষ্ট হয়।—

ইন্দ্র, হিমালয় পর্ব্বতে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অমিত, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বামদেব ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(চরক, চিকিৎসাস্থান ১ম অধ্যায় ৪র্থ রসায়ন-পাদ দ্রষ্টব্য।)

---

## দেব-ধন্বন্তরি।

যিনি ক্ষীরসমুদ্র মন্থন-সময়ে অমৃত-কমণ্ডলু সহিত উত্থিত হয়েন তিনি দেব ধন্বন্তরি।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে বিষ্ণু ষষ্ঠবারে দেব ধন্বন্তরি এবং সপ্তম বারে কাশিরাজ ধন্বন্তরি রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সমুদ্র মথনোত্থিত অমৃত-কমণ্ডলুধারী দেব ধন্বন্তরি দ্বিভুজ-শ্যামবর্ণ এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তথাহি

ষষ্ঠেচ সপ্তমে চায়ং দ্বিধাভির্ভাবমাগতঃ।
ষষ্ঠেন্তরেঽব্ধিমথনাদ্ধৃতামৃতকমণ্ডলুঃ॥
উদ্গতো দ্বিভুজঃ শ্যাম আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ।
সপ্তমেচ তথারূপ কাশীরাজ সুতোভবৎ॥

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়ে দেব ধন্বন্তরিকে বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার বলা হইয়াছে:—

"ধান্বন্তরং দ্বাদশমং * * * *।" আবার আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষিগণ দেব ধন্বন্তরিকে চতুর্ভুজ বলিয়াছেন। যথা—

ক্ষীরাব্ধেরুত্থিতং দেবং
পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজং।
বন্দে ধন্বন্তরিং ভক্ত্যা
নানা গত নিসূদনং॥

(প্রাচীন মধুমতী ধৃত মুনি বচন)

ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে লিখিত আছে, অমৃতার্থী কশ্যপগণ-কর্তৃক সমুদ্র মন্থন সময়ে

এক পরম অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হয়েন। তিনি দীর্ঘ অথচ স্থূল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, কম্বু-গ্রীব, অরুণলোচন, শ্যামবর্ণ, তরুণ, মালা-ধারী, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, পীতাম্বর, মহোরস্ক, বিশোধিত মণিকুণ্ডলধারী, বলয় ভূষিত এবং কীর্ত্তিমান। তাঁহার সিংহের ন্যায় বিক্রম ও কেশের অন্তভাগ স্নিগ্ধ এবং কুঞ্চিত। তিনি অমৃতপূর্ণ-কলস ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশসম্ভূত এবং পরম ভাগবৎ। তিনি ধন্বন্তরি নামে খ্যাত ও আয়ুর্ব্বেদের সুদূরদর্শী গুরু ছিলেন। তথাহিঃ—

অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈ রমৃতার্থিভিঃ
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ।
দীর্ঘঃপীবরদোর্দ্দণ্ডঃকম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তঃ সুভগঃ সিংহবিক্রমঃ।
অমৃতাপূর্ণকলস সংবিভ্রদ্বলয় ভূষিতঃ।
সবৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ দৃগিজ্যভাক্॥

ভাগবতের নবম স্কন্ধে লিখিত আছে।

ধন্বন্তরি সুদীর্ঘ, আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক, যজ্ঞভুক ও বাসুদেবাংশ ছিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করা মাত্র রোগ সকল বিনষ্ট হয়।—

ধন্বন্তরি দীর্ঘতম আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তকঃ।
যজ্ঞভুংগাসু দেবার্ত্তশঃ স্মৃতমাত্রান্তি নাশনঃ॥

বাল্মীকি রামায়ণে ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদময় "এবং বঙ্গদেশ প্রচলিত রামায়ণে" বৈদ্য-রাজ "বলিয়া লেখা আছে।" *

যে ক্ষীরসমুদ্রোত্থিত দেব ধন্বন্তরি আয়ু-র্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ও আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব তিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি-কল্পে কি করিয়া গিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইবেন। কিন্তু এ কথার সদুত্তর প্রাচীন সংহিতা বা পুরাণাদিতে স্পষ্টভাষায় কিছুই পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে সূর্য্যের ষোলজন শিষ্যের মধ্যে ধন্বন্তরি চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, দিবোদাস চিকিৎসা-দর্পণ ও কাশীরাজ চিকিৎসাকৌমুদী প্রণয়ন করেন। কিন্তু কাশীরাজধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত মুনির মতে কাশীরাজ ও দিবোদাস অভিন্ন ব্যক্তি।

ভারতবর্ষে ধন্বন্তরি নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। এমন কি, যিনি দেশে সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক হইতেন, ঋষিগণ তাঁহাকেই বাসু-দেবাংশ দেব ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই কাশীরাজ-দিবো-দাসের নামান্তর ধন্বন্তরি এবং তিনি বিষ্ণু বা দেব ধন্বন্তরির অবতার। বৈদ্যজাতির আদিপুরুষ অমৃতাচার্য্যের নামও ধন্বন্তরি। ঋষিদিগের মতে তিনিও বিষ্ণুর মূর্ত্ত্যন্তর অর্থাৎ দেব ধন্বন্তরির অবতার। বিক্রমা-দিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন ধন্বন্তরি নামে পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস তিনিও

* বাল্মীকি রামায়ণের প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় রামায়ণে লিখিত আছে।—

অমৃতানন্তরং চাপি ধন্বন্তরি রজায়ত।
বৈদ্যরাজোঽ মৃতস্যৈব বিভ্রৎ পূর্ণং কমণ্ডলুং।
(আদিকাণ্ড, ৪৬শ অধ্যায়)

একজন সুপ্রধান চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিক্রমাদিত্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

সুশ্রুতের মতে আয়ুর্ব্বেদ-গুরু কাশী-রাজ ও দিবোদাস অভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রণেতা, দিবোদাস ও কা-শীরাজকে কেন বিভিন্ন ব্যক্তি বলি-লেন তাহার কিছুই মর্ম্মোদ্ধার করা যায় না। একজন পরবর্ত্তী লোক অপেক্ষা, শিষ্য গুরুর জীবনী সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই প্রামাণ্য। সুতরাং এ বিষয়ে সুশ্রু-তের বাক্যই অধিকতর মূল্যবান। বোধ হয় এই পুরাণ প্রণেতার অমৃতোদ্ভব দেব ধন্বন্তরি, কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি এবং অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি এই তিন জন সুপ্র-সিদ্ধ ধন্বন্তরিকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু মানব ধন্বন্তরি দ্বয়ের (কাশীরাজ দিবোদাসের ও অমৃতাচার্যের) সুপ্রসিদ্ধ নাম "ধন্বন্তরি" অভিন্ন দেখিয়া ইহাঁদিগের ভিন্ন নাম বসাইবার কালে "ধন্বন্তরির্দ্দিবোদাসেঽমৃতাচার্য্যঃ" লিখিতে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ হইয়া অথবা লিপিকর-প্রমাদে "ধন্বন্তরির্দ্দিবোদাসঃ কাশীরাজঃ" হইয়া রহিয়াছেন। যখন ভারতবর্ষের এক প্রদেশের একখানি গ্রন্থ আর এক প্রদে-শের ঠিক সেই গ্রন্থের নিকট স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়, তখন এ সকল স্থলে প্রণেতাকে দোষ না দিয়া লিপিকারের প্রমাদ বা "ওস্তাদি" মনে করাই শ্রেয়ঃ।

যাহা হউক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ধন্ব-ন্তরি-ত্রয়ের গ্রন্থ প্রণয়ন সংক্রান্ত বচন কতদূর প্রামাণ্য তাহা এক্ষণে কাহারই বলিবার যো নাই। যদি প্রামাণ্য হয় তবে দেব ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রণীত আয়ু-র্ব্বেদের নাম "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান।"

হরিবংশের ২৯শ অধ্যায়ে কাশীরাজ ধন্বন্তরির বিবরণে দেব ধন্বন্তরির উদ্ভব বৃত্তান্ত লিখিত আছে। হরিবংশের মতে অব্জ অর্থাৎ জল হইতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বিষ্ণু ইহার নাম অব্জ রাখিয়া-ছিলেন। বিষ্ণুর বর প্রভাবেই পুনরায় কাশীরাজ ধন্বন্তরিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত করিয়া-ছিলেন। হরিবংশের আর আর বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে কাশী-রাজ ধন্বন্তরির বিবরণে বর্ণিত হইবে।

দেবতত্ত্ব বিশেষতঃ পুরাণাদির মত লইয়া যাহারই আলোচনা করা যায় দুই একটী আনুমানিক যুক্তি ব্যতীত প্রায়শঃই তাহার কোন সর্ব্ববাদী সম্মত মীমাংসা হয় না। অমৃতোদ্ভব দেব ধন্বন্তরি সম্পর্কে একটী স্থির মীমাংসা হইতে পারে কি না সন্দেহ। যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদ-সর্ব্বস্ব দেব ধন্বন্তরিকে লইয়া আমাদের মনে স্বতঃই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়ঃ—

(১) ভাব প্রকাশে লিখিত আছে "অথর্ব্ব-বেদ সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদকে ব্রহ্মা লক্ষশ্লোকময়ী করিয়া সহজ ভাষায় নিজ নামে এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। সুশ্রুতেও একথা এই ভাবে লিখিত আছে, যথাঃ—পূর্ব্বে ব্রহ্মা লক্ষশ্লোকাত্মক এক আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া উহা অথর্ব্ববেদের অঙ্গরূপে প্রকাশ করেন।

পরে মানবদের অল্পায়ু দেখিয়া উহা সংক্ষেপ ও আট অঙ্গে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করেন। এই সকল বাক্যে কি এইরূপ বুঝা যায় না, যে অথর্ব্ববেদ-সর্ব্বস্ব যে আয়ুর্ব্বেদ, প্রথমতঃ ব্রহ্মা তদবলম্বনে লক্ষশ্লোকাত্মক এক খানা আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া উহাও অথর্ব্ববেদের অঙ্গীভূত করেন, পরে মানুষের অল্পায়ু দেখিয়া সংক্ষেপে পুনরায় আয়ুর্ব্বেদ রচনা করেন।—সুতরাং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রণীত হইবার পূর্ব্বেও অথর্ব্ববেদে (এবং চরণব্যূহমতে ঋগ্বেদে) আয়ুর্ব্বেদীয় উপাঙ্গ ছিল। শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতির মতে "আয়ুর্ব্বেদঃ, অষ্টাদশ বিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরি প্রণীত বিদ্যা বিশেষ"। তবে ব্রহ্মকৃত আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদই (যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন) কি দেব ধন্বন্তরি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ?

(২) মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে কেবল শিবই আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন আর কেহই জানিত না। শিবের নিকট ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্রাদি উহার শিক্ষা লাভ করেন। ইহাতে জানা গেল ব্রহ্মাই প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন না তিনিও শিবের নিকট উহা শিক্ষা করেন। শিবও আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন মাত্র তিনি যে আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শিব যে আয়ুর্ব্বেদ জানিয়াছিলেন সেই সর্ব্বাদিম আয়ুর্ব্বেদই কি দেব ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল ?

## বুধ।

মৎস্যপুরাণ মতে চন্দ্রের পুত্র বুধ গজায়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ছিলেন এই জন্য তাহার অপর নাম "গজবৈদ্যক।" তথাহিঃ—

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ।
তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারশ্চন্দ্র সন্নিভঃ।
সর্ব্বার্থশাস্ত্রবিদ্ধীমান্ হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।
নাম যদ্রাজপুত্রীয়ং বিশ্রুতং গজবৈদ্যকং।
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রোবুধঃ স্মৃতঃ।
(মৎস্যপুরাণ ২৪শ অধ্যায়।)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বুধ, সূর্য্যের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, তাঁহার প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের নাম সর্ব্বসার। যথাঃ—

"সর্ব্বসারং- চন্দ্রসুতঃ * * *"

## যম।

সূর্য্যপুত্র যমও স্বীয় অনুজ অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ইনি ইহার জনক সূর্য্যের নিকটেই আয়ুর্ব্বেদ শিখিয়াছিলেন। যম-প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের নাম জ্ঞানার্ণব মহাতন্ত্র। তথাহিঃ—

জ্ঞানার্ণব মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার সঃ।
(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)

## দেবর্ষি নারদ।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে দেবর্ষি নারদ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কি না এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু মহালক্ষ্মী, বিলাসরস, লক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের কলেবর নানা মৃতসঞ্জীবন অমৃতে পূর্ণ করিয়াছেন।

## কামদেব।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অনঙ্গদেবও

ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেন। প্রমেহ-মিহির তৈল প্রভৃতি "রতি নাথ ভাষিত" বলিয়া বিখ্যাত।

প্রমেহমিহিরং নাম্না রতিনাথেন ভাষিতং।

বসু।

অন্যতম গণদেবতা বসু-প্রণীত ঔষধাদিও আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়। লবঙ্গাদি বটী বসু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"বটী লবঙ্গাদ্যা বসু প্রণীতা।"

(রসেন্দ্র সার সংগ্রহ)

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যত্ন করিয়াছিলেন এরূপ বহু দেবতার নাম, আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলাম। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী দেবগণের কাহিনী পাঠ করিয়া নব্য-সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। এই ভয়েই অতি সংক্ষেপে এ অধ্যায়টীর পরিসমাপ্তি করিতে হইল।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ঋষিগণের বিবরণই আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের প্রধান উপাদান। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত হইবে।

শ্রী যাদবানন্দ গুপ্ত।

# সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

## প্রতিবাদ।

গত শ্রাবণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মূল কথা এই, হৃদয়ের প্রসারতা পাইতে গেলে, আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হইলে, এবং সেই উপলব্ধিজনিত পরম, পবিত্র শান্তি, সুখ ও তৃপ্তি ভোগ করিতে হইলে কোন মূর্ত্তি বা কোন চিহ্নের দ্বারা তাহা হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা সেই সীমার মধ্যে অনন্ত স্বরূপের ধ্যান করিতে চেষ্টা করেন, ক্রমে তাঁহাদের কল্পনা সেই সীমান্তেই আবদ্ধ হইয়া যায়, ক্রমে সেই মূর্ত্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। এই কথাগুলি বুঝাইতে গিয়া তিনি সাকারবাদীদের মতগুলির ভুল-অর্থ করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি জীর্ণ ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। সাকারবাদীদের যথার্থ ভ্রম যদি কিছু থাকে, তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার উদ্দেশ্যও তিনি সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সেই ভ্রমগুলি একে একে প্রদর্শন করিব, এবং উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের যাহা মত ও বিশ্বাস তাহাও ব্যক্ত করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, উপাসনা কাহাকে বলে। জগতের আদি কারণ এক এবং অদ্বিতীয় ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ আগ্রহচিত্তে সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাকেই ঈশ্বরো-

পাসনা বলা যায়। * কিন্তু মনের এই আগ্রহ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সম্ভবে না। যাহার চিত্ত যত বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে সেই আদিকারণের স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন। অতএব সাকারবাদীও ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারেন, নিরাকারবাদীও পারেন। অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার জানিয়া পুরাণোক্ত কোন মূর্ত্তি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানলাভে চেষ্টা করেন, এবং যিনি নিজের মন-গড়া উপস্থিত কোন-ভাবোদ্রেককারী মূর্ত্তি দ্বারা নিরাকারের উপাসনা করেন; ইহাদের উভয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন, এবং উভয়েই অপৌত্তলিক। অতএব যাঁহারা "সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছেন" তাঁহাদের সহিত রবীন্দ্র বাবু এবং অন্যান্যও নিরাকারবাদীদের প্রভেদ কিছুই নাই বলিলেও হয়। তাঁহারা কোথাও মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া, ডোবাকে সমুদ্র বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই। কোন বিশেষ ভাবোদ্রেকের জন্য নিরাকারবাদীরাও যেমন মূর্ত্তিবিশেষ কল্পনা করেন, সাকারবাদীরাও সেই ভাবব্যঞ্জক পুরাণোক্ত কোন মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সকলকে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নিরাকারবাদী যেমন ঈশ্বরের দয়াময়রূপ চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; মানুষের যতগুণ আছে, সবগুলি তাঁহাতে আরোপ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে নির্গুণ, নিরাকার বলিয়া ডাকেন, সাকারবাদীও যেগুণে মূর্ত্তিবিশেষকে বিষ্ণু বলিয়াছেন, সেই গুণের বা ভাবের পূজা করিয়া অতৃপ্তমনে তাঁহাকে তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা বলিয়া ডাকিয়াছেন। † অর্থাৎ তোমার গুণের সীমা নাই; তুমি নির্গুণ, অনাদি, অনন্ত জগদীশ্বর। ডোবাকে সমুদ্র বলা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সমুদ্র, পর্ব্বত, নদ, নদী সমস্তই আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই, চিত্রেও দেখিতে পাই। সুনিপুণ চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত-সমুদ্রের চিত্রে আমরা কি সমুদ্রের ভাব কল্পনা করিতে পারি না? অধিক কি, যাঁহারা সমুদ্র-বর্ণনা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সে চিত্র দেখিয়াও সমুদ্রের গম্ভীর উদারভাবের কতকটা কল্পনা করিতে পারেন।

তারপর অধীনতা ও স্বাধীনতার কথা। যে অধীন সে স্বাধীনতার চর্চ্চা করিতে যে জানে না। আমরা ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়া রাখি, কারণ ছাড়িয়া দিলে সে যেখানে ইচ্ছা দৌড়িবে, কত লোককে হত ও আহত করিবে। সেইরূপ, আমাদের মনকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দাও, তাহার সকল অবলম্বন কাটিয়া ফেল, তবে সে অসংযত হইবে। যদি কাহাকেও মনের নিতান্ত অপরিপক্ব অবস্থায়, ধারণাশক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে, নিরাকারের ভাব কল্পনা করিতে বল, যদি তাহাকে বল, সাকারের সাহায্যে ঈশ্বর-আরাধনা হয় না, তবে সে নিরাশ্রয় হইবেই, উচ্ছৃঙ্খল হওয়া

* প্রচার—"ঈশ্বরোপাসনা।"

† নবজীবন—ত্রেত্রিশ কোটি দেবতা।

তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই নাস্তিক হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অধিকাংশই না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, একরূপ কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর মত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব একেবারেই স্বাধীনতার আস্বাদন করিতে দেওয়া অবিবেচকের কর্ম্ম; ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খল খুলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম কি তাহাই শিক্ষা দেয় না?

ভক্তিভাব উদ্রেক করিবার জন্য এবং সেই ভাব কিছুকালের মত স্থায়ী করিতে সাকারোপাসকেরা মূর্ত্তি গড়িয়া থাকেন। এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "মূর্ত্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছু দিন পরে সে মূর্ত্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্ত্তিটাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমে উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। একথাগুলি রবীন্দ্র বাবুর নিতান্তই কল্পনা; কার্য্যে পরিণত করিয়া কখনও দেখা হয় নাই। মনে করুন, আমার বৈঠকখানায় আমার মৃত পিতৃদেবের একখানি ফটোগ্রাফ আছে, আমি প্রত্যহই সে ছবিখানি দেখিতেছি; যখনই দেখি, তখনই আমার পিতার নানা কার্য্যের, আমার প্রতি অনেক প্রকার সস্নেহ ব্যবহারের, কত কথা স্মরণ হয়, হয়ত বা কোন দিন তাঁহার কোন কথা স্মরণ করিয়া আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করি। কিন্তু কখন কি আমি সেই ফটোগ্রাফকে 'বাবা, বাবা' বলিয়া ডাকি, অথবা কোন দিন তাঁহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ফটোগ্রাফখানি খুলিয়া পিতা-ভ্রমে বুকে চাপিয়া ধরি? যদি সজ্ঞানে সেই পটখানিকে এরূপ করিতে না পারি, তবে ঈশ্বরকে নিরাকার, অরূপ জানিয়া কেবল ভাবাভিনয়নের জন্য যদি কোন মূর্ত্তি গড়ি, যদি প্রকৃতই আমার কিছুমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তবে ভক্তির সম্যক বিকাশের জন্য যাহা কল্পনা করি, সেই মূর্ত্তি কি কোন প্রকারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারে; উপায়টা কি উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়? যাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানেন না, যাঁহাদের বিশ্বাস তেত্রিশকোটি দেবতার স্বর্গ বলিয়া একটী বাসস্থান আছে, যাঁহারা মনে করেন প্রতি বৎসর দুর্গা শ্বশুর বাড়ী, কৈলাস পর্ব্বত হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসেন, তাঁহাদের কাছেই মূর্ত্তি সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, এবং বাস্তবিক তাঁহারাই পৌত্তলিক।

আংশিক সূর্য্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভাল নয় বটে, কিন্তু এমন সময় এবং এমন কতকগুলি কার্য্য নাই কি যে সময়ে সূর্য্যকিরণ অনাবশ্যক এবং যাহা দীপশিখা ব্যতীত হয় না? সেইরূপ এমন পৌত্তলিক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বর যে নিরাকার এ কথা কোনমতেই কল্পনায় আনিতে পারেন না। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় শিব বা বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া এবং তাহারই অর্চ্চনা করিয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন ও আত্মার সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি সাধন করে। সূর্য্যকিরণ হইতে

তাহাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয় বলিয়া কি তাহাদিগকে দীপের আলোক হইতেও বঞ্চিত করিয়া চির অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতে হইবে?

রবীন্দ্র বাবুর মত কবি আমাদের দেশে খুব অল্পই আছেন। কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তর্ক করা একরূপ অযৌক্তিক। কিন্তু একটী কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। কেবল মাত্র ভাবপ্রধান (Mere saggestive) কবিতা কখন মনে একটা স্থায়ী ভাব (Impression) অঙ্কিত করিতে পারে কি? নিতান্ত বস্তুগত (Realistic) কবিতা যেমন দোষের, তাহাতে যেমন হৃদয়ের আনন্দ, তৃপ্তি ও সুখের অনেক বাকি থাকে, Mere saggestive কবিতা দ্বারাও তেমনি হৃদয়ে পূর্ণ তৃপ্তি, সুখ ও আনন্দের ক্ষণিক বিকাশ হয়, সে ভাব একবার চমকিয়া অমনি মিলাইয়া যায়, তাহার ফল (Effect) কিছুই হয় না বলিলেও চলে।

"বসন্তের বাতাস মাতালের মত টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে।" এই কথায় বাতাসকে টলটলায়মান রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট মনে হইবে না বটে, কিন্তু যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি কখনও মাতাল দেখেন নাই, তাহার নামও শুনেন নাই, তিনি কি বাতাসের ঐ ভাবটি ঠিক কল্পনা করিতে পারিবেন? মানুষ কি মনুষ্য-জ্ঞান, ভাব বা ভাষাতীত ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারে?

রবীন্দ্র বাবু কবি টেনিসনের যে কাব্যের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে কুমারী গিনেবীর লান্সলটকে আর্থর ভাবিয়াই আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহাকে প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইত, যে ইনি আর্থর নহেন, তাঁহার প্রতিনিধি লান্সলট্‌, তবে কি তিনি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতেন? আর্থরের রূপ, গুণ, বা কোন গূঢ়ভাব গিনেবীরের প্রণয় আকর্ষণ করিয়াছিল; তিনি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, লান্সলটে মুগ্ধ হয় নাই। সেইরূপ, সাকারবাদীরা যখন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতেছেন, এ মূর্ত্তি ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর নিরাকার; তখন সেই মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর-জ্ঞানের আশঙ্কা ঘটিতেই পারে না, সে সাবধানতা তাঁহার বরাবরই আছে। সম্মুখে মূর্ত্তি খাড়া করিয়া ঈশ্বর-ভাবেই তিনি মুগ্ধ আছেন, সেই ভাবময়-ঈশ্বরেরই আরাধনা করিতেছেন, প্রতিমার আরাধনা নহে।

বাল্যকালে সকলেই পুঁতুল লইয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, এবং বয়স হইলে সত্যকার গৃহকার্য্য করে। সংসারের গুরুভার বহন একজন বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তা বলিয়া সে তাহার যুবতী জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে অথবা প্রৌঢ়া মাতাকে গৃহকার্য্য ফেলিয়া খেলা করিতে বলে না, তাহারই সমবয়স্ক বালিকাদিগকেই খেলার-সঙ্গী হইতে ডাকে, তাহার মাতা কিংবা ভগিনী হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাকে কোন মতে সে অবস্থায় গৃহকার্য্যে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। সুখের বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমতী মাতা ও ভগিনী তাহার বয়স হইলে, জ্ঞান

বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাকে সকল গৃহকার্য্য শেখান, এবং অনেক বহুদর্শীতার পর সে সংসারের দায়িত্ব বুঝিতে পারে, গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারে। ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। মানুষের জীবনের এমন একটী দশা (Stage of life) আছে,যে-সময়ে নিরাকার ভাব কল্পনা করিবার চিন্তাশক্তি তাহার জন্মে নাই, জন্মিতে পারেও না। জীবনের যে বয়সে সে অবস্থিত সে বয়সের কাজ সম্পন্ন না করিয়া সে কখনও অধিক বয়সের কাজ করিতে পারে না। সাকার উপাসনা রূপ-দশা (Stage) সকলকেই অতিবাহিত করিতে হইবে; কোন মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাকার-উপাসনা সম্ভব নহে। তা তিনি পুষ্প চন্দন দিয়া পুরাণোক্ত প্রতিমারই অর্চ্চনা করুন, আর নিজে মনে মনে প্রতিমা গড়িয়া ভাষাপুষ্পেই তাঁহাকে পূজা করুন। শুধু তা নয়, মানবজাতির অধিকাংশ আজন্মকাল পৌত্তলিক আছে, আরও কত কাল থাকিবে বলা যায় না। জ্ঞানার সংখ্যা এসংসারে কত? মানব জাতির এই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শ্রেণীকে রবীন্দ্রবাবু কি নাস্তিকতায় গঠিতে বলেন? নিরাকার উপাসনা ত দূরের কথা, তাহারা যে সাকারোপাসনাতেও অক্ষম। তাই বলিয়া কি তাহাদের হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব,—সুখের শ্রেষ্ঠ উপকরণ উন্মূলিত করিতে বলেন? এবং তাহাদিগকে অবলম্বনহীন করিয়া সংসারকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তির আকর করিতে বলেন?•

আমরা একে একে রবীন্দ্রবাবুর ভ্রমগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম; কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না পাঠকগণ এবং রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং বিচার করিবেন। এক্ষণে উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বিশ্বাস, তাহা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম কথা এই, উপাসনা আমাদের স্বাভাবিক এবং উপাসনা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। আমাদের হৃদয়ে কতকগুলি বৃত্তি আছে, উপাসনা ব্যতীত যেগুলি সম্যক স্ফূর্ত্তি পায় না; এবং এই সকল বৃত্তির উপরেই আমাদের সমস্ত সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি নির্ভর করে। উপাসনা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতি বর্ব্বর হইতে অতি সভ্য জাতির অবস্থা আলোচনা করিলে যে ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। নাস্তিকের কথা আমরা ধরি না; কারণ প্রকৃত নাস্তিক জগতে আছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আত্মবঞ্চনা করেন। প্রকৃতির সহিত আমাদিগকে অহরহ যুদ্ধ করিতে হইতেছে; আমরা তাহার প্রবল পরাক্রমে সর্ব্বদাই পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত। উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। নিরাশ্রয়, দুর্ব্বল মানব সুতরাং সর্ব্বদাই প্রকৃতির স্রষ্টার শরণাপন্ন। যাহারা আবার এই স্রষ্টার অস্তিত্ব ভাবিয়া উঠিতে পারে না, তাহারা প্রকৃতির পদার্থ নিচয়েরই শরণাপন্ন। অতি বর্ব্বর যখন সৃষ্টির কোন কৌশল বুঝিতে না পারিয়া প্রকৃতির প্রভাবে অহরহ উৎপীড়িত হইয়া বিপদ নি-

বারণের কোনও উপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারে না, তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়, তখন প্রকৃতির সেই মহান্ ও আশ্চর্য্য পদার্থগুলিকে ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে স্বার্থের জন্য পূজা করে। ঈশ্বর কি তাহারা বুঝে না, পদার্থগুলিই তাহাদের নিকট সর্ব্বেসর্ব্বা। বিপদুদ্ধারের কামনাই তাহাদের অর্চ্চনা, নিষ্কাম উপাসনা কি তাহারা জানে না। ক্রমে মানুষ যতই সভ্যপদবীতে আরোহণ করিতে থাকে; ততই স্থষ্টিকৌশল অল্পে অল্পে তাহাদের নিকট প্রকাশ হয়, এবং উন্নততর পদার্থে তাহাদের নির্ভরতা ও ভক্তি অর্পিত হয়। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড যে এক অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষের দ্বারা রচিত ইহা সমগ্র মানবজাতির কিয়দংশ মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এই মাত্র; তাঁহার স্বরূপ কি আজও জানিতে পারেন নাই; কতকালে যে পারিবেন, কখনও পারিবেন কি না কে বলিতে পারে? তাঁহার সৃষ্টপদার্থ সকলেরই কি রূপ কি গুণ সে জ্ঞানই আমাদের এখনও জন্মে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা তাঁহার ধারণা কি করিব? মানব-ভাষা, জ্ঞান ও ভাব যতদূর পৌঁছিতে পারে, আমরা তাহা দিয়াই সেই অনন্ত পুরুষের ধ্যান, আরাধনা করিতেছি এবং করিব।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

---

## POSITIVISM কাহাকে বলে?

পূর্ব্ব প্রবন্ধে এক প্রকার 'ভাসা ভাসা' প্রকারে positivism বিষয়ে কিঞ্চিৎ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছি। এ প্রবন্ধে মনস্থ হইতেছে যে, তাহার সারাংশ বাঙ্গালাতে প্রকটিত করি। এস্থলে আমি positivism শব্দ বাঙ্গালা রচনার মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে পাঠকের পক্ষে উদ্ভ্যক্তিকর হইতে পারে এই নিমিত্ত positivism বলিতে 'প্রামাণিক বাদ' এই সংজ্ঞা পরিগ্রহ করিলাম। 'প্রামাণিক বাদ' এই সংজ্ঞা কোন ক্রমেই সন্তোষকর নহে, ইহা পূর্ব্বে কহিয়াছি। কিন্তু কি বাঙ্গালা কি সংস্কৃত উভয় ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে সন্তোষকর সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান সংস্কৃত বিশারদ মহাপণ্ডিত স্থলবিশেষে লিখিয়াছেন যে এমন ভাব বা এমন অভিপ্রায় নাই, যাহা সুচারুরূপে সংস্কৃত ভাষাতে ব্যক্ত করা না যায়। কিন্তু ইয়োরোপের বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রে এত অভিনব ভাব ও অভিপ্রায় দিন দিন প্রকাশ হইতেছে যে বাঙ্গালা বা সংস্কৃতের সাহায্যে সে সমস্ত ভাব বা অভিপ্রায় প্রচার করিবার চেষ্টা দুরাশা। এ নিমিত্ত 'প্রামাণিক বাদ' এই সংজ্ঞার

প্রতি নিতান্ত প্রসন্নতা অসত্ত্বেও আমি এই প্রবন্ধের জন্য Positivism কে 'প্রামাণিক বাদ' কহিলাম, যেরূপ গণিত শাস্ত্রের অনুশীলন কালে রাশি বিশেষকে 'ক' বা 'খ' বা 'পাই' ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

এই একটী মাত্র প্রবন্ধের মধ্যে 'প্রামাণিক বাদের' কিছু সারাংশ প্রকটণ করিবার উদ্যম অসমসাহসিক। এই প্রামাণিক বাদ কম্‌ট্‌ নিজে দশ খণ্ড বৃহৎ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকের পৃষ্ঠ-সংখ্যা গড়ে তিন শত পৃষ্ঠা ধরিলে তিন হাজার পৃষ্ঠা পুস্তক হয়। তাহা ফরাশি ভাষায় লিখিত। বোধ হয় ইয়োরোপীয় কোন এক ভাষায় এক পৃষ্ঠাতে যত ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাতে বাঙ্গালায় তিন পৃষ্ঠা লাগা সম্ভব। বিশেষতঃ কমটের ন্যায় এক জন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও দর্শনকার চব্বিশ বৎসর ধরিয়া (১৮৩০-১৮৫৪) চিন্তা করিতে করিতে ঐ সমস্ত চিন্তার প্রসব স্বরূপ ঐ দশ খণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার Positive Philosophy নামক প্রথম ছয় খণ্ড গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালাদেশে কি সমস্ত ভারতবর্ষে অদ্যাপি এতাদৃশ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় 'প্রামাণিক বাদের' কিছু সারাংশ এক প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে উদ্যত হইয়া উপহাস্যই হইতে পারি। তথাপি দেখা যাউক; যদি এমন কিছু বলিতে পারি, যাহাতে পাঠকের ঐ বিষয়ে অনুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলেও যথেষ্ট।

প্রথমতঃ। কম্‌ট্‌ কহিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রটী দর্শনও বটে, ধর্ম্মপ্রণালীও বটে। দর্শন কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে তিনি কহিয়াছেন যে, মনুষ্যের জীবন এই তিনটী ব্যাপার লইয়া সংঘটিত হয়, যথা চিন্তা, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া। প্রকৃত দর্শনের উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য জীবনের ঐ তিনটী ব্যাপারকে নিয়মবদ্ধ করা, ঐ তিনটী ব্যাপারের একটা বন্দোবস্ত আঁটিয়া দেওয়া, যাহাতে ঐ তিনটী ব্যাপার অনিয়মিত অথবা 'বেহিসিবি' প্রকারে প্রবর্ত্তমান না হয়। যত প্রাচীন দর্শন ঐ চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা আপাতত সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক এই ছয়টী শাস্ত্রকে দর্শন কহিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থের প্রণেতা মাধবাচার্য্য ঐ ছয়টীর উপর আরো কুড়ি পঁচিশটী দর্শনের বিষয় লিখিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে সকলেতেই চিন্তা প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া এই তিন ব্যাপারের 'বন্দোবস্ত' করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন দর্শনে চিন্তার নিয়ম বন্ধন বেশী, কোন দর্শনে প্রবৃত্তি ও ক্রিয়ার নিয়ম বন্ধন বেশী পরিমাণে আছে। বোধ হয় এতদ্দেশীয় পাঠকের পরিষ্কার বোধের জন্য ইহা বলিলে অসংগত হইবে না যে, চিন্তা প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া কাহাকে বলে? এই নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। তুমি মনে কর যে, তুমি মনুর মতাবলম্বী হিন্দু; তাহা হইলে তুমি ভাবিবে যে, উপরে যে গোলাকার গুম্বজের মত আকাশ দেখা যায়, উহা ব্রহ্মার ডিম্বের একখানি খোলা; আরো

ভাবিবে যে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত বিশ্বাসকে চিন্তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। প্রবৃত্তি বলিতে কাম ক্রোধ লোভ জিগাংসা যশোবাসনা পরহিতেচ্ছা ইত্যাদি। আর ক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল কার্য্য লোকে বাস্তবিক করিয়া থাকে, ইংরেজেরা সুডান জয় করিতেছে, দোকানদার মাপে বা ওজনে কম দিয়া জিনিস বিক্রয় করিতেছে, বিদ্যার্থী ছাত্র পরীক্ষা দিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী অপর ছাত্রের লেখা দেখিয়া লিখিতেছে ইত্যাদি। এইরূপে চিন্তা প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া এই তিন ব্যাপার কি তাহা বুঝিয়া যদি মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ-বর্ণিত দর্শনগুলি দেখ, তাহা হইলে কম্‌টের কথার তাৎপর্য্যগ্রহ হইবেক। চার্ব্বাকদর্শনে কহিতেছে, বেদের কথা মানিওনা, বেদ তিন প্রকার লোকের রচনা, মস্করার লোক, জুয়াচোর আর নিষ্ঠুর লোক। দেহ নষ্ট হইলে আর কিছুই থাকে না ইত্যাদি। ইহা চিন্তার কথা গেল। প্রবৃত্তির বিষয়েও চার্ব্বাকদর্শনে কহে, আপনার সুখের চেষ্টা দেখ। যাহাতে লাভ হয়, তাহার চেষ্টা কর। কিঞ্চিৎ অসুখ হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য ইত্যাদি। ক্রিয়ার বিষয়েও কহিয়াছে যে, অর্থই সকল সুখের মূল, অতএব রাজা ও বড়মানুষদিগের খোসামোদ কর, তাহাতে অর্থলাভ হইবে। সাংখ্যদর্শন কহেন, পুরুষ আর প্রকৃতি ভিন্ন, পুরুষের কেবল জ্ঞান আছে, সুখ দুঃখ প্রকৃতির; তবে পুরুষ প্রকৃতির সহিত আপনাকে এক মনে করেন, এই নিমিত্ত পুরুষেতে প্রকৃতির সুখ দুঃখের ছায়া পড়ে, তাহাতে পুরুষ ভাবেন, আমি সুখী ও দুঃখী। এই সমস্ত চিন্তা অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যবস্থা গেল। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যদর্শনের মতে এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইলে আর দুঃখ থাকে না। সুতরাং সাংখ্যে প্রবৃত্তি আর ক্রিয়ার বিষয়ে তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। বরং সকল প্রবৃত্তি দমন ও সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতেই কহিয়াছে। সাংখ্যেতে এই যে অসম্পূর্ণতা, তাহা পাতঞ্জলে পূরণ করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ পাতঞ্জলে ক্রমাগত যোগাভ্যাস ও নিশ্বাস বন্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই একমাত্র ক্রিয়া উহাতে উপদেশ করিয়াছে। এইরূপে দৃষ্ট হইবেক, যে, সকল দর্শনেতেই এই কথা আছে তুমি কি বিশ্বাস করিবে, তাহাতে তোমার উপকার কি, এবং কি কার্য্যের দ্বারা সেই উপকার পাইবে।

প্রামাণিকবাদের যে দর্শন ভাগ, তাহাতেও সেই কথা; অর্থাৎ কি বিশ্বাস করা উচিত, তাহাতে উপকার কি, এবং কিসে সেই উপকার লাভ হয়। তবে যাবতীয় প্রাচীন দর্শন আর প্রামাণিক দর্শন এ দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাবতীয় প্রাচীন দর্শন 'আমি' 'আমার সুখ' 'আমার দুঃখপরিহার' 'আমার স্বর্গ সুখ ভোগ' 'আমায় মোক্ষ' এই সকল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য জানে না। কিন্তু প্রামাণিক বাদ সকলের সুখ, সকলের সাচ্ছন্দ্য ইহাকেই উদ্দেশ্য স্বরূপ পরিগ্রহ

করে ; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাহা বিশ্বাস করা আবশ্যক, যে সকল কার্য্য করা উচিত, তাহারি ব্যবস্থা বলিতে উদ্যত। ইহা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহার অতিরিক্ত আর কোন কার্য্য নাই। এই নিমিত্ত প্রামাণিক দর্শনের মূল সূত্র এই যে, প্রীতিই আমাদিগের প্রবৃত্তি, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস এবং উন্নতিই আমাদিপের অভিপ্রায়! যদি এই তিন কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই প্রামাণিক বাদের সার আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এই তিন কথা ভালরূপে বুঝিতে গেলে বোধ হয় কম্‌টের দশ খণ্ড পুস্তক আয়ত্ত করিতে হয়। তথাপি আমি যাহা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রীতিই আমাদিগের প্রবৃত্তি।—কম্‌টের মতে কাম,ক্রোধ,লোভ,প্রভুত্বের ইচ্ছা, যশের ইচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ, সাধারণের প্রতি সহানুভূতি, এইগুলি আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। এই সকল প্রবৃত্তিবর্গের মধ্যে কেহ স্বভাবত সতেজ, কেহ স্বভাবত কমজোর। যেমন সাধারণত মনুষ্যজাতির কাম ক্রোধ লোভ যেরূপ প্রবল, তাহা অপেক্ষা যশের ইচ্ছা, বা স্নেহ, বা দয়া অর্থাৎ সহানুভূতি, সেরূপ প্রবল দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরস্পর সহানুভূতি যত প্রবল হইবেক, ততই সমাজের মঙ্গল হইবেক। কারণ সহানুভূতির পাত্র লইয়া উভয়ের বিবাদ হয় না। যদি কাহারো দুঃখ মোচনের ইচ্ছা কর, আর কেহ তাহার দুঃখ মোচন করিতে গেলে তোমার ক্লেশ হয় না, বরং তুমি সন্তুষ্টই হও। কিন্তু যে সকল প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য স্বার্থ, কাম, বা ক্ষুধা বা যশের ইচ্ছা বা প্রভুত্বের ইচ্ছা অথবা লোভ অর্থাৎ ধনের ইচ্ছা, তাহাতে পরস্পর বিবাদ হইবেই হইবে। যিনি অত্যন্ত যশের প্রয়াসী, তিনি আর একজনকে যশস্বী হইতে দেখিলে কিছু না কিছু ক্ষুব্ধ হইবেন। যাঁর যশের ইচ্ছা অপেক্ষা অন্যান্য স্বার্থ-উপযোগী প্রবৃত্তি গুলি সতেজ, তিনি এবিষয়ে আরো ঈর্ষ্যাযুক্ত। গ্লাড্‌ষ্টোন্ ও ডিজ্‌রেলি, দুজনের মিল থাকা অসাধ্য; নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌জ্ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পারিতেন না। এক্ষণকার দুচারিজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক, যাঁহারা এদেশে বিরাজ করিতেছেন এবং যাঁহাদের নাম করা সংগত নহে, তাঁহাদিগের পরস্পর এইরূপ 'নাক্‌তোলাতুলি' আছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষ সুযোগ্য এবং যশস্বী হইবার মত গুণ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট আছে, অথচ এক জন অপরের গুণ দেখিতে পান না। ফলত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র যাঁহারা কিছুমাত্র অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার যথার্থতা স্বীকার করিবেন ; ইহা পুরাতন কথা। কম্‌ট এই তত্ত্ব আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন না। তিনি কেবল এই সর্ব্বজনবিদিত তত্ত্ব হইতে একটী সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন, সমাজে পরস্পর বিবাদ যত কম হয়, ততই ভাল। প্রবৃত্তির উত্তেজনা ব্যতীত কার্য্য হয় না ; অতএব যে প্রবৃত্তিকে প্রসর দিতে গেলে পরস্পর 'রেসারেসী'

হইবে না, তাহাকেই প্রসর দাও; যত পার প্রসর দাও। সহানুভূতি নামে আমাদিগের একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। খৃষ্টানেরা ইহা মানেন না। অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রণালীর মূলতত্বের মধ্যে ইহা অঙ্গীকৃত হয় না, যে মানুষে পরের সুখে সুখী বা পরের ক্লেশে ক্লেশযুক্ত হইতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম্মের মূল তত্ব এই যে,আদমের ফল-ভক্ষণ অবধি মানুষের প্রকৃতি এক কালে নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ঈশ্বরের কৃপা (Grace of God) মানুষের অন্তঃকরণের ভাবান্তর জন্মিয়া দিলে মানুষের সৎপ্রবৃত্তি আসে। এই ঘোরতর ভ্রান্তির প্রতিপক্ষ-স্বরূপ বিস্তর ব্যাপার সংসারে বিদ্যমান আছে। পশুদিগের মধ্যেও সহানুভূতি ও পরোপকারের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর খৃষ্টান্ ভিন্ন অন্যান্য নরজাতি-দিগের মধ্যেও পরম চমৎকার সৎপ্রবৃত্তির অগণ্য দৃষ্টান্ত খৃষ্টানেরা দেখিয়াও দেখেন না। কিন্তু একালে লেখা পড়ার চর্চ্চাকারী কোন ব্যক্তিই আর সাহস পূর্ব্বক অস্বীকার করিতে পারেন না যে পরের সুখে সুখী এবং পরের ক্লেশে ক্লেশযুক্ত হওয়া মানুষের স্বভাবসিদ্ধ একটী গুণ। Adam Smith তাঁহার Moral sentiments বিষয়ক গ্রন্থে ইহা এক প্রকার জ্যামিতির তত্বের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাও কম্‌টের নূতন আবিষ্ক্রিয়া নহে। কম্‌টের নূতন আবিষ্ক্রিয়া এই যে, তিনি কহেন এই সহানু-ভূতিকেই আমাদিগের ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা ও মূলীভূত করিয়া তুলিতে হইবেক। তিনি কহেন যে, যে কার্য্য, যে চিন্তা বা যে প্রবৃত্তি কথিত সহানুভূতি গুণের যে পরিমাণে অনুকূল, তাহা সেই পরিমাণে ধর্ম্মানুগত (Moral); আর যাহা সহানুভূতির প্রতিকূল, তাহা সেই পরিমাণে ধর্ম্মবহির্ভূত। বোধ হয়, তিনি এই বিষয়ের যুক্তি নিম্নলিখিত রূপে বিন্যাস করিবেন। সমাজবদ্ধ না হইয়া মানুষের থাকিবার যো নাই। সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তির যত অনৈক্য কম হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। প্রত্যেকে যদি অপরের ক্লেশ ক্লেশবোধ আর অপরের সুখে আনন্দ-বোধ, এই গুণটী যত পারে, অভ্যাস করে, ততই পরস্পর অনৈক্য কম হয়। এই অভ্যাস আমাদিগের সাধ্যায়ত্তও বটে। আমাদিগের প্রকৃতির ধর্ম্ম এই যে, যে গুণটী বেসী চালনা করিবে, সেইটীই কালসহ-কারে প্রবল ও তেজস্বী হইবে। মাংস-পেশী চালনা কর, উহা সতেজ হয়; বুদ্ধি চালনা কর, উহা সতেজ হয়; তেমনি প্র-বৃত্তি চালনা কর, উহা কালে সতেজ হয়। যদি পরের সহিত সহানুভূতি অর্থাৎ পরের সুখে আনন্দ বোধ করা এবং পরের ক্লেশে ক্লেশযুক্ত হওয়া এই গুণটী আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে চালনা করিলে ইহাও কালে সতেজ হইবে। তবে চালনার চেষ্টা না করিব কেন? এখন পর্য্যন্ত সংসারবাসী বিস্তর লোকের ঐ গুণ এত ক্ষীণ, যে তাহা-দিগের ব্যবহার কুক্কুরের মত। সকল পাঠকই দেখিয়া থাকিবেন, যদি একটী কুক্কুরকে চাট্টী ভাত কেহ দিয়া থাকে, আর সে খাইতে থাকিতে আর একটী কুক্কুরকে

নিকটে আসিতে দেখে, তাহা হইলে প্রথম কুকুর কি করে? সে একবার ভাত খায়, আরবার দ্বিতীয় কুকুরকে তাড়িয়া যায়। তাহার অর্দ্ধেক সময় নিজে খাইতে আর অর্দ্ধেক সময় দ্বিতীয় কুকুরকে তাড়া দিতে অতিবাহিত হয়। আমি ত মনে করি যে, নরজাতির মধ্যে বিস্তর লোকের ব্যবহারের ঐরূপ ছবি আঁকা যায়। আমি ইহাতে তাহাদিগকে কোন দোষ দিই না। এই ছবি দ্বারা রাগ বা ঘৃণা উদয় না হইয়া বরং বিষম ক্লেশ ও দয়ার উদ্রেক হয়। সভ্যতার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াও এখনও পৃথিবীর বার আনা লোককে 'আধ্‌পেটা' খাইয়া থাকিতে হয়। এই 'আধ-পেটার' ভিতর থেকে যদি আবার কেহ ভাগ বসাইতে আসে, তবে কি আর সহানুভূতি থাকে? ক্ষুধা ভয়ানক প্রবল প্রবৃত্তি, সহানুভূতি তাহার নিকট অতি ক্ষীণ, অতি নিস্তেজ। ক্ষুধা ব্যাঘ্রবৎ, সহানুভূতি মৃগশিশুবৎ। ব্যাঘ্র ও মৃগশিশুর বিরোধস্থলে মৃগশিশুকেই নষ্ট হইতে হইবে। অতএব ঐ সকল বেচারাদিগের জন্য কম্‌টের উপদেশ অভিপ্রেত নহে। তাঁহার উপদেশ এমন এমন লোকদিগের জন্য অভিপ্রেত, যাঁহারা নিজের বা পূর্ব্বপুরুষদিগের সদ্‌গুণে বা অসদ্‌গুণে ভাগ্যমন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, অথবা ক্ষমতাপন্ন হইয়া বসিয়া আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যবস্থা না থাকে, ততক্ষণ ধর্ম্মোপদেশ অকিঞ্চিৎকর। তথাপি সহানুভূতির অনুসরণ করা ঐ সকল নিরন্নপ্রায় লোকদিগেরও সম্ভবে। অবস্থা গতিকে অন্য কোন প্রবৃত্তির বিশেষ চরিতার্থতা করিতে পারে, তাহাদের এরূপ ক্ষমতা বা সুবিধা নাই। কিন্তু যথাসাধ্য পরের সুখে সুখী হইবার অভ্যাস তাহাদিগের পক্ষেও পরামর্শসিদ্ধ। ইহা দ্বারা এক প্রকার মৃদু মধুর আনন্দ তাহাদিগের অনুভব হইতে পারে। সে যাহা হউক; কম্‌ট্‌ কহিতেছেন যে পূর্ব্বোক্তরূপ পরার্থপরতা দ্বারা সমাজের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। অন্য কোন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে তাহা হইবার যো নাই। অতএব নরসমাজের মঙ্গলের জন্য সহানুভূতিকেই যত পারা যায় প্রসর দেওয়া কর্ত্তব্য। কম্‌ট্‌ এই কথাই সংক্ষেপ করিয়া কহিয়াছেন যে, প্রীতিই আমাদিগের প্রবৃত্তি। প্রীতি অর্থাৎ ভাল বাসা। আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালবাস; আপনার জন্মভূমিকে ভাল বাস; তাহাতেও তোমার ভালবাসার 'খাঁই' না মেটে, সমস্ত নরজাতিকে ভাল বাস; যদি পার, তবে যতদূর পার, ইতর জন্তু দিগকে পর্য্যন্ত ভাল বাসিলেও ক্ষতি নাই।' কিন্তু নরজাতির ক্ষতি করিয়া ইতর জন্তুদিগকে ভাল বাসিবার দরকার নাই। আর এই ভালবাসা, যাহা কম্‌ট্‌ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তাহা কেবল কথার ভাল বাসা হইলে চলিবে না। প্রবল, সতেজ, উদ্দাম, স্রোতোবাহী ভালবাসা হওয়া চাই; এমন ভালবাসা হওয়া চাই, যাহার জন্য ক্লেশ পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতে পার। কেবল কাগজে কলমে ভাল বাসিলে চলিবে না। ইহারি নাম,—প্রীতিই আমাদিগের প্রবৃত্তি।

পাঠক মনে করিবেন না, যে ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, কিম্বা কম্‌টের দশখণ্ড পুস্তক হইতে যাহা কিছু বলিবার পাওয়া যায়, তাহা আমার বলা হইল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক প্রবন্ধে সমস্ত 'প্রামাণিক দর্শন' প্রকটন করা আর মুখগহ্বরের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখান, দুই এক।

কম্‌টের দ্বিতীয় বীজবাক্য, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস। ইহার তাৎপর্য্য এই। প্রামাণিক দর্শন বলিতে চাহেন না, কেমন করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইল, অথবা পুরুষের অস্থি হইতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইল, অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। ইত্যাদি। প্রামাণিক দর্শন বলে, জ্যামিতিতে বিশ্বাস কর, বীজগণিতে বিশ্বাস কর; জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিধান, সমাজশাস্ত্র (Sociology), ও ধর্ম্মনীতি (Morals) এই সমস্ত শাস্ত্রে যে সকল অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস কর। এই বিশ্বাস বিষয়ে মতভেদ নাই, বিবাদ বিসংবাদ নাই, অনৈক্য নাই। যাঁহার ইচ্ছা, তিনিই ঐ সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। কম্‌ট কহেন, ঐ সকল সিদ্ধান্তই 'প্রামাণিক দর্শন' এবং 'প্রামাণিক ধর্ম্ম প্রণালীর' (Positive Religion) বনিয়াদ। ঐ সকল সিদ্ধান্ত মানিতে গেলেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে পৃথিবীর মধ্যে নরজাতিই শ্রেষ্ঠজীব; ঐ শ্রেষ্ঠজীবের ভাবী উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকর্ম্ম। পরস্পর প্রীতিই ঐ উন্নতি সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আনুষঙ্গিক উপায় শাস্ত্র চর্চ্চা, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অনুশীলন। বিজ্ঞানের দুই শাখা—একের উদ্দেশ্য বাহ্য-জগতের নিয়ম সমস্ত অবগত হওয়া। অপর শাখার উদ্দেশ্য মনুষ্যের প্রকৃতির নিয়ম সমস্ত অবগত হওয়া। বাহ্য জগৎ যে সকল নিয়মের অধীন, মনুষ্যের প্রকৃতিও সেই সকল নিয়মের অধীন বটে। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতিতে তদতিরিক্ত কতগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেই বিশেষ নিয়মগুলির অস্তিত্ব দ্বারা মনুষ্যের পক্ষে বাহ্যজগতের নিয়মের ক্রিয়া কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বাহ্য জগত্ বলিতে 'ভৌতিক জগৎ' বলা আমার উদ্দেশ্য। যেমন মনে কর জড় পদার্থ মাত্রই বিশ্ববিসারিণী আকর্ষণশক্তির অধীন। পৃথিবীতলে এই আকর্ষণ সকল-বস্তুকেই পৃথিবীর দিকে টানে। মনুষ্যকেও সেই আকর্ষণ অনুক্ষণ পৃথিবীর দিকে টানিতেছে, মনুষ্য-শরীরের প্রত্যেক পরমাণুকে সেইদিকে টানিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্য শরীরের কতগুলি বিশেষ নিয়ম আছে, তাহাদিগের ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য শরীরের মধ্যে রক্ত ও নানাবিধ রস উপরদিকেও চলিতে থাকে। এই নিমিত্ত ভৌতিক জগতের নিয়ম সমূহ হইতে পৃথক্ রূপে মনুষ্যপ্রকৃতির নিয়ম অনুশীলন করিতে হয়। সেই অনুশীলন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবার জন্য ইতরজন্তুদিগের প্রকৃতির নিয়মও অনুশীলন করা আবশ্যক। বিজ্ঞানের এই দুই শাখা অনুশীলনের মুখ্য

এবং একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল মনুষ্যের উপকার। কম্‌ট বলেন যে, সত্য বটে, প্রাচীন কালে কেবল বুদ্ধির চালনাজনিত সুখানুভবের নিমিত্ত লোকে নানা বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যের উপকারী অনেক সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল অনুশীলনের আবশ্যকতা নাই। যাহাতে মনুষ্যের উপকার, তাহাই একান্ত মনে অনুশীলন কর। তদ্দ্বারা যে যে সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহাই বিশ্বাস কর। ইহারি নাম,—'প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস।' যাহা প্রমাণে সিদ্ধ হইবেক না, তাহা লইয়া 'নাড়া চাড়া' করা অনর্থক কালহরণ মাত্র। মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জীব আছে কি না আছে, তাহা আমাদিগের নিঃসংশয়ে জানিবার যো নাই, অতএব সেই বিষয় অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা নাই। এক সময়ে মনুষ্য কল্পনাবলে সেই সকল জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া বিস্তর শুভফল লাভ করিয়াছে। তখন মনুষ্যের পরস্পরকে স্নেহ করিবার গুণ বিকসিত হয় নাই, সুতরাং ঐ সকল অলৌকিক জীবের প্রসাদলাভের আশায় সে অনেক সৎকর্ম্ম করিত, তাহাদিগের কোপে পড়িবার ভয়ে অনেক অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিত। ইহাতে সমাজের বন্ধন ও ধর্ম্মের বন্ধন কিয়ৎপরিমাণে বাঁধা হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন সহকারে সেই সকল অতিমানুষ জীবদিগের অস্তিত্বে আর বিশ্বাস থাকে না। অথচ পরস্পরকে স্নেহ করিবার গুণ পূর্ব্বাপেক্ষা বিকসিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্ম এই নূতন বিকসিত গুণের শরণাগত হইবেন।

কমটের তৃতীয় বীজবাক্য, উন্নতি -ই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেন আমরা প্রীতিকে প্রধান প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিব, এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অবগত হইবার চেষ্টা করিব, তাহার উত্তর—যে তদ্দ্বারা উন্নতি হইবে। এই উন্নতি কি? ইহা অলীক অবাস্তবিক কাল্পনিক উন্নতি নহে, ইহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উন্নতি। বাঙ্গালিদিগের পক্ষে এই উন্নতি বলিতে, ইহাদিগের শরীরে ও মনে অধিক সাহস ও তেজ ও বলাধান হওয়া; পরস্পর মিলিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা হওয়া; নিজের দেশ নিজে শাসন করিবার ক্ষমতা হওয়া; জাহাজ, কলের গাড়ী, খবরের তার, ঘড়ি, ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা হওয়া; সুবিস্তীর্ণ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইবার ক্ষমতা হওয়া; বিজ্ঞান ও দর্শন অনুশীলন; ইত্যাদি। ইয়োরোপীয়দিগের ঐ উন্নতি বলিতে, কিছু কম্ নিষ্ঠুর হওয়া; হীনবীর্য্য নরজাতিদিগের উপর কিছু অধিক সদয় হওয়া; কিছু অধিক অপক্ষপাতী হওয়া; ইন্দ্রিয়সুখকে অত বড় জিনিশ জ্ঞান না করা; ইত্যাদি। সমস্ত নরজাতির পক্ষে ঐ উন্নতি বলিতে, এক্ষণে যাহারা আধপেটা খাইয়া থাকে, তাহাদিগের পরিতোষ পূর্ব্বক আহার পাওয়া; উত্তম স্থান ও স্বাস্থ্য-আধায়ক পরিচ্ছদ পাওয়া; আবশ্যকমত

শিক্ষা পাওয়া, সাধারণ-লোকদিগের শরীর ও মনের পেষণকারী পরিশ্রমে চির জীবন কাটাইবার দরকার না থাকা; দুর্ব্বলদিগের প্রতি প্রবলদিগের দয়া মায়া হওয়া; ইত্যাদি। কম্‌টের উন্নতি শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে করিতে আমি মনের চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, অনেক সুপণ্ডিত বিজ্ঞমহাশয়দিগের অধরে ঈষৎ হাস্য উদয় হইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ইহাত ইংরেজী ধরণের সত্যযুগ। কম্‌ট্‌ অতিবাতুল, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে এরূপ কখন ঘটিতে পারে। এই সকল সুপণ্ডিত ব্যক্তি ম্যাল্‌থসের শিষ্য। লোক সংখ্যাবৃদ্ধি এই বিভীষিকা খাড়া করিয়া তাঁহারা ভাবী উন্নতির সকল আশা এক কালে উড়াইয়া দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা কহেন যে, ঐ সকল বাজে কথা লইয়া গোলমাল করা কেবল কতকগুলা পণ্ডিতমূর্খ লোকদিগের কার্য্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তর্কে বা যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করা আমার কর্ম্ম নহে। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি তোমার পুত্রের উৎকট Typhoid জ্বর হইয়া থাকে, তবে যদি ডাক্তারে এড়িয়া দেয়, কবিরাজে জবাব দেয়, হমিওপেথিতে কিছুই হইতেছে না, টোট্‌কাও ঢের দেখা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হইতেছে না; তথাপি কি তুমি চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিতে পার! তুমি কি তবুও ধড়্‌ফড় ছুটোছুটী কর না! কই, তুমি কেন এই ভাবিয়া স্থির হইতে পার না, যে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে! ইটী তোমার আপনার ছেলের বেলায় হয়। কিন্তু সমস্ত নরজাতি যে ঘোরতর বিষম যন্ত্রণাতে কাতর হইতেছে, তাহার বেলা তুমি সচ্ছন্দে বলিয়া ব'স, কেন মিছে চেষ্টা, কিছুতেই কিছু হইবে না! কিন্তু কমটের স্নেহপ্রবৃত্তি অনেক অধিক বিকসিত হইয়াছিল, তাই তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি অতুল বিবেচনাশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বিবেচনা তাঁহাকে বলিয়াছিল, এই এই উপায় অবলম্বনে মনুষ্যের ক্লেশের লাঘব হইবে, তাই তিনি সেই সেই উপায় বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। সাংসারিক ব্যাপারের নিয়ম এই যে, অল্প হউক, বা অধিক হউক, কিয়দংশেও যদি কোন উপায় দ্বারা নরজাতির ক্লেশের লাঘব ও সাচ্ছন্দ্যের উন্নতি হয়, তাহাও অগ্রাহ্য নহে। যতটুকু হয়, ততটুকুই ভাল, এই নিয়মে সাংসারিক ব্যাপারে চলিতে হয়। কম্‌ট্‌ এরূপ মনে করিতেন না যে প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা সংসার হইতে সকল ক্লেশ দূরীভূত হইবে। তিনি ভাবিতেন যে, লোক—সমাজ এক্ষণে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে হয় ইহাকে এক কালে উৎসন্ন হইতে হইবে, নয় 'প্রামাণিক দর্শন' এবং 'প্রামাণিক ধর্ম্ম' যে পদ্ধতি দেখাইয়া দিতেছে, সেই পদ্ধতি মতেই চলিতে হইবে। যতই সেই পদ্ধতি মতে চলিতে পারিবেক, ততই নরজাতি উন্নতিপ্রাপ্ত হইবেক।

অবশেষে আমার পুনশ্চ নিবেদন যে, উপরে প্রামাণিক দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা

বলা হইল, তাহাতে উহার শতংাশের একাংশও প্রতিপাদন করা হইল না। কিন্তু অতিবাহুল্যভয়ে এই স্থানে সমাপন করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

---

# পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

কমটির মতানুযায়ী ধর্ম্মের আদর্শ কৃষ্ণকমল বাবু এই পত্রিকাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাবু ইতিপূর্ব্বে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে সহজেই প্রতীতি হইতে পারে যে, কমটের গ্রন্থ সমুদ্র-বিশেষ। তাহা মন্থন করিয়া তাহা-হইতে সারোদ্ধার করা—ব্যপারটি যে বড় সহজ তাহা নহে; লেখকের মত সার-গ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তি দ্বারাই তাহা সম্ভবে।

তাঁহার প্রবন্ধটির সার কথা এই যে, মনুষ্যে মনুষ্যে সহানুভূতি-বিস্তারই কমটের মতে প্রধান ধর্ম্ম। কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে "লেখা পড়ার চর্চ্চাকারী কোন ব্যক্তিই সাহস পূর্ব্বক অস্বীকার করিতে পারেন না যে পরের সুখে-সুখী এবং পরের ক্লেশে ক্লেশ যুক্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ একটি গুণ। আদম স্মিথ তাঁহার Moral sentiments বিষয়ক গ্রন্থে ইহা এক প্রকার জ্যামিতির তত্ত্বের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাও কমটির নূতন আবিষ্ক্রিয়া নহে, কমটের নূতন আবিষ্ক্রিয়া এই যে, তিনি কহেন, এই সহানুভূতিকেই আমাদের ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা ও মূলীভূত কারণ করিয়া তুলিতে হইবেক।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এ-যাবৎ কাল লোকে যে-সিংহাসন ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে দিয়া আসিতেছে—কমটি সেই সিংহাসনে সহানুভূতিকে বসাইতে চা'ন। এখন সহানুভূতি সত্যসত্যই সে সিংহাসনের যোগ্য কি না তাহাই বিচার্য্য।

কমটের মতে সহানুভূতি আর-দশটা প্রবৃত্তির মধ্যে একটা প্রবৃত্তি—এ বই আর কিছুই নহে। কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেছেন—"কমটের মতে কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভুত্বের ইচ্ছা, যশের ইচ্ছা, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি স্নেহ, সাধারণের প্রতি সহানুভূতি, এই গুলি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি।" তা যদি হয়—তবে কমটি প্রবৃত্তি দিয়াই প্রবৃত্তিকে দমন করিতে বলিতেছেন। এক প্রবৃত্তির সবিশেষ প্রাদুর্ভাবে অন্যান্য প্রবৃত্তি দমনে থাকিতে পারে—ইহা আমরা অস্বীকার করি না; এরূপ প্রবৃত্তি-দমনের দৃষ্টান্ত পশুদিগের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে

পাওয়া যায়। পশুদিগের যখন অপত্য-স্নেহ প্রবল হয়—তখন তাহাদের ভয়-প্রবৃত্তি একেবারেই মন-হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়; কোন একটা বড় জন্তু যদি একটা ক্ষুদ্র মুরগীর ছানা'র নিকট-পানে যায়—ধাড়ী মুরগী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি তাড়া করে; মাছের প্রতি বিড়ালের খুবই লোভ, কিন্তু মনুষ্যের ভয়ে তাহার সে লোভ সব-সময় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না;—ই-ত্যাদি। মনুষ্যের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু হইলে হইবে কি—প্র-বৃত্তি স্বভাবতই অন্ধ, এমন কি—প্রবৃত্তি জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দী; প্রবৃত্তি যেখানে যে অংশে প্রবল হয়, জ্ঞান সেখানে সেই অংশে মোহে অভিভূত হয়; আর, জ্ঞান যে-খানে যে-অংশে প্রাদুর্ভূত হয়, প্রবৃত্তি সেখানে সেই অংশে দমনে থাকে; জ্যামিতির তত্ত্বের ন্যায় ইহা একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। কাম ক্রোধ লোভ যখনি অতি-মাত্রায় প্রবল হয়—তখন লোকে একেবারেই জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে; তেমনি আবার, উত্তেজিত কাম-ক্রোধাদির উপরে যখন জ্ঞানের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি জাজ্বল্য-রূপে নিপতিত হয়, তখন আপনা-হইতেই তাহাদের তেজ নরম পড়িয়া আসে। সহানুভূতি-প্রবৃত্তি যে, এ-নিয়মের এলাকা-বহির্ভূত, তাহা নহে;—সে-দিন ভারতবর্ষীয় শ্বেতাঙ্গ-দিগের সহিত ব্রানসন্ সাহেবের কেমন প্রবল সহানুভূতি হইয়াছিল, কিন্তু সে সহানুভূতি যে অন্যায়ের কতদূর পক্ষপাতী তাহা কাহারো অবি-দিত নাই। এখানে কি দেখা যাইতেছে? দেখা যাইতেছে যে, ব্রানসন সহানুভূতি-প্রবৃত্তির উত্তেজনা-প্রভাবে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহানুভূতিই বলো, আর অন্য কোন প্রবৃত্তিই বলো, তাহার উত্তে-জনায় যে কখনই কোন ভাল কার্য্য হয় না—ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে;—সে কার্য্য অন্ধভাবে হয় বলিয়াই তাহার প্রতি আমাদের যত কিছু আপত্তি। প্রবৃ-ত্তির কাছে পাত্রাপাত্রের বা ন্যায়ান্যায়ের বিচার নাই;—কোন প্রবৃত্তিকে যদি মনো-রাজ্যের রাজারূপে অভিষিক্ত করা যায়, তবে সে রাজা উপলক্ষে এই প্রবাদটি সম্পূ-র্ণই খাটে—"অব্যস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ;" তাহা দ্বারা ভাল কাজ হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার উপর আমাদের কোন আস্থা থাকিতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সহানু-ভূতির নিজের এমন-কোন রাজোচিত গুণ নাই যাহাতে মনের সিংহাসনে তাহার অধিকার জন্মিতে পারে। ইহার উত্তরে কৃষ্ণকমল বাবু হয়তো এইরূপ বলিবেন—কমট বলিয়াছেন বটে যে, "সহানুভূতিকেই আমাদের ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা ও মূলীভূত কারণ করিয়া তুলিতে হইবেক," কিন্তু তা-হাকে অসহায় অবস্থায় একাকী রাজত্ব করিতে দেওয়া হইতে পারে না—জ্ঞানকে তাহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা বিধেয়—ইহাই কম্‌টির নিগূঢ় অভিপ্রায়। এখানে ইংলণ্ডের রাজার কথা মনে পড়ে,—রাজা কেবল নামেই রাজা—কাজে মন্ত্রীই রাজা। ঐরূপ কৃত্রিম নাম-করণ ইংলণ্ডের

স্বদেশোচিত একটি পুরাতন প্রথা—তাহা ইংলণ্ডেকেই সাজে; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনাস্থলে যে যাহা—তাহাকে তাহা বলাই ভাল, তাহা হইলে—আর-কিছু না হো'ক্—কথার ঘোর-ফের হইতে আপাততঃ পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা-স্থলে—সহানুভূতিকে ধর্ম্মনীতির নিয়ন্তা না বলিয়া ধর্ম্ম-নীতিকে সহানুভূতির নিয়ন্তা বলিলেই ঠিক হয়।

অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায়, মনুষ্যের সহানুভূতি প্রথম প্রথম সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রে এলোমেলো ভাবে কার্য্য করে; পরে জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত পথ অনুসরণ করে। যতক্ষণ সহানুভূতির বা (মৈত্রী ভাবের) সংকীর্ণতা-দোষ জ্ঞান-দ্বারা প্রক্ষালিত না হয়—ততক্ষণ বৈরীভাব বলিয়া একটা পার্শ্বচর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকে;—আপনার স্ত্রীপুত্রকে অন্ধভাবে ভাল বাসিতে গেলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠে;—পারস্য দেশের সহিত বৈরিতার প্রভাবে গ্রীকদিগের স্বদেশানুরাগ যেমন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—সহজ অবস্থায় সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে সহানুভূতি অন্ধ-প্রবৃত্তি আকারে কার্য্য করে, সেই পরিমাণে তাহার সহিত বৈরীভাব যুক্ত থাকে। ইহা তো আমাদের চক্ষের সাম্‌নেই পড়িয়া আছে যে, মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে-পরিমাণে বেশী, পর-জাতির প্রতি বৈরীভাবও সেই পরিমাণে বেশী; মুসলমানদিগের মধ্যে রীতিমত জ্ঞানের চর্চ্চা হইলেই এইরূপ বৈরীভাব হইতে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারে। অতএব অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় সহানুভূতিকেও জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত করা বিধেয়। জ্ঞান-দ্বারা এইরূপ যে, নিয়মিত করা, ইহার দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথম, বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা; দ্বিতীয়, ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা। বিষয়-বুদ্ধির লক্ষ্য স্বার্থ, ধর্ম্ম-বুদ্ধির লক্ষ্য পরমার্থ। এ বিষয়টি আমরা গত সংখ্যক ভারতীতে বিশদরূপে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি—সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

এখানে কেহ বলিতে পারেন যে, "বিষয়-বুদ্ধিই বা কি—আর ধর্ম্ম বুদ্ধিই বা কি—বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া সহানুভূতির প্রতি একবার ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখ; সহানুভূতি বলিয়া মনুষ্যের যে একটি প্রবৃত্তি আছে তাহা কোন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকিবার নহে, মনুষ্য-মাত্রই মনুষ্যের সহানুভূতির পাত্র।" আমরা বলি যে, জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত না হইলে সহানুভূতি স্বভাবতই ওরূপ বন্ধন-মুক্ত হইতে পারে না কিন্তু সে কথা যাক্—এখন আমরা তর্কের খাতিরে তাঁহার ঐ কথাই শিরোধার্য্য করিলাম; তাহা হইলে ফলে কি দাঁড়ায় দেখা যা'ক্;—যদি প্রবৃত্তি-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া জন-সমাজের যৎপরোনাস্তি সুশৃঙ্খলা-সাধন কখনও মনুষ্য-জাতির সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে ইহা আর অস্বীকার

করিবার জো থাকিবে না যে, মৌমাছি এবং পিপীলিকার সমাজ মনুষ্য-সমাজ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মৌমাছিরা কেমন দেখ সকলেই সকলের জন্য অষ্টপ্রহর কার্য্য করিতেছে—বিরাম যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না; তাহাদের সুশৃঙ্খল সমাজের তুলনায় আমাদের সভ্যতম সমাজ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব? শ্রেষ্ঠ নয় কিসে?—তাহারা সত্য কাহাকে বলে জানে না, মঙ্গল কাহাকে বলে জানে না, ন্যায় কাহাকে বলে জানে না,—প্রবৃত্তিই তাহাদের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; ইহাতেই মনুষ্যের সহিত তাহাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

কম্‌ট এ দিকে বলিতেছেন—প্রবৃত্তি-বিশেষকে মনের অধিপতি-রূপে বরণ করিলেই ধর্ম্ম-কার্য্য চলিতে পারে,—ও-দিকে বলিতেছেন "উন্নতিই আমাদের উদ্দেশ্য।" উন্নতি বলিতে দুইরূপ উন্নতি বুঝাইতে পারে,—(১) মনুষ্যের আত্মার উন্নতি—ইহা অনন্ত উন্নতি—ইহা ধর্ম্ম-বুদ্ধি-ব্যতিরেকে শুদ্ধ কেবল প্রবৃত্তি দ্বারা ঘটনা-সাধ্য নহে; (২) জন-সমাজের সুশৃঙ্খলার উন্নতি,—আমাদের মতে ইহা আত্মার উন্নতিরই ফল-স্বরূপ। কিন্তু যদি আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল জন-সমাজের সুশৃঙ্খলাই উন্নতির চরম লক্ষ্য হয়, তবে সে উন্নতিকে অনন্ত উন্নতি বলা সঙ্গত নহে—কেননা মধুমক্ষিকারা সে-উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। মধুমক্ষিকা-সুলভ পরস্পর-সহানুভূতি—একটা অন্ধ প্রবৃত্তি—যদি মনুষ্যের একমাত্র পথ-প্রদর্শক হয়, তবে মনুষ্য-সমাজের খুবই সুশৃঙ্খলা সাধিত হইতে পারে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু মনুষ্যের সেরূপ অবস্থাকে আমরা উন্নতির অবস্থা বলিতে পারি না। মনুষ্যের পক্ষে—প্রবৃত্তির অধীনতাই অবনতি—আত্মার আধিপত্যই উন্নতি; আর, ধর্ম্ম-বুদ্ধিই সে উন্নতির পথ-দর্শক।

এখন ধর্ম্মবুদ্ধি কি? ধর্ম্মবুদ্ধি কি তাহা জানিতে হইলে—মনুষ্যের ধর্ম্ম কি তাহা জানা আবশ্যক;—মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? জলের ধর্ম্ম যেমন শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উত্তাপ, মনুষ্যের ধর্ম্ম সেইরূপ মনুষ্যত্ব। যে বুদ্ধি মনুষ্যত্বের অনুকূল তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি; এই জন্য মনুষ্যত্ব কি তাহার সন্ধান পাইলেই, ধর্ম্মবুদ্ধি কি—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। মনুষ্যত্ব কি? সত্যের জন্য সত্যকে ভালবাসিতে কেবল মনুষ্যকেই দেখা যায়, পশুরা ইহার দিক্ দিয়াও যায় না; এই জন্য আমরা বলি যে, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র জীব—সে দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসে—দুই দিনে চলিয়া যায়; এ হিসাবে অন্য জীবের সহিত মনুষ্যের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদ তবে কি হিসাবে? প্রভেদ যে-হিসাবে তাহা এই—গোড়ার সত্যের জন্য অন্য জীবদিগের কোন মাথাব্যথা নাই, মনুষ্যই কেবল তাহার একমাত্র অনুরক্ত ভক্ত! আপাততঃ মনে হইতে পারে—ইহাতে আর বিশেষ কি হইল? কিন্তু

যখন দেখা যায়—সত্য কি বৃহৎ ব্যাপার, কালে তাহার আদি অন্ত পাওয়া যায় না, গভীরতায় তাহার তল পাওয়া যায় না, আকাশে তাহার ব্যাপ্তির ইয়ত্তা পাওয়া যায় না,—অথচ সেই সত্যের জন্য মনুষ্যের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই শান্তি মানে না—তখন মনে হয় যে, এরূপ পরমাশ্চর্য্য অনন্ত ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি কেবল মনুষ্যেরই সম্ভবে! সচ্ছন্দে একজন কেহ বলিতে পারে—"তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্য—সত্যের খবরে তোমার কি কাজ! খাও, দাও, লোকজনের সহিত আমোদ আহ্লাদ কর, নিদ্রা যাও,—বস্!" কিন্তু মনুষ্যের আত্মা এ কথায় প্রবোধ মানিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের আত্মার স্পৃহা পরিপূর্ণ সত্যের দিকে এমনি প্রবল-রূপে আকৃষ্ট রহিয়াছে—যে, সে নাড়ীর টান কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে। মূল সত্যের জন্য আত্মার এই যে আঁকুবাকু—ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? মূল-সত্যকে মনুষ্য আজিও সমুচিত আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এবং কখনও যে পারিবে—তাহারও সম্ভাবনা নাই,—তবুও কেন মনুষ্যের আত্মা মূল সত্যের পানে তৃষিত চাতকের ন্যায় যুগযুগান্তর চাহিয়া আছে!—কেবল কি চাহিয়া থাকা-ই সার! শিশুর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য স্তন্য দুগ্ধ রহিয়াছে,—মনুষ্যের আত্মার পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য কি কিছুই নাই! এ যদি হয়, তবে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা পশুত্ব শত গুণে ভাল! কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মূল সত্যের প্রতি আত্মার ঐ যে ঐকান্তিক স্পৃহা—তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। আত্মা মূল সত্যকে সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করিতে না পারুক্, যুগে যুগে কিছু কিছু করিয়া আয়ত্ত করিয়া আসিতেছে—সাধক-গণের আপনার আপনার আত্মার পরীক্ষা-ই ইহার বলবৎ প্রমাণ। প্রকৃত সাধক-গণের মধ্যে মুখ্য অভিসন্ধি এবং মুখ্য কর্ত্তব্য লইয়া মত-ভেদ নাই—সকল শৃগালেরই এক রায়;—সাধকের আত্মা যখনই মূল সত্যের সহিত একতানে মিলিত হয় তখনই প্রশান্ত জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া নবীভূত হইয়া উঠে। স্পেন্‌সরের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও ইহা অকাট্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জগতের সকল সত্যই আপেক্ষিক সত্য—কেবল জগতের মূল-স্থিত সত্যই পরিপূর্ণ সত্য। তবে, স্পেন্সর বলেন—সে মূল-সত্য একেবারেই অজ্ঞেয়, সুতরাং আমাদের জ্ঞান-ও-কার্য্যের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত; কিন্তু স্পেন্‌সর ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মূল সত্যের প্রভাবেই সমস্ত জগৎ সত্য হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগতের সহিত মূল-সত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; তবেই হইল যে, আমাদের আত্মার সহিত—জ্ঞান-প্রেমের সহিত—মূল-সত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্যই আমরা বলি যে, মূল সত্যের প্রভাব যখন সকল সত্যেতেই বর্ত্তমান—তখন মূল-সত্যের প্রতি আমাদের জ্ঞানের ঐ যে, আকর্ষণ, উহার মধ্যেও সেই তাহার প্রভাব কার্য্য করিতেছে;—মূল-সত্য স্বীয় প্রভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাই-

তেছেন—আমাদের কল্পনা-প্রভাবে নহে। অনতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, মূল-সত্যের প্রতি আত্মার এই যে আন্তরিক টান, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব;—শৈত্য যেমন জলের ধর্ম্ম—উত্তাপ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম—মূল-সত্যের প্রতি আকর্ষণ সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্ম। যে-বুদ্ধি সেই আকর্ষণের অনুকূল—তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি; আর, যে কার্য্য ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে কৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম-কায্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূল-সত্যের উপরে যেমন সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই রূপ মনুষ্যের ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা মূল-সত্য কাহাকে বলি তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা এখন আবশ্যক;—

মূল সত্য সকল সত্যেরই মূল; সুতরাং তাহা পরিপূর্ণ সত্য—তাহাতে অপূর্ণতাসূচক কোন লক্ষণই থাকিতে পারে না। জ্ঞান, মঙ্গল, ন্যায়, ইত্যাদি যত কিছু সদ্ভাব আছে সমস্তই সেই একাধারে বর্ত্তমান—এবং অন্যায় অমঙ্গল অজ্ঞান এ-সকল অসদ্ভাব সেখানে স্থান পাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলি—সমস্ত জগৎ মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের মূল-স্থিত ন্যায় মঙ্গল ও জ্ঞানের উপর মনুষ্যের এমনি অটল আস্থা যে, যদিও আমরা জগতের অপূর্ণতা-নিবন্ধন অন্যায়ের জয়—অমঙ্গলের জয়—অসত্যের জয় শত শত বার দেখিতে পাই, তথাপি আমরা ইহা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হই না যে, জগতে সত্যের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গলের জয় হইবেই হইবে, ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে। জগতের মূলস্থিত ন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি জগৎকে ঠকাইতে যায়, সে আপনি ঠকে; যে ব্যক্তি জগতের হিতসাধন করিতে যায় সে আপনার হিতসাধন করে; যে ব্যক্তি জগতের চিরস্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে যায় সে আপনারও চিরস্থায়ী উন্নতি সাধন করে; যে ব্যক্তি জগতের অক্ষয় জীবন এবং অনন্ত উন্নতির জন্য আপনার প্রাণ ঢালিয়া দেয়, সে ব্যক্তি নিজেও অক্ষয় জীবন এবং অনন্ত উন্নতি লাভ করে। ঈশ্বরের ন্যায়-নিয়ম—প্রতি-মনুষ্যের আত্মা এবং সেই আত্মা ছাড়া আর সমস্ত জগৎ—এইদুইকে তৌল-দণ্ডের দুই পাত্রে ধরিয়া আছে;—ন্যায়বান্‌ মূল সত্য মধ্য-স্থলে আছেন বলিয়াই মনুষ্যের আত্মা যেমন জগতের মঙ্গল চায়, জগৎও তেমনি মনুষ্যের আত্মার মঙ্গল চায়। যে ব্যক্তি জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার হৃদয়ের ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে এক দিকে রাখ এবং জগৎকে একদিকে রাখ, দেখিবে,তাহার গুরুত্ব জগতের গুরুত্ব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কাণ্ট বলিয়াছেন যে, একদিকে আকাশ-স্থিত অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎ আর-এক দিকে আত্মার অভ্যন্তরস্থিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি, এই দুইটি আশ্চর্য্য ব্যাপার যেমন ঈশ্বরের অপার মাহাত্ম্যে মনকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, এমন আর কিছুই নহে; ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একটি-

আত্মার অতল-স্পর্শ গভীরতা—অসংখ্য জগতের অপরিমেয় ব্যাপ্তির সহিত ওজনে সমান। যদি জগতেরই অনন্তকাল উন্নতি চলিতে পারে—তবে কি জগতের ব্যথার ব্যথী—সুখের সুখী—মনুষ্য দুই-চারি-দিন পৃথিবীতে মহা রব-দব লম্ফ-ঝম্প আস্ফালন করিয়া—কিয়ৎকাল পরেই জন্মের মত সাড়া শব্দ বিসর্জ্জন দিয়া অগাধ মহা-শূন্যে পরিণত হইবে! তাহা যদি হয় তবে জগতের মূলস্থিত ন্যায়ের গাত্র চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। জগতের মূলেতেই এইরূপ ন্যায়ের বিপর্য্যয়-দশা!—ইহা যদি একবার মনেতেও ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে ন্যায়-ও-ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিতে আমাদের হস্ত পদ একেবারেই অসাড় হইয়া পড়ে। মূল সত্য যদি সত্যসত্যই লক্ষ্যবিহীন—উদ্দেশ্য-বিহীন—হ'ন, কিম্বা যদি মূল সত্যের উদ্দেশ্য সত্যসত্যই আত্মার বিনাশ ও জগতের অমঙ্গল হয়, তবে কখনই আমরা মঙ্গলকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত;—তাহা হইলে মঙ্গল-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে ঘোরতর বিড়ম্বনা। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, পৃথিবী বরং সূর্য্যের আকর্ষণ ছাড়াইয়া লইয়া অন্ধকার-ময় মহাশূন্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গল-নিষ্ঠ—আত্মা কখনই মঙ্গলময় মূল সত্যের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ পাইতে পারে না। আত্মার অভ্যন্তরে অন্বেষণ করিলেই এই আনন্দ-জনক সত্যটি উপলব্ধি করা যাইতে পারে—দূরে যাইতে হয় না। মূল-সত্যের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে একটি মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ—ইহা একদিকে আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক, আর একদিকে আমাদের আত্মার অমরত্বের নিদান। কমটি মূল-সত্যকে ছাড়িয়া, অবিনাশী আত্মার অনন্ত উন্নতিকে ছাড়িয়া, জনসমাজের অনন্ত উন্নতির প্রত্যাশা! ইহাই নাম "গোড়া কাটিয়া আগায় জল।"

আমরা যেখানে বলি মূল-সত্যেই আমাদের বিশ্বস, কম্‌টি সেখানে বলেন "প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস"। ইহা বলিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন - তাহা হইলে ও-কথাটি আমরা শিরোধার্য্য করিয়া, তাহার উপর আর-একটি কথা কেবল এই বলিতাম যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীও যেমন বিশ্বাস্য—আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীও তেমনি বিশ্বাস্য। আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী কাহাকে বলে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সহিত তাহার প্রভেদ কি, ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে এখানে আমরা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার স্বল্প আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি,—এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, ধ্রুব-তারার দিকে চুম্বক-শলাকার আকর্ষণ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, মূল-সত্যের প্রতি আত্মার আকর্ষণ সেইরূপ আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞেয় বিষয়, মনুষ্য জ্ঞাতা পুরুষ। জ্ঞেয় বিষয়-সকলকে জ্ঞানে আয়ত্ত করা মনুষ্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, জ্ঞাতা পুরুষকে জ্ঞানে আয়ত্ত

করাও তেমনি আবশ্যক। বাহ্য বিষয় সকলকেও আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি না, আমাদের আপনাদের আত্মাকেও আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি না; বাহ্য বিষয়-সকলও আমরা কিছু কিছু জানি, আত্মাকেও আমরা কিছু কিছু জানি। যাহাকে যতটুকু জানি—তাহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক জানিবার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা অবশিষ্ট থাকে। কোন বিষয়েই—যথেষ্ট সত্য জানা হইয়াছে বলিয়া মনুষ্য অহঙ্কার করিতে পারে না; মনুষ্য আপনার জ্ঞানের মহিমা জ্ঞাপনার্থে কেবল এই পর্য্যন্তই বলিতে পারে যে, সত্যের প্রতি তাহার অসামান্য টান আছে, তাহার সত্য-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি মানিবার নহে। সত্যের এই যে দুর্নিবার পিপাসা—ইহাই মনুষ্য-জ্ঞানের জীবন। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু "প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস"—এই কথাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, "প্রামাণিক দর্শন বলিতে চাহে না—কেমন করিয়া পৃথিবী সৃষ্ট হইল, অথবা পুরুষের অস্থি হইতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইল অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল ইত্যাদি। প্রামানিক দর্শন বলে—জ্যামিতিতে বিশ্বাস কর, বীজগণিতে বিশ্বাস কর, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, শরীর বিধান, সমাজ শাস্ত্র, ও ধর্ম্মনীতি (Morals) এই সমস্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস কর; এই বিশ্বাস করিতে মতভেদ নাই, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, অনৈক্য নাই। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই ঐ সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। কমট কহেন এই সকল সিদ্ধান্তই প্রামানিক দর্শনের বনিয়াদ।" ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, জ্যামিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের কতকগুলি আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তেই মনুষ্যের জিজ্ঞাসা বা জ্ঞান-পিপাসা সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চুম্বক-শলাকা ধ্রুবতারার দিকে আকৃষ্ট থাকে—ইহা যেমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, সেইরূপ আত্মার লক্ষ্য পূর্ণ সত্যের দিকে আকৃষ্ট থাকে ইহা একটি আধ্যাত্মিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রভাবে আত্মার সত্য-জিজ্ঞাসা কিছুতেই নিবৃত্তি মানিবার নহে। যে দিন মনুষ্যের সত্য-জিজ্ঞাসা একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, সেইদিন তাহার মনুষ্যত্বও একেবারে চলিয়া যাইবে;—তাহার জ্ঞানের জীবন বিনষ্ট হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র যেরূপ অপক্ব সিদ্ধান্ত হইতে ক্রমে ক্রমে পরিপক্ব সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, অধ্যাত্ম-বিদ্যাও সেইরূপ। এখন যেমন Caloric অর্থাৎ তাপবাহী সূক্ষ্ম পদার্থ-বিশেষ-হইতে উত্তাপের উৎপত্তি কেহই বিশ্বাস করেন না, সেইরূপ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টিও কেহই বিশ্বাস করেন না, উভয় বিশ্বাসেরই কাল এখন গিয়াছে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, আণবিক কম্পনই উত্তাপের কারণ—এবং পরিপূর্ণ মূল সত্যই সকল জগতের মূলাধার। আণবিক প্রকম্পন কিরূপ তাহা যেমন আমরা বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা জানি, মূল

সত্য কিরূপ তাহা তেমনি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা দ্বারা জানি। তবে কি? না পূর্ণ-মাত্রায় আমরা ইহাও জানি না, উহাও জানি না। কৃষ্ণকমল বাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম যাহা কিছু ইহারি মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই সামাজিক উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, মনুষ্যের আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল জনসমাজের সুশৃঙ্খলা সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই উন্নতি বলিয়া ধরা যায়, তবে মধু-মক্ষিকার সমাজের মত একটা সমাজ গঠন করিতে পারিলেই মনুষ্যের উন্নতির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; তাহা হইলেই অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, মধুমক্ষিত্বই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ ও মধুমক্ষিকা মনুষ্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্য্যাদার প্রতি আমরা অন্ধ নহি,—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বার্থ-সাধনের খুবই সহায়তা করিতে পারে ইহা আমরা স্বীকার করি, —এমন কি গৌনরূপে পরমার্থ সাধনেরও সহায়তা করিতে পারে—কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানই পরমার্থ-সাধনের সবিশেষ উপযোগী—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অধ্যাত্মবিদ্যাই আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারে যে, মূল-সত্যের সহিত আত্মা এক-তানে মিলিত হইলে—সমস্ত জগতের মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রতিজনের উদ্দেশ্য এক তানে মিলিত হইলে—প্রতি-জনের আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জন-সমাজের উন্নতি সাধিত হইতে থাকে।

“আত্মার উন্নতি” এই কথাটি শুনিয়া কৃষ্ণকমল বাবু হয় তো হাসিবেন, তিনি হয় তো বলিবেন—“আপনার আপনার আত্মাকে লইয়াই যদি সকলে ব্যস্ত রহিলেন, তবে জন-সমাজের গতি কি হইবে? এ উপলক্ষে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন “যাবতীয় প্রাচীন দর্শন আমি, আমার সুখ, আমার দুঃখ পরিহার, আমার স্বর্গসুখ ভোগ, আমার মোক্ষ, এই সকল ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য জানে না। কিন্তু প্রামাণিক-বাদ (Positivism) সকলের সুখ ও সকলের স্বচ্ছন্দ ইহাকেই উদ্দেশ্য স্বরূপ পরিগ্রহ করে।” ইহার অর্থ অবশ্য এই যে, কমটির ধর্ম্মের মধ্যে “আমি” “আমার” এ সকল কথা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু কিছু পরেই আবার লেখক বলিতেছেন—“আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালবাস, আপনার জন্মভূমিকে ভালবাস—তাহাতেও তোমার ভালবাসার খাঁই না মেটে সমস্ত নরজাতিকে ভালবাস, যদি পার তো যতদূর পার ইতর জন্তু-সকলকে ভালবাসিতে পারিলেও ক্ষতি নাই”;—এখানে এ কি দেখিতেছি! এখানে দেখিতেছি “আমি” “আমার” এ-ভাবগুলার ছড়াছড়ি-ব্যাপার! স্ত্রী-পুত্র যে—সে আমার স্ত্রী-পুত্র; জন্ম-ভূমি যাহা—তাহা আমার জন্ম-ভূমি; নর-জাতি যে—সে আমার স্বজাতীয় জীব; পশু-পক্ষীর সহিত “আমার” দূর সম্পর্ক বলিয়া তাহাদিগকে ভাল বাসিতে পারি—ভাল,—না পারি—

ক্ষতি নাই! এই তো দেখা যাই-তেছে যে, আমার স্ত্রী-পুত্র হইতে আমার স্বজাতীয় জীব (অর্থাৎ নরজাতি) পর্য্যন্ত যে-একটী ভালবাসা-বিস্তারের সোপান-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহাই ভালবাসার মুখ্য পরিসর, এবং তাহার প্রতি-ধাপেই 'আমি' 'আমার' জড়িত রহিয়াছে। কাজেই 'আমি' 'আমার' এই শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দিলে কমটির অতগুলা কথা একে-বারেই ধূমে পরিণত হইয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, আত্ম ও পর এই দুয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত ভালবাসা দাঁড়াইতে পারে না। পরকে ছাড়িয়া দিলেও ভালবাসা চলিতে পারে না—আপনাকে ছাড়িয়া দিলেও ভালবাসা চলিতে পারে না। আত্ম-পরের পরস্পর তন্ময়-ভাবের উপরেই ভালবাসার আদান-প্রদান সুচারু-রূপে চলিতে পারে। ভালবাসা নিজেই একটি আনন্দের বিষয় ;—কাহার আনন্দের বিষয়? যে ভালবাসে তাহারই। আমি যদি ভালবাসি তাহাতে আর কাহারো আনন্দ হৌক আর না-ই হৌক, তাহাতে আমার আনন্দ হইবে তা-হাতে আর ভুল নাই। পরের সুখে যদি আমার আনন্দ না হয় তাহা হইলে পরকে ভালবাসার কোন অর্থই থাকে না। এইরূপ দেখা-যাইতেছে যে, যদি আমি ও আমার এই ভাব একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া কমটের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য একটা প্র-কাণ্ড অট্টালিকা হইলেও কম্‌টের নিজের কথাতেই তাহা সমূলে ভূমিসাৎ হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, মূল স-ত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মঙ্গল-সাধন করিলেও পরের মঙ্গলসাধন করা হয়, পরের মঙ্গলসাধন করিলেও আপনার মঙ্গল সাধন করা হয়; কেননা মূল সত্যের প্র-ভাবে আত্ম-পর সমস্তই এক মঙ্গল-সূত্রে আবদ্ধ। সেক্‌স্‌পিয়ার এ বিষয়ে কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes.

করুণা-গুণ বলপূর্ব্বক নিঙ্‌ড়াইয়া আ-নিতে হয় না,—সুধীর বারিধারার ন্যায় তাহা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যভূমিতে নিপতিত হয়, তাহা যুগল কল্যাণ-ময়ী—দাতার প্রতিও কল্যাণ বর্ষণ করে, গৃহীতার প্রতিও কল্যাণ বর্ষণ করে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যে, আমার সুখ, আমার মোক্ষ, ইত্যাদি আছে তাহার অর্থ তো আর ইহা নহে যে, শাস্ত্রকার তাঁহার নিজের সুখের জন্যই—নিজের মোক্ষের জন্যই—ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন; সমস্ত জন-সমাজ যদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তবে সমস্ত জন-সমাজেরই মঙ্গল হইবে—ইহা যে শাস্ত্র-কারের অভিপ্রেত নহে ইহা কে বলিল? আমরা কথায় বলি "জন-সাধারণ," কিন্তু জন-সাধারণ জিনিস্‌-টা কি? শত সহস্র আমিরই (অর্থাৎ আত্মারই) কেবল সমষ্টি! সে আমি-গুলি বাদ দিলে জন-সাধারণের কি-আর অবশিষ্ট থাকে? যন্ত্রায়মান চর্ম্ম-পুত্তলিকা-

প্রবাহের শূন্য-গর্ত্ত আড়ম্বর—এ ভিন্ন আর কি ? কিন্তু বাস্তবিক কিছু-আর জন-সমাজ কলের পুতুলের সমাজ নহে—তাহা জ্যান্ত আত্মারই সমাজ ; "আমি" এবং "আমার" তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুস্যূত রহিয়াছে ; এমন কি—ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তি যখন নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে ডাকেন তখনও তিনি বলেন "আমার ঈশ্বর"। তবে যদি কৃষ্ণকমল বাবু এইরূপ বলেন যে, স্বর্গ সুখ কেবল আত্ম-সুখ মাত্র, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে লইয়া সে সুখ ভোগ করা যায় না, সুতরাং সে সুখ-সাধনের বিধি দিলে লোকের স্বার্থপরতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় ; তবে তাহার উত্তর এই যে, মনে কর এক-ব্যক্তি শীত-প্রধান সাইবিরিয়ার জনশূন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহার গায়ে শীত বস্ত্র নাই ; এস্থলে তাহাকে যদি কোন হিতৈষী ব্যক্তি শীতবস্ত্র পরিধানের উপদেশ দেন, কমটি কি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিবেন—"তুমি এমন কর্ম্ম করিতেছ ! দেখিতেছ না—শীতবস্ত্র গায়ে দিলে উহার কেবল আপনারই সুখ হইবে, উহার স্ত্রী পুত্র পরিবার আর কেহই উহার সে-সুখের ভাগী হইবে না ; এরূপ উপদেশ-দান পূর্ব্বেকার লোকেরা যাহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন—কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীতে উহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।" এইরূপ যুক্তিতেই বলা যাইতে পারে যে, পরলোক-প্রয়াণের সময় স্ত্রী পুত্র কেহই সঙ্গে যাইবে না—অতএব পরলোকের সুখের জন্য পুণ্য-সংগ্রহ করিতে বলা—অতি অহৃদয় ব্যক্তির কার্য্য। কৃষ্ণকমল বাবু যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, পরকালোচিত ধর্ম্ম ইহ-কালোচিত ধর্ম্মের বিরোধী পক্ষ, তাহা হইলে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডের উপর একবার-মাত্র চক্ষু বুলাইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার সে ভ্রম তিরোহিত হইয়া যাইবে ;—তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, ইহকালের ধর্ম্মই পরকালের ধর্ম্ম ;—সে ধর্ম্ম কি ? না, ঈশ্বরকে ভক্তি করা, পিতামাতাকে ভক্তি করা স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করা, সত্য কথা বলা—সত্য ব্যবহার করা, ইত্যাদি ; এবং ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, ইহকালের আত্মপ্রসাদ এবং পরকালের স্বর্গসুখ—একই অভিন্ন বস্তু। এ বিষয়ে আমাদের চরম বক্তব্য এই যে, পৌরাণিক হিন্দু-শাস্ত্র স্বতন্ত্র এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক হিন্দু-শাস্ত্র স্বতন্ত্র ; শেষোক্ত হিন্দু-শাস্ত্রে ঐহিক-পারত্রিক আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য কোন স্বর্গ-সুখকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই !

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ কমটের উপদেশ হইতে যে কিসে কম তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কমটি যেরূপ সহানুভূতির কথা বলিতেছেন, আমাদের শাস্ত্রে তাহা কেমন-যে নির্দ্দোষ-রূপে বলা হইয়াছে তাহা আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু আগে একটা গল্প বলি। একজন খৃষ্টান বাঙ্গালী একজন হিন্দু বাঙ্গালীকে বলিতেছিলেন "আমাদের দেখ দেখি কেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম—প্রভু বিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "যদি

কেহ তোমার এক গালে চড় মারে তবে তাহাকে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে।” একজন পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গালী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“যাহা কিছু ভাল সব তোমাদের শাস্ত্রেই বলে! তবে কি আমাদের শাস্ত্রে বলে—মানুষ দেখেছ কি অমনি তাড়াইয়া গিয়া লাঠি মারিবে?” অধুনা আমাদের মধ্যে—স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অবিচার করা—একরূপ লৌকিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবুর স্বদেশের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ বোধ হয় স্বতন্ত্র;—আমাদের অনুমানে দুইটি কারণ দেখা দিতেছে, (১) কম্‌টের প্রতি অসামান্য ভক্তি, (২) বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মূঢ়-ধরণের পাণ্ডিত্যের প্রতি চটা-ভাব,—ইহা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্;—এমন অনেক কুসংসর্গ আছে, যাহার সহিত সহানুভূতি করিতে গেলে আপনাকে পতিত হইতে হয়, এবং মন্দকে উৎসাহ দেওয়া হয়; এমন স্থলে সহানুভূতি আত্ম-পর কাহারো পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তবেই দাঁড়াইতেছে, সহানুভূতি-বিস্তারেরও সীমা আছে। অতএব “সকলের প্রতি সহানুভূতি” শুনিতে যেমন জোরের শুনায় উহা প্রকৃত পক্ষে তেমন নহে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার উপর কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না;—আমাদের শাস্ত্রে আছে “মৈত্রী করুনা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ-পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনং”। সুখের প্রতি মৈত্রী, অর্থাৎ পরের সুখে সুখ-বোধ; দুঃখের প্রতি করুণা, অর্থাৎ পরের দুঃখে দুঃখ-বোধ; পুণ্যের প্রতি মুদিতা (অর্থাৎ অনুমোদন); এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা (অর্থাৎ তাচ্ছিল্য); এই-সকল ভাব দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সাধন করিবে। দেখ—কেবল সহানুভূতির চর্চা অপেক্ষা এ সাধন কত নির্দোষ এবং শুভ-জনক! ঐ উপদেশ-বাক্যটিতে কেবল সুখ-দুঃখ ও পুণ্যের প্রতি সহানুভূতি করিবার বিধি আছে—পাপের প্রতি নহে। আবার, পাপের প্রতি পাপাচরণ—যেমন শঠে শাঠ্য—ইহাও শাস্ত্রকারের মতে নিষিদ্ধ; পাপের প্রতি কেবল উপেক্ষারই অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—পাপের প্রতি উপেক্ষা হইলে আর পাপ-সংশোধন হইল কই? শুধু পাপের প্রতি উপেক্ষা এই কথাটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে ঐরূপ দোষ ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করি—কিন্তু পাপের প্রতি উপেক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের প্রতি অনুমোদন—অর্থাৎ উৎসাহ-দান—ইহার বিধি দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক দেখা যায়, পাপকে পাপ দ্বারা পরাজয় করা যায় না, পুণ্যই পাপকে পরাজয় করিতে সমর্থ। পাপের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি লোকের চক্ষের সমক্ষে পুণ্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার গুণে যেমন মনুষ্যের ধর্ম্ম-ভাব উত্তেজিত হইতে পারে ও পাপের প্রতি বিরাগ জন্মিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। ইহাই পাপ-সংশোধনের প্রশস্ত উপায়।

পতঞ্জল মুনির ঐ প্রাচীন উপদেশটি কমটের সহানুভূতির উপদেশ অপেক্ষা কত না সার-গর্ভ ।

কৃষ্ণকমল বাবু বলিতে পারেন—আমাদের শাস্ত্রের উপরি-উক্ত ঐ যে ব্যবস্থা উহার উদ্দেশ্য কেবল আপনার চিত্তের প্রসাদন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পরের সুখে যদি আমার নিজের আনন্দ না হয় তাহা হইলে পর'কে ভালবাসার কোন অর্থই থাকে না। প্রসন্ন-চিত্তে ভালবাসাই ভালবাসা ; ওষুধ-গেলা রকমের ভালবাসা ভালবাসাই নহে। ধর্ম্ম-কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্ত-প্রসাদ লাগিয়া থাকা আবশ্যক ; ধর্ম্মানুষ্ঠাতার যতক্ষণ না চিত্ত-প্রসাদ হয়, ততক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। শুধু কার্য্যেতেই ধর্ম্ম হয় না, কার্য্য-কর্ত্তার মনের ভাবেতেই ধর্ম্ম হয়। একই কার্য্য নানা ভাবে কৃত হইতে পারে—যদি তাহা ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে কৃত হয় তবেই তাহা ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া উক্ত হইতে পারে। শুধু যদি কার্য্য লইয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার্য্য হইত, তাহা হইলে একটা অবাস্তব শূন্যভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবারও যে মূল্য, পূর্ণ সত্য পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবারও সেই মূল্য হইত। কিন্তু মনের ভাবকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেবল কৃত কার্য্যেতে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন লক্ষণই বর্ত্তিতে পারে না,—একটা কলের পুতুল আর একটা পুতুলকে হত্যা করিলে সে পাপে লিপ্ত হয় না—একটা ব্যাঘ্র নরহত্যা করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না ; মনুষ্য যদি কেবল একটা যন্ত্র-মাত্র হইত, অথবা পশু-বিশেষ হইত, তবে মনুষ্য মূলেই ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারী হইত না—ইহা জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় সুস্পষ্ট। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই—পরিপূর্ণ মূল সত্যের প্রতি তাহার আত্মার আকর্ষণ আছে বলিয়াই—এবং মনুষ্য সেই আকর্ষণের অনুকূলে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করিতে পারে বলিয়াই—সেইরূপ মূল-সত্য-নিষ্ঠ বুদ্ধিকে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধি বলি ; ও সেইরূপ বুদ্ধি অনুসারে যে কার্য্য কৃত হয় তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম কার্য্য বলি। মূল-সত্য-নিষ্ঠ ধর্ম্ম বুদ্ধি-ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কার্য্য হইতেই পারে না—গতমাসের ভারতীতে এটি আমরা বিশদ রূপে সপ্রমাণ করিয়াছি ; কম্‌টি আর-একরূপ বলেন—ইহা লইয়াই কমটির সহিত আমাদের যত কিছু বিবাদ। গত মাসের ভারতীতে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সার-সিদ্ধান্ত এই ;—মনুষ্যের কার্য্যের উদ্দেশ্য তিনটি, (১) উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন ; (২) উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির যথোপযুক্ত চরিতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার স্থায়ী সুখ-সাধন, এক কথায়—স্বার্থ সাধন; (৩) আপনার প্রকৃত স্বার্থ এবং অন্য-সকলকার প্রকৃত স্বার্থ—এই সকল স্বার্থের যথোপযুক্ত চরিতার্থতা-সাধনের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মূল-সত্যের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন—এক কথায় পরমার্থ-সাধন। পরমার্থ-সাধনই আমাদের মতে ধর্ম্ম-সাধন, এবং পরমার্থ-দর্শী বুদ্ধিই আমাদের মতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি। কেহ যেন এরূপ মনে

না করেন যে, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলে স্বার্থকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে হয়;—স্বার্থ-সাধন করিতে হইলেও প্রবৃত্তিকে উড়াইয়া দিতে হয় না, পরমার্থ-সাধন করিতে হইলেও স্বার্থকে উড়াইয়া দিতে হয় না;—করিতে হয় কেবল—সামঞ্জস্য-সাধন। উত্তেজিত এবং অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য (এক কথায়—স্বার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা তাহার পরে বিবেচ্য; উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা যে-অংশে স্বার্থের অনুমোদিত সে অংশে তাহা কার্য্য-কর্ত্তার বৈষয়িক ক্ষতি-জনক নহে; ঠিক্ এইরূপ যুক্তি অনুসারে পাওয়া যায় যে, আপনার এবং পরের—সকলকার—মঙ্গল (এক কথায় পরমার্থ) অগ্রে বিবেচ্য, আপনার স্বার্থ তাহার পরে বিবেচ্য; আপনার স্বার্থ-সাধন যে অংশে পরমার্থের অনুকূল সে অংশে তাহা ধর্ম্মের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক—বরং তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে,—পরমাত্মার অধীনে জীবাত্মাকে, জীবাত্মার অধীনে মনকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা, যাহা একই কথা,—ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে বিষয়-বুদ্ধিকে, বিষয়-বুদ্ধির অধীনে ইন্দ্রিয়-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; অথবা যাহা একই কথা,—পরমার্থের অধীনে স্বার্থকে, স্বার্থের অধীনে প্রবৃত্তি-গণকে, নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য;—ইহাই, আমাদের মতে, ধর্ম্মের বীজ মন্ত্র। উপসংহার-স্থলে সহানুভূতি বা মৈত্রী সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, যে মৈত্রী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সহসা উৎপন্ন হয়—যেমন বালকে বালকে মৈত্রী—তাহা এক-রূপ; আবার, যে মৈত্রী স্বার্থের মন্ত্রণায় বিধেয় বলিয়া মনে হয়—যেমন রাজনৈতিক সাম, দান, ভেদ, মৈত্রী, ইহার শেষের-টি—ইহা আর-একরূপ; কেবল, যে মৈত্রী পরমার্থ-উদ্দেশে সাধন করা হয়, অর্থাৎ আমার তোমার এবং সকলকার মঙ্গল-সাধন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—ইহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে সাধ্যানুসারে আত্ম-পর-নির্ব্বিশেষে সাধন করা হয়, সেইরূপ মৈত্রীই ধর্ম্ম-নামের যোগ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রধান প্রহরী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে যে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে তাহার দু-এক দিন পরে ভোলানাথ নবাব বাটীর পশ্চাতের রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন। এ রাস্তায় নবাবী আড়ম্বর কিছুই নাই—প্রহরীদিগের শিরস্ত্রাণের লাল রংটুকু পর্য্যন্ত এখান দিয়া দেখা যায় না—

নবাবীয়ানার মধ্যে যা নবাববাটীর পশ্চিম দিগের প্রকাণ্ড প্রাণহীন দেয়ালটা সগর্ব্বে উচ্চে মাথা তুলিয়া আছে। এ রাস্তা দিয়া লোকজন বড় চলেনা, কেবল জন-তুই গরীব-দুঃখী মাত্র ভোলানাথের কাছ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহারা দুইজনই পশ্চিমদিকে চাহিয়া দশ বিশবার সেলাম করিয়া গেল। ভোলানাথ ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিকে এক লোকের মধ্যে যা তিনি—কিন্তু তিনি কি এত বড় লোকটা যে তাঁহাকে পথের অপরিচিত লোকে পর্য্যন্ত সেলাম করিয়া যাইবে। তাঁহার মনে বড়ই অশোয়াস্তি উপস্থিত হইল। এই সময় আবার একটা তরকারী-ওয়ালা ঝাঁকা মাথায় করিয়া ঐ দিকে চাহিয়া সেলাম করিল,—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেলাম কর কাকে জি—এখানে ত কেহই নাই।" তিনি আপনাকে একটা কেহর মধ্যেই বুঝি গণ্য করিতেন না। ঝাঁকাওয়ালা দাঁড়াইয়া দেয়ালটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। ভোলানাথ যদিও ইহাতে বিশেষ কিছুই জ্ঞান-লাভ করিলেন না—তবে এইটুক বুঝিলেন বটে যে, সেলামের লক্ষ্য তিনি নহেন—ঐদেয়ালটা। তাহা বুঝিয়া তাঁহার প্রাণ হইতে একটা ভার কমিয়া গেল বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছু মাত্র কমিল না। তিনি হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভোলানাথ জন্মে আর কখনো এরূপ অবাককারখানা দেখেন নাই, ভোলানাথ এক জন মুসলমানকে জানিতেন বটে, সে যদিও প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িত, আবার হিন্দুর দেবদেবী দেখিলেই প্রণাম করিত, বৈষ্ণবদের সহিত হরি সঙ্কীর্ত্তন গাহিত, বৌদ্ধদের সহিত বুদ্ধদেবকে ভজনা করিত, ইত্যাদি,—কিন্তু এমন কাজ সে কখনো করে নাই, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি ভোলানাথ যাহা জড় বলিয়া জানেন তাহাদের কাছে সে কখনও মাথা নোয়ায় নাই। তবু তাহাই তখন ভোলানাথের কাছে এমনি রহস্যকর মনে হইয়াছিল যে তিনি এক দিন সেই মুসলমানকে পাকড়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বাপুহে এ কিরূপ?" সে বলিয়াছিল—"মশায় কোন দেবতা সত্যি তা কেজানে, তবে যেটা সত্যি হোক সবাইকেই সন্তুষ্ট করা ভাল—আমাকে তাহলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।" সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্মগ্রহণের তাৎপর্য্য সেই অবধি তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আজকের কারখানাটা সে তাৎপর্য্য দিয়া তলাইতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন "কিন্তু দেয়ালকে সেলাম করিতেছ—ওটা যে জড় পদার্থ।" সে বলিল—"ও মশায়—আপনাদের ঠ্যাকরুণ ত খড়ের গ্যাদায় বসে সব দেখে, আর দেয়ালটার ভিতর দিয়ে কি কেউ দেখতে পার না।"

কথাগুলো ঠিক ভোলানাথের মাথায় গিয়া পৌঁছিল না,—তিনি হাত রগড়াইতে সুরু করিয়া বলিলেন—"কি বল্লে জি, দেয়ালের ভিতরেও কি তোমাদের পীরের অধিষ্ঠান নাকি"—সে বলিল, "হ্যাঁ পীরই বই কি। না সেলাম করলে কি আমাদের মাথা থাকে? আপনি কি মশায়

এদেশের লোক নও নাকি! সেলাম না করে চুড়িওয়ালার কি হয়েছে জান না মশায়? সেই অবধি নবাবের হুকুম হয়েছে—ঘরের কাছ দিয়ে যে মাথা নুইয়ে না যাবে—তার মাথা দিয়ে গঙ্গার পুল তৈরি হবে।” ভোলানাথ শুনিয়া মহা চিন্তিত হইলেন, “তাইত তাইত” করিতে করিতে ঘুরিয়া একেবারে সদর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া প্রধান প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ দরোয়ানজি একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। একবার নবাবশার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হচ্ছে।” প্রহরী বলিল—“ক্যা বোলতা তোম, এ কাঁহাসে আয়ারে উল্লুক?” ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন—না রে না উল্লুক নই—আমি মহম্মদ মসীন সাহেবের গাইয়ে ভোলানাথ!” ভোলানাথ ভাবিলেন পরিচয় পাইয়া নবাবের কাছে লইয়া যাইতে প্রহরীগণ তিল-বিলম্ব করিবে না।

প্রহরী বলিল—“কোন তেরা মহম্মদ মসীন? ওতো নবাবশাকা পাঁউকা জুতী আছে।” ভোলানাথ রাম রাম করিয়া উঠিলেন—তাঁহার বড় রাগ হইল, তিনি বলিলেন—“দরোয়ান জি, তোমাদের বড় বৃথা অহঙ্কার হয়েছে—আমার মনিব তোমার মনিবের চেয়ে একশ গুণে হাজার গুণে লক্ষ গুণে বড়?” প্রহরী অনেক লোক দেখিয়াছে—এমন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা-নাছড়বান্দা-লোক আর দুটি দেখে নাই, ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া দূর করিয়া দেয়, কিন্তু বিকাল হইয়াছে, নবাব সা এখনি উদ্যানে বেড়াইতে আসিতে পারেন, তাই কষ্টে ইচ্ছাটা দমন করিয়া বলিল—“ক্যা বক্‌বক্ করতা, যাওগি কি নেই”

ভোলানাথ বলিলেন—“রাগ করিওনা জি, তোমার মনিবের মানের ভাণ্ডার এমনি খালি—যে পথের লোকের সেলাম চাহিয়া সে ভাণ্ডার পূরাইতে হয়। আর আমার প্রভু, আপনার মানে এত পূর্ণ যে অন্যের কাছ হইতে এক ফোঁটা মান তিনি চাহেন না, বরং জগতের গরীব দুঃখীদিগকে পর্য্যন্ত মান দান করিয়া তিনি ফুরাইতে পারেন না। এখন বল দেখি কার প্রভু বড় হইল।’

প্রহরীর অতদূর বাঙ্গলা বিদ্যা ছিলনা,যে ভোলানাথের কথার মর্ম্মটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, সে ভাবিল, ভোলানাথ কি রকম মস্ত গালাগালিটাই না জানি তাহাকে দিয়া লইলেন—তাহার আর সহ্য হইল না, বজ্রআঁটুনিতে সে বাম হাত দিয়া ভোলানাথের ঘাড় চাপিয়া ধরিল, ভোলানাথও নিতান্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, মাথাটা তাঁহার নীচু হইয়া পড়িয়াছে—তিনি সেই অবস্থায় চকিতের মত একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া তাহার বুক জড়াইয়া ধরিলেন। সেও তখন ঘাড়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। দুজনে জড়াজড়ি করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন—অন্য প্রহরীগণ হাঁ হাঁ করিয়া চারিদিক হইতে আসিয়া পড়িল, বৃদ্ধ ভোলানাথের হাড় গুলা পিশিয়া ময়দা করিয়া ফেলিতে চারিদিক হইতে রাশি রাশি হস্ত উত্তোলিত হইল—এই সময়ে উদ্যানে নবাব শা আসিয়া দাঁড়াইলেন—প্রহরীগণ

ভয়-কম্পিত কণ্ঠে একবার "নবাব শা নবাব শা—বলিয়া বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। প্রহরী নবাবের নাম শুনিয়া ভোলানাথকে ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি মাটি হইতে উঠিল—দেখিল নবাবশার ভীম-ভ্রূকুটি বদ্ধ নেত্রযুগল দিয়া অনল বহির্গত হইতেছে—ভয়ে সে কাঁপিয়া উঠিল। ভোলানাথও হাঁপাইয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্যানে নবাবশাকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই সুযোগ মনে হইল—তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমি একটি কথা বলিতে আসিয়াছি, গরীবদের প্রতি অন্যায় করিবেন না—ঈশ্বর আপনাকে উহাদের রক্ষা করিতে দিয়াছেন—বধ করিতে দেন নাই"—

ভোলানাথের কথা শেষ হইতে না হইতে নবাবশা দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া ঘরে গিয়া তানপূরাটাকে লইয়া গান ধরিলেন—

মা ব'লে আর ডাকব না মা
নাম রেখেছি পাষাণ-মেয়ে,
ডাকছি এত আকুল প্রাণে
দেখ্‌লিনে তবুও চেয়ে।
সবাই বেড়ায় হাহা করে
সবার চোখে অশ্রু ঝরে
অশ্রু নয় সে হৃদয় ফেটে
রক্ত রাশি পড়ে বয়ে।
কেমন মায়ের ভালবাসা
সে রক্তে তোর মিটে তৃষা
মা হয়ে মা নৃত্য করিস
সন্তানের রক্ত পিয়ে!
কিগুণে সবে না জানি
বলে তোয় করুণা রাণী
এমনত পাষাণী আমি
দেখি নাই ভূমণ্ডলে।
মা আমার জননি ওমা
মা বলে আর ডাকিব না
সন্তানে স্নেহ দিলিনে—
ছি ছি মা জননী হয়ে।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### বিচার।

খাঁজাহা খাঁর ঘাড়ে কাজ কর্ম্মের ভার—অনেক, কিন্তু আসলে ইহার ধার তিনি বড় কমই ধারেন। সুন্দরী বেগমগণের, বিম্বাধরের হাসি লইয়া, মদির-আঁখির কটাক্ষ লইয়া, অভিমানের অশ্রু সুধা লইয়াই তাঁহার কারবার। এক কথায়, খাঁজাহা খাঁ ঘোর বিলাসী, বিলাসের প্রমোদবনে প্রেমের ফুলশয্যায় তাঁহার জীবনের নিশাটা স্বপ্নহীন একঘুমে কাটাইতে পারিলে তিনি আর কিছু চাহেন না। কিন্তু কি জানি কেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, তিনি যে বিরাম পাইতে চাহেন কিছুতেই যেন তাহা পান না।

বুঝি কিছুতেই তাহা পাইবেন না, যেখানে তৃপ্তি নাই যেখানে বিরাম নাই সেখানে বুঝিবা তাহা তিনি অন্বেষণ করিতেছেন। খাঁজাহা খাঁ লালসাকে বুঝিবা প্রেম বলিয়া মনে করিতেছেন, মোহকে বুঝিবা নিদ্রা বলিয়া আহ্বান করিতেছেন? খাঁজাহা বুঝি জানেন না ও তৃষ্ণায় তাঁহার সুখ নাই ও নিদ্রায়

তাঁহার শান্তি নাই। জীবনের রক্ত দিয়া যে আকাঙ্খাকে পুষ্ট করিতেছেন হৃদয়ের শেষ রক্ত বিন্দু যখন সে শুষিয়া লইবে তখনও সে আকাঙ্খার তৃপ্তি নাই। আকাঙ্খার বলিদানেই মাত্র এ আকাঙ্খার একমাত্র পরিতৃপ্তি—এ তৃষ্ণার একমাত্র নিবৃত্তি,—তাহা বুঝি জাহাখাঁ জানেন না।

এ অবস্থায় কাছারীর কাজ কর্ম্মে খাঁজাহার কিরূপ মনোযোগ তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। না বসিলে নয়—তাই প্রত্যহ নিয়মিত একবার করিয়া কাছারি ঘরে আসিয়া বসেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক কাজ না শেষ হইতে হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যান্। কর্ম্মচারীগণই একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা। এক একবার কেবল কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন চারিদিকে হুলস্থূল বাধিয়া যায়—কর্ম্মচারীগণ ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়ে। তবে রক্ষা এই—নবাব যতটা গর্জ্জান ততটা বর্ষান না।

কাল বিকালে আর কি তাহাই হইয়াছে,—প্রহরীদের অত্যাচার দেখিয়া খাঁজাহা এতটা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—যে এককালে সমস্ত বাগানের প্রহরীদের জবাব দিতে হুকুম হইয়াগিয়াছে। একে ত প্রহরীদের নামে ক্রমাগত কয়দিন ধরিয়া অভিযোগের উপর অভিযোগ আসিতেছে, মহম্মদ মসীন নিজে পর্য্যন্ত আসিয়া সকালে প্রহরীদের অত্যাচারের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আবার আজ কাছারীর সময় অভিযোগ পত্র-রাশির জালায় তাঁহার অন্তপুর যাইবার সময় পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই বিরক্তি ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আবার ঐ ঘটনা চোখে পড়িয়াছে—কাজেই আগুণে ঘৃত পড়িল, নহিলে অন্য সময় হইলে, খাঁজাহা খাঁ এ ঘটনায় এতদূর জাগিয়া উঠিতেন কিনা তাহা বলা যায় না।

* * * *

পর দিন নিয়মিত সময়ে কাছারি বসিয়াছে। নবাব খাঁজাহা খাঁ একটি কিংখাপ জড়িত মুক্তাশোভিত উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, ডাইনে বামে ও পশ্চাতে আসাসোটা ধারী, সুসজ্জিত ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া আছে। ভৃত্যদিগের পরিচ্ছদ হইতে, নবাবের পরিচ্ছদ হইতে, গৃহের ফুলময় সজ্জার মধ্য হইতে, আতর গোলাপ ও নানাফুলের গন্ধ উঠিয়া ঘরটি ভূরভূর করিতেছে। নীচে ফরাস বিছানার উপর কর্ম্মচারীগণ বসিয়াছে, নায়েব নবাবের কাছাকাছি বসিয়া সম্প্রতি অন্যলাগাও জমীদারীর লোকের সহিত তাঁহার জমীদারীর লোকের যে একটা দাঙ্গা হেঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাই অবগত করাইতেছেন। নবাব খানিকটা শুনিয়াই অধীর ভাবে বলিলেন "ওসব থাক্, এখন মোদ্দাটা বল; খুন কটা হইয়াছে," নায়েব বলিলেন—"খুন একটাও হয় নাই। আমাদের জাহাঙ্গির খাঁকে শুধু খুব মারিয়াছে—. আর সকলে পলাইয়াছিল মারিতে পায় নাই"

খাঁজাহা খাঁ বলিলেন "জাহাঙ্গীর আমার চাকর হইয়া মার খাইয়াছে—মারিতে পারে নাই—উহাকে আর একশ জুতা মার—আর ছাড়াইয়া দাও৷৷"এই কথা বল যদি মারিয়া

আসিতে পারিত ত বকসিস পাইত—ও পদ বৃদ্ধি হইত।"

নবাব যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন উল্লেখিত কথা হইতে তাহা যেন কেহ না মনে করেন। রাজাদিগের যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় দাঙ্গা হেঙ্গামাটা জমীদারদিগের পক্ষে তিনি অনিবার্য্য মনে করিতেন। বোধ করি অনেক জমীদারেই এরূপ মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষুদ্রযুদ্ধে ভৃত্যের জয় পরাজয়ের সহিত তাঁহার নিজের মান অপমান আত্মমর্য্যাদা এতটা জড়িত মনে হইত যে কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে উক্তরূপ শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য হইতেন। তাহা ছাড়া, খাঁজাহা ঝোঁকওয়ালা স্বভাবের লোক, সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শুনিয়া তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজ করা তাঁহার পোষাইয়া উঠিত না, অতদূর তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না—তিনি সব বিষয়ে একটা সংক্ষেপ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারিলে বাঁচিতেন। সেই জন্য প্রথমটা তাঁহার শাস্তি প্রায়ই কঠোর হইয়া পড়িত, কিন্তু পরে তাহা সব বজায় থাকিত না।

কর্ম্মচারীগণ নবাবকে বিলক্ষণ করিয়া চিনিত, নায়েব বুঝিল নবাবের আর এসব শুনিতে ভাল লাগিতেছে না, এখন আর কিছু বলিতে গেলেই উল্টা উৎপত্তি হইবে, সে অন্য সময়ের জন্য উহা তুলিয়া রাখিয়া তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল। দাওয়ান তখন উঠিয়া দাঁড়াইল, নবাব বলিলেন "তোমার আবার কি বলিবার আছে?"

দেওয়ান।" হুজুর প্রহরীদের অপরাধ তদারক করিয়া জানিলাম—দোষ হইয়াছে—"

নবাব। "সে বিষয়ে ত সন্দেহ ছিল না।"

দেওয়ান। "কিন্তু সকলের দোষ নাই।"

নবাব। "বেশীর ভাগের ত আছে?"

দেওয়ান। হুজুর বেশীর ভাগই নির্দ্দোষী।"

নবাব।" বেশীর ভাগই নির্দ্দোষী! আমি যে সকলগুলাকে একসঙ্গে হাত তুলিতে দেখিলাম—সব মিথ্যা হইয়া গেল"—

দেওয়ান। "হুজুর তাহা মিথ্যা নহে—"

নবাব। তবে তাহা কি! আমি ত তোমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

দেওয়ান। "তাহারা মারিতে হাত তুলে না। উহাদের দুজনাকে তফাৎ করিয়া দিতে যাইতেছিল',

নবাব দেখিলেন ইহাতে তাঁহার কিছু বলিবার থাকে না—আর রাগটাও তখন পড়িয়া গেছে,—তখন হেঙ্গাম করিবার ইচ্ছাও আর তেমন নাই। তিনি বলিলেন, "তবে দোষী কে?"

দেওয়ান। "প্রধান প্রহরী মাদারী,"

দেওয়ানের সঙ্গে প্রধান প্রহরীর সঙ্গে বড় একটা বনিবনাও ছিল না,—দাওয়ান ভাবিতেন, প্রহরী তাঁহাকে যথোচিত মান প্রদান করে না, প্রহরী ভাবিত দাওয়ানও চাকর—সেও চাকর, দাওয়ানের কাছে কেন সে নীচু হইতে যাইবে। আসল কথা,

প্রহরী দাওয়ানকে খাতির করিবার তেমন কারণ দেখিত না, বেগম সাহের বানুর দাসী প্রহরীর পিশি, সুতরাং প্রহরী জানিত দাওয়ানের হাতে তাহার মার নাই। এ ঘটনার পর সে দাওয়ানের বিশেষ শরণাগত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দাওয়ান তখন ন্যায়ের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল, তাহাকে বাঁচাইতে গেলে অন্য আর কাহাকেও বাঁচাইতে পারিবেন না। সুতরাং মাদারীর পক্ষ হইয়া কোন কথাই তিনি রাজাকে বলিলেন না। দেওয়ানের কথায় নবাব বলিলেন—

"কেন মারিতেছিল ?"

দেওয়ান। "তাহা প্রহরীরা বলিতে পারিল না।"

নবাব। দাও তবে তাহাকেই দূর করিয়া দাও—মাদারী প্রধান প্রহরী হইয়া অবধি—আর নিস্তার নাই—কেবলি উহার নামের অভিযোগ দেখিয়া দিন কাটাও"

প্রধান প্রহরীর জবাব হইল, আর সকলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

—

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### স্মৃতি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাদারীর পিশি বেগম সাহের বানুর দাসী। সুতরাং মাদারা গিয়া অবধি নবাব বাড়ীর আর কিছুমাত্র সুশৃঙ্খলা নাই, অন্তঃপুরে ত যত রাজ্যের বিপদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দিনে দুপুরে অন্তঃপুর হইতে অনায়াসে সাহার বানুর মাথায় দড়ি গাছটি পর্য্যন্ত চুরী যায়, বিড়ালে খোকাদের দুদ খাইয়া ফেলে, রাঁধুনীরা ভাল করিয়া রাঁধে না, ধোপারা ভাল করিয়া কাপড় কাচে না, আবার রাস্তার লোক গুলা পর্য্যন্ত এমন বে-আদপ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদের চীৎকারের জ্বালায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে সাহের বানুর মহলে তিনি ঘুমাইতে পারেন না; এদিকে আবার কোলের ছয় মাসের খোকাটি প্রহরীর জন্য ভাবিয়া সন্ধ্যা না হইতে নিঃঝুমে এমনি ঘুমাইয়া পড়ে যে সারারাতের মধ্যে সে একবার জাগিয়া উঠে না;—বেগম ত মহা চিন্তিত হইয়া ডাক্তার ডাকাইয়া পাঠাইলেন,—ডাক্তার আসিয়া যখন বলিল ও কিছুই নয়, ও আরো স্বাস্থ্যের লক্ষণ,—তখন দাসী ত রাগিয়া ফুলিয়া উঠিল,—অমন হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে ছেলের যে রক্ষা নাই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বেগমকে গিয়া বলিল, বেগম মহা কান্নাকাটনা লাগাইয়া দিলেন, শেষে আর এক ডাক্তার আসিয়া এমন ঔষধ দিয়া গেল—যে তাহা খাইয়া সমস্ত রাত খোকা কাঁদিয়া কাটাইয়া দিল—তখন বেগম সে বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু মাদারী না থাকায় অন্যান্য অসুবিধা যেমন তেমনই রহিয়া গেল। নবাবের ত প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ইহার উপায় খুঁজিয়া আকুল হইয়াছেন, একবার প্রহরীকে ছাড়াইয়া আবার তাহাকে ডাকিয়া আনিতেও তাঁহার মন উঠিতেছে না, অথচ ঘরের মধ্যেও এই অশান্তি, তিনি কয়দিন হইতে দারুণ মুস্কিলে পড়িয়াছেন। ইহার

উপর আবার আর এক মুস্কিল আসিয়া জুটিল। সাহেরবানু একদিন পালকী করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রহরীগণ বেগমের সম্মান ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই, তাঁহার পাল্কীর সম্মুখ দিয়া একজন লোক চলিয়া গিয়াছিল। (এ ঘটনা বোধ করি পাঠকদিগের স্মরণ আছে—মহম্মদ মসীন বুড়ীকে প্রহরীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কিরূপে সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।)

বেগম সাহেব তাহাতে এতদুর অপমানিত মনে করিলেন—যে রাগে গস গস করিতে করিতে পালকী হইতে উঠিতে না উঠিতে খাঁ জাহাকে অন্তঃপুরে তলব করিয়া পাঠাইলেন। যাহা বলিবার ছিল বলিয়া বলিলেন—"এমন অকর্ম্মা নারীর অধম দ্বারবানগুলা না রাখিলেই কি নয়—তার চেয়ে দুগ্ধপোষ্য বালক কতকগুলা রাখিলেই ত হইত।" খাঁজাহাখাঁও মার মার কাট কাট করিতে করিতে বাহির বাটীতে আসিয়া প্রহরীদের ডাকিলেন। প্রহরীরাও আগে হইতে ভয়ে হাড়ে হাড়ে কাঁপিতেছিল, কেন না নবাব অন্য বিষয়ে যতই ক্ষমাবান হউন না কেন, বেগমদিগের লইয়া যেখানে কথা, সেখানে সত্যই খাঁজাহা খাঁজাহা হইয়া পড়িতেন। তাহারা প্রাণ হাতে করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, আপনাদের পক্ষে যতকিছু বলিবার ছিল, সব অনুনয় বিনয় বরিয়া বলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই, আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া নবাব বিশেষ নরম হইয়া পড়িলেন, ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিয়া তাহাদের এ যাত্রা একেবারে রেহাই দিলেন। এরূপ দোষে এরূপ পূর্ণ মার্জ্জনা তাহাদের আশাতীত, এরূপ দোষে তাহারা যখন অতি লঘু শাস্তি পাইয়াছে তখনও তাহাদের জরিমানাটা দিতে হইয়াছে, তাহারা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় এতটা বিস্মিত হইল, যে সে বিস্ময়ে যেন তাহাদের আহ্লাদটা ঢাকিয়া গেল—তাহারা মুক্তি পাইল বটে কিন্তু তাহাদের আদর্শ ভাবের নিকট তিনি যেন নীচু হইয়া পড়িলেন। তিনি যদি এস্থলে প্রত্যেককে দশবিশ জুতা মারিয়া মহম্মদ মসীনের মাথা আনিতে হুকুম দিতেন তাহা হইলেই আর কি তাহাদের মতে ঠিক হইত। যাহাই হৌক খাঁজাহার আর যতই দোষ থাক তিনি বাস্তবিক সেরূপ ধরণের লোক ছিলেন না, তিনি যখন আসল কথাটা কি বুঝিতে পারিলেন—যখন দেখিলেন—মহম্মদ মসীনের কাছে প্রহরীরা নিরস্ত হইয়াছে তখন প্রহরীরা তাঁহার চক্ষে দোষমুক্ত হইয়া গেল, এবং ইহার মধ্যে অপমানও তিনি বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল আর একবার যে সত্যসত্যই মহম্মদের নিকট অপমানিত হইয়াছিলেন—এই সম্পর্কে তাহা মনে পড়িয়া গেল। তিনি যখন মুন্নাকে বিবাহ করিতে চান—তখন মতাহার ও মহম্মদ সে প্রস্তাব ত অগ্রাহ্যই করিয়াছিলেন—তাহার পর মহম্মদ নাকি বলিয়াছিলেন—মুন্নাকেত আর বনবাস দিতে ইচ্ছা নাই।

হায়! তখন যদি মহম্মদ জানিতেন মুন্নার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কিরূপ অন্ধকার তাহা হইলে কি আর একথা বলিতে পারিতেন। তখন মহম্মদের প্রাণের আশার উষালোকে সে অন্ধকার তিনি দেখিতে পান নাই। আলোকে আর সব দেখাযায় কেবল অন্ধকার দেখা যায় না। তাই মুন্নার ভবিষ্যৎ তখন মধুময় হাসিময় নির্ম্মল একখানি প্রভাতের মত তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না, তাঁহার মনের সে প্রভাত অন্ধকারের মধ্যেই শুধু প্রভাত হইয়াছে—অন্ধকারেই লয় পাইয়া যাইবে।

কে তোমরা অদৃষ্ট জানিতে চাহ, জানিয়া রাখ, তাহা দেখিতে হইলে—সুখশান্তি আশা ভরষার সমস্ত আলোকগুলি একে একে নিভাইয়া ফেলিতে হইবে, তখন সেই অন্ধকারের ভিতরে আর একটা এমন ভীম চরাচর গ্রাসী স্থির অন্ধকার তোমার চোখে পড়িবে, যে প্রাণপণ সংগ্রামে—তাহাকে এক তিল নড়াইতে পারিবে না, সহস্র চেষ্টায় তাহার ভীষণতা একতিল কমাইতে পারিবে না—সে অন্ধকারের ভীমশক্তিতে পেষিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার জীবনপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি কে তোমরা অদৃষ্ট জানিত চাহ তাহা আর চাহিও না, জানিয়া রাখ তাহা আলোক নহে অন্ধকার—তাহা দেখা হইতে না দেখা ভাল।

বনবাসের কথা মহম্মদ বলিয়াছিলেন কি না কেজানে, কিন্তু যখন খাঁজাহার বিবাহ প্রস্তাব তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন তখন সে কথাও খাঁজাহার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। বিবাহে অসম্মতিইত যথেষ্ট অপমান, তাহার উপর এই কথা! খাঁজাহাখাঁর গর্ব্বে দারুণ আঘাত লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে এই অপমান তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। সেইদিন তাঁহার মনে হইয়াছিল—মহম্মদকে নীচ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত দিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু এ ঘটনার পর যে দিন নবাব নওরত উল্লা খাঁর বাটীতে আবার মহম্মদের সহিত তাঁহার দেখা হইল—মহম্মদ স্বাভাবিক সরলভাবে, হাস্য-মুখে যখন তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন—তখন তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি বুঝিলেন মহম্মদকে প্রতিশোধ দিতে তাঁহার সাধ্য নাই, মহম্মদ তাহা হইতে উচ্চ হইতে যেন অতি উচ্চে বিরাজ করিতেছেন।

আসলকথা খাঁজাহা নবাব হইয়াও সামান্য মহম্মদ মসীনকে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন, মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতকে যেরূপ ভয়ে ভয়ে অথচ মান্যের ভাবে দেখে, সামান্য-হৃদয় লোকে মহান আত্মাকে যেরূপ তাচ্ছিল্য ভাবে দেখিতে গিয়াও ভক্তিভাবে দেখে, কে জানে কেন মহম্মদের প্রতি খাঁজাহারও সেইরূপ মনের ভাব। খাঁজাহা এভাব মন হইতে এত তাড়াইতে চাহেন, এভাব নিজের নিকটে স্বীকার করিতেও তিনি লজ্জিত হয়েন—তবু কেমন অজ্ঞাতভাবে এ ভাবটি তাঁহার মনে আধিপত্য করিতে থাকে। কেন যে এরূপ হয় তিনি দৃশ্যতঃ তাহার

কোনই কারণ খুঁজিয়া পান না। ধনে, মানে, পদমর্য্যাদায় সকল বিষয়েই তিনি বড়—তবে কেন এই ভাব? কোন নিমন্ত্রণ-সভায় অত লোক থাকিতে মহম্মদ আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলে তিনি কেন আপনাকে ওরূপ মাননীয় মনে করেন? মহম্মদের অভিবাদন পাইলে আপনাকে কেন শ্লাঘান্বিত মনে হয়? ইহার কারণ জাহা খাঁ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই-রূপ মনের ভাব হইতেই প্রহরীদের অতি সহজেই তিনি মার্জ্জনা করিলেন। মহম্মদ মসীন যখন খাঁজাহার প্রতিশোধেরও উপরে তখন সামান্য প্রহরীরা যে তাহার নিকট পরাস্ত হইবে ইহা ত ধরা কথা।

এমন অনেকে আছেন বটে, যাঁহারা এরূপ অবস্থায় অন্যরূপ ব্যবহার করি[illegible] থাকেন, উদোর ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে [illegible] পারিয়া বুদোর ঘাড়ে সে [illegible]োঝা চাপ[illegible] [illegible] দেন [illegible]কে না মারিতে পারিয়া ঝিকে [illegible] [illegible]রিয়া বসেন, প্রভু শ্বেতাঙ্গের কট[illegible] [illegible] শোধ দিতে না পারিয়া ভাত খাইবার সময় ব্যঞ্জনের দোষ পাইয়া গৃহিনীর উপর বিলক্ষণ ঝাড়িয়া লয়েন;—কিন্তু মানুষও অনেক—স্বভাবও বিচিত্র,—সুতরাং উক্তরূপ স্বভাবটা আমাদের—বাঙ্গালীদের কাছে আদর্শনীয় হই-লেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলের ওরূপ স্বভাব নয়—অন্ততঃ খাঁজাহাখাঁর ওরূপ ছিল না। একজনের দোষে অন্যকে প্রতিশোধ দিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, খাঁজাহা খাঁ যথার্থ ক্ষমতার স্বাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং বৃথা ক্ষমতার প্রকাশে তিনি সন্তোষ লাভ করি-তেন না; তাই বিনা শাস্তিতে প্রহরীদের মার্জ্জনা করিলেন। প্রহরীরা চলিয়া গেল, খাঁজাহাখাঁ অনেকক্ষণ বাহিরে একাকী বসিয়া রহিলেন—কি যেন একটা কষ্টকর ভাবনা তাঁহার মনের মধ্যে উঠাপড়া করিতে লাগিল। বুঝি বা মহম্মদের পূর্ব্ব অপমানের স্মৃতিটা তীব্ররূপে মনে জাগিয়া উঠিল—একবার থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন এখনকার অপেক্ষাও কি ঘোর বনে গিয়া পড়িত।" ইহার কিছুদিন পরেই শুনিতে পাইলেন, মুন্নার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, মসীনও এখানে নাই।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### কথা বার্ত্তা।

সন্ধ্যার কিছু পরে একখানি নৌকা একটি দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া লাগিল, গাছে নৌকা বাঁধিবার জন্য অমনি দাঁড়িমাল্লারা তীরে লাফাইয়া পড়িল। নৌকার ভিতর হইতে একজন তখন মা[illegible] ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—"মাঝি এত শীঘ্র লাগাইলে যে? এখানে কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে?" মাঝি বলিল—হুজুর একটা চড়ার কাছাকাছি আসিয়াছি—রাত্রে আর নৌকা চলিবে না।"

যিনি কথা কহিয়াছিলেন—তিনি সেই কথা শুনিয়া নৌকার বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন—চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কিন্তু রবিবারের মধ্যে

নদীর মোহানায় পৌঁছান চাই সেটী ভুলিও না, নহিলে করাচীর জাহাজ সেদিন আর ধরিতে পারিব না।”

মাঝি বলিল। “তা পারিব বই কি, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।”

মহম্মদ আর কিছু উত্তর করিলেন না, নৌকা হইতে নামিয়া তীরে একটি গাছের ঝোপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, শ্বেত-নীল নির্ম্মল মেঘের উপর সপ্তমীর চাঁদের আধখানি মুখ শুধু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবু রূপে ধরে না, লজ্জাবতী যুবতীর মত আধো ঘোমটার ভিতর হইতে সেরূপ উছলিয়া পড়িতেছে, সেই অস্ফুটরূপ-জ্যোতিতে শ্যামক্ষেত্র প্রান্তর প্লাবিত হইয়াছে, দিগন্তের সীমা হারাইয়া গিয়া আকাশ পৃথিবী এক হইয়া গিয়াছে, সসীম অসীমে গিয়া মিশিয়াছে, ভাবের সৌন্দর্য্যে বিশ্ব ডুবিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যেদিকে জ্যোৎস্নার এত রূপের ছড়াছড়ি, প্রাণঢালা হাসির উচ্ছাস, সেদিকে মহম্মদের দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে, তাঁহার দৃষ্টি গঙ্গার উপর। এখানে আর জ্যোৎস্নার পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্য ঘটা নাই, উভয় তীরের বৃক্ষাবলীর ছায়া পড়িয়া দুইদিক হইতে গঙ্গার জ্যোস্নালোক এখানে বাধিয়া ফেলিয়াছে, এখানে আলোকে অন্ধকারে মিশিয়া নদীর জলে গ্রহণ লাগিয়াছে, ছায়া আলোকের অপূর্ব্ব মিলন চলিয়াছে— তাহা দেখিতে দেখিতে মহম্মদের মনে হইতেছে—

“পৃথিবীতে সকল বিষয়ে সারাদিনই বুঝি এইরূপ আলোক আঁধারের গ্রহণ লাগে, যেথানে আলোক সেইখানেই বুঝি অন্ধকার, যেথানে সুখ সেইখানেই বুঝি দুঃখ জড়িত? একটি চাহিলে আর একটিকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গে ধরিতেই হইবে। নদীর এই উপকূল সারাদিন বুকে আঁধার ধরিয়া আছে, একটু আলোক পাইবার জন্য কত না উহার আকুল বাসনা? কিন্তু এত চাহে বলিয়াই বুঝি আলোক উহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে না, অযাচিতভাবে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিয়া এই দীনহীনক্ষুদ্র-উপকূলকে ভিক্ষা দিতে গেলেই বুঝি উহার ধনভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়? আলোকের আলোকত্ব লোপ পাইয়া যায়? যে আলোক ছিল সে ছায়া হইয়া পড়ে, উপকূলের অন্ধকার ঘুচাইবে কি, সে আঁধার আরো গভীর করিয়া তুলে। এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম তবে?—আলোক চাহিলেই আধার আসে? সুখ চাহিলেই দুঃখ আসে!!!

জ্যোৎস্না-ধৌত নিশাথের-স্বপ্নের মত-বিভাসিত সেই ঘুমন্তপ্রবাহিত-স্রোতস্বিনীর পানে চাহিয়া মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন, যেখানে আলোক-আঁধার এক হইয়া গিয়াছে যেথানে সুখ দুঃখ সব সমান, যেথানে সুখে আকাঙ্ক্ষা নাই, দুঃখে বিরাগ নাই, সেথানেই শান্তি বিরাজমান, এই আলোক আঁধারের স্বাতন্ত্র্য হীনতাই প্রকৃত স্থায়ী-আলোক, সুখ দুঃখের সাম্য-ভাবই প্রকৃত সুখ, তাহা ছাড়া আর সংসারে সুখ নাই।

সহসা মহম্মদের চিন্তা ভঙ্গ হইল, যেন পৃষ্ঠদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিলেন, চমকিয়া তিনি সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন, সহসা তাঁহার নিরাশঅন্ধকার হৃদয়ের সম্মুখে যেন শত শত আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সেই নির্জ্জন অপরিচিত তটিনীতীরে অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্নালোকে সন্ন্যাসীর স্নেহময় পরিচিত প্রশান্ত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে বিভাসিত হইল। তিনি বিস্ময়ে আহ্লাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে বলিলেন—"কেন বৎস আমাকে স্মরণ করিয়াছ?" তখন মহম্মদের চমক ভাঙ্গিল, তখন মহম্মদের মনে হইল, যাহা দেখিতেছেন, তাহা স্বপ্ন নহে, সত্যই তাঁহার সম্মুখে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবশ্যক হইলে আসিব বলিয়াছিলাম তাহা ভুলিয়া যাই নাই, কেন বৎস এত ব্যাকুল হইয়াছ?" সে স্নেহবাক্যে মহম্মদের হৃদয় উথলিয়া উঠিল, চোখে জল ভরিয়া আসিল, তিনি বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "গুরুদেব, তাহাকে একাকী রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে কেহ সান্তনা দিবার নাই, কেহ দেখিবার নাই, তাহার কষ্ট দূর করিবার কেহ নাই প্রভু, সে একাকী আছে।" সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "সেই শক্তিরূপ মহাপুরুষের অনন্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া চল। সেই নিয়মের বশেই সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যে ফল ভোগ করিতেছে তাহার নামই নিয়তি। সে নিয়তি খণ্ডন করা কি তোমার আমার সাধ্য? তুমি সেখানে থাকিলেই কি তাহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিতে? নিজের কর্ম্মফলে নিয়তির সৃষ্টি, নিজের কর্ম্মবলেমাত্র নিয়তির খণ্ডন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কেহ কাহাকে সুখী অসুখী করিতে পারে না, সুখ অসুখ সকলি নিজের হাতে, তবে অন্যে সুখ অসুখের পথ দেখাইয়া দিতে পারে এই মাত্র।"

সন্ন্যাসীর কথা মহম্মদের উদ্বেলিত হৃদয়-স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"প্রভু ওকথা আপনার মুখেই সাজে, কিন্তু যাহারা সংসারের কঠোর বজ্রাঘাতে জরজর, যাহারা পরের একটি কথায় মরিয়া যায়, একটি কথায় বাঁচিয়া উঠে—তাহাদের কাছে ওরূপ কথা উপহাস মাত্র।"

স। "না বৎস সত্য কাহারো নিকট উপহাস হইতে পারে না। তবে সত্যকে মিথ্যা ভ্রম হইলে মাত্র তাহা হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যাহা মিথ্যা তাহা সকল অবস্থাতেই প্রকৃত দুঃখের কারণ। সেজন্য সকল অবস্থাতেই এ ভ্রান্তি এমিথ্যা সংসারী অসংসারী সকলেরি পরিহার্য্য। বিশেষতঃ এসত্যটি ধারণা করিতে পারিলে সংসার পীড়িতেরা যেমন উপকার লাভ করিবে তেমন অসংসারীরা নহে, কেননা যাহারা অসংসারী তাহারা কতক পরিমাণে দুঃখজয়ী হইয়াছে, কিন্তু যাহারা তাহা পারে নাই—যাহারা সংসারের দুঃখতাপে ঘোর মগ্ন—

তাহারা যদি বুঝে যে সুখ দুঃখের প্রকৃত স্রষ্টা নিজে ভিন্ন অন্য কেহ নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক কষ্ট লাঘব হইতে পারে।

সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন—একটু একটু করিয়া মহম্মদের হৃদয়ে যেন প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"সকল সময়ে এরূপ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" কতদূর দুঃখে মহম্মদ এইরূপ আত্মবিহ্বল, সন্ন্যাসী তাহা বুঝিলেন, তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি মৌন হইয়া রহিলেন, মহম্মদের সরল স্বচ্ছ গৌরবর্ণ মুখে বিষাদের কেমন মলিন ছায়া পড়িয়াছে, মস্তকের অতিশুভ্র মলমল পাগড়ির নীচে হইতে কুঞ্চিত কাল কাল লম্বা লম্বা চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া সেই বিষাদময় ভাবের সহিত কেমন সুর মিলাইয়াছে, সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদ থাকিয়া থাকিয়া বলিলেন—প্রভু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, "যদি পাপ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি সত্য হয়—তবে যাহার জীবন এত পবিত্র, যে পাপ কাহাকে বলে জানে না, তাহার তরে কেন এত দুঃখ? আপনি বলিবেন এ জন্মের না হউক উহা পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ করিয়াছে সে কি এ জন্মে এত পবিত্রমনা হইতে পারে? অন্ততঃ সেই পূর্ব্ব পাপ-জনিত পাপময়-ভাবও তাহার স্বভাবে লক্ষিত হইবে—নহিলে কর্ম্মের কোন নিয়মই দেখা যায় না।

সন্ন্যাসী। "তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা একরূপ ঠিক। পাপময় কর্ম্মফলে পাপময়-প্রবৃত্তি এবং পুণ্যময় কর্ম্মফলে পুণ্যময় প্রবৃত্তি, এবং কোনরূপ বাধা না ঘটিলে অর্থাৎ পাপময় প্রবৃত্তিকে দমন না করিলে কিম্বা পুণ্যময়-প্রবৃত্তি কার্য্য করিতে বাধা না হইলে, এই প্রবৃত্তি অনুসারে আবার পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিকাশ। সুতরাং যে দুঃখের সহিত পাপ ময় প্রবৃত্তিও দেখা যায় না তাহা পাপ কর্ম্মের ফল বলিতে পারি না।"

স। "যদি দুঃখ পাপের ফল ও সুখ পুণ্যের ফল নহে, তবে কর্ম্ম ফলের নিয়ম কি প্রভু বুঝিতে পারিলাম না।"

স। "যথার্থ দুঃখ ও যথার্থ সুখ—পাপ ও পুণ্য হইতে ঘটিয়া থাকে সত্য, "পাপ কর্ম্মবশাদ্দুখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং—হিন্দুশাস্ত্রের একথাটি সূক্ষ্ম খাঁটি অর্থে ঠিক। কিন্তু সচরাচর লোকে সুখ দুঃখ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে সেসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কেননা সাধারণতঃ দুঃখকেই লোকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে—আর সুখকে অনেক সময় দুঃখ বলিয়া মনে করে। সুতরাং সেখানে সে সুখ পাপের ফল, এবং সে দুঃখই পুণ্যের ফল সন্দেহ নাই। যেমন একজন দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করিতে লাগিল—সে নিজে তাহাকে সুখী বিবেচনা করিল—কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট না হইলে যে সুখ পাওয়া যায় না, যে সুখ জীবনের উন্নতি পথের কণ্টক—তাহা কি সুখ বলিতে পার? সুতরাং পাপ কর্ম্মের ফলেই মাত্র এ সুখ ঘটিতে পারে। আবার সেইরূপ যে দুঃখে জীবনের উন্নতি সাধিত হয় তাহা

যেমন প্রকৃত দুঃখও নহে তেমনি পাপের ফলও বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা এই, পাপ ছাড়া দুঃখই কোন নাই—কেননা পাপে আমাদের নিশ্চয় অধোগতি—পাপ আর কিছুই নহে প্রকৃতির বিপরীত গতি মাত্র। সুতরাং পাপহীন-দুঃখ দুঃখ-নামেরি বাচ্য নহে, অনেক দুঃখ দুঃখই নহে সুখের কারণ মাত্র। দুঃখ মাত্রেই যদি পাপ কর্ম্মের ফলে হইত তাহা হইলে সহৃদয় করুণ ব্যক্তি মাত্রেই পাপী হইতেন। এই যে তোমার হৃদয় পরের দুঃখে এত দুঃখ অনুভব করিতেছে অবশ্য ইহাও কর্ম্মফল সন্দেহ নাই—কিন্তু বল দেখি কত পুণ্যফলে এরূপ করুণ-মমতাময় হৃদয় একজন লাভ করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে এদুঃখ দুঃখই নহে অতি পবিত্র আনন্দ লাভের উপায় মাত্র।"

স। "তাহা হইলে আমরা সুখ দুঃখের ভিন্ন অর্থ বুঝিতেছি, কষ্টের অনুভূতি মাত্রেই তাহা হইলে দুঃখ নহে।"

স। "অবশ্য নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়-গম্য ক্ষণিক তৃপ্তিকর বা কষ্টকর অনুভূতি মাত্রকেই যদি সুখ দুঃখ বলা যায় তাহা হইলে সুখ দুঃখের অর্থ যে কেবল সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এমন নহে, সুখ দুঃখের যথার্থ অর্থই লোপ পায়। প্রথমতঃ বাসনা পাপময়ই হোক আর পুন্যময়ই হোক—তাহা সিদ্ধ হইলেই একটি তৃপ্তিকর অনুভূতি লাভ হইতে পারে। একজন যে চুরী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে সে অবাধে কৃতকার্য্য হইলে তাহার ক্ষণিক আহ্লাদ হইতে পারে তাহাকে কি তুমি সুখ বলিবে?"

ম। "তাহা বলিব না—কেননা ঐ অন্যায় কার্য্যের জন্য তখন সুখ হইলেও পরে তাহাকে এক সময় দুঃখ পাইতেই হইবে, এখানে না হয় পরলোক আছে।"

স। "বেস, তাহা হইলেই দেখিতেছ দুঃখের সম্ভাবনা-বিহীন-স্থায়ী-আনন্দের নামই সুখ। সুতরাং যেরূপ জঘন্য তৃপ্তিকর অনুভূতিতে সেই সুখের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায় তাহাকে কিছু আর সুখ বলা যায় না বরং তাহাকে দুঃখই বলা যায়—কেন না সে সুখ আমার ভবিষ্যতের দুঃখের কারণ;—এইরূপ আবার যে দুঃখ হইতে স্থায়ী-সুখ লাভ করা যায় তাহাকে দুঃখ না বলিয়া অনায়াসে সুখই বলা যাইতে পারে। একজন তাহার কোন অন্যায় কর্ম্মে ব্যাঘাত পাইয়া—দণ্ড পাইয়া—দণ্ডের সেই কষ্ট হইতে যদি শুভমতি ফিরিয়া পায়—তবে সেই কষ্টই তাহার সুখের কারণ। এ হিসাবে যে অন্যায় কার্য্য করিয়া এড়াইয়া গেল—অন্যায়কেই সুখ বলিয়া বুঝিতে অবসর পাইল সেই প্রকৃত ফাঁকিতে পড়িল। সুতরাং এস্থলে উল্লিখিত দুঃখই পুণ্যের ফল, এবং সুখ পাপের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে পাপময় প্রবৃত্তি ঘুচাইবার জন্যই পাপের ফল দুঃখময় হইয়াছে। যখনি আমরা মরীচিকাভ্রমে বিপথে সুখ ধরিতে যাই অমনি দুঃখ আমাদের দংশন করে—সেই আঘাত পাইয়াই আমরা ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করি। যতই কেন ঘোর পাপী হউক না—যখন সেই সঙ্গে তাহার এই দুঃখ অনুভবের

কারণ ঘটিতেছে দুঃখ অনুভবের শক্তি রহিয়াছে তখন তাহার উঠিবারও আশা আছে, সুতরাং এই দুঃখ হইতে তাহার শুভ কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার পাপের সঙ্গে যদি ■ন কিছু পুণ্য কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে এরূপ দুঃখ আসিয়া তাহাকে সংশোধিত করিত না। যাহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়াও এইরূপ দুঃখের দংশন অনুভব করে না, তাহারাই যথার্থই অভাগা যথার্থ দুঃখী, কেননা জীবন-চক্রে উন্নতির সোপানে উঠিবার শক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলিতেছে। এখন দেখিতেছ সুখ দুঃখ কিছুই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, সম্পূর্ণতাই মানুষের লক্ষ্য, উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য, তবে এই উন্নতির মূলে গৌণভাবে মাত্র সুখ বিরাজ করিতেছে, সুতরাং সুখের আশায় আমরা না ফিরিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য এই উন্নতির দিকেই যদি আমাদের যথাসাধ্য শক্তি অর্পণ করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুখও পাইতে পারি, আর সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া বাসনা-চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইলেই আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে; তৃষ্ণার সহিত দুঃখের কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।”

মহ। “এখন দেখিতেছি, সকল দুঃখই যে পাপ-মূলক তাহা না হইতে পারে, কিন্তু সকল দুঃখের অন্তরেই তৃষ্ণা বাস করিতেছে। আমি যদি ভালবাসিয়া ভালবাসা না চাই, আমি যদি সুখের তৃষ্ণায় কোন কাজ না করি, তাহা হইলে আর কখনও নিরাশার কষ্ট আমাকে ভোগ করিতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে তৃষ্ণাই দেখিতেছি সকল কষ্টের কারণ, এই তৃষ্ণা হইতে ক্রমে পাপ তাপ দুঃখ শোক সকলেরি উৎপত্তি, কিন্তু এ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় কি প্রভু?”

স। “বিষই বিষের ঔষধ। তৃষ্ণা হইতে দুঃখের উৎপত্তি, আবার দুঃখই সেই তৃষ্ণা নিবারণের উপায়। দুঃখে পড়িলেই পৃথিবীর স্থূল বিষয়ে সুখ নাই ক্রমে এই অনুভব করা যায়। এবং এই অনুভব হইতেই সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি অনেক সময় দুঃখই সুখ। কে বলিতে পারে, মুন্নার উন্নতির নিমিত্তই তাহার এ দুঃখ নহে।”

মহম্মদের হৃদয় কি যেন শান্তিভাবে পুরিয়া গেল; একটি কাল মেঘের ভিতর চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছিল, চাঁদখানি আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া প্রাণ ভরিয়া জ্যোৎস্না ঢালিল; সন্ন্যাসী সেই জোৎস্নালোকে দেখিলেন, মহম্মদের প্রশান্ত করুণা-পূর্ণ প্রেমময় নয়নে প্রাতঃশিশির বিন্দুর ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু শোভিয়াছে। সে অশ্রু আর কিছু নহে, সে আশার আনন্দাশ্রু—হৃদয়ের অপরিমিত স্নেহের উচ্ছাস।

# ভাই বোন।

পরিপূর্ণ-জোছনায় মগ্ন দশ-দিশি,
স্থখেতে মরমহারা অতি স্তব্ধ নিশি।
রজনীর কানে কানে, কি কথা কহে কে জানে
বারে বারে ধীরে আসি মলয় বাতাস,
নিশার আলোক-কায়, ফেলিয়া মলিন ছায়'
কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিশ্বাস।
তটিনী কোমল বুকে সে দুঃখে জাগায় ব্যথা,
মৃদু মৃদু কলোলি সে কহে সান্তনার-কথা।
তরীখানি এসময়, ধীরে ধীরে ব'য়ে যায়
কে ওরা সোনার ছেলে দুটি ভাই বোনে?
জোছনার হাসি রাশি মুখেতে পড়েছে আসি—
—কচি মুখে চুমি খায় প্রাণের যতনে।
অধরে জোছনা ভাসে, বোনটি সে চায় হেসে,
চুলগুলি আশে পাশে করে দুল দুল,—
কচি মুখে হাসে আধো, গান গায় বাধো বাধো
আর কিছু নয় সে যে বসন্তেরি ফুল।
এক হাতে বায় তরী, এক হাতে গলাধরি
কত চুমি দেয় মুখে ভাইটি তাহার;
কেনরে এমন প্রাণ, ·· গানে মিলাতে তান
বেস্থরো নীরস-কণ্ঠ চাহে অনিবার?
শুষ্ক এ তরুর শাখে, একটি না পাখী ডাকে
একটি নবীন পাতা নাহি এর পরে,—
শৈশবের খেলা ধূলা, যৌবনের হাসি আশা
একটি নাহিক হেথা পড়িয়াছে ঝরে।
তবে বসন্তের বায়, কেনরে এ শুষ্ককায়
সহসা শিহরি উঠে অঙ্কুরিত চায়!

একটি নবীন পাতা, হয়ত বা অঙ্কুরিবে,
আবার শুকাবে, সব ফুরাইবে হায়!
সত্যকার ছবি একি, আজিকে সমুখে দেখি?
কিম্বা নিশীথিনী দেখে স্থখের স্বপন!
সত্য বলে পরকাশে, এখনি যাইবে মিশে—
যখনি নিশীথ-রাণী মেলিবে নয়ন।
কত স্বপ্ন দেখিয়াছি আবার গিয়াছে ভাঙ্গি;
—এক ফোঁটা অশ্রু শুধু একটি নিশ্বাস—
সেই স্বপনের শেষে, দেখেছি রয়েছে পড়ে,
স্বপ্নের অস্তিত্বে বুঝি জাগাতে বিশ্বাস।
ছিল যারা নাই আর—কোথায় কে জানে?
আকুল পরাণে চাহি অনন্তের পানে।
অশ্রুতে পরাণ ভাসে, ধীরে আঁখি মুদে আসে
জগৎ মিলায় ধীরে আঁধার-নয়ানে।
অমনি তরীটি বেয়ে, আর একটি আসে মেয়ে
আঁধারে জ্যোতির ঘটা,—সহসা চমকি চাই,—
কেমন সে নিরদয়, আরত সে নাহি রয়—
কাঁদিয়া জাগিয়া উঠি যেমন হাসিতে যাই।
এও যদি স্বপ্ন হয়, আবার ভাঙ্গিবে নয়—
কে তোরা সোনার ছেলে দেখি দেখি আয়,—
একবার কোলে করি কুলে নিয়ে আয় তরী
স্থধামুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।
নিয়ে যাবি সাথে করে? সারা দিন রাতধরে
দেখিব সরল মধু জোছনার হাসি;
দুজনে করিবি খেলা, খেলেনা হইব আমি
তুলিয়া আনিয়া দিব ফুল রাশি রাশি।

শ্রান্ত হয়ে ঘুম এলে, বিছানা পাতিব কোলে
ভাই বোনে ঘুমাইবি কোলেতে আমার।
ঘুমন্ত সুখের হাসি, অধরে যাইবে ভাসি
পুলকে দেখিব বসি অবিশ্রান্ত অনিবার।
অস্তে যাবে চন্দ্র তারা উঠিবেক রবি পুনঃ
আবার পশিবে দিন রজনীর প্রাণে,
কালেরে ডুবায়ে দিব, কালের মহান কোলে
অনন্ত চাহিয়া রবে অবাক নয়নে।
কে তোরা সোনার ছেলে দেখি দেখি আয়, —
একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী
কচি মুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।

—*—

# ফর্দ্দুসীর মৃত্যু।

প্রসিদ্ধ পারসীক কবি ফর্দ্দুসী একদিন তাঁহার বাগানে বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় বসিবার দরুণ শীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৯৫ বৎসর।

পরদিন প্রত্যুষে তাঁর বুড়ী দাসী জোরা তাড়াতাড়ি একজন হাকিম ডাকিয়া আনিল। হাকিম কিনিনি বৃদ্ধ-কবির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া জোরাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিলেন—"জীবনের আশা ছাড়িয়া দেও এই বয়সে এ ফাঁড়া কাটাইয়া উঠা অসাধ্য— কবির প্রপরমায়ু আর অধিক দিন নাই।"

এই বৃত্তান্ত লোকের মুখে মুখে ও হাতের লেখা কাগজে চারিদিকে প্রচারিত হইল। বোগদাদপুরবাসী ও রাজ্যশুদ্ধ লোক একথা যে শুনে সেই তটস্থ।

কারণ ফর্দ্দুসীকে লোকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার দুই প্রতিদ্বন্দী কবি তুরীরি ও নিশামী ৩৩ বৎসর মৃত হইয়াছেন। ফর্দ্দসী একমাত্র জীবন্ত থাকিয়া তাঁহার কবিতা স্রোত এমন অনর্গল ঢালিয়া দিতেছেন যে তাহা প্রকাণ্ড নদী-প্রবাহের ন্যায় দেশ বিদেশে প্রবাহিত হইয়া আর আর সকল কবিতা কলাপ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পারসীকেরা আর সকল ভুলিয়া ফর্দ্দুসীর কবিতা রসেই নিমগ্ন, তাহাই তাহাদের একমাত্র সম্বল। আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মুখে সেই কবিতা। ফর্দ্দুসীর গ্রন্থে শোকার্ত্ত, পীড়িত দীন হীন জনের উপর যেরূপ মমতা প্রকাশ, কবির প্রতিও সাধারণ জনপদের সেইরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ। বিদ্বজ্জন কবির পদলালিত্যে বিমুগ্ধ, জন-সাধারণ তাঁহার প্রেম সদ্ভাব সাধুতাগুণে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। এই বৃদ্ধ কবি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে পারসীকদের মধ্যে একছত্র রাজত্ব ভোগ করিতেছিলেন।

কবির আসন্ন মৃত্যু সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত। লোকে তাঁহাকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করিত কিন্তু কবি নিজে অনেকবার আপনাকে মৃত্যুর অধীন বলিয়া পরিচয় দি-

য়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার উপক্রম।

তিন দিন তিন রাত্রি ফর্দ্দুসী রোগ শয্যায় শয়ান। বোগদাদের চতুর্দ্দশ কবি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই রোগ শয্যায় ফর্দ্দুসীর যে সকল প্রলাপ উঠিতেছে তাহার এক এক বাক্য এক এক বহু মূল্য রত্ন। চতুর্দ্দশ কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

জীবাত্মা অমর কি না?

কবি উত্তর করিলেন—

"আমার আত্মা অমর ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমার যে মন্তব্য তাহা ঈশ্বর সন্নিধানে নিবেদন করিতে চলিলাম"।

বোধ হইল পরলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি যে বক্তৃতা দিবেন তাহার জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছেন।

এদিকে কবির কুশল সংবাদ লইতে লোকেরা পালে পালে আসিয়া গৃহের সম্মুখে ঝাঁকিয়া পড়িতেছে। বার বার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হইয়া জোরা দাসী দরজা বন্দ করিয়া রাখিল।

কোন কোন দুরাত্মা দুরভিসন্ধি ধরিয়া ফর্দ্দুসীর মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ মিথ্যা জনরব রটাইয়া দিল ও কাগজে এই সংবাদ লিখিয়া বেচিবার জন্য বালকেরা পথে পথে ফিরিতে লাগিল।

অনেকে কৌতূহল বশতঃ সেই সকল কাগজ কিনিবার জন্য ব্যস্ত। যখন জানিতে পারিল যে খবর ঠিক নয় তখন তাহারা চটিয়া আগুণ।

চতুর্থ দিন প্রাতে চতুর্দ্দশ-কবির মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ-কবি দরজা খুলিয়া এক-টুকরা কাগজ বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। শীঘ্রই কবির মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইল।

লোকের মনে হইল কবির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া এমন ধূমধাম জাঁক জমকে সম্পন্ন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই শুনে নাই।

মফস্বলবাসী প্রতিনিধিদের বোগদাদে আসিবার সময় দেওয়া আবশ্যক অতএব রাজা আলিরীরা সপ্তাহ পরে কর্ম্মারম্ভ আদেশ করিলেন।

ফর্দ্দুসীর মৃত দেহ নানা প্রকার মসলা ও সু[illegible] গন্ধ-দ্রব্যে বিলেপিত হইল। তাঁহার [illegible]র্ঘ শ্মশ্রু বিনাইয়া রঞ্জিত হইল। [illegible]নে অঞ্জন, গালে লাল চূর্ণ, গলে স্বর্ণহার, [illegible]স্তে স্বর্ণ বলয়—এইরূপে দেব মূর্ত্তির ন্যায় [illegible]র দেহ অতিযত্নে সজ্জিত হইল। রাজা [illegible] এক বহু মূল্য জরির কাপড় উপহার [illegible] দিলেন।

[illegible], সেনাপতি, যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই সেই মহিমান্বিত শবকে আগুলিয়া বসিবার জন্য মহা উৎসুক।

বোগদাদে যত মালী আছে তাহারা ভাল ভাল পুষ্পমুকুট পুষ্পহার শবোপহার তৈয়ার করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। সেই সকল পুষ্প শবাবরণের আভরণ হইবে।

বোগদাদ সহরে অনেক রকম সমাজ ছিল তাহারা একত্রে বক্তৃতা আহারাদি করিবার জন্য সম্মিলিত হইত। ব্যায়াম

সমাজ, বৈদ্য সমাজ, বিজ্ঞানসমিতি, অহুর-মজ্দ্ বিপক্ষসভা, গানউত্তেজনমণ্ডলী” ই-ত্যাদি। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবলী, অ-ধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারী। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত নিশান।—জ্ঞানচর্চ্চা ও আমোদ প্রমোদ এই দুই কাজ একত্রে সমাধা করা তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ বাধিল কে ফর্দ্দুসীর সমাধিস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্প মুকুট উপহার আনিয়া দিবে।

বোগদাদ সহর উজ্বল স্বর্ণ গোলাপের বেড়ায় বেষ্টিত, ফুলে ফুলে চতুর্দ্দিক সুশোভিত, মনে হয় যেন মেদিনী তাহার বসন্তের সমস্ত অলঙ্কার কবির আভরণরূপে সমাধি-মন্দিরে উপঢৌকন দিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছে।

সকলেই আপনাকে ফর্দ্দুসীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে উৎসুক। এপর্য্যন্ত যাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রুত হওয়া যায় নাই সেও জানাইতে লাগিল কবির সহিত কতই যেন তাহার আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল, কবির জীবনের রহস্য ঘটনা বর্ণন—কবির রচনাবলি সংকীর্ত্তন এই তাহার কাজ।

এই নির্জনবাসী কবির যে কত হৃদয়-বন্ধু ছিল দেখিয়া সকলে অবাক।

কেহ বা কবির অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে যোগ দান—বাহিরে শোকাতিশয্য প্রকাশ, এই উপায়ে আপনার গৌরব বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইল।

কবির বাস গৃহ-দ্বারে বেদীর উপর এ-কটী রেজিষ্টর রাখা হইল, যাহার ইচ্ছা স্বনাম স্বাক্ষর ও কবির গুণ বর্ণনা লিখিয়া যাক্।

জনৈক বোগদাদবাসী প্রস্তাব করিলেন, ফর্দ্দুশীর নামে সহরের সমস্ত পথের নাম-করণ করা হউক।

যত পারসীক কবি ও লেখক ফর্দ্দুশীর গুণগান আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন ফর্দ্দুশী অদ্বিতীয় কবি, তাঁহার মত কবি পৃথিবীতে কখন জন্মায় নাই।

এই অতিমাত্র স্তুতিবাদের উল্টা ফ-লোৎপত্তি হইল। লোকেরা ফর্দ্দুসীকে এমন এক কিম্ভূত কিমাকার অবতার গড়াইয়া তুলিল যে তদ্দর্শনে শেষ তাদের নিজেরই বিরাগ জন্মিল, ক্রমে তাহার যত দোষ বাহির হইতে লাগিল। লোকটা এমনি কি মহাপুরুষ, কবি বটে কিন্তু পাণ্ডিত্য কোথায়?

বিজ্ঞদল নীচু স্বরে এই সকল কথা কহিতে লাগিল কিন্তু তখনো সাধারণ লোক-দের উৎসাহ কমে নাই। বিশেষতঃ রাজা আলিরীরা ফর্দ্দুসীর একজন প্রধান অনু-রাগী। এই রাজা শান্ত প্রকৃতি ছিলেন কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কেমন একটা একগুঁয়েমি ছিল সেই দোষে কতক বৎ-সরের মধ্যে তিনি রাজ্য হারাইলেন।

এই মহাকবিকে যোগ্য সম্মানে কিরূপে সমাধিস্থ করা হয় রাজা ভাবিয়া স্থির করিলেন।

সহরের বাহিরে এক পাহাড়ের উপর ৩০০ হাত উচ্চ এক প্রস্তরময় সুন্দর সমাধি স্তম্ভ ছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে আলি মাবুল দুষ্ট রাজার আদেশে তাহা নিজ-সমাধির

জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। আলীরীরার কোন পূর্ব্বজ রাজা কর্তৃক আলিমাবুল রাজ্য-ভ্রষ্ট হন। তাঁহার গোরস্তম্ভ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভগ্নাবস্থায় খালি পড়িয়া আছে, তাহা ফর্দ্দুসীর সমাধির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

আলিরীরা আদেশ করিলেন ফর্দ্দুসীর দেহ আলিমাবুলের সমাধিস্থলে সমানীত হউক ও জীর্ণ মন্দির পুনঃ সংস্করণে সময় দিবার জন্য সমাধি-ক্রিয়ার সপ্তাহ কাল বিলম্ব হউক।

এই সংকল্প প্রজাদেরও মনঃপুত হইল। আলিমাবুলের গোর মেরামতের কাজ চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য লোকের যে কি ভীড় তাহা কহতব্য নয়।

কিন্তু অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা শুষ্কপ্রায়, কেননা তখন গ্রীষ্মকাল,সেই উত্তাপে তোলা ফুল কতদিন টেকে ? যাহারা সেই সকল ফুল ফরমাস করিয়াছিল, তাহাদের ও মালীদের মধ্যে মহা ঝগড়া।

ফরমাসকারীরা বলে—গোর দিবার দিন আমরা এ ফুলের ফরমাস্ দিয়াছি, এর দাম পাবি না।

কাজের যে দেরী পড়িয়াছে তাতে আমাদের কি দোষ, ফুলের ব্যাপারীর এই উত্তর।

এইরূপে বিবাদ কলহ—মারামারি, ফুল ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইল। অনেক দিন পর্য্যন্ত বোগদাদের নদী স্রোতে সেই সকল ছিন্ন ফুলের পাপড়ী ভাসিয়া চলিল।

অসন্তোষের আরো নানা কারণ উপস্থিত। ফর্দ্দুসীর স্তুতি গানেই গেজেটের সকল পাত পুরিয়া যায়—তাছাড়া আর কোন লেখা বাহির হইবার স্থান থাকে না অন্যান্য পেসাদার ইতিহাস লেখকদের মহা বিপদ।

এই সময় দুই তিন জন সুবিখ্যাত লোকের মৃত্যু হয়, তাহাদের প্রতি এই গোলযোগে কাহারো লক্ষ্য নাই। তাহাদের পারবারেরা লোকের মন ফর্দ্দুসী হইতে আপনাদের প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য বিব্রত।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন, সাজ সজ্জা, হট্টগোল, ফর্দ্দুসীর প্রতিমূর্ত্তি-বিক্রেতাদিগের অবিশ্রান্ত চীৎকারধ্বনি, এই সমস্ত শান্তিভঙ্গের কারণ অনেকের বিরক্তি জনক হইল, যে শবের সম্মানার্থে এই সব নানান হাঙ্গাম ও পথ ঘাট সকাল বন্ধ তাহার প্রতি তাহাদের দ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল।

পরে এক দিন গোল উঠিল সহরে এক মহা হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটা সমস্ত পরিবার—বাপ মা দশ ছেলে রাত্রিতে কোন্ এক খুনির হাতে মারা পড়িয়াছে। এই বারজনের শরীরে একই রকম মারের দাগ—লুটিবার মানসে খুন নয়—ঘরের জিনিস পত্র অস্পৃষ্ট, যেমন তেমনি রহিয়াছে। কত লোকে কতপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল তাহার ঠিক নাই।

ফর্দ্দুসী জনহৃদয় হইতে শীঘ্রই অন্তর্হিত হইলেন।

যাহারা কবির পাশে বসিয়া পাহারা দিতে আসিত জোরা দেখিল তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

আজিকের রাত্রে একটী লোকও উপস্থিত নাই এক মাত্র জোরা দাসী কবির শিয়রে বসিয়া চৌকী দিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রভুর গৃহ রাশিরাশি লোকের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য দ্বারবদ্ধ করিতে হইত, আজ একটী জনপ্রাণীও দৃষ্ট হয় না। জোরা উঠিয়া কবির প্রকোষ্ঠ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিল– পরে তিন রাত্রি বেচারী একাকিনী মৃত্যুশয্যা আগুলিয়া রহিল।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় জোরা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। একটী সুন্দরী—আলু থালু কেশ—সামান্য বেশে প্রবেশ করিল।

জোরা বলিল কে তুমি, বাছা ?

যুবতী। "আমাকে চেন না ? তোমাদের পড়োসী–আমার নাম জেতুল-বি। আমি কাপড় সেলাই করিয়া বিক্রী করি।

জোয়া। "কি চাও ? এখানে কেন ?

যুবতী। "আমি একবার তোমাকে দেখতে এলুম মা। দেখলুম এখানে দিন কতক থেকে আর কেউ আসে না–ভাবলুম হয়ত দেখবার শোনবার আর কেউ নাই–যদি আমাকে দিয়ে কোন কাজ হয়।

জোরা জেতুলবির আদর-সৎকার করিল। তিন রাত্রি ধরিয়া জেতুলবি শবরক্ষণে রাত কাটাইলেন। কবির শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অনাথ গরীবদের জন্য কাপড় শেলাই করেন ও শেলাই করিতে করিতে ফর্দ্দুসীর বয়েদ গাইয়া কোনরূপে ঘুম তাড়ান। জেতুলবির মৃদুস্বরে গান শুনিয়া ফর্দ্দুসী যেন মৃদু মৃদু হাস্য করিতে থাকেন।

এ দিকে সেই হত্যাকাণ্ডে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট। খুনী ধরা পড়িয়াছে মুহুর্মুহু এই জনরব। যে বাড়ীতে মৃত্যু হইয়াছে তাহার চারিদিকে দিবারাত্রি লোকসমাগম।

মফস্বল হইতে যাহারা কবির অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছিল তাহারা পান্থশালা ও অন্যান্য প্রমোদ ভবনে ছড়াইয়া পড়িল–কেন যে আসিয়াছে তাহা তাহাদের মনে নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে শবের সঙ্গে শব যাত্রীদল বাহির হইল। দিনমণির প্রখর কিরণে দিগ্বিদিক্ উত্তপ্ত।

ফর্দ্দুসী দীন দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ মানসে ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন যে গরীব লোকদের সামান্য বিমানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থলে আনীত হয়। তাহার উপর আবার একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রস্তাব করিলেন যে বাহকের পশ্চাৎ এক ভিখারীর কুকুর তাড়িত হইলে কবির মনোগত অভিলাষানুরূপ কার্য্য করা হয়। তাহাই ধার্য্য হইল।

বোগদাদের পশুশালা হইতে এক কুকুর সংগৃহীত হইল। কিন্তু সে গাড়ীর পিছনে চলিতে নারাজ–বেচারীকে গাড়ীর পিছনে বাঁধিয়া দেওয়া হইল ও সে গাড়ীর টানে ধূলায় পড়িয়া কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে ঘসড়াইয়া চলিল।

তাহার পিছনে জোরা ও জেতুলবী।

রাজা একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন তিনি রমণী দ্বয়ের পশ্চাৎ চলিলেন।

ঘর্ম্মাক্তকলেবর মৃদুমন্দগতি ৫ জন পারসীক সেই রাজপুরুষটিকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কবির গোরস্থানে তাঁহাদের প্রতিজনকে এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। হাতে সেই লেখা, পাখা করিতে করিতে তাঁহারা যাত্রা করিতেছেন।

আরো অনেক যাত্রী রাস্তার দোধারী চলিয়াছে। পথের মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অনেকে পানগৃহে প্রবেশ করিতেছে, যাত্রীরদল ক্রমিকই কমিয়া আসিতেছে।

বক্তাদের পশ্চাৎ একটা প্রকাণ্ড গাড়ী, —তাহার মধ্যে জনকতক লোক বসিয়া আছে। দেখিতে জীবন্ত কিন্তু নড়ন চড়ন নাই।

এই সকল মূর্ত্তি মোমের তৈয়ারি—উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন তাহাদের নেত্র হইতে ঝর ঝর অশ্রু ধারা বহিতেছে। রাজপুরুষ—কোতয়াল—মৌলবী প্রভৃতি যে সকল বড় বড় লোকের কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইবে অথচ যাঁহারা ইচ্ছা অথবা সময়াভাবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহারা এই হাঙ্গাম এড়াইবার জন্য এক ফন্দী বাহির করিয়া নিজের পরিবর্ত্তে মোমের পুতুল পাঠাইয়া দিয়াছেন।

লোকেরা জানিতে পারিল না তাহা যথার্থ কি কৃত্রিম। সে দিকে তাহাদের লক্ষ্যই নাই। চতুর্দ্দশ-কবির মধ্যে একজনও উপস্থিত ছিলেন না।

এইরূপে যখন শব-বাহন ও পরিক্ষীণ যাত্রীদল আলি মাবুলের সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইল তখন সকলি অপ্রস্তুত। এক জন মজুর নিদ্রিত আর সকলে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

জোরা নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া বলিল কি লজ্জা—কি আপশোষ! যাও তোমরা সহযোগীদের ডাকিয়া আন—গর্ত্ত খনন করিতে হইবে তাহা কি মনে নাই?

অনেক কষ্টে দশজন বক্তা একত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে নয়জন সময় সংক্ষেপ বশত একসঙ্গে আপনাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেল।

দশম বক্তা কবিভক্ত একজন বৃদ্ধ। তিনি, এক রাজপুরুষ দুজন স্ত্রীলোক এই চারিজন ও মোমের পুতুলগুলি অবশিষ্ট। বৃদ্ধ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়াছিলেন—তাঁহার পড়া আর ফুরায় না। মজুরেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া গোঁজরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁর বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। জোরা ও জেতুল বি নয়নবারি সম্বরণ করিতে পারিল না।

রাজপুরুষ জেতুলবির নিকটে আসিয়া তাহাকে সান্তনা করিলেন। চখের জল মুছাইয়া মধুর চতুর বাক্যে তাঁহার চিত্ত মৃত ব্যক্তি হইতে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। তাঁহার কথা বার্ত্তা ক্রমে প্রেমালাপে পরিণত হইল। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! নগরে পৌঁছিয়া জেতুল বি মৃত কবিকে

বিস্মৃত হইলেন—ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে হাসির ফোয়ারা, শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস। ফর্দ্দুসী তাঁহার শান্তি নিকেতন হইতে এই দুই প্রণয়ীর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেবল সেই একমাত্র জরাজীর্ণ-জোরা দাসী শ্মশান ভূমির উপর জানু পাতিয়া মৃত কবির জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বেদসম্বন্ধে গুটিকত কথা

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে বেদ আজ কাল আদরণীয় হইয়াছে কিন্তু সে আদরে আমরা সন্তুষ্ট নহি। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদকে যে ভাবে দেখেন হিন্দু পণ্ডিতগণ বেদকে সে ভাবে দেখেন না। প্রাচীন আর্য্যজাতি যখন সভ্যতার সোপানে প্রথম উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সময়কার কবির কাব্য বলিয়া ইয়ুরোপে বেদের আদর, কিন্তু হিন্দুরা ভাবেন যে বেদ আধ্যাত্মিক-তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত ব্রহ্মার বাক্য। হিন্দুরা ভাবেন যে বেদ জগতের সমস্ত তত্ব নির্ণায়ক-বিজ্ঞান শাস্ত্র। বাস্তবিক বেদ ঋষিগণের কপোল কল্পিত কাব্য না, প্রকৃত সত্যমূলক বিজ্ঞান, এ বিষয়ে সকল হিন্দুরই একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বেদ হিন্দুর কাছে মহামান্য। বেদের এই মান্য আজ কতকাল ধরিয়া রহিয়াছে তাহা কেহই জানে না। বেদকে হিন্দুরা এত যে মান্য করে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। কারণটা কি একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। সাধারণ হিন্দুগণ সকলেই বলিবেন যে বেদ যে কি জিনিস তাহা আমরা কিছুই জানি না কিন্তু তথাপি বেদকে মান্য করিয়া থাকি। যাহাকে চিনি না তাহার কি গুণ দেখিয়া তাহাকে মান্য কর? এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু এই কথা বলিবেন যে, হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা সকলেই বেদকে সত্যমূলক বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছেন তাই আমরাও জানি যে ইহা সত্যমূলক। আমাদের দর্শন শাস্ত্র ত কবির কল্পনা নয় ইহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা বেদ বুঝি না বটে কিন্তু সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা কপিল যখন বেদ ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তখন তিনি যে বেদকে কবির কল্পনা বলিয়া বুঝেন নাই ইহা নিশ্চয়। সমাজ যাঁহাদিগকে সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিল তাঁহারা সকলেই বেদকে সত্যমূলক বুঝিতেন তাই হিন্দুসমাজে বেদের এত মান্য প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সকলেই কি নিউটন বুঝিতে পারে কিন্তু

নিউটনের আদর এখন চারিদিকে যেরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেইরূপেই বেদের আদর হিন্দুসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দু দর্শনকারগণ বিশেষতঃ মহাত্মা কপিল যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন ইহা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। এখন ভাবিতে হইবে কপিলদেব বেদকে সত্যমূলক বুঝিয়া সেই বেদ-ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার চিন্তা স্রোত চালাইয়াছিলেন ইহা কি কপিলদেবের কুসংস্কারের ফল কিম্বা তিনিই যথার্থ বেদরহস্য বুঝিয়াছিলেন, আর আজকালকার পণ্ডিতগণ সেই রহস্য বুঝিতে পারেন না বলিয়া বেদকে সে ভাবে দেখিতে পান না। হিন্দুদের কাছে এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, গুরুদীক্ষা ব্যতীত লোকে বেদরহস্য বুঝিতে পারে না; একথাটি যদি সত্য হয় তবে পাশ্চাত্যগণ যে প্রকৃত রহস্য বুঝেন নাই ইহা নিশ্চয়।

যাই হউক পাশ্চাত্যগণ বেদকে কাব্যস্বরূপ দেখিতেছেন বলিয়াই আমরাও যে সেই ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিব ইহা আমাদের উচিত নহে। যখন আমাদের মধ্যে এই কথা প্রচলিত যে, গুরুদীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত বেদরহস্য বুঝিতে পারা যায় না,— তখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া বেদের যদি কিছু রহস্য থাকে তাহা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া পরে বেদ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মনেকর একটি গোলকধাঁধা আছে সেই সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি চারিদিকে ব্যাপ্ত আছে যে তাহার মধ্যস্থলে এমন এক অপূর্ব্ব বাসস্থান আছে যে সেখানে যাইলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্থলে যে একবার গিয়াছে তাহার সাহায্য ব্যতীত অন্য কেহ পথ খুজিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন না। ঐ গোলকধাঁধাটি সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়া একদিন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তুমি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলে সমুখেই ভিতরে ঢুকিবার একটি দ্বার রহিয়াছে! তখন তুমি কোন পথ পরিদর্শকের সাহায্য বিনা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে, এবং খানিক পথ যাইয়াই দেখিলে যে সম্মুখে পথ বন্ধ এবং সেই খানে কোন একটি ভাল রকম বসিবার স্থান আছে। এখন বল দেখি তুমি যদি বাহিরে আসিয়া বল যে গোলকধাঁধাটি সম্বন্ধে যা কিছু জনশ্রুতি আছে সে সমস্তই মিথ্যা, ভিতরে একটি বেশ বসিবার স্থান আছে এই পর্য্যন্ত, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে সুবিবেচকের কথা হয় না। যখন সকলেই বলে যে উহার ভিতরে যাইবার পথ যে জানে তাহার সাহায্য ব্যতীত ভিতরে যাওয়া যায় না তখন প্রথমে সেইরূপ কোন লোকের সাহায্য লইয়া তবে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে যাওয়া উচিত ছিল তাহার পর তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে বাহিরে সেইরূপ বলিলেই ভাল ছিল। বেদ সম্বন্ধে আমিও ঠিক ঐ কথা বলিতে চাই। তুমি আমি একটু সংস্কৃত শিখিয়া বেদ সম্বন্ধে যাহা বলিতে যাই সে কথার যে বেশী

মূল্য আছে ইহা আমি মানিতে চাহি না। যিনি ঠিকপথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ গুরু-দীক্ষা লাভ করিয়া বেদ সম্বন্ধে আপন অভি-প্রায় প্রকাশ করিবেন তাঁহার কথাই সবি-শেষ মান্য।

বেদ সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে ঋষি-গণ যে অবস্থায় যোগারূঢ় হইয়া থাকিতেন বেদমন্ত্র সকল সেই সময় তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এবং যিনি সেই যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহই বেদ মন্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে ক্ষম নহেন। এই সকল কথা গুলির বিষয় মনোমধ্যে একটু ভাবিয়া তবে বেদ সম্বন্ধে কথা কহা সকলেরই উচিত।

ম্যাক্স্মূলর বেদের যে সকল অংশ বুঝিতে পারেন নাই সেই সকল ভাগকে Theological twaddle অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাজে কচকচি বলিয়া বুঝিয়াছেন। আমাদের কবি ভারতচন্দ্র যদি ইংরাজী শিখিয়া নিউট-নের Principia পড়িতেন তবে তিনি ও হয়ত বলিতেন যে উহার ভিতর কিছুই নাই কেবল বাজে কথা আছে। কবি না হইলে কবির কথা বুঝা যায় না বিজ্ঞান না শিখিলে বৈজ্ঞানিকের কথা বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ ঋষি হইতে না শিখিয়া যিনি ঋষিদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চান তিনি মূর্খ।

মনে কর তুমি এই ১৮৮৫ সালের এক-দিনকার খবরের কাগজে দেখিলে যে war between the Lion and the bear is expected in winter; তুমি যদি ইহা হইতে বুঝ যে কলিকাতায় জিওলজিক্যাল বাগানে শীতকালে সিংহের সহিত ভল্লুকের যুদ্ধ প্রদর্শনী হইবে তবে তুমি লেখকের ভাব কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলে না। পলি-টিক্সের ভাষায় এখানে সিংহ অর্থে ইংলণ্ড এবং ভল্লুক অর্থে রুষিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ ঋষিদের ভাষার কি কথায় কি ভাব বুঝায় তাহা না শিখিয়া বেদ বুঝিতে চেষ্টা করিলে তুমি যে বেদের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয়।

ঋষি দীক্ষিত কোন লোকের সাহায্যে বেদ সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনের ভাব জন্মি-য়াছে, সেই ভাব অবলম্বন করিয়া আমি বেদ সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিতে চাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমন জড় জাতীয় শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে সেই-রূপ বেদ মনোময় জগতের শক্তি-তত্ত্ব বুঝা-ইবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের দেবতা সকল মনোময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। জড় বিজ্ঞানে যেমন শিক্ষা দেয় যে ইলেক্‌ট্রিসিটি, ম্যাগনিটিজম, তেজ প্রভৃতি ভিন্ন প্রকারের শক্তি সকল কোন একটি শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, সেইরূপ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে মনোময় জগতের যে-সকল শক্তি কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যক্ত হইয়া থাকে সকলই সেই এক ব্রহ্মশক্তির রূপান্তরিত অবস্থামাত্র।

হিন্দুধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে, যে সকল জড় শক্তির ক্রিয়া জড় জগতে দেখিতে পাই তাহারা আবার মনোময়-জাতীয় শক্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র,* সেই জন্য আর্য্য ঋষিগণ

জগৎতত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমে মনোময় জগতে প্রবেশ করিয়া সেইখানকার শক্তিতত্ব সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বেদ এই আলাচনার ফল।

বেদের এক একটি মন্ত্র কোন না কোন মনোময় শক্তি বিষয়ক সত্যমূলক কথা; যেমন কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ঠিক করিয়া বুঝিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয় এবং কিরূপে সেই পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা বিজ্ঞান শাস্ত্রে লিখিত থাকে সেইরূপ বেদের মন্ত্র-মূলক সত্য সকল পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারি বার• জন্য বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে সেই সকল পরীক্ষা-পদ্ধতি বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য-গণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ সম্যক্ আলোচনা না করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ বুঝিতে গিয়াছেন তাই বেদের প্রকৃত অর্থ কিরূপ তাহার আভাস পর্য্যন্ত পান নাই।

বেদ মনোময় জগৎ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; এক্ষণে মনোময় জগৎ কথাটার অর্থ একটু বুঝান চাই। যাহা চক্ষু-আদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই স্থূল জগৎ, কিন্তু যাহা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে অথচ অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে তাহাই সূক্ষ্ম-জাতীয় বিষয়। এই সূক্ষ্ম জগৎকেই মনোময় জগৎ বলিয়া আসিয়াছি। ভারতীতে 'মনের কথা জানা' নামক প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি মনোময় জগৎ কিরূপ তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। এক জনের মনের• ভাব আর এক জনের বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর নহে •কিন্তু• আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় স্ফুরিত হইলে উহা যে সেই অন্তরেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে ইহা আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কেহ কেহ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা স্থূল ইন্দ্রিয় সকল যখন চালনা করি তখন যে শক্তি ব্যয় করি, বাহ্য জগতে সেই শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেই জন্যই বাহ্যজগতে স্থূল শক্তির আধার আছে ইহা বুঝিতে পারি। আমাদিগের কর্তৃক প্রযুক্ত শক্তির ক্রিয়া যাহাতে লক্ষিত হয় তাহাকেই আমরা পদার্থ (matter) বলিয়া বুঝি। হাত নাড়িলাম, একটি স্থূলশক্তি ব্যয় করিলাম, দেখিলাম সেই শক্তির বলে একটি ভাঁটা গড়াইয়া গেল, তখন বুঝি যে ভাঁটা একটি পদার্থ। কিন্তু আমরা ইচ্ছা প্রকাশ, মনে মনে বিচার কার্য্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিবার সময় যে শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি বাহ্য জগতে তাহার কোন ক্রিয়া দেখিতে পাই না, সেই জন্যই বাহ্যজগতে যে আবার মানসিক শক্তির আধার ক্ষেত্র আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত মনের কথা জানা নামক প্রস্তাব যাঁহারা একটু যত্নের সহিত পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত পক্ষে, আমার মানসিক শক্তি যাহা আমি মানসিক কার্য্য করিবার সময় ব্যয় করিয়া থাকি তাহা যে অমনি আমার মনেই লয় পায় তাহা নহে। বাহ্য জগতে মনোময় শক্তির আধার আছে এবং আছে বলিয়াই অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইলে একজন আর এক জনের মনের ভাব মনের সাহায্যে বুঝিতে পারে। এই মনোময় শক্তির আ-

ধার ক্ষেত্রকেই মনোজগৎ কহে (The substratum of thought energy)। স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ যেমন সত্য, সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্মজগৎও সেইরূপ সত্য। ঋষিগণ আপন আপন সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ সাধন করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্মজগতের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বেদ সেই আলোচনার ফল। আমাদের এই মোটা ইন্দ্রিয় লইয়া বেদের প্রকৃত অর্থ কেমন করিয়া বুঝিব।

যেজন অন্ধ তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে মনকে যতই সরাইয়া লইবে ততই অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। স্বপ্নাবস্থায় যখন বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল বিশ্রাম করে সেই সময় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আমাদের নিজের নিজের মনের ভাবের রূপ রসাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় আমরা নিদ্রিত থাকি স্বপ্নরহস্য কিছু বুঝিতে পারি না। নিদ্রিতাবস্থায় যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমরা আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইনা, যেরূপ ভাবে দেখিয়া পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করিতে হয় সেরূপ ভাবে স্বপ্ন দেখিতে সক্ষম হই না—কিন্তু যেজন জাগ্রত থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছেন তিনিই মানসিক তত্ব আলোচনা করিবার পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রথমে স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শিখিতে হইবে, স্বপ্নাবস্থায় বিচার করিতে শিখিতে হইবে, তবে বেদ রহস্য বুঝিতে যাওয়া উচিত। এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া কোন এক বিষয় আলোচনা করিবার জন্য চিত্ত স্থির করার নামই সবিকল্প সমাধি যোগ। ঋষিগণ এইরূপ যোগাবস্থায় আরূঢ় হইয়া জগতের মনোময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বেদ প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া বেদের একটি মন্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে বেদে কিরূপ সত্য আছে তাহা বুঝিতে পারিবে।

হিন্দুরা বরাবর এই কথা শুনিয়া আসিতেছে যে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া কথাটা বড় সহজ কথা নয়। কত কত যোগীর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে অথচ কোন একটি বিশেষ মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ইচ্ছা করিলেই অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া। সুতরাং ম্যাক্সমূলরের ভাষ্য দেখিয়াই বেদ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি এরূপ মনে করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুদের এখন আর কিছুই নাই, হিন্দুদের সমাজ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের সব লোপ পাইয়াছে, কেবল বাহিরের অঙ্গহীন অস্থিচর্ম্ম সার দেহটি আছে। তবে যে হিন্দু সমাজ এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার কারণ এই যে, হিন্দুদের ঋষিদের নামে এখনও ভক্তি আছে। সেই ঋষিদের অসভ্য কৃষক বলিয়া যদি কেহ বুঝাইতে চান, হিন্দুধর্ম্মের গোড়া বেদকে যদি কাব্য বলিয়া কেহ প্রতিপন্ন করিতে চান তবে তিনি যে অস্থিচর্ম্মসার হিন্দু সমাজের প্রাণহানির চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিশ্চয়। হিন্দুসমাজের বন্ধন ধর্ম্ম, পলিটিকল ন্যাসন্নালিটি ইত্যাদির বন্ধনে

হিন্দুসমাজ টেঁকিবে না, তাই বলি ঠিক না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া যা মনে আসিল বলিয়া ফেলিয়া গরিবের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা কেহ যেন না করেন। বেদে যে অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি দেবতার কথা আছে তাহারা মনোময় জগতের শক্তি সকলের ভিন্ন নাম। মনোময় জগতের সূর্য্যদেবের নাম সূর্য্য দেবতা। মনোময় জগতে আবার অগ্নি, সূর্য্য কি কথা! বেদের একটি মন্ত্র লইয়া ইহা বুঝাইতে চাই।

ব্রাহ্মণের প্রথম দীক্ষা-মন্ত্র গায়ত্রীমন্ত্র ইহার দেবতা জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য। এই মন্ত্র ও এই মন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে আমি যেরূপ অর্থ বুঝি তাহা কথঞ্চিৎ বুঝাইতে চাই।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

আইস সেই দীপ্তিমান্ সবিতাদেবের বরণীয় ভর্গ আমরা চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রদান করিবেন"।

বাহ্য জগতে সূর্য্য উদয় হইলে উহার জ্যোতি আমরা চক্ষে দেখিতে পাই উহার তেজ আদি অন্যান্য গুণ আমাদের ত্বগেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যোগী যখন বাহ্য-ইন্দ্রিয় হইতে মন সরাইয়া লন, যখন তিনি স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হন তখন বাহ্যজগতীয় সূর্য্য তাঁহার নয়নগোচর হয় না, কিন্তু সেই অবস্থায় থাকিয়া যে মানসিক শক্তির সাহায্যে তিনি অন্তর-চক্ষুর সাক্ষাতে সূর্য্যতেজ প্রকাশিত দেখিতে পান; অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার সূর্য্য সম্বন্ধীয় গুণ সকল যেমন প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থায় যখন ঠিক সেই সকল গুণ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে তখন যে মানসিক শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই সূর্য্য-দেবতা শক্তি। যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া বৃক্ষাদি পদার্থ সকল আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয় যখন দেখিবে যে অন্তর্জগতীয় পদার্থ সকল সেইরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, তখনই অন্তরে সূর্য্যদেবতার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। বাহ্য জগতের সূর্য্যালোকের গুণ মানুষকে জাগাইয়া রাখা, সূক্ষ্ম-জগতের সূর্য্যের গুণ যোগীকে স্বপ্নাবস্থায় জাগাইয়া রাখা। যোগী বাহ্য-ইন্দ্রিয় হইতে মন সরাইয়া লইয়া যে সময়ে স্বপ্নাবস্থায় আসিতেছেন সেই সময়ে যে মানসিক শক্তির সাহায্যে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ও বিচার-ক্ষমতা প্রবুদ্ধ থাকে সেই মানসিক শক্তির নামই সূর্য্য-দেবতা। এই দেবতাকে চিন্তা করিলে, এই দেবতার সাহায্য পাইলে অর্থাৎ মানসক্ষেত্র সূর্য্য দীপ্তি প্রকাশিত করিয়া জাগ্রত থাকিতে শিখিলে ধীশক্তির প্রকাশ পায়। সাধারণ স্বপ্নাবস্থায় ধীশক্তির বিকাশ থাকে না, কিন্তু সূর্য্যদেবকে চিন্তা করিয়া বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ রাখা যায়, তাই সবিতা মন্ত্রে "ধীয়োয়োন প্রচোদয়াৎ" এই সত্যমূলক কথাটি সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু বেদের সূর্য্য-দেবতাকে যিনি জড়-জগতীয় সূর্য্য বিবেচনা করেন তিনি এই 'ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' কথাটিতে একটুখানি কবিত্ব বই আর কি দেখিতে পাইবেন?

বেদ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে আর বেশী কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঋষিদের গুপ্তভাণ্ডার ঋষিদের সাহায্য-বিনা খুলিতে চেষ্টা করা বৃথা শ্রম মাত্র।

হিন্দু।

---

# নক্সা।*

## শিক্ষিতা আসীন, অশিক্ষিতার প্রবেশ।

শিক্ষিতা। (দণ্ডায়মান হইয়া) "এই যে আসুন—বসুন বসুন—"

(দুজনে উপবিষ্ট হওন)

অশিক্ষিতা। "আহা আজ আবার আমাদের কত দিন পরে দেখা গেল!—মনে আছে সেই ছেলেবেলা দুজনে কত খেলা করে বেড়াতুম—কত ভাব ছিল, একজনকে না দেখলে আর একজন যেন মণিহারা ফণীর মত হয়ে পড়তুম, তাপর কোথায় কে সব চলে গেলুম।"

শি। "হাঁ তা অনেক দিনের পর দেখা বই কি, এর মধ্যে কত লোকের জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত রাজ বিপ্লব, কত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কত গবর্ণর জেনেরল বদল হয়েছে—কত নূতন আইনের সৃষ্টি হয়েছে—এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ কতই ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেছে, আবার সম্প্রতি ত লিবারল মিনিষ্ট্রি পর্য্যন্ত চেঞ্জ হয়ে গেল—

অশি। (হাঁ করিয়া) "তুমি ভাই কি কত কগুলো বল্লে—ভাল বুঝতে পারলুম না। ওঃ লিবারের কথা বলছ বুঝি? তা—আমার ভাই লিবারের কথা শুনলে বড় ভয় করে—সে দিন আমাদের হারাণের মেয়ে আহা ঐ ব্যামতে মারা পড়েছে"—

শি। (একটু হাসিয়া) "না না আপনি বুঝতে পারেন নি, আমি সে কথা বলিনি, আমি বলছি গ্ল্যাডষ্টোন আগে প্রাইম-মিনিষ্টর ছিলেন—এখন কন্‌সারবেটিব সলস্‌বেরি তাই হয়েছেন।"

অশি। (খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া) হাঁ এবছর কাঁসার বাটীটা সত্যিই খুব শস্তা হয়েছে বটে, আমিও সেদিন পরাণ মিস্ত্রীর কাছ থেকে দুআনা করে এক একটা বাটী কিনিছি।

শি। (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগতঃ) এ কি ইনি এই কথাটা বুঝতে পারলেন না, খবরের কাগজ টাগজ কি কিছুই পড়েন না নাকি? God be praised—ভাগ্যিস আমি ও রকম

---

* ভাদ্র মাসের নক্সাটির উত্তর রূপে নিতান্ত রঙ্গচ্ছলে এই নক্সাটি লেখা হইয়াছে। সুন্দরী পাঠিকাগণ কেহ যেন মনে না করেন—যে তাঁহাদের ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কিম্বা তাঁহাদের ইউনিবর্সিটি পরীক্ষার প্রতি কটাক্ষ করা নক্সাটির উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এ গরীবকে নিতান্তই ভুল বুঝা হইবে।

লেখক।

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে নেই।” (প্রকাশ্যে) ও মেয়ে দুইটি আপনার সঙ্গে যে এনেছেন ওরা আপনার কে ?”

অ। এইটি আমার মেয়ে, আর এইটি আমার ননদের মেয়ে।”

শি। “এদের দুজনকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে, আচ্ছা দু বছর আগে কি এরা আমাদের স্কুলে লাষ্টক্লাশে পড়ত ? আমি তখন এণ্ট্রেন্স দিচ্ছিলেম।”

শি। “হাঁ কিছু দিন এরা স্কুলে গিয়াছিল বটে, তাপর ভাবলুম লেখা পড়া করে মেয়েরা ত আর পাক্ড়ি বেঁধে চাকরি কর্‌তে যাবে না,তাই ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।”

শি। (একটু হাসিয়া) তা ওরা দুজনে এক বয়সি না ?

অশি। হ্যাঁ। তা তুমি কি ক’রে জান্‌লে ভাই ?

শি। “স্কুকুর সঙ্গে এদের দুজনের ভাব ছিল, স্কুকু আপনার মেয়েকে দেখিয়ে বল্‌ত যে তার এক বয়সি, আর আপনার ননদের মেয়েকে দেখিয়েও বল্‌ত একবয়সী। তা ইউক্লিডের ফার্ষ্ট অ্যাক্সিয়মে ত লেখাই আছে, যে Things which are equal to the same thing are equal to one another, তাই বুঝলেম ওরা দুজনেই যখন স্কুকুর equal তখন They are equal to each ather.”

(অশিক্ষিতার অবাক হইয়া শ্রবণ )

শি। “তা শুনেছিলেম আপনার ননদের মেয়েটির নাকি কেউ নেই।”

অশি। “হ্যাঁ বাছার আমার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই কেবল একটি কানা খুড়ো, তা সে থাকা না থাকারি মধ্যে।

শি। “তা একজন থাকলে একেবারে হতাশ হবার আবশ্যক নেই, একজন থাক্‌লেই দুজন থাকা হয়। আমি আপনাকে অ্যালজেব্রিক্যাল প্রূফ দেখাতে পারি যে, One is equal to two। দেখবেন, আমি অ্যালজেব্রা আনছি।”

(প্রস্থান ও কিছুপরে প্রত্যাগমন।)

শি। (বই খুলিয়া) এই দেখুন, এক্‌স্ ইনটু এক্‌স্ মাইনাস-একস্ ইজ ইকোয়াল টু একস্-স্কোয়্যার্ড মাইনস্ এক্‌স্-কোয়ার্ড। বুঝতে পারছেন ? এগেন একস্ প্লাস——

অ। “আমরা ভাই মুখ্য সুখ্য মানুষ অত কি বুঝতে পারি? তুমি ভাই কত লেখা পড়াই শিখেছ। আমার ছেলেটিও খুব শিখেছে—সেও ঐ রকম কত আবল তাবল বকে।”

শি। ‘‘আপনি বুঝি কোন স্কুলে পড়েননি ? তা আপনার ছেলে কেমন লেখা-পড়া করছে।”

অ। “মা কালীর প্রসাদে একরকম ভালই হচ্ছে।”

শি। “মা কালী ? সে আবার কে ? শুনেছিলুম না কি সে দুর্গার মা।”

অ। “ওমা সে কি কথা! তিনিই যে মা দুর্গা। তা তুমি কি ভাই হিন্দু শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু পড়নি ?”

শি। “Nonsense হিন্দুশাস্ত্র আবার কেউ পড়ে নাকি ? History, Mathematics এই সব পড়তেই সময় পেয়ে উঠিনে তা আবার আপনাদের সেই কুসংস্কার-পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্র পড়তে যাব ?”

(একজন লোকের গেজেট হস্তে-প্রবেশ)

শি। “কি গেজেট ? দেখি দেখি কোন ডিবিজনে পাশ হলুম দেখি।”

(সমস্ত দেখিয়া নিজের নাম না দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।

অ। “ওমা একি গা ? হঠাৎ পড়ে গেল কেন ? ওমা গাটা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। বাছা তোরা একজন কোন ঝিটিকে ডাক দেখি।”

(একজন বালিকার গমন ও দাসী লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

... "দেখ দেখি বাছা, এ কি হোল"
...নী। "ও আবার বুঝি সেই ইস্ত্রি-... কি বলে সেই ব্যাম হোল, মুখে চোখে ...র ছিটে দাও, সেরে যাবে। আমাদের ...শে হলে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধুঁয়া দিলেত ...র যায়, (অশিক্ষিতার কানের কাছে আসিয়া চুপে চুপে) আমাদের দেশে এরকম হলে ভূতে পাওয়া বলে।"

শি। (মুখে জল দিতে দিতে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) O my God my God। উঃ আর পারিনে। (চোখ মেলিয়া) এ কি উঃ unbearable pain!

পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা।

---

# লজ্জাবতী।

১

বদন খানি চাঁদের আলো,
কালো কেশের রাশি,
হাসি-ভরা ঠোঁট খানি তার
পরাণ—উদাসী।

২

নয়ন দুটি সাঁজের তারা
ভেসে ভেসে রয়,
কথা—কইলে পরে আধ বাধ
দুটি কথা কয়।

৩

যে—কাছে গেলে জড় সড়,—
"লজ্জাবতী" লতা;
মুখের পানে চাইলে পরে
সয়েনা ক কথা।

৪

কোথায় তারে রাখব আমি
পাইনে ঠিকানা,
সে কিসের তরে চম্‌কে উঠে
কিসের ভাবনা।

৫

কবির স্বপন দিয়ে দেব
বাগান খানি ঘে—
হাঁস্‌বে চাঁদ ফুট্‌বে ফুল
দুল্‌বে মাতা নেড়ে।

৬

বাতাসটিকে বলেদেব
চুপি চুপি যাবি,
ফুলের গন্ধ ফেলে দিয়ে
দুটি কথা চাবি।

৭

তারি মতন সেজে গুজে
কাছে তার যাব,
ফুলের কাজল বুলিয়ে চোকে
চোকের পানে চাব।

৮

যে দিক্ পানে চাইবে সে যে
দেব মধুর হাসি,
যেখেন দিয়ে চল্‌বে সে যে
ফেল্‌ব কুসুম রাশি।

৯

তার প্রাণের পরে ছড়িয়ে দেব
প্রেমের জোছনা,
তারে—মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে
ভাব্‌তে দেব না।

শ্রী প্রিয়নাথ সেন।

# প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন।

## হ্যারল্ড কোম্পানির

### উন্নতি-সাধিত হার্ম্মণীফ্লুটের মূল্য

অনেক

হ্রাস

করা হইয়াছে।

এই সুমধুর ও চিত্তবিনোদক যন্ত্রের প্রতি সাধারণের আদর দেখিয়া হ্যারল্ড কোম্পানি ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অভিনব যন্ত্র বহুল পরিমাণে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইক্ষণে হ্যারল্ড কোম্পানি সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছেন যে সেইগুলি এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বরযুক্ত যন্ত্র। ইহা টেবিলের উপরে কিম্বা হাঁটুর উপরে রাখিয়া বাজান যায়। এই যন্ত্র অতিসহজে যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং যেরূপ সহজে শিখিতে পারা যায় তাহাতে সকলেরই ইহার একটি একটি গ্রহণ করা উচিত।

## মূল্য।

৩ অক্টেভ ও একষ্টপের ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কেল যুক্ত বাক্স হারমনি ফ্লুট নগদ মূল্য ... ৪০৲ টাকা

... ৫০৲ টাকা

তন অক্টেভ তিন ষ্টপযুক্ত বাক্স হা[illegible] ফ্লুট নগদ মূল্য ... ৭৫৲

৩½ অক্টেভ এক ষ্টপ যুক্ত... ৯০৲

৩½ অক্টেভ তিন ষ্টপ যুক্ত ... ৯৫৲

হ্যারলড কোম্পানি এই যন্ত্র [illegible] ইতে শিখিবার একখানি পুস্তক [illegible] করিয়াছেন। নিম্নে তাহার বিশেষ [illegible] দেওয়া গেল। সংবাদ পত্র সকল [illegible] যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। উহা [illegible] পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এই [illegible] কের নাম "কিরূপে শিক্ষক ব্যতি[illegible] হ্যারল্ড কোম্পানির হার্ম্মণী ফ্লুট [illegible] ইতে শিখা যায়" ইহার মূল্য ৩ [illegible] পুস্তকে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ও [illegible] বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী গত-সকল [illegible] আছে। ইহাতে যন্ত্রের একটি প্রতি[illegible] স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। [illegible] কোন সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তি [illegible] অভ্যাস করিয়া এই যন্ত্রের যে কোন [illegible] বাজাইতে পারেন।

কেবল মাত্র হ্যারলড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হ্যারলড কোম্পানি—৩ নং [illegible] স্কোয়ার কলিকাতা।

# নিরামিষ ভোজন।

## প্রতিবাদ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা—"ভারতীতে" "নিরামিষ ভোজন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক মাংসাদি আমিষ ভোজনের প্রতিবাদ দ্বারা নিরামিষ ভোজনের উপযোগিতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নিরামিষ ভোজনের উপযোগিতানুপযোগিতার কথা—আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া মাংসাদি আমিষ ভোজন সম্বন্ধে আমাদের এক আধটী কথা আছে। নিরামিষ ভোজন সমর্থনকারী লেখক যদি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া—মাংসাদি ভক্ষণের প্রতিবাদ করিতেন, ষোলআনা ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া "অহিংসা—পরম-ধর্ম্ম" প্রচার করিতেন তাহা হইলে অবশ্য কোন কথাই ছিল না। অথবা যদি তিনি বিজ্ঞানের প্রশস্ত পথ ধরিয়া মাংসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করত শরীর-পোষণ-কল্পে উহার অনিষ্টকারিতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কথার বিশেষ মূল্য থাকিত। কিন্তু লেখক তাহার কোন পথেই যান নাই। তিনি গিয়াছেন, এমত একটা পথে, যেটা না আধ্যাত্মিক না ভৌতিক, না নৈতিক, না বৈজ্ঞানিক। লেখক কোন প্রণালীই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করেন নাই। এদিক সেদিক হইতে এক আধটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা লইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া দুষ্কর।

আমিষ ভোজন নিষেধ ও নিরামিষ ভোজনের বিধি নূতন নহে। উহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক যুক্তি আছে, তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপতঃ এক আধটা স্বপক্ষ কথার অবতারণা করিয়া লেখকের বিচার্য্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

লেখক মহাশয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন "নাইট্রোজেন ও অকসিজেন" লইয়া। শিষ্য বলিলেন, আমিষ পদার্থে (মাংসে) ইহা বহু পরিমাণে আছে, এবং আমি ডাক্তারদিগের নিকট শুনিয়াছি, ইহাতে বহু পরিমাণে শারীরিক পুষ্টি ও বলবিধান করে।" কিন্তু গুরুর উপদেশ শুনিয়া শিষ্যের চক্ষু স্থির। গুরু বলিলেন—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে খানিক আদত "নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন" যাহা দ্বারা নাইট্রোজিন পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা লইয়া শরীরে প্রবেশ করাইলে শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। অস্থিতে চূণ আছে, খানিক চূণ খাইলেই কি অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারে?" এস্থলে গুরুঠাকুর রসিকতা করিয়াছেন, মন্দ নয় কিন্তু তাঁহার অনুধাবন করা

উচিত ছিল, যে চূণ অস্থিরোগের একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ। অস্থির পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত চূণের তুল্য ঔষধ ইংরাজিতে নাই *। তোমার শিশুসন্তান দন্ত উঠিবার সময়, নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে, সেই সময় ডাক্তারের নিকট ব্যবস্থা লইলে, চূণ ব্যতীত ভিন্ন ঔষধ কদাচিৎ দিবেন। যদি রোগার অভিভাবক সঙ্গতিপন্ন লোক হয়েন, ডাক্তার একটু হাইপোফসফেট অফ্ লাইম ব্যবস্থা করিবেন, নতুবা এজন্য সচরাচর চূণের জল ব্যবহার হয়। যেহেতু চূণ শরীরাভ্যন্তরে রাসায়ণিক কার্য্য পরম্পরায় দন্ত উঠিবার সাহায্য করে। † পরন্ত কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল, তাহার অস্থি সকল এত কোমল হইয়াছে, যে ভবিষ্যতে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হইবেক না, এমতাবস্থায় চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থার্থী হইলে তিনি প্রধানতঃ চূণ ব্যবস্থা কবিবেন, কেননা এরূপ স্থলে চূণ ব্যতীত অতি অল্প ঔষধই আছে। অতএব চূণ দ্বারা যে অস্থির পুষ্টিসাধন ও শরীর কর্ম্মঠ হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আর অধিক কথা বলিতে হইবেক না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অস্থি ও মস্তিষ্ক রোগে চূণ একটী প্রধান ঔষধ। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে চূণে বহু পরিমাণে জান্তব পদার্থ (আমিষ) আছে। পরন্ত অমিশ্র বা "আদত" "নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন" শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে শারীরিক পুষ্টিবিধান কতদূর যুক্তিসংগত ও সম্ভব, তাহা আমরা ক্রমে যাহা বলিব, তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইবে। এস্থলে কেবল এই একটা কথা—এটা খুব সোজা কথাও বটে যে কোন দ্রব্যের উপকারিতা বা অপকারিতা কেবল মাত্র তাহার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না, তাহার পরিমাণ ও প্রয়োগ-প্রণালীর উপরও যথেষ্ট নির্ভর করে। বিষে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ও সেই ঔষধে না না প্রকার রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু তাই বলিয়া রোগীকে খানিক বিষ খাওয়াইয়া দিলে তাহার মৃত্যু ভিন্ন রোগ আরোগ্য হয় না। ধাতুঘটিত ঔষধ সেবন করিলে রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ খানিক আদত ধাতু খাইবে?

হিংসা দ্বারা আত্মা কলঙ্কস্পৃষ্ট হয় ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে, অতএব পৃথিবীর যাবতীয় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে হিংসা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। মাংসাদি জান্তব আহার্য্য সামগ্রী হিংসালব্ধ। অতএব উহা ভোজন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ যেহেতু তদ্দ্বারা হিংসাকেই বর্দ্ধিত করা হয়। পরন্ত অরণ্যজাত ফল মূলাদির দ্বারা যখন অনায়াসে মনুষ্য-শরীর রক্ষিত ও পোষিত হইতে পারে তখন জীবহিংসা করার প্রয়োজন কি? ইহা অবশ্য

* বলা বাহুল্য, যে চূণ বলিলে, সামান্যতঃ আমরা যে, চূণ ব্যবহার করি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ হইতে যে চূণধর্ম্মী দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাও চূণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যথা—Hypo-phosphate of lime, carbonate of lime ইত্যাদি।

† আধুনিক "শরীরতত্ত্ববিদ্" দিগের মতে দন্ত অস্থির রূপান্তর মাত্র।

বহুকালের নীতি-কথা। একথা সকলেই জানে এবং ইহার বিশেষ নৈতিক মূল্য আছে ইহাও অনেকে স্বীকার করে। কিন্তু মাংসাদি আহারে বুদ্ধির স্থূলত্ব ও চিন্তা শক্তির জড়ত্ব উৎপাদিত হয়, একথাটা অনেকের নিকট নূতন ঠেকিবে। বস্তুতঃ কথাটা নূতনই বটে। এ সম্বন্ধে "ভারতীর" উপরোক্ত প্রবন্ধলেখক মতের অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অভিনবত্ব সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, যদি তাহা সত্যমূলক ও যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, বক্ষ্যমাণ নূতন সিদ্ধান্তটীতে মূল ও যুক্তি উভয়েরই অভাব।

লেখকের আর একটা কথা "মাংস আহার ভাল কি মন্দ বিচার করিতে গেলে মাংসে কি কি" "কেমিকেল এলিমেণ্ট" আছে, তাহার অন্বেষণের বেশী দরকার নাই।" কেন? যদি মাংসের "কেমিকেল এলিমেণ্ট" কি দেখিবার প্রয়োজন না থাকিল, তাহা হইলে তিনি আমিষ ভক্ষণের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা কি প্রকারে স্থির করিলেন? প্রবন্ধলেখক একটু অনুধাবন করিলে অর্থাৎ যেটা অপ্রয়োজন মনে করিয়াছেন সেইটা প্রয়োজন মনে করিলে বুঝিতে পারিতেন মাংসে শরীর রক্ষণোপযোগী পদার্থ যে পরিমাণে আছে, তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের যে প্রকার উন্নতি হইতে পারে, অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তত শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় না। শারীরিক পুষ্টি-সাধন ও রক্ষণের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীরের গঠন জন্য যত প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয় তাহার সকল গুলিই অল্লাধিক পরিমাণে মাংসে আছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত।

প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে "যিনি ভোজন করিবেন, তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে, এবং আমিষ ভোজন (মাংস) সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্ত্তব্য—গোরুকে মাংস খাওয়াইলে সে কখন বলিষ্ঠ হইবেক না, কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে। আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেইজন্য যাহার মাংস ভোজন প্রয়োজন, তাহার পক্ষে মাংস ভোজন বিধি, আর যাহার তাহা প্রয়োজন নাই, তাহার পক্ষে অবিধি" এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, লেখকের মতে গোরুর পক্ষে যেমন মাংস ভোজনের আবশ্যকতা নাই, মনুষ্য পক্ষেতে সেইরূপ। এ স্থলে একমাত্র কথা জিজ্ঞাস্য এই যে লেখক কিরূপ পরীক্ষা দ্বারা জানিলেন যে মাংস মনুষ্যের আদৌ আহার্য্য নয়? সে কাঁচা মাংস খায় না বলিয়া। এটা অদ্ভুত যুক্তি বটে। "মানুষ কাঁচা চাউল খাইতে পারে অতএব তাহার স্বাভাবিক আহার্য্য ভাত। সে কাঁচা মাংস খায় না বা খাইতে পারে না, অতএব মাংস তাহার খাদ্যই নহে।" লেখক মানুষ বলিতে বোধ হয় আমাদের এই কয়জন বাঙ্গালীকে বুঝেন। নহিলে উপস্থিত হাস্যকর সিদ্ধান্তে কদাচ উপনীত হইতেন না। চাউল শীঘ্র পরিপাক হয় না, ভাত শীঘ্র হয়, এজন্য লোকে চাউল না খাইয়া ভাত খায়। কাঁচা ও রাঁধা মাংস

সম্বন্ধেও সেইরূপ। বাঙ্গালী বাবু ভাত না পাইলে অপার্য্যমাণে যেমন চাউল খাইতে বাধ্য হয়, সেইরূপ মাংসভোজী মানুষ রাঁধা মাংসের পরিবর্ত্তে অপার্য্যমাণে কাঁচা মাংস খায়। তার পর অরণ্যবাসী অসভ্য আদিম মনুষ্যের তো কথাই নাই। তাহারা স্বভাবতঃ কাঁচা মাংস খায়। ফল কথা এই যে মানুষের অবস্থা ভেদে অর্থাৎ সভ্যতা ও অসভ্যতা ভেদে কাঁচা ও পাককৃত খাদ্যের ব্যবহার। আর সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের পরিণতি। গো জাতির আহার তৃণ, তথাপি যাহারা গো সকলকে অধিক বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম করিতে ইচ্ছা করে তাহারা তাহাদিগকে তদুপযোগী আহার—যথা খইল, ভাত, ভূসী ইত্যাদি পুষ্টিকর আহার দিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যভোজী গোরুর সহিত প্রাঙ্গণস্থ তৃণভোজী গোরুর তুলনা করিলে, কাহার কিরূপ উন্নতি বুঝা যায়। অতএব বলা বাহুল্য যে, শারীরিক ও মানসিক বললাভ যদি মানব জীবনের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণে "স্থূল ও সূক্ষ্ম" উভয়বিধ আহার্য্য দ্রব্যই ভোজন করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দ্রব্য আহারে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্যকরূপে রক্ষিত ও পোষিত হয় না।

সমালোচ্য প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, স্থূল জাতীয় শক্তির সাহায্যে আমরা স্থূল জাতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং সূক্ষ্ম জাতীয় শক্তির সাহায্যে সামাজিক কর্ম্ম করিয়া থাকি। যাহাকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, সেই কর্ম্মে যে শক্তির ব্যয় হয়, যেরূপ আহার দ্বারা সে ব্যয় সহজে পূরণ করা যায় তাহাই জীবের পক্ষে প্রশস্ত আহার।" সুতরাং স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, জীবগণের কার্য্যের (গুরুত্ব ও লঘুত্ব) তারতম্যানুসারে শরীর পোষণ ও কার্য্যানুযায়ী শক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত তদনুরূপ খাদ্যের প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, যে, কোন্ প্রকার খাদ্য দ্বারা আমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা এস্থলে লেখকের মতানুসারে খাদ্য দ্রব্য সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছি—"স্থূল ও সূক্ষ্ম।" যেমন খড় স্থূল আর ধান্য সূক্ষ্ম পদার্থ; মাংস স্থূল পদার্থ দুগ্ধ সূক্ষ্ম পদার্থ। সূক্ষ্ম জাতীয় শক্তি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে যত সহজে পাওয়া যায়, স্থূল পদার্থ হইতে তত সহজে পাওয়া সম্ভব নহে।" যখন শরীরধারী মানুষের পক্ষে মানসিক (সূক্ষ্ম) উন্নতি, শারীরিক (স্থূল) উন্নতি সাপেক্ষ, তখন লেখকের উপরোক্ত যুক্তি অসঙ্গত। শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষণ কল্পে কেবল মাত্র সূক্ষ্ম দ্রব্য প্রচুর নহে। স্থূল দ্রব্যও প্রচুর নহে উভয়ই প্রয়োজন। ইহা প্রাত্যহিক পরীক্ষিত সত্য।

পরন্তু লেখক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে "নিরামিষ ভোজন দ্বারা মানসিক সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ যত শীঘ্র সম্পাদিত হয়, আমিষ (মাংস) ভোজন দ্বারা তত শীঘ্র তৎক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। যেমন দুগ্ধ দ্বারা যত সত্বর সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ হয় মাংসে তাহার বিপরীত।" আচ্ছা স্বীকার করিয়া লইলাম তাহাই ঠিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপাদ-

নের মূল কি? কোথা হইতে সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে? মানুষের স্থূল শক্তি না হইলে সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, স্থূল হইতেই সূক্ষ্ম আইসে। সূক্ষ্ম শক্তির মূল চিন্তা, সেই চিন্তার আধার মস্তিষ্ক (Brain)। চিন্তা করিতে হইলে মস্তিষ্কের সরলতা আবশ্যক। সেই সরলতার উপায় সুস্থ শরীর। শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইলে মানসিক সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা থাকে না। পরন্তু কোন একটী বিষয়ের শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে দীর্ঘকাল চিন্তার আবশ্যক ও তৎপরিমাণে মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা না হইলে চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল এবং তাহাই রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক। এক্ষণে লেখক বলিতে পারেন, যে, যদি পুষ্টিকর খাদ্যই শারীরিক সুস্থতা ও বলাধানের প্রকৃত উপাদান হয়, তাহা হইলে "মাংস" ব্যতীত কি জগতে এমত পদার্থ নাই যদ্দ্বারা সেই আবশ্যক পূর্ণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি,—পারে বটে। কিন্তু সে "পারার" পরিমাণ ভেদ আছে। আমরা নীচে যাহা বলিতেছি তদ্দ্বারা কথাটা পরিষ্কার হইতে পারিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক মনুষ্য-শরীর সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ও স্বাস্থ্যপ্রদ করিতে হইলে কি পরিমাণে কি দ্রব্য খাদ্যে থাকা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ আমাদের শরীররক্ষণোপযোগী উপাদান সমূহকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম করিতে হইলে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যে এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক; ইহা দৈনিক খাদ্যে না থাকিলে শরীর অব্যাহত থাকিতে পারে না। ইহা আধুনিক শারীর-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

### একটী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ।

(১) Protied (প্রটিড্)—৪ আউন্স ও ১½ ড্রাম।

(২) Amyloids (এমিলইড্স্) ৯ আং ও ১½ ড্রাম।

(৩) Fat (চর্ব্বি)——　　২ আং—৪½ ড্রাম।

(৪) Mineral (মিনারেল)—৬¾ ড্রাম।

(৫) water (জল)—৭৬ আং—২ ড্রাম।

এক্ষণে দেখা যাউক, উল্লিখিত দ্রব্য

সমূহের কোনটী কোন্ দ্রব্য দ্বারা গঠিত এবং আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহারার্থ ব্যবহার করি, তাহার কোন্ দ্রব্যে এই সকল বস্তু অল্প বা অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

১ মতঃ। প্রটিড্ (Protied or fibrinous and albuminous matter) অর্থাৎ সূত্র নির্ম্মাপক ও আন্তর্নালিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ। ইহা অঙ্গার (carbon) উদজান (Hydrogen) অম্লজান (Oxegen) যবক্ষারজান (Nitrogen) গন্ধক (Sulphur) ও ফস্ফরাস্ (Phosphorus) এই কয়েকটী পদার্থের রাসায়ণিক সংযোগে উৎপন্ন হয়।

২য়তঃ। এমিলইডস্ বা এমিলেসাস্ অর্থাৎ মণ্ডধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ। ইহা অঙ্গার, উদজান্ ও অম্লজানের রাসায়ণিক সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩য়তঃ। Fat অর্থাৎ মেদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ। ইহা যদিও এমিলইড্ পদার্থের ন্যায় কেবল উদজান অম্লজান ও অঙ্গারের রাসায়ণিক বৈষম্যে গঠিত কিন্তু ইহাতে অম্লজান ও উদজানের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

৪র্থতঃ। (Mineral) বা ধাতব পদার্থ। ইহা নানা প্রকারে আমাদের খাদ্যের সহিত মিশ্রিত থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ আমরা লবণ, চুণ, জল ইত্যাদির সহিত নানা প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

৫মতঃ। জল। সকলেই অবগত আছেন ইহা (হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন) উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে আমরা উল্লিখিত পদার্থগুলি সংগ্রহ করিলে, দেখিতে পাইব যে, আমরা যে খাদ্যের কথা বলিতেছি তাহা এই; অম্লজান উদজান অঙ্গার যবক্ষার জান ফ্‌ুরণ পদার্থ গন্ধক সিলিকন, ক্লোরিণ ফ্লুরিণ পটাসিয়ম্ সোড়িয়ম্ ম্যাগ্‌নেসিয়া লোহ তাম্র সীসা ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া "অমিশ্র বা আদত" এই দ্রব্যগুলি খাইলে আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে?

যাহা হউক এক্ষণে বিচার্য্য যে আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাতে প্রাগুক্ত পদার্থ সকল কি পরিমাণে আছে ও দৈনিক খাদ্যে তাহা কি পরিমাণে ব্যবহার করিলে আমরা আবশ্যকানুযায়ী ফল পাইতে পারি। আমরা অধিক কথা না বলিয়া নীচে একটী তালিকা দিলাম, তাহাতে বুঝা যাইবেক যে কোন্ বস্তুতে কোন্ ধর্ম্মী দ্রব্য সকল কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

## খাদ্যের গুণ পরিচায়ক তালিকা।

| | নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের নাম | শত করা মাংস বিধায়ী পদার্থ | শত করা উষ্ণজনক পদার্থ | শত করা খনিজ পদার্থ | শতকরা জলীয় ও মেদসিক পদার্থ |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) Protied or Fibrinous and albuminous বা সূত্র ও অণ্ড-লালধর্ম্মী খাদ্য | গম | ১৩ | ৭২ | ২ | ১৩ |
| | যব | ১১ | ৭২ | ২ | ১৫ |
| | মুগ | ২৪ | ৬০ | ৩ | ১৩ |
| | বর্ব্বটী | ২৪ | ৫৯ | ৩ | ১৪ |
| | মাস কলাই | ২২ | ৬২ | ৩ | ১৩ |
| | কলাইসুঁটী | ৭ | ৩৬ | ২ | ৫৫ |
| | ছোলা | ১৯ | ৬২ | ৩ | ১৬ |
| | অরহর | ২০ | ৬১ | ৩ | ১৬ |
| | মটর | ২৫ | ৫৮ | ২ | ১৫ |
| | মূসূরী | ২৪ | ৫৯ | ২ | ১৫ |
| | খেঁসারী | ২৮ | ৫৬ | ৩ | ১৩ |
| | মৎস্য | ১৪ | ৭ | ১ | ৭৮ |
| | মাংস | ২২ | ১৪ | ১ | ৬৩ |
| | দুগ্ধ | ৫ | ৮ | ১ | ৮৬ |
| Amyloids বা মণ্ডধর্ম্মী খাদ্য | তণ্ডুল | ৭ | ৭৮ | ১ | ১৪ |
| | সাগু | ৪ | ৮২ | ১ | ১৩ |
| | আরারুট | ৪ | ৮২ | ১ | ১৩ |
| | আলু | ২ | ২৩ | ১ | ৭৪ |
| | শর্করা | „ | ১০০ | „ | „ |
| তৈলধর্ম্মী খাদ্য | ঘৃত মাখন তৈল | „ | ১০০ | „ | „ |

উপরোক্ত তালিকা হইতে আমরা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য দ্রব্যে শরীর পোষণোপযোগী কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আছে এবং ইতি পূর্ব্বে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, একটী পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের শরীর সম্যক পরিপোষণ হইতে প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য কি পরিমাণে আবশ্যক। অবশ্য, মাংস ও মৎস্য ব্যতীত যে সকল খাদ্য এই তালিকায় নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই সম্যক পুষ্টিকারিতা শক্তি বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাদিগের উপকরণের সকলগুলিই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও মেদসিক পরিমাণ এত অল্প, যে, তদ্দ্বারা

শরীর সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে তাহার পরিমাণের আধিক্য একান্ত আবশ্যক। যদিও দুগ্ধে অত্যধিক পরিমাণে মেদসিক পদার্থ আছে, কিন্তু মাংসধর্ম্মী ও উষ্ণজনক পদার্থ এত অল্প, যে তদ্দ্বারা মানুষের "স্থূলত্ব" ব্যতীত অন্য কিছুই বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সেই নিমিত্ত দুগ্ধপায়ীরা অধিক মেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সকলে বলিতে পারেন আমরা যে সকল ডাল সচরাচর আহারার্থ ব্যবহার করি সেইগুলিতে ত যথেষ্ট পরিমাণে মাংসধর্ম্মী পদার্থ আছে, এবং কোন কোনটী আবার মৎস্য ও মাংস অপেক্ষা এবিষয়ে প্রধান, তবে আমাদের আমিষ ব্যবহারের আবশ্যক কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও উহাদের (ডাল) উপাদানে মাংস-বিধায়ী পদার্থ অত্যন্ত অধিক কিন্তু অন্যান্য পদার্থ তেমনি অল্প সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইলে উহাদের উপাদানে যে সকল পদার্থের অসদ্ভাব আছে, তাহা তদনুযায়ী কোন পদার্থ দ্বারা পরিপূরণ করিয়া লইতে পারিলে চলিতে পারে। কিন্তু তাহা একরূপ অসম্ভব। এমনও প্রমাণিত হইয়াছে, যে উক্ত ডাল সকলের মধ্যে কোন কোনটীতে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, যে সেই সকল ডাল অধিক দিবস একাদিক্রমে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার উৎপত্তি হয়।

আমরা এস্থলে ২।১ টী উদাহরণ দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিবার ইচ্ছা করি। বোধ হয়, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন, যে ইউরোপীয় ও আমেরিকানেরা পৃথিবীর মধ্যে উন্নতিশীল জাতি। ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, বিদ্যা বুদ্ধিতে বল, সকল বিষয়েই, তাহারা জগতের প্রধান জাতি মধ্যে গণ্য। তাহাদের প্রধান আহার কি?—মাংস। তাই বলিয়া কি তাহারা শাক সবজি ইত্যাদি খায় না?—যথেষ্ট খায়, কেননা তাহারা জানে, যে, দেহরক্ষা ও মানসিক বৃত্তির পোষণ ও উন্নতির নিমিত্ত "স্থূল ও সূক্ষ্ম" উভয় প্রকার খাদ্যেরই প্রয়োজন। আবার বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, যে, আমাদের বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থল-বাসীরা আজও পর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে। তাহাদের প্রধান আহার, ভাত অথবা রুটী, ডাল তরকারী; ঘৃত ও দুগ্ধ। কিন্তু সকলেই দেখিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদের বুদ্ধি বড়মোটা ও চিন্তা শক্তি অতি অল্প। যদিও শারীরিক বল যথেষ্ট আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে "সূক্ষ্ম" দ্রব্য ঘৃত ও দুগ্ধ ব্যবহার করাতে তাহাদের শরীরে মেদের পরিমাণ এত অধিক হয় যে, চলিতে পারে না। যদিও দুগ্ধাদি সূক্ষ্ম দ্রব্য ও অন্যান্য স্থূল দ্রব্য আহার দ্বারা শরীর রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু শরীর প্রকৃতরূপ কার্য্যক্ষম করিতে হইলে নিয়মিত পরিমাণে মাংস বা তত্তুল্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিলে জীবন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ নিরামিষভোজী ছিলেন এবং প্রত্যহ সূক্ষ্ম জিনিষের মধ্যে

কেবল মাত্র ২ সের দুগ্ধ পান করিতেন। কিন্তু সামান্য আহারে তাঁহার চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি হওয়া যতদূর সম্ভব তিনি তাহার শেষ সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কয়দিন জীবিত ছিলেন? মস্তিষ্ক আলোড়নকারী ধর্ম্মচিন্তা তাঁহাকে দিন দিন যেন অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছিল, করিবেই বা না কেন, শরীরে রক্তের তেজ না থাকিলে ত মনুষ্য সবল ও সুস্থকায় থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহ ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তাহাতে যদি দুর্ব্বহনীয় চিন্তা আসিয়া মস্তিষ্ক ঘুর্ণিত করিতে থাকে, তাহা হইলে নশ্বর মানব জীবন কতক্ষণ!! কেবল যথেষ্ট পরিমাণ আহারের অভাবে স্বর্গের কেশবচন্দ্র, পৃথিবী কাঁদাইয়া অল্প সময়ে বহু শিক্ষা দিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। পীড়ার অবস্থায় তিনি কি না করিয়াছেন। যে কেশবচন্দ্র আদৌ অবসর পাইতেন না তিনি এসময়ে শারীরিক পরিশ্রমের জন্য সূত্রধরের কার্য্য ও শরীর পোষণের নিমিত্ত তাঁহার বাল্য পরিত্যক্ত অখাদ্য "মাংসের সুরুয়াও" খাইতে কুণ্ঠিত হন নাই *। কিন্তু যখন দৈহিক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাতে কি হইবে? কোন ফল্ল হইল না, কেশবচন্দ্র অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। আমাদের মতে পুষ্টিকর আহারের অভাব তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। যদি তিনি পূর্ব্ব হইতে নিরামিষ ভোজনের সহিত প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণে মাংস ভোজন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত থাকিয়া তাঁহার চিন্তা শক্তির আরও স্ফূর্ত্তি দেখাইতে পারিতেন। এই প্রকার উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িল। ফলতঃ আমরা স্থূলবুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে শরীর রক্ষণার্থ যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর আহারের সহিত প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণে মাংস ভক্ষণ অতীব আবশ্যক †। যদি শারীরিক শক্তি মানসিক বৃত্তি সমূহের মূলীভূত কারণ হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির নিমিত্ত মাংস বা তত্তুল্য বিশেষ কোন দ্রব্য নিয়মিত রূপে ভোজন নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা যত দিন আমরা না বুঝিতে পারিব তত দিন উন্নতির পথও কণ্টকাকীর্ণ তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।
দারভাঙ্গা।

* শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত "কেশব চরিত" দেখ।

† বান্ধব—১ম খণ্ড ১২৮১ "আহার ও বাঙ্গালী," "প্রবাহ" ৩য় ভাগ আষাঢ়।৯১ "বিদ্যালয়গামী বালকের খাদ্য ও ভাদ্র।৯১ "আহার ও বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

# গ্রাম্য ছবি বা জন্ম ভূমি।

মাটীতে নিকাণো ঘর, দাওয়া গুলি মনোহর
সমুখেতে মাটীর উঠান,
খড়ো-চালা-খানি ছাঁটা, লতিয়া করলা লতা,
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঁজিরায় বস্ত্র বাঁধা, বউ কথা, কহে কথা,
বিড়ালটী, শুইয়া দাবাতে,
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা!
খোকা শুয়ে, দড়ির দোলাতে,
কাণে দুল, দুল দুল, (গাছ ভরা পাকা কুল!)
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটী বোনে,
ছোট হাতে জোর ক'রে,শাখাটী নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে!
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কল্মীর দল,
হাঁস দুটী করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশবন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখীদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদ্‌টুকু সোনার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা! বালা দুটী হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান্ নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে,
শান্ত স্তব্ধ, দ্বিপ্রহরে, গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে,
তরু তলে রাখাল শয়ান;
সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে, পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে, সেই মিঠে তান্;
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে,
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান;
সুধাময়ী জন্মভূমি, তেমনি আছ কি তুমি?
শান্তি মাখা স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ!

শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।
(কবিতাহার রচয়িত্রী)

# পজিটিবিজ্‌ম্‌ ও বিশ্বাস।

* ভারতীর গত সংখ্যায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় পজিটিবিজমের সারাংশ প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি তিনটী বীজ-বাক্যে মানব প্রকৃতির তিনটী গভীর প্র-

* এই প্রতিবাদ লেখার উদ্দেশ্য পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত 'টক্‌রাটকরি' করা নহে। 'টক্‌রাটক্‌রি আমি নিতান্ত রুচি বিরুদ্ধ মনে করি। পজিটি-বিজম্ প্রবন্ধে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মানব চরিত্র ও সমাজনীতি বিষয়ে এক অতি গভীর সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন—পজিটি-বিজমের 'খাওয়া পরার' উন্নতিই সংসারের ধ্রুবতারা হইবে, না সে সঙ্গে লোকে উহার অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণে উচ্চতর উন্নতি—আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ করিতে যত্ন-শীল হইবে? আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা

শ্নের তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন—আমাদিগের কোন্ প্রবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসর দেওয়া কর্ত্তব্য, আমাদিগের জ্ঞানের কোন্ অংশে বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ, এবং আমাদিগের কার্য্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত। মানব প্রকৃতির তত্ত্ব যিনি কিছুমাত্র অবগত আছেন, তিনিও জানেন যে এতিনটী প্রশ্ন অতি গূঢ়; আর মানব প্রকৃতি-তত্ত্ব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত যিনি কিছুমাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সর্ব্বপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিয়া উত্তর দেওয়া অতি কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতীর গত সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত প্রবন্ধটির যে প্রতিবাদ লিখিয়াছেন তাহাতে ঐ কঠিন কার্য্যও তিনি যেরূপ সহজ করিয়া আনিয়াছেন —তাহা কেবল তাঁহারই সম্ভবে। তিনি অতি স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন. যে জ্ঞান-ভিন্ন-প্রবৃত্তি কাণ্ডারীহীন-নৌকার ন্যায়। যেখানে দেখা যাইতেছে একটী বিষয়ে জ্ঞান ও প্রবৃত্তি উভয়েরই অবশ্য প্রয়োজন, সেখানে প্রবৃত্তিকেই মুখ্যভাবে উপস্থিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। † আমাদিগের কার্য্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়েও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা

---

আধ্যাত্মিক উন্নতিই জীবনের সার বলিয়া জ্ঞান করিতেন ও সে নিমিত্ত সংসারত্যাগী হইতেন। তাহার পর আমাদিগের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে—এরূপ হওয়ার কারণ কি তাহা এস্থলে অনুসন্ধান করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। তবে ইহা বলিব যে এরূপ মন্দ অবস্থায় অনেকে পজিটিবিজমের ধ্বজা দেখিয়া ভুলিয়া যাইতে পারেন। খাওয়া পরার উন্নতি করিতে যাইয়া অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে শিথিল—যত্ন হইতে পারেন। আর তাহা হইলে সমাজের কত দূর অমঙ্গল হইতে পারে তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পজিটিবিজমে যেখানে এতদূর কুফল দাঁড়াইতে পারে সেখানে সমাজের মধ্যে তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত যে যাহা কিছু করিতে কিম্বা বলিতে পারে তাহার তাহা করা কিম্বা বলা উচিত। সত্য বটে, পজিটিবিজমে যেমন খাওয়া পরার উন্নতি করিতে বলে—সেইরূপ আবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও আদেশ করে। কিন্তু সাধারণ লোকে খাওয়া পরার উন্নতি করিতে গিয়া—উচ্চতর উন্নতির চিন্তার অবর্ত্তমানে—সহানুভূতিকে জলাঞ্জলি দিবে ইহা অসম্ভব নহে। এবং ইহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। খাওয়া পরার উন্নতি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরে প্রশ্রয় পাওয়াতেই মানুষ মানুষকে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

---

† কৃষ্ণকমল বাবু বলিতে পারেন যে প্রবৃত্তির সঙ্গে যে জ্ঞান থাকা চাই ইহা ত ধরা বাঁধা কথা। কিন্তু সাধারণ কথা বার্ত্তা এক জিনিস আর দার্শনিক প্রবন্ধ আর এক জিনস। আমাদিগের আশঙ্কা এই যে কৃষ্ণকমল বাবুর লেখা পড়িলে অসতর্ক অবস্থায় কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে প্রবৃত্তিই মানবপ্রকৃতির নায়ক—কিন্তু আসলে ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, জ্ঞান বৃত্তিই প্রকৃত নায়ক, আর জীবনের কোন গূঢ় প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে জ্ঞান বৃত্তির উপদেশই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য।

লেখক।

করিলে ইহা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতির আংশিক উদ্দেশ্য মাত্র, সমুদায় উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এক্ষণে বাকী থাকিল বিশ্বাস—এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্বেও আরও কয়েকটী কথা বলিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না। কিন্তু মূল প্রস্তাবটী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাহিরের দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে হইতেছে। কৃষ্ণকমল বাবু আমাদিগের দেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার লেখায় যদি কিছু ত্রুটি থাকে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখাইয়া দেওয়া উচিত—নহিলে ত্রুটিটী কালক্রমে দস্তুর হইয়া উঠিতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষ্ণকমল বাবু কোম্‌টকে উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন "তাঁহার Positive Philosophy নামক প্রথম ছয়খণ্ড গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন, বাঙ্গলা দেশে কি সমস্ত ভারতবর্ষে অদ্যাপি এতাদৃশ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই,"

ইহাতে আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গালা দেশ ও সমস্ত ভারতবর্ষকে ইয়োরোপের তুলনায় প্রকারান্তরে নীচ করা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের ও দর্শনের অনেক বিষয় বাঙ্গালা দেশ ও সমস্ত ভারতবর্ষ বুঝিতে না পারা আশ্চর্য্য নহে, কারণ ইয়োরোপ এক অবস্থার দেশ আর ভারতবর্ষ আর এক অবস্থার দেশ। কিন্তু আবার এদিকে ভারতবর্ষীয় সাহিত্য, ভারতবর্ষীয় দর্শনের কয়টী কথা কয়জন ইয়োরোপীয় বুঝিতে পারে? ইয়োরোপীয়েরা যেখানে আমাদিগের সাহিত্য, আমাদিগের দর্শনের সারগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় সেখানে তাহারা 'barbarous,' 'savage' 'primitive' ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি করে—অর্থাৎ তাহারা যাহাতে কোন গূঢ় অর্থ দেখিতে না পায়, তাহাদিগের নিকট তাহা অসার ও অসভ্যতার চিহ্ন। অবশ্য, অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত আছেন যাঁহারা ভারতবর্ষীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রশংসাবাদ মুক্তকণ্ঠে করিয়া থাকেন—এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত এপর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে উপনিষদ পাঠ, উপনিষদের মর্ম্মগ্রহ করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণকমল বাবু বলিয়াছেন 'সহানুভূতি নামে আমাদিগের একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। খৃষ্টানেরা ইহা মানেন না।' খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদিগের যে যৎসামান্য জ্ঞান আছে তাহাতে আমরা বলি যে 'মানুষে পরের সুখে সুখী বা পরের ক্লেশে ক্লেশযুক্ত হইতে পারে' এই তত্ত্বটী বাইবেলে মুখ্য ভাবে বলা হউক আর নাই হউক গৌণভাবে উহার বিলক্ষণ উল্লেখ আছে। ক্রাইষ্ট বারম্বার তাঁহার শিষ্যদিগকে নিঃস্বার্থ (অন্ততঃ ইহলোকের পক্ষে নিঃস্বার্থ) প্রীতি আদেশ করিয়াছেন। ফলতঃ (Grace of God) ঈশ্বরের কৃপা ও (Love) প্রীতি এই দুইটী বিষয় খৃষ্টান ধর্ম্মে একপ্রকার দৃশ্যতঃ দ্বন্দ্বীভাবে অবস্থিত—বাইবেল পড়িলে একবার বোধ

হয় ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তির দ্বার আবার বোধ হয় প্রীতিই মুক্তির দ্বার। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপাই যদি মুক্তির দ্বার হয়, তবে আবার প্রীতির প্রয়োজন কি। আমাদিগের বিবেচনায় দুইটী বিষয়েই আস্থাবান্‌ হইতে শিক্ষা দেওয়া ক্রাইষ্টের উদ্দেশ্য। আমাদিগের স্বভাব নিকৃষ্ট, উহা উন্নত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক ও উচিত, আবার ঈশ্বরের কৃপার উপযুক্ত হইতে হইলে জনসমূহের প্রতি, সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রীতিবান্‌ হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের কৃপা ও প্রীতি এই দুইটী বিষয়ের প্রত্যেকে অপরের সাধক ও পোষক। অনেকেই জানেন Love (প্রীতি) Faith (ভক্তি) Hope (আশা) এই তিনটী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। আমরা যদি এমন স্বীকার করি যে ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তির একমাত্র দ্বার তাহা হইলেও ক্রাইষ্ট যেখানে শিষ্যদিগকে প্রীতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন সেখানে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে মানব প্রকৃতির মূলে সহানুভূতি বৃত্তি নিহিত আছে—নচেৎ ঈশ্বরের কৃপায় কিরূপে প্রীতি উত্থিত হইবে। তাঁহার প্রস্তাবের আর একটি কথা আমার মনে লাগিয়াছে, হয়ত অন্যের কাছে তাহা সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু তবু সে কথাটি আমি এখানে বলিবার আবশ্যক মনে করিতেছি। কৃষ্ণকমল বাবু কুক্কুরের উদাহরণে মানব প্রকৃতি প্রকটিত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন 'নরজাতির মধ্যে বিস্তর লোকের ব্যবহারের ঐরূপ ছবি আঁকা যায়'—'ঐরূপ' অর্থাৎ কুক্কুরের মত। কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবুর ন্যায় একজন পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া রুচিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এক্ষণে আমরা মূল প্রস্তাব আরম্ভ করি—কৃষ্ণকমল বাবু বলিয়াছেন "কম্‌টের দ্বিতীয় বীজবাক্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস"—এই বাক্যটীর অর্থ কি তাহা তিনি সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন, আর তাহা ভিন্ন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "যাহা প্রমাণে সিদ্ধ হইবে না, তাহা লইয়া 'নাড়াচাড়া' করা অনর্থক কালহরণ মাত্র।"

আমরা প্রথমতঃ দেখিব বিশ্বাসের প্রকৃতি কি, দ্বিতীয়তঃ দেখিব কৃষ্ণকমল বাবু যাহা বিশ্বাস করিতে বলেন তাহার প্রকৃতি কি, এবং অবশেষে দেখিব কৃষ্ণকমল বাবু যে সকল বিষয় 'নাড়া চাড়া' করিতে একপ্রকার নিষেধ করেন সে গুলিরই বা প্রকৃতি কি এবং সেগুলির সম্বন্ধে না ভাবিয়া মানুষ থাকিতে পারে কি না।

বিশ্বাসের প্রকৃতি কি ?

যত দিন পর্য্যন্ত অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক কষ্ট ভুগিয়া আমরা সন্দেহ করিতে না শিখি, ততদিন পর্য্যন্ত যাহা কিছু আমরা একবার হইতে দেখি তাহা বরাবর হইবে এইরূপ অনুমান করি। এই অনুমানের নাম বিশ্বাস। একজন অসভ্য ব্যাধ এক দিন শীকারে অকৃতকার্য্য হইল, সে সে দিন সকালে উঠিবার সময় টিক্‌টিকির ডাক শুনিয়াছিল, তাহার মনে হইল টিক্‌টিকির ডাক শুনিলে অমঙ্গল হয়, শীকার পাওয়া যায় না।

সে যদি বলে যে আজ আমি টিক্‌টিকির ডাক শুনিয়াছিলাম এবং আজ আমি শীকার পাই নাই—তাহা হইলে তাহার কথার বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলার থাকে না, কারণ সে সত্য কথাই বলিয়াছে। কিন্তু যখন সে তাহার ঐ বিশ্বাসের কথা বলে—অর্থাৎ টিক্‌টিকির ডাক শুনিলেই অমঙ্গল হইবে—তখন তাহার কথায় আমরা সন্দেহ করিতে পারি। অসভ্য ব্যাধের মনে ঐ বিশ্বাস থাকিয়া যাইতে পারে, কিম্বা অনেক দেখিয়া শুনিয়া পরে চলিয়াও যাইতে পারে। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি যে কোন একটী বিষয়ের সহিত অন্য কোন একটী বিষয় একবার কি অনেক বার দেখা গিয়াছে অতএব ঐরূপ স্থলে বরাবরই ঐ রকম হইবে এইরূপ অনুমান বিশ্বাস।

বিশ্বাস শুদ্ধ যে কেবল ভবিষ্যৎ কালের সহিতই সম্পর্ক-বিশিষ্ট এরূপ নহে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সহিতই বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে। খৃষ্ট পূর্ব্বে অমুক সনে একটী ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়াছিল এই কথাটী আমি বর্ত্তমান জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—অর্থাৎ আকাশে যাহা এখন হইতে দেখা যায়, তাহা অতীতেও হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে পারি, ইত্যাদি। অতএব,কোন একটী বিষয়ের সহিত অন্য একটী বিষয় আমরা একবার কি অনেকবার নিজে দেখিয়াছি—সুতরাং অতীতেও ঐরূপ হইয়াছে, কিম্বা বর্ত্তমানেও ঐরূপ হইতেছে, কিম্বা ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবে, কিম্বা সর্ব্বকালেই ঐরূপ হয় এইরূপ অনুমান অর্থাৎ না দেখিয়াও এইরূপ জ্ঞান বিশ্বাস।

এখন দেখা যাইতেছে যে বিশ্বাস জ্ঞানের প্রকার ভেদ মাত্র—জ্ঞান দুই প্রকারের হইতে পারে, বাস্তবিক কোন কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার জ্ঞান ( যেমন, আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে বা লাগিয়াছিল এই জ্ঞান) আর কোন একটী ঘটনা না দেখিয়াও তাহা সত্য বলিয়া অনুমান। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের নাম বিশ্বাস। প্রথম প্রথম আমরা অনেক কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু শেষে কতকগুলিতে সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস জন্মে আর অন্য কতকগুলিতে বিশ্বাস থাকে। যাহাকে আমরা অবিশ্বাস বলি তাহা বিপরীতে বিশ্বাস মাত্র—এই নিমিত্ত অধ্যাপক বেন্‌সাহেব বলিয়াছেন যে বিশ্বাসের বিপরীত সন্দেহ, অবিশ্বাস নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক কৃষ্ণকমল বাবু কি বিষয়ে বিশ্বাস করিতে বলেন,—তিনি বলেন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদিগের বিশ্বাস।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? আমরা চারিদিকে যে সমুদায় ঘটনা দেখি তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী ব্যাপার যদি বরাবর হইতে দেখি অর্থাৎ যতবার আবশ্যকীয় বিষয়গুলি একত্র হয় অথবা একত্র করা হয় ততবারই যদি ব্যাপারটী দেখা যায়—তাহা হইলে একটী প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। যেমন, বরাবরই দেখি শুষ্ক বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে এক প্রকার শব্দ হয়—সুতরাং বলি ওরূপে শব্দ হওয়া একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। আবার

বরাবরই দেখি প্রস্তরখণ্ড জলে ডুবিয়া যায়, অতএব বলি প্রস্তরখণ্ড জলে ডুবিয়া যাওয়া একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মে কেন বিশ্বাস করি? তাহার বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কোন ঘটনা দেখা যায় নাই। তাহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন ঘটনা দেখা যায় নাই ইহা ভিন্ন এস্থলে বিশ্বাসের আর কোন কারণ পজিটিবিজ্‌ম্‌ দেখাইতে পারে না। অবশ্য এস্থলে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায়, তাহা দৃষ্ট ঘটনা কিম্বা ঘটনা সমূহ দ্বারা সমর্থিত—অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যাহা কিম্বা যাহা যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা উহার (প্রাকৃতিক নিয়মের) সপক্ষে। কিন্তু সপক্ষে যতই কেন ঘটনা দেখা যাউক না, কেবল তাহাতে ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না যে এই নিয়মটী অবশ্য সত্য হইবে, ইহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণকমল বাবু যাহা বিশ্বাস করিতে বলেন তাহা বিশ্বাস করার কিম্বা তাহা অবিশ্বাস না করার একমাত্র কারণ এই যে এ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন ঘটনা দেখা যায় নাই।

তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণকমল বাবু যে সকল বিষয় 'নাড়াচাড়া' করিতে একরূপ নিষেধ করিয়াছেন তাহাদিগেরই বা প্রকৃতি কি। একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক, মানুষের আত্মা অমর কি না। কৃষ্ণকমল বাবু বলিবেন এ বিষয় প্রমাণে সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই কি 'প্রমাণে' সিদ্ধ। আমরা ত দেখিয়াছি প্রাকৃতিক নিয়মের একমাত্র জোর এই যে তাহার বিরুদ্ধে কিছু দেখা যায় নাই। কিন্তু মানুষের আত্মা অমর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও কি কিছু দেখা গিয়াছে। আত্মা অতীন্দ্রিয় বস্তু—সুতরাং ইহা বলিলে চলিবে না যে মানুষ মরিয়া গেল, তাহার আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না, অতএব মানবাত্মা মরণশীল। আমি বলি মৃত্যুর পর ও আত্মা রহিল, অতীন্দ্রিয় বলিয়া দেখা যায় না। আবার কৃষ্ণকমল বাবু বলিতে পারেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের সপক্ষে ত অনেক ঘটনা দেখি, কিন্তু মনুষ্যের আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে ত কিছু দেখি না।* দেখিই বা

---

* যাঁহারা মিলের (Logic) ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছেন কিম্বা যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন—প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে পরীক্ষা (Experiment) করা যাইতে পারে কিন্তু অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে তাহা করা যাইতে পারে না, অতএব প্রাকৃতির নিয়মে অধিক আস্থা করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সুদীর্ঘ তর্ক করা এস্থলে পোষায় না, তবে আমরা সংক্ষেপে এই বলি যে সাধারণ দেখা (Observation) আর পরীক্ষা (Experiment) উভয়েই দেখা। উহাদিগের মধ্যে জাতিগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ যাহা আছে তাহা কেবল মাত্রাগত।

একটী উদাহরণ লওয়া যাউক—একটী শিশিতে পরিষ্কার সাদা জলের মত চূণ গোলা আছে—আমি তাহাতে মুখের ভাব দিলাম আর চূণগোলার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁড়া দেখা গেল। এখন আমার মুখের ভাবে জল আছে, নাইট্রোজেন গ্যাস আছে, অক্‌সিজেন গ্যাস আছে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্‌ গ্যাস আছে—ইহাদের কোন্‌টীতে চূণে ঐরূপ গুঁড়া হইল তাহা আমি কিছু নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম

না কেমন করিয়া?—আমি দেখি, শুনি, বেড়াই, খাই, ভাবি, ভালবাসি, আশঙ্কা করি, আশা করি—এসব কি ভাসা ভাসা জিনিষ মাত্র—ইহাদের তলায় কি কিছু নাই।

---

না—আমি পরীক্ষা করিলাম—চূণ গোলায় শুদ্ধ কেবল কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস প্রবেশ করাইলাম আর অমনি গুঁড়া গুঁড়া হইল আবার ঐরকম করিলাম, আবার ঐ রকম হইল! আমি স্থির করিলাম কার্ব্বলিক অ্যাসিডে চূণ গোলা গুড়া গুড়া হয়। স্নুতরাং এস্থলে পরীক্ষায় এইমাত্র বলিল যে চূণের গোলায় কেবল কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস প্রবেশ করাইলে গুঁড়া গুড়া জিনিষ দেখা যায়।

আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে যখনই আমরা পরীক্ষা দ্বারা কিছু স্থির করিয়াছি তাহা আবার পুনর্ব্বার কার্য্যতঃ ঠিক দেখিয়াছি কিন্তু সাধারণ দেখায় আমরা যাহা স্থির করি তাহা সকল সময় এরূপ ঠিক হয় না। অতএব আমাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে পরীক্ষা দ্বারা যাহা নির্ণয় করা হয় তাহা বরাবর ঠিক। যখন পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম যে কর্ব্বলিক অ্যাসিড্ ও চূণ গোলা এই দুয়ে গুঁড়া গুঁড়া জিনিষ উৎপন্ন হয় তখন এই বিশ্বাস হইল যে বরাবর ঐ রকম হয়। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের কারণ কি? আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে—বিরুদ্ধে কিছু দেখা যায় নাই ইহাই বিশ্বাসের মূল। অন্ততঃ পজিটিবিজমে বিশ্বাসের অন্য কোন মূল থাকিতে পারে না, কারণ পজিটিবিজমে বস্তু ও কারণ এই দুইটী কথার ভাসা ভাসা অর্থ ছাড়া কোন গূঢ় অর্থ নাই। মিল্ বলেন কোম্‌ট দর্শনশাস্ত্র হইতে কারণ কথাটী উড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল বাবু বলিবেন উহা ভাবিয়া 'মাথা ব্যথা' করিও না,—কিন্তু এবিষয়ে ত লোকে না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যেই হউক না কেন কিছু না কিছু ভাবে, আর কিছু না কিছু বিশ্বাস করে। কেহ বলে মানুষ কাদার পুতুল মাত্র—মরিয়া গেল, কাদায় কাদা মিশিল, মানুষ শেষ হইল। কেহ ভাবে মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল বস্তুটী অমর, তাহা এখনও আছে আর যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি তাহার পরও থাকিবে! এই দুই প্রকার মতের মধ্যে কোন্‌টী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে তাহা এখন আলোচনা করিতেছি না। তবে, আমরা ইহা দেখাইয়া দিতেছি যে কৃষ্ণকমল বাবু যে সব বিষয় 'নাড়াচাড়া' করিতে বারণ করেন, সেসব 'নাড়াচাড়া' না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। আর তিনি যাহা বিশ্বাস করিতে বলেন তাহা যে জন্য বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়গুলি সম্বন্ধেও গুটিকত মত (সেগুলি বিশ্বাস করার অন্য কোন কারণ থাকুকই আর নাই থাকুক) অন্ততঃ সেই একই জন্য বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু আসলে অন্য কারণও আছে—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,—জগতের মূলেতেই ন্যায়ের বিপর্য্যয়—ইহা মনে করিলে হস্তপদ একেবারেই অসাড় হইয়া পড়ে। কাণ্ট বলেন,—মানুষ নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী, অতএব মানুষ স্বাধীন, মানুষ অমর, পরমেশ্বর আছেন।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

# শঙ্করাচার্য্য।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলিতেছেন যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন শ্রীসম্পন্ন অথবা তেজস্বি সে সমস্তই ভগবানের অংশসম্ভূত। শাস্ত্রকারেরা এই মহা বাক্য অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণকে ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'শঙ্কর বিজয়কার' ও সাধুদিগের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের এই চির-প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিয়া, শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। একদা মহাদেব কৈলাস ভবনে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন:—"হে দেব! আপনার অবিদিত নাই ভগবান বিষ্ণু লোকের হিতের জন্য জগতে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অধুনাতন শিষ্যেরা আত্ম বঞ্চনায় দিন যাপন করিতেছেন। তাহারা নানাবিধ দূষিত মতে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, সর্ব্বত্র অনাচার, বেদের অনাদর হইতেছে, কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর, এই তিন প্রকার লোকে বেদ রচনা করিয়াছে, বৈদিক ক্রিয়া কলাপ অলস ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। সন্ধ্যা বন্দনাদি সাধন সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে; কেহ আর সন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করে না, লোক সকল নিতান্ত পাষণ্ড হইয়াছে, যজ্ঞের নাম লইবামাত্র তাহারা কাণে হাত দেয়। আমরা আর বলি পাই না। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, লোকে লিঙ্গ চক্রাদির চিহ্ন মাত্র অঙ্গে ধারণ করিতেছে। জঘন্য কাপালিকেরা সদ্যকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্র ভৈরবের পূজা করে, তাহাদের দুরাচারের আর সীমা নাই। ঈদৃশ আরও অসংখ্য কুপথ আশ্রয় করিয়া জনগণ বিড়ম্বিত হইতেছে। হে ভগবন! আপনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল দূষিত মত খণ্ডন না করিলে আর সংসারের রক্ষা হয় না।" তথাস্তু বলিয়া, মহাদেব দেবগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "অধর্ম্মের নাশ এবং সদ্ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং শঙ্কর নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিব। বিষ্ণুর ভুজ-চতুষ্টয়ের ন্যায় আমার চারি জন শিষ্য হইবে; আমি ব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিব। আমি জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অজ্ঞানতা-জনিত দ্বৈত ভাব দুর করিব। কিন্তু হে দেবগণ, তোমরাও সকলে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা হইলেই তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। দেবগণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া স্বীয় পুত্র স্কন্দের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "হে সৌম্য যে উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তোমাকে বিশেষরূপে

বলিতেছি:—কর্ম্ম, যোগসাধন এবং জ্ঞান বেদের এই তিন কাণ্ড; জগতের রক্ষার জন্য এই কাণ্ড—ত্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন। যোগ শাস্ত্রের উদ্ধারার্থ, বিষ্ণু এবং শেষ পূর্ব্বেই আমার অনুমতি ক্রমে শঙ্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং জ্ঞান কাণ্ডের উদ্ধার, আমি স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধন করিব, এই মাত্র দেবগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম। অধুনা তোমাকে যাইয়া সুব্রহ্মণ্য নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বেদ-বিরোধি বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া জৈমিনি-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তোমার সাহায্যার্থ ব্রহ্মাও মণ্ডন নামে অবতীর্ণ হইবেন,এবং ইন্দ্র সুধন্বা নামে রাজা হইবেন। দেবসেনানী স্কন্দ মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

যজ্ঞ-ভাগের অভাবে আতুর হইয়া দেবগণ অনেক সময়েই এইরূপে ব্রহ্মা অথবা শিবের নিকটে যাইয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কোথাও বা শঙ্কর বিষ্ণুর অবতার কোথাও বা হিরণ্যগর্ভের অবতার, আবার কোথাও তিনি ব্রহ্মা ও শিব উভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ * কিন্তু নামেতেও শঙ্কর শিবেরই মিত্র। নামের সাদৃশ্যেও তিনি প্রথমে অজ্ঞ লোকদিগের পরে শাস্ত্রকারদিগের নিকট শিবের অংশ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন; এবং পুষ্পের সংশ্রবে যেমন অনেক হেয় কীটও দেবতার মস্তকে স্থান লাভ করিয়া থাকে, শঙ্করের অবতারত্বেও সেইরূপ তাৎকালিক আরও অনেকেই দেবাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক এরূপ লোককে দেবাবতার বলাতে বড় দোষ হয় না। একটী ক্ষুদ্র প্রবাদে অদ্যাপি কাশীতে শঙ্করের গুণ কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রবাদটী এই—একদা একজন ভদ্রলোক আচার্য্যকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্ন প্রস্তুত হইলে পর নিমন্ত্রণকর্ত্তা বহুকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন আচার্য্য আসিতেছেন না। অবশেষে তাঁহার ভাত বাড়িয়া রাখিয়া তিনি স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন। ইতি মধ্যে একটা কুকুর আসিয়া আচার্য্যের অন্ন খাইতে লাগিল। গৃহস্থ দণ্ড হস্তে যাইয়া সেই কুকুরকে বেগে প্রহার করিল, কুকুর চিৎকার করিতে করিতে দূরে পলাইয়া গেল। শঙ্কর আর সে দিন আসিলেন না। পরদিন গৃহস্থ স্বয়ং যাইয়া আচার্য্যের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর উত্তর করিলেন আমি ত গিয়াছিলাম, আমি কুকুরের বেশে অন্ন খাইতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমায় প্রহার করিয়াছিলে। এই দেখ আমার কটিদেশে যষ্টির চিহ্ন লাগিয়া আছে। একথা শুনিয়া লজ্জায় ভদ্রলোকের মুখ মলীন হইয়া গেল। প্রবাদের সত্যাসত্য অতি অকিঞ্চিৎকর কথা। যাঁহার সম্বন্ধে লোকে এইরূপ গল্পও কল্পনা করিতে

---

* স্মরেণ কিল মোহিতৌবিধিচ বিধুজাতুৎপথোতথাঽমপি মোহিনীকুচকচাদি বীক্ষাপরঃ। অগমহহমোহিনীমিতি বিমৃশ্য সোঽজাগরীৎ। যতীশ-বপুষা শিবঃস্মর-কৃতার্ত্তিবার্ত্তোজ্‌ঝিতঃ॥

পারে, তাঁহার চরিত্রের এমন কিছু অলৌকিক মাহাত্ম্য অবশ্যই ছিল যাহার উপরে এইরূপ অলীক কথারও আরোপ করা যায়। আমরা সেই শঙ্করের গুণরাশির একটী অতি অপূর্ব ছবিও যদি সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারি, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার প্রয়াস সফল হইল মনে করিব।

দাক্ষিণাত্যে সুধন্বা নামে একজন রাজা ছিলেন। ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যথাবিধি রাজধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজধানী পৃথিবীতে অমরাবতী তুল্য শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বিদ্যার প্রতি আদর দেখিয়া রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইল। অথবা যেন স্বয়ং দেবরাজ কৌশলক্রমে সমস্ত বেদনিন্দুকদিগকে একত্র করিয়া স্কন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে সুব্রহ্মণ্যও জন্মগ্রহণ করিলেন; তাঁহারই অন্যতর নাম ভট্টপাদ। তিনি জৈমিনিকৃত মীমাংসা সুত্রের বিষদ ব্যাখ্যা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া কলাপের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরিশেষে রাজা সুধন্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সভাস্থলে আসীন হইলে পর, নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন;—"হে রাজকোকিল! যদি হেয় কাক তুল্য বেদ নিন্দুকদিগের সঙ্গ তোমাকে দূষিত না করে তবেই তুমি বাস্তব প্রশংসার পাত্র।" বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই কথা শুনিবামাত্র পাদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষের বিচার আরম্ভ হইল। ভট্টপাদ স্বীয় তীক্ষ্ণ যুক্তি কুঠারে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধদিগের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণিত হইল। শব্দে রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। অবশেষে তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধেরা লজ্জায় অধোবদন হইল। এইরূপে তাহাদিগের দর্পচূর্ণ হইলে পর, ভট্টপাদ বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন এবং তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে রাজা স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন:—"তর্কে জয় পরাজয় দ্বারা মতের সত্যতার প্রমাণ হয় না; তাহাতে কেবল বিদ্যারই পরিচয় হয়। অতএব যিনি গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আহত না হইবেন তাঁহারই মত সত্য।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ভট্টপাদ বেদমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "যদি বেদ সত্য হয় তবে আমার কোন রূপ আঘাত লাগিবে না"; বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দ্বিজবরের পতনে, তুলাপিণ্ড পতনের ন্যায় শব্দ হইল, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ আঘাত লাগিল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভট্টপাদের দর্শন লালসায় দিকদিগন্ত হইতে লোক সকল আসিয়া মিলিল। এতদ্দর্শনে রাজারও বেদে শ্রদ্ধা হইল এবং আপনাকে বেদ নিন্দুকদিগের সঙ্গ-দোষে দূষিত দেখিয়া আত্মগ্লানি জন্মিল।

কিন্তু বৌদ্ধেরা প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে এতদ্দারা মতের সত্যতার পরীক্ষা হয় না। যেহেতু মন্ত্র ও ঔষধাদির দ্বারাও এই-রূপে শরীর রক্ষা হইতে পারে। রাজা প্রত্যক্ষ প্রমাণেও তাহাদের অনাদর দেখিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেনঃ—"আপনা-দিগকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, যাঁহারা উত্তর দানে অক্ষম হইবেন শিলাঘাতে তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ করিব।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা একটা কলসির মধ্যে একটা সর্প পুরিয়া রাজসভায় আনয়ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন দেখি কলসের মধ্যে কি আছে?" তাঁহারা বহু অনুনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া, পরদিন প্রাতে বলিবেন, এই অঙ্গী-কার করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-দেব প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের যাহা বক্তব্য বলিয়া দিলেন। বৌদ্ধরাও কলস মধ্যে কি আছে স্থির করিলেন, পরদিন প্রাতে সকলে সভাস্থলে আসীন হইলে পর, বৌদ্ধরা বলিল কলস মধ্যে সর্প লুকাইত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলিল স্বয়ং বিষ্ণু শেষফণায় তন্মধ্যে শয়ান আছেন। ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া সুধন্বার মুখ ম্লান হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল!—"হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সত্যই বলিয়াছে সংশয় করিও না" কলসের মুখ খুলিয়া রাজা তন্মধ্যে বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই-লেন। দেখিবামাত্র তাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইল। তিনি সেই অবধি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ভয়ঙ্কর শত্রু হইলেন, হিমালয় হইতে সেতু পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ সেই বেদ নিন্দুকদিগের বধের আজ্ঞা প্রদান করি-লেন। ভট্টপাদের প্ররোচনায় সুধন্বা নানা প্রকার অমানুষোচিত নিষ্ঠুর উপায়ে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। উলুখলে ফেলিয়া ডাল ভাঙ্গার ন্যায় অসংখ্য জীবন্ত লোকের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা ভট্টপাদকে আর দোষ দিই না; তিনি নিজেই আপনার দোষ বুঝি-য়াছিলেন, তুষানলে প্রবেশ দ্বারা সে দোষের প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছিলেন, সে কথা স্থানা-ন্তরে বলিব। বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্যেতে কোন দোষ ছিল না, বোধ হয় তিনি ধর্ম্ম বিস্তারের উপায় বলিয়া এই সকল অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক বৌদ্ধ দিগের বিনাশ হইলে পর, বৈদিক ধর্ম্ম অবাধে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল। স্কন্দ এইরূপে কর্ম্ম কাণ্ডের উদ্ধার দ্বারা স্বীয় অবতরণের প্রয়োজন সাধন করিলেন।

—:*:—

# প্রবাস-চিন্তা।

মুদে আসে দিবসের আঁখি,  
সাঁঝের বিষাদময় ছায়  
হিম-মাখা বিরামের কোলে  
মাথা রাখি স্নেহে ঘুম যায়।

ক্লান্ত এ হৃদয় মোর এবে
থেকে থেকে উড়ে যেতে চায়
যেথা শ্যাম ধরণীর পরে
লাজমুখী ফুল হাসে বায় ;—
যেথা উঁচু তাল-বন মাঝে
চরে সুখে শান্ত-আঁখি গাই ;
আগেভাগে বালক তপন
স্নেহে চুমে যেথাকার ঠাঁই।
হেথা আজ বন্ধুগণ মাঝে
মানস-বিকাশ নাই শেষ,
হেথা পূর্ব্ব স্বদেশ-ভারতী
বিরাজে ধরিয়া নব বেশ।
তবুও হৃদয় এ আমার
থেকে থেকে অন্য দিকে চায়—
অন্য দিন অন্য কথা যেথা
চাপা আছে পাসরণ ছায়।

* * * *

উড়ে যায় গগনের পাখী,
বহে যায় সন্ধ্যা-স্নিগ্ধ বায়,
মুদে আসে বাস্তবের আঁখি,
স্মরণ বিষাদ গান গায়।
নিয়মের নিদ্রা-হীন চাকা
চলে যায় হৃদয়ের পরে
স্মরণের রেখা মাত্র রাখি
বর্ত্তমান চূর্ণ চূর্ণ করে।
কেন এ জীবন তবে মোর,
কেন এ ধরণী বাস তবে,
কেন আশা ভাল বাসা মোর,
সব-ই এই শূন্যময় যবে ?
কার তরে দিন দিন আমি
কুড়াইয়া জীবনের ফুল—
কার তরে মালা গাঁথি আমি
নাহি যদি জগতের মূল ?
শূন্য কুক্ষি সর্ব্ব গ্রাসী যম
তোর দাস্যবৃত্তি মোর,
তোরে কি হৃদয় বলি দিব,
শত্রু তুই—কিকুহক ঘোর ?

* * * *

“পশ্যারে দক্ষিণ মূর্ত্তি মোর
বটি আমি সর্ব্বগ্রাসী যম,
চেয়ে দেখ বরাভয় করে,
শান্তিদাতা কে আমার সম।
যম আমি সর্ব্বগ্রাসী বটি,
চিদানন্দ আত্মা নাশী নই,
প্রপঞ্চ যমের করাধীন ;
সদানন্দ সদা যম জয়ী।
জল-বিম্ব মানুষ জীবন
মহা কাল জলধির বুকে
নিয়ম মরুত বলে চলে
মৃত্যু-হীন মহাশিব মুখে।
দুর্লভ মানুষজন্ম তোর
কত কোটী তপস্যার বলে ;
বিষয়ের প্রলোভন ঘোরে
তারে কি হারাবি অবহেলে ?
বাসনা-কুহক জালে প’ড়ে
মোহময় বিষয়ের করে
বিকাইবি চিন্তামণি তুই,
রাঙা চোঙা কাচখণ্ড তরে ?
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণবাঞ্ছিত
মানুষ-জনম ধরাতলে—
পৃথিবীর পরাণ রতন
দেবতার পূজ্য চিতি বলে।

কি আর অধিক তোর আশা ?
মানুষের দুঃখ নাশ তরে
পারিস জীবন দিতে যবে
পৃথিবীর হৃদি পূর্ণ করে ?

জল্পন্তি স্বয়ঃ সর্ব্বে
ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।
এতস্য জ্ঞাতব্যমদ্যৈব
কিমত্রচ ভবিষ্যতি ॥"

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
লণ্ডন।

——(০)——

# মেসমেরিজম।

## বা

## শক্তি চালনা।

গত বৎসর ভারতীতে "মনেরকথা জানা" নামক প্রবন্ধে ইংলণ্ডের মানসিক-শক্তি অনুসন্ধান সভার বিবরণ—অর্থাৎ কিরূপ দরের ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য, কিরূপ প্রণালীতে এই সভার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে—ইত্যাদি সংক্ষেপে একরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সে প্রবন্ধটি পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্য এখানে আর একবার উক্ত সভা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আলোচ্য বিষয়টির অবতারণা করিব।

যথার্থ পক্ষে আমাদের এমন কোন মানসিক শক্তি আছে কি না, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত রূপে কার্য্য করিতে পারে—এই বিষয়টি নির্ণয় করিবার জন্য চার বৎসর হইতে চলিল, ইংলণ্ডে মানসিক-শক্তি অনুসন্ধান (Society for Psychical Research) নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মনের কথা পাঠ, দিব্য দর্শন, ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চালন, এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকটি বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে রীতিমত পরীক্ষা করাই এ সভার উদ্দেশ্য। ডাবলিন কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট, ব্রিষ্টলের রাজ কলেজের অধ্যাপক সেলাণ, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিস্কর্ত্তা ক্রুকস্, অধ্যাপক হেনরি সিজউইক, (ইনিই এ সভার সভাপতি) হাউস অব কমন্সের মেম্বর আর্থার ব্যালফোর, ও জন হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডের আরো অনেকানেক খ্যাত নামা বৈজ্ঞানিকগণ ও সমাজের উচ্চ-শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ, এ সভার সভ্যরূপে মানসিক শক্তি অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা যে কেবল মনে মনে চালিত হইতে পারে—পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এ বিষয়টি কিরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা আমরা "মনের কথা জানা" নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই কারণে সাধা-

রণতঃ কাহাকেই বা শক্তি চালনা ঘটনা বলে—এবং কিরূপেই বা তাহা সাধিত হয় তাহা অগ্রে দেখা যাউক, তাহার পর—বাস্তবিক সেই রূপ ঘটনাগুলির সহিত ইচ্ছা শক্তির যোগ আছে কি না—কিম্বা তাহার অন্য রূপ কোন কারণ আছে—তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এস্থলে পুস্তকের কথা না তুলিয়া আমি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিব।

আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি (ইনি নিজেও একজন অল্প বয়স্ক যুবক—বালক বলিলেও চলে—ইহার বয়স—১৫।১৬ মাত্র) ১০।১২ বৎসরের একটি বালককে লইয়া তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া তাহার চোখের কাছে হস্ত চালনা করিতে লাগিলেন, তাহার পর তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় স্বরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিতে বলিলেন—সে বন্ধ করিল, তিনি আবার খুলিতে বলিলেন, সে খুলিল, তিনি আবার বন্ধ করিতে বলিলেন—এইরূপ দুই চারি বার করিয়া—শেষে তাহার বন্ধ চোখের উপর আবার আগেকার মত দৃঢ় আজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কখনই খুলিতে পারিবে না—খোল দেখি—" সে অনেক চেষ্টা করিয়াও আর চোখ খুলিতে পারিল না। ইচ্ছা কর্ত্তা খানিক পরে বিপরীত দিকে হস্ত চালনা করিতে করিতে যখন চোখ খুলিতে আজ্ঞা করিলেন—তখন সে খুলিতে পারিল। এই রূপে তাহাকে লইয়া তিনি নানা প্রকার ঘটনা করিতে লাগিলেন। তাহার পায়ের কাছের শূন্য ভূমি দেখাইয়া তিনি তাহাকে বলিলেন "ঐ দেখ সাপ—" বালকটি মাটীর দিকে চাহিয়াই সভয়ে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহার সে আতঙ্কের ভাব দেখিলে—সে যে সত্যই সাপ দেখিতেছে—তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইচ্ছা কর্ত্তা তখন তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া দিলেন। বালকটির হাত একবার ইচ্ছা কর্ত্তা এমন অসাড় করিয়া দিলেন যে সহস্র চেষ্টাতেও বালকটি তাহা নাড়াইতে পারিল না। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার চারিদিকে হাতের গণ্ডি দিয়া ইচ্ছা কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন—"ইহার বাহিরে যাইতে পারিবে না",—সত্যই সে তাহার মধ্যে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কি বালকটির এমনি মোহ জন্মাইয়া গেল—যে সে অবস্থায়—এমন কিছু অসম্ভব ছিল না, ইচ্ছাকারীর কথায় যাহা তাহার প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে না হইত। ইহাই আর কি যাদু বিদ্যার "ভেলকি"। এইরূপ শ্রেণীর নানা ঘটনাত, দেখিলাম, কিন্তু আর একটি ঘটনা যাহা দেখিলাম তাহা আবার অন্য রকমের। বালকটির মোহ উৎপাদন করিয়াই ইচ্ছাকারী আমাকে বলিলেন—"আপনি কাহাকেও মনে করুন দেখি—দেখিবেন—বালকটি ঠিক তাহার ছবি বলিয়া দিবে।"

আমি একটি মেয়েকে মনে করিলাম—অবশ্য সে কথা আর কাহাকেও বলিলাম না, কেবল বলিলাম "মনে করিয়াছি।" ইচ্ছাকারী তখন বালকটিকে বলিলেন "উনি কি মনে করিয়াছেন দেখ" দুই চারিবার

দৃঢ় আজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে ঐরূপ বলিতে লাগিলেন। বালকটি নিস্পন্দভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

ইচ্ছাকারী বলিলেন।

"দেখিয়াছ ?"

বালক। "হাঁ"।

ইচ্ছাকারী। "কি দেখিতেছ ?"

বালক। "একটি মেয়ে।"

ইচ্ছা। "কেমন দেখিতে ?"

বালক। "বেশ। রং পরিষ্কার, এলো-চুল" ইত্যাদি ইত্যাদি সে বর্ণনা করিয়া চলিল। ইচ্ছাকারী বলিলেন।

"কিরূপ কাপড় পরা" ?

বালক। "ইংরাজি মেয়েরা যেমন ঘাগরা পরে।" আমি যে মেয়েটিকে মনে করিয়া-ছিলাম হুবাহুব যেন সে ছবি আঁকিতে লাগিল—অথচ বালক সে মেয়েটিকে কখনো চক্ষে দেখে নাই। বিশেষ সত্যই সে মেয়ে-টির সর্ব্বদাই প্রায় এলোচুল থাকিত আর সে ঘাগরাই পরিত। কাজেই সেইরূপ ছবি আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু যে বালকটি একথা বলিল, তাহার পক্ষে সহসা এরূপ ছবি মনে আসা নিতান্ত অসম্ভব, বাঙ্গলীর ঘরে আর কিছু ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে এলোচুলে কিম্বা ঘাগরা পরিয়া থাকে না। যাহা হউক. এ ঘটনাটিকে আমরা মনের কথা জানা বলিতে পারি। আর একজনকে আর একবার শক্তি চালনা করিতে দেখিয়া-ছিলাম। একটি মহিলা কৌচে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন—ইচ্ছাকারী তাঁ-হার চক্ষে চক্ষু রাখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার মাথার কাছ হইতে পদমূল পর্য্যন্ত হস্তচালনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিছুক্ষণ মধ্যেই মহিলাটি ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন ইচ্ছাকারী তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—তিনি কি দেখিতেছেন কোথায় গিয়াছেন ইত্যাদি। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সে কথাগুলি আর আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম না।

যাহা হউক ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে ইহা হইতেও যে নানারূপ ও আশ্চর্য্যতর ঘটনা সাধিত হইয়া থাকে, আমাদের দেশের কাছে তাহা কিছু আর নূতন কথা নহে; ইয়ুরোপেও এ জ্ঞান নিতান্ত আধুনিক এমন নহে। জর্ম্মাণ ডাক্তার মেসমার এক-শতাব্দির ও পূর্ব্বে প্রথমে ইয়ুরোপে ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব আবিষ্কার করেন, তাহার নাম হইতেই এ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও ঘটনা-দিকে মেসমেরিজম বলে। তাহার পর তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত অনেকেই পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অনেকের মধ্যে ডাক্তার এসডেল, ডাক্তার ইলিয়টসন,ডাক্তার গ্রেগরি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগকে আমরা দেখিতে পাই। উপরে আমরা যে শক্তি চালনা ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি—তাহার মধ্যে ইচ্ছাধীন ব্যক্তির দুইটি অবস্থা এবং ইচ্ছা চালনায় দুইটি উপায় দেখিতে পাইতেছি।

(অবস্থা)—

এক জাগন্ত অথচ মোহবিহ্বল অবস্থা, অপর—নিদ্রাভিভূত অবস্থা।

শক্তি চালিত হইয়া সাধারণতঃ এই দুই অবস্থাতেই ইচ্ছাধীনগণ আসিয়া পড়ে। তবে ইহার মধ্যবর্ত্তী আর একটি সুষুপ্তির অবস্থা আছে—কিন্তু সেরূপ অবস্থা কাহারো অধিক ক্ষণ থাকে না,খানিক পরে সে সুষুপ্তি আবার নিদ্রাতেই পরিণত হয়।

(শক্তি চালনা করিবার উপায়।)

এক,—মনে মনে ইচ্ছা করা—

দ্বিতীয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতঃ ইচ্ছাধীনের প্রতি হস্তচালনা কিম্বা দৃষ্টি প্রয়োগ করা।

সচরাচর এইরূপ উপায়েই শক্তি চালিত হইয়া থাকে। এখানে কেহ বলিতে পারেন, ইচ্ছাশক্তি মানসিক, এ শক্তি চালনার জন্য হস্তচালনা—বা দৃষ্টি প্রয়োগের আবশ্যক কি ?

যে সকল বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন—"উত্তাপ যেমন আপনার চারিদিকে তাপ নিক্ষেপ করিতেছে—তেমনি প্রত্যেক মানুষ হইতে,(এমন কি জীব জন্তু জড়পদার্থ পর্য্যন্ত হইতেও) তাহার চারিদিকে দর্শনাতীত স্পর্শাতীত এক কথায় ইন্দ্রিয়াতীত অতি সূক্ষ্ম একরূপ আভা (aura) নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

বিশেষতঃ চক্ষুদিয়া ও হস্তপদের অগ্রভাগ দিয়া ইহা অধিকতররূপে নির্গত হইয়া থাকে। এই আভার একটি আকর্ষণীয় শক্তি আছে—সেই জন্য ইহার অন্য নাম আকর্ষণ আভা—Magnetic aura—Animal magnetism—ইত্যাদি।

কৌশল দ্বারা এই আভাকে মানুষ ইচ্ছার অধীনে আনিয়া—ইহাকে যথা ইচ্ছা চালিত করিতে পারে,—এমন কি কতদূরে যে ইহা চালনা করা যায়—তাহার ঠিক নাই। বাতাস মধ্যে থাকিয়া যেমন শব্দ চালিত হইতেছে তেমনি এই আভা ইচ্ছা চালনার একটি উপায় (medium) স্বরূপ।

এই আভার প্রভাব সকলের উপর সমান নহে। একরূপ বিশেষ প্রকৃতির লোক আছে—যাহারা অতি সহজেই অন্যের এই আকর্ষণ আভার অধীনে আসিয়া পড়ে—তাহাদিগকে আমরা মোহিষ্ণু নাম দিলাম, ইংরাজিতে তাহাদের sensitive বলে। যেমন সকলেই এই আভার প্রভাব অনুভব করিতে অক্ষম তেমনি সকলের আভার প্রভাবও সমান নহে। স্বভাবতঃ যাহার যত এই আকর্ষণ প্রভাব অধিক সে তত সহজে অন্যের উপর শক্তি চালনা করিতে পারে। যেমন একই জিনিস এক বস্তুর সংশ্রবে সমতড়িৎ উৎপাদন করে অন্যের সংশ্রবে বিষম তড়িৎ উৎপাদন করে, (বিড়ালের চামড়া দিয়া কাচ ঘসিলে—কাচে বিষম তড়িৎ এবং রেশম বস্ত্র দিয়া ঘষিলে কাচে সম তড়িৎ উৎপন্ন হয়।) যেমন চুম্বকের মধ্যে একই বিন্দু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুর পক্ষে সম এবং তাহার পরবর্ত্তী বিন্দুর পক্ষে বিষম, তেমনি এক জনের নিকট এক ব্যক্তি মোহিষ্ণু হইয়াও—অন্যের আকর্ষণ আভায় সে অটল থাকিতে পারে।

ইচ্ছা শক্তি সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের ত এইরূপ মত, কিন্তু সাধারণ বৈজ্ঞা-

নিক সম্প্রদায়গণ কি ইচ্ছাশক্তি, কি মানুষ-নিহিত এই আভা,—কিছুই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ অলৌকিক ঘটনার অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে গোঁড়া বৈজ্ঞানিক সমাজ ঐরূপ ঘটনার সত্যতায় পর্য্যন্তও অবিশ্বাস করিতেন, সকলি তাঁহাদের মিথ্যা জুয়াচুরি বলিয়া মনে হইত। এমন কি—শক্তি চালনা দ্বারা নিদ্রাভিভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে রোগীদের উপরে ভয়ানক অস্ত্র চিকিৎসা করা হইয়াছে শুনিলে তথনকার ল্যানসেট প্রভৃতি ডাক্তারি পত্রিকাগুলি এইরূপ বলিতেন—"রোগীরা ঘুস খাইয়া ঐরূপ অসাড়তা ভান করে। তাহারা এমনি পাকা প্রতারক যে পা কাটিয়া ফেল, বড় বড় আব কাটিয়া ফেল—তবু তাহারা কষ্টের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ করে না।"* যাহা হউক এখন ইয়োরোপের সে কাল গিয়াছে, মেসমেরিজম ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে এখনকার বৈজ্ঞানিক সমাজ আর অবিশ্বাস করিতে পারেন না, কেননা ইহার প্রমাণ এতই অজস্র হইয়া পড়িয়াছে। তবে ইচ্ছা শক্তির সহিত যে ঐরূপ অলৌকিক ঘটনার যোগ আছে—ইহাই তাঁহারা মানিতে চাহেন না, তাঁহারা উহার কারণ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এঘটনাগুলির নাম শক্তিচালনা নহে; তাঁহারা ঐরূপ ঘটনাদিকে স্বাপ্নিকতা (Hypnotism) বা কাল্পনিকতা অর্থাৎ পাত্রের নিজের মনের কল্পনা বা বিশ্বাস মাত্র এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ডাক্তার ব্রেড এই মতটির প্রথম প্রবর্ত্তক। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এ সম্বন্ধে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্রমাগত এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে চক্ষুদ্বয়ে ও তাহাদিগের সহিত সম্বদ্ধ মস্তিষ্কের অংশগুলিতে স্নায়বীয় কেন্দ্র সমূহ অসাড় হইয়া পড়ে—এবং তদ্দ্বারা স্নায়ু প্রণালীর সাম্যভাব নষ্ট হওয়ায় উল্লিখিত ঘটনা উৎপন্ন হয়। †

---

* When the most painful surgical operations were successfully performed in the hypnotic state, they said, that the patients were bribed to sham insensibility, and that it was because they were hardened imposters that they let their legs be cut off and large tumours cut out without showing a sign even of discomfort.

Proceedings of the Society for Psychical Research. Vol. 2.

† স্নায়বীয় কেন্দ্র অর্থে স্নায়ু প্রকোষ্ঠ (nerve cell) বুঝিতে হইবে। স্নায়ু প্রকোষ্ঠের দুইরূপ কার্য্য—এক, স্নায়ুসূত্র হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করা, আর এক—স্নায়ুসূত্রে ইঙ্গিত চালনা করা। স্নায়ুসূত্রগণ চতুর্দ্দিক হইতে যে ইঙ্গিত লইয়া আইসে কিম্বা চতুর্দ্দিকে যে সকল ইঙ্গিত লইয়া যায়—স্নায়ুপ্রকোষ্ঠগুলি সে সকলের কেন্দ্র স্বরূপ কার্য্য করে বলিয়া তাহাদিগকে স্নায়বীয় কেন্দ্র বলে। স্নায়বীয় কেন্দ্র একটি প্রকোষ্ঠও হইতে পারে,—কিম্বা কতকগুলি প্রকোষ্ঠের সমষ্টিও হইতে পারে।

(That the continued fixed stare, by paralyzing the nervous centres in the eyes, and their appendages, and destroying the equilibrium of the nervous system, thus produced the phenomenon refered to.)

ব্রেডের মতে, ঐরূপ বিকল স্নায়ু পাত্রের প্রবল কল্পনা বা বিশ্বাসই উল্লিখিত মোহজনক ঘটনার একমাত্র কারণ, অন্যের ইচ্ছা শক্তির সহিত তাহার কিছুই যোগ নাই। * সেই জন্যই তিনি মেসমেরিজম নামের পরিবর্ত্তে ইহার নাম Hypnotism—অর্থাৎ স্বাপ্নিকতা রাখিয়াছেন। এই মতটি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক্তার কার্পেন্টর তাঁহার মানসিক শারীর বিধান (mental Physiology) নামক পুস্তকে বলিতেছেন—"শক্তিচালনা হইতেছে এমন সন্দেহ পর্য্যন্ত যেখানে পাত্রদিগের মনে আসিতে দেওয়া হয় নাই সেখানে বিশেষ অহঙ্কার সত্ত্বেও শক্তি-প্রয়োগকারীগণ তাহাদিগকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারেন নাই। * * যাহাকে ইচ্ছাকারী ও ইচ্ছাধীনের তন্ময়তা ভাব বলা যায়, ভাব প্রবলতা কারণ দিয়া তাহার বেশ রহস্য ভেদ হয়। †"

ব্রেশলর অধ্যাপক হাইডেনহাইন সম্প্রতি ইহাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তিনি বলেন পূর্ব্ববিশ্বাস কিম্বা ভাব প্রবলতা কোনরূপ মনোভাবের সহিত ইহার যোগ নাই--স্নায়ু প্রণালীর প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়াই (reflex action) অন্য কথায়—স্নায়ুউত্তেজনাজনিত বুদ্ধি বিবেচনা রহিত কলের পুতুলের ন্যায় কার্য্যই ইহার একমাত্র কারণ।

প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া কাহাকে বলে তাহা বোধ করি কিছু বলা এখানে আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। আমাদের শরীরে স্বভাবতঃ দুইরূপ কাজ হইয়া থাকে, এক আমা

* ব্রেড বলিতেছেন—"The mesmerists are never in a position to be able to prove that the expectant idea, or influence of habit in the patient may not be the real producing cause of the phenomena realised because the crucial experiments of myself and others, have satisfactorily demonstrated that these subjective influences alone are quite adequate for their production, without any influence whatever passing to the subject from another person; whereas the mesmerists cannot prove that these subjective influences are not in operation during the exercise of their mesmeric processes. **

† Mesmerisers who assert they could send particular individuals to sleep have altogether failed to do so when the subjects were carefully kept from any suspicion that such will was being exercised. * * Nothing is more easy than to explain the peculiar rapport between the mesmeriser and his subject on the principle of dominent ideas.

দের ইচ্ছাজনিত কাজ, যেমন হাত পা নাড়া ইত্যাদি, আর আমাদের অজ্ঞাত ভাবে কেবল স্নায়ু উত্তেজনা হইতে যে কাজ হয় তাহাকেই প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া কহে, যেমন আমাদের চোখে আলো পড়িল অমনি চোখের তারা কুঞ্চিত হইল, খাইলাম আপনা হইতে পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হইল—চোখে বালি পড়িল, আপনা হইতে চোখ বুজিয়া গেল—ইত্যাদি। এখন কিরূপে এই প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ?

ইহা একটি শারীর বিধানিক নিয়ম যে ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু (sensory nerve)* উত্তেজন কালে প্রথমতঃ তাহাদিগের বহিঃস্থিত অগ্রভাগ গুলি উত্তেজিত হয়—তাহার পর সে উত্তেজনা—স্নায়বীয় প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী অংশে স্নায়ু প্রকোষ্ঠে ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এই ইঙ্গিত, মস্তিষ্কের ইচ্ছা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনাদির সম্বদ্ধ উচ্চতম অংশ স্পর্শমাত্র না করিয়া (অজ্ঞাতসারে) গতি উৎপাদক (moter nerves) স্নায়ুদিগকে উত্তেজিত করে, এবং তাহা দ্বারা মাংসপেশীগণ চালিত হইয়া কার্য্য করে,—এইরূপে শরীরে গতি উৎপাদিত হয়।

ইচ্ছাশক্তির অজ্ঞাতসারে—এইরূপ গতি উৎপাদন ক্রিয়াকে (reflex action) প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া বলে। প্রত্যাবর্ত্তিত—কারণ, ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ুর ইঙ্গিত মনের উপর কার্য্য না করিয়া গতি-উৎপাদক-ইঙ্গিত রূপে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

হাইডেনহেন—এই প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রি-

* আমাদিগের শরীরে কতকগুলি শ্বেত বর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ ও তাহাদিগের সহিত সম্বদ্ধ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell) আছে। এই সমুদায় সূত্র ও প্রকোষ্ঠের সমষ্টিকে স্নায়ু প্রণালী বলে। বাহ্য-জ্ঞান, চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল শারীরিক ক্রিয়ার আবশ্যক, সে সকল ক্রিয়া স্নায়ু প্রণালীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা ভিন্ন শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গতি সাধনের নিমিত্ত মাংসপেশীদিগের সঙ্কোচন ক্রিয়া ও শরীরের অন্যান্য কার্য্যের প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন ক্রিয়া স্নায়ু প্রণালী দ্বারা সংঘটিত হয়। স্নায়ু প্রণালীর এই তিনটি প্রধান অংশ; মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠ বংশের পশ্চাদ্ভাগস্থিত (স্নায়বীয়) রজ্জু এবং পৃষ্ঠবংশের সম্মুখ ভাগ-স্থিত যুগল রজ্জু। এই সকল অংশ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ; ইহারা প্রথমতঃ উল্লিখিত সূত্র ও প্রকোষ্ঠ হইতে নির্ম্মিত। এই সকল অংশ হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্নায়বীয় সূত্র চলিয়া গিয়াছে। যে সকল স্নায়বীয় সূত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে উক্ত তিনটি প্রধান অংশের কোনটির অভিমুখে ইঙ্গিত বহন করে তাহাদিগকে অভিবাহী সূত্র (efferent fibre) আর যে সকল সূত্র বিপরীতদিকে অর্থাৎ উক্ত তিনটি প্রধান অংশের কোনটি হইতে বহির্দ্দিকে (শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে) ইঙ্গিত বহন করে তাহাদিগকে বহির্বাহী সূত্র (efferent fibre) কহে। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের নিমিত্ত শরীর হইতে অভিবাহী সূত্র দ্বারা মস্তিষ্কে ইঙ্গিত যাওয়া আবশ্যক এই নিমিত্ত অভিবাহী সূত্রের আর এক নাম (Sensory nerve) ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু। বহির্বাহী সূত্রেরা যে ইঙ্গিত বহন করে, গতি সাধনের নিমিত্ত মাংসপেশী সঙ্কোচন ক্রিয়ায় সেই ইঙ্গিতের গমন আবশ্যক সেই নিমিত্ত ইহার আর এক নাম (moter nerve) গতি উৎপাদক স্নায়ু।

য়ার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করিয়া উহাই স্বাপ্নিকতার একমাত্র কারণ প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি বলেন—মোহিষ্ণু ব্যক্তিদের যদি এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রাখ, কিম্বা তাহার কানের কাছে খানিকক্ষণ ধরিয়া এক ঘেয়ে শব্দ কর, কিম্বা তাহাকে স্পর্শ না করিয়াও তাহার নিকট দিয়া একঘেয়ে ভাবে খানিকক্ষণ হাত চালাইতে থাক, তবে তাহার ঐন্দ্রিয়িক-স্নায়ু প্রথমে উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন তাহার সহিত যে কথা কহ, তাহাকে যে ইঙ্গিত কর—তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার মস্তিষ্কের বুদ্ধি বিবেচনাদির সহিত সম্বদ্ধ উচ্চতম অংশে পৌঁছিতে পারে না, তাহা কতক অংশে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কেবল কলের পুতুলের ন্যায় গতি উৎপাদক কার্য্য করে। এ সময় তাহার কাছে যেরূপ কাজ কর—সে তাহা না বুঝিয়া অনুকরণ করে, ইচ্ছাকারীর তন্ময়তা প্রাপ্তিবশতঃ তাহা করে না, এবং যাহা বল না বুঝিয়া সেইরূপ করে, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাহা করে না। †

এইত এ পর্য্যন্ত স্বাপ্নিকতা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কারণ বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রবর্ত্তিত

---

† Hypnotized persons are, at a certain stage of hypnosis, in a similar though not exactly identical condition. Unconscious sensations cause them, too, to carry out unconscious though conscious-like acts, especially such movements of the experimenter as produce in them auditory or visual impressions.

The perceived, but not consciously perceived, movement is imitated. The same with many movements which are accompanied by a familiar and distinctly audible sound.

I clench my fist before Mr. H- who stands hypnotized before me; he clenches his.

I open my mouth, he does the same. Now I close my fist behind his back or over his bent head; he makes no movement.

I shut my mouth, still over his bent head, rapidly, so that the teeth knock together; he repeats the manœvre I noiselessly contort my visage; he remains quiet.

A hypnotized person behaves, therefore, like an imitating automaton, who repeats all those of my movements which are for him linked with an unconscious optic or acoustic impression.

The material change, brought about in the central organs through the stimulation of the organs of sense, liberates movements which have the type of voluntary movements, but are not really so.

Thus I can easily induce him to follow me, by walking before him with an audible step; to bend first this way, then that, by standing before him, and myself performing these movements.

In walking the medium imitates exactly the time and force of my audible steps.

ANIMAL MAGNETISM (HEIDENHAIN)

হইয়াছে—তাহা আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম, এখন দেখিতে হইবে, বাস্তবিক পক্ষে উক্ত দুই কারণ দিয়া (ভাবপ্রবলতা বা পূর্ব্ব বিশ্বাস—এবং প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া) সমগ্র স্বাপ্নিকতা ঘটনা আয়ত্ত করিতে পারা যায় কি না। স্বাপ্নিকতা ঘটনা এক প্রকারের না, এক প্রকৃতির না, নানা প্রকারের, নানা প্রকৃতির; সেই অজস্র ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ঘটনা রাশিকে উক্ত দুই নিয়মের মধ্যে আনা যায় কি না, পরীক্ষাদ্বারা তাহা স্থির করাই মানসিক শক্তি অনুসন্ধান সভার একটি উদ্দেশ্য। সে পরীক্ষার ফলে তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন—তাহা বাহুল্য-ভয়ে আমরা আগামীবারের জন্য রাখিয়া দিলাম, তবে মোটামোটি এখানে এই বলিতেছি যে উক্ত সভা দেখিয়াছেন—যে কেবল উল্লিখিত দুই কারণ দিয়া সমগ্র স্বাপ্নিকতার রহস্য ভেদ হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

---

# সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

ছা। মহাশয় আপনি পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে সাধারণ জনের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত। *

শি। সাকার উপাসনা অর্থে যদি দেব দেবীর উপাসনা বুঝ তবে আমি সাকার উপাসনার বিরোধী কিন্তু সাকারের আরাধনার সাহায্যে যে ঈশ্বরোপাসনা তাহাকে যদি সাকার উপাসনা বল তবে আমি তাহারই পক্ষপাতী। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাকার উপাসনা অর্থে দেব দেবীর উপাসনা বুঝিতেন। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই দেব দেবীর উপাসনার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন; দেব দেবীর উপাসনা ঈশ্বর পদ লাভের পথের ব্যাঘাত স্বরূপ। আজ কাল যে সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া ঝগড়া দেখিতেছ, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাদের ঐরূপ উক্তিই এই ঝগড়ার মূল। তাঁহারা কি অর্থে সাকার উপাসনা নিন্দনীয় বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঠিক না বুঝিতে পারাই এই ঝগড়ার গোড়া। যখন সমাজ সেই ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবে তখন ঝগড়া মিটিয়া যাইবে।

ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের উপদেশ এই যে, সাকার অর্থাৎ দেব দেবীর উপাসনা কখন করিও না, কেন না উহা দ্বারা শান্তি সুখ মিলে না; দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা দেব দেবীর চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে হয়; তবে 'নিরাকার ঈশ্বরের উপা-

* "প্রচার" ঈশ্বরোপাসনা।

সনার জন্য স্থল বিশেষে দেব দেবীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

ছা। আপনি এ কি গোলমেলে কথা কহিলেন ইহার মর্ম্ম ত বুঝিতে পারিলাম না। 'দেব দেবীর উপাসনা' আর 'দেব দেবীর আরাধনা' এই দুইটি কথায় কি অর্থ যোজনা করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শি। উপাসনার প্রধান অঙ্গ উপাস্য পদার্থে ভক্তি,উপাস্য পদার্থের সহিত সম্পূর্ণ রূপে এক হইয়া যাইবার চেষ্টার নাম উপাসনা। উপাস্য পদার্থে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক আপনাহারা হইবার চেষ্টার নাম উপাসনা। আর আরাধনা কথাটির অর্থ সন্তুষ্ট করা। আরাধনায় আপনাহারা হইতে হয় না। উপাস্য দেব যে দিকে লইয়া যাইবেন আমি সেই দিকে চলিব এইরূপ ভাব সংস্থাপনের চেষ্টার নাম উপাসনা, কিন্তু আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্মে দেব দেবীকে নিযুক্ত করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার নাম দেব দেবীর আরাধনা। ঈশ্বরোপাসক, দেব দেবীর চক্রে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাহারা হইতে চান না। এক ঈশ্বর ভিন্ন, আর কাহারও জন্য আপনা হারা হইও না, ইহাই ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ, ঈশ্বরান্বেষী জনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কালী দেবীর আরাধনা সম্বন্ধীয় একটি মন্ত্রের শেষভাগ এই—

কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা—

নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থী ব্রহ্মোপাসক প্রয়োজন অনুসারে কালীর আরাধনায় কোন হানি দেখেন না, কিন্তু কালীতে তিনি আপনাহারা হইতে চান না, কালীকে নিজের বশে আনিতে চান। দেব দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাদের অধীন হওয়ার নাম দেব দেবীর উপাসনা আর নিজের গুণের সৌন্দর্য্যে দেব দেবীকে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের বশে আনার নাম দেবদেবীর আরাধনা। তাহা বুঝিলে দেব দেবীর উপাসনার কি কুফল তাহা বুঝিতে পারিবে। হিন্দুধর্ম্ম রহস্য বড় গভীর সুতরাং ধর্ম্ম রহস্য সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মিছা গণ্ডগোল করা কাহারও উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মানুসারে দেব দেবীর উপাসনা নিন্দনীয়,কিন্তু স্থল বিশেষে দেব দেবীর আরাধনা প্রয়োজনীয়। হিন্দু ধর্ম্মের এই রহস্যটুকু সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানিতে না।

দেখ আরাধনা ক্রিয়ার নাম যজ্ঞ। বেদের কর্ম্মকাণ্ড দেবদেবীর আরাধনা। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছেন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হিবো দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ।

দেবতাদিগকে যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে তাহারা দাসের ন্যায় ইষ্ট ভোগ্য সকল দান

করিয়া থাকে। সুতরাং দেবতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্নাদি গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগকে যিনি যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট না করেন তিনি চোর। *

ছা। মহাশয়, ঈশ্বরোপাসকের কাছে বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় সে কথা এখন ছাড়িয়া দিয়া সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনা লইয়া বিবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহাই প্রথমে শুনিতে চাই

শি। আমি যাহা বলিতেছি তাহা ঐ বিবাদ সম্বন্ধেই বলিতেছি। ঐ বিবাদের গোড়াটা কোথায় সেটাত আগে খুঁজিয়া দেখা চাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড আর উপনিষৎভাগ লইয়া যে বিবাদ সেই বিবাদই, এই বিবাদের গোড়া। কেহ বলেন কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা (বৌদ্ধমত) ঈশ্বর পাওয়া যায় না সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই কেহ বলেন (পূর্ব্ব মীমাংসক) কর্ম্মকাণ্ড ব্যতীত ঈশ্বর পাওয়া যায় না এই দুই দলের বিবাদ হইতেই সাকার বাদী ও নিরাকার বাদীর মধ্যে বিবাদ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা গীতা শাস্ত্রে এই উভয় মতের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

---

* দেবদেবী অর্থে আমি এই বুঝি যে, কর্ম্মফলপ্রদ শক্তির নামই দেব দেবী। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ একজন বলিয়াছেন যে—Every thought of man upon being evolved passes in the inner world and there coalescing with an elimental becomes an active entity. এই active entity রাই দেব দেবী। শক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, দৃষ্টশক্তি এবং অদৃষ্টশক্তি। অদৃষ্ট শক্তিই দেব শক্তি।

এইখানে আর একটি কথা উঠিতে পারে, দেবতা বলিতে ভালশক্তিকেই বুঝায় কিনা? দেবতা কথায় ভাল শক্তিকে বুঝায় কি মন্দ শক্তিকে বুঝায় সে বিষয়ে আমি এই বলি, যে দেবতারা বাস্তবিক ভালমন্দ কিছুই নহে। মানুষের চিন্তার রূপ অনুসারে দেবতাদের ভাল বা মন্দ বলা যায়, যেমন এক তাড়িৎশক্তি কখনও বা ভাল কাজের জন্য কখনও বা মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কালীশক্তি ঠগীদেরও দেবতা, এবং তান্ত্রিক মুমুক্ষু যোগীদেরও আরাধ্য। Forces in the astral light—অর্থাৎ সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি মাত্রেরই সাধারণ নাম দেব, সেই জন্য দেব ও অসুর কথার অর্থ—হিন্দু ও পারসীকদের মধ্যে উল্টা হইয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম শক্তি সকল নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে অসুর পিশাচ প্রভৃতিও দেব নামে অনেক স্থলে অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পিশাচের আরাধনা করেন পিশাচেরা তাঁহাদের কাছেই দেবতা। আসল কথা আরাধ্য অদৃষ্ট শক্তির নাম দেব বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা আরাধ্য, হিন্দুরা তাঁহাদেরই দেবতা বলেন, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম প্রদ শক্তি সকল যাহারা বেদাদি অনুসারে আরাধ্য নহে তাহারাই অসুর। দেবতা কথার আর একটি অর্থ আছে এই অর্থে তাঁহারা কেবল স্থল বিশেষে আরাধ্য নহেন তাঁহারা উপাস্য। গুরু শক্তির নাম দেবতা। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত করেন তাহাই শিষ্যের ইষ্টদেবতা। কর্ম্মফলপ্রদ সাধারণ শক্তি হইতে এইরূপ দেবতার প্রভেদ এই যে, যে ইহারা গুরুর ক্ষমতাধীন, কিন্তু অন্য শক্তি সেরূপ নহে।

লেখক।

কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা যাঁহাদের সম্পর্কে আসিতে হয়, তাঁহারা দেব দেবী তাঁহারা সাকার, এবং জ্ঞান কাণ্ড দ্বারা যাঁহার সম্পর্কে আসা যায় তিনিই ঈশ্বর তিনি নিরাকার। ঈশ্বর তত্বজ্ঞ মহাত্মারা বলেন যে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সাকারের আরাধনা প্রয়োজনীয় হইলেও সাকারের উপাসক হইও না। দেব দেবীরা শ্রদ্ধার পাত্র হইলেও ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই ভক্তির পাত্র নহেন। প্রথমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া নিরাকার বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সম্পর্কে আসিয়া সেই ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করাই ঈশ্বরোপাসকের কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও সম্পর্কে আসিয়া আপনাহারা হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই যেন উপাস্য না হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইয়া তবে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভক্তিযোগ কহিয়াছেন।

তন্ন তন্ন করিয়া ঈশ্বরালোচনা করিতে হয়। ইহা কি ঈশ্বর? না ইহা নহে, এই রূপ করিয়া আলোচনা করিয়া তবে ঈশ্বর কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। সাধক স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু দেখিতেছেন তাহাদের মধ্যে কি কেহ ঈশ্বর? না; স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকল সাকার কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার; সুতরাং যতক্ষণ এই সকল সাকার পদার্থের সম্পর্ক থাকিবে ততক্ষণ সাধক যেন আপনাহারা হন না। পরে সাধক বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন সরাইয়া লইয়া যখন মনোময় জগতে পঁহুছিয়া জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উঠিবেন তখন যে সকল পদার্থের সহিত সম্পর্কে আসেন তাহাদের মধ্যে কেহ কি ঈশ্বর? এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধক দেখিতে পাইবেন যে তখনও তিনি সাকারের সম্পর্কে রহিয়াছেন, সুতরাং সে অবস্থায় তিনি যেন আপনা হারা না হন। এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থার পর সাধক যখন জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিবেন—তখন তিনি সাকার অর্থাৎ সগুণ পদার্থের সম্পর্কে আর থাকিবেন না। এইরূপ জাগ্রত সুযুপ্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক যাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকেন, তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলে সেই ঈশ্বরে সংস্থা রক্ষার নাম ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরোপাসনা কথাটি বড় সহজ কথা নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোময় জগতীয় সূক্ষ্ম শক্তির আধার পদার্থ সকলের নামই দেব দেবী। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে এই সকল দেব দেবীর সূক্ষ্ম শক্তির সম্পর্কে আসিয়া সাধক সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। যিনি সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে শিখেন নাই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ কখনই অন্তরে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। কেন না ঈশ্বর কি তাহা জানিতে হইলে ঈশ্বর কি নহেন তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরোপাসক ঈশ্বর তত্ত্ব অনুসন্ধান জন্য যখন বাহ্য জগৎ হইতে আপনাকে সরাইয়া লইবেন, তখন তাঁহার ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ আরম্ভ হইবে। এই অবস্থায় তিনি যেন আপনা-

ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মিয়াছে তখন জানিবে যে ঈশ্বর নামে তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে।

কাহারও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলে অন্তরে যে ভাব জন্মে, যে ভাব নিবন্ধন সেই মাহাত্ম্য বিশিষ্ট পদার্থকে ছাড়িতে চাই না, তাহারই নাম ভক্তি। ঈশ্বরোপাসককে ক্রমে ক্রমে সব ছাড়িতে হইবে সুতরাং কোন অনিত্য পদার্থের মাহাত্ম্যে তিনি যেন মুগ্ধ না হন। রূপের মাহাত্ম্যে দর্শনেন্দ্রিয় মুগ্ধ হয়, সঙ্গীত—সৌন্দর্য্যে কর্ণ মুগ্ধ হয়, কবিতার সৌন্দর্য্যে কল্পনাত্মক মন মুগ্ধ হয়, আর নামের মাহাত্ম্যে বুদ্ধি মুগ্ধ হয়। যখন দেখিবে যে তোমার বুদ্ধি বৃত্তির আলোচনা জন্য তোমার অন্য কিছুই ভাল লাগেনা, কেবল ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেই তোমার বুদ্ধিবৃত্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তখন তুমি ঈশ্বরের নামে ভক্তি কিরূপ তাহার আভাস পাইবে, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য তুমি কিছুই বুঝ নাই এই জ্ঞানটি প্রথম জন্মান চাই, তাহার পর সেই মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য অন্তর যখন লালায়িত হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র, খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র বা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র যেখানে ঈশ্বরের নাম পাইবে, সেই সেই শাস্ত্রের ভাব লইয়া আলোচনা করিবার জন্য যখন আগ্রহতা জন্মিবে, তখন ঈশ্বর ভক্তি কিরূপ তাহার আভাস পাইবে। ঈশ্বর মাহাত্ম্য কি গভীর, তখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, যে সকল মহাত্মারা ঈশ্বর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গকামনায় প্রাণ মন যখন উতলা হইবে তখন তুমি ঈশ্বর নামে ভক্তি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছ বুঝিও। আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া অহঙ্কার কখনও যেন না জন্মে। যে দিন তোমার ঐ অহঙ্কার জন্মিবে সেই দিন তোমার উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে।

আজকাল সাকার ও নিরাকার উপাসনা যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে সেই অর্থে তুমি সাকার উপাসকই হও, আর নিরাকার উপাসকই হও, মনে ইহা স্থির জানিও যে কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিতে ঈশ্বর নাই; ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। সুতরাং কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনার উন্নতির পথে আপনি কণ্টক দিও না। ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। যোগী পতঞ্জল বলেন, প্রণব স্তস্য বাচক। এই প্রণব আলোচনা দ্বারা সমস্ত বৃত্তি সকলকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে শিখ। মিছে ঝগড়া ঝাটিতে মাতিয়া নিজের কাজ হারাইও না।

হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পিতৃতত্ত্ব এবং দেবতা তত্ত্ব আদি আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে বিশেষ বিশেষ উপাসনা বা আরাধনা পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেবতাদের সম্পর্কে আসা যায়। সুতরাং যাঁহারা আপনাদের উপাসনা পদ্ধতি লইয়াই আড়ম্বর করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাদের উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন বলিতে হয়। কিরূপ পূজাপদ্ধতি দ্বারা কিরূপ সূক্ষ্ম শক্তির সম্পর্কে আসা যায় হিন্দু শাস্ত্র সকলে তাহার বিশেষ আলোচনা করা আছে। এসম্বন্ধে গোটাকত কথা মোটামুটি বলি শুন।

দেবাদি পূজার মূল সূত্র এই যে "না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"। 'দেব ভাবাপন্ন না হইলে দেব পূজার অধিকারী হয় না'। যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিবে সেই-রূপ ভাবানুযায়ী দেবতাদের সম্পর্কে আ-সিতে পারিবে। সূক্ষ্ম শক্তির আধার সকল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। পিতৃলোক, দেবলোক, ঋষিলোক। শ্রদ্ধা দ্বারা পিতৃ-লোককে সন্তুষ্ট করিতে হয়, কর্ম্ম অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির চালনা দ্বারা দেবলোকের সম্পর্কে আসা যায় এবং জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা ঋষিলোকের সম্পর্কে উপনীত হওয়া যায়। যে পূজা প্রেম প্রধান, তাহা পিতৃলোকের পূজা, যে পূজায় ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য তাহা দেব পূজা এবং যে পূজায় জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য তাহা ঋষি পূজা। আর যে পূজার উদ্দেশ্য পিতৃ ঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ পরি-শোধ করা তাহাই ঈশ্বরোপাসনা। নি-ষ্কাম প্রেম চর্চ্চা দ্বারা পিতৃ ঋণ শোধ দিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা দেব ঋণ পরিশোধ হয়, এবং আত্মজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা ঋষি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে পূজায় পিতৃ চক্র, দেব চক্র, এবং ঋষি চক্র হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা। দেবভাবাপন্ন জন দেব পূজার অধিকারী এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন জনই ঈশ্বর উপাসনা করিতে জানেন। ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা যদি জানিতে চাও তবে ঈশ্বর ভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবের চরিত্রে চিত্ত সংযম করিতে শিখ।

আমি তোমায় ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে দু কথায় কি বুঝাইব? সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে তবে ঈশ্বর উপাসনা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবে।

ছা। আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন—ঈশ্বর স্থূল পদার্থে নাই, ঈশ্বর সূক্ষ্ম পদার্থে নাই, ঈশ্বর কোন বিশেষ পূজা পদ্ধতিতে নাই, এই সকল কথা আমার মনে লাগিতেছে না; কেন না সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই এই কথা আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। সামান্য স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, প্রহ্লাদ ইহা বুঝিয়াছিলেন।

শি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সকলের অর্থ বুঝা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন অর্থাৎ তিনি স্থূল পদার্থেও আছেন সূক্ষ্ম পদার্থেও আছেন একথাও ঠিক এবং তিনি স্থূল পদার্থে নাই এবং সূক্ষ্ম পদার্থেও নাই একথাও ঠিক। তুমি আমি সাধারণ লোকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে যে ভাবে দেখি, স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থকে সে ভাবে দেখিলে ঈশ্বর তাহাতে নাই—কিন্তু যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধীয় ভেদ জ্ঞান নাই তিনিই সকল পদার্থেই ঈশ্ব-রের অস্তিত্ব দেখিতে পান, আর কিছুই দে-খিতে পান না।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। যে এক এবং অদ্বি-তীয় পদার্থ সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম ঈশ্বর। কিন্তু যাহা জগতের এক দেশ ব্যাপী তাহা ঈশ্বর নহে। এই সম্মুখস্থিত স্থূল পদার্থটি তোমার সমক্ষে রহিয়াছে—এই পদার্থ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান এই যে ইহা জগতের একদেশ ব্যাপী সুতরাং তোমার কাছে ঐ স্থূল পদার্থ-

টিতে ঈশ্বর নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষের একখানি পুস্তক দেখিলেও অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, একটি সুন্দর পুরুষ দেখিলেও অন্তরে সেইভাব উদয় হয়; কিছুতেই তাঁহার অন্তরের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। সেই জন্যই তিনি সকল পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান। দেখ কেবল কথা লইয়া কখনও তর্ক করিও না। কথার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। সে দিন একজন প্রতিমা পূজার পক্ষ সমর্থন জন্য এইরূপ তর্ক করিতেছিলেন। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন; ঈশ্বর নদীতে আছেন পর্ব্বতে আছেন, কাষ্ঠে আছেন এবং এই প্রতিমাতেও আছেন। সুতরাং প্রতিমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে বাধা কি? কিন্তু এ তর্কের গোড়ায় গলদ কোথায় দেখ। প্রতিমাতে যে ঈশ্বর আছেন, সে কি তুমি আমি বুঝিতে পারি। প্রতিমা দেখিলে মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা প্রতিমা সম্বন্ধীয় ভাব; তাহাকেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বলিলে ঘোরতর ভ্রম হইল। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাতে অন্তরে যে সচ্চিদানন্দ ভাব উপস্থিত হয়, প্রতিমা দর্শনেও যিনি সেই ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই বলিতে পারেন ঈশ্বর এই প্রতিমাতেও আছেন।

তোমার আমার ন্যায় লোককে এখন বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ কোন বিশেষ একদেশ ব্যাপী নহেন। যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের (যাহাদের এখন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝ) সম্পর্কে আসিয়া সকল সময়েই সেই এক সচ্চিদানন্দ ভাব বই অন্য কোন ভাব অন্তরে আসিবে না, তখনই তুমি গাছেও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে এবং মানুষেও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে।

দেব ভাবাপন্ন না হইলে পূজা দেবলোকে পঁহুছায় না, সেইরূপ নিজে ঈশ্বর ভাবাপন্ন না হইলে ঈশ্বর পূজা হয় না। সচ্চিদানন্দ ভাব ঈশ্বর ভাব। ঈশ্বরোপাসনা শিখিতে গেলে অন্তরে এই ভাব আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহার অন্তরে এই ভাব উপস্থিত হয় নাই অথচ নিজের উপাসনা পদ্ধতির গোঁড়ামী করিয়া থাকেন তিনি তাঁহার সেই ছোট খাট উপাসনা পদ্ধতির শিষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া আপনা হারা হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরে নাই; সেই উপাসনা পদ্ধতিতে তাঁহার ভক্তি দাঁড়াইয়াছে। অতএব সতত সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে শিখিবে। অন্তরে এইরূপ গোঁড়ামী জন্মাইয়া দেওয়া দুষ্ট দেবতার কার্য্য। দেবতারা ঈশ্বর উপাসকের সাধনার পথে কেবল বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করে ইহা হিন্দুরা বেশ বুঝিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে দেবতাদের এইরূপ দুষ্টামি বেশ বর্ণনা করা আছে। সাবধান দেবতাদের চক্রে পড়িয়া আপনাহারা হইও না।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মন যত দিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের থাকিবে, ততদিন পূজা পদ্ধতি কখনই এক রকম হইবার সম্ভাবনা নয়। যিনি যে রকম ভাল বুঝেন, তিনি সেই রকমে উপাসনা করুন, মিছে ঝগড়া কর্ত্তব্য নহে। এই সব ঝগড়া দেখিয়া আমার অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ের গল্পটি মনে পড়ে। ঈশ্বর

সম্বন্ধে সকলেই কানা অথচ আপনকার গোঁ ধরিয়া ঝগড়াটি না করিলে চলে না। আগে ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর তাহার পর না হয় ঝগড়া করিও। যে পদ্ধতি অবলম্বনে মনে সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা পদ্ধতি। আজকালকার সমাজে যে সাকার উপাসনা দেখিতে পাই কেবল মাত্র সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনেই কেহ কি সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাইয়াছেন? আজকালকার নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই কি সেই সচ্চিদানন্দ ভাবের আস্বাদ পাওয়া যায়? তাহা যদি হইত তবে ভারতে আজ মুক্ত পুরুষের ছড়াছড়ি যাইত। তবে কেন মিছে সামান্য পূজা পদ্ধতি লইয়া গোল মাল করা ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঘরে অন্ন নাই কিন্তু কি রূপে অন্ন খাইতে হইবে—হাতে কিম্বা কাঁটা চামচে—এই লইয়া দুই ভাইয়ে ঝগড়া করাটা কি ভাল দেখায়। আগে অন্নের চেষ্টা কর; আগে ঈশ্বর কি দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তাহাই বুঝিবার চেষ্টা কর। বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞান চর্চ্চা কর তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

ছা। আপনার কথা বার্ত্তায় যতদুর বুঝিতেছি তাহাতে আপনি জ্ঞান মার্গেরই বেশী পক্ষপাতী।

শি। আমি ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যাহা বুঝি তাহা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। প্রথম নামে ভক্তি চাই, সেই ভক্তির ফলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অন্তরে বুঝিবার জন্য আগ্রহতা জন্মান চাই; জ্ঞান এবং কর্ম্মের সাহায্যে বিশ্বরূপ, নিরাকার ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণা করিতে পারিলে তখন সেই ঈশ্বরের স্বরূপে ভক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক, আমি কে ইহা বুঝিবার জন্য বিজ্ঞান চর্চ্চা চাই, তাহার পর আমার অহং জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান যোগ করিতে পারাই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরে ভক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইহার একটি হইতেই অপরটি জন্মিয়া থাকে। কর্ম্মমার্গ অবলম্বনে জ্ঞানের চর্চ্চা, জ্ঞানের সাহায্যে ভক্তির চর্চ্চা, ভক্তির সাহায্যে আবার কর্ম্মের চর্চ্চা এইরূপ করিয়া প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান বা ঈশ্বর ভক্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা সাধারণ লোকে প্রেম ও ভক্তি কথার যে অর্থ বুঝি, ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থতে যদি তুমি সেইরূপ প্রেম বা সেইরূপ ভক্তি বুঝ, তবে তুমি ঠিক বুঝ নাই। ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থ আমি যাহা বুঝি, তাহা তোমাকে আর এক দিন বুঝাইব।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মুন্না সারাদিন প্রায় একাকী জানালার ধারে বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে গাছ পালার পানে চাহিয়া থাকে, হু হু করিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, কাহারো পায়ের সাড়া পাই-লেই চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া যায়। শূন্য অট্টালিকার এঘর ওঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—ঘরে ঘরে যেন কাহা-দের খুজিয়া বেড়ায়—তাহাদের দেখিতে পায় না। গৃহময় তাহাদের পরিত্যক্ত কত চিহ্ন,—অতীতের কত স্মৃতি, সুখ দুঃখের কত কা-হিনী,—কেবল তাঁহারা নাই। তাহাকে দে-খিয়া সেই স্মৃতি, সেই কাহিনী গৃহ ফাটা-ইয়া যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠে "না গো না তাঁহারা এখানে নাই"। মুন্না কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়া আবার তা-হার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বাগা-নের গাছপালা গুলি ঝর ঝর শব্দে আবার সেই কথা কহিয়া উঠে, গঙ্গা কুল কুল ক-রিয়া তাহাই বলিতে থাকে, মুন্না আর পারে না, উথলিত অশ্রু উৎস বুকে চাপিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে।

কিন্তু সে অশ্রু তাহার আর মুছাইবে কে? সে মর্ম্ম-বেদনায় তাহাকে সান্ত্বনা কে দিবে? তাহার আর আছে কে? এই অসীম বিশ্বসংসারে সে যে নিতান্ত অনাথিনী, নি-তান্ত একাকী। তাহার স্বামী নাই, তাহার স্নেহের পিতা নাই, তাহার সুখের সুখী, দুঃ-খের দুঃখী একমাত্র ভাইটি ছিলেন, মুন্নার জীবনের শেষ জ্যোতিটুক নিভাইয়া দিয়া তিনি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন, তবে তা-হার আর আছে কে? তাহার চারিদিকে কি ঘোর অন্ধকার, কি প্রাণ শূন্যকারী নিরাশা!

চার পাঁচ মাস হইল মহম্মদ চলিয়া গিয়া-ছেন এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদই নাই। তিনি যাইবার পর পিতার নিকট হইতে মুন্না একখানা পত্র পাইয়াছে কিন্তু তাহাতে মহম্মদের কোন কথাই নাই। দিন দিন মুন্নার বুকে পাষাণ ভার বাড়ি-তেছে, দিন দিন তাহার ক্ষীণ দেহ ক্ষীণতর হইতেছে—মলিন মুখকান্তি শীর্ণ বিবর্ণতর হইয়া পড়িতেছে।

সে যে নিরাশার বলে বল আনিয়া, পাষাণ বলে প্রাণ বাঁধিয়া তবুও ধৈর্য্য সহ-কারে আশার পানে চাহিয়া আছে—কিন্তু আরত সে পারে না। প্রতি দিন কত কষ্টে কত করিয়া, এক একটা দীর্ঘ যুগের মত যখন বেলাটা শেষ হইয়া যায়, মুহূর্ত্ত পল গণিয়া গণিয়া সারাদিনের পর যখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দিগন্তে বিলীন হইয়া পড়ে—তখনও যে মহম্মদের কোন খবরই আসে না, —সে আর এমন করিয়া কত পারে? দিন দিন যে তাহার ধৈর্য্য একটু একটু করিয়া লোপ হইয়া আসিতেছে, আশা খসিয়া খসিয়া

পড়িতেছে। যত দিন যাইতেছে তাহার মনে হইতেছে—এইরূপ দিনের পর দিন যাইবে, মাসের পর মাস যাইবে—বৎসরের পর বৎসর যাইবে,—এই দগ্ধ হৃদয় লইয়া অনন্তকাল এই অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া থাকিবে তবু বুঝি আর কেহ আসিবে না, বুঝি আর মহম্মদ ফিরিবেন না,—বুঝি বা তিনি বাঁচিয়া নাই—" মর্ম্মান্তিক কষ্টে দুঃখে আত্মগ্লানিতে অবসন্ন হইয়া মুন্না ভাবিতেছে, "হায় কি করিলাম—কোথায় পাঠাইলাম? আমার সুখের জন্য তাহাকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলাম। সব গেল—সব গেল—কেহ রহিল না—বুঝি আর কেহ ফিরিল না!"

মহম্মদ সুখী হইবেন ভাবিয়া তাহাকে যে মুন্না যাইতে দিয়াছিল—সে কথা মুন্না ভুলিয়া গেছে, তাহার কেবল মনে হইতেছে তাহার নিজের সুখের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য সে মহম্মদকে মৃত্যুর হস্তে পাঠাইয়াছে।

বিকালের শেষ বেলা, রোদ পড়িয়া গিয়াছে, তবু গাছের মাথাগুলি এখনো যেন অল্প অল্প চিক চিক করিতেছে, বাসায় যাইবার আগে তেতালার চিলে ছাতের মাথায় কাকের রাশি দল বাঁধিয়া বসিয়া কাকা করিতেছে, বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় মাথায় ছোট ছোট কত রকমের পাখীগুলি মনের সাধ মিটাইয়া একবার কিচির মিচির করিয়া লইতেছে। মুন্না এই সময় খোলা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে। প্রথম বসন্তের আরম্ভ, প্রেমের হাসির মত দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, সে স্পর্শে বাগানের মুদিত জুঁই বেল কলির মুখগুলি ঈষৎ ফুট' ফুট' হইয়া উঠিয়াছে, আম গাছ, নীচু গাছ, বাদাম গাছ, ঝাউ গাছের শাখাগুলি একত্রে মিলিয়া মিশিয়া, অল্প অল্প দুলিয়া দুলিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বারান্দার পাশের বকুল গাছের শাখাটি হইতে এক একটি পাতা মর্ম্মর শব্দে খসিয়া খসিয়া মুন্নার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে; কামিনী গাছের ঝোপে লুকাইয়া একটা দোয়েল থাকিয়া থাকিয়া গান গাহিয়া উঠিতেছে, দূরে কোথা হইতে একটা কোকিল সপ্তমে তান চড়াইয়া তাহার প্রতিধ্বনি গাহিতেছে।

নীল আকাশের গায়ে নানা বর্ণের পাহাড় পর্ব্বত উঠিয়াছে, বাগানের সীমান্তে ঘন বদ্ধ বৃক্ষরাশির ফাঁক দিয়া আকাশ গুলি সমুদ্রের অংশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মুন্না একদৃষ্টে তাহারদিকে চাহিয়া আছে, বুঝি ঐ সমুদ্রে মহম্মদ আসিয়া চলিয়াছেন, বুঝি এখনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কই দেখা যায় না কেন? এত নিকটে তবু দৃষ্টি চলে না কেন? সীমার মধ্যে দাঁড়াইয়া একি অসীমের ব্যবধান? মুন্না একদৃষ্টে চাহিয়া বুঝি সে ব্যবধান ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

একজন দাসী কাছে আসিয়া বসিয়া তাহার চুলের রাশি লইয়া জটা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল। ভোলানাথের স্ত্রী আসিয়া নিকটে বসিলেন, মসীন গিয়া অবধি তিনি রোজ মুন্নাকে দেখিতে আসিতেন। মুন্না একবার মাত্র তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, আবার

আনমনে সেইদিকে মুখ ফিরাইল। খানিক পরে আবার কাহার পায়ের শব্দ হইল, মুন্না চমকিয়া আর একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইল, বাতাসের শব্দেও মুন্না আজকাল চমকিয়া উঠে। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার চোখ'চোখি হইল—মুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া মুন্না পূর্ব্ব ভাবে আকাশ পানে চাহিল। স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিল। ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"কেগা তুমি"।

সে বলিল—"কেউ নই গা—এই পাড়াতেই থাকি—আমার নাম ময়না। ইনিই বুঝি বিবিজি ?"

দাসী চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—"কেন গা তোমার সে খবরে কাজ কি গা ?"

অপরিচিতা বলিল—"খবর থাকিলেই খবরের দরকার, আর জিজ্ঞাসা করলে কি দোষ আছে নাকি—মরণ"

দাসী রাগিয়া গেল, চিরুণি খানি মাটিতে রাখিয়া বলিল—"তুই কে লা আমাকে গাল দিতে আসিস, আমার মরণ না তোর মরণ—আঃ গেল যাঃ," ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন "চুপ কর মতি, ঝগড়া করতে আরম্ভ করলি কেন ?"

মতি চিরুণি খানা উঠাইয়া, আবার চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিয়া বলিল—"দেখ মা—যেচে পরের বাড়ী ঝগড়া করতে এসেছেন।"

অপরিচিতা বলিল—আঃ মরণ, আমি ঝগড়া করছি না তুই ঝগড়া করছিস। দেখ দেখি মা রকম খানা—কোথায় ভাল কথা বলতে এলুম না দেখেই ঝগড়া করতে আরম্ভ করলে।" দাসী আবার কি বলিবার উপক্রম করিল—ভোলানাথের স্ত্রী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—"কি বলতে এসেছ তুমি বল।" সে বলিল "বড়ই ভাল খবর—শুনলে পরে এখনি ঐ মলিন বদন চাঁদ পারা হয়ে হেসে উঠবে"—মুন্না এতক্ষণ অন্য মনে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল—সহসা তাহার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল, প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—পারিল না, ওষ্ঠে আসিয়া তাহা যেন বাধিয়া গেল, ভোলানাথের স্ত্রী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, তিনিও উন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহম্মদ মসীন সাহেব আসিওেছেন কি ?" তৃষিত ব্যক্তি যেমন জলের পানে চাহিয়া থাকে—মুন্না সেইরূপ উতলা হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অপরিচিতা একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"ও কি এমনিই ভারী খবর নাকি? না গো না—বিবিজি তোমাদের রাণী হইবেন—খবর লইয়া আসিয়াছি, নবাব খাঁ জাহা খাঁ সাদির পয়গাম পাঠিয়েছেন"—মুন্নার পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—আবার পরক্ষণেই তাহা আরো পাংশু হইয়া গেল, চোখ জলে পূরিয়া আসিল মুন্না মুখ নত করিল! অপরিচিতা বলিল—"হ্যাগা তা মুখখানি তুলে চাও—দুট কথা কও, নবাবশাকে কি বলব দুট বলে দাও।"

দাসী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—ভোলানাথের স্ত্রীর কথা বন্ধ হইয়া গেল—ময়না

আবার বলিল—"হ্যাঁ তা সরম লাগে বই কি, তা হোক ছুট কথা বলে দাও।"

স্নিগ্ধ বিদ্যুতেও বজ্র লুকান থাকে, উষার আলোকেও তাপ নিহিত থাকে,—মুন্নার স্বভাবত বিনম্র কোমল হৃদয়েও যে গর্ব্বটুকু লুক্কায়িত ছিল্ তাহাতে সবলে দারুণ আঘাত পড়িল—মুন্নার আর সহ্য হইল না,—মুন্নার জীবনে বুঝি সে এত অপমান বোধ করে নাই—এত ক্রুদ্ধ হয় নাই, কষ্টে দুঃখে—রোষে, অপমানে সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"তাঁহাকে বলিও এখনো গঙ্গার বুকে আমার আশ্রয় আছে।" মুন্না দ্রুতপদে সেখান হইতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া মাটির উপর গড়া গড়ি দিয়া—আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—"মসীন ভাই আমার এ সময় একবার সাড়া দিবে না, না ডাকিতে আপনি আসিয়াছ—এখন আকুল হইয়া এত ডাকিতেছি—এক বার দেখিতে আসিবে না ভাই!" স্তব্ধ গৃহে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কঠোর দেয়ালের প্রাণও যেন সে আকুল ক্রন্দনে ফাটিয়া উঠিতে চাহিল, কিন্তু আর কেহ—কেহ আর সাড়া দিল না।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মুন্না চলিয়া গেলেন, স্ত্রীলোকটা অবাক হইয়া গেল। অমন ভাল কথা শুনিয়া কেন যে মুন্না রাগিয়া গেলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না—সে বলিল—"বাবা ও কি মেয়ে গা—ভাল কথা বলতে অমন করে কেন? আমাদের যদি কেউ অমন কথা বলে ত আমরা তাকে মাথায় করে রাখি।" ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ গা তোমাদের এ কি রকম? বিধবা হলেও ত আমাদের বিয়ে হয় না, আর স্বামী বেঁচে থাকতেই তোমাদের বিয়ে!"

সে বলিল "কে জানে তোমাদের কেমন, আমাদের শাস্ত্র ওতে ভাল। স্বামীই যদি আমাকে ত্যাগ করে গেল ত সে বেঁচে থাক আর নাই থাক আমার আর তাতে কি?

দাসী বলিল—"তা মা তক্ষনি কি আর আমাদের সাদি হয়, স্বামী মরে গেলে বল ত্যাগ করলে বল—৪০ দিন আমাদের শোক করতে হয়।"

ভোলানাথের স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ সে অনেক কাল বই কি?—ততদিন যমে তোমাদের নেয় না কেন—আমি তাই ভাবি।"

অপরিচিতা বলিল—"যমে নিলে আর সাদি করবে কে? বলব কি তেমন কাঁচা বয়স নেই, নইলে স্বামী—যত দিন মরেছে আবার দুট তিনটে সাদি এতদিনে হতে পারত" বলিয়াই সে আকর্ণ বিস্ফারিত হাসি হাসিল—ভাবিল কি রসিকতাটাই করিয়াছে। সে হাসির বিকাশে পানের ছোবধরা বেগনি রংয়ের পুরু পুরু ঠোঁট দুখানির মাঝে আতা বিচির মত কাল কুচকুচে দাঁত দুই পাটি—(কবির ভাষায় বলিতে গেলে নীল ইন্দিবর মাঝে ভ্রমরবৎ)—আমূল বাহির হইয়া পড়িল;—কাল মুখে কাল দাঁতের ঘটা পড়িয়া গেল। হাসির ধমকে তাহার গা দুলিতে লাগিল,

কানের একরাশ রূপার মাকড়ি নড়িতে লাগিল—হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিতে হাসিতে রূপার চুড়িভরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বারান্দা পার না হইতে হইতে সে হাসির চিহ্ন মাত্র আর রহিল না। যখন রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল তাহার মনে অনেক রকম ভাবনা আসিয়া পড়িল। বড় মুখ করিয়া সে নবাবের কাজের ভার লইয়াছিল—সে মুখ তাহার কোথায় রহিল! দেওয়ান নাজানি তাহাকে কি বলিবেন! এই মন্দ খবর লইয়া নবাববাটীতে যায় কি করিয়া!

যাইতে যাইতে রাস্তার মাঝে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রধান প্রহরীর সহিত তাহার দেখা হইল। এখন তাহার আর চাকরী নাই, ঘরেই বসিয়া আছে। নবাব বাড়ীর চাকরকে তাহার ঘরের কাছ দিয়া যাইতে দেখিলেই মহা আপ্যায়িত করিয়া সে এখন গৃহে লইয়া আসে, এক সময় যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিত, দশ কোটী সেলাম করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে আপনার দুর্দ্দশা জানায়, এবং পুনর্ব্বার বহলের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের কাছে একবার করিয়া আপনার সমস্ত জীবনটা চিরজীবনের জন্য বাঁধা রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা বাড়ীর বাহির হইবা মাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শত গুণ আক্রোশে তাহাদের মুণ্ডপাতে নিযুক্ত হয়। ময়না যে নবাব বাটীতে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহা প্রহরী খবর পাইয়াছে—সেই জন্য তাহারও আজ কাল বড় আদর, আজ কাল সে, তাহার মাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই প্রহরী মাসী মাসী করিয়া অস্থির হইয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল। মাসীও আপনার দর বাড়াইতে ছাড়িল না,—বসিবার যে বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই, নবাব যে তাহার জন্য হা প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছেন, বিশেষ করিয়া সে কথা তাহাকে বলিয়া কোন মতেই সে তাহার কথায় রাজি হইল না, অথচ বলিতে বলিতে তাহার বাড়ী আসিয়া বসিল। আসলে নবাববাড়ী যাইবার জন্য সে যে বড় একটা উৎকণ্ঠিত ছিল তাহাও নহে, বরং যতক্ষণ না যাইতে হয় আপাততঃ সে তাহাই চাহে। মন্দ খবরটা লইয়া যাইতে তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে।

এখানে আসিয়া হিন্দুস্থানিতে তাহাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল, আমরা বাঙ্গলা করিয়াই তাহা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এ কথা সে কথার পর প্রহরী বলিল "মাসি—জি কি হোল কি?" প্রহরী অনেক করিয়া নবাববাড়ীতে চাকরীর জন্য মাসীকে বলিয়া দিয়াছিল, মাসীও তাহাকে বিধিমতে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি প্রহরীর চাকরীর ভাবনায় তাহার যে সারারাত ঘুম হয় না এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করাইয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। অথচ সে কথাটা তাহার স্মৃতির ত্রিসীমাতেও ছিল না, রাত জাগিয়া জাগিয়া বোধ করি মাথার ব্যাম উপস্থিত হওয়াতে স্মৃতিটা এই রূপ বিকল হইয়া থাকিবে, সুতরাং প্রহরী যাহা ভাবিয়া ঐ কথা বলিল, ময়না তাহা

বুঝিল না, ময়নার মনে যেরূপ কথা আনচান করিতেছিল, সে সেইরূপই বুঝিল,—সে বলিল "আর কি হোল! মেয়ে না ত যেন আস্ত বাঘ। কথা বলতে গিল্‌তে আসে, তা এর মধ্যে এ খবর তুই কি ক'রে পেলি? এত কেউ জানার কথা নয়" প্রহরী বড় চতুর, বুঝিল একটা কিছু ব্যাপার আছে, বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল "হ্যাঁ আমি আবার জানব না, সব কথা আগে আমার কাছে তা মেয়েটা কি বল্লে?"

ময়না। "এমন লক্ষ্মীছাড়া ডাইনি মেয়ে দেখিনি—কোন মতে সে সাদি করতে চায় না।"

প্রহরী আন্দাজে একরকম সব বুঝিয়া লইল, বলিল—"তাইত বড় তাজ্জব! তা কোথাকার মেয়েটা বল দেখি মাসী।"

ময়না। "সব জানিস ওটা জানিসনে! এই যে ওই বড় বাড়ীর মুন্না বিবিজি, মহম্মদ মসীনের বোন"

প্রহরীর দাঁতে দাঁতে লাগিল, প্রহরী বলিল "জানি জানি তার পর".

ময়না। "তার পর আর কি? এখন নবাব সাকে গিয়ে বলি কি বল দেখি?"

প্রহরী বলিল "বল, আর কিছু নয় একবার হুকুমের প্রতীক্ষা।"

ময়না বলিল "কথাটা ত মন্দ নয়! তাইত বলি বোনপো নইলে কারো ফন্দি এসে না—কিন্তু পারবি কি?

প্রহরী ভীষণ ভ্রুকুটি করিল—দাঁতে দাঁতে আর একবার কিটি মিটি করিল—তাহার পর বলিল "কেন পারিব না? তাঁহার বোনকে ধরিয়া আনিব, তাহাকে পাইলে মুণ্ডপাত করিতাম, বদমাস কাফের!"

ময়না বলিল "কাফের কি গো সে যে মুসলমান?

প্রহরী। "সে কাফের নয়, তাহার আমলা কাফের, তাহার গমস্তা কাফের, তাহার গাইয়ে কাফের, তার যত সব কাফের। তার রক্ত পান করিতে পারিলে সব পাপ আমার মোচন হইবে।"

ময়না বলিল "তবে তাই তুই করিস—আমি এখন নবাবের বাড়ী যাই।"

প্রহরী বলিল "দোহাই মাসী ভুলিও না, বলিও তাঁহাকে, এ বান্দা থাকিতে তাঁহার কোন ভাবনা নাই, কেবল চরণে একটু স্থান পাইলেই হইল।

—:*:—

# রাজনৈতিক আলোচনা।

—(০)—

রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ভারতীর একটি উদ্দেশ্য, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রস্তাব আমাদের এত হস্তগত হয়, যে অভিপ্রায় সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রস্তাব আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের সমাজের এখনও এত অভাব ও এত সংস্কার আবশ্যক যে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্র-

স্তাবের উপর আমাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃ আ-গেই পড়ে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, যে জাতি সামাজিক উন্নতি লাভ না করিতে পারে, সে জাতি রাজনৈতিক উন্নতি লাভ কখনই সুচারুরূপে করিতে সক্ষম হয় না। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকে সভ্য নির্ব্বাচিত করা সম্বন্ধে বাঙ্গালি বিদ্বেষী পাইওনিয়র সংবাদপত্রে একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক প্রশ্ন করেন যে সিভিল সার্ব্বিস ও Anglo Indian দলের, এমনকি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিলাত যাইয়া কেন ভোঁতা হইয়া যায়? ভারতে থাকিয়া অনেকে রাজনৈতিকতায় দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু বিলাতে পদার্পন করিয়াই হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহারা সামান্য লোকের ন্যায় বাস করিয়া থাকেন—কোন মতেই মাথা চাড়া দিতে পারেন না। ইহার কারণ পাওনিয়র অনেকগুলি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উহাদের আত্মশ্লাঘা অর্থাৎ হামবড়া হ্যায় একটি প্রধান কারণ। (তাঁহাদের চরিত্র ও কার্য্য সমালোচনা তাঁহাদের প্রাণে অসহ্য) দ্বিতীয় অনুদারতা—তৃতীয় অধার্ম্মিকতা। এই সকল কারণেই আর কি ইংলণ্ডীয়-উদার রাজনীতি অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদেরউত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা এই জন্য বলি যে রাজনৈতিক সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করার পূর্ব্বে সামাজিক উৎকর্ষ সাধন অতি আবশ্যকীয়। যে জাতি আপনাদের পারিবারিক উন্নতি সম্বন্ধে এত অবহেলা করে, আমাদের মতে তাহাদের রাজনৈতিক বিষয় লইয়া কোন আন্দোলন করা বিধেয় নহে। অসংখ্য পরিবার লইয়া একটি জাতির গঠন। সেই জাতির একটি একটি পরিবার যেরূপ উন্নতি লাভ করিবে, সেই জাতিও সেই প্রকার উন্নতি সোপানে আরোহণ করিবে। সমাজ আর কাকে বলে? তুমি আমি লইয়াই সমাজ। অতএব তুমি আমি যদি ভাল না হই, তাহা হইলে তোমার আমার সমাজ কিরূপে ভাল হইবে? তোমার আমার নীতি সমাজনীতিই বল, আর রাজনীতিই বল কিরূপে ভাল হইবে? আবার বলি নিজের উন্নতি কর—পারিবারিক উন্নতি কর—সামাজিক উন্নতি কর—তাহা হইলে তোমার রাজনীতির জন্য মাথা ব্যথা করিতে হইবে না—স্বতঃই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ফিরিয়া যাইবে।

আমরা ধান ভান্‌তে শীবের গীত গাইলাম্। সে যাহা হউক আমরা এখন হইতে দুই একটি অতি আবশ্যকীয় ও সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতব্য রাজনৈতিক খবর মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

## আফগানিস্থানের সীমা নির্ণয়।

এখনকার মস্তখবর—আপাততঃ ইংলণ্ড ও রুসিয়ায় আর যুদ্ধ বাধিল না। এ যুদ্ধ বাধিলে ভারতবাসীর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না। রক্ষণশীল (Conservative) দল রুশিয়দের সহিত শেষ গণ্ডগোল মিটাইয়া ভারি বাহাদুরি লইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে গোল মিটানর প্রশংসা উদার-

নৈতিক (Liberal) দলকে দেওয়াই উচিত; কেননা গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব সন্ধির জন্য রুশিয়দিগের কাছে যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, লর্ড সলিস্‌বরি তাহা অপেক্ষা তিলার্দ্ধও বেশী পান নাই। রুশের সহিত সন্ধি করিয়া আপাততঃ কলহ বন্ধ হইল কিন্তু অর্দ্ধ সভ্য চতুর রুশ নিজ বল বৃদ্ধি ও অভীষ্ট সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ পাইল। যে জুলফিকর পাস্ (Zolfikar pass) লইয়া ইংরেজগণ এত হাঙ্গামা করিতেছিলেন, তাহা অবশ্য আফগানদিগের রহিল; কিন্তু পাঁজদের জন্য চীৎকার বৃথা হইল। রুশেরা জুলফিকর চাহে নাই। পাঁজদে (Panjdeh) লইয়াই গোল হইয়াছিল—সেই পাঁজদেই রুশিয়া পাইল। সীমা নির্ণয় কমিসনের (Boundary commission) ইতিহাস আমরা দুই এক কথায় পাঠকদিগকে বলিব। গত বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইল যে রুশেরা ক্রমাগত আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেণ্ট্ পিটর্সবর্গের বৃটিশ্ দূত রুস সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে রুশদিগের আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, কারণ যখন তাঁহারা মার্ভ (Merv) নগর অধিকার করেন, সেই সময় বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্টের নিকট মৃত সম্রাট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তিনি মধ্য আসিয়ায় আর ভারতের দিকে অগ্রসর হইবেন না। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আজ দুই ক্রোশ, কাল চারি ক্রোশ করিয়া রুশেরা প্রায় হাজার মাইল অগ্রসর হইয়াছেন। গ্লাড্‌ষ্টোন গবর্ণমেণ্ট যখন রুশের অগ্রসর হওয়ায় আপত্তি উত্থাপন করিলেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজের চক্ষে ধাঁদা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা এক কমিশন নিযুক্ত করিয়া আমাদের রাজ্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও—আমরা আর ভারতের দিকে অগ্রসর হইব না। ইংরাজ তথাস্তু বলিয়া সর পিটর লমস্‌ডেন্‌কে সীমা নির্ণয় কমিশন্ নিযুক্ত করিয়া লণ্ডন হইতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভারতবর্ষ হইতেও কতিপয় সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে পাঠান হইল। গত নবেম্বর মাসে রুশদিগের নিযুক্ত কমিসনর সর পিটরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া রুশের তরফ হইতে কেহই আসিল না। ইতি মধ্যে কতিপয় রুশ-সৈন্য লইয়া আলিখাঁনফ(Alikhanof)নামক একজন নিম্নতরসৈন্যাধ্যক্ষ পাঁজদের নিকট উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা আস্ফালন করিলেন যে এক পদ অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ হইবে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে ইংরেজেরা তাঁহাদের মিত্র কাবুলের আমির আবদুর রহমন খাঁর তরফ হইতে রুশের সহিত গণ্ডগোল করিতেছিলেন। ইহাও শুনাযায় যে ইংরেজেরা কাবুলিদিগকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন। পাঁজদের নিকট একটি ছোট খাট যুদ্ধ হইল। আফগানরা পরাস্ত—ইংরেজদের মুখহেঁট্। দুই পক্ষ হইতে কৈফিয়ত তলব হইল। আলিখাঁনফ (ইনিপূর্ব্বে মুসলমানছিলেন) ইংরেজদের দোষ দিতে লাগিল—সরপিটর লমস্‌ডেন্ আলিখাঁনফকে দোষী করিলেন। ইংরেজি সংবাদ পত্র লেখকেরা মহা লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। আমরা দূর হইতে মনে করিলাম

আলিখাঁনফের মাথাটা বা ইহারা হাতে কাটিয়া ফেলে। কিন্তু কথায় বলে যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না। বাস্তবিক আলি খাঁনফ দোষী—কিন্তু রুশের রাজাত আর ব্রহ্মরাজ থিবোর ন্যায় দুর্ব্বল নহেন সুতরাং আমাদের শাসন কর্ত্তারা এস্থলে আর বেশী কিছু করিতে পারিলেন না। লাভে হইতে সর পিটর লম্‌সডেন সকলের নিকট মিথ্যাবাদী হইলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আফগান লয় কৌশলে (Policy) কত গলদ আছে আগামী বারে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে সীমা নির্ণয় কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু এ সীমানিণয় ঠিক যেন ব্রাহ্মণের চোরধরার গল্পের মত। ব্রাহ্মণের বাড়ীর একদিকে আস্তাকুড়, অন্যদিকে ভাদ্র বধূকে দাঁড় করাইয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন—'কোন পথে যাবি—যা দেখি" ইংলণ্ড ও রুশের সীমা নির্ণয়ও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। দুইটা চারিটা থাম্ গাঁথিয়া সীমা নির্ণয় করিলে কি রুশেরা আর আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না? রুশ সংবাদ পত্রেরা এখন হইতেই বলিতেছে যে সীমা নির্ণয় করিয়া আমরা আমাদের রাজ্য ঠিক করিয়া লইলাম, কিন্তু আমাদের যখন ইচ্ছা হইবে আমরা আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হইব। আমাদেরও বিশ্বাস তাই। পাঁজদে পর্য্যন্ত রেল খুলিলেই রুশ পুনরায় ভারতের দিকে অগ্রসর হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমাদের লাভ এই যে আপাততঃ দুই বৎসর যুদ্ধাদি বন্ধ রহিল।

## বাঙ্গালার দুর্দ্দশা।

এই যুদ্ধ স্থগিদ হওয়ায়—ভারতবর্ষ আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু প্রকৃতির তাড়নে বঙ্গ দেশের এবৎসর দুর্দ্দশার সীমা নাই।

গৃহদাহ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও ঝড় এবৎসর বাঙ্গলা দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। গরিব বাঙ্গালীর এখন দুর্দ্দশার সীমা নাই। মেদ্‌নিপুর কটক, বালেশ্বর, কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান, বাঁকুরা, বীরভূম, চব্বিশ পরগণার অনেক গরিব প্রজারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—সহস্র সহস্র লোক অর্দ্ধানশনে দিনযাপন করিতেছে, আর কত সহস্র ব্যক্তি জঠরানলে দগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জলপ্লাবন পাড়িত ব্যক্তিদের আবার মাথা গুঁজিয়া থাকিবারও স্থান নাই। হায়! কবে এই নিঃসহায় গরিব প্রজারা অন্ততঃ একবেলা পেঠ ভরিয়া অহার করিতে পাইবে? রাজার উপর প্রজারা দুর্দ্দিনের সময় প্রাণ ধারণ জন্য নির্ভর করে—কিন্তু হুর্ভাগা বঙ্গবাসীর অদৃষ্টে তাহাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সহানুভূতি পর্য্যন্ত মিলেনা। যাঁহারা চক্ষে দেখিয়া দেখিবেন না—কর্ণে শুনিয়া শুনিবেন না—স্পর্শ করিয়া অনুভব করিবেন না, তাঁহাদিগের নিকট মঙ্গলের আশা আর কিরূপেই করিতে পারা যায়। সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীগণ দেখিতেছেন এক, লিখিতেছেন তাহার বিপরীত। আজ লিখিতেছেন তাঁহার জিলায় দুর্ভিক্ষ নাই—পাঁচদিন পরে স্বীকার করিতেছেন যে সামান্য অন্ন কষ্ট হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন জলপ্লাবনে প্রজাদের অতিশয় কষ্ট হইতেছে—দেশের মান্যগণ্য দেশী ও বিলাতি লোকেরা জানাইল যে চাঁদা তোলা আবশ্যক—সর্ রিভারস্ টমসন্ বলিলেন যে এখনও সময় হয় নাই—দারজিলিং

শৈলশিখরে বায়ুসেবন করিতে গেলেন—দুই দিবস পরে গেজেট হইল চাঁদা তোলা আবশ্যক—এক কমিটি নিযুক্ত হইল। এক মাসের অধিক দারজিলিংএ থাকিয়া কটক ভ্রমণে নির্গত হইলেন। এক মাসের অধিক হইবে ও প্রদেশের পাঁচশত গ্রাম ঝড়, ও জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে যাইয়া দরবার ও ভোজে দিনকাটাইলেন। পাঁচশত গ্রামের লোক সংখ্যা ২৬,০০০ ছিল, কিন্তু এক্ষণে মোট ৮০০০ লোকের ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গেশ্বর ২০০০০ টাকা এই গৃহশূন্য ও অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। গড়পড়তায় ২॥০ টাকা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি পাইবে। ২॥০ টাকার মধ্যে অন্ন ও ঘরের জোগাড় করিতে হইবে! বঙ্গেশ্বর অতিশয় দয়ার কার্য্যই করিতেছেন!! অথচ এই টাকা হইতে—সীমানির্ণয় কমিসন, রাওয়ালপিণ্ডি দরবার—রুশিয়ার সহিত যুদ্ধের বন্দবস্তইত্যাদিতে সাড়ে তিন ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।—কয়েক বৎসর হইল—লর্ডলিটন যখন গরীব প্রজাদিগের ঘাড়ে জোয়াল দিয়া লাইসেন্স ট্যাকস নামে একটা ট্যাক্‌স চালান তখন তিনি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা ছাড়া অন্য কিছুতে এই ট্যাক্সের একটি পয়সা ব্যয় করা হইবে না। কিন্তু এখন দুর্ভিক্ষ নিবারণী উক্ত ফণ্ডের সমস্ত টাকা ধ্বংস করিয়াও গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত নহেন, আবার ইহার উপর নূতন ব্যয়। সীমান্ত প্রদেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতেছে, দুর্গ নির্ম্মাণ হইবে, দেশীয় সৈন্য যাহা আছে তাহার উপর ২৫শ হাজার নূতন দেশীয় ও ব্রিটিস সৈন্য বৃদ্ধি করা হইবে—এই সকল আয়োজনে অন্যূন আড়াই ক্রোড় টাকা বৎসর বৎসর খরচ হইবে, এই ব্যয় সঙ্কুলন জন্য আবার গভর্ণমেণ্ট নূতন ট্যাক্‌স্ বসাইতে চান। গরীব ভারতবাসীর দুর্দ্দশার শেষ কোথায়?

এখন যদি আমরা দুর্ভিক্ষ নিবারণী ফণ্ডের কথা তুলি, তাহা হইলে পাইওনিয়ার বলিবে যে যখন এই টাকা লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করিয়া তুলিবার কথা ছিল তখন এমন কথা কখনই বলা হয় নাই যে এই টাকা অন্য কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না। কথাটি অতি ন্যায্য ও যুক্তিপূর্ণ বটে! দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য ট্যাক্স ধার্য্য হইল কিন্তু লর্ড লিটনের অন্যায় আফ্‌গান যুদ্ধে সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইল। সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ও বঙ্গেশ্বরের দুর্ভিক্ষ অস্বীকারের মর্ম্ম আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম। যদি বেশী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, স্বীকার করা যায় তাহা হইলেই ইহার নিবারণ জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়!!!

## পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন।

আমাদের এই নানারূপ দুঃখের কথা ইংলণ্ডে আন্দোলন করিবার জন্য দুই বৎসর হইতে চলিল—শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বিলাত গিয়াছেন। গত ২৩ শে নবেম্বর হইতে বিলাতে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই জানেন পার্লে-

মেণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত—রাজা, হাউস অব লর্ডস্, এবং হাউস অব্ কমন্স।

ইংলণ্ডের রাজবংশীয় পুরুষগণ—আর যত ডিউক, মারকুইস, আর্ল প্রভৃতি ইংলণ্ডের পিয়ার্শগণ, ২ জন আর্চ বিসপ, ২৪ জন বিসপ, এবং স্কটল্যাণ্ডের পিয়ার্সদের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ১৬ জন, আর আয়ারল্যাণ্ডের পিয়ার্শদের প্রতিনিধি স্বরূপ ২৮ জন পিয়ার্শ, হাউস অব্ লর্ডের সভ্য।

এ দেশে এখন মিউনিসিপ্যাল কমিসনর নির্ব্বাচনের জন্য যেরূপ অনেক প্রধান নগর ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত দেখা যায়—হাউস অব কমন্সের সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য সমুদায় ইংলণ্ড, ওয়েল্স, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, সেই সব খণ্ডের নির্ব্বাচকগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা নিয়মিত রূপে নির্ব্বাচিত হয়েন—তাঁহারা হাউস অব কমন্সের সভ্য। নামে যে যত বড় হউক না কেন, কাজে হাইস অব কমন্সের যত দূর ক্ষমতা, তত দূর কি রাজা কি হাউস অব লর্ডস কাহারো নাই। ৭ বৎসর অন্তর কিম্বা বিশেষ কারণে কখনো কখনো তাহার অগ্রেও এক পার্লেমেণ্টের কাল শেষ হইয়া নূতন পার্লেমেণ্ট বসে। এই নূতন পার্লেমেণ্ট বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হাউস অব কমন্সের নূতন নির্ব্বাচন হয়। এক মাস পরেই পার্লেমেণ্টের এইরূপ একটি নূতন অধিবেশন কাল আরম্ভ হইবে, তাই কিছুদিন হইতে সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচন (General election) চলিয়াছে। লালমোহন বাবু পার্লেমেণ্টের একজন সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে আজকাল মহাধুম, বক্তৃতায় উচ্ছন্ন হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্কুলের বালকেরা সেখানে বক্তৃতাহল পূর্ণ করে না। মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিকদিগের, বিশেষতঃ দুই দলের গোঁড়াদের আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়। প্রধান প্রধান গোঁড়াদের ল্যাজও একটু মোটা হয়; কেন না উমেদারগণ (Candidates) উহাদের মুরব্বি ধরে ও বিশেষরূপ খোসামোদও করে। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান হইতে সামান্য লোকদিগের পর্য্যন্ত উৎসাহের ও ব্যস্ততার সীমা থাকে না। শত সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া—স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া দূরদেশ হইতে তাহারা ভোট দিতে আসে। বাঙ্গালি! তুমি যতদিন না স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে ততদিন তোমার রাজনীতিজ্ঞ (Politician) হওয়ার আশা কেবল দুরাশা মাত্র। ইংরাজদের নিকট হইতে মদ্য ও গরু খাইতে শিখিয়াছ, তাহাদের হ্যাট কোট চাল চলন ও বাহ্যিক টুকু অনুকরণ করিয়াছ। কিন্তু বলিতে চক্ষে জল আসে—আবার না বলিলেও নয়—উহাদের সার পদার্থ টুকুর অনুকরণ করিতে কয়জন চেষ্টা করিতেছ? তাই বলি যত দিন না ইংরেজের দেশ হিতৈষিতা ও নিঃস্বার্থপরতা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, ততদিন তোমার Political improvement, Patriotism, ও National progress কেবল জল

বুদবুদের ন্যায় স্থায়ী হইবে। তাই বলিতে আহ্লাদ হইতেছে সম্প্রতি তিন-জন ভারতবাসী স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন। তাঁহারা তথাকার সভ্য নির্ব্বাচকদিগকে ভারতের দুঃখ কাহিনী সমূহ জানাইয়া অনুরোধ করিতেছেন যে যে উমেদারগণ ভারতবর্ষের বন্ধু, ভারত সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত, তাঁহাদিগকেই সভ্য নির্ব্বাচন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই তিন মহোদয়ের নাম,—১ মনোমোহন ঘোষ, ২ রামেশ্বর মুদিলিয়ার ৩ চন্দ্রভাকর। ইঁহারা সপ্তাহে তিন চারিবার নির্ব্বাচক (Electors)দিগকে স্থানে স্থানে ভারতের দুঃখ কাহিনী ও অভাব জানাইয়া তাহাদের এরূপ সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন যে ভারতদ্বেষী লেথব্রিজ ও ম্যাকলিনও ইহাঁদের খোসামোদ ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভারত সচীব লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ চার্চ্চহিল (RandolphChurchill) ইহাঁদের মতামত ও অভিপ্রায় অতি যত্ন ও মনোযোগের সহিত শুনিয়া খুব আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব লণ্ডনে আসিলে ইহাঁদের সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন নগর ও উপনগরের নির্ব্বাচকেরা ইহাঁদের ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করিতেছেন। নির্ব্বাচনের সময় এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল উমেদারগণ (Candidates) ভারতের বন্ধু তাহাদিগের নির্ব্বাচন জন্য ইহাঁরা বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতবন্ধু হিউম্ (A. O. Hume) ইহাঁদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ভারতের তিন জন প্রতিনিধি যেরূপ সর্ব্বত্রে সম্মানিত ও আদৃত হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন্ ভারতবাসীর না হৃদয় পুলকিত হয়? Anglo Indian দের নিকট হইতে আমাদের অভাব দূরীকরণের কোন উপায় নাই। সহৃদয়, নিঃস্বার্থপর ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ ভিন্ন আমাদের এখন অন্য আশা নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৭ সালের Proclamation ই আমাদের Magna charta। যে পর্য্যন্ত না এই Proclamation অনুযায়িক কার্য্য চলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কোন উন্নতির আশা নাই। যে Anglo Indian গণ নিজের মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাপত্র ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে (waste paper Basket) ফেলিয়া দিতে চায়, তাহাদিগের নিকট আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা কেবল ডাইনের হাতে ছেলে সমর্পণ করার ন্যায় হইবে।

লালমোহন বাবু ডেপ্‌টফোর্ডে লিবারেল বা র‍্যাডিক্যাল উমেদার মনোনীত হইয়াছিলেন—তাঁহার মহাসভায় নির্ব্বাচিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এতদূর হইয়াও অবশেষে আমাদিগের আশা নিষ্ফল হইল—তারে সংবাদ আসিয়াছে যে তিনি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। বাবু নন্দলাল ঘোষ কোন স্থানের লিবারেল উমে-

দার হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি সমর-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছেন—আমাদের মতে খুব ভালই করিয়াছেন। ভারতবন্ধু সিমর কি, ডিগবি, উইলফ্রেড ব্লণ্ট, সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল, জজ ফিয়ার ইত্যাদি মহোদয়গণ ভারত সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া লইয়া মহাসভায় বিশেষ আন্দোলন করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। যদি আমরা নিতান্ত দুর্ভাগা হই তবেই সকল আশা ভরসা বৃথা হইবে।

## ভূপালের বেগম অবমানিত।

কি কুক্ষণেই মনুষ্য ভারতে জন্ম গ্রহণ করে। যে ভূপালের বেগম ইংরাজের এত বন্ধু, যে বেগম সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরাজের এত সাহায্য করিয়াছিল—যে বেগম (অল্প কথায়) ইংরাজের এত খয়ের খাঁ (প্রিয়) সেই বেগমের কন্যা (এখনকার বেগম) আজ কি না সর্ব্ব সমক্ষে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন।

বেগমের স্বামী নবাব সাদিক হোসেন খাঁ বাহাদুর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নবাব ও খাঁ বাহাদুর খেতাব চ্যুত। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে কামান আওয়াজ হইত, তাহাও বন্ধ হইল। তিনি যদি তাঁহার স্ত্রীর রাজকার্য্যে একটুও হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে পুনরায় গুরুতর শাস্তি ভোগ করিবেন। তাঁহার দোষ যতদূর জানা যায় তাহা এইঃ—১। নবাব সাহেব একজন গোঁড়া ওয়াহাবি (wahabee), ২। তিনি নিজ মনোমত লোক রাজ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৩। প্রজা পুঞ্জের উপর অত্যাচার। ৪। পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য। ৫। পলিটিক্যাল এজেণ্টের সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক ইহার মধ্যে কোনটি গুরুতর দোষ। প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার বাস্তবিক দোষের কথা, কিন্তু প্রজাপুঞ্জেরা এ বিষয় কোন আবেদনও করে নাই এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও অত্যাচারের কোন বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার প্রধান দোষ এই যে তিনি অর্থ-লোলুপ পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন ও তাঁহাদের উপায়ের পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে নবাবের বিশেষ কোন দোষই প্রমাণ হয় নাই। বন্ধু ও করদ রাজ্যের প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের শ্রদ্ধা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িবে।

## বর্ম্মা যুদ্ধ।

"জোর যার মুল্লুক তার"। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও যদি বল দ্বারা সভ্য জাতি দুর্ব্বল প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে দুর্ব্বলের প্রাণ বাঁচান দায় হইয়া উঠিবে। ইংরাজদের অযথা বর্ম্মা আক্রমণ দেখিয়া আমাদের ছেলেবেলার বাঘ ও মেষ শাবকের গল্প মনে পড়িয়া গেল। বাঘ যেমন বিনা কারণে মেষ শাবককে জল ঘোলা করার অপরাধে বধ করিয়াছিল, ইংরাজও বোম্বে ট্রেডিং কোম্পানির উপর বর্ম্মা অত্যাচার করিয়াছে এই ভান করিয়া ব্রহ্ম রাজ্য হস্তগত করিতেছে। যদি অতি সভ্যতার এই ফল হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে যেন আর সভ্যতা বৃদ্ধি না হয়। ব্রহ্ম রাজা থিব তিন মাসের সময় চাহিলেন, ঝগড়া মিটাইবার জন্য সালিসি মানিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কিছুতেই মন উঠিল না। কিরূপেই

বা মন উঠে। একদিকে রাজ্যলাভের আশা, অন্যদিকে ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের চীৎকার, তাহার উপর রুস যুদ্ধ না হওয়ায় কতকগুলা মিলিটারির সহজে খেতাব-লাভের উপায় দেখিয়া অতি ব্যগ্রতা প্রকাশ ও কুপরামর্শ প্রদান—এই সকল কারণে লর্ড ডফরিনের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন বিনা আয়াসে একটি দুর্ব্বল রাজ্যকে হস্তগত করিয়া যোদ্ধা ও পলিটিসিয়ান বলিয়া নাম লইবেন; এদিকে বিলাতের প্রধান সংবাদ পত্র টাইমস্ লম্বা লম্বা বর্ম্মা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতারণা করিতে লাগিলেন। লর্ড ডফরিন দেখিলেন অধিকাংশ ইংরেজই তাঁহার পোষকতা করিবেন, তখন কি আর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন? যুদ্ধের আপাতত কারণ এই বম্বের ইংরাজ ট্রেডিং কোম্পানি ব্রহ্ম রাজের অধিকার হইতে কাষ্ঠ আনিয়া বাণিজ্য করে। রাজা থিবো উক্ত বম্বাবোম্বেট্রেডিং কোম্পানির নিকট হইতে ২৩ হাজার কাষ্ঠের মাশুল বাকি করিতেছেন—ট্রেডিং কোম্পানি তাহা অস্বীকার করিতেছেন। ট্রেডিং কোম্পানির বাক্যই আমাদের গবর্ণমেণ্ট যুধিষ্ঠিরের বাক্য জ্ঞান করিয়া ন্যায়ের মাথায় লাথি মারিয়া একজন দুর্ব্বল স্বাধীন রাজার রাজ্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন। যুদ্ধের ভিতরকার কারণ লণ্ডন টাইম্‌স্ গোপন করিতে পারে নাই। বর্ম্মা ইংরাজাধিকৃত হইবে মনে করিয়া সম্পাদকের এত হৃদয়োচ্ছাস হইয়াছিল যে সেই উল্লাসে মনের কথা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। টাইমস্ বলেন যে ইংলণ্ডের ব্যবসার হ্রাস হইতেছে—লক্ষাধিক ইংরেজমজুর কর্ম্মাভাবে অর্দ্ধানশনে কালাতিপাত করিতেছে—যে দিকে তাকান যায়, সেইদিকেই ব্যবসার হ্রাস। ব্যবসায়ীগণ শুষ্ক-মুখে উপায় উদ্ভাবন চেষ্টায় কালাতিপাত করিতেছেন। বর্ম্মা ইংরাজের হইলে সমস্ত ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ চীন এবং তিব্বত পর্য্যন্ত ব্যবসা চলিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে স্বার্থপর ইংরেজদিগের আর্থিক লাভের জন্য একটি দুর্ব্বল রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইল।

## কাশ্মীরের নূতন বন্দবস্ত।

কাশ্মীরেরও অবস্থা বড় ভাল নয়। অল্প দিন হইল কাশ্মীরের বৃদ্ধ নরপতি রণবীরসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ তথাকার রাজা হইয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বাড়াইবার উপায় করিয়াছেন। অন্য অন্য স্বাধীন রাজাদের রাজ্যে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি বারমাস বাস করেন এবং তাঁহারাই রাজার উপর রাজত্ব করেন। কাশ্মীরে এতদিন সেরূপ ছিল না। বৎসরের মধ্যে কেবল মাস কয়েকের জন্য একজন প্রতিনিধি সেখানে থাকিতেন। এখন অবধি তিনি বারমাস সেখানে থাকিবেন, এবং তাঁহার পদ ও ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইল; তিনিই কাশ্মীরের এক রকম প্রধান রাজা হইলেন।

## লর্ড ডফরিনের রাজপুতানা ভ্রমণ।

আজমীর, জয়পুর, উদয়পুর, আল্‌ওয়ার, যোধপুর, ইন্দোর ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়া লর্ড ডফরিন খুব সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আমরা যখনই রাজপুতানার কোন পুরাতন নগর বা দুর্গের কথা মনে করি, তখনই চক্ষে দুই এক ফোঁটা জলের আবির্ভাব হয়। জয়পুরের পুরাতন ভগ্ন রাজধানী অম্বর ও চিতোর দেখিয়া বা তাহাদের নাম শুনিয়া কোন্ আর্য্য সন্তানের না পূর্ব্বস্মৃতি মানস-পটে উদয় হইয়া চক্ষে জল লইয়া আসে? লর্ড ডফরিন খুব সন্তোষলাভ করিলেন বটে কিন্তু যে যে রাজ্য তিনি দর্শন করিয়াছেন তাহার রাজাকে দেউলিয়া করিয়া আসিয়াছেন।

## সরভিয়া ও বলগেরিয়ার যুদ্ধ।

সরভিয়ার রাজা মিলান্ বলগেরিয়ান-দিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়া বল-গেরিয়া আক্রমণ করিয়াছেন, প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে সরভিয়ানরা জয়ী হইয়াছিল, কিন্তু সিনডিনজা ও ড্রাগোমান পাসের যুদ্ধে বল-গেরিয়ানরা জয়ী হইয়াছে। বলগেরিয়া রাজা আলেকজন্দর এখন স্বয়ং সেনাপতির ভার লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘোর বিক্রম ও অসমসাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে-ছেন। সরভিয়া (Servia and Bulgaria) ও বলগেরিয়া দুইটিই ক্ষুদ্র রাজ্য—কিন্তু এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে বলা যায় না। কারণ দুই পক্ষই ১৮৭৭ সালের বর্লিন সন্ধির দোহাই দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। আ-লেক্‌জণ্ডর প্রথমে রুমেলিয়া আক্রমণ করি-বার জন্য তুরস্কের সুলতানের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি সর-ভিয়ানদের দ্বারা পীড়িত হইয়া সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দেখা যাউক শেষে কি হয়। শ্রীপলিটিসান।

---

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পৌত্তলিককে।—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত কর্ত্তৃক বিবৃত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা কতদূর আমোদ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিজদাস বাবু তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ আসাধারণ উদারতা দেখা-ইয়াছেন তাহাতে আমাদের হৃদয়ও বিস্ফা-রিত হইয়া উঠিল। সচরাচর ব্রাহ্ম ভ্রাতা-দিগের মধ্যে এইরূপ একটি ভাব দেখা যায়—যেন পৌত্তলিক হইলেই স্বর্গ রাজ্যের দ্বার তাহার প্রতি বন্ধ হইয়া গেল, তাহারা যেন কৃপাপাত্র অতি দীন।

কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মগ্রাহী দ্বিজদাস বাবু বোধ করি তাঁহাদের এই ভুলটি ভাঙ্গা-ইয়া দিতে পারক হইবেন।

তাঁর মতে, বাস্তবিক আমরা পৌত্তলিক নই কে? ঈশ্বরকে পূর্ণ আয়ত্ত করা যখন আমা-দের সম্ভব নহে, তখন আমাদের কোন না কোন চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে হইবে—সেই জন্য কেহবা আমরা ভাষা-চিহ্ন যেমন পরমাত্মা ইত্যাদি, কেহবা মূর্ত্তি চিহ্নদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। সুতরাং এই ইতর বিশেষ টুক লইয়া এত গোলযোগ কেন? ইচ্ছা হইতেছে তাঁহার পুস্তক হইতে কিছু কিছু এখানে উঠাইয়া দিই, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ তাহা পারিলাম না।

বাস্তবিক পৌত্তলিকতা নামেই দুষ্য এমন একটা যে কিছু নাই তাহার তিনি সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন—তিনি বলি-তেছেন—"সে কেবল দলাদলির মূল মন্ত্র মাত্র। সার কথা এই সরল বিশ্বাসে চালিত হইয়া যে যাহা করে তাহাতেই তাহার ধর্ম্ম সাধনা হয়"।

শেষোক্ত কথাটিতে আমাদের একটু গোলযোগ বাধিয়াছে। তিনি যাহা বলিয়া-ছেন উহা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। জ্ঞান, ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ, জ্ঞানকে ছাড়িয়া যে বিশ্বাসগঠিত হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে সকলস্থলে ধর্ম্ম সাধনার উপযোগী হয় না। পূর্ণ অনন্ত সত্য মঙ্গলকে চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের যেমন প্রসা-রতা লাভ হয়, যে ধ্যান কেবল মূর্ত্তি চিন্তাতেই মাত্র সমাধান সে খানে তাহা হয় না, সুত-রাং জ্ঞান স্ফূর্ত্তির অভাব হেতু অনেকস্থলে সরল বিশ্বাস কেবল একটি কুসংস্কারে পরি-ণত হইয়া ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে প্রকৃত ব্যা-ঘাত জন্মাইতে পারে।

# বিজ্ঞাপন।

# মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে, মহারাজা নন্দকুমার একজন অতিশয় মাননীয়, বিত্তসম্পন্ন, ও ক্ষমতাশালী বাঙ্গালী ছিলেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় ইংরাজেরা তাঁহার নিকট নানাকারণে বাধ্য ছিলেন। দেশের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, অথচ তিনি বাঙ্গালী সমাজের একজন মুখপাত্র ছিলেন, ও সকলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। জমীদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে ছোট বড় সকলেই কোন না কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ক্লাইব, ভান্ সিটার্ট, কার্টিয়ার প্রভৃতি সমস্ত গবর্ণর গণই, মহারাজা নন্দকুমারের সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত ছিলেন ; ও তাঁহারা সকলেই, তাঁহার কূটবুদ্ধি কার্য্য-কুশলতা, ও অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এমন কি ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন বাঙ্গলার গবর্ণরী প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কার্য্যোদ্ধার মানসে প্রকাশ্য রূপে মহারাজা নন্দ কুমারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কূটবুদ্ধি, সুচতুর মহম্মদ রেজা খাঁর কুটিল চক্রের ভিতর প্রবেশ করিতে হেষ্টিংস শত চেষ্টায়ও অক্ষম হইয়া ছিলেন, কিন্তু নন্দকুমার স্বীয় অভিজ্ঞতাবলে স্বল্প চেষ্টাতেই তাঁহাকে সে কুটিল চক্র মধ্যে পথ দেখাইয়া দেন। এমন কি তৎকালীন দিল্লীশ্বরও আবশ্যক মতে তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ লইতেন। তিনি নন্দকুমারের উপর এতদুর সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁহার সহিত পরিচয়ের স্বল্পকাল পরেই তিনি নন্দকুমারকে "মহারাজ বাহাদুর" এই উপাধি, এক সম্মান সূচক পরিচ্ছদ ও একখানি বাদসাহী সনন্দ দ্বারা সম্মানিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তৎকালীন এতাদৃশ মাননীয় ও ক্ষমতাশালী বাঙ্গালীর জীবনের ঘটনাবলী প্রকৃত রূপে বিকশিত হয় নাই। স্বজাতিপ্রিয় ইংরাজ-লেখকদিগের পক্ষপাত-দূষিত-লেখনী দ্বারা, ইহা অত্যন্ত বিকৃত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মেকলে আবার সেই বিকৃত উপকরণ সহায়ে, নন্দকুমারের চরিত্রকে আরও অধিকতররূপে বিকৃত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। আবার এইরূপ করিয়াই তিনি যে ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, এই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে অযথা গালিবর্ষণ ও তাহাদের সাধারণ চরিত্রে গভীর কালিমা ক্ষেপণ করিয়া তিনি মনের জ্বালা মিটাইয়াছেন। হৃদয়-বান বাঙ্গালী আজও সেই গালাগালি গুলি পড়িতে পড়িতে লজ্জিত ও ব্যথিত হন। বস্তুতঃ মেকলে প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ নন্দকুমারের চরিত্র যে প্রকার চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই

কি [illegible]? না ইহা স্বজাতি প্রেমের, [illegible]তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত? সত্য [illegible]আমাদের শেষোক্ত অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক দিগের স্বজাতি প্রেম, স্বজাতি গুণ বর্ণনার ও প্রচুর এক দেশ দর্শিতার—প্রতি শত শত ধন্যবাদ! তাঁহারা যে স্বজাতীয় দুই তিন জন প্রকৃত দোষীর চরিত্র রক্ষণ করিতে গিয়া—একজন নির্দ্দোষী বিদেশীয় ব্যক্তির চরিত্রে অযথা কালিমা ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহা সদ্বিবেচক ও পক্ষপাত শূন্য ব্যক্তিগণের নিকট কখনই অপ্রকাশ্য থাকিবে না। একদিন না এক-দিন স্বজাতিপ্রিয়, স্বদেশপ্রিয় বাঙ্গালীর অশেষ যত্নে, নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র জগতের সমক্ষে সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুট হইবে।

স্বজাতি-প্রেম-উদ্বেলিত-হৃদয়ে, ইংরেজের মত আমরা নন্দকুমার যে একবারে সর্ব্বদোষ পরিশূন্য ছিলেন, একথা বলিতে চাহিনা। প্রলোভনময় জগতে খুব অল্প সংখ্যক মনুষ্যই নির্দ্দোষ চরিত্র হইতে পারে। ইংরাজের সহিত মিশিতে গিয়া, তাহাদের শঠতার প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া, দুই একবার কয়েকটী অন্যায় কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহাও আমরা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া সত্যকথা বলিতে গেলে এই মাত্র বলিতে হয় যে, যদ্যপি তিনি (নন্দকুমার) কৌন্সিলে হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষ সদস্যগণের সম্মুখে বর্দ্ধমানের মহারাণী ও মণি বেগম প্রভৃতির হইয়া হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ গুলি উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কোন দোষই ইতিহাসে স্থান পাইত না; ও ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ সুখ্যাতিতে তাঁহাকে ছাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সেই সমস্ত অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করাইতে কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন। হেষ্টিংস প্রথমতঃ নন্দকুমারকে বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু এখন তাঁহার মনে এই দৃঢ় ধারণা হইল, যে নন্দকুমার কোন মতেই উপেক্ষনীয় শত্রু নহেন। নন্দকুমারকে নরলোক হইতে অপসৃত না করিতে পারিলে নিষ্কণ্টকে ও অক্ষত সম্মানের সহিত ভারতে শাসন দণ্ড চালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে দুরূহ হইয়া উঠিবে, ইহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল। অন্য উপায় না দেখিয়া, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া নন্দকুমার—উচ্ছেদ—ব্রতে ব্রতী হইলেন। উন্মুক্ত নয়নে আশাপূর্ণ মনে, একবার সুপ্রীম কোর্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার নিরাশার ঘোরান্ধকারাবৃত মনে, আশার তীক্ষ্ণ-মধুর-ছটা প্রতিভাত হইল, তাঁহার বাল্য সুহৃৎ, সমপাঠী, সোদর প্রতিম, ইম্পি তখন বাঙ্গালার ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান কর্ত্তা, ও সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন; হেষ্টিংস ভাবিলেন একবার নন্দকুমারকে ইম্পির চত্বরে আনিতে পারিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। তিনি সুহৃৎগণের সহিত, নন্দকুমারের বিপক্ষগণের সহিত দিবা-রাত্র মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন! শীঘ্রই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপক্রম হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের অগ্রে Mayor's Court নামে এক বিচারালয়ে কোম্পানীর প্রজাগণের বিচারাদি সম্পন্ন হইত। এই মেয়র কোর্টে কলিকাতার প্রেসিডেন্টের বা গবর্ণরের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গবর্ণর সাহেব মেয়র কোর্টের সভাপতি ছিলেন, ও তাঁহার বিচারই শেষ ও সম্পূর্ণ বিচার বলিয়া এদেশে বিবেচিত হইত। হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের বিবাদ ঘটিবার বহু পূর্ব্বে এই মেয়র কোর্টে মহারাজা নন্দকুমারের নামে, বালাকীদাস নামক একজন মহাজনের পরিত্যক্ত বিষয়ের তত্বাবধারক মোহন প্রসাদ নামধেয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক জাল করার অভিযোগে একটী মোকর্দ্দামা উপস্থিত হয়। তখন কোন বিশেষ কারণে নন্দকুমারকে কোম্পানির কার্য্যে প্রয়োজন হওয়াতে ও তৎকৃত অপরাধ সম্যক সত্য বলিয়া প্রমাণ না হওয়াতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়; কিন্তু কাগজ পত্র সেই মেয়র কোর্টেই থাকে। এ সমস্ত খবর হেষ্টিংস আগাগোড়াই জানিতেন, তিনি নিজেই মেয়র কোর্টের সভাপতি ছিলেন, মোহনপ্রসাদও তখন জীবিত—তাঁহার বিশেষ অনুগত—এবং নন্দকুমারের ভয়ানক শত্রু; সুতরাং হেষ্টিংস চক্রান্ত করিয়া মোহনপ্রসাদকে ফরিয়াদি খাড়া করাইলেন। মেয়র কোর্টের সেই পুরাতন মোকর্দ্দামাটী আবার নূতন করিয়া তুলিয়া নূতন বিচারক গণের সম্মুখে ধরা হইল। কর্ম্মবাড়ীর প্রধান ব্যক্তি হেষ্টিংসের প্রধান সহায়, সুতরাং সে বহুকালের পুরাতন মোকর্দ্দামাটী অচিরেই বিচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইল। নন্দকুমার, দৈব প্রতিকূলতায়, ভীষণ চক্রান্তে জড়িত হইয়া জাল অপরাধে পুনরায় অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন, ও এই অতর্কিত বিপৎ-পাতে তাঁহার মস্তকে বজ্রপতিত হইল। *

---

* মহারাজা নন্দকুমার কি অপরাধে ও কোন ঘটনাবশে জালিয়াত বলিয়া অভিযুক্ত হন, তাহা জানিতে পাঠক বর্গের কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। এ সমস্ত বিষয় আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য না হইলেও, সেই কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য দুই চারিটি কথা তৎসম্বন্ধে বলিব।

নন্দকুমারের সমকালবর্ত্তী বালাকীদাস নামক এক শ্রেষ্ঠীর মুঙ্গের, মুরশিদাবাদ, কলিকাতা, ও বঙ্গদেশের অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে কয়েকটী কুঠী ছিল। বালাকীদাস একজন বিখ্যাত রত্নবণিক ছিলেন। রত্নাদি ক্রয় বিক্রয়, ও অর্থাদি কর্জ্জ দেওয়াই বালাকীদাসের কার্য্য ছিল। বালাকীদাস একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন, ও কোম্পানীর সহিতও তাহার কারবারাদি চলিত। মহারাজ নন্দকুমার বালাকীদাসের নিকট কয়েকটী হীরক অঙ্গুরীয় ও অন্যান্য কয়েকখানি বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ৪৮০২১।

এই ঘটনার স্বল্পকাল পরেই নবাব মীর মহম্মদ কাশেম আলিখাঁর সহিত ইংরাজদের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। মীরকাশেম ধাবমান ইংরেজ সৈন্য দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। ইংরেজ সৈনিকেরা লুণ্ঠিতরাজ করিতে আরম্ভ করিল। এই সঙ্গে সঙ্গে বালাকী দাসের বাটীও লুণ্ঠিত হয়।

কিয়ৎকাল পরে কলিকাতায় নন্দকুমারের সহিত বালাকীদাসের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি কথা প্রসঙ্গে সেই অলঙ্কারগুলি প্র-

এই ব্যাপার লইয়া তখন কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; ইম্পি প্রমুখ জজেরা ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে নন্দকুমারকে ভয়ানক দোষে দোষী বিবেচনা করিয়া, পাছে তিনি পলাতক হন, ও তাঁহাদের বিচার কার্য্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে কলিকাতার তদানীন্তন সেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেবকে এক শীলমোহরযুক্ত পরওয়ানা প্রেরণ করিলেন।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে তিনি (নন্দকুমার) কৌন্সিলের মেম্বরগণের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, ও একমাস পরেই ৬ই মে তারিখে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া, জজেদের আজ্ঞায় কারা-নিক্ষিপ্ত হয়েন। জজেরা উক্তদিবস কলিকাতার সেরিফকে এই মর্ম্মে এক পরোয়ানা প্রদান করেন, যে "আপনি এই পরোয়ানা প্রাপ্তিমাত্র, মহারাজা নন্দ-

ত্যর্পণ করিতে বলিলেন। বালাকীদাস "নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আপনার অলঙ্কারগুলিও লুণ্ঠিত হইয়াছে" এই উত্তর প্রদান করেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে তিনি তাঁহাকে একখানি অঙ্গীকার পত্র দিবেন। অঙ্গীকার পত্রও নিয়মিত সময়ে দেওয়া হয়, ও তাহাতে লেখা থাকে—যে "আমি আপনার নিকট ৪৮০২১ টাকার জন্য দায়িক রহিলাম, যতদিন না টাকা দিতে পারিব, ততদিন ফিঃ শতে, চারি আনা করিয়া সুদ দিব। আমার কোম্পানীর নিকট যে দেড়লক্ষ টাকা পাওনা আছে, তাহা পাইলেই আমি আপনার টাকা শোধ করিয়া দিব ও আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি নালিশ করিয়া এই অঙ্গীকার পত্র দেখাইয়া, আমার ও আমার উত্তরাধিকারী-

কুমারকে সাধারণ কারাগারে আবদ্ধ করিতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিবেন না। মোহন প্রসাদ ও কমল উদ্দিন খাঁ নামক দুই ব্যক্তির এজাহারে, তাঁহার জাল করা সম্বন্ধে কতকাংশে প্রমাণ পাইয়া মোকর্দ্দামার সম্পূর্ণ বিচারজন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে আমরা আজ্ঞা প্রদান করিলাম"।

জজেরা যখন এই পরোয়ানা সহী করিয়া পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময়ে Jarret নামক এক জন বিখ্যাত এটর্ণি, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নন্দকুমারের পক্ষে জজেদের দুই চারিটী কথা বলেন। জ্যারেট সাহেব বলেন যে, "মহারাজ নন্দকুমার একজন বিশিষ্ট ও উচ্চবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ; সাধারণ কারাগারে সাধারণ অপরাধীর সহিত থাকিতে হইলে তাঁহার জাতিপাত হইবার সম্ভাবনা। বিচারে মুক্তিলাভ করি-

গণের নিকট টাকা আদায় করিতে পারিবেন।"

ইহার পর হঠাৎ বালাকীদাসের মৃত্যু হয়। তাহার পোষ্যপুত্রগণের তত্ত্বাবধারক (Executor) রূপে, (তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া) মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। এই মোহনপ্রসাদের সহিত নন্দকুমারের ঘোর শত্রুতা ছিল। এই ব্যক্তিই মেয়র কোর্টে নন্দকুমারের পূর্ব্বোল্লিখিত অঙ্গীকার পত্র খানি জাল বলিয়া অভিযোগ করে। উক্ত অঙ্গীকার পত্রে, বালাকীদাসের ও কমল উদ্দিন আলিখাঁর যে মোহর আছে, তাহা প্রকৃত নহে, জাল মাত্র—ইহাই মোহন প্রসাদের অভিযোগের বিষয়। এ মোকর্দ্দমা-ফল আমরা উপরে বলিয়াছি ও ইহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

লেও তিনি সমাজে বোধহয় স্থান প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব আপনারা তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অন্য-স্থানে আবদ্ধ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন।" তিনি নিজ প্রস্তাবের সমর্থনার্থ অনেক যুক্তিও দেখাইলেন, কিন্তু তাঁহার ও নন্দকুমারের দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রধান জজ ইম্পি হুকুম দিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অবশিষ্ট তিনজন জজ স্থির করিলেন, যে ইম্পির বাটীতে গিয়া সন্ধ্যার সময় এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া সংবাদ পাঠাইবেন। নিয়মিত সময়ে সংবাদ আসিল, তাহাতে কিছু ফল হইল না। জজেদের পূর্ব্ব আজ্ঞাই বাহাল হইল, ও নন্দকুমারও সেই সঙ্গে সঙ্গে কারাপ্রেরিত হইলেন। †

কেবল মহারাজা নন্দকুমার যে এই অতর্কিত বিপৎ পাতে এতদুর চমকিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। সমস্ত কলিকাতাতে এই সমস্ত বিষয় লইয়া হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ও রাজোপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণ কারাগৃহে প্রেরিত হওয়াতে অনেকে অনেকরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কেহবা কোম্পানির অন্যায় অত্যাচারের বিষয়, আবার কেহবা তাঁহার শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিলেন। কলিকাতাবাসী হিন্দু সম্প্রদায় নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। নন্দকুমারের পরিবারবর্গ মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই ব্যথিতচিত্তে বিমর্ষ মুখে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সান্ত্বনা-সূচক পত্র আসিতে লাগিল ‡ সকলেই উৎসুক চিত্তে বিচারের ফল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার কেহবা নিজে আসিয়া বা লোক পাঠাইয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কুমার গুরু দাস, রায় রাধাচরণ (নন্দকুমারের জামাতা) Fwoke সাহেব ও তাঁহার পুত্র ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ অনেক রাত্রি

---

† Mr Jarret said—'Moharajah Nundo kumar was a person of very high rank of the caste of Brahmins, and that he would be defiled if placed in a common goal."

জজেরা ইহার উত্তরে বলেন—

Upon consultation with Lord Chief Justice, we are all clearly of opinion, that the Sheriff ought to confine his person, in the common goal upon this occasion.

Vide,-Full proceedings for the Trials of Moharajah Nundcomer for forgery and conspiracy. London Printed for T. Cadell. Pub. by authority of the Supreme court.

‡ যাঁহারা সান্ত্বনাসূচক পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে General clavering, Philip Francis, Lady Anne Monson (মন্সন সাহেবের পত্নী) Joshep Fowke, মহারাজা নবকৃষ্ণ, কাশীনাথ বাবু ও অন্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত কলিকাতাবাসী ছিলেন। Francis ও clavering এক দিন কারা গৃহে তাঁহাকে দেখিতে গিয়া ছিলেন।

পর্য্যন্ত কারাগারে নন্দকুমারের নিকট বসিয়া রহিলেন। নানাবিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। সকলেরই মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত; সকলেরই মুখ ঘোরতর বিষাদ কালিমায় অঙ্কিত। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাঁহারা সকলেই বিদায় লইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। নন্দকুমার সেই সময়ে স্থির গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বৎস গুরুদাস! হেষ্টিং-স্ই যে চক্রের মূল, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি; কিন্তু আমার যে এতদূর ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম না। সাধারণ কারাগার হইতে উদ্ধার কামনায় কত লোক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আজ আমার সেই কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইল; সকলই অদৃষ্ট লিপি, তোমরা আমার জন্য ভাবিও না, পরমেশ্বর আমায় রক্ষা করিবেন।"

এইরূপে প্রথম রজনী কাটিয়া গেল, প্রথম রাত্রির গভীরাবস্থায় অনেকেই কারা-গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়া ছিলেন, আবার প্রভাত না হইতে হইতেই তাঁহারা সকলে কারাগৃহে আসিয়া দেখা দিলেন। দ্বারে বেলা বৃদ্ধির সহিত অত্যন্ত জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও ভিক্ষুক,সকলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে সমুৎসুক, কিন্তু তাহাদের সকলের কামনা পূর্ণ হইল না, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই গৃহ প্রবেশ করিতে পাইল না। মহারাজ নন্দকুমার সমস্তই আদ্যোপান্ত শুনিলেন, কিন্তু স্বীয় অক্ষমতা, শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া মনের ভাব সংবরণ করিলেন।

এই অসম্ভাবিত বিপৎপাতে যদিও তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিলমাত্র সময়ের জন্য সাহস বিচ্যুত ও ধীরতা বর্জ্জিত হন নাই। অবরোধের প্রথম দিন হইতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কালের জন্য তিনি অদমনীয় সাহস, অতুলনীয় ধী-রতা, ও স্বাভাবিক প্রসন্নতার বলে, শত্রুরও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেলাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রে মহা-রাজা নন্দকুমার জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করেন নাই, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া তিনি ম্লেচ্ছাদি নানাজাতি পরিপূর্ণ স্থানে, আহারাদি ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। গত রাত্রে এক এক সময় যাতনাময় পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে, হৃদয়ে বিজা-তীয় যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি, ইষ্ট দেবতায় মন গভীর নিবিষ্ট করিয়া, পরি-চারক গণকে জোরে ব্যজন করিতে বলিয়া, তিনি সেই প্রচণ্ড তৃষ্ণার উপশম করিয়া-ছেন। তাঁহার সুবিধার জন্য দাস, দাসী, পাচকব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি সমস্তই সেই কারাক্ষেত্রে উপস্থিত রাখা হইয়াছিল; পুরোহিতেরা শাস্ত্রকথা তুলিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া নন্দকুমারকে আহার করাইতে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া ছিলেন, তত্রাচ তিনি কোন মতে স্বীকার করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে তিনি এই প্রকারে দেহপাত করিতে কোন মতে কুণ্ঠিত নহেন, তত্রাচ কারাগারে ম্লেচ্ছ স্পৃষ্টস্থানে, কদাচই পান ভোজনাদি করিবেন না।

৯ই মে তারিখে, নন্দকুমারের কারারুদ্ধ হওয়ার তিন দিন পরে, কলিকাতার মন্ত্রী-সভার অধিবেশন হইবা মাত্রই নন্দকুমারের কথা প্রথম আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে। জেনারেল ক্লেভারিং প্রস্তাব করেন যে "কারাগারে থাকাতে মহারাজ নন্দকুমারের স্নান, আহার বন্ধ হইয়াছে। আজ তিন দিন তিনি উপবাসী রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় আর একদিন থাকিলেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। অতএব এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক, সুপ্রীম কোর্টের জজেদের নিকট, এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া একটী বিবরণী পাঠাইলে, বোধ হয় নন্দকুমারের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।" এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইল। দুঃখময় বিবরণী মহারাজা নন্দকুমারের স্বপক্ষে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ সার ইলাইজা ইম্পি সাহেবের ভবনে প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য হেষ্টিংসও এই দিবস সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোন বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। ১

ইম্পি সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের কথা অতিরঞ্জিত কিনা, নির্দ্ধারণের জন্য, কলিকাতার তদানীন্তন সেরিফ Macrabi সাহেবকে কারাগার হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেরিফ সাহেবও নন্দকুমারের অবস্থা সম্বন্ধে যথা যথ সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। ইম্পি তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিলেন, তাহাতে পাষাণেরও হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বল্প মাত্রই বিচলিত হইলেন, পত্রোল্লিখিত একটী কথা তাঁহাকে বোধ হয় সাতিশয় যাতনা প্রদান করিল। ক্লেভারিং লিখিয়া ছিলেন, "নন্দকুমার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছেন, তথাপি আজও তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ় চিত্ত।"

ইম্পি সাহেব তদানীন্তন নূতন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণের প্রধানকর্ত্তা। তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে নন্দকুমারকে এই অকারণ কারা-ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন। নন্দকুমারকে তাঁহার (ইম্পির) নিজ নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন স্থানে বা তাঁহার (নন্দকুমারের) নিজগৃহে, প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিলে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন ত্রুটিও হইত না, বরঞ্চ তাঁহার যশ আরও বর্দ্ধিত হইত; কিন্তু নন্দকুমারকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়া হেষ্টিংসের মনে কষ্ট দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তিনি নন্দকুমারকে অন্যত্র রাখিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না।

নন্দকুমার একজন বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের সর্ব্বকর্ম্মেরই ব্যবস্থা-

---

১ I acquaint the Board that I received a letter from Mr J Fowke, who is just come from visiting Moharajah Nundokumar, acquainting me, that it is the opinion of the people who are about him, that they do not think he can live another day without drink. He says his tongue is much parched but that his spirit is farm."
(Proceedings of the council 9th May 1775.)

কর্ত্তা, ইম্পি এই ভাবিয়া কতকগুলি শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। তাঁহাদের নিকট কারাগারে থাকিয়া হিন্দুর আহারাদি চলিতে পারে কি না, এই বিষয়ে ব্যবস্থা লওয়া হইল। † যে কয়জন ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা দিতে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা, বাণেশ্বর শর্ম্মা, গৌরীকান্ত শর্ম্মা, ও কৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা এই চারি জনই প্রধান। বড় বাড়ীতে পণ্ডিতেরা কি প্রকার বিদায় পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু যে ব্যবস্থাটী দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা অবিকল সেই ব্যবস্থাটি এই স্থানে তুলিয়া দিলাম।

“যদি কোন ব্রাহ্মণ, যবনেরা বাস করিয়াছে, ব্যবহার করিয়াছে, বা স্পর্শ করিয়াছে—এরূপ স্থলে কারাবদ্ধ হন, বা পান ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হন; এরূপ স্থলে তিনি পূজা আহ্নিকও করিতে পারেন না, এবং করিলেও শাস্ত্রমতে তাঁহাকে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার এ দোষ খণ্ডাইতে পারে। এই হিন্দুশাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্তের নাম, “চান্দ্রায়ণ”। একমাস কাল “চান্দ্রায়ণের” নিয়মিত সময়; কিন্তু কলিকালে লোকের ক্লেশ সহিবার শক্তি নিতান্ত অল্প, ও শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, সুতরাং দানাদি কার্য্য দ্বারা এই চান্দ্রায়ণকৃত ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। ধনীর পক্ষে ৮টি সবৎসা গাভী * ও অসমর্থের পক্ষে ৩৮ কাহন ৭ পণ কড়ি, ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দক্ষিণা ও পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধাদি দ্বারা, চান্দ্রায়ণের ফল লাভ হইতে পারে। এক দিনের দণ্ড এই, কিন্তু ইহার পর যতদিন থাকিতে হইবে—ততদিন এই হিসাবে দণ্ড দিতে হইবে, ও তাহা হইলে জাতিপাত হইবে না।

যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত এক প্রাচীর বেষ্টিত স্থলে অথচ ভিন্ন ছাদযুক্ত গৃহে থাকে, ও সেই গৃহের সহিত কোন রূপ ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ না থাকে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি সেই স্থলে গঙ্গাজলে স্নান, আহ্নিক, পাক ও পূজাদি করিলে ততদূর পতিত হয় না, ও কারামুক্ত হইলেও, বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে আসিতে পারে।

[illegible] শর্ম্মা
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা
শ্রীকৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা
শ্রীগৌরীকান্ত শর্ম্মা
ইত্যাদি।”

এই ব্যবস্থাখানি আয়ত্ত করিয়া ইম্পি, তৎক্ষণাৎ নন্দকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজা নন্দকুমার (যিনি এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান রক্ষক বলিয়া গণ্য হইতেন) জজ সাহেবের এই প্রকার কার্য্য-প্রণালী, ও পণ্ডিতগণের এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন।

† A voice from old Calcutta.

* এই সময়ে একটী গাভীর মূল্য ৪৲ চারি টাকা ছিল।

তখন তাঁহার অতি দুঃসময় সুতরাং মনের ক্রোধ মনেই সম্বরণ করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে ইম্পিকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যে ব্যবস্থা পাঠাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। এই সকল পণ্ডিতগণ লোভী ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ, শাস্ত্রে ইহাদের কোনই দখল নাই, সুতরাং ইহাদের ব্যবস্থা গ্রহণীয় নহে। আপনি নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা আনাইলে, তদনুযায়ী চলিতে আমার কোন আপত্তি নাই।" এ সমস্ত কথা যুক্তি যুক্ত হইলেও ইম্পি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরদিন প্রাতে, নন্দকুমারের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইম্পি Dr Murchisonকে রোগীর প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি রাজার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিলেন ও ইম্পিকে শুনাইলেন। এবার ধর্ম্মাধিকরণের, ধর্ম্মপরায়ণ বিচারকের খ্রীষ্টিয়ান হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি গোপনে কলিকাতার তদানীন্তন জেলর Mathew Yeandaleকে নন্দকুমারের জন্য, বাহিরের উঠানে একটী তাঁবু গাড়িয়া দিতে বলিলেন। জেলখানার সহিত ইহার কোন বিশেষ সংশ্রব রহিল না। এই স্থানে স্নান আহ্নিক ও ভোজনাদি করিতে তাঁহার কোন বিশেষ অমত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত হিন্দু দাস দাসী পাচক প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই অপ্রতুল হইল না। এই ৪।৫ দিন ক্রমাগত উপবাসের পর মহারাজা সেই প্রথম জল স্পর্শ করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও জপাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। এই প্রকারে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল, ক্রমশঃ বিচারের দিন সন্নিকটস্থ হইল, ৭ই জুনের রাত্রি ধীরে ধীরে প্রভাত হইল। ৮ই জুন উপস্থিত হইল। এই দিনে সুপ্রীমকোর্টে তাঁহার প্রথম বিচারারম্ভ হয়। ৮ই হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত সমস্ত দিন ধরিয়া, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিচার কার্য্য চলিতে লাগিল, * বার জন গণ্য মান্য জুরী বসিলেন। জুরীদের মধ্যে একজনও দেশীয় ছিলেন না। প্রতিদিনই আদালত লোকে লোকারণ্য হইত। সকলেই বিচারের শেষ ফল দেখিবার জন্য সমুৎসুক। ৮ দিন বিচারের পর জজেরা রায় দিলেন। লোকে মোকর্দ্দামার ভাব গতিক দেখিয়া বিচারের ফল যে নন্দকুমারের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে, তাহা অনুমান করিয়া ছিল। তাহাদের সেই অনুমান কঠোর সত্যে পরিণত হইল। জজেদের বিচারে মহারাজা নন্দকুমার ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হইয়া বিবেচিত হইলেন। ইম্পিও সেই আইনের দোহাই দিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। সমস্ত আদালত সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ, বোধ হয় সূচীপতন শব্দও তখন শ্রুতিগোচর হইত। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই

* এই সময়ে জজেরা Wig ও গাঢ় লোহিত বর্ণের বড় বড় পোষাক পরিতেন। এই পোষাক দিনের মধ্যে দুই তিন বার তাঁহাদের বদলাইতে হইত। আর তাঁহারা ঠিক মধ্যাহ্নেই Dinner করিতেন।

হায় হায় করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হেষ্টিংসেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি এই রাজনৈতিক মহা সমরক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিলেন।

Farer এবং Brix সাহেবদ্বয় এই মোকর্দ্দামায় নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করেন। ইহারা দুইজনেই প্রাণপণে নন্দকুমারকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও মহারাজা নন্দকুমার তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি অনেকাংশে নিস্বার্থ ভাবে তাঁহারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বহুদর্শী ফেরার সাহেব মোকর্দ্দামার ভাবগতিক দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ফল নন্দকুমারের শুভপ্রদ হইবে না। আরও তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে নন্দকুমার যে অপরাধে দোষী বলিয়া অভিযুক্ত, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এই ফেরার সাহেবই ইংলণ্ডে গিয়া Parliamentএর মেম্বর হন ও ইম্পির নামে অভিযোগ কালে, প্রধান সাক্ষী রূপে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। †

প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় অভিযুক্ত হইয়া মহারাজ নন্দকুমার কারাপ্রেরিত হইলেন। তাঁহার বাসের জন্য কারাগারে একটী দ্বিতল গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই গৃহে আর কেহই থাকিত না; এক কথায় বলিতে গেলে এই গৃহটী কারাগার সীমা হইতে কিঞ্চিৎদূরে অবস্থিত ছিল। এইস্থানে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া মহারাজ নন্দকুমার অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথন, ও শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা শ্রবণে দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার মৃত্যু যে অনিবার্য্য, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং মৃত্যুর জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন।

ক্রমশঃ

† ইম্পির দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের অব্যবহিত পরেই, Farer সাহেব জুরীদিগের ফোর ম্যানের নিকট প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার কাল বাড়াইয়া দিতে গোপনে অনুরোধ করেন। এই ব্যক্তি ইম্পিকে বলিয়া দেওয়াতে ইম্পি Farer সাহেবকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

---

# নিরামিষ ভোজন।

## (প্রতিবাদের উত্তর।)

আমি ভারতীতে নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ ভারতীতে বাহির হইয়াছে। মাংস ভোজন সম্বন্ধে আমার যাহা মত, তাহা বোধ হয় পরিস্কার রূপে আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝান হয় নাই—কেন না দেখিতেছি প্রতিবাদ লেখক আমার লেখা হইতে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। পাঠকগণ আমায় মাপ করিবেন।

মাংস ভোজন করা যে, সকল মানুষের পক্ষে অন্যায়, আমার মত এরূপ নহে। কিন্তু প্রতিবাদ লেখক আমার লেখা হইতে

আমার মত সম্বন্ধে তাহাই বুঝিয়াছেন; মানুষমাত্রেরই পক্ষে যে মাংস ভোজন করা দূষ্য, তাহা বোধ হয় আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে কোথাও বলি নাই।

আমার প্রবন্ধে এইরূপ কথা ছিল যে “যিনি মাংস ভোজন করিবেন, তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্ত্তব্য—গরুকে মাংস খাওয়াইলে সে কখন বলিষ্ঠ হইবে না। কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে, আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই জন্য যাঁহার মাংস ভোজন প্রয়োজন, তাঁহার পক্ষে মাংস ভোজন বিধি, আর যাঁহার তাহার প্রয়োজন নাই—তাঁহার পক্ষে অবিধি।” প্রতিবাদ লেখক ঐটুকু উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে লেখকের মতে গরুর পক্ষে যেমন মাংস ভোজনের আবশ্যকতা নাই, মনুষ্য পক্ষেও সেইরূপ।” তাহার পর অসভ্যাবস্থায় মানুষ কাঁচা মাংস খাইত, এই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে যে মাংস ভক্ষণ অবিধি, একথা তিনি উদ্ধৃত বাক্য হইতে কেমন করিয়া বুঝিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা কামনা জয় করিতে চান, তাঁহারা যেন মদ্য ও মাংসকে শত্রু জ্ঞান করেন; কল্পনা শক্তি, ধীশক্তি ইত্যাদি সূক্ষ্ম শক্তির ব্যয় যাঁহাদের বেশী করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন শ্রেয় নহে। অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের মাংস ভোজন করা উচিত নহে, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; পাঁচ ইয়ারে বসিয়া মদ্যসেবন নৃত্যগীতাদি যাঁহারা করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে মাংস ভোজন করা অনুচিত একথা আমি বলি না।

প্রতিবাদ লেখক একস্থলে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে “এস্থলে গুরুঠাকুর রসিকতা করিয়াছেন মন্দ নয়।” প্রতিবাদ লেখকের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিলনা; তবে সাধারণকে আমার জানান কর্ত্তব্য যে শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন অবলম্বনে আমি মাঝে মাঝে যাহা লিখি তাহাতে এমন যেন কেহ মনে না করেন যে আমি নিজেকে সাধারণের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনেকরি। আমার লেখায় আমি নিজেই শিক্ষক, আবার নিজেই ছাত্র। পাঠকগণকে আমার জানান কর্ত্তব্য যে আমি যখন যাহা লিখি, তাহা শিখিবার জন্য; এবং সাধারণের কাছে যে সেই লেখা প্রকাশ করি, তাহাও শিখিবার জন্য। প্রতিবাদ লেখক মহাশয় আমাকে ছাত্র বলিয়া জানিবেন।

প্রতিবাদ লেখক মহাশয় আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন এবং কথাগুলি বাস্তবিক সত্য কথা। আমি উক্ত প্রবন্ধ লিখিতে যে পথে গিয়াছি, তাহা না অধ্যাত্মিক, না ভৌতিক, না নৈতিক, না বৈজ্ঞানিক। কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কেন না আমি আধ্যাত্মিক রহস্যের কিছুই জানি না, ভৌতিক রহস্যের কিছুই জানি না, নৈতিক রহস্যেরও কিছুই

জানি না, বৈজ্ঞানিক রহস্যের ত কথাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিবাদ লেখক যে ঠিক বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বনে তাঁহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, তাহাও বলি না। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে আমি বিজ্ঞানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ জ্ঞান করি। এই জগতের ভিতর যে সমস্ত গূঢ় গূঢ়তর গূঢ়তম তত্ত্ব আছে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান সাহায্যে তাহার কণা মাত্রের আভাস পাওয়া যায় এই পর্য্যন্ত। যিনি পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চরম অবস্থা জ্ঞান করেন, তাঁহাকে আমি ভ্রান্ত জ্ঞান করি। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমিও এককালে উহার বড় গোঁড়া ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার সে গোঁড়ামি এখন আর নাই। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান চরম অবস্থায় উঠিতে যে এখনও ঢের বিলম্ব আছে, ইহা প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনারাই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ডাক্তারি শাস্ত্র আবার অত্যন্ত অপরিপক্ক সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বা পাশ্চাত্য ডাক্তারি শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই যে অকাট্য প্রমাণ,ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

* আরও এক কথা আছে, লেখক যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া মাংসভোজন মনুষ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্থির করিয়াছেন, মাংস ভোজন সম্বন্ধে সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেই মতভেদ আছে। বিলাতের অনেকে আজকাল মাংস ভোজনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। *যাঁহারা মদ্যসেবন-জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হন, তাঁহাদিগকে মদ ছাড়াইবার জন্য আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারেরা প্রথমে মাংস ছাড়িবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিলাতে যাঁহারা মদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মাংস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে অস্থিতে চুন আছে, থানিক চুন খাইলেই কি অস্থির পুষ্টিসাধন হইতে পারে? ইহার উত্তরে প্রতিবাদ লেখক বলিয়াছেন যে এস্থলে "গুরুঠাকুর রসিকতা করিয়াছেন মন্দ নয়, কিন্তু তাঁহার অনুধাবন করা উচিত ছিল যে চুন অস্থিরোগের একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ অস্থির পুষ্টি সাধনের জন্য চুনের তুল্য ঔষধ ইংরাজিতে নাই" ইত্যাদি।

যেরূপ রোগে ডাক্তারেরা চুন ব্যবস্থা করেন, সেই রূপ রোগে সেই ব্যবস্থা দ্বারা শরীরের যে অনেক সময় উপকার হয়, ইহা আমার নিজের দ্বারা পরীক্ষিত সুতরাং প্রতিবাদ লেখকের কথা আমি সম্পূর্ণ মান্য করিতে বাধ্য; কিন্তু একটি কথা এই বলিতে চাই যে ঔষধের সহিত যে চুন খাওয়ান হয়, সেই চুনের কেমিক্যাল ইনগ্রিডিয়াণ্ট সকল হাড়ে জমা হইয়া যে হাড়ের পুষ্টি সাধন হয় একথা আমি স্বীকার করি না। না স্বীকার করিবার একটি কারণ আছে—হাড়ের যেরূপ রোগে ডাক্তারেরা চুনের জল কিম্বা চুন ঘটিত অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করেন, সেই সেই অসুখে হোমিওপাথী চুন ঘটিত ঔষধ(Calcarea Carbonica, Calci-

um phosphite ইত্যাদি) সেবন করাইয়া বেশী উপকার হইতে দেখিয়াছি। হোমিও-পাথী চুন ঘটিত ঔষধের এক ফোঁটায় চুনের কেমিক্যাল এলিমেণ্টের কণার কণামাত্র থাকে, সুতরাং চুন ঘটিত ঔষধ সেবন দ্বারা সেই চুনের কেমিক্যাল এলিমেণ্ট হাড়ে গিয়া জমা হয় বলিয়া যে হাড়ের পুষ্টি সাধন হয় সে কথা কাজের কথা নয়। আমি বিজ্ঞা-নের বড় পক্ষপাতী ; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ ধরিয়া "মাংসের রাসায়ণিক বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহার আনষ্ট কারিতা" প্রতিপাদনের চেষ্টা করি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড় এলিমেণ্ট ছাড়া অন্য অন্য পদার্থ খাদ্য দ্রব্যের ভিতর আছে কিন্তু সেই সেই পদার্থ যে কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার বড় ধার ধারেন না।

প্রতিবাদ লেখক ৩৫২ পৃষ্ঠায় একস্থলে বলিয়াছেন যে "এমন ও প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত ডাল সকলের মধ্যে কোন কোন-টিতে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে যে সেই সকল ডাল অধিক দিবস একাদি ক্রমে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার দুশ্চি-কিৎস্য পীড়ার উৎপত্তি হয়।" কিন্তু এই বিষাক্ত দ্রব্য যে কি তাহা বোধ হয় প্রতিবাদ লেখক জানেন না, কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ ডাল হইতে কেহ বাহির করিতে পারেন নাই এবং কেমিক্যাল বি-শ্লেষণ দ্বারা ডালের ভিতর যে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, সেই দ্রব্য কি জাতীয় তাহা যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থির করিতে পারিবে তখন মাংসের ভিতরও কি বিষাক্ত পদার্থ আছে তাহাও স্থিরীকৃত হইবে।

কেবল স্থূল কেমিক্যাল এলিমেণ্টের বিশ্লেষণ দ্বারাই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে তাহা ঠিক করা যায় না। চিনি একটি খাদ্য দ্রব্য, উহার কেমিক্যাল বিশ্লে-ষণ দ্বারা কয়লা আর জল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে কয়লা আর জল বই কিছুই নাই কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে স্থূল কয়লা ও জল ছাড়া এমন পদার্থ আছে যাহা পাশ্চাত্য রাসায়-ণিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে খুজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু বিজ্ঞানের কথায় চিনিতে স্থূল কয়লা এবং জল ভিন্ন এমন একটি পদার্থ আছে যাহা রস তন্মাত্রের এক প্রকার পরি-ণাম এবং যাহাকে চিনির "স্বরূপ" বলা যাইতে পারে। এই পদার্থটি কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলে খাদ্য সম্বন্ধে চিনির উপযোগীতা অনুপযোগীতা বিষয়ে বৈজ্ঞা-নিক নির্ণয় কখনও ঠিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে কর গম একটি খাদ্য দ্রব্য। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল যে উহাতে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ইত্যাদি পদার্থ আছে। একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের মধ্যে কত অক্সিজেন, কত হাইড্রোজেন ইত্যাদি থাকে, তাহা নির্ণয় করিয়া খাদ্য সম্বন্ধে গমের গুণাগুণ বিচার করা যায় না। প্রতি-বাদ লেখক "প্রটিড" ইত্যাদি পদার্থে কি কি কেমিক্যাল এলিমেণ্ট আছে তাহা

বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে "কিন্তু তাই বলিয়া অমিশ্র বা আদত এই দ্রব্য গুলি খাইলে কি আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে?" কিন্তু কেন হইতে পারে না প্রতিবাদ লেখক সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। প্রশস্ত বিজ্ঞানের পথ অবলম্বনে তিনি যখন প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন সেটা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

অমিশ্র বা আদত খাইলে কেন যে শরীর রক্ষা হইতে পারে না তাহার একটি বিজ্ঞান সম্মত উত্তর আমি দিতে চাই এবং বোধ হয় পাশ্চত্য বিজ্ঞানের অন্য উত্তর থাকিতে পারে না। রাসায়ণিক আকর্ষণে এলিমেণ্ট সকল যখন মিশ্রিত হইয়া যে নূতন পদার্থ জন্মে, তাহার গুণ সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্টদের গুণ হইতে সম্পূর্ণ রূপ ভিন্ন হইয়া পড়ে। কার্ব্বন অর্থাৎ কয়লা আর অক্সিজেন অর্থাৎ বায়ুস্থিত পদার্থ যাহা প্রতি নিশ্বাসে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই দুই পদার্থ মিশিয়া একটি বিষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রটিডের গুণে প্রাণ ধারণ সম্ভব বলিয়া কার্ব্বন হাইড্রোজেন ইত্যাদি খাইয়া প্রাণ ধারণ হইবে এরূপ অনুমান করা অন্যায়।

এইবারে একটি কথা বলিতে চাই— মাংসে ২২ ভাগ মাংসবিধায়ী পদার্থ আছে, ১৪ ভাগ উষ্ণজনক পদার্থ আছে, ১ ভাগ খনিজ পদার্থ এবং ৬৩ ভাগ জলীয় ও মেদসিক পদার্থ আছে, কিন্তু এই পদার্থ গুলি যে মাংসে মিশিয়া আছে, তাহা ডাল ও চালের খিচুড়ির ন্যায় মিশ্রণ কি কোন রাসায়নিক সম্বন্ধে মিশ্রিত। যদি খিচুড়ির ন্যায় মিশ্রণ হয়, তবে উদ্ভিদ জগৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে লইয়া খিচুড়ি বানাইলেই মাংস তৈয়ারী হইতে পারিত, মাংস খাইবার জন্য আর প্রাণী হত্যা করিতে হইত না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যে পদার্থ মাংসে আছে, তাহারা পরস্পর আবার এক প্রকার রাসায়নিক আকর্ষণে বদ্ধ। এবং সেই জন্যই মূল জড় পদার্থের গুণ জানিলেই মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থের গুণ জানা যায় না। প্রটিড অ্যামেলয়েডের গুণ জানিলেই মাংসের গুণ জানা সম্ভব নহে। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয় জন্য যাঁহারা কেবল কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করতঃ শরীরপোষণ কল্পে উহার ইষ্টানিষ্টকারিতার প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা ভুল পথে চলিতেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে ডালের সঙ্গে চালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডালের সঙ্গে চেতন পদার্থ আমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহাই দেখিতে হইবে। হিন্দু বিজ্ঞান যে পথ অবলম্বন করিয়া দ্রব্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতেন, সেই পথ অবলম্বনে খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ঠিক বুঝিতে পারা যায়। কোন পদার্থের সহিত চেতন পদার্থ-আমার কি সম্বন্ধ তাহাই আলোচনা দ্বারা ঋষিগণ

দ্রব্যস্থ পদার্থ সকলকে ভিন্ন ভিন্নরূপে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

একটি চুম্বক আছে আর একখানি লোহা আছে। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে দুইই এক পদার্থ; কিন্তু বাস্তবিক চুম্বকেও যা আছে আর লোহাখানিতেও কি তাই আছে? একজন নব্য বিজ্ঞানবিদ হয়তঃ বলিবেন যে matter সম্বন্ধে দুইই এক; তবে চুম্বক খানিতে এমন একটি শক্তি আছে যাহা লোহা খানিতে নাই। কিন্তু যাঁহারা ঋষিদের বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বনে দ্রব্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অয়স্কান্তমণিতে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা লোহ খানিতে নাই, এই পদার্থ সাধারণের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে কিন্তু অনুভূতি শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশে এই পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। প্রতিবাদ লেখকের কাছে আমার একটি নিবেদন এই যে আমার এই সকল কথা একেবারে বিজ্ঞান বহির্ভূত কি না সে বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্ব্বে রিসনব্যাক্ রিসার্চেস্ এবং বিলাতের সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রসিডিংস্‌গুলি যেন পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে অনুভূতি শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশের সাহায্যে চুম্বক হইতে দীপশিখার ন্যায় এক প্রকার আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায়। যেমন দীপশিখায় ফুঁ দিলে দীপশিখা চঞ্চল হয়, ফুঁ দিলে এই শিখাও সেইরূপ চঞ্চল হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চুম্বকে এমন একপ্রকার পদার্থ আছে যাহা লোহায় নাই। রিসনব্যাক এই পদার্থকে অড (od) নাম দিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই পদার্থকে তেজ বলা যাইতে পারে।

যোগী পতঞ্জলি বলেন যে পঞ্চভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থতত্ত্ব এই পাঁচ অবস্থা আছে; এই পাঁচ অবস্থা বিষয়ে চিত্ত সংযম করিতে শিখিলে ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য সকল অন্তরে প্রকাশ পায়। ভৌতিক দ্রব্য সকলের গুণাগুণ তখনই ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

পেটের অসুখ হইলে মুড়ী চালভাজা খাওয়া ভাল কি পোরের ভাত খাওয়া ভাল এইটি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রতিবাদ লেখক কোন পথ অবলম্বন করেন তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের প্রশস্ত পথ ধরিয়া উক্ত পদার্থ দ্বয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহাদের ইষ্টানিষ্টকারিতা বুঝিতে যান, তবে বোধ হয় মুড়ীতে এবং পোরের ভাতের মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজিয়া পাইবেন না। প্রশস্ত বিজ্ঞান পথ অবলম্বনে তিনি যাহা স্থির করিবেন তাহাত মিথ্যা হইবার নহে সুতরাং যদি কেহ বলে যে পেটের অসুখে মুড়ী চালভাজা খাইতে নাই, তাহা হইলে প্রতিবাদ লেখক যে তাঁহার কথায় হাস্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিতে গিয়া প্রতিবাদ লেখক মধ্যে মধ্যে এইরূপ হাসি হাসিয়াছেন ইহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। পেটের অসুখের সময় মুড়ী চালভাজা খাইতে নাই—একথাটি যদি সত্য

হয়, তবে এ সত্য কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা ঠিক করা যায় না। নিজের জঠরাভ্যন্তরস্থ শক্তির সহিত মুড়ীর সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা মুড়ী ভোজন কোন সময়ে ভাল এবং কোন সময়ে মন্দ তাহা ঠিক করিতে হয়। কিম্বা পূর্ব্বগামী লোকেরা মুড়ি খাইয়া মুড়ির গুণাগুণ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহা (সেই Experience) অবলম্বনে উহার উপযোগীতা অনুপযোগীতা স্থির করিতে হয়। প্রতিবাদ লেখক একস্থলে বলিয়াছেন "কেন? যদি মাংসের কেমিক্যাল এলিমেণ্ট কি দেখিবার প্রয়োজন না থাকিল তাহা হইলে তিনি আমিষ ভক্ষণের উপযোগীতা অনুপযোগীতা কি প্রকারে স্থির করিলেন"? প্রতিবাদ লেখক আমার অনেক কথায় হসিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহার হাসি দেখিয়া ইহা শিখিয়াছি যে হাসি আসিলেও হাসি সম্বরণ করা ভাল; সেই জন্য তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যটি পড়িয়া যে একটু হাসি আসিয়াছিল তাহা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রতিবাদ লেখকের মতে কেমিক্যাল বিশ্লেষণ ভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপযোগীতা অনুপযোগীতা কথনই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এই দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে যখন কেমিক্যাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি বাহির হয় নাই তখন লোকে খাদ্য সম্বন্ধে উপযোগীতা অনুপযোগাতা কিছুই বুঝিতে পারিত না প্রতিবাদ লেখকের কথায় অর্থটি এইরূপ বোধ হইতেছে। খাদ্য দ্রব্যে কি কি এলিমেণ্ট আছে তাহা ঠিক করিয়া কি গরু ছাগলে তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য বাছিয়া লয়? গরু ছাগলে আপনাদের তীক্ষ্ণ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে পদ্ধতি অবলম্বনে উপযোগী অনুপযোগী খাদ্য বাছিয়া লয়, তাহাই যে ঠিক পদ্ধতি পাঠকগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

৩৪৮ পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ লেখক একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। আমি লিখিয়াছিলাম "নিরামিষ ভোজন দ্বারা মানসিক সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ যত শীঘ্র হয়, আমিষ (মাংস) ভোজন দ্বারা তত শীঘ্র তৎক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। যেমন দুগ্ধ দ্বারা যত সত্বর সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ হয় মাংসে তাহার বিপরীত।" প্রতিবাদ লেখক ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আচ্ছা স্বীকার করিলাম তাহাই ঠিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপাদনের মূল কি? কোথা হইতে সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে? মানুষের স্থূল শক্তি না হইলে সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। স্থূল হইতেই সূক্ষ্ম আইসে; সূক্ষ্ম শক্তির মূল চিন্তা, সেই চিন্তার আধার মস্তিষ্ক (Brain); চিন্তা করিতে হইলে মস্তিষ্কের সরলতা আবশ্যক। সেই সরলতার উপায় সুস্থ শরীর। শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইলে মানসিক সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা থাকে না ইত্যাদি। মস্তিষ্কর শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও

শারীরিক বল এবং তাহাই রাখিবার নিমিত্ত পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক।” লেখক পরে দেখাইবেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে মাংসই সর্ব্বশ্রেষ্ট।

লেখক যখন যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকথিত কথাগুলি অর্থাৎ “মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল” এই সমস্ত কথা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু যুক্তি দেখান উচিত ছিল।

লেখকের অভিপ্রায় যদি এরূপ হয় যে মনের জোর বা চিন্তা করিবার শক্তি গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তিনি বড় ভুলিয়াছেন। এমন লোক ঢের আছে যাঁহাদের শরীর বেশ সবল ও সুস্থ কিন্তু মনের ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই অর্থাৎ মনের স্বভাব বড় ভীরু; এমন লোকও ঢের দেখা যায় যাহাদের শরীরে বেশা জোর নাই—কিন্তু চিন্তাশীলতা ক্ষমতায় অদ্বিতীয়; সুতরাং শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক ক্ষমতা থাকিবে, তাহার ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না। বরং অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায় যে যাঁহারা চিন্তাশীলতায় অদ্বিতীয়, তাঁহারা প্রায়ই দুর্ব্বল। (দুর্ব্বল কথায় রুগ্ন অর্থ যেন কেহ না বুঝেন) আমি অনেককে দেখিয়াছি যাঁহারা শারীরিক বল বৃদ্ধি করিতে গিয়া নানাবিধ জিমন্যাষ্টিক আদি ব্যায়াম করিয়া থাকেন ও খুব মাংসাদি দেহের পুষ্টিকর পদার্থ সেবনে দেহের পুষ্টি-সাধনে যত্নবান থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধি প্রায়ই পূর্ব্বাপেক্ষা মোটা হইয়া পড়ে। এই সব কারণে প্রতিবাদ লেখকের কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

মাংস ভোজনে যে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, ইহা আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে এক-রকম বলিয়াছি এবং শারীরিক বল থাকিলেই মানসিক বল জন্মিবে ইহা যদি সত্য হয় তবে মানসিক তেজ লাভের জন্যও যে মাংস ভোজন কর্ত্তব্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক বল থাকিবে, শারীরিক বল যত বাড়িবে, মানসিক বলও যে সেইরূপ বাড়িবে—এ কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

তবে শরীর রুগ্ন হইলে মনের ক্ষমতা কমিয়া যায়, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে মাংস ভোজন না করিলে শরীর রুগ্ন হয়, এরূপ প্রমাণ কি কোন বিলাতী শাস্ত্রে আছে?

অমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে মাংস ভোজন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। মাংস ভোজনে স্থূলকর্ম্মের অনুকূল শক্তির বেগ যেরূপ বেশী হয়, নিরামিষ ভোজনে সেরূপ হয় না। যাঁহারা স্থূল জাতীয় শক্তির বেগ কমাইতে ইচ্ছুক, যাঁহারা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ভাবাপন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশে যত্নবান হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন করা শ্রেয় নহে। মনুষ্য মাত্রেরই যে মাংস

ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে একথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলি নাই। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত কোন যুক্তি দিতে পারি নাই—কেন না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এখন যে অবস্থা, তা-হাতে এসকল বিষয়ক সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আর্য্য বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ভোজ্য দ্রব্যের উপযোগীতা অনুপযোগাতা কিরূপে স্থির করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাই; কিন্তু তাহা সাধা-রণের কাছে কিরূপ লাগিবে, তাহা বলিতে পারি না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নাম Experimental Science—আমি যে আর্য্যবিজ্ঞানের কথা বলিব, তাহাও Experimental Science। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই আর্য্য বিজ্ঞান পদ্ধতির প্রভেদ এই যে পাশ্চাত্যগণ নানা-বিধ জড় ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঋষিগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র চেতন মনুষ্য। বিজ্ঞানের যন্ত্র সকল যত সূক্ষ্ম (Sensitive) হইবে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তত সূক্ষ্ম হইবে; পাশ্চাত্যগণ জড় পদার্থ নির্ম্মিত যন্ত্র সকলকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম করিতে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু ঋষিগণ অনুভূতি শক্তির সূক্ষ্মতা সম্পাদন দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনার জন্য কোন পথ অবলম্বনে প্রকৃত সত্য জানা যায়,তাহা পাঠকগণ আপনারা বিচার করিয়া লইবেন। সেকালের বৈদ্যরা অনুভূতি শক্তির সাহায্যে রোগার নাড়ী টিপিয়া রোগের অবস্থা সম্যক নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন; কিন্তু হালের বিজ্ঞানে নাড়ী পরী-ক্ষার জন্য Spygmograph যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি যে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহা নাই,তাহা বুঝি আর সত্যই নহে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসটি বড়ই ভ্রান্তি মূলক।

আর্য্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া মাংস ভোজন ভাল কি মন্দ ইহা কিরূপে বিচার করিতে হয়, তাহা বলিতে চাই। মানুষ যে জাতীয় কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম অনু যায়ী তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবি-চ্ছেদ, দীর্ঘতা বা সূক্ষ্মতার মধ্যে বৈল-ক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবি-চ্ছেদ কথাটি ইংরাজী কথায় rhythm of respiration বলা যাইতে পারে। যখন খুব দৌড়াদৌড়ি করা যায়, তখন শ্বাস যে ভাবে বহিতে থাকে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে শ্বাস সে ভাবে পড়ে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার সময় শ্বাস যেরূপ স্থূল ভাবে বহিতে থাকে, প্রগাঢ় চিন্তার সময় শ্বাস সে ভাবে বহেনা; চিন্তাকালে শ্বাসের গতি বড় সূক্ষ্ম হয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম করিবার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের তাল এবং সুর ভিন্ন রূপ ধারণ করে। আহারের সহিত আবার এই তাল ও সুরের সম্বন্ধ আছে। লঘু আহার কর, আর গুরু আহার কর, এই উভয় অবস্থার শ্বাসের

গতির যে বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহা অনেকে জানেন; আবার ভোজ্য পদার্থের বিভিন্নতা জন্য এই শ্বাস প্রশ্বাসের সুর ও তালের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবনে শ্বাস প্রশ্বাসের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাও অনেকে জানেন।

যে রূপ কর্ম্মে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি যে-রূপ তালে এবং যে সুরে বহিতে থাকে এবং যেরূপে আহারের সহিত উহাদের একতানতা আছে,ইহাই লক্ষ্য করিয়া কাহার পক্ষে কি আহার উপযোগী এবং কোন আহার অনুপযোগী, তাহাই স্থির করা যায়। মাংস ভোজন জন্য শ্বাস যেরূপ খর ভাবে বহিতে থাকে, তাহার সহিত চিন্তা কর্ম্মের শ্বাসের সুরের সহিত একতানতা নাই।

শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া আমি ইহা বুঝিয়াছি যে দুগ্ধস্থ শক্তির সহিত মাংসস্থ শক্তির,এমন কি মৎস্য নিহিত শক্তির সহিত একতানতা নাই; এবং ভক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ইহারা পরস্পর বিরোধী বস্তু।

চিন্তার একাগ্রতা সাধন পক্ষে আমিষ ভোজন ব্যাঘাত স্বরূপ। মাংস ভোজনের সহিত চিন্তা শক্তির বেশী চালনায় মাংস ভালরূপ হজম হয় না।

কেবল দুদের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটান সাধারণের পক্ষে চলে না। কিন্তু স্থূল কর্ম্মত্যাগ করিয়া মানসিক শক্তির তীব্র চালনায় দিন কাটাইলে কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়, কোন কষ্ট হয় না।

লঘু আহার বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় বড় অনুকূল।

মাংস আহার করিয়া নিদ্রা গেলে যে সকল স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে ভয় এবং কামনা যে পরিমাণে থাকে, নিরামিষ ভোজনে দিন কাটাইলে স্বপ্নে তত ভয় এবং কামনা আসিতে পারে না।

কোন সত্য অনুসন্ধান করিতে গেলে মনকে সেই বিষয়ে স্থির রাখিতে হয়, কিন্তু মাংস ভোজেনে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়।

মাংস ভোজনে স্থূল ইন্দ্রিয় সকল সঞ্চালনের ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং সেই জন্য মাংস ভোজন ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু জনের পরম শত্রু।

আমার এই সকল কথা সত্য কি না তাহা যিনি পরীক্ষা করিতে চান, তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু হইয়া আমিষ ভোজন ত্যাগ করুন; কিছুকাল ( ১ বৎসর ২ বৎসর ) আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া পরে পরীক্ষা করিবার জন্য দিনকতক অমিষ ভোজন করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই আমিষ ভোজনের এবং নিরামিষ ভোজনের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবেন। ইন্দ্রিয় সংযমের ইচ্ছা যাঁহাদের নাই,তাঁহারা মাংস ভোজনের দোষ দেখিতে পাইবেন না।

ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার। এক উর্দ্ধস্রোতস্বিনী এবং অন্তর্মুখী, অপর প্রকার অধঃস্রোতস্বিনী এবং বহির্মুখী। আমাদের ন্যায় সাধারণ জনের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল অধঃস্রোতস্বিনী এবং বহির্মুখী। অভ্যাস নিবন্ধন শরীরের শক্তি যে স্রোত পথে চলিতে শিখিয়াছে, উহা সর্ব্বদাই সেই স্রোত পথে চলিতে যায়; অধঃস্রোতাভিখীমু

শক্তিকে উর্দ্ধ স্রোতাভিমুখী করিতে পারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; কিন্তু ইহা যে কতদূর দুরূহ তাহা যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মাংস মদ্যাদি সেবনে ইন্দ্রিয় বৃত্তির বেগ বড় বেশী হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল বড়ই বলবান্ হয়; তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে জয় লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু ব্যক্তি কামরূপী শত্রুদিগকে মদ্য মাংসাদি সেবন করাইয়া বলশালী করিতে ইচ্ছা করেন না। আমার এই কথা গুলির অর্থ সকলেই যে বুঝিবেন, ইহা আমি প্রত্যাশা করি না; যিনি বুঝিতে পারিবেন, একথা গুলি তাঁহার জন্যই লিখিলাম।

প্রতিবাদ লেখক মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদের শেষভাগে পাঠকগণকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মাংস ভোজন করিতেন না বলিয়াই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মাংস ভোজন না করাই যে কেশব বাবুর মৃত্যুর কারণ, ইহা প্রতিবাদ লেখক কেমন করিয়া জানিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কেশব বাবু প্রথমে নিরামিষ ভোজন করিতেন, পরে হালের ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে মাংসের সুরুয়া খাইতে হইয়াছিল, এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লেখক বুঝাইতে চান যে কেশব বাবু মাংস ভোজন করিতেন না বলিয়াই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু যুক্তিটি বড় অসার বোধ হইতেছে। মদ্য মাংস ভক্ত ডাক্তারেরা কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহার জন্য মাংস ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া নিরামিষ ভোজনই যে কেশববাবুর অকাল মৃত্যুর কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না; যদি কোন নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বৈদ্য কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তবে তিনি হয়তঃ তাঁহার জন্য মাংসের সুরুয়ার বন্দোবস্ত করিতেন না। প্রতিবাদ লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র ত নিরামিষ ভোজী ছিলেন না, তবে তাঁহার কেন অকাল মৃত্যু ঘটিল?

নিরামিষ ভোজনে অকাল মৃত্যু ঘটে না; দীর্ঘ জীবীদের সংখ্যা যদি গণনা করা যায়, তবে ইহা দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি দীর্ঘ জীবী হইতে চান, তবে নিরামিষ ভোজনই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত। আমার এই কথাটি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্বাস প্রশ্বাস যত শীঘ্র শীঘ্র পড়ে, মনুষ্যের পরমায়ু তত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় পায়; শ্বাস প্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে পড়িতে থাকে, মনুষ্য তত দীর্ঘজীবী হয়। মাংস ভোজনে শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং মাংস ভোজন আয়ু ক্ষয় করে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মাংস ভোজন ব্যতিরেকে যে সুস্থ থাকেন না, একথা মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। বরং অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাংসভোজী, তাঁহারা প্রায়ই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। টিণ্ডল হারবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি

বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অধিকাংশই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। আমার এক জন বন্ধু যিনি চিন্তা কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটান, তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতে চাই। তিনি একজন বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর ন্যায় আমিষাশী ছিলেন, প্রায় ৮ বৎসর ধরিয়া অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান; এই ৮ বৎসরের মধ্যে অ্যালোপাথী, কবিরাজী, হোমিওপাথী কোন রকম চিকিৎসারই বাকি রাখেন নাই। ইনি পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ন্যায় মৎস্যসেবী আমিষাশা ছিলেন। কালে কখন মাংস খাইতেন। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রত্যহ মাংস সেবনের ব্যবস্থা হয়,—কেন না ডাক্তারের মতে মাংস যত শীঘ্র হজম হয়, এত শীঘ্র কিছুই হজম হয় না। এই চিকিৎসার ফলে তাঁহার অজীর্ণ রোগ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাঁহার জীবন ভার বোধ হইয়াছিল, ইংরাজীতে যাহাকে Hypochondria বলে, তাঁহার সেই Hypochondria জন্মে। ক্রমে মাংস ভোজনের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া নিরামিষাশী হন। তিনি যতদিন আমিষাশী ছিলেন, দুগ্ধ সেবন করিলেই তাঁহার উদরাময় হইত। কিন্তু নিরামিষাশী হইয়া অবধি দুগ্ধ ক্রমে ক্রমে সহিতে লাগিল; তিন মাসের মধ্যে তিনি রোগ মুক্ত হন। তিন বৎসরের অধিক হইল তিনি আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া অজীর্ণ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত পাইয়াছেন। মধ্যে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি দিনকত মাংস ভোজন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে মাংস ভোজন করিলেই তাঁহার অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয় এবং মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই সব দেখিয়া আমার ইহা ধারণা হইয়াছে যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে আমিষ ভোজন বড়ই প্রয়োজনীয়, একথাটি বড় ভুল।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

---

# প্রামাণিক ধর্ম্ম।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা আমার এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মন্তব্য গুলি পাঠ করিয়া কয়েকটী কথা আমার বলিতে ইচ্ছা হওয়াতে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। তাঁহার সহিত আমার মতের এত ঐক্য দেখিতেছি যে, প্রতিবাদ করিবার উদ্যম আমার পক্ষে সুদূর পরাহত।

তিনি কহেন, প্রবৃত্তি মাত্রেই অন্ধ, জ্ঞানের সহকারিতা ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে পারে না। আমিও তাহাই বলি। অধিকন্তু আমার বক্তব্য

এই যে, জ্ঞান সৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি উভয়েরই চরিতার্থতা বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বিষয়ে সহকারিতা করে যে জ্ঞান, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহাকে জ্ঞান কহিবেন কিনা, জানিনা। কিন্তু উভয় স্থলেই জ্ঞানের স্বরূপ একই বলিয়া আমার বুদ্ধিতে আইসে। ইয়োরোপীয় শিক্ষিত দস্যু জানে যে, ক্লোরোফর্ম নামক দ্রব পদার্থ নাসিকার নিকট ধরিলে লোক অচৈতন্য হয়, সে ক্লোরোফর্ম লইয়া চুরি করিতে বাহির হয়, ঘরের ভিতর যাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকার নিকট ক্লোরোফর্মে ভিজান রুমাল নাড়িয়া অচৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে চৌর্য্য ক্রিয়া সম্পাদন করে; এস্থলে জ্ঞান অবৈধ লোভের চরিতার্থতা বিষয়ে সাহায্য করে; আবার দুরূহ অস্ত্র চিকিৎসা ব্যাপার ক্লোরোফর্মের দ্বারা অক্লেশে ও রোগীর যন্ত্রণা ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়; এস্থলে জ্ঞান অবশ্যই সৎকার্য্যের সহায়তা করিল বলিতে হইবেক। অতএব প্রবৃত্তি যদি অন্ধ হয়, জ্ঞানও তেমনি অনেক সময়ে ভাল মন্দ বিবেচনা বিহীন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিবেন যে, তবে ভাল মন্দ বিবেচনা কাহার কার্য্য, যদি জ্ঞানের কার্য্য না হয়? আমি স্বীকার করি যে ভাল মন্দ বিবেচনা জ্ঞানেরি কার্য্য; কিন্তু জ্ঞান নানা, যেমন প্রবৃত্তিও নানা। অতএব কোন সময়ে প্রবৃত্তি দ্বারা অনিষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানকে প্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলা তেমনি ভ্রম, যেমন কোন সময়ে জ্ঞান হইতে অনিষ্ট হয় বলিয়া প্রবৃত্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলা ভ্রম। উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ; উভয়ের সামঞ্জস্য দ্বারাই সুচারু রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রবৃত্তি জাহাজের পাইল, জ্ঞান জাহাজের কর্ণ, (হাইল্); প্রবৃত্তি বাস্প, জ্ঞান তাহার চালকদণ্ড; সুতরাং এককে হীন করা, অপরকে প্রধান করা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় সহানুভূতি প্রবৃত্তি ও যে অন্ধ, * তাহাও আমি স্বীকার করি। যখন ডাক্তর দুরন্ত বিস্ফোটক কাটিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সহানুভূতি হয়ত 'আহা! কর কি' এই ব্যগ্র বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে—কিন্তু জ্ঞান

---

* পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর দু এক বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে, 'সহানুভূতি' শব্দটী সুনির্ব্বাচিত হয় নাই। অতএব এস্থলে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক যে, আমার 'সহানুভূতি' শব্দের অর্থ universal benevolence—ইহা শিক্ষা দ্বারা জন্মে না, ইহা কাম ক্রোধের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। যখন কোন ব্যক্তি পুত্রশোকে রোদন করিতে থাকে, তখন অপরিচিত ব্যক্তিরো কান্না পায়। ইহা সহানুভূতির কার্য্যে। যখন কোন বাজীকর দড়ির উপর যাইতে থাকে, তখন বাজীকর যেরূপ আপনার পতন নিবারণের জন্য হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে থাকে, তখন দর্শকও অনেক সময়ে তদনুরূপ সঞ্চালন করিতে থাকে, অজ্ঞাতভাবে করে, ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে। ইহাও সহানুভূতির কার্য্য। এই প্রবৃত্তিরই অপর এক ফল, বিশ্বজনীন দয়া অর্থাৎ universal benevolence প্রঃ।

তাহাকে বলিয়া দেয় যে, বালক ঐ বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় রাত্র দিন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তাহা অপেক্ষা এক নিমেষের জন্য বেলকারের চোট্‌ খাওয়া ভাল; তাহা হইলে সেই সমস্ত যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইবে। সহানুভূতি তখন বুঝিতে পারে যে, সকল বিষয়েই লঘু গুরু বিবেচনা আছে। ফলত সহানুভূতিকে যে প্রাধান্য দিতে হইবে, ইহা জ্ঞানেরই আবিষ্ক্রিয়া। আর প্রাধান্য দেওয়া, মানে,—বিরোধ স্থলে সহানুভূতির অনুমোদিত কার্য্য করাই ধর্ম্মানুগত। যখন লোভ কি ক্রোধ এক দিকে টানিতেছে, আর সহানুভূতি আর এক দিকে টানিতেছে, তখন সহানুভূতির টানই শিরোধার্য্য কর, ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। তবে এক একটী বিশেষ স্থলে প্রকৃত পক্ষে সহানুভূতির অনুমোদিত কার্য্য যে কি, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। সেই স্থলে ধর্ম্ম সঙ্কট (questions of casuistry) উপস্থিত হয়। এই নিমিত্তই কম্‌ট্‌ ধর্ম্মনীতি (Morals) নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রকে সর্ব্ব বিজ্ঞানের মস্তকস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—অর্থাৎ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দুরূহ। ইহাতে এমন এমন গুরুতর ও কুটিল প্রশ্ন সকল উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহার মীমাংসা মানুষের বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতি দ্বারা সম্ভব কি না বলা ভার। সেই সকল প্রশ্নের দু একটী মাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত থাকিব। সকল দেশেই সময়ে সময়ে এমন এক এক জন লোক হইয়া উঠে, যে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, নরাধম, নৃশংস; অথচ কোন বৈধ উপায়ে সে ব্যক্তির শাসন হইতেছে না। সে স্থলে কেহ যদি আপনার প্রাণ সংশয়ারূঢ় করিয়া ঐ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে, তাহা হইলে পাপ করা হয় কি না? জ্ঞানকে সহানুভূতির সহকারী বা মন্ত্রী করিলে দ্বিজেন্দ্র বাবু কহেন যে, ইংলণ্ডের রাজা ও মন্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কের ন্যায় হয়। কিন্তু আমার চক্ষে তুলনাটী সংগত বোধ হয় না। বরং সাংসারিক ধরনের সাদাসিদে দুটী একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমি বলিতে পারি যে, সহানুভূতির পায়ের জুতা গড়িতে হইবে, জ্ঞান চর্ম্মকার সেই জুতা গড়িয়া দিতেছে; বেসী ঢল্‌ক না হয়, বেসী আঁট্‌ না হয়, তাহা জ্ঞানকেই দেখিতে হইবে। কিন্তু ঢল্‌ক হইল কি আঁট হইল, তাহা সহানুভূতিই পায়ে দিয়া বলিবে; তেমনি সহানুভূতির পোশাক্‌ চাই, জ্ঞান দর্জি পোশাক প্রস্তুত করিয়া দেয়। ফলত প্রবৃত্তি গুলির কার্য্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দেওয়া; জ্ঞানের কার্য্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় অবধারণ করা।

দ্বিজেন্দ্র বাবু মৌমাছী আর পিপীলিকার সমাজের সহিত মনুষ্য সমাজের সাদৃশ্য সংঘটন করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। কিন্তু সে সাদৃশ্য যে অপলাপ বা অস্বীকার করিবার যো নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ফলত বিস্তর প্রাণীতেই সমাজ বদ্ধ হইয়া একত্রে থাকিবার গুণটী বিদ্যমান আছে, মনুষ্যও তাদৃশ একটী প্রাণী; কিন্তু সেই গুণ কেবল সহানুভূতি নহে, তাহার সঙ্গে

কিঞ্চিৎ চতুরতা ও অগ্রপশ্চাদ্ বিবেচনা ও আত্ম সংযম থাকা আবশ্যক। মৌমাছী ও পিপীলিকাদিগের যে সে সমস্ত গুণ নাই ইহা কে বলিতে পারে? তবে যে তিনি জ্ঞান করেন উহাদিগের সহানুভূতি যত দূর সম্ভব প্রসর পাইয়াছে, তাহা নিতান্ত সমূলক নহে। কারণ যেমন মনুষ্য সমাজে, তেমনি উহাদিগের সমাজেও অত্যাচার, উৎপীড়না, বিবাদ, বিগ্রহ দাসত্ব ও প্রভুত্ব, একের আলস্য ও বিলাসিতা, অপরের প্রাণাস্তকারী পরিশ্রম, এই সকল কাণ্ডই আছে; অন্ততঃ প্রাণিবৃত্তান্তবেত্তারা পিপীলিকাদিগের বিষয়ে তাহা কহিয়া থাকেন। যদি তাই হয়, তবে সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা আর হইল কই? আর ইতর জন্তুদিগের সহিত মনুষ্যের তুলনা করিতে তিনি এত কুণ্ঠিতই বা কেন? তিনিও কি দেখেন নাই যে, অনেক মানুষের চেয়ে অনেক কুকুর ও অনেক ঘোড়া ভাল। ডারুইন স্বরচিত 'মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ' (Descent of man) নামক গ্রন্থে এক বীর হনুমানের অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন যে 'এতাদৃশ পূর্ব্ব পুরুষের বংশে জন্মিয়াছি বলিতে আমার কিছু মাত্র লজ্জা বোধ হয় না।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু অনেক স্থলে 'ধর্ম্ম বুদ্ধি' বলিয়া একটী শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ইহা (conscience) এই শব্দের অনুবাদ হয়, তাহা হইলে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হউক আর না হউক, ইহাও মন্দ; অর্থাৎ অনেক সময়ে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য করে। আমেরিকার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদিগের ধর্ম্ম বুদ্ধি (Conscience) তাহাদিগের নিজের ব্যবসায়ের প্রতি কিছু ক্ষুন্ন ছিল না; শূদ্র বেদোচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা চ্ছেদন করিতে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি (Conscience) কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই সহস্র সহস্র প্রোটেস্‌টাণ্ট প্রজাকে জন্মভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির কোন ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিবেন, মার্জ্জিত ধর্ম্মবুদ্ধির কার্য্য তাদৃশ নহে। মার্জ্জিত সহানুভূতিরও কার্য্য কোন অংশে দোষাশ্রিত হইবার কথা নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু কহেন যে, সত্যের জন্য টান—ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমি ত সত্য (truth) বলিতে বুঝি, (মিল আমাকে শিখাইয়াছেন) যথার্থ ও প্রমাণসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য এক একটী প্রতিজ্ঞা (a true proposition)। বরফ শীতল, কি বরফ শুভ্র, কি মনুষ্য মরণশীল, এই প্রকার এক এক প্রতিজ্ঞা এক এক সত্য। ইত্যাদি প্রকার অশেষবিধ সত্য অনুসন্ধান করা মানুষের আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক, মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে সেই অনুসন্ধিৎসা উহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ধনের দ্বারা বিস্তর সুখসাধন বস্তু পাওয়া যায়, এই জন্য প্রথমে ধন উপার্জন করে, কিন্তু কৃপণেরা ধনকে তাহার নিজের জন্যই ভাল বাসে, তখন তাহারা ধনের উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিয়া ধনেরই আলিঙ্গন করে। ফলতঃ কেবল সত্যের জন্য কেন, মানুষের ধর্ম্মই এই

যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়কে (means) উদ্দেশ্য (end) বলিয়া তাহার ভ্রম হয়। ইহা কেবল (association of ideas) নামক বিচিত্র নিয়মের প্রসব স্বরূপ। ফলত দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাকে সত্যের প্রতি টান কহিয়াছেন, কম্‌টের ভাষাতে বলিতে গেলে কহিতে হয় যে, বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে সুখবোধ করা। ইহা মনুষ্যের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু অসভ্য মনুষ্যের প্রায় নাই বলিলেও হয়, এবং ইতর প্রাণাদিগের যে আদৌ নাই, তাহাও বলা যায়। নূতন জিনিস দেখিলেই কুকুর শুঁকিয়া দেখে, কেবল যে খাওয়া যায় কি না, তাই জন্য দেখে, শুদ্ধ তাহা নহে; জিনিসটা কি জানিবার জন্যও দেখে, পেটভরা থাকিলেও দেখে। ফলত কৌতূহল (Curiosity) নামক বৃত্তি কেবল মনুষ্যেরই নহে, ইতর জন্তুরও আছে। তবে কি কৌতূহলই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিধায়ক একমাত্র গুণ হইবে? দ্বিজেন্দ্র বাবু 'মূল সত্য' বলিয়া আর একটী পরিভাষা অবতারিত করিয়াছেন। আমি তাহার মানে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, সাধারণ সত্য (General truth) অর্থাৎ যে একটী সত্যের মধ্যে আর পাঁচটি সত্য অন্তর্ভূত হইতে পারে। ঢিল ছুঁড়িয়া দিলে মাটীতে পড়ে, চন্দ্র পৃথিবীর দিকে পড়িতে পড়িতে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, বাষ্প উপরে উঠে,এইরূপ অনেক সত্য এক মাধ্যাকর্ষণ নামক সত্যের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়। প্রথম গুলি বিশেষ সত্য, মাধ্যাকর্ষণ মূল সত্য। ফলত মূল সত্য নিরূপণ করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য; আর অনেক গুলি বিজ্ঞানের একতাধায়ক মূল সত্য নিরূপণ করা দর্শনের উদ্দেশ্য। আমাদিগের বৈদান্তিকেরা 'ব্রহ্ম' বলিয়া এক মূল সত্য নিরূপণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে 'নিরূপণ' অর্থাৎ 'ঠাহরান' অথবা 'একটা ঠিক্ ঠিকানা করা' যে কোথা, তাহা ত কিছুই দেখা যায় না। যেহেতু তাঁহারা নিজেই স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছেন, যে ব্রহ্ম 'নেতি নেতি' এই বাক্যে নির্দ্দেশযোগ্য। অর্থাৎ, যে জিনিশের কেন নাম কর না, ব্রহ্ম তাহার কিছুই নন। স্পেন্সরও সেই কথা বলেন। অতএব সেই ব্রহ্মের বিষয়ে কোন কথা বলাই বা কিরূপে সম্ভবে, তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় বা আন্দোলন করাই বা কিরূপে ঘটিবে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি বাক্‌পথাতীত, তবে আর তাঁহার বিষয়ে বলি কি? তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, তবে আর তাঁহার বিষয়ে ভাবি কি? যদি তাঁহার বিষয়ে কোন কথাও চলে না, কোন চিন্তাও চলে না,তবে তাঁহার সম্বন্ধে মৌন ও নিরুৎসুকতা ব্যতীত আর কি ঘটিতে পারে? দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার আরো বিস্তর কথা উপস্থিত হইতেছিল, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আর অধিক লেখা হইতে নিরস্ত থাকিতে হইল। চরম কথা—দ্বিজেন্দ্র বাবুর মঞ্চ আর আমার মঞ্চ বিভিন্ন; সুতরাং অনেক বিষয়ই আমরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবলোকন করিব। বাদানুবাদ দ্বারা আমাদিগের উভয়ের মঞ্চ এক হইয়া যাইতে পারে কি না, তাহা আমি বলিতে অক্ষম।

# পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কি—ইহাই প্রদর্শন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহাতে অগত্যা কম্‌টের মতের প্রতিবাদ আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বাবু উপরে যে কয়েকটি সংশয়-সূচক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা আহ্লাদের সহিত তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা বলি—মূল সত্যই ধর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক;—কৃষ্ণকমল বাবু তাহা বলেন না। কৃষ্ণকমল বাবু মিলের মতানুসারে, "বরফ শীতল" এইরূপ তত্ত্ব-গুলিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। পরীক্ষাসিদ্ধ স্থূল তত্ত্ব এবং স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব (Fundamental principles) এ দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে—মিল্ তাহা আপন শাস্ত্রে আদবেই আমল দে'ন নাই। মিল্ চক্ষু মুদিয়া মনে করিতে পারেন—সূর্য্য অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সূর্য্য সত্যই-কিছু-আর আলোক-দানে ক্ষান্ত থাকিবে না; মিলের মতে, স্থল-বিশেষে দুই আর দুয়ে পাঁচ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার ঐ কথায় ভুলিয়া কোন জগতের কোন লোকই দুই আর দুয়ে পাঁচ গণনা করিবে না। মূল-তত্ত্ব-সকল যে, কিরূপ অকাট্য, তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই আমরা এখানে ক্ষান্ত হইতেছি;—

যতবার আমরা বরফ হস্তে লইয়াছি ততবারই আমাদের হস্ত কন্ কন্ করিয়াছে—ইহাতেই আমাদের মনো-মধ্যে বরফের ভাবের সহিত হাত-কন্‌কনানির ভাব যোগ-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই তত্ত্বটি আমাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়াছে যে, বরফ শীতল। কিন্তু যতবার আমরা পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি—একবারও আমরা তাহার নিগূঢ় কারণ ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করি নাই, অথচ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে; আমরা বীজ-বপন দেখি এবং তাহার কিছুদিন পরে অঙ্কুরের উত্থান দেখি—পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনা দেখি; কিন্তু বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গমের কি-যে বাধ্য-বাধকতা সে-টি আমরা আদবেই দেখিতে পাই না—অথচ সেই-টিতেই কারণের কারণত্ব হয়। শুধু যে পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হয় এবং পরবর্ত্তী হইলেই কার্য্য হয়, তাহা নহে;—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার মধ্যে যদি এমন একটা-কিছু থাকে যাহার গুণে পরবর্ত্তী ঘটনা উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়—তবেই আমরা ঐ দুই ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ উপলব্ধি করি; কিন্তু সেই যে "একটা কিছু" যাহার গুণে কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধ্য হয়, তাহা কি? তাহা কি কেহ বরফের কন্‌কনানির ন্যায় স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়াছে, তাহার রূপ

কেহ দেখিয়াছে, না তাহার ধ্বনি কেহ শুনিয়াছে? বরফের কন্‌কনানি বারবার আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হওয়াতেই এই তত্ত্বটি আমাদের বুদ্ধিতে দখল পাইয়াছে যে, বরফ শীতল; কিন্তু পরিবর্ত্তনের হেতুমত্তা একবারও আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই অথচ আমরা বলিতেছি যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রই সহেতুক। এমন হইলেও হইতে পারে যে, সূর্য্য-লোকে জল জমিয়া বরফ হইলেও তাহা শীতল হয় না; কিন্তু অসীম জগতের কোন স্থানেই এরূপ হইতে পারে না যে, তরল জল কঠিন হইয়া উঠিল অথচ তাহার কোন কারণ নাই। "বরফ শীতল" ইহার অন্যথা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু "পরিবর্ত্তন সহেতুক" ইহার অন্যথা একেবারেই অসম্ভব। এই বৎসরের পৌষমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব" এই শিরস্ক প্রবন্ধে উপরি-উক্ত বিষয় জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে—পাঠকের ইচ্ছা হইলে তিনি তাহা দেখিতে পারেন; এখানে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, "বরফ শীতল" এই সকল স্থূল-তত্ত্ব ছাড়া এমন অনেকগুলি মূলতত্ত্ব আছে—যাহা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ। স্পেন্‌সর্ অতীব সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, আপেক্ষিক অপূর্ণ সত্য-সকলের মূলে এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মূল সত্য বিদ্যমান আছেন ইহা একটি সর্ব্বোচ্চ মূলতত্ত্ব;—কাহারো সাধ্য নাই যে ইহা অমান্য করিতে পারেন। ফল কথা এই যে,সত্যকে ভাগ ভাগ করিয়াও দেখানো যাইতে পারে এবং মোট্ বাঁধিয়াও দেখানো যাইতে পারে;—"বরফ শীতল, অগ্নি উষ্ণ," এ প্রকার সত্য-সকলকে স্থূল সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; "ত্রিভুজের তিন কোণ ঠিক্ দিলে দুই ঋজু কোণ (Right angle) হয়, কোন একটি জড় পিণ্ড একই সময়ে দুই দিকে তাড়িত হইলে কোণাকুনি যায়, জলের মূল উপাদান অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন্," এ প্রকার সত্য-সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; আবার, কি স্থূল সত্য —কি বৈজ্ঞানিক সত্য—উভয় প্রকার সত্যের গোড়াতে যে সকল সত্য নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে-সকল সত্যকে দার্শনিক সত্য বলা যাইতে পারে; ইহার একটা দৃষ্টান্ত —পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; আবার সমস্ত দার্শনিক সত্যের মূলে যে এক অদ্বিতীয় সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই মূল সত্য,—তাহা এই যে, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলাধার। এইরূপ, সত্যকে একদিকে যেমন বহুধা ভাগ ভাগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে, আর এক দিকে তেমনি মোট বাঁধিয়া দেখানো যাইতে পারে। সত্যকে ভাগ ভাগ করিয়া তাহার কোন একটি অংশ-বিশেষে মনুষ্য-জ্ঞানের সমগ্র চরিতার্থতা হইতে পারে না;—জ্যামিতিক সত্যে যাঁহার মন ডুবিয়া রহিয়াছে—ঐতিহাসিক সত্যের আলোচনায় তাঁহার নিতান্ত অপটুতা জন্মিতে পারে; রাসায়নিক সত্যে যাঁহার মন ডুবিয়া আছে, জ্যোতিষিক স-

ত্যের আলোচনায় তাঁহারও ঐরূপ। বিশেষ-সত্যের প্রতি বিশেষ-মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ থাকিতে পারে—ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু সে আকর্ষণ স্বতন্ত্র, এবং সাধারণতঃ সত্যের প্রতি মনুষ্য-জ্ঞানের যে আকর্ষণ, তাহা স্বতন্ত্র;—আমরা যেখানে বলিয়াছি—সত্যের প্রতি আকর্ষণ মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, সেখানে সত্যের অর্থ এক দিক্ ঘেঁসা কোন অসম্পূর্ণ সত্য নহে কিন্তু মোট সত্য। একদিক্-ঘেঁসা কোন সত্যই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য নহে; তাহা যদি সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইত, তবে সেই-একটি সত্যেই মনুষ্যের জ্ঞান-পিপাসা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হইতে পারিত; তাহা হয় না বলিয়াই স্পেন্‌সর সর্ব্ব-দিক্‌দর্শী মোট সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অগত্যা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মূল-সত্য সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলাধার।

কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে, "আমাদিগের বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম বলিয়া এক মূল সত্য নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে 'নিরূপণ' অর্থাৎ 'ঠাহরাণো' অথবা 'একটা ঠিক্ ঠিকানা করা' যে কোথা, তাহা ত কিছুই দেখা যায় না। যেহেতু তাঁহারা নিজেই স্থানে স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম 'নেতি নেতি' এই বাক্যে নির্দ্দেশ-যোগ্য। অর্থাৎ যে জিনিসের কেন নাম কর না, ব্রহ্ম তাহার কিছুই ন'ন। স্পেন্‌সরও সেই কথা বলেন।" স্পেন্‌সর "নেতি নেতি" বলিয়াই ক্ষান্ত আছেন—একথার বিশেষ কোন প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। স্পেন্‌সর্ কেবল এই বলেন যে, আমরা ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি না; তেমন, এক-গাচি তৃণকেও আমরা স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। কিন্তু আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে তৃণের যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা নিরূপণ করা কিছুই কঠিন নহে; তেমনি আমাদের আত্মাতে মূল সত্যের যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা আমরা নিরূপণ করিব—ইহাতে আর কাঠিন্য কি? পূর্ব্বতন ঋষিরা ব্রহ্মের আবির্ভাব যেরূপ জানিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন,—কেনই বা তাহা না করিবেন! "ব্রহ্মের আবির্ভাব-দ্বারা আমরা তাঁহার নিরূপণ করিতে পারি" ইহা বলিয়াই স্পেন্‌সর ক্ষান্ত নহেন, আরো তিনি বলেন যে, মূল-সত্য আমাদের মনে তাঁহার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন, সেইরূপ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবার ভার তিনি আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; স্পেন্‌সরের নিজের লেখনী হইতে নিম্ন লিখিত কথাটি স্পষ্টাক্ষরে বাহির হইয়াছে;—"And when the Unknown Cause produces in him (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মনে) a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief"। পাঠক পাছে মনে করেন যে, স্পেন্‌সরের কথার ল্যাজা-মূড়া বাদ দিয়া আমরা আপনাদের একটা কথা স্পেন্‌সরের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছি, এই জন্য নিম্নে উহার গোড়ার কথাটা উহার সঙ্গে গাঁথিয়া দিতেছি।

"It is not for nothing that he has in him these sympathies with some principles (যেমন এই এক principle যে, সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ মূল সত্য বর্ত্তিতেছেন) and repugnance to others. He, with all his capacities, and aspirations, and beliefs, is not an accident, but a product of the time. He must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future; and that his thoughts are as children born to him, which he may not carelessly let die. He like every other man, may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause; and when the Unknown Cause produces in him a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief." কিন্তু এই যে, "অপরিজ্ঞাত কারণ," ইহা কি স্পেন্সরের মতে একেবারেই অজ্ঞেয়—না সকল বস্তুই যেমন স্বরূপতঃ আমাদের নিকট অজ্ঞেয়, তিনিও সেইরূপ? স্পেন্সরের নিম্নের এই কথাটির প্রতি পাঠক প্রণিধান করুন,—

"The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer; and must eventually be freed from its imperfections. যদি মূল সত্যকে স্পেন্সর একেবারেই অজ্ঞেয় বলিতে ইচ্ছা করিতেন তবে "consciousness of an Inscrutable Power" না বলিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন "The unconsciousness of an Inscrutable Power has been growing ever clearer." অতএব ইহা অতীব স্পষ্ট যে, মূল সত্য স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় বটে কিন্তু আমাদের জ্ঞানে (in our consciousness) তাঁহার যেরূপ আবির্ভাব হয় তাহা আমাদের জ্ঞেয়, "জ্ঞেয়" শুধু নয় কিন্তু অবলম্বনীয়; আমরা "authorized to profess and act out that belief" অতএব "ব্রহ্মকে একেবারেই জানা যায় না—নিরূপণ করা যায় না—তাঁহার কোন ঠিক ঠিকানা করা যায় না" এ কথা কম্‌টির হইলেও হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্‌সরের নহে! স্পেন্‌সরের নিজের কথা-মতে দাঁড়াইতেছে যে, (১) মূল সত্য আছেন ইহা সুনিশ্চিত; (২) অন্যান্য বস্তুর ন্যায় স্বরূপত তিনি আমাদের অজ্ঞেয়; (৩) মূল সত্যের আবির্ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়; (৪) মূল সত্য আমাদের ভিতরে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন; (৫) সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই পাঁচটি কথার মধ্যে "স্বরূপতঃ তিনি অজ্ঞেয়" এই একটি কথা কেবল কম্‌টের পছন্দ-সই, অবশিষ্ট চারিটি কথা দেখিবা-মাত্র কমটি অমনি মুখ ফিরাইবেন

তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। স্পেন্সরের এই যে একটি কথা—

"The consciousness of an Inscrutable power must eventually be freed from its imperfections (যথা-কালে অপূর্ণতা হইতে নির্মুক্ত হইবে)" ইহা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি;—দুর্জ্ঞেয় মূল-শক্তির ভাব (The consciousness of an Inscrutable Power) যাহা আমাদের আত্মার ভিতর জাগিতেছে, সেই ভাব-টি অপূর্ণতা হইতে মুক্ত হইলেই অন্ধ শক্তির পরিবর্ত্তে সজ্ঞান শক্তি জাগরূক হইয়া উঠে; কেননা অন্ধতা অপূর্ণতার লক্ষণ—জ্ঞানবত্তা পূর্ণতার লক্ষণ। আবার, যেখানে সজ্ঞান শক্তিমত্তা সেই খানেই তাহার আধার-স্বরূপ আত্মা আপনাতে এবং আপনার শক্তির আবির্ভাবে আপনি আনন্দিত—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য বেদান্ত ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের অভাবাত্মক লক্ষণ "নেতি নেতি"—ভাবাত্মক লক্ষণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আমাদের আত্মারও অভাবাত্মক এবং ভাবাত্মক দুই শ্রেণীর লক্ষণ আছে;—আমরা যখন বলি "আত্মা হস্ত নহে—পদ নহে—চক্ষু নহে—ইত্যাদি" তাহাই নেতি-নেতি; আবার, যখন বলি যে, "আত্মা স্বীয় শরীর-মনের এক অদ্বিতীয় অধিকারী, আত্মা সজ্ঞান-শক্তি ও তজ্জনিত আনন্দের আধার, ইত্যাদি" তখন আমরা আত্মার ভাবাত্মক লক্ষণ নির্দ্দেশ করি; এইরূপ দুই শ্রেণীর লক্ষণের মধ্যে বিরোধের কোন প্রসঙ্গই স্থান পাইতে পারে না। কৃষ্ণকমল বাবু যদি বলেন যে, সকল জ্ঞানের চেতয়িতা এক অদ্বিতীয় মূল জ্ঞানের প্রমাণ কি? তবে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটিতে তাহার সমুচিত উত্তর অনেক-কাল পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।

এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে প্রবোধিত করে যে জ্ঞান (অর্থাৎ মূল জ্ঞান) তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহা-পণ্ডিতেরা কি করেন? না কাষ্ঠকে দগ্ধ করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।" এই কাগজের এ পিট দেখিবা-মাত্র যেমন প্রমাণ হয় যে ইহার ও-পিট আছে, সেইরূপ অপূর্ণ-জ্ঞান-গম্য অপূর্ণ সত্য (যেমন "বরফ শীতল" এই একটি সত্য) দেখিবা মাত্রই প্রমাণ হয় যে পরিপূর্ণ-জ্ঞান-গম্য পরিপূর্ণ সত্য তাহার মূলে বর্ত্তমান্ আছেন,—ইহা জানিবার জন্য দ্বিতীয় কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে, "বরফ শীতল" ইহা যে মূল সত্য নহে কিন্তু স্থূল সত্য—ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে;—"বরফ শীতল" এই সত্যটির মূলে অসংখ্য অসংখ্য সত্য অবস্থিতি করিতেছে; বরফ এক সময়ে সমুদ্রের বাষ্প ছিল; সমুদ্র এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল; বরফের

মূল উপাদানের পরমাণু-সকল সেই বাষ্প-রাশির অন্তর্ভূর্ত ছিল; সেই অনির্দেশ্য পরমাণু-রাশি ছাড়া বরফ আর কিছুই নহে; এখন আমরা যে-বরফের পরমাণুকে শীতল দেখিতেছি—সেই পরমাণু তখন উষ্ণ ছিল; যখন বলি যে, বরফ শীতল, তখন তাহার পূর্ব্বতন বাষ্পীয় পরমাণুর সঙ্গে তাহার যে আনুপূর্ব্বিক যোগ চলিয়া আসিতেছে তাহা আমরা আদবেই দেখিতে পাই না; আমরা দেখিতে পাই কেবল একটা আংশিক সত্য—যাহা এককালে ছিল না এবং যাহা ভবিষ্যতে না থাকিলেও না-থাকিতে পারে। সুতরাং "বরফ শাতল" ইহা একটা স্থূল সত্য। আমরা বলি যে, মূল-সত্যের প্রতি আকর্ষণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং অমরত্ব—স্থূল সত্যে কখনই মনুষ্যের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আমরা বলি যে,প্রবৃত্তির সম্বন্ধে প্রবৃত্তির নিয়ামক জ্ঞান এক-মাত্র, ও সেই নিয়ামক জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রবৃত্তি নানা; কৃষ্ণকমল বাবু বলেন "আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভাল-মন্দ বিবেচনা জ্ঞানেরই কার্য্য; কিন্তু জ্ঞান নানা, যেমন প্রবৃত্তিও নানা।" ইহার উত্তরে, কি হিসাবে জ্ঞান এক এবং কি হিসাবে জ্ঞান নানা, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন। জ্ঞান কি হিসাবে এক এবং কি হিসাবে অনেক?

উত্তর। ভগবদ্গাতা, নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক-পংক্তিতে, এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

ইহাতে তিন প্রকার বুদ্ধির ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে; (১) বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি (অর্থাৎ যাহা প্রবৃত্তির বশীভূত, (২) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি, এবং (৩) সমাহিত বুদ্ধি অর্থাৎ মূল সত্যে সমাহিত ধর্ম্মবুদ্ধি। এই তিনের মধ্যে ভগবদ্গীতা কেবল ব্যবসায়াত্মিকা বিষয়-বুদ্ধিকেই "এক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে;—

লিখিবার সময় সকলেই-আমরা চৌত্রিশ অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের কাহারো হাতের লেখা চৌত্রিশ প্রকার নহে—একই প্রকার। আপন আপন হাতের লেখাতে আমরা যেমন একত্ব প্রদান করি—বিষয়-বুদ্ধি সেইরূপ আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমূহে একত্ব প্রদান করে। ইতিহাস-বেত্তারা নেপোলিয়নের কার্য্যে নেপোলিয়নের বিষয়-বুদ্ধির একত্ব, এবং সীজারের কার্য্যে সীজারের বিষয়-বুদ্ধির একত্ব, সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত দেখিতে পা'ন। কাব্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, রামায়ণের উত্তর-কাণ্ড বাল্মীকির রচনা নহে, এবং ইহার কারণ দেখা'ন এই যে, সমস্ত পূর্ব্বকাণ্ডে বাল্মীকির সরল বুদ্ধির একত্ব যেরূপ মুদ্রাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—উত্তর-কাণ্ডে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইরূপ, বিষয়-বুদ্ধি আপনার নানা কার্য্যে একত্ব প্রদান করিয়া সেই একত্বে আপনার

একত্ব প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়—দেখিতে পায় যে, সে একত্ব আপনারই দান করা একত্ব সুতরাং তাহা আপনার একত্বেরই প্রমাণ-স্বরূপ; কেননা তাহার আপনার যদি একত্ব না থাকিত তবে অন্য কোন কিছুতে একত্ব দান করা তাহার পক্ষে সম্ভব-সাধ্য হইত না। এইরূপ,—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কার্য্যেতেই সপ্রমাণ হয় যে তাহা এক; তাই ভগবৎগীতা বলিয়াছেন

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক।

ভগবৎগীতা ইহাও বলিয়াছেন যে, "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে" "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে বিধেয় নহে"; ইহার তাৎপর্য্য কি—নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে;—

এক দিকে যেমন দেখা যায় যে, বিষয়-বুদ্ধি আপনার দান-করা একত্বে আপনার একত্ব দেখিতে পায়, আর-এক দিকে তেমনি দেখা যায় যে, বিষয়-বুদ্ধি যদি মূলে (অর্থাৎ গোড়াতে) এক না হয়, তবে তাহার দান-করা ঐ যে, একত্ব, উহার কোন মূল্যই থাকে না; ব্যাঙ্কে যদি আদবেই নগদ্ টাকা না থাকে, তবে ব্যাঙ্ক্ নোটের কোন মূল্যই থাকে না। স্বীয় কার্য্য-কলাপে বিষয়-বুদ্ধির দান করা যে, একত্ব, তাহা এক জিনিস্; আর, বিষয় বুদ্ধির মূলের যে, একত্ব, (এক কথায়—আত্মার একত্ব) ইহা আর এক জিনিস্; আত্মার একত্ব আমরা আত্মাতে দান করি নাই কিন্তু আত্মাতে পাইয়াছি; বিষয়-কার্য্যে যেমন আমরা একত্ব দান করি, ঐশ্বরিক কার্য্য-হইতে সেইরূপ আমরা একত্ব গ্রহণ করি; উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক কার্য্য সূর্য্য, বিষয়-বুদ্ধি চন্দ্র, বিষয়-কার্য্য পৃথিবী, এবং একত্ব আলোক; চন্দ্র পৃথিবীতে আলোক প্রদান করে, কিন্তু সূর্য্য হইতে আলোক গ্রহণ করে;—বিষয়-বুদ্ধি বিষয়-কার্য্যে একত্ব প্রদান করে, কিন্তু ঐশ্বরিক কার্য্য হইতে একত্ব গ্রহণ করে। বিষয়-কার্য্যে একত্ব দান করিবার যে ব্যাপার—তাহাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির নিজের একত্ব প্রতিবিম্বিত হয়; আর, ঐশ্বরিক কার্য্য-হইতে একত্ব গ্রহণ করিবার যে ব্যাপার, তাহাতে সমাহিত-বুদ্ধির নিজের একত্ব নহে কিন্তু মূল সত্যের একত্ব প্রতিবিম্বিত হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে যে, "আমার একত্ব আছে—তাই আমি একত্ব দান করিতেছি," কিন্তু সমাহিত বুদ্ধি আর এক কথা বলে—এই বলে যে, "একত্ব আমার নহে—একত্ব মূল-সত্যের তাঁহা হইতেই আমি একত্ব পাইয়াছি।" এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।" অর্থাৎ সমাধি-ব্যাপারে বিষয়-বুদ্ধি-সুলভ নিজের কর্তৃত্ব খাটে না।

ধর্ম্মবুদ্ধির একত্ব আমাদের নিজ্ বুদ্ধির একত্ব নহে কিন্তু পরমাত্মার একত্ব; বিষয়-বুদ্ধির একত্বই আমাদের নিজ-বুদ্ধির একত্ব। এখন, জ্ঞান কি হিসাবে এক এবং কি হিসাবে অনেক, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে; (১) ঐশ্বরিক জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে এক; তাঁহা হইতে একত্ব প্রাপ্ত

হইয়াই আমাদের প্রতিজনের আত্মা এক হইয়াছে; (২) বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়-বুদ্ধি অনেক; (৩) এক ব্যক্তির বিষয়-বুদ্ধি এক, কিন্তু সেই বিষয়-বুদ্ধির ব্যাপার বা ক্রিয়া অনেক, অর্থাৎ তাহা নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়;—এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন ব্যাপারে বিষয়-বুদ্ধির নিজের একত্ব প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমার অশ্ব-জ্ঞান এবং হস্তি-জ্ঞান একই জ্ঞানের বা একই বুদ্ধির দুই বিভিন্ন ব্যাপার বা ক্রিয়া,—দুই বিভিন্ন বুদ্ধির দুই বিভিন্ন ক্রিয়া নহে।

আমরা বলি জ্ঞান প্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ; কৃষ্ণকমল বাবু বলেন "কোন সময়ে প্রবৃত্তি দ্বারা অনিষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানকে প্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলা তেমনি ভ্রম, যেমন কোন সময়ে জ্ঞান হইতে অনিষ্ট হয় বলিয়া প্রবৃত্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলা ভ্রম।" ইহার উত্তর আমরা এই দিই যে, প্রবৃত্তি ভাল হইলেও তাহা অন্ধ এবং মন্দ হইলেও তাহা অন্ধ; আর জ্ঞান ভাল হইলেও তাহা সজাগ—মন্দ হইলেও তাহা সজাগ। ভাল অশ্বও আছে—মন্দ অশ্বও আছে; আবার, ভাল সারথীও আছে—মন্দ সারথীও আছে; কিন্তু অশ্ব কখনও সারথীকে নিয়মিত করে না—সারথীই অশ্বকে নিয়মিত করে; এই জন্য আমরা সারথীকে অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকি। এখন, ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রবৃত্তি অশ্বের সহিত উপমেয়,—সুপ্রবৃত্তি সু-অশ্বের সহিত এবং কুপ্রবৃত্তি কু-অশ্বের সহিত; তেমনি, জ্ঞান বা বুদ্ধি সারথীর সহিত উপমেয়,—সুবুদ্ধি সু-সারথীর সহিত এবং কুবুদ্ধি কু-সারথীর সহিত। ধর্ম্ম-বুদ্ধি সু ভিন্ন কু হইতে পারে না; কেবল, বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি উভয়েরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিষয়-বুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরোধী, তাহাই কুবুদ্ধি; আর, যে বিষয়-বুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির অনুগত, তাহাই সুবুদ্ধি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রবৃত্তির নিয়ামক যে জ্ঞান বা বুদ্ধি, তাহার লক্ষণ কিরূপ?

উত্তর। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছি যে, "অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় সহানুভূতিকেও জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, অশ্ব-জ্ঞান, হস্তি-জ্ঞান, প্রভৃতি এমন অনেক জ্ঞান আমাদের আছে—প্রবৃত্তি-সংযমের সহিত যাহার কোন সম্পর্কই নাই, এই জন্য উহার অব্যবহিত পরেই আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞান-দ্বারা এইরূপ যে, নিয়মিত করা, ইহার দুইটি পদ্ধতি আছে;—(১) বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা, (২) ধর্ম্ম-বুদ্ধি-দ্বারা নিয়মিত করা। বিষয়-বুদ্ধির লক্ষ্য স্বার্থ—ধর্ম্ম-বুদ্ধির লক্ষ্য পরমার্থ।" কুবুদ্ধিও প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে—কুসারথীও অশ্বকে নিয়মিত করিতে পারে—ইহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি; এবং তাহাকে সেরূপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, ইহাও আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস; এইজন্য আমরা বলিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে বিষয়-বুদ্ধির অধীনে এবং বিষয়-বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবুদ্ধিও সু ছাড়া কু হইতে

পারে না, এবং ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত বিষয়-বুদ্ধিও সু ছাড়া কু হইতে পারে না; এই জন্য আমাদের কথা-অনুসারে স্পষ্টই দাঁড়াইতেছে যে, সুবুদ্ধিকেই প্রবৃত্তির নিয়ামক পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। উপমা-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মবুদ্ধি সেনাপতি, বিষয়-বুদ্ধি শতপতি (বা কাপ্তেন), প্রবৃত্তি সামান্য সৈনিক। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সৈন্য-দলের নিয়ন্তা হইবার কে উপযুক্ত? তবে তাহার এক উত্তর এই যে, সেনাপতি; আর-এক উত্তর এই যে, সেনাপতির আজ্ঞাধীন শতপতি; এ ভিন্ন, সেনাপতির অবাধ্য শতপতি সৈন্যদলের নিয়ন্তৃ-পদের যোগ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেছেন "অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-বিষয়ে সহকারিতা করে যে জ্ঞান, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহাকে জ্ঞান কহিবেন কি না, জানি না।" ইহার উত্তর এই—তাহাকে আমি জ্ঞান কহিব—বুদ্ধি কহিব—কিন্তু তাহার উপর আর-একটি কথা এই বলিব যে, সে বুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধির অবাধ্য বিষয়-বুদ্ধি—সেনাপতির অবাধ্য শতপতি—তাহা প্রবৃত্তি-রূপ সৈন্য-দলের নিয়ামক-পদের অযোগ্য। অনেক সময় ধর্ম্ম-বুদ্ধির অবাধ্য বিষয়-বুদ্ধিকে—অথবা যাহা একই কথা পরমার্থের অবাধ্য স্বার্থকে—প্রবৃত্তির নিয়ামক পদবীতে বলপূর্ব্বক আরূঢ় হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইলে ন্যায়-রাজা তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন তাহা অতি পরিষ্কার এবং পরিপাটী; ন্যায় বলেন "তুমি বিষয়-বুদ্ধি—তোমার প্রভু ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে—অমান্য করিয়াছ,ইহার উচিত দণ্ড এই যে, তুমি যাহার প্রভু সে তোমাকে অমান্য করিবে, তোমার প্রবৃত্তি-সকল তোমার বশে থাকিবে না।" ন্যায়ের এই বিধান অলঙ্ঘনীয়—তাই ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী বিষয়-বুদ্ধি (এক কথায় কুবুদ্ধি) সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রবৃত্তি-সকলকে বশে রাখিতে পারে না। ধর্ম্মবুদ্ধির অবাধ্য বিষয়-বুদ্ধির—দুষ্ট সরস্বতীর—মন্ত্রণা-অনুসারে রাবণ আপনার প্রবৃত্তি-সকলকে দমন করিয়া অনেক কাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-মাত্র ব্রহ্মার বর পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন, অমনি তাঁহার প্রবৃত্তি-সমূহ একেবারেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিল। অতএব হয় ধর্ম্মবুদ্ধি স্বয়ং, নয় ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত বিষয়-বুদ্ধি, এই-দুই বুদ্ধি ভিন্ন আর কোন বুদ্ধিই প্রবৃত্তির নিয়ামক পদের যোগ্য নহে। ইহা আমরা অস্বীকার করি না যে, রথ চালাইতে হইলে সারথীরও যেমন প্রয়োজন—অশ্বেরও তেমনি প্রয়োজন; সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হইলে জ্ঞানেরও যেমন প্রয়োজন, প্রবৃত্তিরও তেমনি প্রয়োজন; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথায় সায় দিতে পারি না যে, অশ্ব (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) সারথীর (কিনা জ্ঞানের) সমকক্ষ অথবা সারথী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বোধ করি কৃষ্ণকমল বাবু প্রেমকে প্রবৃত্তির মধ্যে ধরিয়াছেন—নহিলে তিনি ওরূপ কথা কখনই বলিতেন না; কিন্তু প্রেম স্বতন্ত্র এবং প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র—ইহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি।৮০

আমাদের শ্বাস দুইরূপ—নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস; আমাদের মনোবৃত্তিও দুইরূপ—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি; নিশ্বাস যেমন অন্তর্মুখী শ্বাস, নিবৃত্তি সেইরূপ অন্তর্মুখী বৃত্তি; আর, প্রশ্বাস যেমন বহির্মুখী শ্বাস, প্রবৃত্তি সেইরূপ বহির্মুখী বৃত্তি। "নি" উপসর্গ দেখিলেই অনেকে তাহাকে অভাব-বাচক মনে করেন—নিবৃত্তি শুনিবামাত্র বৃত্তি-শূন্যতা মনে করেন—কিন্তু সেটি তাঁহাদের বড়ই ভুল; নিবাস-শব্দেও বাস-শূন্যতা বুঝায় না—প্রবাস-শব্দেও প্রকৃষ্টরূপ বাস বুঝায় না; প্রবাস-শব্দে বাড়ির বাহির বুঝায়—নিবাস শব্দে বাড়ির অভ্যন্তর বুঝায়; অতএব নিবৃত্তি অন্তর্মুখী বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি বহির্মুখী বৃত্তি ইহাতে আর ভুল নাই। "নি" উপসর্গ এখানে in-উপসর্গের সহোদর এবং "প্র" উপসর্গ pro-উপসর্গের সহোদর ইহা দেখিবা-মাত্রই ধরা পড়ে। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি-সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত হয় এই জন্য তাহারা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তি) শব্দের বাচ্য। বিষয়-বুদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত হয় না, পরন্তু "যাবজ্জীবন সুখে অতিবাহন করিব" এই উদ্দেশ্যটির সাধনে ব্যাপৃত হয়। ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধি-অপেক্ষা আরো উচ্চ অঙ্গের বৃত্তি—ইহা নিতান্তই অন্তর্মুখী বুদ্ধি-বৃত্তি; ইহার লক্ষ্য বহির্ব্বিষয়ের দিকেও নহে—বিষয়ে জড়িত বিষয়ীর দিকেও নহে; ইহার লক্ষ্য ন্যায়ের দিকে—সর্ব্ব-মুলাধার মূল সত্যের দিকে—পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের দিকে—অন্তরতম পরমাত্মার দিকে; এইরূপ অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি প্রবৃত্তি-শব্দের বাচ্য নহে—নিবৃত্তি-শব্দেরই বাচ্য; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশুদ্ধ প্রেম প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি?

বিশুদ্ধ প্রীতি বিশুদ্ধ-বুদ্ধির বামে এক সিংহাসনে বসিয়া আছে—সুতরাং তাহাও নিবৃত্তি-শব্দের বাচ্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে ভাল বাসে—আপনি আপনাকে ভালবাসে—আপনাকে আপনার সম্মুখে আবির্ভূত দেখিলে (অর্থাৎ মনুষ্য পশু পক্ষী তরু লতা গিরি নদী সাগরে প্রতিফলিত দেখিলে) আনন্দিত হয়; এই যে বিশুদ্ধ ভালবাসা ইহাতে বিষয়ের আকর্ষণ নাই—প্রবৃত্তির অধীরতা নাই। বিশুদ্ধ বুদ্ধির একরূপ অমায়িক সৌন্দর্য্য আছে;—তাহা কখনও শিশুর সুকোমল মুখের সরল হাস্য-ছটায় নবোন্মেষিত দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও যুবার প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডলে বিকসিত দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও বৃদ্ধের প্রসন্ন ললাটে সমাহিত দেখিতে পাওয়া যায়;—বিশুদ্ধ বুদ্ধি—আপনারই এই সৌন্দর্য্যের প্রতি—আপনারই প্রতি—আপনি আকর্ষণ অনুভব করে। বিশুদ্ধ বুদ্ধির এই যে আকর্ষণ ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম—প্রবৃত্তির যে আকর্ষণ তাহা কাম; এই জন্য বিশুদ্ধ প্রেম শাস্ত্রে নিষ্কাম শব্দে উক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি আপনাকে আপনি প্রীতি করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে এবং অন্যেতেও যখন আপনার অন্তরতম বিশুদ্ধ ভাব প্রতিবিম্বিত দেখে তখন অন্যকেও প্রীতি করে, মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করে; আবার যখন

আমরা আমাদের আত্মাকে স্বার্থের পক্ষপাতিতা এবং বিষয়-কামনার অধীরতা হইতে পরিশূন্য করি, তখন তাহা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিরালম্ব মূল-সত্যে গিয়া ঠেকে—তখন তাহা অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়ে; এবং হিমালয়ের উচ্চশিখর হইতে যেমন ভাগীরথী অবতীর্ণ হ'ন, সেইরূপ সেই প্রেম আত্মার উচ্চতম শিখর হইতে জন-সমাজে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক মঙ্গলে প্লাবিত করে। এইরূপ অন্তর্মুখী বিশুদ্ধ প্রেমকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সমকক্ষ বলিলে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহাকে প্রবৃত্তির সমকক্ষ বলিলে বিশুদ্ধ প্রেমকে নিতান্তই হীন করিয়া ফেলা হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বিষয়াসক্তি প্রবৃত্তির সহধর্ম্মিণী; আপনার প্রতি ভালবাসা (সুতরাং আপনার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা) বিষয়-বুদ্ধির সহধর্ম্মিণী; আর, মূল সত্যের প্রতি ভালবাসা (সুতরাং সমস্ত জগতের প্রতি ভালবাসা) ধর্ম্ম-বুদ্ধির সহধর্ম্মিণী।

কৃষ্ণকমল বাবু জ্ঞানের সহিত প্রবৃত্তির সমকক্ষতা রক্ষা করিবার মানসে বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি-গুলির কার্য্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দেওয়া,জ্ঞানের কার্য্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় অবধারণ করা।" এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা দেখিতেছি যে, প্রবৃত্তি কেবল আপনার চরিতার্থতা লইয়াই ব্যস্ত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করা তাহার নিতান্তই অধিকার-বহির্ভূত। ক্ষুধাতুর পথ-হারা পথিক যখন কোন ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়, তখন সে ভাবে না "কল্য আমি কি খাইব;" "এখন—এই মুহূর্ত্তে কিছু খাইতে পাইলে বাঁচি" এই তাহার একমাত্র ভাবনা; এ অবস্থায়, কোথায় যাইতে হইবে—কি করিতে হইবে—সমস্ত উদ্দেশ্যই তাহার মন হইতে অন্তর্ধান করে। যখন আমাদের মনে কাম-ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে—ভয় লোভ প্রবল হইয়া উঠে—তখন আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যাই; জ্ঞান আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই-সব প্রবৃত্তিকে দমন করিবার বিধেয়তা প্রদর্শন করে;—বিষয়-বুদ্ধি বলে "প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে তোমার স্বার্থ-হানি হইবে," ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "ওরূপ করিলে তোমার আত্মার নির্ম্মল শ্রী কলুষিত হইয়া যাইবে—তোমার মনুষ্যত্বে দোষ পৌঁছিবে"। মনুষ্যত্ব যে কি তাহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনো বলিতেছি—মূল সত্যের প্রতি আত্মার আকর্ষণই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—তাহা কুক্কুরেরও নাই—অশ্বেরও নাই—হস্তীরও নাই। কোন কুক্কুর যদি মূল সত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তবে তাহাকে আমরা বলিব "বাহিরে কুক্কুর—ভিতরে মনুষ্য।"

আমরা বলি যে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থির-সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণকমল বাবু বলেন যে,"ধর্ম্ম-বুদ্ধি যদি Conscience এই শব্দের অনুবাদ হয়, তাহা হইলে তাহা স্বভাবসিদ্ধ হউক্ আর না হউক্, ইহাও অন্ধ অর্থাৎ অনেক সময়ে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য করে।"

ইহার মীমাংসা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে ;—

ধর্ম্মের বুদ্ধি এক পদার্থ এবং ধর্ম্মের অনুরাগ এক পদার্থ, জ্ঞান এক পদার্থ—প্রেম এক পদার্থ। বিষয়-বুদ্ধি যখন পরস্ব-অপহরণকে স্বার্থ-সাধন মনে করিয়া সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করে, ধর্ম্মবুদ্ধি তখন তাহাকে সুধীর-স্বরে বারণ করে, ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "তুমি করিতে যাইতেছ এক—করিতেছ আর ; করিতে যাইতেছ স্বার্থ-সাধন—করিতেছ অনর্থ-সাধন! সমস্ত জগৎ ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি হস্ত উত্তোলন করিতেছ!—সাবধান! জগৎ-মন্দিরে দেবতা জাগিতেছেন—হৃদয়-মন্দিরে দেবতা জাগিতেছেন—তিনি নির্নিদ্র!" কৃষ্ণকমল বাবু হয় তো বলিবেন যে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির এই যে কথা—এ এক প্রকার ভয়-দেখানে কথা,—ধাত্রী যেমন শিশুকে জুজুর ভয় দেখাইয়া চাপল্য হইতে নিরস্ত করে—ইহাও সেইরূপ ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ;—ন্যায়কে কেবল যে আমরা ভয় করি তাহা নহে, কিন্তু ন্যায়কে আমরা আন্তরিক ভাল বাসি ; আমাদের কোন প্রিয়-পাত্রের প্রতি কেহ হস্ত উত্তোলন করিলে যেমন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, ন্যায়ের বিরুদ্ধে কেহ হস্ত উত্তোলন করিলেও আমাদের মনের ভাব ঠিক্ সেইরূপ হয়। কোন পতি যদি দৈবাৎ ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া আপনার প্রিয়তমা পত্নীর সমক্ষে মুখ দেখাইতে ভয় ও সঙ্কোচ করে, তবে ভালবাসা সে ভয়ের ভিত্তিমূল—ইহা সুস্পষ্ট; সেইরূপ,—আমরা যখন স্বার্থের পরামর্শ শুনিয়া ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করি, তখন আমরা আপনারা আপনাদের অন্তরাত্মার নিকটে মুখ দেখাইতে ভীত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ন্যায়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক টান আছে। সেই যে ন্যায়, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধির প্রদর্শিত ; এবং ন্যায়ের প্রতি সেই যে আন্তরিক টান তাহা conscience নামক ধর্ম্মানুরাগী চিত্ত-বৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-বুদ্ধি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব সকলের (অর্থাৎ Moral principles ইহাদের) আলয়, conscience ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখের আলয় ; এ জন্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে conscience বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের সৌন্দর্য্যানুরাগ যেমন পুষ্পের প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত এবং কুজ্ঝার প্রতি স্বভাবতই বিরক্ত ; Conscience, সেইরূপ ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যের প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত, এবং অধর্ম্ম-বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যের প্রতি স্বভাবতই বিরক্ত। তবে, সংসর্গ ও সংস্কারের প্রভাবে Conscience এর স্বভাব কিয়ৎ কালের জন্য বিগড়াইয়া যাইলেও যাইতে পারে।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের শিরোভূষণ কাণ্ট বুদ্ধি-বৃত্তি (Intellect) ব্যতীত আর একটি আভ্যন্তরিক বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি তাহার নাম দিয়াছেন "Internal sense" অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ; এই অন্তরিন্দ্রিয়কে কবিরা বলেন হৃদয়, দার্শনিকেরা বলেন চিত্ত। চিত্ত

সুখ দুঃখের আলয়। বহির্বস্তুর ক্রিয়া দ্বারা যেমন আমাদের বহিরিন্দ্রিয়—এবং তাহার সঙ্গে আমাদের চিত্ত—উপরক্ত (affected) হয়, সেইরূপ আবার আমাদের বুদ্ধি-ক্রিয়া-দ্বারাও আমাদের চিত্ত উপরক্ত হয়,—বিষয়-বুদ্ধি-দ্বারাও উপরক্ত হয়—ধর্ম্ম-বুদ্ধি-দ্বারাও উপরক্ত হয়। ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিরোধে চলিয়াও যখন বিষয়-বুদ্ধি কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, তখন "অমুককে কেমন জব্দ করিয়াছি—কেমন ঠকাইয়াছি—আমি কেমন বুদ্ধিমান্" এই বলিয়া চিত্তে একরূপ বিষাক্ত আসুরিক আনন্দ উপস্থিত হয়; আবার, যখন ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধিকে আপনার অধীনে চালাইয়া কোন ইষ্ট লাভ করে, তখন "আমি একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি" এই বলিয়া চিত্তে একরূপ অমৃতময় দিব্য আনন্দ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আসুরিক আনন্দ-দ্বারা আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়, এবং শেষোক্ত দিব্য আনন্দ-দ্বারা আমাদের চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়। আমাদের চিত্ত যদি কখনও কোন গতিকে বিষকে অমৃত—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম—মনে করে, তবে তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি অপরাধী নহে। প্রবৃত্তিও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে—বিষয়-বুদ্ধিও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে—ধর্ম্ম-বুদ্ধিও আমাদের চিত্তের উপর কার্য্য করে; তাহার মধ্যে আমাদের চিত্ত যদি কুসংস্কারের বা কুসঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তির দিকেই অথবা বিষয়-বুদ্ধির দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়, তবে তাহাতে মনুষ্যের অপূর্ণতাই প্রকাশ পায়—ধর্ম্ম-বুদ্ধির অসারতা প্রকাশ পায় না। জাহাজের নাবিক যদি নির্দ্দেশ-পত্র (chart) অবজ্ঞা করিয়া আপনার অভিরুচি মতে জাহাজ চালায়, তবে সে দোষ কিছু-আর নির্দ্দেশ-পত্রের নহে—সে দোষ নাবিকের। ফল কথা এই যে, আমাদের সম্মুখে—গম্য-স্থানে যাইবার একটি মাত্র সরল পথ আছে এবং অসংখ্য বক্র পথ আছে,—কোনোটা বা অধিক বক্র—কোনোটা বা অল্প বক্র; সেই যে একটি-মাত্র সরল পথ তাহাই ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপদিষ্ট পথ। কখনও কাহারো প্রতি শাঠ্য করিবে না—ইহাই সরল পথ; শঠে শাঠ্য করিবে—ইহা তাহা অপেক্ষা বক্র পথ; দেশের উপকারের জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা আরো বক্র পথ; আপনার লাভের জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা ততোধিক বক্র পথ; কৌতুক দেখিবার জন্য শাঠ্য করিবে—ইহা ততোধিক; —ধর্ম্ম-বুদ্ধি কেবল ঐ প্রথম পথটি অবলম্বন করিতে বলে, অবশিষ্ট সকল-পথই অগ্রাহ্য করে। আবার, ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা না শুনিয়া কেহ যদি বক্র পথ অবলম্বন করে, তখনও ধর্ম্ম-বুদ্ধি তাহাকে সরল পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প-বক্র পথ অবলম্বন করিতে বলে। এখনকার যেরূপ সমাজ তাহাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রদর্শিত ঠিক্ সরল পথটি অবলম্বন করা লোকের পক্ষে দুরূহ; এ জন্য কোন ব্যক্তি ঈষৎ বক্র পথ অবলম্বন করিলে লোকের চক্ষে তাহা নিন্দনীয় হয় না; —কোন ব্যক্তি যদি শঠে শাঠ্য ক-

রিয়া জয়-লাভ করে—লোকে বলে "এই ঠিক্ হইয়াছে—যেমন তেমনি হইয়াছে—বিষস্য বিষমৌষধং," কিন্তু লোকে যাহাই বলুক্ না কেন—ধর্ম্ম-বুদ্ধির মুখে এক ভিন্ন দুই কথা নাই ; ধর্ম্ম-বুদ্ধি ঠিক্ সরল পথ-টি অবলম্বন করিতে বলে—ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে ! সেই সরল পথটি অবলম্বন করিতে হইলে এক-দিকে ন্যায়বান্ ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্থির রাখা আবশ্যক, আর-এক দিকে বিষয়-বুদ্ধিকে সেই ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে চালনা করা আবশ্যক। অত্যাচারী রাজা যখন প্রজা পীড়ন করিতেছে, তখন আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি এক দিকে এই বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করে যে, "উপরে ঈশ্বর আছেন," আর-এক দিকে সেই রাজার অত্যাচার নিবারণার্থে বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে বলে ; কিন্তু আমরা যদি সেই রাজাকে অন্যায়-রূপে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি, তবে ধর্ম্ম-বুদ্ধি আমাদিগকে বলে "ন পাপে প্রতি পাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ" পাপাচারীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না—সর্ব্বদাই সাধু থাকিবে।" যিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের উপদিষ্ট সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলেন—এরূপ লোক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ ; বিষয়-বুদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন নেপোলিয়ন দুর্লভ, ধর্ম্ম-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও সেইরূপ অজেয় ধর্ম্মবীর দুর্লভ ;—কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রদর্শিত মূল-তত্ত্ব-সকলের এক চুলও এদিক্ ওদিক্ হইতে পারে না।

ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিতান্ত অবাধ্য হইলে কেহ যে, অমনি অমনি পার পাইয়া যাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমাদের কোন-একটি প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইলে যেমন আমাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেইরূপ আমাদের কাহারো স্বার্থ উচ্ছৃঙ্খল হইলে ন্যায়ে আঘাত লাগে; এবং সেই আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে পরিণামে দাঁড়ায় এই যে, স্বার্থ যেমন আপনার প্রভু ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, সেই দৃষ্টান্ত-অনুসারে স্বার্থের অধীনস্থ প্রবৃত্তি-সকল ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়া স্বার্থকে ঘোর বিপদে ফেলে। ন্যায়ের প্রতিঘাতেই রোম-নগর অপহৃত ধন-ভারে ধরাশায়ী হইয়াছিল—স্পেন্ এবং পোর্টুগাল্ আমেরিকার রুধিরাক্ত স্বুবর্ণ-ভারে অধঃপতিত হইয়াছে—আর কাহার ভাগ্যে কি আছে ভবিষ্যতের ইতিহাসই তাহা বলিতে পারে। স্বার্থের দেবতা—আমার আমি, তোমার তুমি, প্রতিজনেরই বিভিন্ন ; কিন্তু ন্যায়ের দেবতা আমারও যিনি—তোমারও তিনি—সকলেরই এক। "একো দেবঃ সর্ব্ব-ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা" এক দেবতা সর্ব্ব-ভূতে নিগূঢ়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা।" আমি না থাকিলে যেমন আমার প্রবৃত্তি-সমূহকে আট্‌কাইয়া রাখিবার বাঁধ থাকে না, এক কথায়—স্বার্থ থাকে না, সেইরূপ—ন্যায়ের জাগ্রত দেবতা মূল-সত্য না থাকিলে নানা ব্যক্তির নানা স্বার্থকে আট্‌কাইয়া রাখিবার বাঁধ থাকে না, এক কথায়—পরমার্থ থাকে না—ধর্ম্ম-থাকে না ; উপনিষদে তাই আছে "স সেতু র্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভে-

দায়” লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে তিনি বিধরণ সেতু অর্থাৎ আট্‌কাইয়া রাখিবার বাঁধ। তবেই হইল যে, মূল-সত্যকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম হইতেই পারে না। অতএব, আমি নাই অথচ স্বার্থ সাধন করিতে হইবে—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা নাই অথচ পরমার্থ সাধন করিতে হইবে—এ কথা শুনিয়া যদি কাহারো মনে হয় “মাথা-নাই-তার-মাথা-ব্যথা” তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মের মূল কথা তিনটি;—(১) সামান্য লৌহকে যেমন প্রকরণ বিশেষ দ্বারা শোধিত করিয়া চিক্কণ লৌহ (ইস্পাৎ) করিয়া তোলা হয়, সেইরূপ বিষয়-বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা শোধিত করিয়া শুভ বুদ্ধি করিয়া তোলা কর্ত্তব্য; ইহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম-সাধন; (২) সেই শুভ বুদ্ধি অনুসারে বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য; ইহাই সাংসারিক ধর্ম্ম-সাধন; (৩) পারমার্থিক ধর্ম্ম এবং সাংসারিক ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে যথোচিত লয় বাঁধিয়া গেলেই ধর্ম্ম-সাধন সর্ব্বাঙ্গীনতা প্রাপ্ত হয়;—ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# তপোবন দর্শন।

ভুলিব না, জননি গো, সেই চারু বেশ,
উজ্জ্বল করেছ যাতে হিমালয় দেশ!
হিমালয়-চূড়ায় ফুটিছে শশধর
অর্দ্ধ অঙ্গ লুকাইয়া—কিবা মনোহর!
কোমল কিরণ কিবা করে ঝলমল,
ভূধর, ভূধর-শৃঙ্গ করিয়া উজ্জ্বল!
কি শোভা ধরিল মরি পৃথিবী গগন,
পূর্ণচন্দ্র গিরিচূড়ে উঠিল যখন!
নিখিল ভুবন ‘পরে কিরণ তরল,
সহাস্য বদন, বন, গিরি, স্থল জল!
প্রকৃতি আনন্দে যেন, স্বপনে জাগিয়া,
আলোকে দেখিছে রূপ বিরলে বসিয়া!
শত খণ্ড শশধর বুকের উপর—
চলেছে অচলতলে গঙ্গার লহর!
মাখিছে চাঁদের আলো কিরণে ফুটিয়া,
খেলিছে উপলখণ্ডে লুটিয়া লুটিয়া!
কল কল কল ভাষ জলের উচ্ছ্বাস,
শত শত মুক্তাঝারা ধারাতে বিকাশ!
কোথাও ফেনিল জল ফুটে শীলাতলে—
কাশপুষ্প বন যেন প্রস্ফুটিত জলে!
মধ্যস্থলে চলে বেগে মন্দাকিনী-ধারা,
দু’ধারে গগনস্পর্শী ভূধর পাহারা!
স্থল, জল, গিরি, বন, সুষুপ্তির সুখে;
স্বপনের হাসি যেন প্রকৃতির মুখে!

ভুলিব না সে লছমন্‌-ঝোলা, বসুন্ধরে,
শূন্য-কোলে রজ্জু দোলে গঙ্গার উপরে;
একধারে তপোবন-তলভূমি শেষ,
অন্য ধারে ঠেকেছে হিমাদ্রি-কটিদেশ,

মধ্যদেশে রজ্জুপথে সেতু চমৎকার
ঝোলাতে বসিয়া পান্থ হয় পারাপার!

ভুলিব না পর্ব্বতের সে খর বাতাস,
প্রহর নিশিতে যার প্রখর প্রকাশ!
সারানিশি ঝটিকার গর্জ্জন গভীর,
না হ'তে প্রহর বেলা আপনি সুস্থির!
ভুলিব না গঙ্গাতটে সে ক্ষুদ্র আলয়,
জম্বুরাজ্ দয়াগুণে পথিক আশ্রয়;
গবাক্ষে বসিয়া যার ভরিয়া নয়ন,
দেখিলাম হিমালয় নিখিল ভুবন!

বাল্মীকির তপোবন বলে এই স্থান,
দেখিলে প্রত্যক্ষ যেন সত্য হয় জ্ঞান!
জিনিয়া পদ্মের কলি যাঁহার হৃদয়,
ধ্যানে যাঁর রামায়ণ গীতের উদয়!
জপ তপ ধ্যান ভূমি তাঁরি বটে এই,
ভারতে তুলনা দিতে স্থান বুঝি নেই!
দেবভূমি হিমালয় শুনিতাম আগে,
নেত্রে হেরে চিত্র তার চিত্তে আজি জাগে!
ধরামাঝে যত দিন জীবন ধারণ,
ভুলিব না কখনও এ চারু তপোবন!

ভুলিব না কখনও সে অচল-শরীর,
জাহ্নবীর পারে যেথা সীতার কুটীর!
পড়েছে নিশির ছায়া শৈলতরুদলে,
করেছে নিবিড়তর আরো সে অচলে;
এক্‌টী দীপের আভা সে অচল গায়—
বন-অন্ধকারে কিবা সুন্দর দেখায়!
শংখ্য ঘণ্টা ঝাঁঝর বাজিছে দূরতর,
নিশিতে বিজনভূমে কিবা সুখকর!
সীতার বর্জ্জন কথা সে বন আখ্যানে,
ভুলিব না কখনও তা দেহে ধরি প্রাণে!

ভুলিবারও নয়, সে পবিত্র হৃষীকেশ,
অচলবেষ্টিত স্থল হিমাচলদেশ!
বিরাজে মন্দির সেথা বিজন গহনে,
শ্রীরাম ভরত মূর্ত্তি শিলার গঠনে!

ভুলিবারও নয়—সেই কুব্জাম্বরকূপ,
গজগিরি-গাঁথা সরঃ দেখিতে স্বরূপ;
শীত গ্রীষ্ম ষড়ঋতু সম উষ্ণতায়,
গভীর পাথার জল প্রবাদ কথায়।
এইখানে ত্রিবেণীর প্রথম ত্রিধারা—
সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী ত্রি-আকারা!
ভুলিবারও নয়—সেই শত্রুঘ্নধাম,
তীর্থ সুপবিত্র অতি মৌনরেতা নাম,
হৃষীকেশ ছাড়িয়া যাইতে তপোবন
পথের প্রথমে যার সহিত মিলন।

কি দেখিনু ভয়ঙ্কর বিকট কান্তার,
ভুলিব না—এজনমে কখনও সে আর!
দ্বিমানুষ ছাড়ায়ে উঠেছে শরকায়, *
আরণ্য করিণী তার কোথায় লুকায়!
মাঝে মাঝে পথ নাই—ব্যাঘ্র-ভয় পথে,
ক্রোশ ছয় বন খালি বেষ্টিত পর্ব্বতে!

দুর্গম পর্ব্বত-নদ শৈলে ওতপ্রোত,
মাঝে মাঝে বহিতেছে কত খর স্রোত;
পাষাণ পঞ্জরে ধারা এবে রজ্জু প্রায়,
ভয়ঙ্কর মূরতি বিরাট বরষায়।
তটিনী সুসুয়া, সোং, নদী কালাপানি,
বাঘ্‌রাও সুখ্‌রাও, কত নাম জানি,
কাটিয়া চলেছে স্রোতে ভীষণ কান্তার,
সে বন, সে শৈল-নদ ভুলিব না আর!
পথি মাঝে † রায়ওলা অরণ্য সৌষ্ঠব,
ভুলিব না তাহার তরুর যে গৌরব!

কি অদ্ভুত(ই) মূর্ত্তি তব হেরি, শৈলরাজ,
বিশাল অনন্ত কোলে করিছ বিরাজ!
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন ঐরাবত কত
শুণ্ড বাড়াইয়া ধরিতেছে শূন্যপথ!
স্তরে স্তরে পরে পরে অসংখ্য পর্ব্বত,
এই শেষ—এই পুনঃ তেমতি বৃহৎ!

* ওদেশে "চরি"বনও বলে।
† রায়ওলা গ্রামের নাম।

জুড়িয়া চলেছে দিক নাহি অন্ত সীমা,
নয়ন পরাণ স্তব্ধ হেরিয়া গরিমা!
কিবা স্বচ্ছ নিরমল বায়ুস্তর তায়,
কুয়াশার গুড়া যেন কিরণ বেড়ায়!
সূর্য্যের কিরণে কিবা দেখিতে সুন্দর
দূর ভূধরের নীল তনু মনোহর!
আরণ্য বিটপে ছায়া কিবা সুশীতল,
শৈলজ ওষধি লতা ধরে কতস্থল;
অদৃশ্য পুষ্পের গন্ধে স্নিগ্ধ কোন স্থান,
বায়ু হতে আপনি বহিছে যেন ঘ্রাণ!
ভুলিব না কখনও তোমারে, গিরিরাজ,
ভারতের শিরে চির মুকুট বিরাজ!

জননি, তোমারও কথা—ভুলিব না, হায়,
এ দেশে জনম মাতঃ সকলি বৃথায়!
দূর দেশবাসীগণ করি কত পণ
আসিয়ে তোমার কোলে করিছে ভ্রমণ;
এদেশে জনম আর এদেশে মরণ—
আমরা ভারতবাসী ভাবি তা স্বপন।
স্বদেশ, স্বজাতি-শাখা স্বধর্ম্মের স্থল,
নয়নে দেখিব সাধ—সে সাধও বিরল,
যে যার ভবনে কূপমণ্ডূক কেবল!
হেন জাতি কোথা আর ধরে এ ধরণী—
ভুলিব না সে কথাও ভারত জননি!

---

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে দুর্লভ হইলেই বুঝি দ্রব্যের গৌরব, বাধাতেই বুঝি ভাবের স্ফূর্ত্তি! খাঁজাহা খাঁ যখন শুনিলেন, মুন্না তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত, তখন তাঁহার নিকট মুন্নার গৌরব আরো বাড়িয়া উঠিল, প্রতিহত হইয়া তাঁহার বাসনা আরো উথলিয়া উঠিল।

মুন্না যে তাঁহার প্রার্থনা এখন অগ্রাহ্য করিবে—তাহা জাহা খাঁ মনেই করেন নাই, অভাগিনী অনাথিনী পরিত্যক্তা মুন্না এই অবস্থায় এখনো যে রাজ রাজেশ্বর নবাব খাঁজাহার পত্নী হইতে অস্বীকার করিবে—ইহা তিনি কিরূপে মনে করিবেন! এ সংবাদে সহসা তাঁহার আশার বুকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় সে নৈরাশ্য, সে আঘাত ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, মনের মধ্যে মুন্নার যে সাধের ছবি আঁকিয়াছিলেন, ক্রোধের অনলে তাহা ভস্মীভূত করিতে প্রয়াস পাইলেন, প্রবাহিত বাসনা-স্রোতকে সবলে জমাট বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন—কিন্তু কিছুই হইল না; মুন্নার সে দিব্যছবি আরো জলন্ত মহিমায় তাঁহার মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল—বদ্ধ বাসনার স্রোত সহস্র গুণে প্রবল হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি তাহার মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

খাঁজাহার কখনো যে ভালবাসার অভাব ছিল এমন নহে, যখন যাহাকে নূতন বিবাহ করিয়াছেন তাহার প্রেমেই তখন ভরপূর হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু কোন প্রেমে আর কখনো তাঁহার হৃদয়ে এরূপ আগুণ জ্বলে নাই, এই নবোদিত প্রজ্জ্বলন্ত আগুণের নিকট সে সকলি যেন নিস্তেজ, প্রশান্ত, শীতল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

নবাবের আজ্ঞামতে ময়নাই তাঁহার কাছে খবর লইয়া আসিয়াছিল,—সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার নিরাশ-প্রকটিত ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার তীব্র দৃষ্টিতে

নবাবের অন্তর ভেদ হইল—সে তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এখনো ত উপায় আছে"

নবাব শা চমকিয়া উঠিলেন—এখানে যে আর একজন কেহ আছে—সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বাহিরের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে যেন লোপ পাইয়াছিল। সচকিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন—নীরব ভাষায় যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপায় ?"

সে বলিল—"হুজুর! আপনার দাসানুদাস ভৃত্য মাদার আলি আপনার হুকুমে হাজীর আছে—হুকুমের মাত্র অপেক্ষা—"

নবাবের প্রোজ্জল চক্ষুদ্বয় একবার বিস্ফারিত হইল মাত্র, কিন্তু তিনি কোন কথাই কহিলেন না—কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না,—আবশ্যকও ছিল না, মনে মনে দুজনে দুর্জনকে বুঝিতে পারিলেন।

এমন অনেক কাজ আছে যাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিতেও মানুষের ইচ্ছা করে না, ইহাও সেইরূপ একটি। সে কাজ করিতে করিতেও মানুষ ইচ্ছা করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে চাহে, যেন তাহাতেই তাহার দূষণীয়তা ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

ময়না বুঝি নবাবের সঙ্কোচ বুঝিতে পারিল,—সে সাহস করিয়া বলিল "তাহাতে ত দোষ কিছুই নাই—শেষে আপনিই বশ হইয়া যাইবে"

কাজটার দোষ যাহা কিছু আর যদি কিছু থাকে ত যেন কেবল ঐ ভয়টা। ময়না ভাবিল—ঐ জন্যই নবাবের যত বুঝি সঙ্কোচ। কিন্তু কথাটা বোধ করি নবাবের তত ভাল লাগিল না—তাঁর কপালে রেখা পড়িল—তিনি ক্রোধ কটাক্ষে ময়নার দিকে চাহিলেন, সে তখন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, অভিবাদন করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। দাওয়ানকে গিয়া মনের কথা ভাল করিয়া খুলিয়া বলিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সমস্তই চলিয়া গেল না, সে যে কথা বলিয়া গিয়াছিল—ঘরের মধ্যে সেই কথাগুলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল,—নবাব শা শিহরিয়া উঠিয়া সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

সলেউদ্দিন চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একটি পয়সা বাকী রাখিয়া যান নাই, দেনায় সকল ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবশিষ্ট যথা সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল, তবু দেনা শোধ হইল না, পাওনাদারেরা শেষে বসতবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মহম্মদেরও কিছু নাই, জাহাজ মারা পড়ায় সমস্ত লোকসান হইয়া গিয়াছে, তিনি থাকিলেও বা এ সময় যাহা হউক একটা ব্যবস্থা হইত—কিন্তু তিনিও এখানে নাই, মুন্না একেবারে নিঃসহায়, নিরাশ্রয়। দুদিন পরে—যে কোথায় মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইবে—তাহার ও একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত নাই। বুঝি সে অনাথিনী বালিকা অদৃষ্টের দোর্দ্দণ্ড তোড়ের মুখে, বাত্যাহত কুটাগাছটির মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতে চলিল!

একথা খাঁজাহা খাঁ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মনে আর একবার আশার সঞ্চার হইল।

নবাবের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, দাওয়ানজির মনেও তাহাতে বড় ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। নবাবের মনের গতি তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে লাভের ত কথাই নাই, না পারিলেও সহানুভূতি দেখাইবার এই উত্তম অবসর—তিনি সুযোগ পাইয়া নবাবকে বলিলেন, "হুজুর বলেনত আর একবার প্রস্তাব করা যায়, মেয়েমানুষ দর্প চূর্ণ না হলে'

বশ হয় না, এবার আর কোন মার নেই” নবাব শা নিজেও উহা মনে করিতেছিলেন।

আর একবার রীতিমত মুন্নার নিকট প্রস্তাব পাঠান হইল, কিন্তু দুই একদিন পরে আবার যখন দেওয়ান থোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া নবাবকে আসিয়া বলিলেন—মুন্না এখনো অসম্মত, তখন নবাবের আর সহ্য হইল না, তিনি রাগিয়া বলিলেন—“একজন সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে বার বার এই অপমান! কে তোমাকে এমন কাজ করিতে বলিল?” দাওয়ান বলিতে পারিত—“আপনিই বলিয়াছিলেন” কিন্তু সে কথা হজম করিয়া বলিল—“হুজুর কসুর হইয়াছে, মাপ করিবেন। কিন্তু এ অপমানের কি আর প্রতিশোধ নাই।”

নবাব। “প্রতিশোধ! সামান্য স্ত্রীলোকের উপর প্রতিশোধ লইয়া তোমরা বীরত্ব মনে করিতে পার—আমি করি না।”

দেওয়ান। “আমি তাহা বলিতেছি না। ইচ্ছা করিলে আপনার মনস্কামনা এখনি পূর্ণ হইতে পারে, হুকুমের মাত্র অপেক্ষা”—নবাব একবার পূর্ণ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, ময়না যাহা বলিয়াছিল সেই একই কথা। কিন্তু এবার আর নবাব শা শিহরিয়া উঠিলেন না—তিনি বলিলেন—“কিন্তু জোর করিয়া কি হৃদয় পাওয়া যায়।”

দাওয়ান। হুজুর—একথা যখন আপনি বলিতেছেন—আমার আর কথা চলে না। কিন্তু আপনি কি জোর করিয়া হৃদয় লইতে যাইতেছেন? আপনি কি আপনার প্রাণ মন দিয়া পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়া নাই? হৃদয় দিয়া হৃদয় পাইবেন না—এ কি কাজের কথা? নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে কি তাচ্ছিল্য করিতে পারিয়াছিলেন?”

নবাব বলিলেন—“কিন্তু?”

দাওয়ান। “বুঝিয়াছি—আপনি বলিতেছেন—ইহা দোষের কাজ। কিন্তু নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবেন ইহাতে দোষ কোথায়? যদি পরেও তাহার ইচ্ছা না হয়—না হয় বিবাহ নাই করিবেন, তাহার অদৃষ্টে না থাকে, আবার পথের ভিখারিণীকে পথে ছাড়িয়া দিবেন—তাহা হইলে ত আর কোন দোষ হইবে না।”

নবাবের আর কিছু বলিবার রহিল না। আসল কথা, ঐরূপ একটা যুক্তির জাল দিয়া বিবেককে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য খাঁজাহা খাঁ উন্মুখ হইয়াছিলেন, বুঝি কেবল একটা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না; এখনো অন্যায় জানিয়া শুনিয়া একটা অন্যায় করিতে তাঁহার মন উঠিতেছিল না। আর কিছু নহে, বোধ করি উহা কেবল অনভ্যাসের সঙ্কোচ, তিনি আরকি ওরূপ কাজ আগে কখনো করেন নাই। তবে কিছু দিন আরো যাইতে দিলে—হয়ত বা এ সঙ্কোচটুকুও আর মনে স্থান পাইত না, কেন না প্রবৃত্তি একবার যাহাকে দাস করিয়াছে—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা তাহার আর কতদিন থাকে।

দাওয়ান তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাঁহার বাসনা তৃপ্তি করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া যদি সে সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিতে পারে—ত নবাব যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা সে বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াই ওরূপ কথা বলিল, নহিলে ন্যায়ের জন্য তাহার বড় একটা মাথা ব্যথা পড়ে নাই।

নবাব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“আচ্ছা এখন যাও, পরে যাহয় বলিব।”

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### প্রবৃত্তি।

দেওয়ান চলিয়া গেল, নবাবের মনে নানা কথা তোলপাড় করিতে লাগিল, নানা দুর্দ্দমণীয় তর্ক বিতর্ক উঠিতে লাগিল। আজ বলিয়া নহে যেদিন ময়না ঐ কথা বলিয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে ঐরূপ একটা বিপ্লব চলিয়াছে, সেই দিন

হইতে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে কে যেন দিনরাত উত্তেজিত করিতেছে—তিনি সমস্ত হৃদয়ের বল একত্র করিয়া দিনরাত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সেই দিন হইতে অন্তঃপুরের প্রমোদ কোলাহল নবাবের আর তেমন ভাল লাগে না, তিনি মাঝে মাঝে নির্জ্জন নিকুঞ্জে, বাগানে, গাছ পালার মধ্যে একাকী আসিয়া বসেন, হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠেন, সেই নিকুঞ্জের পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন বলিয়া উঠে "তাহাতে দোষ কি ?" নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনীতে গভীর নিদ্রার মাঝখানে হঠাৎ যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, অমনি যেন শুনিতে পান, "তাহাতে দোষ কি ?" তিনি অমনি বিবেকের উচ্চস্বরে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া সেই বিদ্রোহীস্বরকে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহেন। সেই দিন হইতে জাহাখাঁর আর শান্তি নাই, শোয়াস্তি নাই, সেই দিন হইতে তাঁহার দুই আমির মধ্যে অনবরত বিবাদ চলিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আর কথনো পড়িতে হয় নাই. অভ্যাসের মায়াকাটির স্পর্শে তাহার হৃদয় এখনো পাষাণ নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে নাই, অনুতাপহীন-চিত্তে স্বার্থের চরণে হৃদয় বলি দিতে এখনো তিনি নিপুণ হয়েন নাই, তাই প্রবৃত্তি তাঁহার কাণে কাণে অনবরত উত্তেজনার এই মহামন্ত্র জপিতেছে।

কিন্তু আজ আর তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিন যে সংশয়ের কাছ হইতে ভয়ে দূরে পলাইয়া যাইতেছিলেন আজ তাহাকেই যুক্তি বলিয়া ধরিলেন, আজ চোরা বালীকে কঠিন মাটি বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন, আজ তিনি ভাবিলেন—"সত্যইত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিব তাহাতে দোষ কি ; হৃদয় প্রাণ দিয়া পূজা করিব—ইহা কি দোষের হইতে পারে, এ পূজা কি কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে ?—না তাহা নহে, "তাহা হইতে পারে না, পারে না।"—বার বার করিয়া তাহাকে কে বলিতে লাগিল—"না তাহা নহে, তাহা হইতে পারে না।" এ কথায় আজ আর তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না, আজ তিনি তর্কে হারিয়া গেলেন, যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—তাঁহার যথার্থ আমি আজ প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র আমির কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম হইয়া ডুবিয়া গেল, মহান তিনি প্রবৃত্তির স্রোতে আজ আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন—আজ তিনি নিজের নিকট নিজে প্রতারিত হইলেন। বাসনার অতীত, প্রবৃত্তির অতীত, স্বার্থের অতীত মনুষ্যের যে অন্তর দেশ আছে যদি সেই নিভৃত অন্তরে লুকাইয়া অনুসন্ধান করিতে পারিতেন ত খাঁজাহা বুঝিতে পারিতেন—তিনি কিরূপ প্রতারিত। কিন্তু আত্ম পরীক্ষা করিতে তাঁহার সাহস হইল না, তিনি সেদিক হইতে সভয়ে মুখ ফিরাইলেন। সূর্য্যের আলোকে যেমন সহস্র তারকা হীন জ্যোতি হইয়া পড়ে এক বিলাসিতার প্রাবল্যে তাঁহার অন্য সহস্রগুণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তাঁহার চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিয়া একে একে সে সব যেন নিভিয়া গেল ; তাঁহাকে আর কিছু দেখিতে শুনিতে দিল না, এতদিন তিনি অজ্ঞাতভাবে দিন দিন যে আবর্ত্তের দিকে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন—আজ অন্ধকারে একেবারে হুড়মুড় করিয়া তাহার মধ্যে পড়িয়া গেলেন ; আর উঠিবার শক্তি রহিল না।

কে তুমি মানব-প্রবৃত্তি জয় করিতে চাও, —সাবধান! এইরূপ করিয়াই লোকে অগ্রসর হয়, এইরূপেই লোকে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, প্রবৃত্তির ভয়ানক আবর্ত্ত-পথের প্রথম সীমায় একবার পা বাড়াইলে—অবস্থাচক্রের ঘূর্ণ তোড়ে একেবারে শেষসীমায় আনীত না হইয়া চেতনা জন্মে না! চেতনা হইলেও তখন আর বল থাকে না, বল থাকিলেও অবসর থাকে

না, জানিয়া শুনিয়া সাধ করিয়া তখন বহ্নি-মুখগামী পতঙ্গের ন্যায় প্রবৃত্তির আগুণে পুড়িয়া মরিতে হয়—বুঝি আর ফিরিতে পারা যায় না! সাবধান! প্রবৃত্তির অঙ্কুর যেন কখনো ফুটিয়া উঠিতে না পায়।

হায়! কে বলিতে পারে এইরূপে কত দয়াদ্রচেতা নিষ্ঠুর হইয়াছে, কত পুণ্যাত্মা পাপী হইয়াছে, কত রত্নে কলঙ্ক পড়িয়াছে?

আজ যে পাষণ্ড, মনুষ্য রক্ত পান করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, হয়ত একদিন পরের এক বিন্দু অশ্রু দেখিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইত; আজ যে রাক্ষসী জঘন্য পৈশাচিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া জীবন কাটাইতেছে, হয়ত একদিন পাপের ক্ষুদ্র দৃশ্য মনে করিতেও সে শিহরিয়া উঠিত, কে জানে একটা রাক্ষসী-প্রবৃত্তির হস্তে পড়িয়া অবস্থা চক্রে উহাদের এই দারুণ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন নহে?

জাহা খাঁ—কে বলে তুমি ক্ষমতাবান? প্রবৃত্তিরহাতে যে একটা সামান্য খেলেনা, কুটার মত ফুঁয়ে উড়াইয়া প্রবৃত্তি আপন পদতলে যাহার যাহা কিছু সমস্তই চূর্ণ চূর্ণ করিল, সেত দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল! সংসারে কে না দুর্ব্বল, তবে যিনি আপনার দুর্ব্বলতাকে চিনিয়া ঘৃণা করিতে পারিয়াছেন—তিনিই ক্ষমতাবান। কিন্তু খাঁজাহা যে মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতার উপর তোমার ভালবাসা জন্মিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ, ক্ষমতাকে স্বহস্তে চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়াছ।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে মাতা পুত্রে কথা হইতেছিল।

বুড়ি মা কহিল "হাজার টাকা! কত সে? কগণ্ডা?"

ছেলে কহিল—"ক গণ্ডা অত আমি জানিনে, গণ্ডা ফণ্ডা ক'রে সে গোণা যায় না"

বুড়ি বলিল—"তবু এই গণ্ডা কুড়িক হবে?

ছেলে। "তার ঢের বেশী"

বুড়ি। "তার ঢের বেশী? সে তবে কাহন নাকি? ও পাড়ার ফতে খাঁর আয়ির নাকি কাহন ভোর ধন ছিল, কিন্তু তা কেমন চক্ষে ত কখনো দেখিনি!"

ছেলে। "উঁ হুঁ তারো বেশী।"

বুড়ি। "তারো বেশী! তবে গুণব কি ক'রে?"

বুড়ির মহা ভাবনা হইল, ছেলে বলিল "তা নাইবা গুণলি"

বুড়ি ফোগলা মুখ খুলিয়া শিশুদের মত সাদাসিদে ধরণে চাহিয়া রহিল, এমন আজগুবে কথা যেন সে কখনো শুনে নাই, তাহার পর বলিল "ওকি কথা বলিস, না গুণলে সব থিতব কি ক'রে? এই দেখ না—ঘরখানি ছাইতে কোন পাঁচগণ্ডা না লাগবে? তার পর বউ একটি আনতে হবে, সেই বা কোন পাঁচ গণ্ডার কমে হবে? টাকার জন্য এতদিন বউএর মুখ পর্য্যন্ত যার দেখতে পাইনি।" বলিয়া বুড়ি দুই এক ফোঁটা চোখের জল মুছিল—

ছেলে বলিল—"আবার প্যান প্যান আরম্ভ করিস নে, সে সবই হবে—"

বুড়ি। "শুধু সে সব হলে ত চলবে না, আমার একটি বউ, ঘরে যে আনব—, দু এক খানা গহনাও ত দিতে হবে, রূপার না হ'ক কাঁসার দু চারখানওত চাই। একজোড়া পাঁইজোড়, মল, চুড়ি, তাবিজ, সিঁতি, এ না দিলে কিন্তু আমি মুখ দেখাতে পারব না?"

ছেলে। "ওতে কত লাগবে?"

বুড়ি—"সে দিন বক্সির মা বউএর জন্য ঐ সব কিনেছে, গণ্ডা দুই তার খরচ হয়েছে—"

ছেলে। "সেত ভারী, তোর বউকে অমন গণ্ডা গণ্ডা গহনা দিতে পারবি—"

বুড়ি। (মহা আহ্লাদে) বলিস কি? তবে কিন্তু আর কিছু না হোক্ পাঁইজোড়টা রূপার দিতে হবে—বউ আমার রূপার পাঁইজোড় পরে কেমন ঝুম ঝুম করে বেড়াবে। ১০ গণ্ডা টাকায় সে বেশ হবে—

ছেলে। "তা দেওয়া যাবে"

বুড়ি। "তা দেওয়া যাবে! তবে তাবিজটাও কেন রূপার হোক না? পাঁচ গণ্ডায় সে দিন একজোড়া ওপাড়ার মতির মা গড়িয়েছে—"

ছেলে বলিল—"আচ্ছা তা দিস—"বুড়ীর তখন আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না—সে একে একে তখন সমস্ত গহনা গুলিই আগে রূপার করিবার বন্দবস্ত করিয়া ফেলিল, তাহার পর সত্যই যেন সে টাকা গুণিতেছে এইরূপ ভাবে শূন্য মাটীর উপর হাত রাখিয়া এক একটা গহনার জন্য গণ্ডা গণ্ডা করিয়া টাকা ভাগ করিয়া রাখিতে লাগিল, ভাগ করিতে করিতে বলিল—"হাঁরে আলি এত ধন কড়ি কোথায় পেলি তুই?"

ছেলে বলিল—"পেলুম আর কই? পাব বল?"

বুড়ি। "তা ও একই কথা। না হয় পাবি, তা' কে দেবে কে বাবা।"

ছেলে। "খা জাহা খাঁ।"

বুড়ি। "খাঁ জাহা খাঁ। জয় হোক তাঁর। তা কেন দেবে বল দেখি?"

ছেলে চুপ করিয়া রহিল। মা বলিল, "চুপ করলি যে?"

ছেলে বলিল—"অমনি কি কেউ টাকা দেয়—কাজ করতে হবে।"

বুড়ি। "কি কাজ বাবা?"

ছেলে। "তোকে বলব কি? কথাটা ফাঁস হয়ে যায় যদি"

বুড়ির বড়ই কৌতুহল হইল, বলিল—"মারে বলবি তা ফাঁস হয়ে যাবে? তুই আর মুই কি তফাৎ নাকি? খোদা খোদা অমন অবিশ্বাস করতে নেই?" ছেলেরও কথাটা পেটের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না, সে বলিল—"তবে শোন্ কাউকে যেন বলিসনে, বিবিজিকে চুরি করে আনতে হবে।"

বুড়ি। "বিবিজি? কোন বিবিজি?

ছেলে। "মুন্না বিবিজি?"

বুড়ি শূন্য জমীর উপর কল্পিত টাকার কাঁড়ি ঘৃণার ভাবে হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল—"হাঁরে নেমক হারাম. তুই অমন কাজ করবি ত তোর সাক্ষাতে গলায় ছুরি বসাব। মনে নেই কে তোকে দু দুবার বাঁচিয়েছে, কার অন্নের জোরে এখনো বেঁচে আছিস? তার বোনকে তুই চুরি করে আনতে যাবি, আল্লা আল্লা।"

ছেলে বলিল—"সেই জন্যই তোকে বলতে চাইনি—জানি বল্লেই গোল হবে। চিরকাল বসে খাবি সেটা বুঝছিস নে? কত টাকা ভাব দেখি?"—বুড়ি রাগিয়া বলিল—"অমন টাকার মুখে সাত ঝাঁটা।"

ছেলেরও মনে আগে হইতেই এক এক বার কেমন অনুতাপের ভাব আসিতেছিল, মায়ের কথায় সে বুঝিল কাজটা সত্যই ভাল হয় নাই, বলিল—"কিন্তু এখন সব ঠিক-ঠাক, এখন পিছই কি ক'রে—তাহলে নবাব সাহেব কি প্রাণ রাখবে?"

বুড়ি। "ঠিক ঠাক কি, সব খুলে বল দেখি"। ছেলে তখন তাহাদের বন্দবস্তটা সব ভাঙ্গিয়া বলিল। বুড়ি শুনিয়া বলিল—"তার আর ভাবনা কি, তোর যেমন যাবার কথা আছে, তেমনি তাদের সঙ্গে চলে যাস, তাহলে ত আর কেউ তোকে সন্দেহ করবে না, আর আমি এখনি এ কথা বিবিজিকে গিয়ে বলি,—তারা সন্ধ্যা হতেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে কোনদিকেই আর গোল হবে না।"

বুড়ি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মুন্নাদের বাড়ী যাত্রা করিল।

সংসারে যাহাকে রাখে—সেই রাখে।

জগতে তৃণ গাছটিও অবহেলার সামগ্রী নহে। দুস্তর তরঙ্গাকুল সমুদ্রে একটি তৃণও তোমাকে পথ দেখাইয়া তীরে লইয়া যাইতে পারে। এক দিন সেও তোমা হইতে উচ্চ। তাই বলি তুচ্ছ বলিয়া কাহাকে উপেক্ষা করিও না। মহম্মদ যখন বুড়ির উপকার করিয়াছিলেন—তিনি কি জানিতেন এক দিন সেই সামান্য দীন হীন স্ত্রীলোক তাঁহার যে উপকার করিবে জীবন দিয়াও তিনি তাহা শোধ করিতে পারিবেন না!

—:*:—

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

রত্ন রহস্য,—নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

পাঠকগণ বুঝিয়াছেন—এখানি পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, শাস্ত্রে কত প্রকার রত্নের উল্লেখ আছে, পুরাকালে রত্নের কিরূপ মর্য্যাদা ছিল, কিরূপ করিয়া রত্নের দোষগুণ বিচার হইত, দর দাম হইত, সুস্পষ্ট সরল ভাষায় অতি সুন্দররূপে এই পুস্তকে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আমরা যেদিকে চাহিয়া দেখি পুরাকালের আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, এ পুস্তকখানি তাহারি অন্যতম প্রমাণ। কত পুরাকালে যে আর্য্যগণ রত্নের আদর জানিতেন তাহা এই পুস্তকে হৃদয়ঙ্গম হয়।

লেখক ভূমিকাতে বলিয়াছেন মণিরত্নের সমাদর যদি সমৃদ্ধিশালিতা ও সভ্যতার জ্ঞাপক হইল, তবে আমরা বিনা ক্লেশে একটি অভিনব অব্যভিচারী অনুমানের উল্লেখ করিতে পারি। তাহা কি? না পুরাকালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা। যে দেশের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে মণিরত্নের আদর করিতে শিখিয়াছিল, সেই দেশই সর্ব্বাগ্রে সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অখণ্ডনীয় অনুমান। এই অনুমান বোধ হয় কোনকালেই অন্যথা হইবে না।

ভারতবর্ষই আদিম সভ্যস্থান, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, পরন্তু আমাদের বিবেচনায়, অন্য কোন প্রমাণের প্রয়াস না পাইয়া একমাত্র রত্ন শাস্ত্র দেখাইয়া দিলেই তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায়। কেন না রত্নের আদর, রত্নের প্রশংসা, রত্নের গুণ দোষ নির্ব্বাচন ও রত্নের পরীক্ষা এই ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশের লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। কোন দেশের কোন ভাষায় পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষের রত্ন শাস্ত্র আছে। যদি থাকে ত সে দেশ এই ভারতবর্ষ এবং সে ভাষা এই ভারতবর্ষের সংস্কৃত।

পুস্তকের প্রথমেই মুক্তামণির ব্যাখ্যা আরম্ভ। লেখক নয়প্রকার মুক্তার কথা কহিয়াছেন। তন্মধ্যে মেঘ মুক্তার কথায় বলিতেছেন,

“জীমূত—মেঘ। তজ্জাত মুক্তার নাম জীমূত মুক্তা। এই আশ্চর্য্য কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমরা বুঝি না। মেঘ বা আকাশে যে কিরূপে প্রস্তর বা মণি জন্মে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা সত্য কি কবিকল্পনা মাত্র, তাহাও আমরা নির্ণয় করিতে পারি

না। কেননা সকল রত্ন শাস্ত্রেই মেঘ মুক্তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে মেঘেও মুক্তামণি জন্মে।”

কিন্তু জীমূতমুক্তার বর্ণনা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়—মেঘজমুক্তা আর কিছুই নহে—উল্কাপিণ্ড পতনকেই তাঁহারা এরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাস্ত্রে সকল বিষয়েই প্রায় রূপকচ্ছলে উল্লেখ দেখা যায়—এখানেই বা উল্কাপিণ্ডকে তাঁহারা মেঘমুক্তা নামে উল্লেখ কেন না করিবেন? “সেই মেঘপ্রভব মুক্তা করকার ন্যায় ও তাহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায়; এই মেঘপ্রভব মুক্তা পৃথিবীতে আইসে না—আকাশ হইতেই ইহা দেবতারা হরণ করেন” ইহা হইতে উল্কাপিণ্ডের বর্ণনা আর কি সুস্পষ্ট হইবে।

মুক্তার পর তেরপ্রকার প্রস্তর-রত্ন ও উপরত্নের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

চন্দ্রকান্তমণি এ কলিযুগে না থাকিলেও অন্যান্য রত্ন কয়েকটি আমরা চিনিতে পারিলাম—কিন্তু রুধিরাখ্য, ভীষ্মরত্ন, পুলক মণি—এই তিনটি উপরত্ন যে কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আর একটি কথা, আজ কালের সব রত্নগুলিই পূর্ব্বোক্ত রত্নে দেখিলাম, এমন কি আজ কাল যাহা নাই, এমন পর্য্যন্ত দেখিলাম, কেবল ফিরোজটি তাহাদের মধ্যে দেখিলাম না। তবে যে উপরত্নগুলি আমরা চিনিতে পারি নাই—তাহার মধ্যে যদি কোনটি ফিরোজ হয় ত বলিতে পারি না। অনেকের বিশ্বাস আর্য্যেরা পুরাকালে হীরা কাটিয়া ব্যবহার করিতে জানিতেন না, কিন্তু এই পুস্তকের সুযোগ্য লেখক যাহা বলিতেছেন, তাহা দেখিলে সে ভ্রম দূর হইবে “অনেকেই মনে করিয়া থাকেন—যে পূর্ব্বকালের মণিকারেরা হীরার পরিকর্ম্ম বা কর্ত্তনক্রিয়া (কট্) জ্ঞাত-ছিলেন না। পরন্তু মণি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের উল্লিখিত ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। প্রত্যেক মণিশাস্ত্রেই রত্নের পরিকর্ম্ম করিবার কথা আছে—মহর্ষি অগস্ত্য রত্নের ছেদন ও উল্লেখন করণের কথা স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন

রত্নানাং পরি কর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু
ছেদনোল্লেখনে চৈব স্থাপনে শোভকৃৎ যথা।
অগস্তিমতম”।

এই পুস্তকে কাচের পুরাতনত্ব কিরূপ সপ্রমাণ হইয়াছে তাহাও একটু না উঠাইয়া থাকিতে পারিতেছি না—

“আজ কাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে কাচ ইংরাজ জাতির আবিষ্কৃত বস্তু, বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যূন ৩০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত সময়ের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও জানা যায়। পঞ্চ তন্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে “কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম” এই উল্লেখটি পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন ‘আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচ মনেঃ কুতঃ’ এই বচনটি ও বহু প্রাচীন। শুশ্রুত নামক প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থেও কাচের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—

পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃন্ময়েষু প্রদাপয়েৎ
কাচস্ফটিক পাত্রেষু শীতলেষু শুভেষুচ।

জল সরবৎ ও মদ্য মৃণ্ময় পাত্র কাচপাত্র ও স্পটিক পাত্রে ব্যবহার করিবে। এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ দোষাবহ নহে।

শুশ্রুত ঋষি শস্ত্র চিকিৎসা প্রকরণে প্রধান প্রধান অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অবশেষে কতকগুলি অনুশাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্বকসার অর্থাৎ বাঁশের চ্যাঁচাড়ি কাচ ও কুরুবিন্দ নামক প্রস্তরই প্রধান, * *

অনেকের ভ্রম আছে যে প্রাচীন কালে কাচ ছিল না। যেখানে যেখানে কাচের উল্লেখ আছে, তাহা কাচ নহে, তাহা স্ফটিক।

বর্ত্তমান ক্ষারসম্ভূত কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।" একথা যে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্ফটিক স্পষ্ট পৃথকরূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাণ হইতেছে। ক্ষারসম্ভূত কাচ যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা নিম্নলিখিত মেদিনী কোষের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমাণ হয়। ক্ষার পুং লবণে কাচে। লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ। মেদিনী কারের মতে ক্ষারও কাচ নাম মাত্রে ভিন্ন বস্তুতঃ পদার্থ এক। অমরসিংহ ও কাচঃক্ষার এইরূপ উল্লেখ করিয়া কাচের নামান্তর ক্ষার বলিয়াছেন। সুতরাং উত্তম বুঝা গেল যে প্রাচীন কালের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আমরা কাচের ক্ষার মণি নামও প্রাপ্ত হইয়াছি * ইহা ছাড়া কাচের পুরাতনত্ব সম্বন্ধে রত্ন শাস্ত্র প্রণেতা আরো প্রমাণ তুলিয়াছেন—বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক উঠাইলাম না। রত্ন উপরত্নের ব্যাখ্যার পর স্যমন্তক ও কৌস্তুভ মণির ইতিবৃত্ত—শেষে রত্নালঙ্কার ও ধাতু। তখনকার রত্নালঙ্কার গুলির বর্ণনা দেখিয়া 'অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়, মাথারই তখন কতরকম অলঙ্কার ছিল, এখনকার অলঙ্কারপ্রিয় রমণীগণ যদি ইহা হইতে ফ্যাসান গ্রহণ করেন ত বড় ভাল হয়; আমরা বরং দুই একটির বর্ণনা তুলিয়া দিই।

ললামক, চুল বাঁধিয়া তাহার মূল দেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুখ ভাগে বিন্যস্ত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে এরূপ অলঙ্কারকে ললামক বলে। এ গহনাটিত অতি সুন্দর মনে হইতেছে।

বালপাশ্য, চুলে যে পাশাকৃতি রত্নালঙ্কার জড়ান হয়—তাহার নাম বালপাশ্য।

দণ্ডক, শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনদ্ধ অর্থাৎ গাথা, উর্দ্ধভাগ মুক্তাজালে বিজড়িত এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয়।

চূড়ামণ্ডন—সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত, আর ইহার আকার কেতকী পুষ্পের দলের ন্যায়।

দণ্ডক চূড়া মণ্ডন একই অলঙ্কার, উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের এই দুই ভিন্ন নাম। এ অলঙ্কারটিকে অনেকটা আজকালকার মাথা ঘেরা মুকুটের মত মনে হইতেছে। যাই হোক্ এটি যে অতি সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাতের, গলার, কানের, কটিদেশেরও অনেকরূপ সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার আছে। মুক্তার হারই তখন কতরূপ ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে নাই কেবল একটি, নাসিকার কোন অলঙ্কারই নাই। এ সম্বন্ধে নোটে লেখক বলিতেছেন—"মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশের নারীজাতির মধ্যে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় নাসিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত।" আমরা ও তাই বলি, তখনকার আর্য্যগণ এমন সৃষ্টিছাড়া অলঙ্কারের সৃষ্টি কখনই করিবেন না, যাহাতে তাঁহাদের পত্নীদিগের মুখের সৌন্দর্য্য না বাড়াইয়া আরো নষ্ট করে। এখন অবধি যে কোন মহিলা নথ পরিবেন—তাঁহাকে শাস্ত্রের দোহাই দিব। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নথ পরা আর সোজা কথা হইবে না।

এখন এই বলিয়া আমরা সমালোচনাটি শেষ করি—রামদাস বাবুর হাতে পড়িয়া রত্নরহস্যের রত্নগুলির ঔজ্জ্বল্য বড় বাড়িয়াছে, তাহার যথার্থ শোভা বিকাশ হইয়াছে।

———

# হ্যারল্ড কোম্পানির

## উন্নতি-সাধিত হার্ম্মণীফ্লুটের মূল্য

এই সুমধুর ও চিত্তবিনোদক যন্ত্রের প্রতি সাধারণের আদর দেখিয়া হ্যারল্ড কোম্পানি ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অভিনব যন্ত্র বহুল পরিমাণে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইক্ষণে হ্যারল্ড কোম্পানি সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করিতেছেন যে সেইগুলি এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বরযুক্ত যন্ত্র। ইহা টেবিলের উপরে কিম্বা হাঁটুর উপরে রাখিয়া বাজান যায়। এই যন্ত্র অতিসহজে যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং যেরূপ সহজে শিখিতে পারা যায় তাহাতে সকলেরই ইহার একটি একটি গ্রহণ করা উচিত।

## মূল্য।

৩ অক্টেভ ও একষ্টপ যুক্ত বাক্স্ হারমনি ফ্লুট নগদ

| | | |
|---|---|---|
| মূল্য | ... ... | ৪০৲ টাকা |
| ঐ অত্যুৎকৃষ্ট | ... ... | ৫০৲ টাকা |

তিন অক্টেভ তিন ষ্টপযুক্ত বাক্স হারমনি

| | | |
|---|---|---|
| ফ্লুট নগদ মূল্য | ... | ৭৫৲ টাকা |
| ৩½ অক্টেভ এক ষ্টপ যুক্ত | ... | ৯০৲ টাকা |
| ৩½ অক্টেভ তিন ষ্টপ যুক্ত | ... | ৯৫৲ টাকা |

হ্যারলড কোম্পানি এই যন্ত্র বাজাইতে শিখিবার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। সংবাদ পত্র সকল ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এই পুস্তকের নাম "কিরূপে শিক্ষক ব্যতিরেকে হ্যারল্ড কোম্পানির হার্ম্মণী ফ্লুট বাজাইতে শিখা যায়" ইহার মূল্য ৩ । এই পুস্তকে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী গত-সকল বিবৃত আছে। ইহাতে যন্ত্রের একটি প্রতিকৃতি ও স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যে কোন সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পক্ষণ অভ্যাস করিয়া এই যন্ত্রের যে কোন গত-বাজাইতে পারেন।

কেবল মাত্র হ্যারল্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হ্যারল্ড কোম্পানি ৩ নং ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা।

# মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর তিনি দ্বাবিংশ দিবস মাত্র কারাগৃহে ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার অদৃষ্টের এই বিপ্লবময় অবস্থায়, আপনার বিষয়াদি সম্বন্ধে হিসাবাদি পরিষ্কার করিয়া গুরুদাসের পথ সরল করিয়া দিয়াছিলেন। কারাগারে শারীরিক কষ্ট তাঁহাকে কিছুই ভোগ করিতে হয় নাই। দাস, দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ, বেহারা'র কিছুমাত্র অভাব ছিল না। আত্মীয় স্বজনেরা দিবসের অধিকাংশ সময়ই কাছে থাকিতেন। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষার সময় তিনি মনের স্বাভাবিক কষ্ট দমন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ছিলেন। "প্রাণ দণ্ডাজ্ঞায় ভীত ও চঞ্চল হইয়াছেন" একথা কাহাকেও তিনি জানিতে দেন নাই। ভয় তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তিনি মনে মনে জানিতেন যে তিনি নির্দ্দোষী, নিরপরাধে কলঙ্কিত হইয়া প্রাণদণ্ড হইতে চলিল, এই কথা স্মরণ করিয়া কখন কখন তিনি অল্পমাত্র চঞ্চল হইতেন। সর্ব্বজনপ্রণয়িনী-আশা আসিয়া সেই গভীর অন্ধকার রাশির মধ্যে তাঁহাকে এক এক বার তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া যাইত। তাহাতেই কখন কখন তিনি পুনর্ব্বিচারের ও আত্মদোষ ক্ষালনের ক্ষণিক চিন্তায় ব্যস্ত হইতেন। আশার এই প্রকার উত্তেজনায় তিনি এই সময়ে Francis ও Claveringকে একখানি পত্র লিখেন। ইহাতে তিনি যে নির্দ্দোষী তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টের জজেদের পক্ষপাতিতার সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পত্রের কোন উত্তর আসিল না। Francis মুখে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিতে পারিলেন না। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র খানি বাহির করিয়া সাধারণ সমক্ষে দগ্ধ করান হয়। বস্তুত নন্দকুমারের মনে দৃঢ় আশা হইয়াছিল যে, তিনি ইংলণ্ডাধীপের নিকট আপিল করিলে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন প্রকার সুযোগ বা অবসর তিনি পান নাই।

নন্দকুমারের নামে এই মোকর্দ্দামার সম্পূর্ণ সমালোচনা আমরা ভবিষ্যতে করিব, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা বর্ণনীয় নহে। এই প্রস্তাবে আমরা সাধারণ ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য, ও এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত নন্দকুমারের জীবনের শেষ দুই দিনের ঘটনা সাধারণের গোচর করিব।

নন্দকুমারের জীবনের শেষ দুই দিন অতিশয় বিভীষিকাময় দৃশ্যে জড়িত। ইহা দেখিয়া ইংরাজের চরিত্রে, ইংরাজের বিচারে কলঙ্ক বই যশার্পণ করিতে কেহই সাহসী

হইবেন না। নন্দকুমার সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনা সাধারণ ইতিহাসে ইংরাজ লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু নন্দকুমারের জীবনের শোচনীয়দৃশ্য-পূর্ণ শেষ দুই দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ না করিয়া তাঁহারা বিলক্ষণ একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর এখন আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহিনা। এক্ষণে আমরা বর্ণনীয় বিষয়ের অনুসরণ করিব।

কলিকাতার সেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেবের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি কোম্পানীর অধীনে বড় চাক্‌রি করিতেন, ও তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তৎকালীন অন্যান্য ইংরেজ-অপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। নন্দকুমারের জীবনের শেষ দুই দিনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বস্তুতই উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই ম্যাক্রেবী সাহেবের দৈনন্দিন ঘটনা পুস্তক (Diary) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের শোচনীয়, বিভীষিকাময় শেষ মুহূর্ত্তের লোমহর্ষণ দৃশ্য পাঠকবর্গের সমক্ষে ধরিব। এ বিষয় নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে আমাদের অনেকাংশে ইচ্ছা নাই। আরও তাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিলে পাঠক হয়ত সেই সরল ভাষাময় শোচনীয় কাহিনীর ভিতর, ম্যাক্রেবীর মনের উদারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহার ৪ঠা আগষ্ট তারিখের লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

"৪ঠা—আগষ্ট, শুক্রবার ১৭৭৫।

শুক্রবার অপরাহ্ণ হইয়াছে, এমন সময় আমি মহারাজা নন্দকুমারের গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাকে সম্বর্দ্ধনা ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন; আমি উপবেশন করিলে এরূপ ধীর ও প্রশান্ত ভাবে তিনি আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন. তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি মনে মনে ভাবিলাম, কল্য যে এজগতে তাঁহার শেষ দিন, তাহা বোধ হয় মহারাজ বিস্মৃত হইয়াছেন। আমি তাঁহকে অবশেষে বলিলাম "অদ্য আমি আপনাকে শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি।" এই কয়েকটী কথা বলিতে বস্তুত আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। আবার যখন ভাবিলাম যে, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে কল্য তাঁহার সহিত বধ্য ভূমিতে যাইতে হইবে, ও শোচনীয় দৃশ্যের আদ্যোপান্ত দেখিতে হইবে, ও সময়োচিত আজ্ঞাদি প্রদান করিতে হইবে, তখন আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে সেই উচ্ছলিত মনোবেগ ধারণ করিয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তাঁহাকে আমি গবর্ণমেণ্টের আদেশে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম "কলিকাতার সেরিফ বলিয়া কল্য আমাকে কর্ত্তব্যের দায়ে বধ্য ভূমিতে আপনার সঙ্গে গিয়া আজ্ঞাদি প্রদান করিতে হইবে। এই সুযোগে আমি আপনার অন্তিম বাসনাগুলি সাধ্য মতে পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। কল্য আপনার যেসমস্ত বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়গণ বধ্যভূমিতে আপনার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট স-

স্মান প্রদর্শন করা হইবে। আর আপনার পালকী ও বাহকগণ নিয়মিত সময়ে আপনার জন্য এই গৃহ-সম্মুখে অপেক্ষা করিবে।” আমি মুখে ধীর ভাবে তাঁহাকে এই সমস্ত জ্ঞাপন করিতেছিলাম, কিন্তু অন্তরে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল।

মহারাজা আমার সমস্ত কথা শুনিয়া, স্থিরভাবে, ধীর গম্ভীর স্বরে প্রভূত শিষ্টাচারের সহিত উত্তর করিলেন, “আপনার এ সদাশয়তার জন্য আমি বড় আপ্যায়িত হইলাম; এই জন্য আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার হতভাগ্য পরিবারগণের ও কুমার গুরুদাসের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন ও তাহাদের তত্ত্ব লইবেন, ও ফ্রান্সিস ও জেনারেল সাহেবকে আমার হইয়া এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিবেন।” তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কপালে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেন—বলিলেন, “মহাশয়, অদৃষ্ট-লিপি কখনও খণ্ডন হয় না।” আমি তাঁহাকে সময়োচিত বাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলিলাম, “মহারাজ! আপনি চিন্তিত হইবেন না। ফ্রান্সিস্ ও জেনারেল আপনাকে সাদর সম্ভাষণ দিয়াছেন, আর আপনার এই শোচনীয় পরিণামের জন্য তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত; রাজা গুরুদাসকে তাঁহারা পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেন, ও সর্ব্ব বিপদে রক্ষা করিতে ও উপদেশ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রাজা স্থির-কর্ণে এই সমস্ত কথা শুনিলেন, তাঁহার মুখে ঈষৎ আশাব্যঞ্জক ভাব বিকশিত হইল। তাঁহার এই সময়ের শান্তিময় ভাব অত্যন্ত আশ্চর্য্য; তিনি একটীও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন না—তাঁহার কথায় বা ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন বা চাঞ্চল্যের ভাব ছিল না। রায় রাধাচরণ * বোধ হয় পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার চক্ষে তিল মাত্রও অশ্রু চিহ্ন নাই। আমি তাঁহার এই অমানুষিক স্থির-গম্ভীর ভাব দেখিয়া তথায় আর তিলমাত্র দাঁড়াইতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। জেলর Yeandale আমার জন্য নীচে অপেক্ষা করিতেছিল। সে আমায় বলিল—“আপনার আসিবার পূর্ব্বে রাজার আত্মীয় বন্ধুবর্গ বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে, আমি উপরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম রাজা নিজের হিসাবপত্র দেখিতেছেন ও তাহার উপর মন্তব্য লিখিতেছেন। আমার মনে হইল হয়ত তিনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন যে, কল্য তাহার প্রাণদণ্ড নিতান্তই অনিবার্য্য।”

অতি কুক্ষণে ৪ঠা অগষ্টের কাল রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব তাঁহার উদয়ের অব্যবহিত পরেই যে শোচনীয় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হইবে, ইহা ভাবিয়াই যেন সে দিবস উদিত হইলেন না। ক্রমশঃ বেলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কারাপ্রাঙ্গনে, রাজপথে অত্যন্ত জনতা উপস্থিত হইল। সকলেই মহারাজা নন্দ-

* রায় রাধাচরণ নন্দকুমারের জামাতা, মহারাজ নন্দকুমার ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন।

কুমারের নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে কারাগার অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। সকলেরই মুখ বিষাদের কালিমায় ঘোর অঙ্কিত; সকলেই কোম্পানীর জজেদের উপর অভিসম্পাৎ করিতে করিতে কারাভিমুখে ধাবিত হইল। মহারাজা সেই দিবস অতি প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ইষ্টদেবতার পূজাদি শেষ করিয়া, সংসারের নিকট চির বিদায় লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, একমনে মন্ত্রজপে নিবিষ্ট ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বন্ধুবর্গ ও অন্যান্য পরিচিত লোক সমূহ ও অনেক দরিদ্র কাঙ্গাল সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের সহিত সময়োচিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহই এই দিবস উপস্থিত ছিলেন না। সে দিনের শোচনীয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে, ও সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য চক্ষু মেলিয়া দেখিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্ব দিবস ভোরে উঠিয়া তাঁহারা বিদায় লইয়াছিলেন। অদ্য কেবল দূরস্থ আত্মীয়বর্গ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিশিষ্ট বন্ধুগণ ও দরিদ্র কাঙ্গালগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের সকলেরই চক্ষে অশ্রুজল; তাহারা দুই মাস অগ্রে মহারাজার স্বাধীন ক্ষমতাময় ভাব দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইল। * অনেক কষ্টে, অনেক অনুরোধের পর, তাহারা ধীরে ধীরে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

সমাগত দর্শক বৃন্দকে বিদায় দিয়া মহারাজ নন্দকুমার যখন শুনিলেন যে, সেরিফ্ সাহেব নীচে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। নীচের একটী গৃহে জেলর ও সেরিফ্ সাহেব একত্র বসিয়াছিলেন। নন্দকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহারা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া একখানি কাষ্ঠাসন বসিবার নিমিত্ত সরাইয়া দিলেন। নন্দকুমার তাঁহাদের নিকটে উপবেশন করিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমাদের লেখনী অগ্রসর হইতে চাহে না। আমরা সেরিফের কাহিনীরই পুনরায় অনুসরণ করিলাম।

"মহারাজা আসন গ্রহণ করিলে, আমি চেয়ার সরাইয়া তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম! কিয়ৎক্ষণ পরে কারারক্ষক ইয়ানডেল, (কি কারণবশতঃ জানি না) দেয়ালস্থ ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল! মহারাজ

* সেরিফ সাহেব এই ঘটনাস্থলে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি একস্থলে লিখিতেছেন, "আমি এই দরিদ্র কাঙ্গালদিগের শোকময় অস্ফুট চীৎকার ও যথার্থ সহানুভূতিপ্রসূত-অশ্রুজল দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলাম। আমার মনের ভাব এতদূর বিকৃত হইয়াছিল যে, আমি প্রায় তিন ঘণ্টা পরে মনের স্থৈর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হই।

• Vide—Sheriff Alexander Macrabie's account of Nundcomar.

নন্দকুমার তাহা দেখিতে পাইলেন—তিনি অমনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয় আমি প্রস্তুত আছি, আপনারা আমায় কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া চলুন।" আমার বোধ হয় তিনি এই ঘড়ি দেখার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "না মহাশয়! আপনার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আপনাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য সময় দেখা হয় নাই। আপনি যখন নিজের সুবিধা ও সময় অনুসারে আমায় ইঙ্গিত করিবেন, তখনই আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে।" আমাদের নিকটে আর তিন জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল। মহারাজা আমার কথা শুনিয়া সেই কয় জন ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি তাঁহার মৃতদেহ লইয়া যাইবার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। তাহারা সকলেই সদ্বংশজাত ও উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে তিনি তাহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার এই ব্যস্ত ভাব দেখিয়া আমি পুনরায় বলিলাম—"আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না। সময় বুঝিয়া, অবসর বুঝিয়া আমায় বলিবামাত্রই সময়োচিত কার্য্য সমস্ত আরম্ভ হইবে"। এই সমস্ত কথার পর আমরা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, নানাবিষয়ে কথোপকথন চলিতে লাগিল। তন্মধ্যে রাজা গুরুদাস ও ফ্রান্সিসের কথাই অধিক। ইহার পর তিনি মালা লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে উঠিয়া গিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। জপকরা শেষ হইলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; আমি নিস্পন্দভাবে বসিয়া মহারাজার অদৃষ্টের আদ্যোপান্ত ও ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। আমার দিকে একবার চাহিয়া তিনি তাঁহার একজন চাকরকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর কারামধ্যস্থ দ্রব্যাদি যেন কুমার গুরুদাসই আসিয়া লইয়া যান। অপর কেহ যেন সে সমস্ত স্পর্শ না করে। সেই ভৃত্যকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি ধীরে ধারে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফটকের নিকট পালকী অবস্থান করিতেছিল, তিনি সেই পালকীতে প্রবেশ করিলেন। বাহকেরা পালকী উঠাইল। আমি ও ডেপুটী সেরিফ সেই পালকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক চলিল; অবশেষে আমরা বহুজনসমাকীর্ণ, কোলাহলপূর্ণ, প্রশস্ত-ময়দানে বধ্যভূমির নিকট উপস্থিত হইলাম।" *

---

* ফাঁসীদিবার স্থান কোথায় নিরূপিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে সেরিফ সাহেব কিছুই লিখেন নাই। এ সম্বন্ধে যত প্রকার প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, খিদির পুরের নিকটস্থ বর্ত্তমান হেষ্টিংসের (কুলীবাজার) মধ্যবর্ত্তী শূন্য ময়দানে নন্দকুমারের বধমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়। আজকাল যেখানে ইংরাজ টোলা ও কয়েকটী বৃহৎ সেনানিবাস বর্ত্তমান, পূর্ব্বে এইস্থান একটী বৃহৎ ময়দান ছিল। বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ডরোড নির্ম্মাণ ও মালামাল

"আমরা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রশস্ত ময়দান লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের কোলাহলে কর্ণপাত করা দুঃসাধ্য বোধ হইল। হিন্দু, মুসলমান, আরমানি, ইউরোপীয়ান, সকল জাতীয় লোকই এই শোচনীয় কাণ্ড দেখিতে সমবেত হইয়াছে। মহারাজা নন্দকুমার সেই স্থলে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মহারাজার পালকীর দুই ধারে লোক ঝুঁকিতে লাগিল। নির্ভীক চিত্ত নন্দকুমার পালকীর দ্বার বিমুক্ত করিয়া দিয়া, সেই উচ্ছলিত অর্ণব প্রবাহের ন্যায় জনস্রোত ও বিভীষিকাময় মঞ্চ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম; দেখিলাম—তাঁহার মুখের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশান্ত ও স্থির। এই সমস্ত বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়াও তিনি তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। আমি তাঁহাকে মনে মনে এই বীরোচিত সাহসের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

মহারাজের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা এখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি তাহাদের জন্য ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন, ও তজ্জন্য আমাকেও অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে তাহারা পালকীর সন্নিকটস্থ হইলে তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের কতকগুলি উপদেশ দিলেন ও আমায় বলিলেন "আপনি দেখিবেন এই কয়জন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ যেন না আমার মৃতদেহ স্পর্শ করে।" আমি সাগ্রহে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলাম। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে বলিলেন—"আর কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছেন, আমি সম্যকরূপে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনার বন্ধু কি আত্মীয় বর্গ কেহ কি আপনার সঙ্গে এ জনতার মধ্যে দেখা করিতে আসিয়াছেন? তাঁহাদের আমায় দেখাইয়া দিন, আমি পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন আমার আত্মীয় বন্ধু কেহই এই ভয়ানক স্থলে আসিতে সাহসী হইবেন না, আর হইলেও এস্থান এক্ষণে কথোপকথনের উপযুক্ত নহে।" এই কথা বলিয়া তিনি পালকীতে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "মহারাজ! সময় প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এই সময়ে একটা কথা বলিয়া যাই—বধমঞ্চে আপনাকে তোলা হইলে যখন আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া সঙ্কেত করিবেন, তখনই রজ্জু সংলগ্ন হইবে" তিনি বলিলেন, "আমি হস্ত নাড়িয়া সঙ্কেত করিব।" আমি বলিলাম "তাহা বোধ হয় অসম্ভব হইবে, কেন না আপনার হাত সেই সময় বাঁধা থাকিবে, অতএব আপনি পা নাড়িয়া সঙ্কেত করিবেন।" তিনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।*

তুলিবার জন্য নদীকূল ভরাট করাতে ভাগিরথী আজ কাল কিছু দূরে পড়িয়াছেন। এইস্থানে একটী প্লাটফরম্ বা বধমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই বধমঞ্চের উপরই মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

ক্রমে সময় উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ নন্দকুমারের ইঙ্গিতক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাহকদিগকে আমি তাঁহার পাল্কী বধমঞ্চের নিকট লইয়া যাইতে বলিলাম। নন্দকুমার এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে মঞ্চাভিমুখে চলিলেন। মঞ্চ-সন্নিকটস্থ হইয়া দৃঢ়পদে, অবিকৃত মুখে, প্রশান্তভাবে, মঞ্চোপরি উঠিতে লাগিলেন। সে মূর্ত্তি, সে পদবিক্ষেপ, সে তুষ্ণীম্ভাব অবলোকন করিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তিন চারিটী সোপান উঠিয়াই তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে আমি তাঁহার হস্তবদ্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। হস্তদ্বয় এক বস্ত্র খণ্ডে আবদ্ধ করা হইল। তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে একখণ্ড বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিবার সময় উপস্থিত হইল। এ নৃশংস কার্য্যে কেহই সহসা অগ্রসর হইল না। একজন ইউরোপীয়ান এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়াতে মহারাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন। সে ব্যক্তি নিরস্ত হইল। নিকটে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সিপাহী দাঁড়াইয়া ছিল, একজন রক্ষক তাহাকে নির্দ্দেশ করাতে মহারাজা তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক প্রিয় পরিচারক তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিতে ছিল। প্রভুভক্ত ভৃত্য উষ্ণ অশ্রু জলে মহারাজার চরণদ্বয় ধৌত করিতে ছিল; রাজা তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন, ও প্রবোধিত করিয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিতে অনুমতি করিলেন। সে ব্যক্তি অনেক অনিচ্ছা ও ঘোরতর আপত্তির সহিত অবশেষে সে কার্য্যে স্বীকৃত হইল।

মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবার কিয়ৎ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মহারাজার মনের ভাব কি রূপ, উপলব্ধি করিবার জন্য আমি একবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মনে বড় ভয় হইল—দেখিলাম তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষাও স্থিরতর, নিষ্পন্দ নিশ্চল, অধিকতর দৃঢ় ভাব পরিপূর্ণ। সে প্রস্তরময় নির্ভীক মূর্ত্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া আমি সভয়ে, শোকপূর্ণ হৃদয়ে মহারাজার পরিত্যক্ত পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মহারাজা বোধ হয় ইহা দেখিতে পাইলেন, ও পদসঞ্চালন দ্বারা তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত করিলেন। ইহার পর আমি মঞ্চোপরিস্থ কাষ্ঠ সরাইবার শব্দ পাইলাম। পাল্কীতে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া কতকাংশে দৃঢ়তা সঞ্চয় করিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখিলাম—মহারাজার নিষ্পন্দ মৃতদেহ দোদুল্যমান হইতেছে—মুখে এখনও সেই দৃঢ়ভাব গভীরাঙ্কিত, সে শোচনীয় দৃশ্য এ জীবনে কখনও আমি ভুলিতে পারিব না।”

সহৃদয় হিন্দু পাঠক! হিন্দু মহারাজার জীবন নাটকের এই প্রকার বিভীষিকাময়, শোচনীয় শেষ অঙ্ক দেখাইয়া আর আপনাদের অধিক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না।

উপরোক্ত ঘটনাবলীই এ ভীষণ চিত্র অনেকাংশে পরিস্ফুট করিয়াছে, এক্ষণে আনুসঙ্গিক দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

---

# শঙ্করাচার্য্য।

## শিব গুরু ও শঙ্করের জন্ম

এই সময়ে মহাদেব দাক্ষিণাত্যে, কেরল (অথবা মালাবার) প্রদেশে বৃষ পর্ব্বতে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন। অনতিদূরে পূর্ণা নদী প্রবাহিত। রাজশেখর নামে জনৈক রাজা স্বপ্নে বারম্বার তাহার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া, তথায় এক অতি উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মন্দিরের অনতিদূরে কালটি নামে এক অতি মনোরম ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম আছে। তথায় বিদ্যাধিরাজ নামে এক জন স্থিরমতি, খ্যাতনামা পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহারই পুত্রের নাম শিবগুরু। এই সময়ে শিবগুরু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু গৃহে বাস করিতেছিলেন। তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুর সেবা করিতেন, ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাতে আপনি ভোজন করিতেন, এবং প্রাতে ও সায়াহ্নে হোম করিতেন। ঈদৃশ বিশুদ্ধ নিয়ম সকল আশ্রয় করিয়া তিনি গুরু সমীপে বেদাধ্যয়ন করিতেন এবং প্রত্যহ পাঠান্তরে বেদের দুরূহ অর্থ সম্বন্ধে বিচার করিতেন।

এইরূপে বিধিপূর্ব্বক পাঠ সমাপন এবং বেদে অধিকার লাভ হইলে পর, শিষ্য-বৎসল গুরু স্বীয় শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন "বৎস, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ তোমার অধ্যয়ন হইয়াছে, তাহার অর্থ বোধও তোমার হইয়াছে, তুমি দীর্ঘ কাল আমার আলয়ে বাস করিলে, তুমি সত্য সত্যই অতি ভক্তিমান। এখন গৃহে ফিরিয়া যাও। হয়ত তোমার বন্ধু বান্ধবেরা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। গৃহে যাইয়া তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর। বাছা, এখানে আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। জীবন অনিত্য; যাহা ভবিষ্যতে করিবে বলিয়া ভাবিতেছ বর্ত্তমানেই তাহা করিয়া রাখ। কল্যকার কার্য্য অদ্যই শেষ করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলে যেরূপ শস্য হয়, অকালে সেরূপ হয়না। অতএব বয়স থাকিতেই বিবাহাদি করা কর্ত্তব্য, নতুবা নিষ্ফল হইবে। তোমার পিতা মাতা সর্ব্বদা তোমার বয়স গণনা করিতেছেন, উপনয়ন হইলেই মাতা পিতা সন্তানের বিবাহ কামনা করেন। বিবাহ হইলেই আশা হয় পিণ্ড লোপ হইবেনা। বিশেষতঃ সস্ত্রীক না

হইলে বৈদিক ক্রিয়া কলাপে অধিকার জন্মে না। যেমন অর্থবোধ না হইলে বিচারে ফল হয় না, সেইরূপ অর্থবোধও নিষ্ফল, যদি ক্রিয়ানুষ্ঠান না হয়।”

শিষ্য উত্তর করিল “হে গুরো, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, তথাপি এমন কোন নিয়ম নাই যে গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিলেই গৃহী হইতে হয়, অন্য আশ্রম গ্রহণ করা যাইবে না। যাহার নিত্যানিত্য বোধ এবং অনিত্যে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে, আর অপরেরা গৃহী হইবে, গার্হস্থ্যই সাধারণ পথ। আমি সন্ন্যাস পূর্ব্বক আজীবন আপনার নিকটে অবস্থান করিব, সবিনয়ে দণ্ডাজিন ধারণ পূর্ব্বক হোম করিব, এবং নিরন্তর বেদপাঠ করিব। স্ত্রীসঙ্গ ততকালই সুখকর যাবৎ তাহা সম্যক্ অনুভূত না হয়; অনুভূতির পর আর তাহাতে সুখের লেশও থাকে না। হে মহাত্মন্, জাজ্জল্যমান সত্য গোপন করিতেছেন কেন? যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গফল লাভ হয় বটে, কিন্তু বিধিমত যজ্ঞানুষ্ঠান এ সংসারে দুষ্কর। আর গৃহী যদি নিঃস্ব হয়, নরক যন্ত্রণাও বরং তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃস্কর, ইচ্ছানুরূপ দান বা ভোগে তাহার আর শক্তি থাকে না। যদিও ধনে গৃহীর গৃহ পূর্ণ হইতে পারে, তবু তাহার ধনতৃষ্ণা যায় না। বহু কষ্টে, না হয়, একবার বাসনানুরূপ ধন সঞ্চয় করিল, কিন্তু পূর্ব্ব সঞ্চিতের ক্ষয় হয়, এবং নূতন অর্থলাভের প্রয়োজন হয়।

গুরুশিষ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল এমন সময়ে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শিব-গুরুর পিতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাধিরাজ বিনীত ভাবে পুত্রের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করিয়া পুত্রকে লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। শিবগুরু মুখে গার্হস্থ্যের এত দোষ প্রদর্শন করিয়া, কিরূপে কাজের বেলায় নিরাপত্তিতে তাহাতে প্রবেশ করিতে চলিলেন? শিবগুরু যুবক ছিলেন! পাঠক! তুমিও যদি যুবক হও, কে বলিতে পারে, তোমারও উচ্চ আস্ফালনের এইরূপ পরিণাম হইবে না! কে বলিতে পারে, তোমারও ভারতউদ্ধারের শ্রাদ্ধ কোথায় গড়াইবে!

বহুকাল পরে শিবগুরু গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া নানা দেশ হইতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। শিবগুরু যথাবিহিত সম্মান পুর্ব্বক প্রত্যেকের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখিয়া বহু আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার বুৎপত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ন্যায়, সাংখ্য, ও বৈশেষক প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেক প্রশ্ন করিলেন। শিবগুরুও আহ্লাদের সহিত যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিল। সন্তানের শাস্ত্রাধিকার ও বিচার নিপুনতা দেখিয়া পিতার মন আনন্দে উদ্বেলিত হইল। পুত্রের আলাপ সহজেই প্রীতিকর, শাস্ত্র যোগে তাহা দ্বিগুণিত না হইবে কেন?

অল্পকাল মধ্যেই শিবগুরুর বিবাহের অনেক প্রস্তাব আসিতে আরম্ভ হইল। অনেক ব্রাহ্মণ তাহার গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবার মা-

নসে, তদীয় গৃহে আগমন করিল। বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার গৃহ বিবাহশালার শোভা ধারণ করিল। অনেকেই বহু অর্থ সহ কন্যা দানে সম্মত হইল, কিন্তু বিদ্যাধিরাজ মঘপণ্ডিত নামে একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে স্বীয় পুত্রার্থে তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। বিবাহ কোথায় হইবে? কন্যা কর্ত্তা বলিতেছেন "আমার গৃহে যাইয়া বিবাহ হইবে।" বরকর্ত্তা বলিতেছেন "না আমার গৃহে হইবে"। মহা আন্দোলন উপস্থিত। কন্যাকর্ত্তা আবার বলিলেন "যদি আমার গৃহে যাইয়া বিবাহ হয়, তবে সঙ্কল্পিত অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিব।" বরকর্ত্তা উত্তর করিলেন "যদি কন্যা আমার গৃহে আনিয়া সম্প্রদান কর তবে বিনা অর্থে বিবাহ করাইব।" ইতিমধ্যে একজন চতুর লোক কন্যাকর্ত্তাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি গোলযোগ করিয়া আমরা সম্বন্ধ স্থির না করিয়া চলিতে যাই, তবে অপর কেহ তোমাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া স্বীয় কন্যা এই পাত্রে অর্পণ করিবে। তাহার পরামর্শে কন্যাকর্ত্তা আপত্তি পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিদ্যাধিরাজের কথাতেই সম্মত হইলেন। গুণে কেই বা মুগ্ধ না হয়? দেবপূজাপূর্ব্বক শুভক্ষণে বাগ্‌দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এবং উভয় পক্ষ হইতে জ্যোতির্ব্বিদেরা আসিয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করিল।

অনন্তর শুভমুহূর্ত্তে শাস্ত্রীয় বিধিমতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, সকলে সবান্ধবে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। নব দম্পতি পরস্পরের মুখকমল সলজ্জে নিরীক্ষণ করিয়া হরপার্ব্বতীর শোভা ধারণ করিল। গৃহে অগ্ন্যাধান না করিলে যজ্ঞফলে অধিকার জন্মে না, এই ভাবিয়া শিবগুরু গৃহে অগ্নি স্থাপিত করিলেন, এবং স্বর্গলাভের ইচ্ছায় বহুব্যয়সাধ্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। সেই সকল যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া দেবগণও যেন আপনাদিগের প্রিয়তম অমৃত বিস্মৃত হইল। তিনি কল্পতরু হইয়া দেবগণ, পিতৃগণ, এবং মানবগণ সকলকে নিজ নিজ অভিলষিত দ্রব্য দানে প্রীত করিলেন। রূপে যদিও তিনি কন্দর্প তুল্য, বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধনে দেশের অগ্রগণ্য ছিলেন, তথাপি তাঁহাতে গর্ব্ব বা ঔদ্ধত্যের লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, এবং তৃণ হইতেও বিনীত। সেই সাধু পরোপকারী নিত্যবেদাধ্যায়ী মহাত্মার সদনুষ্ঠানে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল।

ক্রমে শিবগুরু বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, কিন্তু হায়, সন্তানমুখ না দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনস্তাপের সীমা রহিল না। ধন-শস্য, অথবা পশ্বাদি, সুরম্য ভবন, সম্মান, অথবা বন্ধু সমাগম, পুত্র বিহীন হইয়া তাঁহার কিছুতেই আর সুখ হইল না। বর্ষাকালে সন্তান হইল না, হয়ত শরৎকালে হইবে, শরৎকালে ও হইল না, হয়ত হেমন্তেতে হইবে, এইরূপ আশায় আশায় তাঁহার দিন চলিয়া গেল। হায়, এত সদনুষ্ঠানের পরেও তাঁহার ভাগ্যে সন্তান লাভ ঘটিল না, ইঁহা ভাবিয়া শিবগুরুর মনে, যার পর নাই, ক্লেশ হইতে লা-

গেল। তিনি মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, স্বীয় ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন, "হে সুভগে! আমাদের আর দুঃখের সীমা কি? বয়স চলিয়া গেল কিন্তু পুত্রমুখ দেখিতে পাইলাম না। ইহলোকে আমাদের আর আশা কি? পুত্র লাভ পরলোকেও মঙ্গলের কারণ হয়; ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন উপায় দেখিতেছি না। পিতা বৃথাই আমায় জন্ম দিয়াছিলেন। হে ভদ্রে, পুত্র বিহীন হইলে কে আমাদিগকে স্মরণ করিবে? সন্তান পরম্পরায় সংসারে লোকের নাম থাকে। ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, ফল-পুষ্প-শূন্য বৃক্ষের কেহ আদর করে না।" স্বামীর বিলাপ শ্রবণে ব্যথিত হইয়া তদীয় ভার্য্যা উত্তর করিলেন, "হে নাথ, চল আমরা শিবরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করি, তাঁহার প্রসাদে অমোঘ ফল লাভ করিতে পারিব। সেই ভক্তবৎসল ভিন্ন, আমাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারে এমন আর কে আছে, আর কাহাকেই বা ডাকিব? দুঃখিনীর পুত্র উপমন্যু ভগবান সদাশিবের আরাধনা করিয়া তাঁহারই প্রসাদে ক্ষীর-সমুদ্রের অধিপতি হইয়াছিলেন।

স্ত্রীর আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শিবগুরু ভগবান উমাপতির আরাধনা করিতে মানস করিলেন। শিবও সেই সময়ে কেরল দেশস্থ বৃষাদ্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিবগুরু সেই দেবমন্দিরের নিকটস্থ নদীতে স্নান করিয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিছু দিন কন্দমূলমাত্র আহার করিয়া কাটাইলেন, পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন শিবচরণামৃত পানে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও বিবিধ ব্রত ও কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে করিতে বৃষাদ্রিনাথের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দম্পতির বহু দিন চলিয়া গেল। একদা শিবগুরু অবসন্ন হইয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া আছেন এমন সময়ে, এক ব্রাহ্মণের বেশে, ভক্তবৎসল মহাদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং বলিতে লাগিলেন—"ওহে তুমি কি চাও, কেনই বা এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ? তখন শিবগুরু উত্তর করিলেন "হে দেব, আমি পুত্র কামনা করিতেছি।" মহাদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বিপ্র, বল দেখি, তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ বহুগুণসম্পন্ন একটি মাত্র পুত্র চাও, অথবা মূর্খ অগুণযুক্ত দীর্ঘায়ু অনেক পুত্র চাও?" শিবগুরু উত্তর করিলেন "হে দেব, আমার বহুগুণযুক্ত খ্যাতনামা সর্ব্বজ্ঞপদভাক্ একটি মাত্র পুত্রই হউক"। "তোমাকে তাহাই প্রদান করিলাম, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে, আর তপস্যা করিও না, গৃহিণীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও," এইরূপ বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিপ্রবর সংজ্ঞা লাভ করিয়া গৃহিণীকে আপন সুস্বপ্ন জানাইলেন। দম্পতির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই স্ত্রীরত্ন বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় আমাদের সর্ব্বগুণ সম্পন্ন একটি পুত্র হইবে।"

তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্বপ্নদৃষ্ট শুভ ঘটনা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সুখী

হইতেন। একদা শিবগুরু অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। সেদিন তিনি যখন সকলের প্রসাদান্ন ভোজন করিতেছিলেন, তখন সেই অন্ন মধ্যে শৈবতেজ প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার পতিপরায়ণা স্ত্রীও সেই ভুক্তশেষ অন্ন আহার করিলেন। কিছুদিন মধ্যে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইলেন। গর্ভস্থ সন্তান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি অলসা হইলেন। যাহা কিছু ভারযুক্ত, কি অলঙ্কার, কি গন্ধ পুষ্প, সকলই তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল। তাঁহার দোহদজনিত কষ্ট আরম্ভ হইল, কোন আহারীয় বস্তুতে আর রুচি রহিল না। সেই কষ্টের কথা শুনিতে পাইয়া, দূর হইতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা নানা প্রকার অপূর্ব্ব দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে লাগিল, তিনি সেই সকল আস্বাদন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। একদিন স্বপ্নে, তিনি দেখিলেন যে এক ধবল বর্ণ বৃষ তাঁহাকে বহন করিতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে বিদ্যাধরগণ সবিনয়ে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বা তাঁহার জয়ধ্বনি হইতেছে, কোথাও বা "রক্ষ, রক্ষ, আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছে। তাঁহার মনে সর্ব্বদা সাত্বিক ভাবের উদ্রেক হইত। বিষয় সুখে আর স্পৃহা রহিল না। এইরূপে গর্ভস্থ শিশুর অলোকসামান্য প্রভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর শুভ লগ্নে, সতীর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। (পণ্ডিতদিগের মত যে ৭৮৮ খৃঃ অব্দেঃ শঙ্করের জন্ম হয়।) শিশুর মুখজ্যোতিতে সূতিকা গৃহে যেন আর অপর আলোকের প্রয়োজন রহিল না। পুত্রমুখ দর্শনে শিবগুরু আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে গো, ধন ও ভূমি প্রভৃতি দান করিলেন। সেই শুভদিনে যেন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকলও নিজ নিজ হিংসা বৃত্তি হইতে বিরত হইল। ছাগব্যাঘ্র প্রভৃতি খাদ্যখাদক জন্তুগণও প্রেমভরে একে অন্যের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। মহীরূহগণ ফলফুলে সজ্জিত হইয়া মহীমাতার অঙ্ক পরিশোভিত করিল। নদী সকল ধারাবাহী আনন্দের ন্যায় পর্ব্বত হইতে নির্ম্মল জলধারা বহন করিতে লাগিল। পর্জ্জন্য আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সহসা অশ্রুবর্ষণ করিল। সেই শুভ দিনে উপনিষৎ সকলের মুখে অপূর্ব্ব শোভার আবির্ভাব হইল, এবং ব্যাসদেবের হৃদয় কমল সহসা বিকশিত হইল। গন্ধবহ সুগন্ধিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বালকের জন্মতিথি আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিল, এ সন্তান সর্ব্বজ্ঞ হইবে, স্বতন্ত্র-শাস্ত্র প্রণয়ন করিবে, এবং সম্মুখীন বিচারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতদিগকেও জয় করিবে। এই শিশু কালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবে, এবং যত কাল পৃথিবী থাকিবে ততকাল ইহার নাম থাকিবে। শিবগুরু সন্তানের আয়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং জ্যোতির্ব্বি-

দেরাও নিজ হইতে সে বিষয়ে কিছুই বলিলেন না। শিশুকে দেখিবা মাত্র দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার হইত বলিয়াই হউক, অথবা বহু তপস্যার বলে শঙ্করের প্রসাদে এই সন্তান লাভ হইয়াছে বলিয়াই হউক, পিতা ইহার নাম শঙ্কর রাখিলেন। বালেন্দুর ন্যায় কলায় কলায় শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু হাসিতে শিখিল, ক্রমে হামা দিতে শিখিল, কিছু দিনের মধ্যে দুপায় চলিতে শিখিল, পরিশেষে বালকের মুখে কথা ফুটিল। সন্তানের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতা পিতারও মনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে লোকসকল যখন অন্ধ পথিকের ন্যায় পথ হারা হইয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিতেছিল, মোক্ষ মার্গ যখন কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন জীবের দুঃখ মোচনের জন্য, মেঘের অন্তরাল হইতে শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন।

---

# আমি কি আছি।

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া পাঠকগণ হয়ত লেখককে বাতুল মনে করিবেন। আমি আছি কি না, এ আবার কিরূপ প্রশ্ন? বাগবাজারের গুলির আড্ডার লোক না হইলেত কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, অনেকেই এরূপ মনে করিতে পারেন। প্রবন্ধ লেখক নিজেই "আমি আছি কি না," এই প্রশ্ন বাতুলতা না হউক অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন হিউম(Hume) জেম্‌স মিল (James Mill) জনষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) আলেকজাণ্ডার বেন (Alexander Bain) প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ গভীর গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে "আমি" নামক কোনও পদার্থ নাই, কতকগুলি মানসিক ভাবপরম্পরার সংযোগেই আমি জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তখন এই কথা হাস্য পূর্ব্বক উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সকল পণ্ডিতদিগের তর্কের কোন স্থানে ভ্রম হইয়াছে এবং কি কারণে তাঁহারা এই অপ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক যাঁহারা যুক্তির দ্বারা আপনাদিগের বিশ্বাস সমর্থন না করিয়া কথায় কথায় আত্ম-প্রত্যয়ের (Intuition) দোহাই দেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাসের উপর আমাদিগের কোনও আস্থা নাই। যে যত সহজে বিশ্বাস করে সে তত সহজে অবিশ্বাসীও হয়। শোনা কথা কিম্বা পিতৃ পিতামহ-ক্রমে চলিত বলিয়া কোনও কথায় বিশ্বাস করা উচিত নহে।

বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইলে, প্রথমে অবিশ্বাসী হইতে হয়। ঈশ্বরপরায়ন হইতে হইলে প্রথমে সন্দেহবাদী হওয়া আবশ্যক। আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের জন্মদাতা মহামতি ডেকার্ট (Descartes) বিশ্বাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিয়া সকল বিষয়ের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া, বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি-মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সকল বিষয়ের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া তিনি অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে আমি সন্দেহ করিতেছি, এই বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। (I can not doubt that I am doubting) সন্দেহ করা একপ্রকার চিন্তা। অতএব "আমি চিন্তা করিতেছি" এই সন্দেহাতীত বিষয় হইতে ডেকাট আত্ম অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। (Cogito ergo Sum) বাস্তবিক বিশ্বাসী হইতে হইলে এইরূপ সন্দেহবাদী হইয়া আরম্ভ না করিলে চলে না। অতএব "আমরা আছি" এই কথা স্বতঃসিদ্ধ না বলিয়া, আমরা যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। কেবল আত্ম অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখাইব যে "আমি আছি" এই কথা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীত হইলে জড়বাদ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদিগের যাহা কিছু বক্তব্য তাহা মনোবিজ্ঞানের (Psychology) ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বলা যাইতেছে। দর্শনের (metaphysics) উচ্চ ভূমি হইতে দেখিলে "আমিতত্ত্ব" আরও সুন্দর রূপে মীমাংসিত হয়।

যাঁহারা "আমির" অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের যুক্তির উল্লেখ করার পূর্ব্বে, কি যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক হিউম মিল্ প্রভৃতি "আমি" নামক পদার্থ অমূলক বলিয়া মনে করেন তাহা বলা আবশ্যক। মিল্ প্রভৃতির যুক্তি এই যে, আমরা সবাই কোন না কোন মানসিক ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছি। মানসিক ভাব বিবর্জ্জিত আমি-জ্ঞান(Knowledge of pure ego ) আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। হিউম বলেন "I can never catch myself at any time without a perception—অর্থাৎ কোন বিষয়ের অনুভবকারী ইহা ভিন্ন নিজ সম্বন্ধে আমার অন্য কোনও জ্ঞান নাই। বাস্তবিক এই পর্য্যন্ত যাঁহারা আত্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের অনেকের সহিত হিউম মিল, বেন প্রভৃতির কোনও মত দ্বৈধ নাই। মাসসিক ভাব পরম্পরা বিবর্জ্জিত "আমির" জ্ঞান বাস্তবিকই অসম্ভব। কিন্তু আত্ম অস্তিত্বে অবিশ্বাস কারীগণ এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত নহেন। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি ইন্দ্রিয় বোধের (Sensations) সমষ্টিই "আমি"। বর্ণ জ্ঞান, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শ, ইচ্ছা, চিন্তা, ঘৃণা, প্রভৃতি অনুভূতি (Perceptions) গুলি একত্রিত হইয়া, চাল ও ডাল মিলাইয়া সিদ্ধ করিলে যেমন খিচুড়ি হয়, সেইরূপ "আমি" নামক এক প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বোধ হয়

তর্ক করিবার সময় ভুলিয়া যান যে শব্দের শ্রোতা ভিন্ন আঘ্রানের ঘ্রাণকর্ত্তা ভিন্ন ইচ্ছার ইচ্ছাকর্ত্তা ভিন্ন ইহাদের কোনও অর্থ নাই। অশিরস্কের শিরব্যথা যেমন, সোনার পাথর বাটি কিম্বা চতুষ্কোণ বৃত্ত যেমন—উল্লিখিত কথাগুলিও ঠিক তেমনি। যাহার ইন্দ্রিয় বোধ করিবার ক্ষমতা আছে (Sentient Being) এমন এক জন ভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধ (Sensation) কিরূপে সম্ভব? ইচ্ছা কর্ত্তা, ঘৃনা কর্ত্তা ভিন্ন ইচ্ছা কিম্বা ঘৃণা আত্ম বিরুদ্ধ কথা, (Contradiction in terms) অতএব অসম্ভব। এক্ষণে আর এক বিষয়ের বিবেচনা করা যাক্। কতকগুলি ভাবের সমষ্টিই যদি "আমি" হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যেরই যে "আমি আছি" এই জ্ঞান আছে, তাহা কোথা হইতে আসিল? সুপ্রসিদ্ধ জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্ এই কথার উত্তরে বলিয়াছেন।—

"The notion of a self is, I apprehend, a consequence of memory. There is no meaning in the word 'ego or I, unless the I of today is also the I of yesterday." অর্থ—আমার বোধ হয় আমি জ্ঞান স্মৃতির ফল। অদ্যকার "আমি" যদি কল্যকারও "আমি" না হই তাহা হইলে আমি কথার কোনও অর্থ থাকে না।" "আমি" স্মৃতির ফল না হইয়া স্মৃতির অস্তিত্বই যে আমি-সাপেক্ষ তাহা প্রবন্ধের শেষে দেখান যাইবে। এক্ষণে স্মৃতির স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। স্মৃতি বলিলেই যাহা স্মরণ করা যাইবে এমন কোন ঘটনা বুঝা যায়।

স্মরণীয় ঘটনা ব্যতীত স্মৃতি অর্থশূন্য কথা। পূর্ব্বে জ্ঞাত কোনও ঘটনা ভিন্ন স্মৃতি হয় না। আবার "পূর্ব্বে জ্ঞাত ঘটনা" বলিলেই যে জানে এমন কোনও ব্যক্তি বুঝায়। "কোনও একটী জ্ঞাত ঘটনা কেহ জানে না" বলাও যাহা "আমি কাঁঠালের আমসত্ব খাইয়াছি" বলাও তাহা। অতএব দেখুন মিল্ স্মৃতির সাহায্যে যে আমি-জ্ঞানের উৎপত্তি বুঝাইয়া দিতে চান সেই স্মৃতির অস্তিত্বই পূর্ব্বে জ্ঞাত ঘটনাবলীর অস্তিত্ব-সাপেক্ষ; আবার জ্ঞাত ঘটনাবলী বলিলেই সেই ঘটনাবলী যাহার নিকট জ্ঞাত এমন কোনও ব্যক্তি বুঝায়। সুতরাং স্মৃতির সাহায্যে "আমি জ্ঞানের" উৎপত্তি বুঝাইবার চেষ্টা করা নিতান্তই বিড়ম্বনা।

কিন্তু যে স্মৃতির দোহাই দেওয়া হইতেছে তাহা এবং "আশা" নামক পদার্থ মন না থাকিলে কোথা হইতে আসিল? মিল্ কিরূপ "অশ্বত্থামা হতইতি গজ" করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, পাঠকগণ তাঁহার "Examination of sir William Hamilton" নামক পুস্তক হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন,—"If we speak of the mind as a series of feelings, we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future; and we are thus reduced to the alternative

of believing that the mind or ego is something defferent from any series of feelings or possibilities of them or of accepting the paradox that something which exhypothesi is but a series of feelings can be aware of itself as a series."

অর্থ, যদি মানবাত্মাকে কতকগুলি ভাব-পরম্পরার সমষ্টি বলা যায়, তাহা হইলে একথাও বলা আবশ্যক যে ইহা এরূপ ভাব পরম্পরার সমষ্টি, যাহার অতীত স্মরণ কিম্বা ভবিষ্যৎ আশা করিবার ক্ষমতা আছে। একথা বলিলে আমাদিগকে হয় বলিতে হইবে যে মন ভাব-সমষ্টি হইতে পৃথক বস্তু, না হয় মানসিক ভাবগুলির আপনাকে আপনি জানিবার ক্ষমতা আছে এই কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। শেষোক্ত কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও সত্য হইতে পারে।" অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও কিরূপে সত্য হইতে পারে মিল্ মহাশয় কুত্রাপি তাহার যুক্তি দর্শান নাই। মিল প্রমুখ দার্শনিকগণ জ্ঞাতা নিরপেক্ষ জ্ঞেয়, অসম্ভব এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই "আমি" মানসিক ভাব পরম্পরার সমষ্টি মাত্র এই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মিলের যুক্তিত এইরূপ। এক্ষণে তাঁহারই মতাবলম্বী প্রোফেসার বেন্ কিরূপে আত্ম পক্ষ সমর্থন করেন দেখা যাউক। বেনও বলেন যে মানসিক ভাব সমষ্টি হইতে "আমি" স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু মানসিক ভাব বলিলেই যে সেই ভাবের অধিকারী ব্যক্তি বুঝায় বেন সাহেব যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। আত্মবিরুদ্ধ ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত হইলেও বেন সাহেব নিজের অস্বাভাবিক মত রোগীর ঔষধ ভক্ষণের ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

It is thus correct to draw a line between feeling, and Knowing that we feel, although there is a great delicacy in the operation. It may be said, in one sense, that wə can not feel without Knowing that we feel; but the assertion is verging on error, for feeling way be accompanied with a minimum of cognitive energy or as good as none at all."

অর্থ "অতএব, অনুভূতি হইতে অনুভবকারীকে স্বতন্ত্র করা যুক্তিযুক্ত; যদিও এই কার্য্য করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। এক হিসাবে ধরিতে গেলে ইহা সত্য যে "আমরা অনুভব করিতেছি" এই জ্ঞান না থাকিলে অনুভূতি হইতে পারে না; কিন্তু এই কথাকে এই জন্য ভ্রমপূর্ণ বলা যাইতে পারে যে এই অনুভূতির জ্ঞান এত সামান্য হওয়া সম্ভব যে তাহা না ধরিলেও চলে" বেন সাহেবের কথার মধ্যেই আত্ম বিরোধিতা রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন "অনুভূতি হইতে অনুভবকারীকে স্বতন্ত্র করা যুক্তিযুক্ত"। কিন্তু এই কার্য্য

করিতে হইলে মানসিক পর্য্যবেক্ষণ (introspection ) আবশ্যক। অনুভূতি ও অনুভবকারীকে স্বতন্ত্র করিতে হইলে, এমন কর্ত্তার আবশ্যক যাহার নিকট দ্বিবিধ অবস্থাই জ্ঞাত রহিয়াছে। বেন সাহেব যে "আমি" উড়াইয়া দিতে যাইতেছেন সেই "আমি" ভিন্ন এবম্বিধ কর্ত্তা আর কেহ হইতে পারে না। বেন সাহেব আরও বলেন যে মানসিক ভাব সমূহের অনুভূতির জ্ঞান এত সামান্য যে তাহা না ধরিলেও চলে। এই "অনুভূতি" জ্ঞান সামান্য কি অসামান্য তাহা লইয়া কথা হইতেছে না—যদি বেন সাহেব স্বীকার করেন যে এই জ্ঞান আমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্রও আছে তাহা হইলেই, মানসিক ভাব সমষ্টিই "আমি" এই মত একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

"স্মৃতি" সম্বন্ধে বেন সাহেব বলেন,—

"Sensations possess the power of continuing as ideas after the actual object of sense is withdrawn."

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলেও সেই ইন্দ্রিয়বোধের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে"। আমরাও ত বলি থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া কাহার সম্বন্ধে থাকে আমরা বেন সাহেবের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আর "আশা" সম্বন্ধে ত বলা যায় না যে Sensations have the power of continuing as ideas after the actual object of sense is with drawn? কি আশ্চর্য্য! পদে পদে এপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াও আমিত্ব সংহার বাদীগণ * নিজের জেদ ছাড়িতে চাহেন না!

মিল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বারম্বার বলিয়াছেন যে মানসিক ভাব পরম্পরার সমষ্টিই "আমি"। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি "ভাব" বলিলেই ভাবের অধিকারী কোনও ব্যক্তিকে বুঝায়। "মন"ই যদি না থাকিল তাহা হইলে মানসিক ভাব আসে কোথা হইতে? মন শূন্য মানসিক ভাব কি বাতুলের প্রলাপ নহে? Percipient Being ভিন্ন perception এর অর্থ কি? এ বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে, আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন ডেকার্টের cogito ergo sum, "আমি চিন্তা করিতেছি অতএব আমি আছি" ইহাই আত্ম অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

পাঠকগণ শুনিলেন আমিত্ব সংহার বাদীগণ "আমি" নামক পদার্থকে মানসিক ভাব সমষ্টি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কতকগুলি ভাব সংযোগ হইলেই কিরূপে "আমি" উৎপন্ন হয় একথা বুঝাইতে না পারিলে কিছুই হইল না। চাল, ডাল ও জল মিলাইলেই খিচুড়ি হয় না—উনানে চড়ান আবশ্যক; সেইরূপ কতক গুলি মানসিক ভাব সংযোগেই

* হিউম, মিল, বেন প্রভৃতির "আমি" নাই এই মতকে ইংরাজীতে nihilism বলে। বাঙ্গালায় nihilism এর প্রতিরূপ কোনও শব্দ না থাকায় আমরা" আমিত্ব সংহার বাদ" এই নাম দিলাম।

"আমি" উৎপন্ন হয় বলিলে চলিবে না—কেমন করিয়া হয় দেখান আবশ্যক। একথা বুঝাইবার জন্য মিল্ আদি পণ্ডিতগণ বলেন যে কতকগুলি ইন্দ্রিয় বোধ কিম্বা মানসিক ভাব যদি কয়েকবার উপর্য্যুপরি একত্রে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে একটা মনে পড়িলেই আর সকলগুলি মনে পড়ে। এই নিয়মকে ইংরাজীতে Laws of association বলে। কিন্তু Laws of association এর দ্বারা উপর্য্যুপরি একত্রে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে, একটি মনে উদিত হইলে যে আর গুলিও উদিত হয় তাহা কোথায় হয়? Laws of association এর আর এক নাম স্মৃতির নিয়ম। যাহার স্মৃতি আছে এমন কেহ না থাকিলে "স্মৃতি" অর্থ শূন্য কথা। অতএব দেখুন যে "আমির" উৎপত্তি বুঝাইবার জন্য আমিত্ব-সংহারবাদীগণ যে Laws of association এর আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই Laws of association ই "আমি নহিলে থাকিতে পারে না। এইরূপ যুক্তিকেই ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রে Fallacy of petitio principii বলে। আমরা আত্ম অস্তিত্বে অস্বীকার কারীগণের যুক্তির আত্মবিরোধিতা দর্শাইয়া প্রমাণ করিলাম যে "আমি আছি" এই কথা কল্পনা নহে—আমি বাস্তবিকই আছি। কিন্তু পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, এমন এক সামান্য কথা লইয়া এত বাক বিতণ্ডার আবশ্যকতা কি ছিল? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কতকগুলি ভাব সমষ্টিই "আমি" এই মত খণ্ডন করিতে পারিলে, জড়বাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড়বাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার নামই আমিত্ব সংহার বাদ (nihilism)। যাঁহারা জড়বাদী, তাঁহাদিগের নিকট অচেতন জড় হইতে, চেতনা সম্পন্ন, চিন্তাশক্তিযুক্ত মনের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা আজ পর্য্যন্ত এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। বৈজ্ঞানিকদিগের জড়বাদ কেবেল অনুমান মূলক—আজ পর্য্যন্ত অচেতন জড় হইতে কিরূপে চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে বিজ্ঞান তাহার কিছুই বলিতে পারে না। * কিন্তু যদি যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারা যায় যে "মন" অথবা "আমি" স্বতন্ত্র বস্তু নহে—ইন্দ্রিয় বোধ অথবা মানসিক ভাব পরম্পরার সমষ্টি মাত্র তাহা হইলে জড়বাদ একরূপ জয়ী হইয়া উঠে। বেন সাহেবের অভিপ্রায়ও যে এই তাহা তাঁহার প্রণীত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি পাঠ করিলে বেশ জানা যায়। কিন্তু এই চেষ্টায় বেন সাহেবের মতাবলম্বী লোকেরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। "আমি নাই" এই মতের সহিত জড়বাদের অল্পই প্রভেদ। জড়বাদ বলে পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানবা-

* জড় হইতেই মনের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেও তাহা অদ্বৈত মায়াবাদীদিগের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। এই বিষয়ের আলোচনা এস্থানে হইতে পারে না।

ত্মার উৎপত্তি। আমিত্ব-সংহারবাদী গণও একরূপ তাহাই বলেন। কতকগুলি ইন্দ্রিয় বোধের (Sensations) সংযোগ বিয়োগেই জড়জগৎ ও মানবাত্মার জন্ম। অনেকের সংস্কার আছে যে হিউম মিল ও বেন প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড় ও মন উভয়েরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। একথা যে ভ্রম মাত্র তাহা বেন সাহেবের নিজের কথাতেই জানা যায়।

"It is no wonder that others have supposed him (Hume) to deny both the existence of matter and the existence of mind, although in point of a fact he denies neither. But only a certain theoretic mode of looking at the phenomena admitted by all."

অর্থ "ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে লোকে মনে করে হিউম জড় ও মন উভয়েরই অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা করেন না। সকলেই যে সকল ঘটনাবলীতে বিশ্বাস করে তাহা সম্বন্ধে বিশেষ এক প্রকার মতই তিনি অস্বীকার করেন।"

অতএব পাঠকগণ দেখিতে পাইলেন দার্শনিক আমিত্ব-সংহারবাদ জড়বাদেরই রূপান্তর মাত্র। এই মত খণ্ডন করিয়া আমরা জড়বাদকেই বলহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমি আছি বটে, কিন্তু এই "আমির" সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদিগের নাই। "আমি" জ্ঞান সাক্ষাৎ (Direct) নহে, পরোক্ষ (Indirect) মাত্র। আমি সর্ব্বদাই কোন না কোন মানসিক ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছি। ভাব কিম্বা ইন্দ্রিয় বোধ বিবর্জ্জিত "আমি" জ্ঞান একেবারে অসম্ভব। "স্মৃতি" আশা ও ইন্দ্রিয় বোধ সমষ্টির অস্তিত্বের জন্য ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানগুলিকে নিয়ম ও প্রণালী বদ্ধ (intellectualisation,করিবার জন্য আমি আবশ্যক। "আমি" আধার ব্যতীত ইহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনারও অতীত, এই জন্যই "আমি আছি" এই বিশ্বাস আমাদের পক্ষে অনতিক্রমনীয় ও ইহার বিপরীত আত্মবিরুদ্ধ (Self-contradictory) বলিয়া অসম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক মহানুভব ইনানুয়েল ক্যাণ্ট এ তত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।* তিনি বলেন Pure অথবা intelligible অথবা transcendental egoর (মানসিক ভাব বিবর্জ্জিত "আমি") জ্ঞান আমাদিগের একেবারে নাই। যে "আমির" জ্ঞান আমাদিগের আছে তাহা প্রকৃত "আমির" ছায়ামাত্র (phenomenal ego)। একথা অনেকটা সত্য। ক্যাণ্টের এই আংশিক সত্য অবলম্বন করিয়াই Hegel আদি তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ ঈশ্বরই এক প্রকৃত "বস্তু" আর সকলই তাঁহার প্রকাশ মাত্র এই মত প্রচার করেন। যাঁহারা এই তত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে

* ক্যাণ্ট যে উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। তাঁহার সিদ্ধান্ত মাত্র এ স্থানে উল্লিখিত হইল।

পারিবেন, তাঁহাদিগের নিকট অদ্বৈত মায়াবাদ অননুভবনীয় বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু এসম্বন্ধে আর অধিক বলার স্থান নাই। ভবিষ্যতে অবসর ক্রমে এই বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে।

পরিশেষে পাঠকদিগের নিকট এক নিবেদন আছে। ইংরাজি অনেকগুলি দার্শনিক শব্দের অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দ না থাকায় স্থানে স্থানে ইংরাজী শব্দের ঠিক বাঙ্গালা হয় নাই। এ ত্রুটি যতদিন বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ থাকিবে তত দিন অপরিহার্য্য। প্রবন্ধের অনেকস্থানের ভাষা হয়ত পাঠকদিগের নিকট কর্ক্কশ বোধ হইবে। কিন্তু দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে গেলে ভাষা সুখপাঠ্য হয় না। বাঙ্গালায় দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

শ্রী হীরালাল হালদার।

---

# বৃন্দাবনে।

বাঁধিতে ছিলাম মন, আপন ঘরে !—
কেন গৃহ ছাড়িলাম, বাঁশীর স্বরে ?
সমুখে প্রমোদ বন,
ফুটে ফুল অগণন !
উড়ে অলি, নাচে শিখী, হরিণী চরে !—
সে যে ছিনু, ভাল ছিনু, আপন ঘরে !
সমীর সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢ'লে পড়ে !
মৃদু কাঁপে তরু-লতা, পিক কুহরে !—
সে যে ছিনু, ভাল ছিনু, আপন ঘরে !
আকাশে তারকা কত,
চেয়ে প্রেমিকার মত !
হেসে গ'লে পড়ে চাঁদ, মেঘের থরে !—
সে যে ছিনু ভাল ছিনু, আপন ঘরে !
যমুনা উছলে কত,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ-শত !
ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা, জোছনা-ভরে !—
সে যে ছিনু, ভাল ছিনু, আপন ঘরে !
—এ যে রে সুখের ধরা !
আমি কেন এনু ত্বরা !
কার বাঁশী গেয়ে গেল, কাহার তরে ?
বাঁধিতে ছিলাম মন, আপন ঘরে !—
বুঝিতে পারি না, হায়,
কে যে—সে, কি গান গায় !
দূরে থেকে কেন ডেকে পাগল করে !
বাঁধিতে বসিলে মন, আপন ঘরে !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

——(০)——

# সুদান সমর।

## ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

গর্ডন খার্তুমে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই সন্ধির প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া মেহিধির নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা যথা সময়ে মেহিধির হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহার একজন প্রিয় অনুচর তাঁহাকে পত্রখানির মর্ম্ম অবগত করিলে তিনি পত্রস্থিত প্রস্তাবে প্রথমতঃ অন্তরের সহিত ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর কর্ত্তব্য অবধারণ ও উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তর দানের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচর বর্গ ও মন্ত্রীগণের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমান্বয়ে দশদিন পত্রের বিষয় লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। বিশেষ বাদানুবাদের পর সকলের সম্মতিক্রমে যাহা স্থিরীকৃত হইল তদনুসারে গর্ডনের পত্রের উত্তর লিখিত হইল। উহা সর্ব্ব সমক্ষে পঠিত হইলে একটি সামান্য বিষয় উপলক্ষে দুই এক জনের কিঞ্চিৎ মতভেদ উপস্থিত হইল; কিন্তু কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না তাহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বেই মেহিধি পত্রখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, আবার দশদিন উক্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন ও তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল। সকলের অভিমত অনুসারে আর একখানি পত্র লিখিত হইল, কিন্তু তাহাও পঠিত হইবা মাত্র পূর্ব্বের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইল। উহার তিন দিবস পরে বিশেষ বিবেচনার পর পুনরায় আর একখানি পত্র লিখিত হইল। উহার সার মর্ম্ম এই—

"আমি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগৃহীত 'ইমাম মেহিধি'। এই নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ ধন, মান ও প্রভুত্বের প্রলোভনে আমার মন বিচলিত হয় না। আমি ক্ষণস্থায়ী পদ-মর্য্যাদার ভিখারী নহি। যাহা কিছু ধ্রুব, যাহা কিছু অবিনশ্বর তাহারই সাধনায় আমি প্রাণ-মন উৎসর্গ করিয়াছি। তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে পদের অধিকার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ তাহা আমি নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি। স্বদেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের প্রভাব হারা হইয়া কোন বিবেচক মনুষ্য অসার পদ-গৌরবে সুখী হইতে পারে? আমি তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, অতএব আমি তোমার কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা কর, তবে ক্ষুদ্র অভিমান দূরে রাখিয়া আইস, আমি তোমাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।......

.........ইয়ুরোপীয় বন্দীগণের জন্য তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই; তাহারা যাহাতে নিরাপদে রক্ষিত হয় তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে ও থাকিবে।

তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও এবং এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া না যাও তাহা হইলে আমি দয়াময় ঈশ্বরের নাম লইয়া তোমার বিপক্ষে যুদ্ধের আয়োজন করিব।"

২২ শে মার্চ্চ, যে দিন ভীষণ বধ্যভূমিতে সৈয়দ ও হোসেন পাশার জীবন্ত দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, সেই অশুভদিনে মেহিধির দুইজন গুপ্তচর উল্লিখিত পত্র খানি লইয়া গর্ডনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। মেহিধি গর্ডনকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার পরিধানের জন্য দূত হস্তে একটি দরবেশের পরিচ্ছদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মানুরাগী গর্ডন মেহিধির পত্র পাঠে এবং তাঁহার অবজ্ঞা সূচক ব্যবহারে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিকট ঘৃণার সহিত উক্ত পত্র ও পরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মেহিধিকে সুলতান পদে বরণ করিবার জন্য যে সনন্দ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পদতলে দলিত করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহাকে "সুলতান" এই গৌরব জনক নামের পরিবর্ত্তে "সেখ মহম্মদ আমেদ" এই সামান্য নামে সম্বোধন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে তাঁহার গর্ব্বিত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেন, "আজি হইতে সন্ধির সমস্ত প্রস্তাব ভঙ্গ হইল; অতঃপর আর আমি তোমার সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিব না। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, তুমিও উহার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।"

এইরূপে সন্ধির শেষ আশা বিলুপ্ত হইলে মহাবীর গর্ডনের হৃদয় বিবিধ ভাবনায় আন্দোলিত ও আকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবনার প্রধান কারণ এই যে তিনি মুষ্টিমিত সৈন্য লইয়া কিরূপে অসংখ্য অরাতির আক্রমণ হইতে খার্তুম নগর রক্ষা করিবেন। পক্ষান্তরে গর্ডনের শেষ অনুশাসন পত্র পাইয়া মেহিধি ও তাঁহার অনুযাত্রীগণের মন এই ভাবিয়া আনন্দে ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে কত দিনে স্বদেশের স্বাধীনতার শত্রু-কুল বিনষ্ট অথবা দেশ হইতে দূরীকৃত হইবে। গর্ডনের পত্র পাইয়া মেহিধি একবার ক্ষণকালের জন্য প্রগাঢ় ভক্তির সহিত স্বীয় আরাধ্য দেবতার আরাধনা ও স্তব স্তুতি করিলেন, অনন্তর তিনি মহোৎসাহে তাঁহার অনুচর বর্গ ও সুদানবাসী মুসলমানগণকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি খার্তুমের সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধনের জন্য জ্বলন্ত বক্তৃতা করিয়া অযুত নর নারীর তেজস্বী হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ উন্মাদিত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে তিনি ধর্ম্ম যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া সমস্ত দেশবাসীকে খার্তুম নগর আক্রমণ ও ধ্বংশ করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সহচর সেখ মহম্মদের নিকট একখানি গম্ভীর উত্তেজনা ও উদ্দীপনা পূর্ণ পত্র লিখিলেন। উহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

"প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমা প্রচারক মহম্মদের বিশেষ বিধান অনুসারে ধর্ম্মযুদ্ধের উত্তেজন, সমর্থন ও আয়োজন করিবার জন্য আমি ইতি পূর্ব্বে নানা স্থানে বিস্তর বক্তৃতা করিয়াছি। যৎকালে আমি তোমাকে চারিদিকে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করিয়া খার্তুম নগর আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছি তখন সেই আজ্ঞা পালন করা তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত; কারণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে কাহারও শিথিল-যত্ন হওয়া নিতান্ত লজ্জা ও দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয়! সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আদেশ করিয়াছেন, "তোমার ত্রাণ কর্ত্তা প্রভুর অনুগ্রহ প্রভাবে পরিত্রাণ পাইতে সত্বর প্রস্তুত হও"। ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজনে নিশ্চয় তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইবে। সুখ শান্তির প্রিয় নিকেতন এই অসীম ভূমণ্ডল ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাদিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ যে পুণ্যাত্মাগণ ধর্ম্ম যুদ্ধে স্বস্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন এই পৃথিবী তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান। পবিত্র কোরাণের অনেক স্থান ধর্ম্মযুদ্ধের অনুষ্ঠাতা ও উৎসাহ দাতাগণের অশেষ স্তুতিবাদে এবং যাহারা উহাতে উপেক্ষা ও অনুৎসাহ প্রদর্শন করে সেই নীচাত্মাদিগের ঘোর নিন্দাবাদে পূর্ণ! তুমি যেরূপ মহোচ্চ পদ-মর্য্যাদায় গৌরবান্বিত, তোমার মত লোকের ধর্ম্মযুদ্ধে অতুল উৎসাহ ও বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করা একান্ত প্রার্থনীয়। জগদীশ্বর তোমার হৃদয়ে বলদান করুন; তোমার প্রতিজ্ঞা অটল হউক; তুমি তাঁহার পবিত্র আজ্ঞা পালনে সক্ষম হও। এই পত্র পাইবা মাত্র তোমার নিকটস্থ মুসলমানদিগকে উত্তেজিত কর; তাহাদের প্রাণ বীর-মদে মাতাইয়া দাও এবং তাহাদের সহিত একপ্রাণে মিলিত হইয়া ভীম পরাক্রমে শত্রু-পরিবৃত খার্তুম নগর আক্রমণ কর। তাহার সমস্ত পথ রোধ করিয়া ফেল। তত্রত্য তুর্কী ও বিধর্ম্মী নাস্তিকদিগকে এবং তাহাদের সহবাসী লোক সকলকে বিব্রত ও বিপদ-জালে জড়িত কর, এবং তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যে প্রাণপণে ঘোর বিঘ্ন উৎপাদন কর। যতক্ষণ দুরাত্মাগণ ঈশ্বরের আদেশ-বাণী শ্রবণ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তোমাদের বিক্রম ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্তম্ভিত কর। পূর্ব্বে যে নরাধমেরা তাঁহার মহা অভিশাপে রাশি রাশি কামান ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়াও নিহত হইয়াছে তাহাদের ন্যায় উহারাও বিনষ্ট হইবে। মঙ্গলময় ধর্ম্মযুদ্ধের অনুষ্ঠানে সত্বর আগ্রহান্বিত হও; নিশ্চয় জানিও জগদীশ্বরের কৃপায় তোমরাই তাহাদের উপর জয় লাভ করিবে। আমি যেরূপ আদেশ করিলাম তুমি যদি তাহা কার্য্যে পরিণত কর তাহা হইলে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে। তোমরা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছ যে জয়-গৌরব বিধাতার অনুগ্রহে আমাদের জন্যই সঞ্চিত রহিয়াছে। পূর্ব্বের যুদ্ধ আমাদের নিকট কতই সহজ বোধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে শত্রুগণ কত শীঘ্র বিনষ্ট হইয়াছিল—অর্দ্ধ ঘণ্টার অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে কত শত শত্রু

নিহত হইয়াছিল—মনে রাখিও আমরা তাহাদিগকে নিপাত করি নাই, দুষ্টের দমনকর্ত্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহারা নিপাতিত হইয়াছিল! মঙ্গলময় বিধাতার জয় চারিদিকে বিঘোষিত হউক; তিনি মনুষ্য-প্রপীড়ক দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াছেন! তোমরা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর এবং ধর্ম্মের জয়ের জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দাও।”

এই তেজোময় উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র পাঠে সেখ মহম্মদ নববলে ও নবোৎসাহে উন্মাদিত হইয়া চারিদিকে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। স্বদেশানুরাগী ফকিরগণ মেহিধির পত্র লইয়া প্রধান প্রধান ধর্ম্ম মন্দিরে উহার মর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। শত শত বীর পুরুষ যুদ্ধার্থে বদ্ধ পরিকর হইল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক সেনা বর্ষা, বন্দুক ও তরবারি লইয়া খার্তুম অভিমুখে ধাবিত হইল।

এদিকে গর্ডনও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি মেহিধির অবমাননা সূচক পত্রের উত্তর দান করিয়াই খার্তুম নগর রক্ষা এবং কৌশলে বিপক্ষ দলের বল নাশ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে সদুপায় অবলম্বনে রত হইলেন। খার্তুম নগরের বন্দরে যতগুলি জাহাজ ছিল তৎসমুদায় যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত হইয়া নাইল নদীর তীরবর্ত্তী গ্রাম সকল আক্রমণে নিয়োজিত হইল। এই সকল রণতরী প্রতিদিন নীল-নাইল (blue Nile) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তৎসন্নিহিত বিদ্রোহীদিগকে গোলা-গুলি বর্ষণে দূরীভূত করিয়া আনিত। নাইলের উত্তর তটবর্ত্তী দুইটি বৃহৎ গৃহ এবং খার্তুম দুর্গ-প্রাকারের বহিঃস্থিত অনেক গুলি গৃহ অবিশ্রান্ত গোলাগুলির আঘাতে ছিদ্রময় হইয়াছিল এবং পরিশেষে ঐ সকল গৃহ লুণ্ঠিত ও বাসিবেজোক সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ২৭০ জন সৈন্য এবং তাহাদের কর্ম্মচারীগণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কতিপয় স্থান অধিকার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিলে গর্ডনের আদেশ অনুসারে একদল বলিষ্ঠ সুদানী সৈন্য তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈন্য-শ্রেণী হইতে বিচ্যুত করিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সৈন্য প্রকাশ্যভাবে মেহিধির সৈন্যের সহিত মিলিত হইল, কেহ কেহ অপ্রকাশ্যভাবে গর্ডনের সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও আত্ম-বিচ্ছেদ জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইল। ২৪শে মার্চ্চ চারিখানি রণতরী হাল্‌ফায়া দুর্গ আক্রমণার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। জাহাজ গুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে একটি বৃহৎ ক্রপ্‌ কামান নীল নাইলের উত্তরতীরে স্থাপিত হইয়াছিল। উহা হইতে অবিরাম গোলা বর্ষিত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে বিদ্রোহীগণের শিবির ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। ঐ দিবস একদল সাহসী আরব সেনা গুপ্তভাবে খার্তুমের সম্মুখবর্ত্তী গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে খার্তুমস্থ রাজপ্রাসাদের উপরে ভয়ানক গুলি বর্ষণ

করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল লাভ করিতে পারে নাই। অনন্তর কিছুকাল প্রতিদিন দুই দলে এইরূপ গোলা বর্ষণ চলিতে লাগিল। কেহ কাহারও উপর জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল না, কিন্তু প্রতিদিন গোলাগুলির আঘাতে উভয়পক্ষীয় দুই একটি লোক হত ও আহত হইতে আরম্ভ হইল। এই সকল বিদ্রোহী সেনার সাহস ও বিক্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়া গর্ডন ২৯শে মার্চ্চ বৃটিশ পার্লিমেণ্টে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উপসংহারে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল;—"এই সকল রাইফল-ধারী সৈন্যের সংখ্যা ১৫০০ পোনের শতের অধিক বোধ হয় না এবং ইহাদের মধ্যে এরূপ ১৫০ জন সুশিক্ষিত ও বদ্ধপরিকর সৈন্য নাই যাহারা উচ্ছৃঙ্খল ইতর লোকদিগকে একত্র দলবদ্ধ রাখিতে পারে। নগরের ভয়ে এখন আর আমি দুর্গের বাহিরে যাইতে সাহস করি না। যদি আপনারা জিবার পাশাকে পাঠাইতেন তাহা হইলে এত দিন এই সকল বর্ত্তমান ঘটনার কতই পরিবর্ত্তন ঘটিত!"

গর্ডন আপনার ও খার্তুমের বর্ত্তমান অবস্থা ইংলণ্ডের গোচর করিয়া খার্তুমের অন্ধকারময় ভবিতব্যের বিষয় পরিচিন্তনে নিমগ্ন রহিয়াছেন এমন সময় খার্তুমের চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ পরিব্যাপ্ত হইল যে বৃটিশ সেনা এল্ দেমারে উপস্থিত হইয়াছে। এই শুভ সংবাদে খার্তুম দুর্গবাসী শত শত নর নারীর হৃদয় অপার আনন্দে পরিপ্লুত হইল। এই সংবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ইহা নগরের এক সীমা হইতে সীমান্তরে প্রচারিত হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া পরম আনন্দ লাভ ও সুখ অনুভব করিলেন। তিনি ভাবিলেন বৃটিশ সেনার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ বিপুল উৎসাহ লাভ করিবে এবং বিদ্রোহীগণ অনিবার্য্য গুরুতর দণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া বিদ্রোহাচরণে নিরস্ত হইবে। তাঁহার সিদ্ধান্ত—অংশতঃ সফল হইল; তাঁহার সৈন্যগণের ভগ্নোৎসাহ-হৃদয়ে নূতন উৎসাহ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বলের সঞ্চার হইল। কিন্তু বিপক্ষ দল এই সংবাদ শ্রবণে বিন্দুমাত্র ভীত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহ ও সাহস সহকারে খার্তুম নগর অবরোধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইল। ৩০শে মার্চ্চ ইংলণ্ড হইতে খার্তুমে ডাকযোগে যে সকল পত্রাদি আসিয়াছিল তাহা পথিমধ্যে একদল বিদ্রোহী সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাহিরের আর কোন পত্রাদি গর্ডনের হস্তগত হয় নাই; তৎসমস্ত বিদ্রোহীগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

—:০:—

# গার্হস্থ্য চিত্র।

ফুটে ফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাছুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
শাদা শাদা মুখ তুলি, যূঁই সেফালিকা গুলি,
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে।
প্রাচীরেতে সুশোভিতা, রাধিকা, ঝুমকালতা,
ছুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়, বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল!
প্রশান্ত মুখের পরে, কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুল!

মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় 'ঘুমপাড়ানিয়া' গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে?
(পিঞ্জরে) ধরেছে পাখী পিউ পিউতান।
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সেই রূপ রাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে,
ছেলে ডাকে 'আয়চাঁদ' মা, বলিছে'আয়চাঁদ'
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা, নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

# মেসমেরিজম।

## বা

## শক্তিচালনা।

এখানে প্রথমেই বলা আবশ্যক মানসিক-শক্তি অনুসন্ধান-সভা শক্তিচালনা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য-জনক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছেন সে সকলি প্রায় সাধারণ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া; অর্থাৎ মনে মনে ইচ্ছা আর বাহিক হস্ত-চালনা, দৃষ্টি প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা; ব্রেডের প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রায় কিছুই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।*

* যাঁহাদের তত্ত্বাবধারণে মেসমেরিজম বিভাগের কার্য্য হইয়া থাকে তাঁহাদের নাম।
W. F. Barrett, F. R. S. E. Edmund gurney, M. A. Frederic.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রেড ইচ্ছাশক্তি কিম্বা শারীরিক আকর্ষণ-আভা কিছুই মানেন না, তিনি বলেন "একটুও গোলমাল না হয়, অন্য কোন দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়, এইরূপ নিস্তব্ধ অনন্যমনাভাবে পাত্রকে একটি নির্জ্জন গৃহে বসাইয়া তাহার কপাল হইতে ১৫ ইঞ্চি দূরের কোন চকচকে জিনিষ কি মুদ্রার প্রতি এইরূপ অবস্থায় তাকাইয়া রাখ যে যাহাতে তাহার চক্ষের অন্তর বাহিরের শিরার কুঞ্চন আরম্ভ হয় তাহা হইলেই পাত্র মোহাভিভূত হইবে।"

ব্রেড বলিতেছেন, এইরূপেই তিনি অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অথচ উক্ত সমিতি এই প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য করিতে গিয়া মোট একজনকে আংশিক মুগ্ধ করিতে পারা ছাড়া আর কাহারো উপর কোনরূপ প্রভাব খাটাইতে পারেন নাই। †

মেসমেরিজম বিভাগের তত্ত্বাবধারকগণ তাঁহাদের পরীক্ষিত ঘটনা রাশিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম, কথায় ভ্রান্তি উৎপাদন বা ভাব প্রবলতা;

দ্বিতীয় ইচ্ছা কর্ত্তার সহিত সমানুভূতি বা তন্ময় ভাব;

তৃতীয় পাত্রের শরীরে স্থানিক অসাড়তা উৎপাদন। আমরা এই তিন জাতির ঘটনাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিব।

কথায় ভ্রান্তি উৎপাদন বা ভাব প্রবলতা। আমরা পূর্ব্বে যে প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা বলিয়াছি, তাহাও এইজাতীয়। পাত্রকে একবার মুগ্ধ করিতে পারিলে তখন তাহাকে যে কথা বল যে ধূয়া ধরাইয়া দাও তাহাই তাহার সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়।

উক্ত সমিতি অনেকের উপর পরীক্ষা করিয়া এ রূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছেন, তবে ফ্রেড ওয়েল্‌স্ নামে ব্রাইটনের রুটি-

---

W. H. myers, M. A., Henry N Ridley, M, A. F. L. S., W. H. stone, M. A., M. B.; George Wyld. M. D.; and Frank Podmore B. A.; Hon. Secretary.

† উক্ত সমিতির তত্ত্বাবধারকগণ বলিতেছেন —"Before recounting our more consecutive experiments, we ought to mention that we have tried on several occasions to influence various persons—boys of from 12 to 20 years old in the manner described by Braid, but, hitherto with little success.

* * * *

Braid states that he found the great majority of the persons on whom he operated susceptible to this method. we on the other hand have only had even partial success in one case, that of Mr W. North, late lecturer at westminster hospital. * * But the rest of the phenomena here described were preceeded by the condition ordinarily associated with mesmeric influence.

Proceedings of the Society for Psychical Research. Vol 1.

ওয়ালার একজন ছেলেকে লইয়াই অধিক পরিমাণে এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে। ওয়েল্‌স্‌ কুড়িবৎসর বয়সের একজন বুদ্ধিমান যুবক। মিষ্টার স্মিথ নামে এক জনকে দিয়া তাহার উপর শক্তিচালনা করা হইত।

স্মিথের শক্তিচালনার প্রণালী এইরূপ, —ফ্রেডকে চৌকিতে বসাইয়া তাহার হাতের চকচকে গোল জিনিসের প্রতি তাহাকে চাহাইয়া রাখিয়া তিনি মাঝে মাঝে তাহার মাথার কাছ হইতে পা পর্য্যন্ত হাত চালাইয়া যাইতেন। খানিকক্ষণ এইরূপ করিবার পর, ফ্রেডের মাথা একটু উঠাইয়া ধরিয়া তাহার চোখ বুজাইয়া দিয়া, ভ্রূর মধ্যস্থলে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বলিতেন— "চোখ খোল"। যদি দেখিতেন সে খুলিতে পারিল ত আবার গোড়া হইতে উক্ত প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য আরম্ভ করিতেন;— কিন্তু যদি খুলিতে না পারিত তাহা হইলে তখন তাহার ঠোঁটের দুই পাশে একটু আঘাত করিয়া বলিতেন—"ঠোঁট খোল—" যদি দেখিতেন ঠোঁট খুলিতেও সে অপারক তখন তাহাকে লইয়া ক্রমে অন্যরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিতেন।

মেসমেরিজম সমিতি বলিতেছেন, এইরূপে বদ্ধ চক্ষু, রুদ্ধ-ওষ্ঠ—হইয়া যখন পাত্র তাহা খুলিবার জন্য আঁকু বাকুঁ করে, সেই শক্তির হাত এড়াইতে চেষ্টা করে— তখন তাহাতে অক্ষম হইয়া তাহার মুখে যেরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়—তাহা দেখিতে বড় অদ্ভুত।

সাধারণতঃ এইরূপে ক্রমে পাত্রের এত পূর্ণ মোহ জন্মে যে তখন যত কেন আজগুবে কথা হউক না তাহাতে আর তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে না, তবে মুগ্ধ হইয়াও, আরম্ভে কখনো কখনো কতকটা জ্ঞান থাকে, তখন কোন কথা বলিলে তাহাতে তাহার কিছু কিছু অবিশ্বাস হইতে থাকে, ক্রমে তাহা লোপ পাইয়া পূর্ণভ্রান্তি জন্মিয়া যায়।

একবার ফ্রেডকে মুগ্ধ করিয়া স্মিথ তাহার সম্মুখে একখানা রুমাল দোলাইয়া বলিলেন "এই দেখ একটি ছেলে" ফ্রেড শুনিল, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, সে সন্দিগ্ধ চিত্তে দেখিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সন্দেহ দূর হইল, সে রুমাল খানাকে সাবধানে হাতের উপর তুলিয়া লইল। কিন্তু স্মিথ আবার যখন তাহার মনোযোগ একটু শিথিল করিয়া দিলেন, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল যে সে ছেলে রাখিতে নিতান্ত অপটু—সে তখন ছেলের মাথা কোথা খুজিয়া অস্থির। তাহার এই ব্যাকুলতার মাঝখানে স্মিথ তাহার মোহ ভাঙ্গাইয়া দিলেন। সে তখন নিজেই অন্য সকলের সঙ্গে হা হা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ সন্দেহ জন্মিতে দেখা যায় না, পূর্ণ ভ্রান্তিই ঘটিয়া থাকে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই চারিটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করি, একবার ফ্রেড মোহাভিভূত হইলে স্পঞ্জকেক বলিয়া তাহাকে একটা মোমবাতি দেওয়া হইল, সে বাতিটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া মুখে ফেলিতে ফেলিতে বলিল "কেকটা কেমন খারাব হইয়া গিয়াছে," বলিয়া সত্যই সে

দেড় ইঞ্চ বাতি উদরস্থ করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার পর তাহার সে কেকটা এত বিশ্রী মনে হইল যে আর সে তাহা খাইতে স্বীকৃত হইল না। একবার এই সময় তাহাকে মিছরি বলিয়া কতকটা নুন দেওয়া হইল, দিব্য আয়াসে তাহা সে খাইতে লাগিল। কিন্তু সত্যকার মিছরি লঙ্কার গুঁড়া বলায় স্পর্শও করিল না।

একবার গোলমরিচের গুঁড়া তাহার নাকের কাছে ধরিয়া তাহাকে বলা হইল তাহা মিয়োনেট ফুল, আশ্চর্য্য এই, তাহাতে যে সে কেবল হাঁচিল না, এমন নহে, তাহার চক্ষের পাতা উলটাইয়া দেখিয়াও তাহাতে জল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গেল না। অথচ ইহার খানিকক্ষণ পরে—মাঝে অন্যরূপ পরীক্ষা হইয়া গেলে, তাহার নাকের কাছে নুনকে যেই নস্য বলিয়া ধরা হইল—অমনি সে হাঁচিয়া হাঁচিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। ইত্যাদি।

আর একবার—তখন তাহাকে মুগ্ধ করা হয় নাই, তাহার দিব্য স্বাভাবিক অবস্থায়—তাহাকে স্মিথের দিকে চাহিয়া থাকিতে বলা হইল, চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একটু পরে তাহাকে বলা গেল—স্মিথ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। স্মিথ তাহার সম্মুখে, অথচ সে চারিদিকে সৌৎসুকে চাহিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল। এই অবস্থায় একজন স্মিথকে দেখাইয়া দিলেন, সে চিনিতে পারিল না, বলিল "আমি কখনো উহাকে দেখি নাই।"

এইরূপ মুগ্ধ অবস্থায় অনুকরণের ক্ষমতা আশ্চর্য্য রূপ বাড়ে। তাঁহারা ব্রেডকে কখনো কাকাতুয়া কখনো পোকা, কখনো ঘড়ি, কখনো মূর্ত্তি (Statue) কখনো ভাল্লুক, কখনও ব্যাং এইরূপ বলিয়া দেখিয়াছেন যে সে তখন আপনাকে কথিত জন্তু জ্ঞানে তাহার আশ্চর্য্যরূপ অনুকরণ করিয়াছে।

ব্যাং হইয়া সে এমন শাগ্র শীঘ্র ও অসতর্কতার সহিত লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে তাঁহাদের ভয় হইল বুঝিবা সে কোন খানে আহত হয়। এই ভয়ে শীঘ্রই তাহার মোহ ভাঙ্গাইয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন।

আর একবার তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন তুমি নাইটেনগেল পাখী। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সে কাকাতুয়া হইয়া কেবল যেমন কাকাতুয়ার মত ডাকিয়াছিল—এবারও তাহাই করিবে। কিন্তু যেই তাহার মনে হইল সে নাইটেনগেল, সে অমনি বেগে দেয়ালের বই পূর্ণ উচ্চ সেল্‌ফের উপর গিয়া উঠিল; এবং কোন পাখী ঘরের মধ্যে বন্ধ হইলে দরজায় যেমন দুট পাখা ছড়াইয়া ঝট ঝট করিতে থাকে, তেমনি মাথাটা তাহার কড়িকাঠের দিকে সে দুই হাত দেয়ালে দিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল।

এইরূপ মোহের সময় এক সঙ্গে দুইরূপ ভাবও মোহিষ্ণুর মনে জন্মান যাইতে পারে। একবার ফ্রেডকে বলা হইল তাহার শরীরের একদিক যাঁতাকল আর অপর দিক একটা ছেলের দাসী, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া এক হাত যাঁতার মত ঘুরাইতে লাগিল,

আর এক হাতে কল্পিত ছেলেকে ধরিয়া রহিল।

দেখা গিয়াছে পাত্রের উক্ত রূপ পূর্ণ ভ্রান্তির অবস্থাতেও যখন ইচ্ছাকারী একবার তুড়ি কি হাততালি দিয়া "সব ঠিক" এইরূপ বলিয়া উঠেন, অমনি তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, পাত্র তখন আশ্চর্য্য ভাবে চারি দিকে চাহিয়া দেখে, কিছুই তখন আর তাহার মনে নাই। তবে যদি পূর্ণ মোহ না জন্মে, তবে সে অবস্থার কথা কতক কতক পাত্রের পরে মনে থাকিতে দেখা যায়, আর পাত্র যতই কেন নিদ্রাভিভূত হউক না—যদি ইচ্ছাকারী তখনকার ঘটনা তাহাকে পরে মনে রাখিতে আজ্ঞা করেন—তবে তাহা পাত্রের পরে মনে পড়ে।

এমন কি, এই মুগ্ধ অবস্থায় ইচ্ছাকারী যে আজ্ঞা তাহার মনে অঙ্কিত করেন তাহা যতই ভয়ানক হউক না কেন, ইচ্ছাধীন তাহা প্রতিপালন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এইরূপে একটা আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া ফ্রেড একবার জাগিয়া তাহার কোট আগুণে ফেলিয়া দিয়াছিল, আর একবার লৌহদণ্ডের ভিতর হইতে আগুণে আঙ্গুল বাড়াইয়া দিয়াছিল, অবশ্য হাত পুড়িবার আগেই তাহাকে বাধা দেওয়া হইল।

ফ্রেডকে একসঙ্গে নানা কথা মনে করিবার আজ্ঞা দিলে, পরে জাগিয়া উঠিয়া তাহা মনে করিবার জন্য তাহার অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে হইত, এমন কি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ধরিয়া উঠিত। একবার এইরূপে সে এমন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল—যে দিন কতক উক্ত সমিতি তাহাকে এইরূপ পরীক্ষার হাত হইতে রেহাই দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে যদিও তাহার ক্রমে সে আজ্ঞা মনে পড়িত কিন্তু কিরূপ অবস্থায় সে আজ্ঞা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা মনে পড়িত না।

ফ্রেডের নিজের কথা এই, জাগিয়া তাহার মনে হইত—তাহার যেন কি কাজ করিতে হইবে, কিন্তু ঠিক কি কাজ তাহা তৎক্ষণাৎ মনে হইত না, খানিকটা ভাবিতে ভাবিতে তখন মনে আসিত।

সাধারণতঃ সে জাগিয়া উঠিয়া ইচ্ছাসুখে কখনও সেই সব আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই, নিতান্ত না করিয়া যখন থাকিতে পারিত না, তখনই সে করিত, কে যেন তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল পূর্ব্বক সেই কার্য্যে বাধ্য করিত। তাহাকে যেরূপ অদ্ভূত অদ্ভূত কাজ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইত, তাহাতে এই অনিচ্ছা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই শ্রেণীর ঘটনা উক্ত সভা অনেক দেখিয়াছেন অন্যান্য পুস্তকেও এরূপ ঘটনার অনেক সংগ্রহ দেখা যায় কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। তবে এই সম্পর্কে এখানে আর একটি গল্প আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অধ্যাপক লিজোয়া—(ন্যানসির একজন অধ্যাপক) বলেন যে ইচ্ছাশক্তি প্রবল একজন ইচ্ছাকারী তাহার ইচ্ছাধীন ব্যক্তিকে মোহাভি-

ভূত অবস্থায় আজ্ঞা দিয়া তাহা দ্বারা যেমন ইচ্ছা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করাইতে পারেন। তিনি ইহার প্রমাণ দেখাইতে এক-জন বলবান পুলিসম্যানকে একদিন মেসমেরাইজ করিয়া বলিলেন” তুমি জাগিয়া টেবিলের উপরের ঐ কাঠখানা লও, উহা একখানা ছুরি, উহা লইয়া তুমি হাঁসপাতালের বাগানে যাও, সেখানে মাঝের রাস্তার উপরে যে চতুর্থ গাছটা দেখিবে— উহা বাগানের মালী, তুমি উন্মত্ত হইয়া ঐ ছুরি তাহার বুকে বসাইয়া দেও, দিয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়া সে কথা আমাদের বল”। পুলিসম্যান জাগিয়াই টেবিল হইতে কাঠখানা তুলিয়া—ছুতা নাতা করিয়া বাহিরে গেল। প্রকাশ্য ভাবে তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য দিল না—কিন্তু জানালা হইতে সকলে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সে বাগানে গিয়া কেহ আছে কি না—চারিদিক একবার দেখিল তাহার পর সেই গাছটাতে সবলে ছুরি বসাইয়া দিল। দিয়াই সে আপনার কার্য্যের ভীষনতা যেন হৃদয়ঙ্গম করিল, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল “আমাকে বন্দী কর আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি। একজন নিরপরাধীকে এখনি হত্যা করিয়া আসিতেছি।” তাহাকে প্রশ্ন করাতে যে কেন সে এরূপ কাজ করিল সে বলিল “হঠাৎ একটা এরূপ ঝোঁক হইল যে কোন মতে সে আপনাকে সামলাইতে পারিল না।”

একটা আদটা নয় অনেক পরীক্ষায় লিজোয়া এইরূপ ঘটিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, ইচ্ছাধীনকে জাগিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ যে আজ্ঞা পালন করিতে বলিয়া রাখা হইবে তাহাই যে কেবল সে পালন করিবে এমন নহে। আজ কোন আজ্ঞা করিয়া রাখ যে তিন মাস পরে তাহার পালন করিতে হইবে—তিন মাস পরেও সে তাহাই করিবে। লিজোয়ার এতদূর ইচ্ছায় প্রভাব যে তিনি নাকি একবার একজন খোঁড়াকে নৃত্য করাইয়াছিলেন, একজন বোবা তাহার আজ্ঞায় নাকি বক্তৃতা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা হইতে কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? ইহা হইতে বুঝা যায় যার তার হাতে এ শক্তি কি ভয়ানক, ইহা প্রবৃত্তি-পরায়ণ মনুষ্যের পক্ষে কি প্রলোভন! এই জন্যই বুঝি ঋষিগণ এ সকল বিদ্যা সাধারণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

—০———০—

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন আর মসীনের বাড়ী দ্বারবান লোক নস্করের জমজমা নাই, ফটক তাই ভিতর হইতে সারাদিনই এক রকম বন্ধ থাকে, কেহ বাড়ী ঢুকিতে চাহিলে ডাকিয়া

খোলাইতে হয়। বুড়ী দরজার কাছে আসিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেই ভোলানাথ নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। মহম্মদ গিয়া অবধি তিনি মুন্নার রক্ষকরূপে এই খানেই প্রায় থাকেন। স্নানাহার করিতে কেবল দু একবার বাটীতে যান।

বুড়ীকে ভোলানাথ চিনিতেন, সে মাঝে মাঝে মসীনের কাছে টাকা লইতে আসিত দেখিতে পাইতেন। আজ তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে—বলিলেন—"বুড়ীজি বলিব কি—" বুড়ী তাঁহার কথা শেষ করিতে দিল না বলিল—"জি আমি একটা কথা বলিব—আগে শোন"। বুড়ির স্বরে, বুড়ীর ধরণ ধারণে এমন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ভাব ব্যক্ত হইল—যে ভোলানাথের মনে ধাঁ করিয়া কেমন একটা খটকা উপস্থিত হইল, তিনি তাড়াতাড়ি হুড়কা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কথাটা কি" ?

বুড়ি বলিল "আজ রাত্রে এই বাড়ীতে চুরি হইবে সাবধান করিতে আসিয়াছি।"

ভোলানাথ। "চুরী! এখানে আর আছে কি যে চুরী করিতে আসিবে ?

বুড়ী। "ধন কড়ির বাড়া রত্ন আছে। মুন্না বিবিজিকে চুরী করিতে আসিবে, জাহা খাঁর হুকুম।"

ভোলানাথ বিস্ফারিত চক্ষে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"মহাভারত! তাও কি হয় ?

বুড়ি বলিল—"খোদা করুন, যেন না হয়। কিন্তু আমি মিথ্যা বলিতেছি না।"

ভোলানাথের হাত পা অবশ হইয়া আসিল, কপাল হইতে টস টস করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল, তিনি বারান্দায় একটা খুঁটি দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন—"রাম রাম! এ কি ব্যাপার"।

বুড়ী বলিল—"জি অমন করিলে ত চলিবে না—একটা ত উপায় করা চাই।"

ভোলানাথ বলিলেন—"তাইত," বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া দরজার হুড়কাটা খুলিয়া বাহিরে এক পা বাড়াইয়া দিলেন, বুড়ি বলিল—"কি কর জি—কোথায় যাও।'

তাঁর এক পা চৌকাঠের এ পারে—এক পা ওপারে—তিনি বলিলেন

"আমি লোক ঠিক করিতে যাই, দস্যুরা আসিলে ভাগাইয়া দিবে।"

বুড়ি বলিল—"তারা যে অনেক লোক অত লোক হাঁকান কি কম লোকের কাজ? আর এখনি অতলোকের জোগাড় করিয়া উঠা কি তোমার কর্ম্ম জি ?"

ভোলানাথের যেন হুঁস হইল, বলিলেন, "তাইত, তাতে যে আবার পয়সা চাই, তা যে আমাদের নাই। তা বুড়ি জি—এই কথা শুনিলে লোকেরা কি অমনি মুন্না বিবিকে রক্ষা করিতে আসিবে না? এ দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া মানুষে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে ?"

বুড়ীর অতি দুঃখে হাসি আসিল, বলিল হ্যাঁ জি—এ সময় অমন ক্যাপার মত কথা বল কেন? খাঁজাহার নাম শুনলে কে এখানে প্রাণ খোয়াইতে আসিবে? আর যদি বা কেউ আসে—খাঁজাহার সহিত যুদ্ধ

করিয়া তুমি কি জিতিবে জি? তাঁহার ইসারায় তোমার বাড়ী ঘর লোকজন যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।”

ভোলানাথ হতাশ হইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—“তবে কি করিব, এখনি বিবিজিকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাই।”

বুড়ি বলিল—“এখনও এত রোসনাই, এখন যাওয়া কেন? কেহ যদি দেখিয়া ফেলে ত সর্ব্বনাশ। আর একটু থাক একটু গা ঢাকা ঢাকা হইলেই পলাইলে চলিবে—তারাও আসিবে সেই রাত দুপুরে। কিন্তু যাইবে কোথায়?”

ভোলানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন—“আমার বাড়ী গিয়া সকলে আজকের রাতটা লুকাইয়া থাকি, কাল সকালে এদেশ ছাড়িয়া যাইব, এদেশে আর থাকিতে আছে! ভগবান তোমার মনে এই ছিল!”

ভোলানাথের চোখে জল আসিল।

বুড়ি বলিল—“এ কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে না, বিবিজিকে এ বাড়ীতে না দেখিলেই আগে তোমার বাড়ীতে তাহারা খুঁজিতে যাইবে”।

ভোলানাথের কথা বাহির হইল না, বুড়ী বলিল—“জি যদি বল—আজ রাত্রে বিবিজিকে আমার বাড়ী লুকাইয়া রাখি, একথা আর কারো মনে আসিবে না।”

ভোলানাথ তাহাতেই রাজী হইলেন। আর কেহ হইলে এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হইত কি না জানি না। হাজার হউক, বুড়ী একজন অজানা অচেনা সামান্য লোক, দু একবার তাহাকে চোখে দেখিয়াছেন ছাড়া—তাহার আর বিশেষ তিনি কিছুই জানেন না। মুন্নার সহিতও যে বুড়ীর জানাশুনা আছে, তাহাও নহে, মুন্নাকে সে কখনো চক্ষেও দেখে নাই, অথচ মুন্নার জন্য হঠাৎ তাহার এত মাথা ব্যথা পড়িয়া গেল—যে মুন্নাকে যাচিয়া আশ্রয় দান করিতে আসিল, প্রকাশ হইলে জাহা খাঁর কিরূপ ক্রোধভাজন হইবে জানিয়া শুনিয়া তাহাও গ্রাহ্য করিল না, ইহাতে অন্য লোকের মনে নানা কথা উঠিতে পারিত, মুন্নাকে তাহার বাড়ী পাঠাইতে সম্মত হইবার আগে অন্ততঃ একবার অন্য কেহ ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু ভোলানাথ স্বতন্ত্রদরের মানুষ, তিনি জানেন, যেখানে অত্যাচার সেই খানেই সহানুভূতি, যেখানে অন্যায় পীড়ন সেইখানেই সহৃদয়তা, ইহাতে আত্মপর পরিচিত অপরিচিত এ সকল আবার কি? এরূপ স্থলে তিনি যাহা করিতেন তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া জানেন, অন্যথা দেখিলেই তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন। সুতরাং বুড়ীকে তাঁহার সন্দেহ মাত্র হইল না। তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি একটি কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল জলপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিলেন, বুড়ি যদি একটা তানপুরা হইত তাহা হইলে বরং তারগুলা ঝনঝন করিয়া দিয়া মনের এই কৃতজ্ঞতাটা সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেন। যাই হোক, বুড়ি তাঁহার এই কৃতজ্ঞতা বুঝিল কিনা কে জানে,—খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ঝোপের অন্ধকার কায়ার উপর একটা ভীষণতর, গাঢ়তর অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া, দ্বিপ্রহরের আগেই সশস্ত্র দস্যুদল একে একে মসীনের বাটীর প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাপের একটা ভীম-করাল-মূর্ত্তি রজনীর প্রশান্তির হৃদয় মাড়াইয়া যেন বিকট নিঃশব্দ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল, স্তব্ধ বনানী শিরায় শিরায় কাঁপিয়া উঠিল। সুষুপ্ত পাখীগুলি শিহরিয়া পাখনা ঝাড়া দিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, দুইটা শৃগাল ঝোপের একপাশ হইতে সচকিত দৃষ্টিতে দস্যুদের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে তাহাদের পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। দস্যুরা কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সিঁদকাটি দিয়া দেয়ালে মস্ত একটা গর্ত্ত করিয়া তুলিল, তাহার পর দুইজন করিয়া একসঙ্গে তাহার ভিতর দিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাগানের শুকনা পাতায় পা পড়িবামাত্র যখন মড় মড় শব্দ হইয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ যখন মুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকে চারিদিক তাহাদের চোখে পড়িল, তখন একবার তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, একবার যেন তাহাদের গাটা ছমছম করিয়া উঠিল, সভয় দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিকে চাহিয়া আবার নিঃশব্দ পদনিক্ষেপে দলপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল; এখানে আসিয়া একজন বারান্দার থাম বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাহার কোমর হইতে একগাছি রজ্জুর সিঁড়ি নীচে নামাইয়া দিল—তাহা বাহিয়া আর একজন উপরে উঠিয়া আসিল, তখন তাহারা দুই জনে দুই গাছা রজ্জুর সিঁড়ি ফেলিয়া আর দুই জনকে উঠাইয়া লইল, আবার তখন চারিজনে চারিটা সিঁড়ি নীচে নামাইয়া দিল, এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকে উপরে উঠিয়া আসিল, দুই চারিজন মাত্র নীচেই দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে উঠা শেষ হইলে একজন তখন বারান্দার দক্ষিণ দিকের একটা ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, (এ সন্ধান ময়না বলিয়া দিয়াছিল।) ঘর অন্ধকার দেখিয়া সে চটপট আলো জ্বালিয়া ফেলিল, একে একে তখন সকলেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আলোক জ্বালিয়া লইয়া, (প্রত্যেকের সঙ্গেই আলো জ্বালিবার সরঞ্জাম ছিল) মুন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্তব্ধ রাত্রে, শূন্য ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আলোক-হস্ত মানুষের ছায়াগুলা নৃত্য করিতে করিতে অন্য ঘরে সরিয়া যাইতে লাগিল, খাঁ খাঁ কারী শূন্যভবন প্রেতযোনীর যেন বিহারক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল তবুও বাড়ীতে কাহাকেও পাওয়া গেল না, নিরাশ হইয়া প্রহরীর কুটীল বক্র-মুখরেখার খাঁজে খাঁজে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল, অবশেষে সে বুঝিল "আর কিছু নহে, মুন্না পলাইয়াছে। পলাইবে আর

কোথা ? সেই পাজি নচ্ছার কাফের ভোলানাথটা আপন ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়াছে"। প্রহরী মনে মনে বদ্ধ হুঙ্কার ছাড়িয়া ভাবিল "বেটা আমার হাত এড়াইবে তুমি" সে তখনি লোকজন সঙ্গে লম্ফে লম্ফে বাড়ীর সিঁড়ি পার হইয়া বাগানে নামিল, সেখান হইতে দ্রুত পদে প্রাচীরের পর পারে আসিয়া পড়িল। যাইবার সময় পাঁচ ছয় জন বলিষ্ঠ লোককে বাড়ীটা আরো খানিকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিবার জন্য সেখানে রাখিয়া গেল।

প্রাচীরের বাহিরে ঝোপের মধ্যে ময়না দু চার জন দস্যুর সহিত তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—প্রহরীরা বাগানে প্রবেশ করিবার সময় ইহাদের এই খানেই বসাইয়া রাখিয়া যায়। তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র ময়না মহা আগ্রহে তাহাদের দিকে চাহিল—কিন্তু প্রত্যেককে শূন্যহস্ত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল—বলিল—"কি-হইল কি" উত্তরে যখন শুনিল, 'মুন্না ওখানে নাই' তখন ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল "ওকি কথা! কখনো ঘরের বার হয় না আজ সে নাই। কথা দেখিতেছি ফাঁস হইয়াছে—কোন বেটার কাজ—তাহাকে আজ আস্ত চিবাইব—"

অন্ধকারে ময়নার ক্রোধান্ধ মুখভঙ্গী দেখা গেল না, কিন্তু তাহার সেই বিকৃত গলার প্রত্যেক চিবান চাপাচাপা কথা নিস্তব্ধ ঝোপের মধ্যে যেন পিশাচী তালে নৃত্য করিয়া উঠিল। আলি হাড়ে হাড়ে কাঁপিয়া উঠিল। প্রহরীও তখন দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল—"যা করিক তাহা মনেই আছে, নখে করিয়া তাহাকে চিড়িব—কিন্তু এখন—" আলি তাহার সমস্ত শরীরে সত্যই নখ ও দাঁতের খরধার অনুভব করিতে লাগিল, সে আর পারিল না,—একটা গাছের ডাল জোরে ধরিয়া বলিল—"আল্লার কিরে —আমি এ কথা কিছুই বলিনি—"

আলি বেচারী আর কখনো সে এরূপ কাজ করিতে আসে নাই—চিরকাল সে খাটিয়া খাইয়াছে, এ কাজে তাহার এই সবে হাতে খড়ি—কি করিলে কি হয় সে কিছুই জানে না, সুতরাং ভয়বিহ্বল হইয়া যেই এই কথা বলিয়া ফেলিল—অমনি প্রহরী বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল "নেমকহারাম তুইই বলেছিস ?"

আলি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল—বলিল —"আল্লার কিরে—আমি বলিনি—আমার মা বলেছে—" ময়না দাঁতে দাঁতে চিবাইয়া বলিল "বটে বেটা তোমার মা বলেছে! সে কোথা বল—নইলে এইখানে তোকে জবাই করিয়া যাইব" সে ভয়-কম্পিতস্বরে বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও সব বলিতেছি হুজুর—" প্রহরী হাত ছাড়িয়া দিল—সে বলিল "দোহাই, আমার দোষ নাই, মা তাহাকে বাড়ী নিয়া গিয়াছে—"

তখন তাহাকে শাস্তি দিবার সময় নয়, তাহা হইলে সময় বহিয়া যায়—শাস্তিটা ভবিষ্যতের জন্য মজুদ রাখিয়া প্রহরী তাহাকে বলিল "চল তবে সেইখানে চল—" মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাহারা দ্রুতপদে বুড়ীর বাড়ীর দিকে চলিল।

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বুড়ি চলিয়া গেলে ভোলানাথ গৃহিনীকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। গৃহিনী মুন্নাকে সে সব কথা বলিতে অন্তঃপুর গমন করিলেন, ভোলানাথ চুপ করিয়া একাকী বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া রহিলেন, তিনি অকুল পাথার ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। আগে হইলে হয়ত এরূপ কষ্টের অবস্থায় তানপুরাটাকে ধরিয়া বিলক্ষণ একবার নাড়াচাড়া দিয়া লইয়া একটু ঠাণ্ডা হইতেন, একটা কিছু উপায় আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু সে দিন আর নাই, মসীন গিয়া অবধি তাঁহার এ অভ্যাসটা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, সেই অবধি তানপূরার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক একরকম উঠিয়া গিয়াছে। মসীন যাইবার পর এক দিন ভোলানাথ তানপূরা বাজাইতে গিয়া চোখের জল ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন এইরূপ একটা গুজব কেমন করিয়া গৃহিনীর কাণে যায়—সেই দিন হইতে মসীনের বাটীর তানপূরা আর তাঁহার নিজের তানপূরা দু দুইটা তানপূরা যে কোথায় লুকাইয়া গেল—কোনটাই আর ভোলানাথের চ’খে পড়ে না। অভ্যাস বশতঃ এক একবার যখন তাঁহার হাতটা ও মনটা তানপূরার জন্য বড়ই নিসপিশ করিয়া উঠে, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে কখনো কখনো মসীনের মজলিস ঘরে আসিয়া দাঁড়ান, চারি দিকে একবার চাহিয়া দেখেন, যেখানে মসীন আসিয়া বসিতেন, যেখানে ভোলানাথ বসিয়া গান বাজনা করিতেন, গানবাদ্য হইয়ে গেলে বাড়ী যাইবার সময় ভোলানাথ যেখানে তানপূরাটাকে রাখিয়া যাইতেন—সব দিক একবার চাহিয়া দেখেন, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। এইখানেই তানপূরা খোঁজা তাঁহার শেষ হয়।

মসীন গিয়া অবধিইত ভোলানাথ মুষড়িয়া পড়িয়াছেন, তাহার উপর আজ আবার এই দারুণ বিপদ-আশঙ্কা। ভোলানাথ কষ্টে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল “অসহায় নির্দ্দোষীর একি এ শাস্ত? দেবি মহামায়া? চিরকাল তোর করুণার উপর এক মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, চিরকাল জানি তুই মা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, সে বিশ্বাস কি তুই আজ ভাঙ্গাইবি মা? তোর অনাথ সন্তানের পানে মুখ তুলে চাহিবিনে মা”? ভোলানাথ করযোড়ে কম্পিতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

“দয়াময়ী নামে তোর কলঙ্ক দিসনে শ্যামা
নিরীহ নির্দ্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা,
অত্যাচারের পাষাণ পায়, দুর্ব্বলে প্রাণ হারায়
এ শঙ্কটে কেবা তারে, দয়াময়ীর দয়া বিনা।
চাগো মা করুণাময়ী নয়ন তুলে বারেক চামা”

গাহিতে গাহিতে বেলা ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার মনের অন্ধকারে—চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িল, তিনি সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া কেবলি গাহিতে লাগিলেন, “চাগোমা করুণাময়ী নয়ন তুলে

বারেক চামা!" চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে-লাগিল, তিনি গাহিতে লাগিলেন—
"নিরীহ নির্দ্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চামা।"

গৃহিনী কি কথা বলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি গান শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন,—যাহা বলিতে আসিয়া ছিলেন—ভুলিয়া গেলেন, সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহারও দুই চক্ষের জল রহিল না। খানিকক্ষণ পরে নয়নের জল সম্বরণ করিয়া গৃহিনী আস্তে আস্তে বলিলেন—"বিবিজি যে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন," ভোলানাথ তখন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিনী বলিলেন তাঁহাকে তুমি বুড়ির বাড়ী লইয়া যাও—আমি ও মতি আমাদের বাড়ী চলিয়া যাই।"

* * * *

বুড়ির বাড়ী মুন্নাকে লুকাইয়া রাখিয়াও ভোলানাথের উৎকণ্ঠা দূর হইল না, কে জানে তাঁর কেমন মনে হইতে লাগিল—"যদি দস্যুরা মুন্নাকে বাড়ীতে না পাইয়া আবার অন্য জায়গায় খুঁজিতে যায়,—আর যদিই বা তখন তাহারা কোন প্রকারে বুড়ির বাড়ী আসিয়া পড়ে? এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার একটা উপায় মনে হইল। তিনি মুন্নাকে বুড়ীর বাড়ী রাখিয়া আবার মসীনের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বাগানে একটি ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন,—ভাবিলেন "এখানে বসিয়া, দস্যুরা কখন আসিবে—যাইবে সব তিনি দেখিতে পাইবেন, সুতরাং তাহাদিগকে এ বাড়ী খুঁজিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর বাড়ী গিয়া মুন্নাকে লইয়া আসিতে পারিবেন—তাহা হইলে বুড়ীর বাড়ী হইতে মুন্নাকে লইয়া যাইবার ভয়ও আর রহিল না,—তার পর রাতটা এক রকমে কাটাইতে পারিলে সকলে মিলিয়া এখানকার পায়ে নমস্কার করিয়া, অন্যত্রে চলিয়া যাইবেন।

রাত্র গভীর হইলে দস্যুরা বাগানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার চোখের উপর দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে রক্ত রাশি তখন বেগে বহিয়া উঠিল, তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার চক্ষুমুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ পরে তাহাদিগকে যখন বাগান পার হইয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেন—তখন উত্তেজিত শিরা রাশি শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি সবলে একটা গভীর রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া—দৃঢ়ভাবে সেইখানে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আরো কিছুক্ষণ গেল—যখন আর কাহারো সাড়া শব্দ দেখিলেন না,—যখন ভাবিলেন সকলে চলিয়া গেছে—তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝোপের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কিছু দূর না যাইতেই দুই চারি জন লোকের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সকলেই এক সঙ্গে চাপাস্বরে বলিয়া উঠিল—"কোন হ্যায়রে—পাকড় লেরে—পাকড়লে"—বলিতে বলিতে তাঁহাকে সকলে ঘেরিয়া ফেলিল, কিন্তু যখন দেখিল—তিনি পুরুষ মানুষ, তখন হতাশ হইয়া তাঁহার পিঠে দুই চারিটা গুঁতা বসাইয়া বলিল—"ঔরৎকে কোথায় রেখে-

ছিস?” হঠাৎ বন্দী হইয়া ভোলানাথ প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তাহার পর বলিলেন—“কি করেছি তাদের বাবা। আমাকে কেন”? তাহারা বলিল—“চুপ র কাফের, ঔরৎ কোথা”? ভোলানাথ বলিলেন, “রাম রাম ও কথা বলে,—তা তোমরা ত সব খুঁজিলে বাবা—আমি কি বলিব”—আবার দুচারিটা হাতের ধাক্কা তাঁহার পিঠে পড়িল—তিনি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন,—দস্যুরা তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নানা রূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিতে করিতে দড়ী দিয়া তাঁহার হাত বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ভোলানাথ বলিলেন, “বাঁধ কেন? কোথায় লইয়া যাবে চল যাইতেছি।” তাহারা বিকৃত স্বরে তাঁহাকে ভেংচাইয়া তাহার মুখের উপর একখানা কাপড় আঁটিয়া দিল। তাহার পর তাঁহার হাতের বাঁধা দড়ি ধরিয়া—খিড়কির দ্বার দিয়া হিড় হিড় করিয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

## ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিভৃত নিস্তব্ধ কুটীরের ক্ষীণ দীপালোক একটা বিষাদ পূর্ণ আশঙ্কার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—অজ্ঞাত অদৃশ্য একটা বিভীষিকা, আপনার নিঃশব্দগর্জ্জিত নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দে কুটীরের ঘোর স্তব্ধতাকে যেন স্তব্ধ করিয়া দিয়া মুন্নার চক্ষে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মুন্না দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছে; মুন্না দেখিতেছে, সেই করালমূর্ত্তির অন্ধকার-হস্তে তীক্ষ্ণ-শাণিত-কৃপাণ মুহুর্মুহু দুলিতেছে, মুহুর্মুহু ঝলসিত হইতেছে, মুহুর্মুহু মুন্নার বক্ষের প্রতি উন্মুখ হইয়া ঝুঁকিতেছে, বুঝি এই আসে আসে, বুঝি এই পড়ে পড়ে, বুঝি এই মুন্নার বুকে বিঁধে বিঁধে, মুন্না সেই ভীম তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ প্রতিক্ষণে যেন বক্ষে অনুভব করিতেছে। মুন্নার চক্ষে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত বহিতেছে না, মুন্না অজ্ঞান পাষাণমূর্ত্তির মত সেই অন্ধকার আশঙ্কার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহা অন্ধকার যাহা অদৃশ্য,—তাহার উপর বল প্রয়োগ চলে না, তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় না; তাই তাহা সর্ব্বগ্রাসী, অনন্ত—আর এই জন্যই তাহা এত ভয়ানক; শত সহস্র নিশ্চিৎ বিপদের মধ্যে যে হৃদয় অটল ভাবে চলিয়া যায়—সে হৃদয়ও এই অনির্দ্দেশ্য ভয়ের নিকট তাহ কম্পমান।

মুন্নার সেই পীড়িত ক্লিষ্ট অবসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া অচেতন দীপ শিখাও যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে যে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন তাহার হৃদয়ের মর্ম্মভেদী এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস।

বুড়ির মুখে কথা সরিতেছে না, এক একবার কথা কহিতে গিয়া সে কেবল হায় হায় করিয়া উঠিতেছে, সেই স্তব্ধ গৃহে সে হায় হায় এমন ভীষণভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে যে আপনার স্বরে চমকিয়া উঠিয়া বুড়ি আপনি নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে।

সহসা বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, দ্বারে আঘাত পড়িল—আলি ডাকিয়া বলিল—“মা দরজা খোল” বুড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল—সে ভাবিল আলি কাজ সা-

রিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। খুলিতে না খুলিতে হুড় মুড় করিয়া দস্যুদল গৃহে প্রবেশ করিল—মুন্না এতক্ষণ যে তরবারির অগ্রভাগ হৃদয়ে অনুভব করিতে ছিল, সবলে আমূল তাহা যেন তাহার বক্ষে কে বিঁধিয়া দিল, তাহাদের দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া ধীরে ধীরে ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর আসিয়া দস্যুরা দাঁড়াইল, ময়না প্রদীপটা উসকাইয়া দিয়া এক হাতে তাহা মুন্নার মুখের কাছে ধরিয়া,—আর এক হাতে তাহার মুখাবরণ খুলিয়া দিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ এই রে, তুলিয়া নে" কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না, দীপালোকে সেই নির্জীব দেবীমূর্ত্তি যখন স্পষ্ট রূপে দস্যুদের চক্ষে পড়িল, তখন সেই পাষণ্ড নির্দ্দয় হৃদয়েরাও বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ময়না আবার বলিল "আর দেরী কেন?" প্রহরী তখন কম্পিত পদে অগ্রসর হইল, কম্পিত হস্তে তাহাকে ভূমি হইতে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া দ্রুত পদ নিক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে গমন করিল।

---

# বোম্বাই রায়ত।

১২৮৫ সালের কয়েক সংখ্যক ভারতীতে প্রকাশিত 'বোম্বাই রায়ত' শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে,—তাহা প্রকাশিত হইবার অনতিকাল পরে কৃষি কষ্ট নিবারণী নূতন বিধি * বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ বিভাগে পুণা, সাতারা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৭৯ সালে এই আইন জারী হইয়া ১৮৮২ সালে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হয়। কৃষিদের ঋণ মোচন—বিবিধ উপায়ে তাহাদের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন এই আইনের উদ্দেশ্য। উল্লিখিত প্রবন্ধে রায়ত ও মহাজনের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়মপরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক বলিয়া সূচিত হয় বিচার্য্য আইনে তাহার কতকগুলি নিয়ম সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইবে। এই আইন সম্মত প্রধান প্রধান নিয়ম গুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

ঋণ সম্বন্ধীয় ছোট ছোট মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য গ্রামের পটেল কিম্বা অন্য যোগ্য ব্যক্তি গ্রাম্য মুন্সিফ রূপে নিযুক্ত হইতে পারে।

গ্রাম্য রেজিষ্ট্রারের নিকট কৃষিদের দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রি করা বিধেয় নতুবা তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

* Tthe dekhan agriculturist Relief act 1879.

Amended by acts 23 of 1881 and 22 of 1882.

আমরা পঞ্চায়ত সূত্রে মকদ্দমা নিষ্পত্তির সূচনা করিয়াছি—স্থল বিশেষে এই রূপ পঞ্চায়তে মকদ্দমা বিচারের ভার সমর্পণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিচারকের হস্তে অর্পিত এবং বাদী প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে তাহারা আপন আপন মধ্যস্থ নিয়োগে সক্ষম।

কিন্তু এই আইনের বিশেষ বিধান এই যে গবর্ণমেণ্টকে রায়ত মহাজনের মধ্যে কতকগুলি সন্ধিকর্ত্তা (Conciliators) নিযুক্ত করিতে হইবে। আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে অর্থীকে সন্ধিকর্ত্তার নিকট যাইতে হইবে। তিনি রায়ত মহাজনের বিবাদ আপসে মিটাইয়া দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন ও তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে অর্থীকে আদালতে যাইবার অনুমতি দিবেন, তাঁহার সর্টিফিকেট ভিন্ন কোন দাওয়া আর্জী গ্রাহ্য হইবে না।

রায়ত ঋণ শোধের টাকা মহাজনের কাছে আনিয়া দিলে মহাজন তাহাকে স্বতন্ত্র রসিদ অথবা পাসবহি মধ্যে রসিদ লিখিয়া দিতে ও প্রতিবর্ষে রায়তের হাতে তাহার দেনা পাওনার হিসাব দিতে বাধ্য।

আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারকের কর্ত্তব্য প্রতিবাদীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার জবানবন্দী লওয়া। দেনা পাওনার হিসাবে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করিয়া ঋণের আসল টাকা নিরূপণ করা ও জজের বিচারে যাহা ন্যায্য সুদ তাহাই ধরিয়া হিসাব ঠিক করিয়া দেনা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। সুদের উপর সুদ কিম্বা অতিরিক্ত অন্যায় সুদ চুক্তি সম্মত হইলেও ধরা হইবে না।

ডিক্রী দিবার অথবা জারী করিবার সময় দেয় টাকা উচিত মত কিস্তীবন্দী করিয়া দেওয়া সকল সময়েই কোর্টের সাধ্যায়ত্ত।

রায়তের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনার জন্য তাহা বিক্রী হইবার নহে।

দেনার ডিক্রীজারী জনিত কারাবাসের আদেশ নিষিদ্ধ। ডিক্রীজারীর দরুণ রায়ত গ্রেপ্তার না হইলেও, তাহার মাল-ক্রোকের হুকুম বাহির না হইলেও ৫০ টাকা ও ততোধিক ঋণে যে রায়ত ঋণগ্রস্ত সে ইচ্ছানুসারে ইন্সল্বেন্সির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।

করার নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বেও কোন বন্ধকদাতা-কৃষক বন্ধক ছাড়াইবার মকদ্দমা আনিতে সক্ষম। বন্ধক-কর্রার লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ঋণাদায় সম্বন্ধীয় তামাদির মেয়াদ ৩ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসর কাল বিস্তৃত।

এই আইন মহাজনের পক্ষে যেমন কঠোর, রায়তের তেমনি লাভ জনক। ইহার প্রভাবে অনেকানেক ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন রায়ত ঋণমুক্ত ও নিজ নিজ পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি মহাজনের গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মহাজন সম্বন্ধে যেমন রায়তের কল্যাণ সাধনে গবর্ণমেণ্ট তৎপর, তাঁহাদের নিজের বেলায়—নিজের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধ সেখানে কি তদ্রূপ মনোযোগী? গবর্ণমেণ্টই এ প্রদেশের জমীদার।—রায়ত সরকারকেই মা বাপ বলিয়া

জানে, সরকারের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন রায়তের দুর্দ্দশা সম্পূর্ণ ঘুচিবার নহে। রায়তেরা কত দূর করভারে প্রপীড়িত, তাহাদের ধার কর্জ্জের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব কার্য্য পরিণত করা কত দূর যুক্তিযুক্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর নিয়ম সকল শিথিল করা কতদূর প্রার্থনীয়, ৩০ বৎসর অন্তর যে রাজস্ব পরিবর্ত্তনের নিয়ম আছে তাহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করা সুসঙ্গত কি না, এই সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট যথাকর্ত্তব্য বিধান করুন পরিশেষে এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# রাজনৈতিক আলোচনা।

## ব্রহ্মরাজ্যের স্বাধীনতা লোপ।

বৃটিশসিংহের নিকট বর্ব্বর বর্ম্মা মেষ কতক্ষণ যুঝিতে পারে? তাহারা বিনা যুদ্ধে নিজ স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিল। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে ব্রহ্মরাজ থিব অত্যাচারী ও নরশোণিত লোলুপ; কিন্তু এখন আসল কথা সব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। থিবর একজন প্রধান মন্ত্রী, রাজ পরিবারের পরিজনবর্গের নিষ্ঠুররূপে প্রাণ সংহার করিয়াছিল। থিব নিজে সাক্ষীগোপালের ন্যয় রাজা ছিলেন। যুদ্ধের বিষয় থিব কিছুই জানিতেন না। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ মাণ্ডালায় আসিতেছে।

এখন ইংরেজ মহাপুরুষেরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। "মান রাখি কি কুল রাখি" ভাবিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়াছেন। কতকগুলা স্বার্থপর ইংরেজ রটাইতেছে যে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরেজ রাজ্য চাহিতেছে। একজন ব্রহ্মবাসী রাজনীতিজ্ঞ ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন যে উক্ত স্বার্থপর ইংরেজদিগের কথিত জনরব অমূলক। ব্রহ্মবাসীরা কথনই আপনাদের স্বাধীনতা হারাইতে চাহে না। ইংরেজগণ বিনা যুদ্ধে অক্লেশে স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য অধিকার করিলেন বটে; কিন্তু এখন দেশ শাসন করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ডাকাতিতে দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বম্বে গেজেট বলেন যে ব্রহ্ম রাজ্য রক্ষা করিতে যে খরচ হইবে তাহা বোধ হয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। ভয় কি কামধেনু ভারতবাসী আছে, সমস্ত ব্যয়ভার বিনা বিরক্তিতে বহন করিবে।

## কাশ্মীরের অধঃপতন নিকটস্থ।

পাইওনিয়র, সিভিল মিলিটারি গেজেট ও অন্যান্য ভারতদ্বেষী ইংরেজি সংবাদপত্রসম্পাদকগণ কাশ্মীরের নূতন মহারাজার বিরুদ্ধে তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। কাশ্মীরে রেসিডেণ্ট ছিল না কিন্তু এক্ষণে বিনা কারণে গবর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সম্পাদকগণ বলিতেছেন নূতন মহারাজা অযোগ্য এবং শাসনসংস্কার বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না, অতএব রাজাকে অপসৃত করা আবশ্যক! মহারাজা ভয় বিহ্বল হইয়া কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ বা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। যাহা হউক মহারাজার এখন বোধ হয় বিশেষ কোন ভয় নাই; কিন্তু যদি রুশেরা পুনর্ব্বার ভারতের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলে মহারাজা যে শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

## পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন।

কোন পক্ষ জয়ী হইল! ইহার উত্তর কি দিব তাহা ভাবিয়া আকুল। পার্ণেল দলের সাহায্য বিহীন হইলে রক্ষণশীল দলের পরাজয় হয়; কিন্তু পার্ণেলদল রক্ষণশীলদিগের সহিত মিলিত হইয়া উন্নতিশীলদিগকে পরাজয় করিয়াছে। এখন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পার্ণেলের তোষামদ ব্যতীত কোন দলের কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ টিন্‌ডেল্‌কে কোন কোন ব্যক্তি মহাসভার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। টিনডেল্ উক্ত অনুরোধ পত্রের জবাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই পাঠ করিয়া হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখা উচিত। টিন্‌ডেল্ বলেন যে পার্ণেল-হস্তে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা রহিয়াছে। যদি আইরিস্‌দিগকে সায়ত্ব শাসন ও পৃথক পার্লিয়ামেণ্ট না দেও তাহা হইলে ইংলণ্ডের কোন মঙ্গলজনক কার্য্য মন্ত্রীদিগের দ্বারা সাধিত হওয়া দুষ্কর হইবে। টিন্‌ডেল বলেন পার্ণেল লোকটা কে যে এত ক্ষমতাবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে? পার্ণেল একজন সামান্য লোক,—মধ্যবিৎ বক্তাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে,—বিদ্যাও এমন কিছু বেসি নাই, কিন্তু পার্ণেলের যাহা আছে তাহা পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্যের নাই। যদি কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে চাহ আগে অধ্যবসায় শিক্ষা কর—স্বার্থ জলাঞ্জলি দেও এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতনে প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে মনোনিবেশ কর। এই সকল গুণ থাকাতে পার্ণেল এত সফল-সিদ্ধ হইয়াছেন। পার্ণেল তোষামোদ ভক্ত নন,—আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন করিবেন—স্বতন্ত্র পালিয়ামেণ্ট দ্বারা আইরিস্‌গণ শাসিত হইবে এই তাঁহার লক্ষ্য;—যত দিন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত পার্ণেলের আর কোন কার্য্য নাই। যে দল পার্ণেলের মতানুযায়িক চলিবে পার্ণেল সেই দলভুক্ত হইবেন—তিনি নিজে উদার নৈতিক, কিন্তু ইহাদিগের নিকট আশানুযায়িক বচন পান নাই বলিয়া এবারে রক্ষণশীলদিগের দল পুষ্ট করিয়া উদারনৈতিকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে দুই দলের লোকেই পার্ণেলের তোষামোদ আরম্ভ করিয়াছে! যতদিন আমাদের মৌখিক দেশহিতৈষীরা পার্ণেলের অনুকরণ করিয়া

তাঁহার ন্যায় একমনা হইয়া কার্য্য না করিবেন ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

## নেপাল রাজ্যে গোলযোগ।

মন্ত্রীবর রণবীর সিংহ, জগৎ জং ও জঙ্গবাহাদুরের অন্যান্য পরিবারবর্গ সম্সের দল কর্তৃক অন্যায়রূপে আক্রান্ত ও হত হইয়াছেন। নেপালে এরূপ ব্যাপার নূতন নহে। আরও তিনবার এইরূপ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। জঙ্গ বাহাদুর নিজে এই প্রকার হত্যাকাণ্ড করিয়া ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেপালের রাজা অনেক দিন হইতে কেবল মাত্র সাক্ষী গোপাল হইয়া আছেন। মন্ত্রী যাহা করেন তাহাই হয়। নেপালের সৈন্যাধ্যক্ষ জিৎজঙ্গ এই হত্যা কাণ্ডের সময় ব্রিটিশ অধিকারে থাকাতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তিনি এখন লর্ড-ডফারিন্‌কে বলিতেছেন যে যদি তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পোষিত হইয়া নেপাল রাজ্যে আপন ক্ষমতা পুনর্লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে নেপাল রাজ্যের শাসনে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন। হত জগৎ জঙ্গ যখন নেপাল রাজ্য হইতে পালাইয়া আসেন তখন কোন কোন ইংরাজ মহাপুরুষ তাঁহার সাহায্যার্থে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। জগৎ জঙ্গ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ক্ষত্রিয়ের সন্তান; যদিও দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারীরা তাঁহার ভ্রাতা ও কুটুম্ব। যদি কখন ঈশ্বর দিন দেন তাহা হইলে তাঁহার অবমাননার প্রতিশোধ করিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সন্তান হইয়া কখনই অন্যের সাহায্যে নিজ ভ্রাতৃবর্গের উচ্ছেদ সাধনে তিনি প্রস্তুত নহেন। আমরাও সেনাপতি জিৎ জঙ্গকে, জগৎজঙ্গের কথাগুলি স্মরণ করাইয়া বলি যে নিজ স্বার্থলাভের জন্য মাতৃভূমির উচ্ছেদ সাধনা করিও না। ইংরেজের সাহায্য লইলে তোমার দেশের দশা অন্যান্য করদ রাজগণের ন্যায় হইবে।

## বলগেরিয়া ও সারভিয়ার যুদ্ধ।

এই অন্যায় যুদ্ধ আপাতত স্থগিদ রহিল। সরভিয়ার রাজা মিলান্ অতিশয় কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া যেমন সভ্য জাতি মাত্রেরই ঘৃণার ভাজন হইয়াছেন, বলগেরিয়ার রাজা আলেকজণ্ডর আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়া তেমনি সকলের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে অষ্ট্রিয়ার উত্তেজনায় মিলান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! ইউরোপের মধ্যে এখন এমনি ব্যাপার হইয়াছে যে সহজে কোন খ্যাতিনামা জাতি ইয়ুরোপের অন্য কোন খ্যাতিনামা জাতির সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, জর্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, ও ইংলণ্ড পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করে কিন্তু সামান্য বিষয়ে অবমানিত হইলেও কেহই লেজ নাড়েন না। যেমন সামান্য দোষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ড বর্ব্বরবর্ম্মাকে হস্তগত করিল, তেমনটি জর্ম্মানির সঙ্গে কখনই করিতে পারিল না। ক্যারো-

লিন্ দীপপুঞ্জ লইয়া ইংরাজগণ আংগরা পিকুউনাতে কি পর্য্যন্ত না লাঞ্ছিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডের মুখে তাহাতে একটিও কথা সরিল না।

## দিল্লীর কৃত্রিম যুদ্ধ।

ইউরোপীয় রাজগণ আপন আপন পরাক্রম দেখাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ দেখাইয়া অন্যান্য পরাক্রমশালী প্রতিবেশীদিগের নিকট মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। এরূপ কাল্পনিক যুদ্ধে সৈনিক দলের যে কতকটা উপকার হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে জাতির সৈন্যগণকে ক্রমাগত নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে এব্যাপারটা কতকটা উত্তেজক ও শিক্ষাজনক বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার পার্কস্ বলেন যে অনেক সময়ে সৈন্যগণ বিনা পীড়ায় মারা যায়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে সৈন্যগণকে কিছু করিতে হয় না বলিয়া আলস্য বশতঃ. তাহারা অকালে মরিয়া যায়। আমাদিগের গবর্ণমেন্টের আমরা আলস্য-দোষ দিতে পারিনা, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে, জুলুলাণ্ড, আফগানিস্থান, মিসর ও বর্ম্মা যুদ্ধে ইংরেজ সেনাগণ বিলক্ষণ যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখাইয়া যথার্থ যোদ্ধার ন্যায় পরাজিত ও জয়ী হইয়াছে। এত যুদ্ধের পরও আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধেচ্ছা মিটিতেছেনা! আবার একটা কৃত্রিম যুদ্ধ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত পরাক্রমশালী ইউরোপায় রাজাদিগের প্রতিনিধি দিল্লীর এই যুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মান সম্ভ্রম বজায় রহিল, নামও বাহির হইল, সৈন্য সেনাপতিগণও একটু ভাল রকমের হলিডে ভোগ করিল—কিন্তু খরচটা কোথা হইতে আসিল? এদিকে বর্ম্মা যুদ্ধের ব্যয়, ওদিকে আফ্গান্ সীমা নির্ণয়ের খরচ—তাহার উপর এই কৃত্রিম যুদ্ধের অন্যায় খরচ,—সুতরাং নূতন ট্যাক্সের সৃষ্টির আবশ্যক হইল।

## ইনকম্‌টাক্‌স।

সর্ অকলাণ্ড কলভিন্ ও লর্ড ডফরিন্ তাঁহাদিগের বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন তাঁহা আমরা অনুমোদন করি বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিগুলি অন্যায় যুক্তি মধ্যে পরিগণিত করি। সত্য বটে শিক্ষিত দেশায় ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ যাঁহারা বৃটিশ শাসনের সুফল লাভ করিতেছেন তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর প্রদান করেন না —সত্য বটে গরিব দুঃখীদগকে করভার বহন করিতে হইতেছে,—ইহাও সত্য যে গরিব ভারতবাসী করে করে এত ডুবিয়া পড়িয়াছে যে ইহার উপর আর তিলার্দ্ধ করবৃদ্ধি হইলে দুঃখী প্রজারা ধনে প্রাণে মারা যাইবে। আমরা ইনকম্‌টাক্স দিতে নারাজ নহি। আমাদের মুখপাত্র বঙ্গের জাতীয় সমিতিতে (National congress held at Bombay) এ কথার উত্থাপন হওয়াতে সকলেই ইনকম্‌টাক্স প্রদানে সম্মত হইয়াছে। যদি ইহা জানিতাম যে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর ভার বহন করিয়া আমাদের সঙ্গতিহীন

দুঃখী ভ্রাতাদিগের দুঃখের লাঘব করিতেছে তাহা হইলে আমাদের হৃদয় কতক পরিমাণে শান্ত হইত। আমরা লর্ড ডফেরিনের ইন্‌কম্‌টাক্সকে অন্যায় কর বিবেচনা করিতেছি; কেন না অন্যায় বর্ম্মাযুদ্ধের ব্যয়, অনাবশ্যকীয় সৈন্য বৃদ্ধির ব্যয়, দিল্লীর অপ্রয়োজনীয় কাল্পনিক যুদ্ধের ব্যয় ও আফগানের সীমা নির্ণয় ব্যয় যদি আমাদের বহন করিতে না হইত তাহা হইলে ইন্‌কম্‌টাক্স ধার্য্যের আদৌ আবশ্যক হইত না। লর্ড ডফেরিন্‌কে আমরা কিরূপে সুদক্ষ ও সদ্বিবেচক শাসনকর্ত্তা বলিব? ভাণ্ডারে ধনের অভাব ও প্রজারা অন্নক্লিষ্ট, এমত অবস্থায় কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন বিবেচক শাসন কর্ত্তার কার্য্য নহে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? ইংরেজ রাজপুরুষ ও সাধারণগণ সাপের ছুঁচো গেলার ন্যায় অবস্থায় পড়িয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে লর্ড ডফেরিন্‌কে এত প্রশংসা করিয়াছেন যে এখন ইন্‌কম্‌টাক্স মনোমত না হইলেও তথাস্তু করিতেছেন। ভারতবন্ধু লর্ড রিপন এই কর প্রচলিত করিলে এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানেরা বোধ করি তাঁহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিত।

সর্ অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ ও লর্ড ডফেরিন্ বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে লর্ড রিপনের শাসন কালে রাজভাণ্ডারে খরচ বাদে প্রায় প্রতি বৎসরে ৭০ লক্ষ টাকা মজুদ থাকিত। লর্ড রিপণ তুলার কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং লবণের শুল্ক হ্রাস করিয়া দীনদুঃখীদিগের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। একটি শুল্ক উঠাইয়া ও অন্যটি হ্রাস করিয়াও সত্তর লক্ষ টাকা তহবিলে উদ্বর্ত্ত থাকিত। লর্ড ডফেরিনের আমলে উদ্বর্ত্ত থাকা চুলায় যাউক, নূতন টাক্সের সৃষ্টি হইল। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক বলেন যে যত দিন গবর্ণর জেনেরেল সিম্‌লা শিখরে বাস করিবেন তত দিন অবধি রাজ্যের মঙ্গল নাই। সেখানে বিশেষ কার্য্য না থাকাতে শাসনকর্ত্তাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে। আমরাও তাইাই বলি যে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া খরচ কর—নূতন টাক্সের সৃষ্টি করিয়া আর হাড়জ্বালাতন করিও না। ব্যয় সঙ্কোচের কথা তুলিতে ভয় হয়। যখনই ব্যয় সংকোচ করা হয়, কতকগুলি দপ্তুরি ও গরিব কেরানিদের কর্ম্মচ্যুত করা হয়। ইহারই নাম retrenchment। কেন প্রতি বৎসর এত সিভিলিয়ান আম্‌দানি হইতেছে? কেন এত ব্যয়সাপেক্ষ জজ মেজিষ্টর ও কর্ম্মচারী রাখা হইতেছে? সৈনিক ব্যয় কেন হ্রাস করা হয় না? মরার উপর খাঁড়ার ঘা! Sir Alfred Lyall এর ন্যায় গবর্ণর হইলে সিভিলিয়ান ভায়াদের বড় সুবিধা। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জুনিয়র সিভিলয়গণের শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি হয় না বলিয়া বাৎসরিক ২৫ হাজার টাকা ৩০ জন সিভিলিয়ানদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়!! হায় আমরা বাস্তবিকই সিভিলিয়ানদিগের খেলার সামগ্রী ও আমাদিগের টাকা তাঁহাদিগের নিকট লোষ্ট্রবৎ পদার্থ!!

## দেশী সভা।

এ বৎসর আমরা বাস্তবিক নির্জীবতা

একটু ত্যাগ করিয়া কতকটা জাতীয় জীবনের পরিচয় দিয়াছি। এ বৎসর ক্রিসমাসের সময় ভারতবাসীরা রাজনৈতিক ক্রিসমস করিয়াছেন। বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও আজ্‌মীরে এবার কতকগুলি কনফারেন্স বা জাতীয়মিলন হইয়াছিল। বম্বের মিলন কিছু উচ্চদরের হইয়াছে। কলিকাতারও দৃশ্য দেখিয়া আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে জানিতাম জলে ও তেলে মিশ খায় না কিন্তু এখন দেখিতেছি সেটি ভ্রম মাত্র। তেলকে একটু ঠাণ্ডা করিয়া লইলে তেলে জলে বেশ্ মিশ খায়। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ানএসোসিয়ানের মিল্ হওয়াতে আমাদের তেলে ও জলের মিল সম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছে। যদি দিন অবধি আমরা একত্র হইয়া কর্ম্ম না করিব ততদিন উন্নতির আশা নাই। মতের যতই অনৈক্য থাকুক না কেন যখন দেশোপকার আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তখন অন্য দেশ হিতৈষীর সহিত মিলিয়া কেন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না? মান্দ্রাজে মহাজন সভার কন্‌ফারেনস্‌ও বেশ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। আজমীরে আর্য্যসমাজের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে এবং প্রয়াগে হিন্দু সমাজের কন্‌ফারেন্স হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

# নক্সা।*

(দৃশ্য বাসর গৃহ, মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর; নিকটে যুবতীগণ আসীন।

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কি গো অমন ধারা চুপ করে বসে রইলে কেন? সেই অবধি বকাবকি করে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।"

২ যু। "রা আর থাকবে কি ক'রে লো? ফুলির আমাদের যে চাঁদ পানা সোনার মুখ, তাই দেখেই অবাক হয়ে গেছে।"

বর। "কি বল্লেন, চাঁদপারা সোনার মুখ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত

---

* শিক্ষিত মহাশয় গতবারের ভারতীর নক্‌সায় আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কাছে আমরা বিশেষ ঋণী। বেশ জানি সে ঋণ পরিশোধ করা আমাদের মত লোকের সাধ্য নহে, সুতরাং তাহা আমার উদ্দেশ্যেরও বাহিরে। তবে যে আজ এই যৎকিঞ্চিৎ উপহারটুকু শিক্ষিত মহাশয়কে অর্পণ করিতে আসিয়াছি সে কেবল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশ করিতে মাত্র। ভরসা করি সামান্য বলিয়া এ উপহার তিনি তাচ্ছিল্য করিবেন না। * শিক্ষিতা।

* আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের নক্‌সা বাহির হইবার পরই তাহার উত্তর স্বরূপ এই নকসাটি পাইয়াছি—কিন্তু স্থানাভাব বশত গত দুই মাস আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই। ভাং সং।

রুচি বিরুদ্ধ তুলনা করলেন? চাঁদ পানা সোনার মুখত কই কোথাও পড়িনি। (চিন্তিত ভাবে) বায়রণ, স্কট, সেলি, টেনিসন, কই কোথাও Moon-face আছে বলেত মনে প-ড়ছে না। আর সোনার মুখ—Why that's absurd! Golden face—সোনার মুখ হয় না—তবে Golden hair—সোনার চুল হয়।"

তৃ যু। "ওমা কেমন কানা বর গা! মেয়ের অমন সোনাপারা মুখ তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচকুচে চুল তাও বলে সোনারঙের—এ কি কথা গা? এতরূপও কি পসন্দ হোলনা না কি?"

প্র যু। "না লো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজি পসন্দ, বর সোনা মুখ চায় না, সোনাচুল চায়।"

৪র্থ যু। "ওমা সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা তবে কি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি? ফুলির আমাদের কাল চুল বলে কি মনে ধরলো না?"

বর। (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া! যার সঙ্গে এক মিনিট বসে কোর্টসিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেছে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এসব নিয়ম বড় ভাল।"

প্র যু। কেন ইংরাজদের কোর্টসিপের মেয়েতেও ত ঝগড়া ঝাটি, ছাড়া ছাড়ির ভাব দেখিনে"। *

বর। "সে কি জানেন,—সে ভালর মন্দ। যাক্ আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন—তার উত্তর দিই,—আপনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন, যে আমি চুপ করে আছি কেন? তার উত্তর এই যে, পরশু দিন আমার একটা Engagement আছে, Town Hall এ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেকচার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলুম।"

প্র যু! "তা কি লেকচারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।"

বর। "তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব? দেখুন দেখি—১০ বৎসরের বা-লিকা তার আজ বিবাহ হোল, কাল সে বিধবা হোল, কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে মুখে এক ফোঁটা জল ঠেকাতে পারবে না, কোন দিন সাধ করে একখানা রংকরা কাপড় পরতে পারবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের loveএ পড়েগেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব—তাহলে তাদের দুজনের মিলনের আর কোনই সম্ভাবনা নেই। দেখুন দিকি এই শেষ ব্যাপারটী কতদূর শোচনীয়। আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার উ-ইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিখে যাব যে যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন, তা না হলে এক কানাকড়িও পা-বেন না।"

প্র। "তা যদি বল তবে তোমার স্ত্রী দ্বোরে দ্বোরে বরঞ্চ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে।"

তৃ। নে ভাই নে এখন তোদের প-ণ্ডিতে পণ্ডিতে ব্যাখ্যা রাখ, এখন বর একটী গান বল ত ভাই—।

কন্যার মাতার প্রবেশ ও বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন।

---

২য় দৃশ্য।

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। "নাও ভাই বর এবার একটী গান শোনাও।"

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আহার করে এলুম এরই মধ্যে গান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

৪র্থ যু। "এ বর ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। মেজদিদি তোরা সবাই মিলে ছুটো ঠাট্টা তামাসার কথা ক?"

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) "বলি একটা পান টান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে ছাই শিখ্‌লিনে।"

(তৃতীয়ার প্রস্থান।)

বর। "জীবনটা কি ঠাট্টা তামাসার? যে সারাদিন ঠাট্টা তামাসা করে কাটাতে হবে? যত দিন আমাদের দেশে—Serious scientific spirit"—

(তৃতীয়ার পান হস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া।)

তৃ। নাও কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে কথা কও।"

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ।)

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) "এই বুঝি ধরে ফেল্লে। (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।"

বর। (মুখ তুলিয়া) "এমন কিছু নয়,—এই আগেই যা বলছিলুম, বাঙ্গালীদের যত দিন discovery করবার spirit না হবে, ততদিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যে দিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকে আমার ঐ দিকে লক্ষ্য।"

প্র। "তা পানের ভিতর আর কি discovery করবে ওটা খেয়ে ফেলো।"

বর। (পান মুখে দিয়া) "কি সে কখন discovery করা যায় তার কি ঠিক আছে? তাইজন্যই ত যা কিছু হাতে পাই আমি পরীক্ষা করে দেখি। এই Dr Kock জলের ভিতর সেদিন কলেরা জার্ম আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি শুকনো জিনিসের মধ্যেও সে জার্ম আছে—তাহলে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরপের মাথা হেঁট হয়ে যায়।"

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হতেই ভারতটা উদ্ধার হ'য়ে গেল।"

বর। (পান লোস্তা বোধে—মুখ বিকৃত করিয়া) একি সত্যিই এতে জার্ম্ম টার্ম্ম কিছু আছে নাকি?—এমন ঠেকছে কেন?"

(বরের থুথু করিয়া পান নিক্ষেপ। যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য)।

বর। "আপনারা একটু চুপ করুন,

এ হাসির সময় নয়। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। এ কি হোল! চারি দিকে যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে বোঁ বোঁ করে উঠ্‌লো। ভগবান এ কি করিলে! মৃত্যুর জন্য আজ বিবাহ শয্যায় বসাইয়াছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদ মুখ—সোনার মুখ আর যে কখনো দেখিতে পাইব না,—জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা দেখিয়া চলিলাম—প্রাণেশ্বরি তুমি যে আজ বিধবা হইলে? এই শেষ দিনে একটি অনুরোধ করিয়া যাই, মাথা খাও আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রাখিও, প্রেয়সি ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করিবে—এই আশা হৃদয়ে লইয়া চলিলাম।"

প্র। (শশব্যস্তে) এ কি তোমার আবার একি হোল?"

দ্বি। "একি নাটক করে যে?

তৃ। "ওমা এমন বেরসিক বরওত কোথাই দেখিনি—পানে একটু নুন দিয়েছি, তাএত হেঙ্গাম।"

বর। "নুন দিয়েছেন। কখনই না—আমি জানি এ কলেরা জার্ম, আর আমিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এখন-মরিলাম বটে, কিন্তু আমার নাম চিরকালই পৃথিবীতে জাগিয়া থাকিবে।

দ্বি। "এ কি তোমার মতিচ্ছন্ন ধরলো যে—নুন নয়ত আবার কি?

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগতঃ) "তাইত নুনইত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটি করলে। কিন্তু আমি কি না মাটী হবার ছেলে—রোসো না—(প্রকাশ্যে) "ঠাট্টা! আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও যদি বিজ্ঞান জ্ঞান থাকত তাহ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন? কি হতে যে কখন কি হয় তা যাদের জ্ঞান নেই—"

১ম। "তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান ভান্‌তে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গাত গাইতে হবে তা কি জানি? না তুমি তোমার স্ত্রী বিধবা বিয়ে না করলে উইলে সে একটা কানা কড়িও পাবে না এই বলে লেক্‌চার ঝেড়ে শেষে পাছে আবার সে একাদশী না করে সেই ভয়ে কান্না জুড়ে দেবে তাই জানি?"

বর। "সেটা আমার দোষ না আপনাদের দোষ। সেই অবধি Science Philosophy বুঝিয়েও আপনাদের নীতি-বিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh! Byron how truly thou said,—'Philosophy and science I have essay'd but they avail not'! সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতিকার আর কি আছে?

১। "তা হলে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায় সেটা যেন মনে থাকে" (সকলের হাস্য)

তৃ। "না আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখেছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি—ও ফুলি দে তোর বরের গলায় একগাছা ফুলের মালা দিয়ে দে।"

দ্বি। "হ্যাঁ এত কান্নাকাটির পর মধুর

মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্—আমরা দেখি—”

বর। (স্বগত) আমাকে বড় মাটীটাই করেছে—এর শোধ এইবার তুলব। (প্রকাশ্যে) দেখুন—science না জানার কত দোষ, তা হলে আর আপনি এমন absurd কথাটা বলতে পারতেন না। একজন living being কি আর একজন living being এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে? প্রকৃত পক্ষে ও কথা matter এর molecules সম্বন্ধেই খাটে, কেন না cohesion matter এর একটা property; একজন ইংরাজ মেয়ে হলে কখনো এরূপ বলতেন না—what a pity—”

প্র। “কেন—ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরাজপুরুষেও ত কবিতায় এরূপ কথার ছড়াছড়ি করে গেছেন।”

বর। সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও আর বেশী দিন চলছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—অল্প দিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা টবিতা কিছু থাকবে না।

প্র। “তখন না হয় বলব না—”

বর। “উঁহু এখনও বলতে পারেন না ওতে অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ পড়ে। একটা গ্রহের যখন Centrifugal force কমে যায় তখন সূর্য্য Centripetal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষত আর একটা গ্রহ নয়—”

দ্বি। “কোথাকার হতভম্বা বর,—এ সব আবার কি বকে?

তৃ। “একবার সোজা না করে দিলে চল্লোনা দেখছি—”

প্র। “আমরা জানি—হাতের জোরে—পিঠের জোর কমিয়ে ফেলতে পারলেই মানুষ গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়—পরীক্ষা দেখবে—?”

(বরের পৃষ্ঠে চারিদিক হইতে মুষ্টি পতন)

বর। “একি ভয়ানক! দোহাই আপনাদের—এ সব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শন গুলো,—গুলো না হ'ক—অন্ততঃ কাণ্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এসব Nasty ব্যাপার হতে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায়—”

প্র। “বটে, তা কানটেপার দর্শন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব—”

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove! রক্ষা করুন—জানলে কোন হতভাগা বিয়ে করতে আসে। দোহাই তোমাদের—যা হবার হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কখনো করব না।

দ্বি। বল করবে না—?”

বর। “কক্ষনো না, জন্মে না, নেহাত গণ্ডমূর্খ না হলে সে বিয়ে করতে আসে—রাম রাম!

প্র। “তা বই কি, কিন্তু হ্যাদে গণ্ডমূর্খ, বিয়েটা একবার করলে যে আর ফেরে না—”

বর। “গণ্ডমূর্খ! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল!”

চতুর্থ। “না না গণ্ডমূর্খ না—পণ্ডিতমূর্খ। ও ফুলি তোর পণ্ডিতমূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্।”

(কনের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন—বিয়েটা করে জীবনের মধ্যে একটা মুর্খমি করে ফেলেছি তাই বলে আর বেশী করতে পারছিনে—"

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। "কেন মালাতে আবার কি দোষ হোল? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি?

বর। "কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বুঝাতে হবে? ফুল থেকে Carbonic acid বলে রাত্রে এক রকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ বিছে হতেও ভয়ানক। রাতে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।"

দ্বি। "সে আবার কি জিনিস?"

বর। "By heaven! সে এক রকম মন্দ বাতাস।"

তৃ। "মন্দ বাতাস কি—ভূত নাকি?"

বর। "তা ভূত বলতে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।"

প্র। "তা তোমাকে দেখছি আগে থাকতে পঞ্চভূতেই পেয়ে বসেছে—একভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন পরে ফেল।"

জা। (স্বগতঃ) সে কথা আর বলতে—এখন ভূতগুলো ছাড়াতে না পারলেত আর প্রাণ বাঁচে না। (প্রকাশ্যে) অনেকক্ষণ হতে যে আলোর সামনে বসে আছি, এতক্ষণ ভূতেভূতে শরীর জরজর করে ফেলেছে। এভূত অন্ধকারে থাকে না, আলোতেই এ ভূতের দৌরাত্ম্য। অনেক দিন Science primer এইরূপ একটা কথা পড়েছিলুম আজ স্বচক্ষে দেখলুম আলোকে ভূতের কিরূপ প্রাদুর্ভাব। আলোটা নিভিয়ে দিলেই এ-ভূত ছেড়ে যাবে। (উঠিয়া দীপ নির্ব্বাণ)

যুবতীগণ। (গোল করিয়া) "যা হউক এতক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে—পাশ দিয়েছে বটে।"

(হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন)।

---

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতরহস্য। প্রথম ভাগ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। ইহাও ভারতের এক খানি পুরাতত্ত্ব পুস্তক।

সোমযাগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, দেবযান, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুরুষমেধ যজ্ঞ, রাজাভিষেক, যুদ্ধরহস্য, যুদ্ধ ধর্ম্ম—নামে কয়েকটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে। ভারতী, আর্য্যদর্শন, পাক্ষিক সমালোচক ও নব্য ভারত, পত্রিকাতে—ঐ প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়—তাহাই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এখন 'ভারতরহস্যে' স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষ করিয়া প্রশংসা করা এখানে বাহুল্য মাত্র, লেখক বঙ্গসাহিত্য সমাজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ—সুপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহার লেখনীর আগায় ভারত সত্যই সোনার ভারত হইয়া উঠিতেছে। আমরা বলি যাঁহারা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান সমাজ ব্যবস্থা, যুদ্ধ প্রণালী—ইত্যাদি তত্ত্ব জানিতে চাহেন—তাঁহারা রামদাস বাবুর পুস্তকগুলি একে একে পাঠ করুন।

জীবনের সদ্ব্যবহার। শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় দ্বারা বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত।

নীলকমল বাবু গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়া-

ছেন, একজন চীন পণ্ডিত জনৈক ব্রহ্মর্ষি রচিত উক্ত গ্রন্থখানি তিব্বত হইতে স্বদেশে আনিয়া নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন, একজন ইংরাজ পরিব্রাজক আবার চীন ভাষা হইতে উহা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। জীবনের সদ্ব্যবহার সেই ইংরাজি পুস্তক খানির অনুবাদ। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। নীতি শিক্ষা দেওয়াই এই পুস্তক খানির উদ্দেশ্য। সচরাচর নীতি পুস্তক বলিতে রসকস হীন শুষ্ক কতকগুলা কথার যে সমষ্টি বুঝায়—এ তাহা নহে, সমস্ত উপদেশ গুলিই ইহার হৃদয়গ্রাহী।

এই পুস্তক থানি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া নীলকমল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। পুস্তকের ভাষাটি আর একটু সাদাসিদা বাঙ্গলা হইলে আরো ভাল হইত, যাহাহউক, ভরষা করি ইহা বিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীর বালকদিগের একথানি পাঠ্য পুস্তক হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। ফরিদপুরের সিভিল সার্জ্জন শ্রীধর্ম্মদাস বসু প্রণীত। স্বাস্থ্যের সহিত বায়ু জল, ভূমি-বাস্তু, বাসগৃহ, খাদ্য ও পরিধেয়ের সহিত কিরূপ যোগ, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উহাদের কিরূপ উপযোগী করিয়া লওয়া উচিত এই সকল বিষয় এই পুস্তক খানিতে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মদাস বাবু একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, তাঁহার এই সম্বন্ধীয় উপদেশে সাধারণে যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

সরল শিশুপালন ও শিশুচিকিৎসা। ডাক্তার শ্রী পুলীনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্ বি প্রণীত। পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে, এই পুস্তক একখানি ঘরে রাখিলে শিশুদের সামান্য সামান্য অসুখের নিজে নিজেই চিকিৎসা করা যায়।

তারা বিজয়। দিল্লি ও রাজবারা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

পুস্তকে প্রতিমার আকারটি গড়া হইয়াছে—কিন্তু রং ফুটাইবার বেলায় গোল হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণনাগুলি, ইহার গল্পটি যেমন হইয়াছে, চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। বিশেষ পুষ্পবতী ও বলভদ্র সিংহের ষড়যন্ত্র ও বিষপান 'মরলো আর ফুরালো' গোছ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দু প্রভা। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহা একটি সাদাসিদে গল্প, এ সম্বন্ধে বলিবার আমাদের বিশেষ কিছু নাই।

জীব তত্ত্ব। (সারমেয় তত্ত্ব)। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কুক্কুর সম্বন্ধীয় কতকগুলি তত্ত্ব—কুক্কুর মূল জাতি কি সঙ্কর জাতি, কতরকম কুকুর আছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির কুকুরের কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, কুকুরদিগের সন্তানোৎপাদন, তাহাদিগের রোগ এবং চিকিৎসা—প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া পুস্তকখানি রচিত, যাহাদের ঘরে কুকুর আছে তাঁহাদের বইখানি দেখা উচিত।

ভারত সীমান্তে রুশ। মধ্য আসিয়ায় ভারতের দিকে রুশের রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিক বিবরণ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুশ গণের বিবরণ ইহাতে আছে। অনেকগুলি ইংরাজি পুস্তক হইতে গ্রন্থকার সাহায্য লইয়া পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন—আজ কাল রুশিয়ার ব্যাপার আমাদের কিছু কিছু জানিয়া রাখা উচিত, পুস্তকখানি আমাদের কাজে লাগিবে। গ্রন্থকারের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় ভাগের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

# স্হদান সমর।

হৃদয়বান মানব-সমাজে জন্মভূমির তুল্য প্রিয় বস্তু আর কি আছে? উহার উৎকর্ষ ও গরিমার বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের দেশীয় একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা সুমধুর-কবিতাময় ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন,"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" ক্ষণজন্মা সুসন্তানগণের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম এতই প্রবল যে তাঁহারা তাহার বিনিময়ে সুর-লোক-বাঞ্ছিত অবিনশ্বর স্বর্গসুখও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সভ্যতার প্রারম্ভ কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কত অসংখ্য নরনারী স্বদেশ মায়ায় মুগ্ধ ও স্বজাতি প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিলে পুণ্য জন্মে। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বক্ষের উপর যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব ও মহাসমর সংঘটিত হইয়াছে তাহার মূলে জাজ্জ্বল্যমান স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম নিহিত। এই পবিত্র অনুরাগ ও পবিত্র প্রেমের নাম লইয়া মেহিধি ও তৎসহচরবর্গ ইতিপূর্ব্বে যে মহা ধর্ম্মযুদ্ধের পরিঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার অত্যাশ্চর্য্য মোহিনীশক্তি প্রভাবে স্হদানের সহস্র সহস্র নরনারী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা হরণোদ্যোগী শত্রুগণকে বিনাশ করিবার জন্য মহোৎসাহে মহোল্লাসে সুসজ্জিত হইয়া মেহিধীর পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। যে সকল মনুষ্য ইতিপূর্ব্বে একদিনও কোন যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করে নাই এক্ষণে তাহারাও যুদ্ধোপযোগী বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গভীর কোলাহলে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল! যে সকল যুবতী রমণী কঠোর-জাতীয় প্রথার অনুশাসনে পূর্ব্বে কখনও অপর পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে স্বস্ব মুখ মণ্ডলের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে নাই, যাহারা বিলাস ও শান্তির প্রিয় নিকেতন অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নিয়ত কেশ ও বেশ বিন্যাসে স্বস্ব দেহের চারু শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া গৃহমধ্যে প্রফুল্ল কুসুমবৎ শোভা পাইত, অথবা যাহারা সংসারিক কার্য্য ও আপন আপন শিশু সন্তান গণকে প্রতিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া অতুল তৃপ্তি লাভ করিত এরূপ শত শত রমণীর সুকোমল হৃদয়ও মহা উদ্দীপনা ও কঠোর প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ হইল; এই জাতীয়-অশান্তি ও বিষাদের দিনে তাহারা সকল সুখ-সাধ পরিত্যাগ করিয়া রণ-সাজে সজ্জিত হইল। তাহাদের সে চারুবেশ আর নাই—তাহাদের মনোলোভা কমকান্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে—সকলেই ভীষণ ছদ্মবেশে জন্মভূমির পবিত্র কার্য্য সাধিতে বদ্ধ পরিকর।

শত শত অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবক, এমন কি, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষীয় অনেক সুকুমার-মতি বালক—এখনও যাহাদের খেলাধূলার সময় অতীত হয় নাই—তাহারাও বীরবেশে সজ্জিত হইয়া কেহ বর্ষা, কেহ বন্দুক ও কেহ তরবারি হস্তে সমর-নিপুণ পরিণত বয়স্ক পুরুষগণের সহিত মিলিত হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, যাহারা ইতি-পূর্ব্বে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এক প্রাণে মিলিত হইয়া পরম-দেবতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক মহাবেগে পঙ্গ-পালের ন্যায় দলে দলে খার্তুম নগর অব-রোধ করিতে লাগিল। ধন্য স্বদেশানুরাগ! ধন্য স্বজাতিপ্রেম!! তোমাদের মোহময় আকর্ষণে আজি সুদানবাসীগণ জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কি এক কঠোরতম সাধনায় মাতোয়ারা হইয়াছে। তাহা-দের অবস্থা মনে হইলে পুণ্যভূমি ভার-তের রাজপুতানার কথা অন্তরে জাগিয়া উঠে—শত শত গৌরবশালিনী রাজপুত ললনা এবং বাদল ও পুত্তের ন্যায় অমিত তেজ, দুর্দ্দমনীয় বিক্রম ও অতুল রণ-কৌশল সম্পন্ন বীরবালকের বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একদিন তেজস্বিনী স্পার্টা ও গরবিনী রাজপুতানায় এইরূপ জাতীয় অভিনয়ের আয়োজন হই-য়াছিল। ইতিহাস পাঠকের নিকট এখন সেদিন স্বপ্নময় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যুগ-যুগান্তর উপস্থিত হইলেও তাহার অবিনশ্বর কমনীয় জ্যোতি প্রভাহীন ও পরিম্লান হইবে না।

খার্তুম নগর এই সময় হইতে দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল; তাহার সমস্ত পথঘাট বিদ্রোহী সেনায় পরিপূর্ণ ও বাজার বাণিজ্য বন্ধ হইল। দুর্গের বহির্দ্দেশ হইতে এক একবার সহস্র বন্দুক গভর্ণমেণ্ট ভবনের প্রতি রাশি রাশি গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর গর্ডন এখনও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীক, এখনও বিপুল উৎসাহে পরিপূর্ণ, এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির-সংকল্প, তিনি ৩১শে মার্চ্চ ইংলণ্ডের মহাসভায় এই ভাবে আর এক-খানি পত্র লিখিলেন;—

"আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে যে এই বিদ্রোহের যথার্থ অকিঞ্চিৎকর অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে আমার মনোভাব আপনা-দের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করি। ৫০০ সমরনিপুণ বদ্ধ-পরিকর সেনা ইহা অতি শীঘ্র দমন কবিতে পারে। আমাদের বর্ত্ত-মান দুর্ব্বলতার বিষয় যখন আমি চিন্তা করি এবং যখন ভাবি যে যদি সুদান এক-বার পরাজিত ও শত্রু-হস্তগত হয় তাহা হইলে সমস্ত মুসলমান রাজ্যে আমাদিগকে বিষম বিপদ ও একান্ত লাঞ্ছনা ভোগ ক রিতে হইবে, তখন আমি একবারে জ্ঞান হারা হই। বর্ত্তমান সময় এবং ইহার পর আর দুই মাসের জন্য আমরা এখানে কেরো নগরের ন্যায় নিরাপদ তদ্বিষয়ে আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপ-নারা যদি উপযুক্ত বেতন দিয়া ৩০০০ পদা-তিক ও ১০০০ অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন তাহা হইলে চারি-মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহ নিবারণ এবং মেহিধির দর্পচূর্ণ হইবে।"

ক্রমশঃ

শ্রী বিজয়লাল দত্ত।

# মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দিকস্থ সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে মহারাজা নন্দকুমারের ন্যায় ন্যায়, ধনী, মানী, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে ইংরাজেরা সামান্য অপরাধীর ন্যায় ফাঁসী দিতে কখনই সক্ষম হইবে না। কেবল তাঁহাকে ভয় দেখাইবার ও জব্দ করিবার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে। বস্তুত তাহারা এ ভ্রান্তবিশ্বাসে প্রতারিত হইয়াছিল। যখন তাহারা দেখিল, যে সেরিফ্ সাহেব ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার (নন্দকুমারের) হস্ত বাঁধিতে অনুমতি দিলেন, তখন তাহাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে, কোম্পানীর জজদিগকে, ও গবর্ণরকে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল, অবশিষ্ট যাহারা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য সাহসে ভর করিয়া রহিল ফাঁস পড়া দেখিবামাত্রই তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে কোলাহল করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। হিন্দুরা উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইয়া স্নান করিয়া উঠিলেন, কেহই আর ফিরিয়া চাহিতে সাহস করে না। লোকের ছুটাছুটী, হাহুতাশ শব্দ, প্রচণ্ড কোলাহল, অস্ফুট ক্রন্দন রোল, কঠিন অভিশম্পাৎ বাক্য একত্র মিশ্রিত হইয়া সেই বধ্য ভূমিকে ভয়ানক করিয়া তুলিল (১)! প্রাচীন লোকদের মুখে গল্প শুনিয়াছি, যে সেই দিন সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ নদীপার হইয়া বহু দিনের জন্য কলিকাতায় আসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সকলেরই চক্ষে তখন ইংরাজ সমাজ, ইংরাজরাজ্য, ইংরাজশাসন, ঘৃণাস্কর হইয়া উঠিল। নগরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে, দেবালয়ে, তীর্থস্থানে সর্ব্বত্রই এই কথা; বস্তুত এই ব্যাপার লইয়া তখন বাঙ্গলায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি তদানীন্তন মোগল সম্রাটও এই সম্বাদে সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। আর কলিকাতার কথা কি বলিব—দিনের পর দিন গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, পক্ষের পর পক্ষ অতীত হইল, মাসের পর মাস কাটিয়া

১ "They (the multitude) could not believe that it was really intended to put the Rajah to death. But when they saw him tied up, and the scaffold drop from under him, they set up an universal yell; and with the most piercing cries of horror and dismay they took themselves to flight, running many of them as far as the Ganges, and plunging into the water, as if to hide themselves from tyranny as they had witnessed, or to wash away the pollution contracted from viewing such a spectacle."

Vide Sir Elliot Gilbert's speech in the Parliament.

গেল, তবুও কলিকাতায় এই বিষয়ে আন্দোলন চলিতে লাগিল। তৎকালীন ইংরাজ সমাজের মধ্যেও অনেক হৃদয়বান ইংরাজ এই ব্যাপারে সাতিশয় ব্যথিত ও বিরক্ত হইলেন। ইংরাজী থিয়েটারেও এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া জজেদের ও হেষ্টিংসকে গালিদিয়া অভিনয় চলিতে লাগিল। ২

স্বনাম খ্যাত মহারাজ নন্দকুমারের বিভীষিকাময়, জীবন নাটকের শোচনীয় শেষ দুঃখ, যথাসাধ্য আমরা পাঠকগণের সমক্ষে ধরিলাম। সহৃদয় পক্ষপাতশূন্য, সরিফ সাহেব নিজ দৈনন্দিন ঘটনা পুস্তকে নন্দকুমারের এই শোচনীয় মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ লিখিয়া রাখাতে নন্দকুমারের জীবনের শেষ মুহূর্তের চিত্র, অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে। নিজে তিনি নন্দকুমারের যতটুকু দেখিয়াছেন তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে নন্দকুমারের জীবনের শেষ অংশটুকুর জন্য আমরা যথার্থই ঋণী, কিন্তু তিনি অথবা তাঁহার ন্যায় অন্য কোন, পক্ষপাতদোষবর্জ্জিত-ইংরাজ ও বাঙ্গালী যদি নন্দকুমারের সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে, মহারাজার প্রকৃত চরিত্র, মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আরও পরিস্ফুট ও উজ্জলভাব ধারণ করিত। ইংরাজের স্বজাতি প্রেম অতিশয় প্রবল, আর সেই প্রবলতার খর স্রোতে ন্যায়পরতা ও পক্ষপাত শূন্যতা, সচরাচর অতি সহজেই ভাসিয়া যায়।

যাহারা নন্দকুমারের নামে দুইটী অভিযোগের সাক্ষাদিগের জবানবন্দী আনু-

---

২ কলিকাতায় তখন একটী থিয়েটার ছিল, সামান্য ইংরাজ হইতে গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত সেই থিয়েটারের দর্শক শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর যে প্রকার play bill এক দিবস বাহির হয়, তাহা হইতে কতকাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

PLAY BILL EXTRAORDINARY.

A TRAGEDY

Tyranny in Full or the devil to pay.

with a farce,

"All in the Wrong"

Dramatis Personœ

Jndge Jeffreys—by Ven'ble Poolbundy (Impey).* Sir Limber—by Sir Pliant (Chambers) * Justice Balance—by Cram Turkey (Hyde). * Judas Escariat—by the Rev Tally. Ho' (Rev. W. Johnson হেষ্টিংসের প্রিয়মিত্র). * * DonQuixote fighting with Windmills } by the great Mogul. (Warren Hastings) *

There will be introduced, a Dance of Demons of Revenge, 1st Ghost by Nuncomar. 2nd by P. Mamock

সুবিধার জন্য আমরা * চিহ্নগুলি বসাইয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের অনুমানিত চিহ্নিত নাম গুলির সহিত – নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সহিত সাদৃশ্য আছে কি না, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। Peter Mamock ব্যক্তিটা কে আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

Vide Hickey's Bengal Gazette June 1781; A Voice from Old Calcutta.

পূর্ব্বিক পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে নন্দকুমার সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যায্য বিচার (ইংরাজীতে যাহাকে Fair Trial বলে) পান নাই। তিনি যেমন অভিযুক্ত হইয়া অবরুদ্ধ হইলেন, অমনি তাহার কিয়ৎদিবস পরেই মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে পারেন নাই, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্যক উপায় করিতে বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কারাগৃহে তাঁহার মনের অবস্থা অতিশয় ভয়ানক ছিল। সে অবস্থায়, একটী ঘোরতর চক্রান্ত বেষ্টিত হইয়া, মোকদ্দমার প্রকৃত বিষয় কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি যে যথাসাধ্য আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রধান শাসনকর্ত্তা, হেষ্টিংস তাঁহার প্রধান শত্রু, ও এই অভিনয়ের প্রধান নায়ক; বাল্যসুহৃৎ স্বজাতিবৎসল ভ্রাতৃভাবাপন্ন সার ইলাইজা, কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক; নন্দকুমারের ঘরের শত্রু, ও বিশেষ ক্ষমতাবান, মোহনপ্রসাদ, কমল উদ্দিন খাঁ, ও কৃষ্ণজীবন দাস, এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী ও হেষ্টিংসের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। এক পক্ষে হেষ্টিংস গড়িয়া পিটিয়া সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, অপর পক্ষে নন্দকুমার আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে স্বল্প সময় পাইয়াছিলেন, ইহাতে হেষ্টিংসের ও মোহনপ্রসাদের জয় না হইবে কেন? কর্ম্মবাড়ীর প্রধান কর্ত্তা যখন সহায়, তখন আর ভাবনা কি? ইম্পি ইচ্ছা করিয়া ব্রিটিশ-আইন-সঙ্গত মোকদ্দমাকালীন অনেক স্বত্ব (privilege) হইতে নন্দকুমারকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। আদালতে তাঁহার হুকুম কে অগ্রাহ্য করে? তার পর নন্দকুমার যখন দণ্ডার্হ বলিয়া ঘোষিত হইলেন, তখন পুনর্ব্বিচারের জন্য * ও তাহাতেও যদি সুবিধা না হয়, তবে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাক ইম্পি অনুরোধকারী নন্দকুমারের কাউন্সেলকে আরও কটু ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। †

জালকরা অপরাধে নন্দকুমার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ তত্ত্বাবধান ও মনঃ-

---

* ইম্পির এই প্রকার পক্ষপাতিতা, ও নন্দকুমারের প্রতি অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে, পাঠক এই প্রবন্ধের প্রথমেই, (কারাগার প্রেরণ বৃত্তান্ত হইতেই) অনেকাংশে অবগত হইবেন। ভবিষ্যতে আমরা হেষ্টিংস ও নন্দকুমারের চরিত্র সমালোচনা করিবার সময়, এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিব। পাঠক একবার Sir Gilbert Elliot এবং ইম্পির বিরুদ্ধে বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

† জুরীর ফোরম্যান, Mr John Robinson সাহেবকে নন্দকুমারের বারিষ্টার Farer সাহেব প্রাণ দণ্ড স্থগিত রাখার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন, তখন ইনি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া ইম্পিকে এই কথা বলিয়া দেওয়াতে, তিনি Farer কে খুব ধমক দেন।

সংযোগ করিয়া তাঁহার নামে, Conspiracy (চক্রান্ত) ও (Forgery) (জালকরা) মোকদ্দামার সাক্ষীগণের জবানবন্দী পাঠ করিলে কোন অপরাধই সম্যক প্রমাণ হয় না। চক্রান্ত অপরাধে সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমার এক প্রকার জয়ী হইয়াছিলেন। কমল উদ্দিন ও কৃষ্ণজীবন নন্দকুমারের প্রধান শত্রু, বিশেষতঃ কমল উদ্দিন, হিজলীর নূন গোলার সত্বাধিকারী, ও হেষ্টিংসের দেওয়ান, কান্ত বাবুর ১ প্রধান আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ক্রীড়াপুত্তলী ছিল। ইহাদের সাক্ষীর উপর, বিশ্বাস করিয়া বিচার করিলে মোকদ্দমার যে কিরূপ সুবিচার হয়, তাহা পাঠক উপলব্ধি করিবেন। সকলেই এই কমল উদ্দিনকে অসৎ প্রকৃতি বলিয়া জানিতেন, নন্দকুমারের সহিত তাহার শত্রুতা সে নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছিল। জেনরেল ক্লেভারিং অনেক স্থলে এই কমলকে মিথ্যাবাদী ও কলুষিত চরিত্র বলিয়াছেন, সুতরাং তাহার সাক্ষীতে বিশ্বাস করা উচিত কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন। সেই ভীষণ অন্ধকারময় সময়ের কোন ঘটনাই অপক্ষপাতিত্ব ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি তাহা হইতেই যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই নন্দকুমারের পক্ষে সম্পূর্ণ সাফাই বলিয়া গ্রহণীয়। তাঁহার বিচার করিবার জন্য, যে কয়জন জুরী বসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইংরাজ ও অধিকাংশই গবর্ণরের প্রসাদ-ভাজন ছিলেন। সুতরাং নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আজ কাল যেমন আমরা দুই একটী নিতান্ত অন্যায় বিচার দেখিতে পাই, নন্দকুমারের ঘটনাটী তদপেক্ষাও অধিক। ইংরাজের স্বজাতিপ্রিয়তা, ও একদেশদর্শিতাকে, শত শত ধন্যবাদ! ইহা আমরা আজও প্রচুর রূপে দেখিতে পাইতেছি। আর মেক্‌লে—, তোমায় আর কি বলিব, তুমি ইংলণ্ডের সম্মানের পাত্র ছিলে, তুমি ইংলণ্ডের উপযুক্ত সন্তান, তুমি প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ, আবার শুনিতে পাই তুমি উচ্চমনা—কিন্তু নন্দকুমারের বিবৃত-চরিত্র ও তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষপাতময় প্রমাণের সাহায্যে তুমি যে তাঁহাকে দোষী, ও সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্র সমালোচন করিয়া তাহাদের জাতীয় চরিত্রে অযথা কালিমা সমর্পণ ও অজস্র বিদ্বেষ বাণ বর্ষণ করিয়াছ, তাহা হৃদয়বান বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না। যাহা হউক, এ সব কথা ছাড়িয়া দিয়া, নন্দকুমার যে জাল করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইলেও, প্রাণদণ্ড যে তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড নহে, তাহা আমরা চক্ষু মুদিয়াও বুঝিতে পারি। আমাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হউক, আমরা অশেষ দোষাকর বাঙ্গালী জাতি, পক্ষপাত দোষও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু নন্দকুমারের ফাঁসীর কয়েক বৎসর পরে এই সমস্ত বিষয়ের সমালোচন প্রসঙ্গে, তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক পত্র, Hickey's Bengal Gazette

১ কাসীমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ ও সংস্থাপয়িতা।

এ একজন উচ্চপদস্থ সাহসী ইংরাজ সদর্পে কি বলিয়াছিলেন তাহা একবার দেখুন—উক্ত উন্নতমনা লেখক লিখিতেছেন—* * "Clive was made a Peer in England, though he committed in Bengal, the same crime for which we hanged Nundkumar." ২ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা যে নিতান্ত অন্যায়, ও রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য (Political motive) সাধনোদ্দেশে সূচিত, উল্লিখিত ঘটনা পাঠ করিলে, আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই স্থলে, অনিচ্ছায় আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম, নন্দকুমারের চরিত্র, পরিস্ফুট রূপে চিত্র করিবার জন্য ভবিষ্যতে অন্য প্রসঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব।

শ্রী হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

---

# মেসমেরিজম

বা

## শক্তি চালনা।

দ্বিতীয়,—ইচ্ছাকারীর সহিত সমানুভূতি, বা তন্ময় ভাব ;—এই শ্রেণীর ঘটনা প্রথম শ্রেণীর ঘটনা হইতে আরো আশ্চর্য্য; ইন্দ্রিয়াতীত মানসিক শক্তির ইহাতে সুস্পষ্টতর প্রমাণ পাওয়া যায়।

গতবৎসর আমরা যে সকল 'মনের কথা জানা' ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি ইহাও অনেকটা সেই রকম, ইচ্ছাকারী যাহা খাইতেছেন, না খাইয়াও ইচ্ছাধীন তাহার স্বাদ অনুভব করিতেছে, ইচ্ছাকারী যাহা মনে করিতেছেন—ইচ্ছাধীন না শুনিয়াও সেই রূপ কাজ করিতেছে—ইত্যাদি। তবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সহিত ইহাদের প্রভেদ এই, তাহা জাগ্রত স্বাভাবিক অবস্থায় মনের কথা জানা, ইহা অজ্ঞান অবস্থায় জানা।

নিম্ন লিখিতরূপে এসম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছে। ফ্রেডকে চৌকিতে বসাইয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইলে স্মিথ তাহাকে শক্তি চালনা দ্বারা নিদ্রাভিভূত করিতেন। সে ঘুমাইয়া পড়িলে তখন স্মিথের গায়ে একজন বেশ জোরে চিমটি কাটিত, কাঁটা ইত্যাদি ফুটাইত, আর স্মিথ ফ্রেডকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার লাগিতেছে।" মাঝে মাঝে স্মিথের ঐ প্রশ্ন ছাড়া, আর কেহ একটি কথা কহিত না, সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিত। এ সময় স্মিথের কথা ছাড়া আর কাহারো কথা সে শুনিতে পাইত না।

---

২ Vide. N. 38. 1781 Hickey's Gazette.

এইরূপে প্রথমবার ক্রমান্বয়ে ফ্রেডকে যে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়, সে সময় স্মিথ তাহার হাত ধরিয়াছিলেন, কিন্তু পরে দেখা গেল—তাহার কোনই আবশ্যক নাই, সুতরাং দ্বিতীয় বারের পরীক্ষার সময় স্মিথ ফ্রেডফে স্পর্শ মাত্র করেন নাই।

প্রথম বারের পরীক্ষার তালিকা। ৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৮৩।

১। মিষ্টার স্মিথের ডান হাতের উপর দিকে খানিকক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত চিমটি কাটা হইতে লাগিল—প্রায় দুই মিনিট পরে ফ্রেড নিজের শরীরের ঠিক সেইস্থান রগ-ড়াইতে আরম্ভ করিল।

২। স্মিথের ঘাড়ে চিমটি কাটা হইল; ঐ একই ফল।

৩। স্মিথের বাঁ পায়ের ডিমে চাপড় মারা হইল; একই ফল।

৪। স্মিথের বাঁ কাণের নীচের নরম জায়গায় চিমটি কাটা হইল, একই ফল।

৫। স্মিথের বাঁ হাতের কবজায় চিমটি কাটা হইল, একই ফল।

৬। স্মিথের পিঠের উপর দিকে চাপড় মারা হইল, একই ফল।

৭। স্মিথের চুল ধরিয়া টানা হইল, ফ্রেড তাহার বাম বাহুতে ব্যথা অনুভব করিল।

৮। স্মিথের ডান কাঁধে চাপড় মারা হইল, ফ্রেড তাহার শরীরের ঐ অংশ ঠিক দেখাইয়া দিল।

৯। স্মিথের বা হাতের কবজায় কাঁটা ফোটান হইল, একই ফল।

১০। স্মিথের ঘাড়ে কাঁটা ফোটান হইল, একই ফল।

১১। স্মিথের বাঁপায়ের আঙ্গুল মাড়ান হইল, ফ্রেড কিছুই বলিল না।

১২। স্মিথের বাঁ কাণে কাঁটা ফোটান হইল, ফ্রেড ঠিক দেখাইল।

১৩। স্মিথের বাঁ কাঁধে পিঠের দিকে চাপড় মারা হইল, একই ফল।

১৪। স্মিথের ডান পায়ের ডিমে চিমটি কাটা হইল, ওয়েল্‌স্‌ নিজের বাহু স্পর্শ করিল।

১৫। স্মিথের বাঁ হাতের কবজায় কাঁটা ফোটান হইল—ফ্রেড ঠিক দেখাইল।

১৬। স্মিথের ডান কানের নীচে ঘাড়ে কাঁটা ফোটান হইল—একই ফল।

দ্বিতীয় বারের পরীক্ষার সময়—ওয়েল-সের শুধু যে চোখ বাঁধা হইল এমন নহে, তাহার ও স্মিথের মধ্যে একটা ব্যবধান দেওয়া হইল, কেবল ইহাই নহে, একেবারে অন্য পাশের ঘরে গিয়া স্মিথ ফ্রেডকে দুই তিন বার প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বারের পরীক্ষার তালিকা। ১০ই এপ্রিল ১৮৮৩।

১৭। "স্মিথের বাঁ কানের উপর দিকে চিমটি কাটা হইল, ওয়েলস্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল "কে আমাকে চিমটি কাটে?" এবং তাহার নিজের সেই অংশ রগড়াইতে লাগিল।

১৮। স্মিথের বাম বাহুর উপর দিকে চিমটি কাটা হইল, ওয়েলস্‌ তৎক্ষণাৎ নিজের সেই স্থান দেখাইয়া দিল।

১৯। স্মিথের ডান কানে চিমটি কাটা হইল, ফ্রেড প্রায় এক মিনিট পরে নিজের ডান কানে এমনি ভাবে চড় মারিল—যেন একটা মাছি মারিতেছে। সেই সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"এইবার পাকড়া গেছে।"

২০। স্মিথের দাড়ীতে চিমটি কাটা হইল, ওয়েলস প্রায় তৎক্ষণাৎ ঠিক সেই-স্থান দেখাইয়া দিল।

২১। স্মিথের পিছনের চুল টানা হইল, ফ্রেড কিছুই করিল না।

২২। স্মিথের ঘাড়ে চিমটি কাটা হইল। একটুখানি পরে ফ্রেড সেইস্থান দেখাইয়া দিল।

২৩। স্মিথের বাঁ কানে চিমটি কাটা হইল, একই ফল। ইহার পর স্মিথ পাশের ঘরে চলিয়া যাওয়ায় ফ্রেড বলিল—"আমাকে আর বিরক্ত করিও না, আমি ঘুমাই, বলিয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল। সে এখন কতকটা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই অবস্থায় আবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

২৪। স্মিথের মুখে নুন দেওয়া হইল—ওয়েলস্ বলিল—"আমি বাতি খেতে চাইনে"। (কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাহার কাছে একবার বাতির নাম করা হইয়াছিল—সম্ভবতঃ সেই নাম হইতে তাহার এখন এইরূপ ভাবোদয় হইল।)

২৫। সুটের গুঁড়া স্মিথের মুখে দেওয়া হইল—ওয়েলস্ চীৎকার করিয়া উঠিল ঝাল জিনিস আমার ভাল লাগে না—আমাকে লঙ্কা দিচ্ছ কেন?

২৬। আবার নুন স্মিথের মুখে দেওয়া হইল—সে বলিল—"কেন আমাকে এমন বিশ্রীঝালের মিষ্টান্ন দেও?

২৭। স্মিথের মুখে (চিরতার মত তিত পাতা) worm wood দেওয়া হইল—ওয়েলস্ বলিল—আমি রাই ভালবাসিনা—আমার চোখে জল আসে।"

শেষের দুই পরীক্ষাতেই দেখা যাইতেছে যে আগের সুটের স্বাদ তাহার মুখে এমন লাগিয়াছিল যে শেষের অন্য জিনিসের স্বাদ তাহাতেই ঢাকিয়া গিয়াছিল।

২৮। স্মিথের ডান পায়ের ডিমে চিমটি কাটা হইল। ওয়েলস্ অত্যন্ত বিরক্ত হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে চাহিল না, অবশেষে ডান পা তুলিয়া, সেইস্থান ঘসিতে আরম্ভ করিল।

ইহার পর ওয়েলস্ এমন বিরক্ত হইল, যে পরের পরীক্ষায় কোনমতে কথা কহিতে চাহিল না, বলিল—"আমি আর বলিব না, কেন না আমি যদি না বলি—তাহলে আর কেউ আমাকে চিমটি কাটিবে না। তোমরা কেবল আমাকে বলাইবার জন্য চিমটি কাটছ। তাহার পর স্মিথ যখন তাহাকে বলিবার জন্য পিড়াপীড়ি করিলেন—সে বলিল—"আমাকে কথা কইয়ে তোমাদের কি হবে? তারাত তোমাকে আর মারছে না, আমাকে মারছে—তা আমি সহ্য করতে—পারি" এই সময়টা স্মিথের বাঁ পায়ের ডিমে সবলে চিমটি কাটা হইতেছিল।

এইরূপে দেখা যাইতেছে ২৪ বারের মধ্যে—ওয়েলস ২০ বার ঠিক আহত স্থানে হাত দিয়াছিল। এই ঘটনা গুলির মধ্যে

যে বিন্দু মাত্র প্রতারণা ছিল না—তাহা দেখাইবার জন্য—উক্ত সমিতির কথা উঠাইয়া দিলাম।

"We never attempted these experiments in mesmeric sympathy until we had satisfied ourselves of the genuineness and completeness of the mesmeric sleep. That state was as we think tolerably unmistakable, nor did any one circumstance occur during the whole course of our experiments which threw any doubt on its reality."

ইচ্ছাকারীর সহিত ইচ্ছাধীনের তন্ময়তা প্রাপ্তির পক্ষে অন্যরূপ যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এইবার দেখাইব।

একবার ফ্রেড মোহাভিভূত হইলে স্মিথ এবং আরো দুইজন—দূরে গিয়া তাহার পেছন দিক হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার নাম ধরিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতে লাগিলেন। ফ্রেড স্মিথের ডাকে প্রত্যেকবার সাড়া দিল, কিন্তু আর কাহারো ডাকে সে উত্তর দিল না।

তাহার পর ফ্রেড যে ঘরের কোণে নিদ্রাভিভূত রহিয়াছিল স্মিথ সেই ঘরেরি এমন একটি কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—যে ফ্রেড জাগিয়া থাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না, আর মেসমেরিজম সমিতির একজন সভ্য—ফ্রেডের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া, তাহার কাণের কাছে (এক ইঞ্চমাত্র তফাৎ রাখিয়া) মহা গোলমাল চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্মিথ তখন সেই কোণ হইতে এত ধীরে এত মৃদু স্বরে মাঝে মাঝে ফ্রেড বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন—যে তাঁহাকে ঘেসিয়া যে বসিয়াছিল—সেও তাঁহার ঠোঁট নাড়া ছাড়া তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছিল না, অথচ ফ্রেড তাঁহার প্রত্যেক ডাকে উত্তর দিতে লাগিল। দশবার এইরূপে ডাকিলেন, দশবারই সে উত্তর দিল। ইহার পর স্মিথ তাঁহার সঙ্গীর সহিত পাশের ঘরে গিয়া সে ঘরের মোটা মোটা পরদার আড়াল হইতে আর এঘরের সমান হট্টগোলেরভিতর আগেকার মত মৃদুস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় কেহ অতি নিস্তব্ধতার সময়ও অতদূরের ওরূপ মৃদুস্বর শুনিতে পাইত না, তাহার উপর আবার এই গোলমাল, কিন্তু এত সব হেঙ্গামার মধ্যেও স্মিথ দশবার ফ্রেড বলিয়া ডাকিবেন, দশবারই সে সাড়া দিল।

এই পরীক্ষার পর ফ্রেডকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে কাহারো চীৎকার শুনিতে পাইতেছে কি না? সে বলিল—"না—সে কেবল স্মিথের কথা শুনিতে পাইতেছে, কিন্তু স্মিথ তাহাকে সেই চীৎকারকারীর কথা শুনিবার মত ঠিক করিয়া দিলে, চীৎকারকারী যখন অতি আস্তে আস্তে তাহার সাহত কথা কহিলেন—ফ্রেড তখন 'চীৎকার করিতেছ কেন' বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, অথচ যখন তিনি চীৎকার করিতেছিলেন—তখন সে কিছুই শুনিতে পায় নাই।

আর একরূপ ঘটনায় মনের উপর মনের ক্ষমতা ইহা হইতেও জাজ্বল্যতর

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মেসমেরিজম সমিতির সভ্যগণের একজন বন্ধু, সিডনি বিয়ার্ডের উপর এইরূপ পরীক্ষা প্রথম। উক্ত সভ্যগণ 'হাঁ—ও না' লেখা বার টুকরা কাগজ—স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন যে, পর পর তিনি 'হাঁ—না' যেমন লেখা দেখিবেন সেই অনুসারে তিনিও নীরবে হাঁ—কিম্বা 'না' ইচ্ছা করিবেন।

এদিকে আগেই বিয়ার্ডকে নিদ্রাভিভূত করা হইয়াছিল, তিনি চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছিলেন; তাঁহার কাণের কাছে এক জন একটা পিয়ানো স্বরে মিলাইবার কাঁটা বাজাইয়া বলিতে লাগিলেন "শুনিতে পাও" (এখানে বিয়ার্ডকে আগের মত ইচ্ছাকারীর কথা ছাড়া অন্য লোকের কথায় বধীর করা হয় নাই।)

তিনি স্মিথের নীরব ইচ্ছানুসারে—কোন বার 'হাঁ'—কোন বার 'না' বলিতে লাগিলেন। একবারো অমিল হইল না।

একবার বলিয়া নহে, বিয়ার্ডের উপর এইরূপ পরীক্ষা অনেক বার করা হইয়াছে, প্রতিবারেই বিয়ার্ড সেই নীরব আজ্ঞায় চালিত হইয়াছেন। একবার এইরূপ পরীক্ষার পর বিয়ার্ড বলিতেছেন "১লা জানুয়ারীর পরীক্ষার সময় যখন স্মিথ আমাকে মেসমেরিজম করিলেন, তখন আমার জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় লোপ পায় নাই, অথচ শরীর এমন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রতিবার যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল—আমি "শুনিতে পাইতেছি কি না—" আমি তাহা প্রতিবারই বেশ শুনিতে পাইতেছিলাম—অথচ অধিকাংশ বার সে কথা বলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছিলাম। স্মিথের ইচ্ছা আমি যেন প্রতিবারে বুঝিতে পারিতেছিলাম—এবং পরীক্ষার আরম্ভ হইতেই আমার নিজের ইচ্ছা তাহার ইচ্ছার এমন অধীন হইয়া পড়িয়াছিল—যে তখন নিজের ইচ্ছা প্রয়োগের একটুও শক্তি ছিল না।"

প্রোফেসর ব্যারেট ডাবলিনে তাঁহার বাড়ীতে এইরূপ পরীক্ষা করিয়া একই রূপ ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখানেও স্মিথ ইচ্ছাকারী—কিন্তু ফ্রেড ইচ্ছাধীন নহে, ফার্ন্‌লি নামে একজন এখানে ইচ্ছাধীন।

ব্যারেট বলিতেছেন—সে নিদ্রাভিভূত হইবার পর তিনি নিজে কিম্বা স্মিথ তাহাকে যে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখনি সে তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

একটা কার্ডে হাঁ—ও না লিখিয়া সেই কার্ডটা স্মিথের সম্মুখে এমন করিয়া রাখা হইয়াছিল—যে যদি পাত্র জাগিয়া থাকে তাহা হইলেও সে কার্ড তাহার নজরে না পড়ে। তাহার পর ব্যারেট একদিকে ফার্ণলিকে মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—তোমার হাতের মুটো এখন খুলিবে—? (তাহার হাত মুটো করাছিল) তাহাকে ঐ কথা বলিয়া আর এক দিকে তিনি তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোনবার সেই কার্ডে লিখিত—'না—কোনবার বা হাঁ কথাটি আঙ্গুল দিয়া স্মিথকে দেখাইয়া দিতেছিলেন, স্মিথ তাঁহার কথানুসারে নীরবে দূর হইতে

কোন বার তাহাকে মুটো খুলিতে বলিতেছিলেন কোনবার বারণ করিতেছিলেন। এইরূপ কুড়িবার প্রশ্ন করা হইল, ১৭ বার উত্তর ঠিক আজ্ঞামত হইল, তিনবার বিপরীত হইল। কিন্তু পরে স্মিথ বলিলেন তিনি ঐ তিনবার উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সময় মত ইচ্ছা করিতে পারেন নাই।

ইহার পর পরীক্ষার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল। একই রকম কতক গুলা টুকরা কাগজে 'হাঁ' ও কতক গুলা টুকরা কাগজে 'না' লিখিয়া এই বন্দোবস্ত হইল, যে ব্যারেট ফার্‌নলিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছ, আর সেই জিজ্ঞাসার সময় স্মিথের হাতে যখন তিনি হাঁ লেখা কাগজ দিবেন তখন স্মিথ আজ্ঞা করিবেন "বল শুনিতেছি," আর না লেখা কাগজ পাইলে স্মিথ বলিবেন—"উত্তর করিও না।"

কত দূরে হইতে ইচ্ছাকারী ইচ্ছাধীনের উপর ইচ্ছার প্রভাব খাটাইতে পারেন—এইবারের পরীক্ষায় তাহা ব্যারেট দেখিবার মনস্থ করিলেন। ব্যারেটের পাঠ ঘরে এক কোণে একটা আরামের চৌকিতে—ফার্ণলি যেমন ঘুমাইয়াছিল তেমনি রহিল—প্রথমে তাহা হইতে তিন ফুট দূরে দাঁড়াইয়া স্মিথ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, এইরূপে ২৫ বার তাহাকে প্রশ্ন করা হইল।

প্রতি প্রশ্নেই ঠিক স্মিথের ইচ্ছানুরূপ উত্তর হইল। তাহার পর ছয় ফুট দূরে দাঁড়াইয়া স্মিথ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, এইরূপে ছয় বার প্রশ্ন করা হইল—ছয়বারই ঠিক হইল।

তাহার পর স্মিথকে ১২ ফুট দূরে দাঁড় করাইয়া ব্যারেট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহাও ঠিক ইচ্ছামত হইল। তাহার পর ১৭ ফুট দূর হইতে ছয় বার পরীক্ষা করিয়া তাহাও ঠিক হইল।

এই শেষের বারে স্মিথ একেবারে ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একখানি কার্ড যাইবার মত ফাঁক রাখিয়া ঘরের দরজাও বন্ধ করা হইয়াছিল, সেই ফাঁকটুকুর মধ্য হইতে ব্যারেট স্মিথকে 'না হাঁ' লেখা যেমন কার্ড দিতেছিলেন তিনি সেখান হইতে সেইরূপ ইচ্ছা করিতেছিলেন।

ইহার পর স্মিথ হলের ঘর পার হইয়া খাবার ঘরে—গিয়া দাঁড়াইলেন, ষ্টাডিরুম হইতে ইহা ৪৩ ফুট দূর,—ইহার উপর মাঝের দুই দরজা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ব্যারেট সেইখানে গিয়া তাহাকে কার্ড দিয়া আবার এ ঘরে আসিয়া ফার্ণলিকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনটি প্রশ্নই ঠিক হইল, কিন্তু তাহার 'হাঁ' বলিবার সময় এত মৃদুস্বরে সে হাঁ বলিতেছিল—যে তাহা অতি অস্পষ্ট রূপে শুনা যাইতেছিল। ইহার পর ফার্ণলি এমনি গভীর নিদ্রাভিভূত হইল যে আর কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া গেল না।

এই শেষের প্রশ্নগুলি ছাড়িয়া দিলেও, আগে—ভিন্ন ভিন্ন দূর হইতে সবশুদ্ধ ৪৩ বার পরীক্ষা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটিও স্মিথের ইচ্ছার বিপরীত হয় নাই।

যদি দৈবাৎ কেবল ফার্ণলির উত্তর গুলি ঠিক হইয়া যাইত, তাহা হইলে অন্ততঃ অর্দ্ধেকও ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন স্মিথের ন্যায় একজন সামান্য ইচ্ছা চালক, অতটা দূর হইতে ইচ্ছার প্রভাব খাটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন গুপ্ত বিদ্যা বিশারদ—মুনি ঋষিগণ যে বহু দূর হইতে ইচ্ছার প্রভাব প্রেরণ করিতে পারিবেন—ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।

ব্যক্তি বিশেষে এই শক্তির প্রভাবের যে বিলক্ষণ তারতম্য আছে ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

ব্যারেট বলিতেছেন, অনেক বার তিনি স্মিথের ইচ্ছার বিপরীতে ইচ্ছা প্রয়োগ করিয়াছেন—দুজনে সমান দূরে দাঁড়াইয়া, স্মিথ যদি ইচ্ছা করিয়াছেন হাঁ বল, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন 'না বল' কিন্তু প্রতিবারেই স্মিথ জয়ী হইয়াছেন।

অথচ ব্যারেট যে শক্তি চালনায় একেবারে অপটু তাহাও নহে! তিনি একবার একটি মেয়েকে মোহাভিভূত করিয়া আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটিকে অজ্ঞান করিয়া তিনি অন্য ঘরের এক জোড়া তাসের মধ্য হইতে একখানি তাস তুলিয়া লইয়া তাহা দেখিয়া একখানি কেতাবের মধ্যে পুরিয়া এ ঘরে লইয়া আসিলেন, এবং মেয়েটিকে বইখানি দিয়া বলিলেন—"কেতাবের মধ্যে কি রাখিয়াছি বলদেখি?" মেয়েটি বইখানি মাথায় ছুঁয়াইয়া বলিল "কতকগুলা লাল ফোটাওয়ালা জিনিস দেখিতে পাচ্চি। ব্যারেট। "ফোটাগুলা গোন" সে গুণিয়া বলিল—"পাঁচটা লাল ফোটা আছে" সত্যই তাসটা হরতনের পঞ্জা। আর এক খানা তাস ঐরূপ লুকাইয়া রাখা হইল, সে বলিয়া দিল। তার পর যখন একটা আয়ারলণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট আনিয়া রাখা হইল—সে বলিল—"আমি অনেকগুলা অক্ষর দেখছি, এত যে তত গুণতে পারিনে।

একবার ব্যারেট বলিলেন—"তুমি লণ্ডনে রিজেন্টষ্ট্রীটে গিয়া দেখ কোন দোকান দেখিতে পাও?" মেয়েটি আইরিস—সে তাহার গ্রাম হইতে কখনো কোথায় যায় নাই। কিন্তু ব্যারেট যে দোকান মনে করিয়াছিলেন—তাহা ঠিক বর্ণনা করিল। তাহার পর সে দোকান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠিক ষ্ট্রীটের সামনে যে বড় ঘণ্টা ঝোলান আছে সে কথাও বলিল। ব্যারেটের মনের ছবি আর কি তাহার মনে গিয়া আঙ্কত হইল।

এইরূপ শক্তি চালিত অবস্থায় কেবল মনের কথা জানা ছাড়া অন্য রূপ দিব্য দৃষ্টিরও তাহারা প্রমাণ পাইয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইল্‌ড বলিতেছেন যে তাঁর বাড়ীতে মিষ্টার রেডম্যান নামক একজন শক্তিচালক ফ্রেডারিক স্মিথ নামে একজন বালককে মেসমেরাইজ করেন। স্মিথের চোখ প্রথমে কাগজ তাহার উপর রুমালদিয়া বাঁধা হইয়াছিল—এই অবস্থায় ওয়াইল্‌ড তাহার হাতে এক প্যাক তাস দিলেন, এবং মাঝে মাঝে যে তাস বাহির করিতে বলিলেন—সে তাহাই বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিতে লাগিল।

ইহার পর ওয়াইল্‌ড তাহাকে একখানা বই দিয়া তাহার পাতা খুলিয়া দিলেন—সে দুইবারই প্রথম লাইন ঠিক পড়িয়া গেল—সে লাইন যে কি—তাহা ওয়াইলড আগে পড়েন নাই, পরে পড়িয়া দেখিলেন ঠিক। ওয়াইল্‌ড একটা কবিতা বাহির করিয়া পড়িতে বলিলেন—এবং পরে দেখিলেন—তাহাও ঠিক পড়িয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত সমিতি আরো অন্যান্য লোকের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইচ্ছাকারীর সহিত ইচ্ছাধীনের তন্ময়তা প্রাপ্তির অজস্র প্রমাণ পাইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিলাম না, যাহা বলিতেছি দৃষ্টান্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

---

# শাক্য বংশের উৎপত্তি।

প্রসিদ্ধি আছে, বুদ্ধদেব শাক্য নামক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাঁহার শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি এই দুই পৃথক নাম প্রচারিত আছে। শাক্যবংশের উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস অতীব অদ্ভুত। বৌদ্ধদিগের প্রধান প্রধান গ্রন্থে এই বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা যেরূপ বলে, তাহাতে স্থির হয় যে, শাক্যবংশ কোন এক পৃথক বংশ নহে; আমাদিগের পৌরাণিক সূর্য্য বংশের একটি পৃথক শাখা মাত্র। সূর্য্য বংশায় ইক্ষাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের এক ধারা হইতে শাক্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল, অর্থৎ ইক্ষাকু বংশীয় সুজাত নামক রাজার পুত্রেরা কোন এক কারণে নির্ব্বাসিত হইয়া "শাক্য" এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের "মহাবস্তু অবদানং" নামে এক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আছে। * এই গ্রন্থে "রাজবংশে আদি" এতন্নামক অধ্যায়ের মধ্যভাগে শাক্যবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যথা;—

"পশ্চিমকে শাকেতে মহানগরে সুজাতো নাম ইক্ষাকু-রাজা অভূষি।" ইত্যাদি। স্থানাভাবে আমরা সমস্তটা উদ্ধৃত করিলাম না, কিন্তু অনুবাদ করিতেছি।

অনুবাদ।—পূর্ব্বে অযোধ্যা মহানগরে সুজাত নামে ইক্ষাকু বংশীয় মহারাজা

*। এই গ্রন্থ খানি বহুপুরাতন ও সমধিক মান্য। ফরাশীশ পণ্ডিত সিনার্ট ৯২০ সম্বৎ অব্দের একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার মুদ্রন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন সুতরাং ইহা বহু পুরাতন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ছিলেন। এই ইক্ষাকু রাজা সুজাতের (বা সঞ্জাতের) পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম ওপুর, নিপুর, করকুণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিশীর্ষ। কন্যা পাঁচটীর নাম শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এতদ্ভিন্ন তাঁহার "জেন্ত" নামে আর এক পুত্র হইয়াছিল, সেটী তাঁহার সখী পুত্র। সখীর নাম জেন্তী, তৎকারণে তৎপুত্রকে লোকে "জেন্ত" বলিত। প্রথিত আছে যে, রাজা সুজাত এক সময়ে জেন্তিকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন. জেন্তি তাঁহার অভিমত পূরণ করিয়াছিল। রাজা জেন্তির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে বর প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করেন। বলিলেন, জেন্তি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব; তুমি যাহা চাহিবে, তাঁহাই দিব। জেন্তি বলিল, মহারাজ! আমি আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিব। এই কথা বলিয়া সে তন্মুহূর্ত্তে নিজ পিতা মাতার নিকট গমন করিল এবং বর বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। বলিল, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন, আপনারা যাহা বলিয়া দিবেন আমি তাহাই রাজার নিকট প্রার্থনা করিব। এই কথা শুনিয়া, জেন্তির পিতা মাতা, আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিল। কেহ বলিল, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম চাহিয়া লও, কেহ বলিল অনেক ধন রত্ন চাহিয়া লও।

সেই সময়ে সেই স্থানে এক পরিব্রাজিকা উপস্থিত হইল। এই ভিক্ষুকী চতুরা, বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা। সে বলিল, জেন্তি তুমি বেশকারিণীর কন্যা, এজন্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার গর্ভজাত পুত্র রাজদ্রব্যেরও অংশভাগী হইবে না। রাজার পাঁচ পুত্র আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত, সুতরাং তাহারাই পিতৃরাজ্যের ও পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে। রাজা সুজাত তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন, রাজা সুজাত সত্যবাদী, মিথ্যা বলেন না, যাহা বলেন তাহাই করেন, এনিমিত্ত আমি বলি, তুমি রাজার নিকট এইরূপ বর চাও যে,—মহারাজ! আপনার পাঁচ পুত্রকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া বনবাসী করিয়া আমার পুত্র জেন্তকে যুবরাজ করুন। তাহা হইলে আপনার ও আমার পুত্র জেন্ত এই অযোধ্যা মহানগরে রাজা হইতে পারিবে। জেন্তি, এইরূপ বর লইলেই তোমার সব হইবে।" অনন্তর জেন্তী ভিক্ষুকীর পরামর্শে তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তির প্রার্থনা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, পুত্র স্নেহে কাতর হইলেন; কিন্তু কি করেন, কোন ক্রমেই স্বীকৃতবর প্রদানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। "যাহা চাহিবে তাহাই দিব" এইরূপ বলিয়া এখন আর তাহা অন্যথা করিতে পারিলেন না। বলিলেন জেন্তি, তাহাই হউক, এই বর তোমাকে দিলাম। অনন্তর নগর বাসী ও জনপদবাসী সকলেই রাজার বরদানের কথা শুনিল। সকলেই শুনিল যে, রাজা স্বীয়পুত্র দিগকে রাজ্যবহিস্কৃত ও বনবাসী করিয়া বিলাসিনীপুত্র জেন্তকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।

তখন সমস্ত লোক ঐ সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইল। রাজপুত্রগণের গুণ ও মহিমা মনে করিয়া কাতর হইতে লাগিল। তখন সকলেই বলিল, কুমারগণের যে গতি, আমাদিগেরও সেই গতি, আমরাও কুমারগণের সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইব। রাজা সুজাত শুনিলেন যে, কুমারগণের সঙ্গে অযোধ্যা নগরের সকল লোকেই বনগমন করিবে। শুনিয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং হৃষ্টই হইলেন। তখন তিনি নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে যে ব্যক্তি কুমারগণের সঙ্গে প্রবাস গমন করিবে, সেই সেই ব্যক্তি যাহা যাহা চাহিবে আমি তাহাদিগকে তাহা তাহা প্রদান করিব। যাহার হস্তিতে প্রয়োজন, তাহাকে হস্তিই দিব। অশ্বের প্রয়োজন থাকিলে অশ্ব দিব, রথ চাহিলে রথ দিব, যান চাহিলে যান দিব, শকট চাহিলে শকট দিল, বৃষ চাহিলে বৃষ দিব, ধন চাহিলে ধন দিব, বস্ত্র চাহিলে বস্ত্র দিব, অলঙ্কার চাহিলে অলঙ্কার দিব, দাস দাসী চাহিলে দাস দাসীও দিব। রাজ পুরুষেরা আমার আজ্ঞায় যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেক। অনন্তর রাজ আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজামাত্যগণ ধনাগার উন্মুক্ত করিল। এবং যে যাহা চাহিল,—তাহাই তাহাকে প্রদান করিল। এইরূপে সেই রাজকুমারেরা সহস্র সহস্র প্রজা সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া ও ধনরত্নাদি লইয়া অযোধ্যা মহানগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর কাশী কোশলের রাজা তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া রাজপুত্রদিগকে আপন রাজ্যে আনয়ন করাইলেন। কাশীকোশল দেশের মনুষ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই কুমারদিগকে ভাল বাসিত, এক্ষণে তাহারা আরো ভালবাসিতে লাগিল। অত্যল্প দিন পরেই কাশিকোশলের রাজার ঈর্ষ্যা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, প্রজাগণ কুমারগণের গুণে অধিক মুগ্ধ হইলে আমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, কুমারদিগকে রাজা করিতেও পারে, অতএব ইহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই ভাবিয়া কাশীকোশলের রাজাও তাঁহাদিগকে রাজ্য বহিষ্কৃত ও নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন; কুমারেরা তখন তদ্দেশীয় ও স্বদেশীয় বহুলোক সঙ্গে লইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। কোথায় গেলেন, কোন দেশে গিয়া প্রবাস বাস করিলেন, তাহাও মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে লিখিত আছে। * যথা—

"অনুহিমবন্তে কপিলো নাম ঋষিঃ প্রতিবসতি পঞ্চাভিজ্ঞো চতুর্ধ্যান লাভী মহর্ষিকো মহানুভাবো" ইত্যাদি।

অনুবাদ।—হিমালয়ের সমীপে, কপিল নামে এক মহানুভাব মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী ঋষি বাস করিতেন ‡ তাহার আশ্রম

* অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব্বভাগ ও কাশীরাজ্যের পশ্চিমভাগ পূর্ব্বে কাশীকোশল নামে অভিহিত হইত। ঐ ভাগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কোশলও বলিত এবং কাশীরাজ্যের শাসনাধান থাকায় কাশীকোশল নাম হইয়াছিল।

‡ এই কপিল সাঙ্খ্যবক্তা ও সগর সন্তানগণের দাহকর্ত্তা কপিল হইতে পৃথক ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে ইনি গোতমগোত্রীয় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন।

স্থানটি অতি বিস্তীর্ণ, রমণীয়, পত্রপুষ্পাদি-সম্পন্ন ও স্বচ্ছ-সলিলযুক্ত ছিল। এই কপিলাশ্রমের এক অংশে এক মহান্ শাকোট বন ছিল। কুমারেরা কাশীকোশল রাজ্য অর্থাৎ অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর উত্তরে গমন পূর্ব্বক সেই কপিলাশ্রমের অন্তঃসীমা সন্নিবিষ্ট বিস্তার্ণ শাকোট বনে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ বনবাস শাকেত দেশে ও কাশীকোশলের দেশে ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায়ী জনগণের দ্বারা প্রচারিত হইল।

"তত্র সমনুক্রান্তা বাণিজকা কাশীকোশলাং জনপদাং গছন্তি ব।" ইত্যাদি।

একদা সেই প্রদেশের বণিক্‌গণ কাশিকোশল দেশে আগমন করিলে, কাশিকোশল দেশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ অমুক শাকোটবন হইতে আসিয়াছি। ক্রমে অযোধ্যাদেশের বণিকেরাও সেই দেশে যাতায়াত আরম্ভ করিল। অন্য লোকে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় যাইবে? তাহারা বলে, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ কপিলাশ্রমের সীমান্তঃপ্রদেশের শাকোটবনে যাইব। এবং ক্রমে সেই স্থানটা এদেশীয়দিগের পরিচয় গোচর হইয়া আসিল। কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিলেন, ক্রমে তাঁহাদের বিবাহকর্ম্ম আবশ্যক হইল। তাঁহারা সে দেশের লোকের কন্যা গ্রহণ ও সে দেশের পাত্রকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পাছে তাঁহাদের জাতি দোষ ঘটে, সেই ভয়ে তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিলেন। কিছুকাল পরে শাকেতবাসী রাজা সুজাতের মনে হইল, তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় এবং কি করিতেছে।

"রাজা সুজাতো অমাত্যানাং পৃচ্ছতি। ভো অমাত্যা কুমারা কহিং আবসন্তি।" ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রাজা সুজাত একদিন অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমাত্যগণ! আমার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় আছে? তাহারা বলিল, রাজন! হিমালয়ের নিকটে এক সুবিস্তীর্ণ শাকোট বন আছে, শুনিয়াছি, কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিতেছেন। রাজা পুনর্ব্বার অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণের বিবাহের কি হইতেছে? কোথা হইতে তাহারা দারা আনয়ন করিয়াছে? অমাত্যগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, কুমারেরা জাতিনাশ ভয়ে তদ্দেশীয়দিগের সহিত মিলিত না হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভগিনী ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

"রাজ্ঞা দানি সুজাতেন পুরোহিতো চ অন্যে চ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতা পৃচ্ছিতা।" ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রাজা সুজাত অমাত্য মুখে

---

যথা,—"পিতৃশাপেন কশ্চিদিক্ষাকু বংশীয়ো গোতম বংশীজ কপিল মুনে রাশ্রমে শাকবৃক্ষবনে কৃতবাসাঃ শাক্য ইত্যভিষাং প্রাপ। "(ভরত ব্যাখ্যা)।

কুমারগণের বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়গণ, কুমারেরা যাহা করিয়াছে, তাহা কি তাহারা করিতে পারে? পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহারাজ! কুমারেরা পারে, সেরূপ কারণে তাহারা দোষদুষ্য হইতেছে না। রাজা সুজাত পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথায় নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহারা শক্য হইল এই কথা হইতে সেই অবধি তাহারা শক্যা, তৎকালের চলিত ভাষায় "শাকিয়া" এই সমাখ্যা প্রাপ্ত হইল।

সূর্য্য বংশীয় ইক্ষাকুরাজার বংশধর সুজাত রাজা স্বীয় পুত্রদিগকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে পর, তাহারা হিমালয়ের সমীপস্থ শাকোটবনে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং স্ব সম্বন্ধীয়-দিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল, ঐরূপ বিবাহ করিতে পারে কি না এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে পুরোহিত ও পণ্ডিত সকলেই শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথা বলিয়াছিলেন, ক্রমে সেই কথা হইতে নির্ব্বাসিত সুজাত পুত্রেরা শক্য শাক্য ও শাকিয় এই অভিধায় অভিহিত হইয়াছিলেন। অতএব শাক্য-বংশ কোন্ এক পৃথক বংশ নহে; সর্ব্ববিদিত ইক্ষাকু বংশই প্রোক্ত কারণে শাক্য বংশ নামে প্রথিত হইয়াছে।

রাজা সুজাত পুরাণ-প্রথিত ইক্ষাকুর বংশধর কি না তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই গ্রন্থে রাজা সুজাতের পূর্ব্ব পুরুষগণনায় মান্ধাতা নরপতির উল্লেখ আছে। ১ সুতরাং ইনি সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু রাজার বংশধর ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বংশজাত নহেন।

শাব্দিকাচার্য্য ভরত, শাক্য-নাম-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে, প্রোক্ত ইতিবৃত্তের পরিপোষক একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারেও শাক্যবংশ ইক্ষাকু বংশের শাখা বিশেষ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যথা,—

"শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছনং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মা দিক্ষাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।"

অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির হইল যে, ইক্ষাকুবংশীয় সুজাত রাজার পুত্র পঞ্চক হইতেই শাক্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুরই" শাক্যবংশের প্রথম বা আদি। শাক্য ওপুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরে মহাত্মা শাক্যসিংহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের বিষ্ণুপুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ইক্ষাকুবংশ মধ্যে শাক্যবংশের মূল পুরুষ

---

১ রাজ্ঞো মান্ধাতস্য পুত্র পৌত্রিকায়ো নপ্ত প্রনপ্তিকায়ো বহনি রাজ সহস্রাণি। (মহাবস্তু)

পূর্ব্বে ইক্ষাকুবংশীয় দশরথ রাজা স্ত্রীর প্রার্থনায় পুত্রদিগকে বনবাসী করিয়াছিলেন, কলিতেও আমার সুজাত রাজা তাহাই করিলেন। রাম নির্ব্বাসনের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকা মন্দ বিস্ময়-জনক নহে।

সুজাত রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাজা সুজাত বা সঞ্জাত ইক্ষাকুবংশীয় বৃহদ্বল রাজার অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ এবং রামপুত্র কুশের বংশধর। যথা,—

রাম।
|
কুশ। নব।
|
অতিথি।
|
নিষধ।
|
নল।
|
নভা।
|
পুণ্ডরীক।
|
ক্ষেমধন্বা।
|
দেবানীক।
|
অহীনগু।
|
রুরু।
|
পারিপাত্র।
|
দল।
|
ছল।
|
উক্থ।
|
বজ্রনাভ।
|
শঙ্খনাভ।
|
ঝুষিতাশ্ব।
|
বিশ্বসহ।
|
পুষ্য।
|
ধ্রুবসন্ধি।
|
সুদর্শন।
|
অগ্নিবর্ণ।
|
শীঘ্র।
|
মরু।
|
প্রস্তুশ্রুত।
|
সুগন্ধি।
|
অমর্ষণ।
|
মহশ্বান্।
|
চিশ্রুতবান্।
|
বৃহদ্বল।

এই রাম বংশীয় বৃহদ্বল রাজা ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যুর বাণে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তৎকালে ইহাঁর বৃহৎকর্ণ নামে এক শিশু পুত্র ছিল, সেই শিশু পুত্রই তৎকালে রাজ্যাধিকার ও বংশ উভয়ের পরিরক্ষক হইয়াছিল। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে এই বৃহদ্বলের বংশও গণিত হইয়াছে। যথা,—

বৃহদ্বল।
|
বৃহৎকর্ণ।
|
গুরুক্ষেপ।
|
বৎস।
|
বৎসব্যূহ।
|
প্রতিব্যোম।
|
দিবাকর।
|
সহদেব।
|
বৃহদশ্ব।
|
ভানুরথ।
|
সুপ্রতীতাশ্ব।
|
মরুদেব।
|
সুনক্ষত্র।
|
কিন্নর।
|
অন্তরীক্ষ।
|
সুবর্ণ।
|
অমিত্রজিৎ।
|
বৃহদ্রাজ।
|
ধর্ম্মী।
|
কৃতঞ্জয়।
|
রণঞ্জয়।
|
সঞ্জাত বা সুজাত।*
|
শাক্য।

* দেশ ভেদে উচ্চারণের ভেদ ও বর্ণ লিপির আকার ভেদ থাকায় এবং নাগরী অক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর লেখার ব্যতিক্রম ঘটনা হওয়ায় এদেশের কোন কোন পুস্তকে সুজাত, কোন পুস্তকে সঞ্জাত এবং

বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই বংশাবলীর মধ্যে সঞ্জাতের পরেই "শাক্য" নাম থাকায় অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের আদিপুরুষ সুজাতকে সঞ্জয় বা সঞ্জাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ ইতিহাসকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; তিনি যে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সকলে বিদিত না থাকিতেও পারেন, একারণ আমরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার আদি বংশ নির্ণয় করিলাম।

শ্রীরামদাস সেন।

---

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলানাথকে নবাববাটীতে আনিয়া ফেলিয়া দস্যুগণ তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল, এবং আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে নবাবের নিকট সমস্ত সংবাদ কহিতে প্রেরণ করিল। কিছু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া ভোলানাথকে নবাবের কাছে লইয়া গেল। এখানে আসিয়াই ভোলানাথ বলিলেন—"বন্দিগি হুজুর, ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হোক্ বেটারা জোর করিয়া আনিয়াছে।"

নবাবের চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখ আরক্তিম, আমস্তক ঈষৎ কম্পমান, যেন একটা রুদ্ধ প্রবাহ মহাবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর তরঙ্গিত করিতেছে। তিনি বলিলেন—"তুমি আপনার পায় আপনি বেড়ী দিয়াছ—ইচ্ছা করিলে তুমিই খুলিয়া লইতে পার।"

ভোলানাথ দেখিলেন—বেগতিক, হাত রগড়াইতে সুরু করিলেন।

নবাব বলিলেন—"কোথায় রাখিয়াছ বল, এখনি মুক্তি দিতেছি।"

ভোলানাথ মনে মনে বলিলেন—"তবে দেখিতেছি আর মুক্তি হইল না।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"হুজুর আর যাহা হয় জিজ্ঞাসা করুন, ও কথাটা বলিতে পারিব না।" জাহা খাঁ বসিয়াছিলেন, উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বলিতে পারিবে না? জান কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?"

ভোলানাথ গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন "হুজুর—দুই জনেই একজনের সম্মুখে।"

নবাবের প্রদীপ্ত চক্ষু দিয়া স্ফুলিঙ্গ

---

কোন কোন পুস্তকে সঞ্জয় এই রূপ পাঠ দৃষ্ট হইলেও সুজাত সঞ্জাত ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিবার বাধা হয় না।

বাহির হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন—"না বলিলে কি হইবে জান ?"

ভোলানাথ আবার হাত রগড়াইতে লাগিলেন।

নবাব একজন দস্যুর দিকে চাহিলেন, সে তাহার তরবারি কোষ মুক্ত করিয়া ভোলানাথের মাথার কাছে উচ্চ করিয়া ধরিল—নবাব বলিলেন—"চাহিয়া দেখ।"

ভোলানাথ একটু হাসিলেন, বলিলেন—"যাঁহার ইচ্ছায় সংসার চলিতেছে—তাঁহার হাতেই জন্ম মৃত্যু, আমার ঐরূপ মৃত্যুই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়—তবে সে ইচ্ছায় অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া মরিতে আমার দুঃখ নাই।"

জাহা খাঁর আরক্তিম মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, জাহা খাঁ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, অবনত মুখে বৃহৎ কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই একবার পদশ্চারণ করিয়া আবার ভোলানাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবার অনুনয়ের স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভোলানাথ আমার শত্রুতা সাধিও না—তুমি আমার সহায় হও, আমাকে চিরকালের জন্য ঋণে বদ্ধ কর—নবাব জাহা খাঁ আজ তোমার হাতে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছে———"

ভোলানাথ রাম রাম বলিয়া হাত টানিয়া লইলেন, বলিলেন—"নবাব শা, ওকথা বলিবেন না—পুরস্কারের লোভ দেখাইবেন না, উহা অপেক্ষা শাস্তির কথা বলুন।"

নবাব শা প্রত্যাহত হইয়া তীব্র গতিতে পিছনে হঠিয়া দাঁড়াইলেন—রোষ কম্পিত স্বরে বলিলেন—এখনো সময় দিতেছি এখনো বুঝিয়া দেখ।"

ভোলা। "হুজুর যখন জন্মিয়াছি—এক দিন মরিতেই হইবে, বিছানায় শুইয়া রোগে মরিতাম—না হয় আপনার হাতেই মরিলাম"।

রুদ্ধউৎস এইবার ছুটিয়া গেল—নবাব শার আর ধৈর্য্য রহিল না, তাঁহার সমস্ত আশা ভরষা একটা সামান্য কেশ-স্পর্শে যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—তিনি তাই জ্ঞানহীন, তিনি তাই উন্মত্ত। তিনি আগেই এতদূর আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে এখন পিছনে রাশ টানিতে আর তাঁহার সাধ্য নাই। যে মুহূর্ত্তে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর সমস্তই ক্ষুদ্র এক 'আমার' বিরোধী বলিয়া সমস্তকেই শত্রু মনে হয়—জাহাখাঁর সেই মুহূর্ত্ত; যে মুহূর্ত্তে অমৃতকে বিষ বলিয়া মনে হয়,—দয়া করুণা—ন্যায়—বিবেক—সকলি যে মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী হৃদয়ের কাছে পেষিত হয়—খাঁজাহার সেই মুহূর্ত্ত; তিনি ইঙ্গিত করিলেন—অমনি ভোলানাথের দুই দিকে দুই খানা তরবার ঝকঝক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভোলানাথ তাহার মধ্যে নির্ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া দিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার বলিলেন—"আপনি যাহা লইতে পারেন তাহা লউন—কিন্তু যাহা আমার হাতে তাহা পাইবেন না।"

ভোলানাথের অমানুষিক সাহসে নবাবশা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁহার সেই দারুণ মুহূর্ত্ত হঠাৎ যেন চলিয়া গেল—কি মনে

হইল কে জানে, বলিলেন—"না মারিও না—বন্দী করিয়া রাখ—"

দস্যুরা ভোলানাথকে লইয়া চলিয়া গেল—কিছু পরেই মাদারী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হুজুর হুকুম তামিল, নওয়া বেগম হাজির"।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুগণ বুড়ির বাড়ী হইতে মুন্নাকে লইয়া বন পথে যাত্রা করিল। তখন শেষ রজনী—কৃষ্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র শেষ রাত্রে আকাশে দেখা দিল, মাঠে প্রান্তরে—গঙ্গার বুকে, গাছের মাথায়, পাতার ফাঁকে, দস্যুদের মুখে, হঠাৎ আলোক ফুটিয়া উঠিল। পাপের অন্ধকার-মূর্ত্তি পেচকের মত অন্ধকারেই লুকাইয়া থাকে, প্রেতের ন্যায় অন্ধকারেই তাহার প্রভাব, আলোকে তাহার ভীষণতা হঠাৎ দস্যুদের চক্ষে পড়িল, হঠাৎ আপনাদের কাজের জঘন্য মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া দস্যুরা কেমন থমকিয়া দাঁড়াইল। এই সময় মাথার উপর একটা পেচক বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, তাহাদের পাষাণ নির্ভীক হৃদয়ও কেমন কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে একবার নিস্তব্ধে তাকাতাকি করিয়া পরস্পর ঘেঁসাঘেসি করিয়া দাঁড়াইল তাহার পর দ্রুতগতিতে আবার পা বাড়াইল। কিছু দূর গিয়া আর তাহাদের পা সরিল না। সম্মুখে ও কাহার মূর্ত্তি? জটাজুট-বিলম্বিত আবক্ষ শ্মশ্রু-শোভিত কেও দেব গম্ভীর মহান পুরুষ—হৃদয়ভেদী কটাক্ষে চাহিয়া তর্জ্জনী উত্তোলিত করিয়া বজ্রধ্বনিতে তাহাদের আদেশ করিলেন—'দাঁড়াও'? সে আদেশে আকাশ পৃথিবী যেন শিহরিয়া উঠিল—বনের লতাপাতা যেন নিষ্কম্প স্থির হইয়া রহিল, নক্ষত্রের গতি পর্য্যন্ত যেন বন্ধ হইয়া গেল—সেই স্তব্ধতার স্থির সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার সেই আদেশ বাণী তরঙ্গিত স্রোতের ন্যায় স্তম্ভিত অরণ্যের অণুতে অণুতে তান তুলিতে লাগিল। দস্যুরা মন্ত্র স্তব্ধ শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইল—দেবমূর্ত্তি তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইলেন, প্রহরীর প্রতি মর্ম্মভেদী কটাক্ষে চাহিয়া মুন্নাকে ভূমে নামাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন,—সে তটস্থ হইয়া নামাইয়া দিল,—সন্ন্যাসী মুন্নাকে স্পর্শ করিয়া মৃদু স্নেহকণ্ঠে বলিলেন "উঠ বৎসে"। মুন্না উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার আর শ্রান্তি নাই—ক্লান্তি নাই—তাঁহার পবিত্র স্পর্শে সে যেন অমৃত পান করিয়া সবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—'এস বৎসে আমার সঙ্গে এস।—' তিনি আগে আগে গমন করিতে লাগিলেন, সে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল। বন পার হইয়া রাজ পথে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাইবে বৎসে—" মুন্না কি বলিবে? কোথায় যাইবে? তাহার আর স্থান কোথা? কিন্তু মনের কথা মুখে আসিল না, মনের কথা মনেই মিলাইয়া গেল—তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া—মুখ আপনি নত হইয়া পড়িল, সে কি বলিল নিজেই বুঝিল না—আস্তে

আস্তে বলিল—"ঘরে—" সন্ন্যাসী তাহাকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়া রাখিয়া গেলেন।

* * *

এদিকে মুন্নাকে লইয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইবার কিছু পরে দস্যুদের সে মোহ নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তাহারা সেই নিস্তব্ধ নিশা-কালে—নির্জ্জন বনের মধ্যে আপনাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। পরস্পর বিস্ময় নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—সকলেই সকলকে যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "এ-খানে কেন আসিলাম?" কিছু পরে একটু একটু করিয়া তাহাদের আগেকার সব কথা মনে পড়িয়া গেল, মুন্নাকে লইয়া এই-খান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল এই পর্য্যন্ত মনে পড়িল,—কিন্তু তাহার পর? আর কি-ছুই মনে নাই। কোথায় মুন্না, কেমন ক-রিয়া চলিয়া গেল—কিছুই মনে নাই। ময়না বলিল—"তাইত নবাবকে কি বলিব? এই বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়াছে খোঁজ দেখি—" দস্যুরা গাছ পালার মধ্যে মু-ন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় মুন্না—আবার সেই মূর্ত্তি! সন্ন্যা-সীকে দেখিয়া আবার তাহারা সভয়ে দাঁড়া-ইয়া গেল—সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া—খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে জ্বলন্ত কটাক্ষে তাহা-দের সকলের দিকে এক একবার চাহিতে লাগিলেন, হঠাৎ দস্যুগণের মুখে একটা আহ্লাদের চিহ্ন প্রকটিত হইল,—তাহারা সকলে এক সঙ্গে ময়নার দিকে ফিরিয়া বলিল "তাইত এই যে বিবিজি, আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম নাকি, এইখানে থাকিতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

সকলে ময়নাকে ধরিতে অগ্রসর হইল,—ময়না অবাক হইয়া বলিল "মরণ ক্ষেপে-ছিস নাকি—আমাকে ধরিস কেন?" ত-খনি ময়নার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর চোখের প্রতি পড়িল—সে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল, প্রহরী তাহাকে ধরিতে আসিল—" সে বলিল ধরিতে হইবে না, চল যাইতেছি—" দস্যুদের সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে নবাব বাটীতে আ-সিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একটি ঘরে বসাইয়া প্রহরী নবাব শাকে গিয়া খবর দিল—মুন্না আসিয়াছে।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন প্রহরী জাহাখাঁকে আসিয়া বলিল —মুন্না হাজির, তখন জাহাখাঁর আরক্তিম মুখমণ্ডল একেবারে রক্তহীন হইয়া পড়িল, শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের যত বল অবসান হইল—এতক্ষণ এরূপ সংবাদে যে রূপ আহ্লাদ যেরূপ উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিতেছিলেন—তাহা আর সমুখে দেখিতে পাইলেন না, কি যেন একটা অশোয়াস্তির ভাবে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এত-ক্ষণ বাসনায় বঞ্চিত হইয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন—এখন কৃতকার্য্য হইয়া মনে হইল, কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যেন ভাল হইত। হায়! মানুষ কি আত্মপ্রতারক—আত্ম-বিরোধিতার নামই যেন মানুষ। কিন্তু

খাঁজাহার ওরূপ ভাব অধিকক্ষণ রহিল না—কিছু পরেই তিনি আত্মস্থ হইলেন, ক্রমে তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল, ক্রমে আর একরূপ ভাব মনে প্রবল হইল, কি করিয়া মুন্নার নিকট অপরাধ মুক্ত হইবেন কি রূপে তাহার প্রেমে অধিকারী হইবেন—তাহাই মনে আসিয়া পড়িল। তিনি সবলে হৃদয় বাঁধিয়া মুন্নাকে দেখিবার আশায় প্রহরী-উক্ত গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পালঙ্কে ময়না ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল কম্পিত হৃদয়ে তাহার নিকট ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ময়না আস্তে আস্তে ঘোমটাটা একটু কমাইয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে নবাবশার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কর্দ্দমোপবিষ্ট শূকরের যেমন কর্দ্দমের মধ্য হইতে কর্দ্দম-নিন্দিত মুখটি বাহির হইয়া থাকে—ঘোমটার মধ্য হইতে ময়নার শূকরী-নিন্দিত মুখখানি তেমনি প্রকাশিত হইতে লাগিল। নবাবশার চোখের সমুখে যেন শত কীট কিলবিল করিয়া উঠিল—তিনি ঘৃণায় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন কোন ঘরে আসিতে কোন ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন,—বাহিরে প্রহরী দস্যুদের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল সেইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় রাখিয়াছ? তাঁহারা আবার ঐ কামরা দেখাইয়া দিল। তিনি গৃহমধ্যে আর একবার প্রবেশ করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—ময়না ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রহরীকে গৃহে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায়" সে আঙ্গুল দিয়া ময়নার প্রতি দেখাইয়া দিল—তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—ভাবিলেন—বুঝি বা ভুল হইয়া থাকিবে, বলিলেন—'ও ত ময়না—অমন করিয়া বসিয়া কেন' প্রহরী বলিল—"হুজুর ময়না নহে, আমরা আল্লার দোহাই দিয়া বলিতে পারি—বিবিজি—' যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসের সহিত প্রহরী ও কথা বলিল তাহাতে তাঁহার উত্তেজিত ক্রোধ থামিয়া পড়িল তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতে প্রহরীদের সাহস হইবে—তাহা ত হইতেই পারে না, আসল ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি কি করিবেন নিজেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না—ময়না এই সময় আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জোড় হাতে বলিল—"প্রাণেশ্বর—" নবাবশা সর্প দংশিতের ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন—সে আবার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল "হৃদয়েশ্বর—অধিনী—" তাহার স্পর্দ্ধায় নবাবের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বন বন করিয়া ঘুরিয়া উঠিল, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহরী প্রহরী করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অসহ্য অসহ্য—! প্রহরীরা শশব্যস্তে আসিয়া হাজির হইল—কিন্তু তাঁহার মুখের হুকুম মুখেই রহিয়া গেল—হঠাৎ এক তেজস্বী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাসিত হইল—তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী যখন জাহাঙ্গার নেত্র হইতে

দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন তখন জাহাখাঁ চকিত দৃষ্টিতে ময়নার দিকে নেত্রপাত করিলেন,—সে সৌন্দর্য্যমহিমায় তাঁহার দৃষ্টি যেন ঝলসিয়া গেল, দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে একজন স্বর্গ বিদ্যাধরী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহ ঘর দ্বার লোক জন সকলি তাহার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল—তিনি উন্মত্ত ভাবে ময়নার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "প্রেয়সী প্রাণেশ্বরি—আমার হৃদয় প্রাণ মন যাহা কিছু আছে আজ ও দেবীচরণে সকল উৎসর্গ করিলাম" বলিয়া অবনত-জানু হইয়া ব্যাকুলভাবে দুই হাতে তাহার চরণ স্পর্শ করিলেন—অমনি তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল,—ময়নার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল—প্রহরীদের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। ময়না ভীত হইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী-গণও ভয়-স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিল, নবাবশা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটাগম্ভীর স্বপ্নের মাঝখানে সকলে যেন জাগিয়া উঠিল। ঘৃণায় লজ্জায় নবাবশার হৃদয় পুরিয়া গেল, সন্ন্যাসী তাঁহার কাছে সরিয়া আসিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে তাঁহার মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিয়া বলিলেন—"বৎস এমোহ এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল—কিন্তু যে মোহে অন্ধ হইয়া ইহা হইতে ঘৃণার কাজ অকুণ্ঠিত চিত্তে করিতে উদ্যত,অন্ধকারময় পাপকে আলোক বলিয়া ধরিতে উদ্যত—সে মোহ সে ভ্রান্তি কি ভাঙ্গিবে না ?" বলিয়া সে মূর্ত্তি ক্রমে মিশাইয়া পড়িল। খাঁজাহা চমকিয়া উঠিলেন, সত্যের একটা আলোক বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া, হৃদয় ভস্ম করিয়া দিয়া, যেন চলিয়া গেল—-পরক্ষণেই গভীর একটা অন্ধকার হৃদয় অধিকার করিল, ঘৃণায় লজ্জায় অনুতাপে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। ময়না ও প্রহরীগণ ভয়ে কম্পমান হইয়া পড়িয়াছিল—নাজানি তাহা-দের আজ কি দশা হইবে—কিন্তু নবাব তাহাদের কিছুই না বলিয়া নীরবে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তা-হার পর একাকী সেই দগ্ধ-হৃদয় লইয়া, অনু-তাপের অশ্রু ফেলিয়া,সে রাতটুকু অতিবাহিত করিলেন—যখন প্রভাত হইল, তাঁহার অশ্রু-জলের মধ্যদিয়া উষার নবরাগ যখন ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার জীবনের তিনি নূতন প্রভাত দেখিতে পাইলেন।

——(০)——

# প্রবাস পত্র।

——ঃ০ঃ——

সমাজ-সংস্কার — এবারকার পত্রে এদেশীয় হিন্দু-সমাজ সংস্কার বিষয়ে দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা করি, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দু সমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্ম্মের শিরে

শিরে পৌত্তলিকতা। সংস্কারকর্ত্তাগণ কাল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা কেহ বা পৌত্তলিকতা এই দুই ভিত্তির উপর সাধ্যানুসারে অস্ত্রাঘাত করিয়া আসিতেছেন। সমাজ সংস্কারের প্রতি যাঁহাদের একান্ত লক্ষ্য তাঁহারা জাতিভেদ উন্মূলন করিতে ব্যগ্র—ধর্ম্মসংস্কার যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন মানসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে সনাতন বেদবেদান্ত প্রতিপন্ন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম উপাসনা প্রচারে কৃত সংকল্প হন তাহাই এইক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইতে আশানুরূপ ফলোৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব সাধারণ হিন্দুসমাজে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করে নাই। এদেশে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বদ্ধ যে তাহা ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। জাতিভেদের শৃঙ্খলও তেমনি কঠোর। সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে সকল চেষ্টা হইতেছে তাহাতে বিশেষ ফলোদয় উপলক্ষিত হয় না। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাধা দিবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিবার শক্তি নাই। এই সমাজে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন—যাহা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা বাহিরের সংশ্রবে, সমাজের নৈসর্গিক নিজ বলে তাহা সাধিত হইতেছে না। ইংরাজি শিক্ষার ফলে—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবে এখন আমাদের নবজীবনের সূত্রপাত। বোম্বায়ে ইংরাজি উচ্চ শিক্ষা পত্তন হইবার অনতিকাল পরে একদল শিক্ষিত যুবক সমাজ সংস্কারে কটিবদ্ধ হয়েন, কিন্তু সেই বামন বলপ্রয়োগে রাক্ষস সমাজের কি হইবে? সমাজের এক অঙ্গুলির তাড়নে উদ্ধত যুবকদল রণে ভঙ্গ দিয়া কে কোথায় ছুটিয়া পালাইলেন তাহার ঠিকানা নাই। শিক্ষিত মণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট; সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান্ কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয়েই বিষম মত ভেদ। কাহারো মত এই যে জোর জবরদস্তী করিয়া জাতিবন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেল—সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া আস্তে আস্তে সংস্কারের সোপান প্রস্তুত কর—মূলে কুঠারাঘাত কর বৃক্ষ আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। এই প্রয়াণশীল ও রক্ষণশীল দুই দলের মধ্যে প্রথম হইতেই দলাদলি বিবাদ বিচ্ছেদ।

**বাল গঙ্গাধর শাস্ত্রী** — প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাল গঙ্গাধর শাস্ত্রী * নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোম্বায়ে

---

* ইন্দু প্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ২ মার্চ্চ ১৮৮৫ হইতে কতিপয় সংখ্যায় Political Rishis স্বাক্ষরিত কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রীর জীবনী ও পরমহংস সভার বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

প্রাদুর্ভূত হন। ইনি যেমন প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র সাধু পুরুষ ও আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এদিকে শিক্ষা বিভাগে তিনি উচ্চ পদারূঢ় কর্ম্মচারী—ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার নম্রস্বভাব ও বিনয়গুণে তিনি সকলেরি চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার চেহারা বেশভূষাতে কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—তাঁহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে? এ বিষয়ের একটা কৌতূহল জনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একব্যক্তি তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশে বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডেস্কে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময় সেই ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত। লেখকটীই যে বালশাস্ত্রী তাঁহার ভাবসাবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে। তিনি তখন কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন আর কতকঘণ্ট। বিলম্বে আসিলে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্তুকের প্রস্থান ও যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রবেশ। বালশাস্ত্রী সেইস্থানেই বসিয়া—কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তুক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিলেন যে এই সামান্য বেশধারী খর্ব্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্নে বোম্বায়ে একটী নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বলের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থী আহরণ করা—নিজ গৃহের নিকট তাহাদের বাসস্থান ভাড়া করিয়া দেওয়া—তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান ও সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বাবধান করা এই সকল বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি ছিল না। এই সকল বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিক্ষা প্রচারে ব্রতী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজসংস্কর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকারী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অল্পে অল্পে সমাজ সংস্কার করা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি বলিতেন ধর্ম্মভিত্তির উপর সমাজ সংস্কার স্থাপন কর নতুবা স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা নাই। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য। তিনি এত সাবধানে কার্য্য করিয়াও গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে পহ্বাড় ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহার কারণ এই, জাতির অনুরোধে কর্ত্তব্য পালনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত, রেবরেণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপাদ শেষাদ্রি অকারণে জাতি ভ্রষ্ট হন। জাতে উঠিবার আবেদন করিলে একদল গোঁড়া হিন্দু তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, এই লইয়া হিন্দুসমাজে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাণপণে পতিতো-

দ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন ও নিজে অশেষ অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও শ্রীপাদের বহিষ্কার কলঙ্ক মোচনে কৃতকার্য্য হয়েন, এদেশে কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার উপর জয়লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্য বশতঃ বালশাস্ত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন—তিনি ১৭ই মে ১৮০০ অব্দে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কারের যে ইচ্ছা—সে মনেরইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমাদের সন্ধ্যা গায়ত্রীর মধ্যে যে গূঢ়ার্থ যে উচ্চ উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইল না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজ সংস্কারের বিস্তর হানি জন্মে—সে ক্ষতি পূরণ করে আজপর্য্যন্ত এমন লোক উদয় হইল না। তাঁহার মৃত্যুর পর শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে আর এক নূতন ভাব প্রবেশ করিল—তাঁহার কার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র, ও ফলে কি দাঁড়াইল তাহার বিবরণ বলি শুন।

কলিকাতায় ডিরোজিও ও ডাক্তার ডফের আমলে নব্য বঙ্গের মধ্যে যে অশান্ততা যে প্রচণ্ড, রুদ্রভাবের আবির্ভাব হয় তাহা শুনিয়া থাকিবে। কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক জাতিচ্ছেদ ব্রতে ব্রতী হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন বোম্বায়ের ইতিহাস পৃষ্ঠায়ও তাহার অবিকল প্রতিরূপ মুদ্রিত দেখা যায়।

কৃষ্ণবন্দ্য { মৃত কৃষ্ণমোহন বন্দ্য সেকালের ইঙ্গ বঙ্গদের নেতা—

তাঁহারা যে সকল কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধই আছে। ডিরোজিওর টেবিলে প্রকাশ্যে খানা খাওয়া তাঁহাদের এককাজ—তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন কতকগুলি যুবক তাঁহাদের দলপতির ভবনে সম্মিলিত হন। তথায় যথেচ্ছা পানাহার করিয়া তাঁহারা গোমাংসহস্তে উন্মত্তের ন্যায় রাস্তায় বাহির হইয়া জনৈক ভক্ত বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসেন। কিন্তু এ উদ্যম অধিক কাল টিকিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজের শাসনে শীঘ্রই তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয় ও এই দুঃসাহস ব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া নিস্তার পান।

ইহার ১৫ বৎসর পরে বোম্বায়ে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত হয় ও উভয়ের শেষ দশা একই প্রকার। এই উভয় বীরদলের কার্য্য প্রণালী যে একই প্রকার তাহা নহে। মহারাষ্ট্রীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা practical কাজের লোক—তাঁহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় বাহির না হইয়া অতি সন্তর্পণে গুপ্তভাবে কার্য্যারম্ভ করেন। বাঙ্গলায় যেমন কৃষ্ণ

দাদোবা পাণ্ডরঙ্গ { বন্দ্য, বোম্বায়ে তেমনি দাদোবা পাণ্ডরঙ্গ প্রসিদ্ধ

ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডরঙ্গের ভ্রাতা, এই দলের দলপতি। এই দুই ব্যক্তি একই ধরণের লোক। উভয়েই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন—উভয়েই খৃষ্টধর্ম্ম তত্ত্ব বিশারদ। উভয়েরই ধর্ম্মের ভাব প্রবল—প্রভেদ এই, কৃষ্ণ বন্দ্য খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমা-

জের সহিত সমুদয় বন্ধন ছেদন করিলেন। দাদোবার ঝোঁক ঐ দিকে কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন—কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক দাদোবার উৎসাহ—তাঁহার বশীকরণ শক্তি—সামাজিক অনীতি অত্যাচারের উপর জলন্ত বিদ্বেষ এই সকল বিষয়ে তিনি কৃষ্ণবন্দ্যোর সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন কলিকাতায় উনি তেমনি বোম্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাল শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ বোম্বাই নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই তাঁহার অবসর—সেই স্কুলের ১২ জন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে তাঁহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার পাইলেন ও নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীঘ্রই তাহারদিগকে শিষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিদ্যালয়েও অনুপ্রবিষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা ও তৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কুরীতি নিবারণ উদ্দেশে এক সভার সৃষ্টি হইল তাহার সভ্যগণ ফ্রীমেসনদের ন্যায়

পরম হংস সভা } গোপনে কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই সভার নাম পরম হংস সভা। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়া দিয়া দুগ্ধ বাছিয়া লয় সেইরূপ সকল বস্তুর মন্দ পরিত্যাগ করিয়া সদগুণ গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্য। জন্মিয়াই হিন্দু সমাজের প্রতি বাণ বর্ষণ ইহার প্রথম উদ্যম। বাহিরের লোকের দৃষ্টি বহির্ভূত বিজন স্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই—অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একটা বাড়ী সংগ্রহ করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহাদের দিতে প্রস্তুত কিন্তু একটী ভাড়াটে ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিতেন তিনি আততায়ীদিগের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর বাসেন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালাচাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন—ভাবিলেন তাঁহার দেব দেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত। পরমহংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বল ও সাহসের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সেই লোকটির অবর্ত্তমানে তালা চাবি ভাঙ্গিয়া প্রতিমা সকল এককোণে সরাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখানে কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই—গিরগামের এক অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। প্রতি সপ্তাহে এক দিন সভার অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্ম্মারম্ভ এই যা ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক। কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাঁওরুটির টুকরা মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের পরিচয়

দিতে হইত, তদনন্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হস্ত হইতে জলগ্রহণ করিবারও বিধান ছিল।

দাদোবা পাণ্ডরঙ্গ, রাম বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লোকের যত্ন ও উৎসাহে ক্রমে সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুণা, অহমদ নগর, খানাযশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরম হংস সভার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য তথাপি সভার শ্রীবৃদ্ধি কালে অন্যূন ৫০০শ আন্দাজ করা যায়।

এই সভা প্রায় বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে গোপনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তথাপি সময়ে সময়ে সভ্যদের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁওরুটি কিনিয়া সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্য রাজ পথ দিয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপনীত হন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে দীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইত না। কিন্তু বার্ষিক প্রীতিভোজ এই সভার এক প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পরম হংস দল সমবেত হইয়া জাতি নির্ব্বিশেষে একত্রে পান-ভোজন করিতেন।

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যায় নাই—পরমহংস মণ্ডলীর শীঘ্রই সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দু ধর্ম্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন সহজ নহে। এক সামান্য ঘটনা হইতে এই বালীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি (কে তাহা প্রকাশ হয় নাই কিন্তু সভ্যেদের মধ্যে নিঃসন্দেহ এক জন) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে সভার যত গুহ্য কথা—সভ্যদিগের নাম, তাহাদের জাতিচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা যাহা কিছু নিহিত ছিল সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত সভার গুহ্য প্রকাশ হয় নাই ততদিন হিন্দু সমাজ সন্দেহ করিয়াও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই, গুপ্ত কথা সকল ফাঁস হইয়া গিয়া সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। হিন্দু সমাজের কাছে তাঁহারা মালশুদ্ধ ধরা পড়িলেন। তাঁহারা ভয়ে একে একে সরিয়া পড়িলেন—পলাতকদের দৃষ্টান্তে যথার্থ বীরের হৃদয়ও দমিয়া গেল। সভা ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল। ভিত্তি এমন দুর্ব্বল যে অল্প একটুকু আঘাত পাইয়া সমূলে নির্ম্মূল ও অদৃশ্য হইয়া গেল। জনসমাজে গভীর-নিখাত কোন কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রথমে লোকের মন নবমার্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে এরূপ বদ্ধমূল যে উহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা দুরাশা-মাত্র। আক্রমণের

অন্যতম কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মোৎকর্ষ সাধন—বিদ্যালোক প্রকাশ—স্ত্রীশিক্ষা দান, গার্হস্থ্যপ্রণালী সংশোধন—ইত্যাদি উপায়ে সামাজিক উন্নতি সাধন কর, জন সমাজে সভ্যতা বিস্তার কর, জাতিভেদ বন্ধন আপনাপনি শিথিল হইয়া আসিবে। এখনি দেখ ঐ সকল কারণে হিন্দুসমাজে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেকাল ও একালে একবার তুলনা করিয়া দেখ। তখনকার কালে জাতিভেদের কি কঠোর নিয়ম ছিল, 'রাজনীতিজ্ঞ ঋষি' তাহার এক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ বোটে করিয়া গঙ্গা ভ্রমণকালে দেখিলেন গঙ্গার উপর এক মনুষ্য দেহ ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাতে জীবন এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। এক জনের কাছে ল্যাবেণ্ডরের আরক ছিল, দেহ উপরে তুলিয়া তাহার এক শিশি আরক মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে ঢালিয়া দিলেন সে তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল। ইংরাজগণ সে ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পৌঁছিয়া দিলেন কিন্তু সে নিজ গৃহে স্থান পায় না। তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে জীবিত পাইয়া কোথায় সাদরে ডাকিয়া লইবে না তাহার প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে বেচারী গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কোথায় যায়—কি করিয়া উদর পোষণ করে—মহা বিপদ! অবশেষে যিনি দয়া করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারই দয়ার উপর তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার পড়িল। বাঁচিয়া উঠিয়া লোকটার কি আপশোষ! সে তাহার জীবনদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে কি—এমন দিন যায় নাই যে তাহার এই দুঃসহ দুঃখ ও কষ্টের কারণ বলিয়া সেই ইংরাজকে সে শত শত তিরস্কার না করিয়াছে। তিন বৎসর এইরূপে যায় পরে আবার সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এবার তাহার মরিবার অগাধসাধ মিটিয়া গেল, আর কেহ তাহাতে বাধা দিল না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই ঘটনা বঙ্গ-দেশে ঘটিয়াছিল—আর এক্ষণকার কি বিপরীত চিত্র! ল্যাবেণ্ডার—লোহিত ল্যাবেণ্ডরের উপরেও এখনকার লোকের ওরূপ বিষদৃষ্টি নাই। ভিন্নজাতির লোকদের একাসনে বসিয়া পানাহার এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। কোন হিন্দু হোটেলে গিয়া প্রকাশ্যে সাহেবীয়ানা খানা খাইলেও জাতির লোকেরা তাহা দেখিয়াও দেখেন না। বোম্বায়ে জাতিবন্ধন অপেক্ষাকৃত কঠিন তথাপি পূর্ব্বকালের তুলনায় কত শিথিল হইয়া আসিতেছে। জাতির শৃঙ্খল অপেক্ষা ঘটনাস্রোত বলবত্তর। পূর্ব্বে নীচ জাতির স্পর্শে ব্রাহ্মণ আপনাবে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, এইক্ষণে রেলওয়ে গাড়ীতে উচ্চনীচ জাতি একসঙ্গে বসিয়া ভ্রমণ করেন। প্রথমে যখন বোম্বাই হইতে একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ 'কালাপানী' পার হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন তাহার প্রত্যাগমন কালে হিন্দুসমাজে যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন দর্শন করা যায়। এইক্ষণে সমুদ্রপার-যাত্রী

হিন্দুসন্তান ফিরিয়া আসিয়া পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন না ও নাম মাত্র প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া তিনি জাতির সমক্ষে সংশোধিত হন। এই পার্লমেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে বোম্বাই প্রেরিত হিন্দু প্রতিনিধি ইংলণ্ড হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জাতির খাতিরে তাঁহার সাদর সৎকারের কোন ত্রুটিই হয় নাই। দেখ সেকাল ও একালে এ বিষয়ে কত প্রভেদ।

**প্রার্থনা সমাজ** } পরমহংস মণ্ডলীর ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বায়ে প্রার্থনা সমাজ উত্থিত হইয়াছে। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডরঙ্গ এই সমাজের প্রধান নেতা। তাঁহার ও তৎসদৃশ আর কতকগুলি সজ্জনের যত্ন ও উৎসাহে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ-বাল্য বিবাহ চির বৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি উন্মূলনে কৃত সঙ্কল্প হইয়া সমাজ কার্য্যারম্ভ করেন—পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ করাতে কোন ফল নাই—ধর্ম্মোন্নতি সাধন প্রথম কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সংস্কারের সোপান হইতে সমাজ সংস্কার সহজ সাধ্য, এই বিবেচনায় পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক একেশ্বরের উপাসনা প্রচার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র সেন দুই একবার বোম্বাই আগমন করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের মন বিচলিত করিয়া গিয়াছিলেন—ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। ১৮৬৭ অব্দে এই সমাজের প্রথম অধিবেশন ও তদুপলক্ষে আনন্দাশ্রম স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী হিন্দীভাষায় উপাসনাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ১৮৭২ এ সমাজের স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর নিহিত হয় ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই কার্য্যে সহায়তা করেন।

**সমাজের মূলতত্ত্ব** } একমাত্র অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

২। তাঁহার উপাসনাতেই ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল।

৩। তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন তাঁহার উপাসনা।

৪। প্রতিমা পূজা ও অবতার পূজা তাঁহার প্রকৃত উপাসনা নহে।

৫। ঈশ্বর প্রণীত বিশেষ কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই।

৬। ঈশ্বরকে পিতা ও সকল মনুষ্যকে পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

সমাজের এই কয়েকটি মূলতত্ত্ব।

ইহা হইতে প্রতীতি হইবে যে প্রার্থনা সমাজ যদিও ব্রাহ্মনাম গ্রহণে সঙ্কুচিত তথাপি ইহার মত ও বিশ্বাস অনেকাংশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী। আমার বোধ হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত এই সমাজের বিশেষ সহানুভূতি। অতীতের প্রতি উভয়েরই অটল শ্রদ্ধা—সামাজিক বিষয়ে উভয়েই রক্ষণশীল। প্রার্থনা সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধরণে ব্রহ্মোপাসনা সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে।

সঙ্গীত আধুনিক ও তুকারামের অভঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন এই উভয় মিশ্রিত ও এমন সহজ ভাষায় গীত হয় যে তাহাতে উপস্থিত সকলে যোগ দিয়া থাকেন। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য্য নাই—সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেশে সক্ষম তাঁহারাই অবসর ক্রমে আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া সমাজের সাপ্তাহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অনূন ১০০, তাহার দশমাংশ পৌত্তলিকতা কার্য্যতঃ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইয়াছেন। অনুষ্ঠান বিষয়ে ইঁহাদের বড় অগ্রসর দেখা যায় না। নূতন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিয়া ব্রাহ্মবিবাহ আজ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র সমাহিত হইয়াছে। এই আইন এখানকার হিন্দুদের হৃদয়গ্রাহী নহে। তাহার প্রধান কারণ এই যে এই আইন অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে হয়।

**শ্রমজীবি বিদ্যালয়** } প্রার্থনা সমাজ যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন শ্রমজীবিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন তাহার মধ্যে প্রধান। সভ্যদের যত্নে এইরূপ চারিটি বিদ্যালয় বোম্বায়ে স্থাপিত হইয়া তথায় প্রায় ৩০০ ছাত্র মহারাট্টা ও ইংরাজী অধ্যয়ন করিতেছে।

প্রার্থনা সমাজ যে শান্ত নিরীহ ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের স্বপ্নগোচর হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাহার সাপ্তাহিক ভজন পূজনে হিন্দু সমাজের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। হিন্দু সমাজ তাহার ৩৩ কোটী দেবদেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত লইয়া সমান ভাবে রাজত্ব করিতেছে। পৌত্তলিকতা যেরূপ পরাক্রমশালী তাহা ভাঙ্গিবার বল সে পরিমাণে সমাজে আছে কিনা সন্দেহ। রাবণ বধের জন্য রামের মত বীর চাই—তাহা কোথায়? যে পর্য্যন্ত না তেমন তেজীয়ান্ একনিষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা বোম্বাই সমাজে আবির্ভূত হইবে সে পর্য্যন্ত প্রার্থনা সমাজের ধর্ম্মবল হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

**আর্য্য সমাজ** } পৌত্তলিকতার দ্বিতীয় শত্রু আর্য্য সমাজ। এই সমাজের অস্ত্র বেদ। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী ইহার জন্মদাতা। বেদবাক্য সত্য বলিয়া সভ্যদের বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহারা বলেন ভাষ্যকারেরা যেরূপ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতে পৌত্তলিকতা বেদ বিরুদ্ধ আধুনিক ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা পরিহার্য্য। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কয় জন স্বীয় বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন? এই আর্য্য সমাজ এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ইঁহাদের মতামত এখনো বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে অবস্থিত—জমাট বাঁধিয়া ভূতলে অবতীর্ণ বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# রাজনৈতিক আলোচনা।

## রক্ষণশীল দলের পরাজয়।

আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। শত্রুর সাহায্যে লোকে কতদিন যুঝিতে পারে? পার্ণেলদল যদিও রক্ষণশীলদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল তথাপি তাহারা বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল যে ইহাদের দ্বারা আয়র্লণ্ডের বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার বক্তৃতা পাঠ শ্রবণে সকলেই চিন্তিত হইয়াছিল—কারণ তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে আইরিশ্‌দিগকে সায়ত্ব শাসন দেওয়া হইবে না। মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ ও লর্ড গ্রানভিলের বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে মহারাণীর বক্তৃতা সম্বন্ধে উদারনৈতিকেরা বিশেষ কোন আপত্তি করিবেন না। উদারনৈতিক দলপতিরা কোন আপত্তি উত্থাপন না করায় মিষ্টার কলিংস্‌ একটি সামান্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া রক্ষণশীলদিগকে পরাজয় করিয়া তাহারদিগের দর্পচূর্ণ করিলেন।

ধার্ম্মিক ও দুর্ব্বলের সহায় গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ পুনরায় মন্ত্রীপদে বরিত হইয়াছেন। লর্ড-রিপণকে ভারতের অণ্ডর সেক্রেটরি না করাতে ভারতবাসীমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। লর্ড কিম্‌বারলি পুনরায় ভারত সেক্রেটরি হওয়াতে আমাদের আশা ভরসা ডুবিয়া গেল। এই মহাত্মা সিবিল সর্ভিসের উমেদারদিগের বয়স হ্রাস করিতে অসম্মত হইয়া লক্ষাধিক ভারতবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করেন। শুনা যায় ডফরিনের ইচ্ছা-বশবর্ত্তী হইয়াই গ্লাড্‌ষ্টোন কিম্বারলিকে ভারত সেক্রেটরি করিয়াছেন। ইউ, কে, সটলওয়ার্থ ভারত অণ্ডর-সেক্রেটরি হইয়াছেন। শুনা যায় ইনি সুদক্ষ, কর্ম্মপটু ও ভারতহিতৈষী।

গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ আয়র্লণ্ডে সায়ত্ব শাসন প্রচলিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় লর্ড-ডরবি, হার্টিংটন্‌ ও নর্থব্রুক্‌ মন্ত্রীসভায় যোগ না দিয়া কেবল আপনাদের ক্ষুদ্রমনার পরিচয় দিয়াছেন। জন মরলি, চেম্বারলেন ও আরল স্পেনসর মন্ত্রীসমিতিতে থাকায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে আইরিস্‌দিগকে গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ কিয়ৎপরিমাণে সায়ত্ব শাসন প্রদান করিবেন। ইহাও এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হইলে গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ যখন ইহার উপর নিজ অভিমত প্রকাশ করেন, তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে আয়র্লণ্ডকে কখনই ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কিন্তু তজ্জন্য আইরিস্‌দিগকে কি কারণে সায়ত্ব শাসন প্রদান না করা হয়? আমাদের মনে হয় যতদিন অবধি আইরিস্‌দিগকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট না করিতে পারিবেন ততদিন সুচারু রূপে আয়র্লণ্ড শাসন করা কেবল দুরাশা মাত্র। সম্প্রতি পার্ণেল ও হিলিতে (হিলি আয়র্ল-

ণ্ডের সায়ত্ব শাসন (Home-rule) প্রার্থী-দলের আর একজন প্রধান ব্যক্তি) মতান্তর দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম হয়ত হোম-রুল্-দল বিভক্ত হইয়া উচ্ছন্ন যাইবে। পার্ণেল ও হিলি পুনর্মিলিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

## লণ্ডনের বিপ্লব।

লণ্ডনের ট্রাফ্যালগার স্কোয়ারে সম্প্রতি 'খেটে খাওয়া' লোকদিগের একটি বিরাট সভা হয়। আজ কাল ইংলণ্ডে বাণিজ্যের হ্রাস বশত লক্ষ লক্ষ লোক কষ্ট পাইতেছে। উক্ত স্থানে লক্ষাধিক লোকের জনতা হয়, এবং সোসিয়ালিষ্ট (যাহারা ধনী ও নির্ধনীকে তুল্যাবস্থায় আনিয়া সমাজকে নূতন রূপে গঠন করিতে চায়) দল ভুক্ত জনকয়েক সুবিধা দেখিয়া তীব্র ও হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করিয়া শ্রমজীবি ছোট লোক (working men) দিগকে ভয়ানক উত্তেজিত করিয়াছিল। এই সকল অন্নক্লিষ্ট অভাগারা বক্তৃতায় উন্মত্ত হইয়া লণ্ডন সহর লুট করিতে আরম্ভ করে। সমস্ত দিবস প্রায় লুটপাট হয়। সন্ধ্যার সময় বহু সংখ্যক শান্তিরক্ষক আসিয়া কয়েক জন চাঁইকে ধরিয়া লইয়া যাওয়াতে উপদ্রব বন্ধ হয় কিন্তু তাহার পরও দুই তিন দিবস উপদ্রবের ভয় থাকাতে দোকানদারগণ দোকান বন্ধ করিয়াছিল। কত লক্ষ টাকার দ্রব্য লুণ্ঠন হইয়াছে তাহার এখনও ঠিকানা হয় নাই। লণ্ডনবাসীদিগের দয়া দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। এই বিষম উপদ্রবের দুই একদিন পরেই লর্ড মেয়র ম্যান্সন্হাউসে একটি সভা আহ্বান করিয়া সভা স্থলেই উপদ্রবপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে তখনি দুই লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন—এবং পরে দিন দিন এই টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। হায়! ভারতবাসীগণ, কবে তোমরা তোমাদের ধনের এরূপ সার্থকতা দেখাইতে শিক্ষা করিবে?

## ফাইনান্স কমিটি ও ইন্‌কম্ টাক্স।

ইন্‌কম্ টাক্স বিল বিধিবদ্ধ হইল এবং ফাইনান্স কমিটি নিযুক্ত হইল। ফল কি হইবে তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। লর্ড ডফেরিন ইনকমটাক্স বিলের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য এক কমিসন নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। এ কমিটির সভ্যদিগের নাম বলিবার বিশেষ আবশ্যক নাই ইহাঁরা সকলেই প্রায় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী। এই সমিতির সভাপতি আসামের প্রধান কমিসনর এলিয়ট সাহেব এবং নামজাদা সভ্যের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ভারতবিদ্বেষী কনিংহ্যাম, ডাক্তার হণ্টর, ভারতবর্ষের কণ্ট্রোলার জেনেরল ওয়েষ্টলাণ্ড এবং বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ চার্ল্ডি। দেশীয়দিগের মধ্যে কেবল মাত্র কৃষি কষ্ট নিবারিণী বিধি সম্বন্ধের জজ এবং বম্বে কৌন্সিলের মেম্বর অনারেবল মহাদেব গোবিন্দ রানাদে এই কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইন্‌কম্ টাক্স বিধিবদ্ধ হইবার সময় মাননীয় প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কতক-

গুলি ধারা সংশোধন জন্য প্রস্তাব করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের মতের প্রাবল্যবশতঃ সেগুলি অগ্রাহ্য হইল। প্যারীবাবু প্রস্তাব করেন যে বিলাতে যাহার দেড় হাজার টাকার কম বাৎসরিক আয় তাহাকে ইন্‌কম্ টাক্স দিতে হয় না অতএব অর্থহীন ভারতেও ৫০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে অন্ততঃ হাজার টাকার সীমা প্রচলিত হউক। দ্বিতীয়, যিনি নিজের বাটি ভাড়া না দিয়া স্বয়ং তাহাতে বাস করেন তাহার বাটির কোন আয় নাই এরূপ ধার্য্য হওয়া উচিত। তৃতীয়, বিলাতে প্রতি বৎসর কেবল এক বৎসরের জন্য ইনকমটাক্স আইন প্রচলিত থাকার যেরূপ নিয়ম হয় এখানেও সেইরূপ বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। এদেশের আইন বিধিবদ্ধ-সভা (লেজিস্‌লেটিব কাউন্সেল) যদি বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের ধরণে গঠিত হইত তাহা হইলে প্যারী বাবুর যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব গুলি কখনই অগ্রাহ্য হইত না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে রাজ্যরক্ষার্থে যখন টাকার আবশ্যক হইবে তখন ভারতবাসী মাত্রেই কেবল টাকা দিয়া ক্ষান্ত হইবে এমন নহে,রাজ্য রক্ষার্থ জীবন পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইবে। যখন ব্যয় কমাইয়া আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে, তখন আমরা কেন অন্যায় করভার বহন করিব? কিন্তু লর্ড ডফেরিনের প্রস্তাবিত কমিটি অর্থের শ্রাদ্ধ ভিন্ন যে আর কিছু করিতে পারিবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। আমাদের ভয় হইতেছে যে ফাইনান্স কমিটি খরচ কমাইতে গিয়া কেবল মাত্র দপ্তরি চাপ্‌রাশি ও গরিব কেরানিবর্গদিগের উপর ঝাল না ঝাড়েন,কেন না যখনই ব্যয় হ্রাসের কথা হয় দেখা যায় যে এই দুর্ভাগারাই কষ্টে পতিত হয়।

যদি বাস্তবিকই লর্ড ডফেরিন্ ব্যয় হ্রাস করিতে চাহেন তাহা হইলে কমিটির পরিবর্ত্তে একটি কমিসন্ নিযুক্ত করুন। কারণ কমিটির ক্ষমতা অতি অল্প—কমিসন্ নিযুক্ত হইলে বিশেষ কার্য্য হইবে, কেন না কমিসনের ব্যয় কমাইবার ক্ষমতা থাকিবে। এরূপ কমিসনে অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্বাধীন সভ্য থাকা আবশ্যক। Bengal chamber of Commerce এর প্রস্তাব আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি। Chamber বলেন যে যদি কমিসন বা কমিটির সভ্যরা কেবল মাত্র সরকারিকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা গঠিত হয় তাহা হইলে "বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া" হইবে। মনে কর এলিয়ট আজ বাদে কাল লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হইবেন এরূপ আশা করা যায়। এই এলিয়ট কখনই গবর্ণরদের শৈল শিখরে যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য লিখিবেন না। মনে কর জজ্ কনিংহ্যামের হাইকোর্টের প্রধান জজ্ হইবার আশা আছে। ইনি কখনই বলিবেন না যে হাইকোর্টের জজের সংখ্যা ও বেতন কমান হউক—বিশেষত চিফ-জষ্টিসের বেতন হ্রাস করা হউক। হণ্টার ব্যবস্থাপক সভায় কি করেন আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি কখনই বলিবেন না যে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায়

থাকার প্রয়োজন নাই। যদি স্বাধীন বে-সরকারি সভ্য নিযুক্ত হইয়া আয় ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন তাহা হইলেই সকলে জানিতে পারিবে যে দুঃখী ভারতবাসীর টাকা কি ভয়ঙ্কররূপে অপচয় হয়। লর্ড ডফেরিনের কমিটি বৎসরে ৩০০০০ হাজার টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কতকগুলি গরিব কেরানিদিগের মাথা খাইবে।

যদি ব্যয় কমাইতে চাও তাহা হইলে সৈনিক ব্যয় কমাও; সরকারি শাসন কার্য্যে উপযুক্ত দেশীয় নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেও; শৈলাশখরে যাওয়া বন্ধ কর; বিভাগীয় কমিসনরাদগের পদ উঠাইয়া দেও; গবর্নর জেনেরেলের ও লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরদিগের বেতন কমাও, দশ কোটি টাকার ব্যয় এই মুহূর্ত্তেই কমিতে পারে।

## বর্ম্মা।

ব্রহ্মদেশ এখন পর্য্যন্তও শাসিত হইল না। Provost Major ব্রহ্মবাসীদিগের বিনা বিচারে প্রাণ দণ্ডের সময় বিলক্ষণ কৌতুক করিতেছেন। যখন কোন ব্রহ্মবাসীকে প্রাণ দণ্ডের জন্য বধ্য ভূমিতে আনা হয় তিনি তাহার ফটোগ্রাফ লয়েন। টাইম্‌সের সংবাদ দাতা ও একজন পাদরি এরূপ নৃশংস ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে এখন অবধি বিনা বিচারে কাহারও দণ্ড হইবে না।

আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। বুঝি চীনদিগের সহিত গোলযোগ বাধে। চীন-সম্রাট ভামো অধিকার করিতে চাহিতেছেন এবং বলিতেছেন যে ব্রহ্মদেশে একজন দেশীয়কে রাজা করিয়া ইংরাজেরা তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ থাকুন। দেখা যাক কি ঘটে।

## দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্য।

আমরা সেণ্ট জেম্‌স্ গেজেট পাঠে অবগত হইলাম—যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজাগণের সৈন্যগণের অবস্থা যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে দুই একটি করিয়া রেজিমেণ্ট রীতিমত ইংরাজি কৌশলে যুদ্ধ শিক্ষা পাইবে, ও মার্টিনি বন্দুক ব্যবহার করিতে পারিবে তাহার বন্দোবস্ত ত্বরায় হইবে। লর্ড ডফেরিনের আমলে বিশেষ যদি কোন ভাল কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে তাহা হইলে গোয়ালিয়ারের দুর্গ প্রত্যর্পণ।

গোয়ালিয়রের দুর্গ প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই দুর্গ প্রত্যর্পণের সহিত অন্যায় রূপে যে টাকার দাবি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক দূষণীয়। আমরা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সম্পাদককে এই অযথা ১৭ লক্ষ টাকার দাবির আন্দোলন জন্য হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। যাহা হউক গোয়ালিয়ার মহারাজার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে দুর্গ-প্রত্যর্পণের সহিত তিনি দুই সহস্র সৈন্য বৃদ্ধিরও ক্ষমতা পাইয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি কবে নিজামকে বেরারণ্ট প্রত্যর্পণ করা হইবে? ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেন এত দিন অবধি অঙ্গীকার পালনে

বিরত রহিয়াছেন? সত্য পালন রাজার ধর্ম্ম। সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে রাজার প্রতি প্রজার ভালবাসা হ্রাস হয় ও অবিশ্বাস জন্মে। আমরা তাই বলি সত্য পালন করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নিজ মান বজায় রাখিয়া প্রজার বিশ্বাস ও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

সেণ্ট জেমস্ গেজেট সম্পাদক বলেন যে দেশীয় রাজাদিগের সৈন্যগণকে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া উন্নত করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লাভ ভিন্ন কোন ক্ষতি নাই। আমরাও ত আজীবন তাহাই বলিয়া আসিতেছি; তবে কেন এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট জেমস্রে সম্পাদক বাঙ্গালি-বাবু ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্র সম্পাদকগণকে অযথা ও অন্যায়রূপে কটূক্তি করিয়াছেন? সম্পাদকের ভয় এই যে, বিদ্রোহী শিক্ষিত বাঙ্গালী পাছে ইংরাজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দেয়। সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত বাতুল। তাঁহার বাতুলের ন্যায় ডাক শুনিয়া মনে হয় যে বাতুলাশ্রমই তাঁহার উপযুক্ত স্থান। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের একটিও সৈন্য বৃদ্ধির আবশ্যক নাই—প্রজার ভালবাসা ও সন্তোষ লাভ করিলে ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হইবে। দেশীয় রাজাদিগকে অযথাপীড়ন না করিয়া ও অযথা সংশয় চিত্ত না দেখাইয়া তাঁহাদিগের নিষ্কর্ম্মা সৈন্য সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলে বিপদ ও সম্পদ উভয় কালেই বিশেষ সাহায্য হইবে। পলিটিক্যাল এজেণ্টদিগের অন্যায় আচরণ দেশীয় রাজাগণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পলিটিক্যাল এজেণ্টের পদগুলি উঠাইয়া দিলে দেশীয় রাজগণ ইংরাজদিগের দৃঢ় ও যথার্থ বন্ধু হইবে। বিপদকালে প্রাণদিয়া বন্ধুর সাহায্য করিবে। রুষ যুদ্ধের সময় তাহাদিগের রাজভক্তি ও বন্ধু ভক্তি দেখিয়া এমন কি তাঁহাদিগের চির শত্রু পায়ওনিয়র ও সিভিল মিনিটরি গেজেট পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিল। যদিও নীচমনা ইংরাজ সম্পাদকগণ আমাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া অভিবাদন করে, যদিও কোন কোন শাসনকর্ত্তারা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সংবাদ পত্র গুলিকে বিষনয়নে দেখেন কিন্তু আমরা যাহাই হই—নেমক হারাম নহি। আমরা বলি যদি ইংরেজের মিত্র কেহ এদেশে থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালিরাই বাস্তবিক তাঁহাদিগের মিত্র। যে ব্যক্তি বন্ধু বা অপরের দোষ না দেখাইয়া কেবল মিথ্যা তোষামোদ দ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখে আমাদের মতে তাহারা বিশ্বাস ঘাতক ও পরম শত্রু। আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া কেবল বন্ধুত্বের ও ভালবাসার পরিচয় দিই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার লক্ষিত হইত তাহার এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে। আমরা বারম্বার বলিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট চক্ষুউন্মিলন করিয়া প্রজাবর্গের দুঃখ ও শোচনীয় অবস্থা একবার হৃদয়ঙ্গম করুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ কেন এত চীৎকার করে।

## কাপ্তান হিয়ারসে ও সর এলফ্রেড লায়েল।

সিভিলিয়ান লেডমান ও হিয়ারসের

মকদ্দমা বোধ করি আমাদের পাঠক বর্গ মাত্রেই অবগত আছেন। লেডম্যান সাহেব যখন মুস্থরি পাহাড়ে ছোট আদালতের জজ্‌ছিলেন তখন তিনি দেশীয়দিগকে সর্ব্বদা স্থয়ার, বদমায়েস, মিথ্যাবাদী, হারাম্‌জাদা ইত্যাদি বলিতেন। এক দিন কাপ্তান হিয়ারসে আদালতে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে গুটিকয়েক জমিদারদিগকে লেডমান অযথা গালি দেওয়াতে কাপ্তেন হিয়ারসে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সংবাদ পত্রে প্রকৃত ঘটনা লিখিয়া পাঠান। লেডম্যান হিয়ারসেকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলায়, কাপ্তান, লেডম্যানকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া পত্র লেখেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া লেডম্যান হিয়ারসের নামে মানহানির দাবি দিয়া মুস্থরির জজের নিকট নালিস্ করেন। তৎপরে মকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিয়া আসে। বিচার কালীন প্রমাণীত হইল যে লেডম্যান যখন বুলন্দ সহরে ও ফতেপুরে ছিলেন তখনও মুস্থরির ন্যায় দেশীয়দিগকে গালি দিতেন ও অবমাননা করিতেন। হিয়ারসে বেকসুর খালাস হইলেন এবং লেডম্যান ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতি সার কোমার পিথরামের নিকট বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিলেন। প্রধান বিচারপতির এই তীব্রবাক্য সিভিলিয়ান গবর্ণর সার এলফ্রেড লায়েলের সহ্য হইল না। তিনি লেডম্যানকে নির্দ্দোষী স্থির করিয়া কোন প্রকার বিভাগীয় শাস্তি প্রদান না করিয়া, চিফজষ্টিসের রায়ের বিরুদ্ধে গোপনে তীব্রমত লিখিয়া আপন ভাই ব্রাদার সিভিলিয়ান বর্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কোন গতিকে সেই লেখা সিভিল ও মিলিটরি গেজেটে প্রকাশিত হইল। এখন কাপ্তান হিয়ারসে সর আলফ্রেডের নামে নালিস করিবেন স্থির করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। বাস্তবিক সিবিলিয়ানরা যেরূপ প্রতিদিন অত্যাচার ও গর্হিত কর্ম্ম করিয়া অনায়াসে পার পাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের সদ্বিচারের আশা ভরসা সকলই জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। দেশী ও ইংরাজের কোন ফৌজদারি মকদ্দমা হইলে, সিভিলিয়ান বিচারকের নিকট প্রায়ই দেশীয়লোক স্থবিচার পায় না। হাইকোর্টই কেবল আমাদের একমাত্র স্থবিচারের ভরসার স্থল। যদি সেই মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান জজ নিজ অপক্ষপাতী-বিচারে সিবিলিয়ান গবর্ণরের নিকট অবমানিত ও উপহাস্যাস্পদ হন এবং এই রূপে সিভিলিয়ান বিচারকগণ তাঁহাদের অবিচারের প্রশ্রয় পান তাহা হইলে বিচারের আশা আর কোথায় থাকিল? আমাদের মতে সার কোমার পিথরামের বাঙ্গলার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার বার্ণাস পিককের মত কার্য্য করা উচিত। পাটনার কমিসনর টেলর সাহেব একদা জজ দ্বারকা নাথের কোন বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলিস্‌ম্যানে দ্বারকানাথের উপর অযথা কটুক্তি করায় পিকক্ ওয়ারেণ্ট-জারি করিয়া কমিসনর টেলারকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করেন। অনন্যোপায় দেখিয়া টেলার বেচারা ক্ষমা প্রার্থনা

করিয়া পরিত্রাণ পায়। সার কোমারেরও উচিত যে তিনিও আদালতের মান হানির দাবি দিয়া সার অ্যালফ্রেডকে আদালতে হাজির করিয়া হাইকোর্টের মান বজায় রাখেন। সিভিলিয়ানগণ দিন দিন প্রশ্রয় পাইয়া আরও অত্যাচারী হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াও দেখিতেছেন না। দেশীয় সংবাদপত্রে কোন অবিচার বা অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইলে, দেশী পত্রগুলি অমনি বিদ্রোহী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সিভিলিয়ানদিগের গুণাগুণ নিরূপণ করিবার জন্য একটি কমিসন্ নিযুক্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# সোনার পাখী।

আমরা কয় ভাইয়ে একটি অরণ্যে বাস করিতাম, স্বচ্ছন্দে বনে বনে বেড়াইতাম; আমরা যেমন সুখে সচ্ছন্দে বেড়াইতাম বনের সোনার পাখীগুলিও সেইরূপ উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত; পাখীগুলিকে খাবার দিতাম তাহারা আমাদিগকে গান শুনাইত, বড় আনন্দে ছিলাম, ছাড়া পাখীর মধুর গান যে কি মধুর তাহা তোমরা বুঝিবে না।

চির দিন সুখে কাটে না—কতকগুলা ব্যাধ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিল। আমাদের সদানন্দ পাখীগুলির রক্ত খাইবার অভিলাষে ব্যাধ সকল নানা অস্ত্র প্রহারে পাখীগুলির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। জাল পাতিয়া ভাল ভাল খাবারের প্রলোভন দেখাইয়া পাখী ধরিতে লাগিল। দেখিলাম পাখীগুলি ব্যাধের প্রলোভনে ভুলিয়া তাহাদের জালে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে; অজ্ঞান পাখী প্রলোভনে ভুলিয়া যায়।

আমরাও একটি সোনার খাঁচা নিৰ্ম্মাণ করিলাম, সেই খাঁচায় পাখীভুলান ভাল ভাল খাবার রাখিয়া দিলাম, পাখীগুলি তখন আবার আমাদের খাঁচায় আরও ভাল ভাল খাবার দেখিয়া আমাদের খাঁচাতেই আসিত, ব্যাধের জালের দিকে বড় একটা যাইত না। আমরা কিন্তু খাঁচার দ্বার কখনও রুদ্ধ করিতাম না, খাঁচায় বদ্ধ পাখী মধুর গান গাইতে ভুলিয়া যায়।

এই রকমে কিছুকাল কাটে, ক্রমে এমনি সময় আসিল যে আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। সেই সময়, সময় বুঝিয়া ব্যাধেরা আমাদের খাঁচা অধিকৃত করিল; খাঁচার সহিত সোনার পাখী সকল ব্যাধের হাতে পড়িল, পাছে পাখীরা উড়িয়া যায় এই ভয়ে ব্যাধগুলা খাঁচার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং একটি একটি করিয়া পাখীগুলিকে মারিয়া তাহাদের রক্ত খাইতে লাগিল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে, দুই একজন ভাই-য়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; ঘুম ভাঙ্গিয়াই তাহাদের আদরের পাখীগুলির দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিতেছে। তাহাদের আর্ত্তনাদ আমার কানে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু চোখ হইতে পোড়া ঘুম আর ছাড়িতেছে না। ভাই, আমার চোখে একটু জল দেবে এস, নহিলে ঘুম যে ভাঙ্গে না।

স্ত্রীগণ আমাদের বনের পাখী; ইন্দ্রিয় পরবশ পাষণ্ডগণ ব্যাধ, ইহারা রমণীগণকে প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাদের রক্ত শোষণ করে, বিবাহ পদ্ধতি আমাদের সোনার খাঁচা। এই সোনার খাঁচা এখন ব্যাধের হাতে পড়িয়াছে, ভাই সকল, একবার জাগিয়া দেখ তোমাদের মনোহারিণী সচ্ছন্দ-বিহারিণী সুন্দরীগণের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!

আমার সূক্ষ্ম শরীর একটি সোনার পাখী, আমার দেহ সোনার খাঁচা, কামাদি রিপু সকল ব্যাধ। এই ব্যাধ সকল আমার দেহ অধিকার করিয়া আমার খাঁচার দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমার পাখী আর আমায় মধুর গান শোনায় না; ব্যাধ সকল উহাকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়াও আমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না কেন? বুঝিয়াছি—আমি যাহাকে ঘুম বলিতেছি ইহা ঘুম নহে—ইহা ঐ পাষণ্ডদের মোহিনীমায়া। তোমরা কে আছ আমার চক্ষে একটু জল দাও।

শ্রী—মুখোপাধ্যায়।

——(০)——

# আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?

লোকে করে যা আমি করি না<br>
লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না,<br>
পাঁচের মত নই হ'তে পারি না<br>
—পারিলাম (ও) না—<br>
এ ভূতলে!

আর যত সবে কত সুখে ধায়,<br>
কত আশা করে কত দিকে চায়,<br>
দুখ-শূলে বেঁধা— তবু সুখময়<br>
ভাবে সকলে।<br>
তারা জানে না পর-বেদনা,<br>
কভু ভাবে না— নিজ যাতনা<br>
হৃদি তাড়না— সহে বাসনা—<br>
কু-ছলে!

আমি হেরি যত চাহি যেবা পথ (ও)<br>
হেরি ছায়াময় সব মনোরথ (ও)<br>
যত আশা ব্রত কিছু মনোমত (ও)<br>
নহে ভূতলে।<br>
সবি দুখময় সদা জ্ঞান হয়,<br>
ভব সমুদয় যেন ঢাকা রয়<br>
ছেঁড়া—জরা আঁচলে!

যত খুঁজি আমি খুঁজি কতবার (ই),<br>
খুঁজে পাই কই— কিবা নরনারী,<br>
কিবা শিশু যুবা— কিবা সদাচারী,<br>
হেন নির্ম্মলে?<br>
নাহি ছায়া রেখা যার (ও) হিয়া' পারি,<br>
যারে হৃদি মাঝে পূরে পূজা করি,

হিয়া মুকুরেতে যারে দিলে ধরি
সদা উজলে!
কোথা পাই হেন ভব চরাচরে,
হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে
বিনি কোন (ও) ছলে!
সখা-সখা—বলি কত সাধে বলি
দিছি কতবার(ই) হিয়াতলে দলি,
শূন্য তবু প্রাণ জীর্ণ আশা কলি
তবু কপালে!

যত পরিবার (ও) সার (ও) জানি তার(ও),
ভাবে নিজ নিজ ভোর যেবা যার (ও),
আমি যে ভিকারী আশা ঝুলি সার (ও)
আজো—ভূতলে!
ভেবে ভেবে হিয়া হাসে মনে মনে
ভবে দেখে যত ভব-খেপা জনে,
পাচে কাঁদে খেলে মিশে ভবরণে,
আমি কাঁদি বনে অচলে।—
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে?

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

নকল ও আসল

# কৃষ্ণকালী।*

পাঠক! বিগত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের 'ভারতী'তে 'কৃষ্ণকালী' নামক যে প্রবন্ধ দেখিয়াছেন, তাহা 'বিদ্যারত্ন' মহাশয় নূতন 'জটাধারী' হইয়া নবসেবিত গঞ্জিকার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ সহ্য করিতে না পারায় সহসা তাঁহার নিজ লিখিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে গঞ্জিকাজাত অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই সকল দোষাদির ক্ষালনার্থই আজ আমরা আপনার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিদংশ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

প্রাগুক্ত 'নকল কৃষ্ণকালী'তে জটাধারী লিখিয়াছেন—"জ্ঞান ও সারবত্তা সম্বন্ধে ভারত ও ভাগবতের কৃষ্ণের অনেক সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু অনেকাংশে উভয়ের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়, এ পার্থক্যের বিশেষ কারণ আছে। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।" জটাধারী এ কারণ পরে দেখাইতে ভুলিয়াছেন। শুধু নকলের অনুরোধে "তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে" এই কথা কটি আসল "কৃষ্ণ-কালী" হইতে তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরে 'আসল' হইতে কারণটিই তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কারণটা নূতন না হইলেও, ভারতীর পাঠকের তাহা অজ্ঞাত থাকা

* গত আশ্বিন কার্ত্তিক সংখ্যক ভারতীতে 'শ্রীজটাধারী শর্ম্মা' স্বাক্ষরিত 'কৃষ্ণকালী' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এখন দেখা যাইতেছে মুকুলমালা নামক একটি লুপ্ত মাসিক পত্রের কৃষ্ণকালী হইতে তাহা সম্পূর্ণই প্রায় চুরী। চুঁচড়া নিবাসী 'শ্রী প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন' ওরফে জটাধারী শর্ম্মার ব্যবহারে আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছি। ভাং সং।

উচিত নহে। অতএব আসল 'কৃষ্ণ-কালী' হইতে কারণটা উঠাইয়া দিলাম।

"এ স্থলে ভারত ও ভাগবতের রচনা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ভারত সরল কবিতায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা মাত্র। বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন ভুলাইয়া ভারতকে ধর্ম্মে মতি দিবার প্রয়োজন হয় নাই; ভারতে সকলের মতিই তখন ধর্ম্মে আছে; সামান্য সৈনিক হইতে ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত, সামান্য কৃষিবল হইতে মহামতি ভীষ্ম পর্য্যন্ত, সকলেই তখন ধর্ম্ম ভয়ে ভীত; ধর্ম্ম তখনও উৎসন্ন যাইতে বসে নাই। কিন্তু তাহার পরই নানা কারণ বশতঃ ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটিল। এই সময়ে, আর্য্যগণ বিশেষ শিক্ষা সম্পন্ন ও মার্জ্জিত বুদ্ধি। এই সময়ে দর্শনের সমূহ সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, নানা স্থানে নানা দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছে। আর্য্যগণ এখন আর সামান্য নদ নদী বা ভৌতিক শক্তিসমূহের আধার স্বরূপ পৌরিণিক দেব দেবীগণের অর্চ্চনায় পরিতুষ্ট নহেন। মার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহারা এখন নদ নদী সমূহের উৎস, ও ভৌতিক শক্তি-প্রতিমূর্ত্তি দেব দেবীগণের মূল স্বরূপ এক মাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছেন। পরে এই একেশ্বর তত্ত্ব লইয়া ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়েই সাংখ্য, পাতঞ্জল, ও চার্ব্বাক আদি দর্শন, এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতের আবির্ভাব। সমাজে নানা মুনির নানা মত বিস্তারিত হইয়াছে। কে কাহার কথা শুনিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণ বশতঃই সাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে। বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্ম্মে আস্থা অসম্ভব, যদি কাহারও সেরূপ আস্থা থাকে, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত কষ্টপ্রসূত বা লোক দেখাইতে ছলনা মাত্র, এই সময়ে ভারতীয় গণের অধিকাংশ বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইলেন। পৌরাণিক বা বৈদিক ধর্ম্মে অল্পলোকেরই আস্থা রহিল; ফলতঃ, সনাতন ধর্ম্মের তখন সমূহ বিপদ। এই বিপন্ন অবস্থা হইতে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার হেতু ভাগবতকার কৃতসংকল্প হইলেন। এখন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা, দর্শনের বড় আদর, যাহাতে দর্শন নাই, তাহার আদরই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকার এই সময়ে কাব্য প্রনয়নে উদ্যুক্ত, সেই কাব্যে সমাজ সংস্করণ ও সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এমত সময়ে দর্শন ব্যতিরেকে কাব্যের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তই, কবি একাধারে কাব্য ও দর্শন সংস্থাপন করিলেন। কাব্য ও দর্শন একাধারে রূপক মিশ্রিত থাকায়, ভাগবতের ভাবার্থবোধ কিছু দুরূহ। দুরূহার্থ বোধক হইবার আরও কারণ আছে। সকল ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা প্রণালী স্বভাবতঃই সরল হইয়া থাকে। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি ও কালের গতির সহিত তাহা জটিল ও দুরূহার্থ বোধক হয়। কাব্যে এই নিয়ম আরো স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্থলে আমরা অধুনা প্রচলিত ইংরাজি ভাষার বিষয় দেখিলে কি দেখিতে পাই?

ইংরাজি ভাষা এক্ষণে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার ক্রমোন্নতির ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে, প্রাগুপ্ত নিয়মের সত্যতা বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে। ইংলণ্ডীয় প্রাচীন কবি কিদ্‌মন বা চসার হইতে সেক্সপিয়র, মিল্টন বা কাউলির রচনা প্রণালী কত বিভিন্ন ও তাঁহাদের কাব্য কত-দুরূহার্থ বোধক! তাহার পর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলির রচনার ভাব সমূহ অতি গূঢ়। এইরূপ আমাদের দেশীয় রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা প্রাঞ্জল, আবার মহাভারত, ভাগবত হইতে সরল ও সহজ বোধ্য।" মাননীয়া ভারতি-সম্পাদিকা এণ্টনির উল্লেখ করিয়া, জটাধারীর যে ভ্রম দর্শাইয়া দিয়াছেন, তাহা জটাধারীরই দোষের ফল। কেন না তিনি এস্থলে আসল কৃষ্ণ কালী হইতে কিছু বিভিন্ন করিতে গিয়াছিলেন। আসল 'কৃষ্ণ-কালী' পড়িলে কৃষ্ণের সহিত এণ্টনির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে না।* কৃষ্ণের সহিত বরং সিজরের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। সিজর ক্লিওপ্যাট্রার প্রণয়োপহার অগ্রাহ্য করিয়া স্বকার্য্য সাধনে নিরত হইয়া ছিলেন, এণ্টনির জীবনবৃত্ত দেখিলে এণ্টনিকে উন্নত চরিত্র মহাবীর বলিয়া মনে হয় না। আরও, ক্লিওপ্যাট্রার চরিত্রে ও সাংসারিক অবস্থায়, সাধারণতঃ বর্ণিতা রাধিকার জীবনে অনেক বিভিন্নতা আছে। প্রণয়োন্মাদটুকু ভিন্ন উভয়ের অন্য কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

জটাধারী লিখিয়াছেন "ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক ভাব ও রাধা কৃষ্ণের যুগলমিলনে যে সাংখ্যের ছায়া আছে তাহা বলা বাহুল্য।" বোধ হয়, জটাধারী মহাশয় সেস্থানটি ভাল বুঝেন নাই, বুঝিতে পারিলে শুধু "রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনে" সাংখ্যের ছায়া দেখিতেন না। বিচ্ছেদেও সেই ছায়া দেখিতে পাইতেন। কিম্বা প্রেমে যে মিলন ও বিচ্ছেদ দুইই ঘটে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনে সে জ্ঞানটা ঘটে নাই। যাহা হউক, কৃষ্ণকালী পড়িলে ভাগবতের কৃষ্ণ বা রাধিকা বা সখিগণ যে কি পদার্থ, পাঠকের তাহা অগ্রে হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। সেই জন্য আসল কৃষ্ণ-কালী হইতে নিম্ন লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত হইল।

"ভাগবত রচয়িতা একজন দার্শনিক ছিলেন, দর্শনের সাহায্যে তিনি কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার কাব্যস্থ দর্শনভাগ রূপকে আবৃত ও সাধারণ চক্ষে অলক্ষিত।

---

* কৃষ্ণের সহিত এণ্টনির সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য আশ্বিন কার্ত্তিকের কৃষ্ণকালীতে এণ্টনির উল্লেখ করা হয় নাই—কেবল একটা দৃষ্টান্তের জন্য সাধারণ ভাবে মাত্র তাঁহার নাম করা হয়। আসল কথা, বীর কিম্বা রাজ নীতিজ্ঞ হইলেই যে তাহার পক্ষে প্রেম বিহ্বলতা অস্বাভাবিক এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; বাস্তবিক যদি গ্ল্যাডষ্টোনকে একজন সামান্য রমণীর প্রেমে বিহ্বল হইতেই দেখা যাইত তবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কি ছিল? যুক্তির পক্ষে ইহা কোন যুক্তিই নহে, বরঞ্চ স্বাভাবিক জীবনে ইহার বিপরীতই দেখা যায়, রাজপুত বীরগণ যেমন বীরত্ব দেখাইয়াছেন তেমনি প্রেমিকতাও দেখাইয়াছেন। ভাঃ সং

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সাংখ্যকার ভাগবত রচয়িতার অগ্রবর্ত্তী। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ ও তদুভয়ের সংযোগ বিয়োগই ভাগবতের মূল মন্ত্র। ভাগবতকারের স্পষ্ট কৃষ্ণজীবনীর ব্রজ লীলা ভাগে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগ ভিন্ন আর কোন সদর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাধা কৃষ্ণের প্রেম প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ মাত্র। পাঠক স্মরণ রাখিবেন আমরা বলিলাম রাধা কৃষ্ণের "প্রেম" প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; তাঁহাদিগের মিলন—যে মিলনে জয়দেব আনন্দসরিতে ভাসিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের "বিচ্ছেদ," যে বিচ্ছেদে বিদ্যাপতির অন্তর কাঁদিয়াছে। এক্ষণে সাংখ্যকার মহাধীশক্তি সম্পন্ন কপিল প্রকৃতি পুরুষ আখ্যায় কি বুঝাইয়াছেন, পাঠকের তাহা বোধগম্য হওয়া উচিত।

কপিল এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, আত্মা ও জড় পদার্থ। সাংখ্যের মতে "অসঙ্গেয়পুরুষঃ" পুরুষ সঙ্গ রহিত, কাহারও সহিত মিলিত নহে। এই অবস্থায় আত্মা কোন দুঃখ ভোগ করেন না। কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই, তাহাকে দুঃখভার বহন করিতে হয়। আত্মা যতকাল দেহ বিচ্যুত থাকে, ততকাল তাহার দুঃখ নাই। দেহ পরিগ্রহ করিয়া মাতৃগর্ভ্ভ হইতে সংসারে পতিত হইয়াই যে ক্রন্দন করিয়াছে, যতদিন আত্মার এ দেহ বিচ্যুত না হইবে, 'ততদিন এ সংসারে আত্মার সেই ক্রন্দন আর থামিবে না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে ভাগবতের কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; প্রকৃত পুরুষের সংযোগ দুঃখের উৎপত্তি; এজন্যই ভাগবতকার প্রকৃতরূপা রাধিকাকে পরস্ত্রী করিয়াছেন ও পুরুষস্বরূপ কৃষ্ণকে পরস্ত্রীর অস্বাভাবিক ও অবিশুদ্ধ প্রণয়ের ভিখারী করিয়াছেন। এ অপবিত্র প্রণয়ের ফল কি? ফল, সদাই "হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি" আর কিছুই নয়। সর্ব্বদাই বিরহানল প্রজ্জ্বলিত, সদাই মনে ভয়, কখন কে প্রণয়ের কথা শুনে, মিলনেও সুখ নাই, মিলনেও ভয়, কখন জটিলা কুটিলা দেখে, কখন আয়ান জানিতে পারিবে; সুখেও সুখ নাই, এ প্রেম দুঃখের উৎস, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই দুঃখের উৎপত্তি। আবার রাধিকা কৃষ্ণের বংশীরবে বিমুগ্ধা ও আত্ম বিস্মৃতা। পুরুষ স্বরূপ কৃষ্ণের বংশীর অর্থ কি? বংশীর অর্থ মায়া। এই বংশীর রব শুনিয়াই প্রকৃতি আত্মার নিকট মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অধীন। মায়াবশেই দেহ' আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই মায়া বশতঃই জড়পিণ্ড দেহ আত্মার বিচ্ছেদ ভয়ে সদাই ভীত। এই মায়ার সুললিত গানে মুগ্ধ হইয়াই প্রকৃতি (দেহ) নয় জন সখীর সহিত (নয় ইন্দ্রিয়ের দ্বাররূপ নব নারী) আত্মার সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। পাঠক এক্ষণে ভাগবতকারের কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম ও কৃষ্ণের বংশী ধ্বনির অর্থ কি তাহা বোধ হয় বুঝিলেন। খৃষ্টিয়গণ চির দিন ঈশাকে মেষপালকের সহিত তুলনা করেন। ইহুদিরা অনেকেই মেষ পালন করিতেন, ইব্রাহিম, আইযাক,

ইস্রেল, সকলেই মেষপালক, ইহুদিরা মেষ-পালন ভাল বুঝিতেন, তাহা হইতে ঈশা, মেষপালক; আমাদের লোকেরা গো-পালন বুঝেন ভাল, সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ, গোপ। কৃষ্ণ এস্থলে পরম পুরুষ বা পর-মাত্মা। গো-পাল কৃষ্ণের বেণুরব না শুনিলে তৃণাদি ভক্ষণ না করিয়া উর্দ্ধ মুখে থাকিত, ও বেণুর সুললিত রব শুনিলে সুস্থ মনে চরিত। ইহার অর্থ, জীব মাত্রেই মায়ার বশীভূত। পরমাত্মার দ্বারা মায়া মুক্ত না হইলে, তাহারা আপন আপন পুষ্টি সাধনে আস্থা রাখে না।

এক্ষণে পাঠক দেখিলেন, ব্রজলীলা আত্মার ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এতদূর এক প্রকার আসিয়া জটাধারী পরিশেষে আপনার বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ? "ভাগব-তের কৃষ্ণ সাংখ্যের পুরুষ, তন্ত্রের কালী সাংখ্যের প্রকৃতি।" একথা বলায়, দেখা যাইতেছে যে, শর্ম্মাজী আসল 'কৃষ্ণ কালী প্রবন্ধটি কিছুই ঝুঝেন নাই। কালীকে প্রকৃতি বলা নিতান্ত অসঙ্গত। (তন্ত্রের আদ্যা শক্তির অর্থ 'আদি জীবনি শক্তি' অর্থাৎ আদি আত্মা,) যে আত্মা হইতে সমস্ত জীবাত্মা আংশিকরূপে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাকেই সাংখ্যকার পরম পুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভাগবত এই পরমাত্মাকে কৃষ্ণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

জটাধারীর কথায় আর একটী দোষ ঘটে। কৃষ্ণকালী প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া "কালীকে' প্রকৃতি বলায় শুদ্ধ লিঙ্গবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণ কালী হইয়াছেন শুনিলেই, মনে হয় রাধিকা সেই কালীকে পূজা করিতেছেন—তোমার চরণ পদ্মে রক্ত পদ্ম দিতেছে রাই কিশোরি"। এরূপ স্থলে তবে রাধিকাকে কি বলিব। জানি না শর্ম্মাজি ব্রজলীলার কিরূপ অর্থ কোথায় পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা ত রাধিকাকে প্রকৃতি বলিয়া জানি। যদি কালী প্রকৃতি হইলেন, তাহা হইলে দুইজন প্রকৃতি কি মাথা ঠোকাঠুকি করিবেন ?

জটাধারী মহাশয় নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়া সমস্ত গুলাইয়া দিলা, আবার নকল করিবার স্রোতে পড়িয়া পরেই পুনর্ব্বার লিখিতেছেনঃ—"পুরুষ আর মায়ার মোহনাক্ষ বীণাবাদনে তৎপর নহেন, তিনি মায়াবিচ্ছেদকারা ঘোর করবাল করে ধারণ করিয়া মায়ার প্রতিমূর্ত্তি নর নারী মুণ্ড চ্ছেদন করতঃ সুন্দর বনমালার পরি-বর্ত্তে ঐ সকল রক্তাক্ত অচিরচ্ছিন্ন মুণ্ডমালা গলদেশে দোলাইয়া বিশ্বসংসারকে স্তম্ভিত করিতেছে" অর্থাৎ পুরুষই কালী হইয়া-ছেন। কালী অর্থে প্রকৃতি হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইয়াছেন না কি ? সাংখ্যের মতে পুরুষ যাহা, তাহা পুরুষই থাকে; প্র-কৃতি প্রকৃতিই থাকে। একত্রে মিলিত হই-লেও তাহাদের "Chemical combination" হয় না, mixture ই থাকে, ইচ্ছাক্রমে বা প্রয়োজন হইলে উভয়ের পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। উভয়ের সম্পূর্ণ একত্ব নিতান্ত অসম্ভব।

এই ভ্রম টুকু সংশোধন জন্য এবং কৃষ্ণকালী প্রবন্ধটী সম্যক বোধগম্য করণার্থ আসল কৃষ্ণকালী হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত হইল "মুক্তাফল রচয়িতা ভাগবতের বংশীধারী সুললিত হাস্য-মুখ শান্তমূর্ত্তি কৃষ্ণকে, অসিধারিণী অট্টহাসিনী ভয়ঙ্করীরূপে সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেও ভাগবতকারের সেই রূপক মণ্ডিত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটে নাই। ভাগবতের কৃষ্ণ, সাংখ্যের পরম পুরুষ, তন্ত্রের করালবদনী কালী একই পদার্থ। তন্ত্রও সাংখ্যের ছায়া লইয়া বিরচিত। কৃষ্ণকালীর আয়ান ধর্ম্মজ্ঞান; জটিলা কুটিলা মানস ও বিবেক। অন্তঃকরণ ও বিবেক যখন ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মের সাহায্য জন্য ধর্ম্মজ্ঞান হইতে স্বাধীন থাকিয়া সংসার কাননের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করে, তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সমাগম এবং সংসারময় মায়ার মোহ দেখিতে পায়। এই দৃশ্যে মানস ও বিবেক মায়াময়ী প্রকৃতির প্রকৃতি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত বাস্তব চর্ম্ম চক্ষে যখন সংসার কাননের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করে, তখন ভিন্ন দৃশ্য তাহাদিগের নয়ন সম্মুখীন হয়। তখন মায়াময় মোহন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, ভয়ঙ্করী আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। যদি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ ও অন্তকারী কেহ থাকেন, ও তাঁহারা যদি একজন হন, এবং একাধারে যদি তাঁহাদের কোন মূর্ত্তি সংগঠন করিতে হয়, তাহা হইলে কালীর ন্যায় কোন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিই আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হয়। মানস ও বিবেক ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া সংসারের অন্তঃপ্রদেশ ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পায়, প্রকৃতি আর মায়ামুগ্ধা নহেন, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হইয়া সংসারের আদি কারণ মহাপুরুষের পূজায় বিরত্তা হইয়াছেন। পুরুষ আর মায়ার সম্মোহন অস্ত্র বীণাবাদনে প্রকৃতির মোহ সম্পাদনে নিযুক্ত নহেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি মায়া বিচ্ছেদকারী ঘোর করবাল করে ধারণ করিয়াছেন, ও তদ্বারা মায়ার আধার নরনারী মুণ্ডচ্ছেদন করতঃ সরলতাময় সুন্দর বন মালার পরিবর্ত্তে, ঐ সকল রক্তাক্ত অচিরছিন্ন মুণ্ডের মালা গলদেশে দোলাইয়াছেন!"

আমার লিখিত কৃষ্ণকালী প্রবন্ধের অপ্রকাশিত অংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। অবশিষ্ট অংশে তাহা বিশদ রূপে বুঝাইতে যত্নবান রহিলাম।

শ্রীঅনুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

# লোহার সিন্ধুক।

প্রথমা। "তার পর?

দ্বি। "নেহাত শুনবে? সে কিন্তু অনেক করে বারণ করে দিয়েছে।

প্র। "তা বারণ করলেই বা, আমার কাছে বলবি বইত নয়, আমি ত আর কাউকে বল্‌তে যাচ্ছিনে—"

দ্বি। "তা জানি বলেই ত তোকে বলছি—নইলে কি বলতুম—তা ভাই দেখিস যেন প্রকাশ না হয়—"

প্র। "মরণ—তুই কি ক্ষেপেছিস—আমার কাছে—"

দ্বি। "তবে শোন এই সে দিন—কিন্তু তাকে কড়ার টা দিলুম,—দেখিস—

প্র। "এমন ক্ষেপাও ত কোথায় দেখিনি আমাকে কথা বলতে ডরাস? এই সে দিন দীনুর মা আমাকে যে বল্লে তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল—সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি—আমার মত লোহার সিন্ধুক কাউকে পাবিনে—"

দ্বি। "তা সত্যি—তবে শোন—"

---

# পত্র।*

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—

স্থলচর বরেষু।

জলে বাসা বেঁধে ছিলেম,
ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে,
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে
কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে যে বাস করা দায়,
ভন্‌ভনানির বাজারে।
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে।
কোথায় পালাই—কোথায় পালাই—
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গা প্রাপ্তির আশা কোরে
গঙ্গা যাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে
আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে
এসে ছিলেম গান শুন্‌তে;
আপন মনে গুন্ গুনিয়ে
রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি,
ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি,
বিদ্যে খানা কাটিয়ে ফেলে
থাকে তারা তুল্যো ধুন্‌তে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে,
ভঙ্গী ক'রে বেঁকে বলে—

* নৌকা যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।

"আমার কথা শোন সবাই
গান শোন আর নাই শোন।
গান যে কা'কে বলে, সেইটে
বুঝিয়ে দেব, তাই শোন।"
টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন,
জেঁকে ওঠে বক্তিমে,
কে দেখে তাঁর হাত পা-নাড়া,
চক্ষু দুটোর রক্তিমে!
চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌চে মিছে
আকাশ খানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি
জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে
সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ,
হয়নাক তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্ না সবাই,
টপ্পা খেয়াল ধুরবোদ,—
গায় না যে কেউ—আসল কথা
নাইক কারো সুর বোধ!
কাগজ-ওয়ালা সারি সারি
নাড়চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙ্গলা থেকে শান্তি বিদায়
তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে!
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায়
বেকার যত ছেলেপিলে,—
কর্ণ ধ'রে পার করবেন
দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে
যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে
তাই উড়েচে এত ধুলো!

ক্ষুদে ক্ষুদে "আর্য্য" গুলো
ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা
কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমি কল্কি"
গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল
যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি!
পাড়ায় এমন কত আছে
কত কব' তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল
বরা' অবতার!
দাঁতের জোরে হিন্দু শাস্ত্র
তুল্‌বে তারা পাঁকের থেকে।
দাঁত কপাটি লাগে, তাদের
দাঁত খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে!
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা,
মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত
জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল।
বাক্য-বন্যা ফেনিয়ে আসে
ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোন ক্রমে রক্ষে পেলেম
মা-গঙ্গার ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা
কুলুকুলু তান!
সাগর পানে ব'হে নে যায়
গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি, দেয়
জলের গায়ে কাঁটা

আকাশেতে আলো আঁধার
খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি
পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিন হেলে দোলে
দেখে না ত কেউ!
পূর্ব্বতীরে তরু শিরে
অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে
সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খ ধ্বনি
ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যা তারা চেয়ে থাকে
ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে
চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যা দীপগুলি
অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি সলিলেতে
দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম
সুখে ছিলেম খুব!

জান ত ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই—
ভাসি দিন রাত!

রোদ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি,
হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে।
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই
তেমন তেমন লোক বুঝে!
গতিক মন্দ দেখ্‌লে আবার
ডুবি অগাধ জলে।
এম্‌নি করেই দিনটা কাটাই
লুকোচুরির ছলে!
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ
শুক্‌নো ডাঙ্গায় বসে?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে
টান মেরেচ কসে!
আমি তোমায় জলে টানি
তুমি ডাঙ্গায় টান'।
অটল হয়ে বসে আছ
হার ত নাহি মান'!
আমারি নয় হার হয়েচে
তোমারি শেষ জিৎ—
খাবি খাচ্চি ডাঙ্গায় পড়ে
হয়ে পড়েচি চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল,
ছিপ গুটিয়ে নাও—
রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েচে
ঢাক পিটিয়ে দাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হিন্দুশাস্ত্র, জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তার—"মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে উপদেশ" পাঠ করিয়া যেমন প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, এই পুস্তকখানি পড়িয়াও সেইরূপ প্রীত হইলাম। হিন্দু শাস্ত্রের যে সকল বিষয় লইয়া পুস্তকখানি রচিত—যেমন জ্ঞানকাণ্ডই বা কি, কর্ম্মকাণ্ডই বা কি—কাহাকে শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞান বলে, সাকার উপাসনাই বা কি, দেবতাই বা কাহাকে বলে—ইত্যাদি সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি হইতে বেশ স্পষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায়। এমন কি বেদান্তসূত্রের চারিজন ভাষ্যকার সঙ্কর স্বামী, রামানুজাচার্য্য, মধ্বস্বামী ও বল্লভাচার্য্যের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কুট ও গভীর মত গুলিও ইহাতে সংক্ষেপে অতি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করান হইয়াছে।

এক কথায় বইখানি বড়ভাল হইয়াছে, ইহার সংগ্রহও যেমন বহুল—অনুবাদও তেমনি সরল-পরিস্ফুট। তবে স্থানে স্থানে লেখকের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অমিল হইতেছে। যেমন তিনি যেস্থলে গীতা হইতে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার ফল কি—উদ্ধৃত করিতেছেন—সেইস্থলে নিজে নোটে বলিতেছেন—

অনেক দুর্ব্বলাধিকারী ভ্রাতার মুখে এরূ শুনিতে পাওয়া যায় যে—পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মুক্তিফল পাওয়া যায় বটে, কি পার্থিব কোন কামনা চরিতার্থ করিতে হইলে, ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কিন্তু ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মুক্তি ফলও যেরূপ লাভ হয়, পর্থিব কামনাদি অন্য পুরুষার্থ সকলও তদ্দ্বারা সেইরূপ লাভ করা যায়। যথা—

"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ।"

বে, সূ, ৩। ৪। ১।

বাদরায়ণ অর্থাৎ "ব্যাস বলিতেছেন যে, পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সকল প্রকার পুরুষার্থই সুসাধিত হইয়া থাকে।"

কিন্তু এখানে ব্যাস দেবের পুরুষার্থ অর্থে যে পার্থিব কামনাদি—তাহা লেখক কোথা হইতে পাইলেন? আমাদের ত এ অর্থ এখানে নেহাত অসঙ্গত মনে হয়; পার্থিব কামনা কি কখনও যথার্থ পুরুষার্থ নামে অভিহিত হইতে পারে? যখন পুরুষ যথার্থ পুরুষার্থ লাভ করে, তখন সে পার্থিব কামনার অতীত হয়। যথার্থ পুরুষার্থ কি? না আত্মজ্ঞান, যথার্থ পুরুষার্থ কি—না মনুষ্যত্ব—এখন আমরা মানুষ হইয়াও মানুষ যতদূর উন্নত অবস্থায় উঠিতে পারে সে অবস্থায় আসিতে পারি নাই, সেই উন্নত

অবস্থায় উঠাই—যথার্থ পুরুষার্থ লাভ করা ; সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মুক্তিও পুরুষার্থ উভয় লাভ হইবে ইহা সুনিশ্চয়। কিন্তু সে পুরুষার্থের অর্থ পার্থিব কামনাদি হইতেই পারে না, এ যেন লোভ দেখাইয়া ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করান। বাস্তবিক যাঁহারা পার্থিব কামনাসিদ্ধির জন্য উপাসনা করেন—ব্রহ্মের ভাব—উপাসনার ভাব তাঁহাদিগের হইতে অনেক দূরে। বুদ্ধিতে ত ইহার অযৌক্তিকতা স্পষ্টই দেখা যায়—কিন্তু বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া পরব্রহ্ম ও পার্থিব কামনা এই দুইটি কথা একত্র আনিতে হৃদয়েও কেমন আঘাত লাগে।

লেখক উপসংহারে প্রাচীন ভারতের উন্নতির কথা বলিয়া বলিতেছেন—"যাহা হউক একটি বিষয় অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা আপনারা এ প্রকার উন্নত হইয়াও দেশের সাধারণ লোকদিগের উন্নতির জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহারা সেই সমস্ত শূদ্রজাতীয়েরা যাহাতে কোন কালেও উন্নতিলাভ করিতে না পারে এরূপ কঠোর নিয়ম সকল প্রচার করিয়াছিলেন।" কিন্তু যে সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণ বিভেদ হয়, যে সময় ভারতের চূড়ান্ত উন্নতিকাল—তখন কি শূদ্র জাতির উন্নতিরোধক নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল? লেখক বর্ণবিভেদ পরিচ্ছেদেত দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে—শূদ্র ভাল কাজ করিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন—আর ব্রাহ্মণ মন্দ কাজ দ্বারা শূদ্র হইতেন।

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ

লেখক নানাস্থান হইতে এইরূপ সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুতরাং এইরূপ বর্ণবিভেদ নিয়মই ত শূদ্রকে শূদ্রত্ব হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি নিয়ম সাধারণের সৎকর্ম্মে উত্তেজক আর উন্নতির অনুকূল হইতে পারে? তবে শূদ্রের উন্নতির প্রতিরোধক যে সকল নিয়ম দেখা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ব্রাহ্মণ নামধারী অব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সন্দেহ নাই।

বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ। শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বাস্তবিক লেখক যাহা বলিয়াছেন—তাহা নিতান্ত সত্যকথা ; আমাদের দেশে কত সাধু কত জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—অথচ আমরা তাঁহাদের জীবন কিছুই জানি না। জীবন জানা ত দূরের কথা—এই পুস্তক খানি পড়িবার পূর্ব্বে আবিয়ার নামে যে এক জন জ্ঞানী মহিলা আমাদের দেশে জন্মেন, তাহা পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম না। অথচ আবিয়ার যে আমাদের দেশের কিরূপ ক্ষণজন্মা মহিলা তাহা পুস্তকের নিম্ন লিখিত বাক্যে বুঝা যাইবে—"কথিত আছে নবম খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে সাত জন চির স্মরণীয় মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন পুরুষ—অবশিষ্ট চারি জন তৎপ্রদেশস্থ চির গৌরবান্বিতা, বিদুষী স্ত্রীলোক। আবিয়ার এই অবলাকুলতিলকদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।"

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ঠিক তাঁহার জীবনী নহে, বরং ইহা তাঁহার মাতার সংক্ষেপ জীবনী বলা যাইতে পারে, তবে পুস্তক সন্নিবেশিত উপদেশ গুলি হইতে তাঁহার জ্ঞানবত্তা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপদেশ গুলি অতি উৎকৃষ্ট। বইখানি যিনি পড়িবেন তাঁরই ভাল লাগিবে—এই রূপ আমাদের বিশ্বাস।

# শঙ্করাচার্য্য।

## শঙ্করশিষ্যগণের জন্ম।

এই সময়ে শঙ্করের প্রধান প্রধান শিষ্যদিগেরও জন্ম হয়। বিমল নামে ব্রাহ্মণের গৃহে পদ্মপাদের জন্ম হইল, ইঁহারই অপর নাম সনন্দন। প্রভাকর নামে ব্রাহ্মণের গৃহে হস্তামলকের জন্ম হইল। উদঙ্ক, শিলাদ নামে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। সুরেশ্বর যাঁহার অপর নাম মণ্ডন-মিশ্র বা বিশ্বরূপ, তিনিও এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন আনন্দগিরি এবং চিদ্বিলাসেরও এই সময়েই জন্ম হয়। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন দেবাবতার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবতারত্ব কেবল সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রচলিত প্রণালী মাত্র। শঙ্করশিষ্যগণ কেহবা ব্রহ্মা কেহবা বিষ্ণুর অবতার; কেহবা বৃহস্পতি কেহবা বরুণ অথবা পবনের অবতার। এক স্থলে বলা হইতেছে আনন্দগিরি বৃহস্পতির অবতার, পর মুহূর্ত্তেই বলা হইতেছে, তিনি নন্দির অবতার। সরস্বতী দেবী, মণ্ডন পণ্ডিতের ভাবিপত্নী উভয়ভারতী হইয়া এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে অপরাপর দেবগণও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে বুঝি, দেবলোক, কিছুদিনের জন্য জনশূন্য—অথবা দেবশূন্য-অরণ্যে পরিণত হইয়া রহিল! বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের ন্যায় বুঝি দেবগণও সৃষ্টি ও পালন কার্য্য হইতে কিছুদিনের অবকাশ গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ অবতারত্বের মূলে এইমাত্র সত্য রহিয়াছে যে, কি সাধু, কি অসাধু, যাহা কিছু শক্তি সকলই ঈশ্বরের; এতদ্ভিন্ন অর্থে ইহা কেবল বাক্যালঙ্কার মাত্র। শাস্ত্রকারগণ এই অর্থেই বেদবিরোধী বুদ্ধদেবকে, বিষ্ণুর অবতার, এবং ধর্ম্ম-নিন্দুক দেহাত্মবাদী চর্ব্বাককে বৃহস্পতির অবতার বলিয়া উল্লেখ করেন। বলিতে পার, যদি তাহাই হইবে, তবে সকলের মধ্যেই ত এক ঐশী শক্তি কার্য্য করিতেছে, তোমায় আমায় কেন অবতার বলা যায় না? যদিও আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার বল নাই, তথাপি সকলকে বলবান্ বলা যায় না। সেই রূপ যাহাদের মধ্যে ঐশীশক্তি অসাধারণ ভাবে কার্য্য করে, তাহাদিগকেই অবতার বলা যায়। শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে একই আখ্যায়িকা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। একই ব্যক্তিই স্থলভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অবতার বলিয়া উল্লিখিত হয়। গল্পচ্ছলে ভিন্ন এরূপ করা সম্ভব হয় না। সরস্বতীর অবতারের গল্প এ স্থলে যেরূপ আছে, হর্ষচরিতেও অবিকল সেইরূপই আছে। সেই একই গল্প যাঁহারই যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তিনিই অবাধে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। গল্পটি এই:—পুরাকালে ঋষিগণ ব্রহ্মার নি-

কটে বেদপাঠ করিতেছিলেন। ক্রোধের আবেগে মুখে কথা বাধে। পড়িবার সময়ে কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসার মুখে কথা ঠেকিয়াছিল। তরলমতি বালিকা সরস্বতী শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বাসা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, নেত্রদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রুকুটিসহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে দু-দু-দুর্ব্বিনয়ে তু-তু-তুমি যাইয়া ভূ-ভূ-ভূতলে জ-জ-জন্ম গ্রহণ কর।" শাপগ্রস্ত হইয়া সরস্বতী ভয়ে জড় সড় হইলেন; দুর্ব্বাসার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন;—অপরাপর মুনিগণও বালিকার কাতরতা দেখিয়া স্নেহবশে দুর্ব্বাসাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। "হে ভগবন্, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর; পিতা কি সন্তানের অপরাধ গ্রাহ্য করে?" ঋষি প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের সময় অবধারণ করিয়া দিলেন।" "মর্ত্ত্য লোকে তুমি শঙ্করের দর্শন লাভ করিলে পর, পুনরায় দেবলোকে ফিরিয়া আসিবে।" হর্ষচরিতেও গল্পটি প্রায় অবিকল এইরূপ। অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা সামগান করিতে করিতে মন্দপাল-ঋষির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে এক স্থানে বাক্যস্খলন হইয়াছিল, শুনিয়া সরস্বতী হাসিয়া উঠিলেন। দুর্ব্বাসা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অভিশাপ করিলেন, যে তিনি যাইয়া মর্ত্ত্যলোকে গ্রহণ করেন, এবং একটী সন্তান হওয়ার কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। উভয় আখ্যায়িকাই কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে, প্রয়োজন ভেদে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সে সকল গল্প কথা যাহাই হউক, বোধ হয় উভয়ভারতীরই নামান্তর সরস্বতী ছিল; অথবা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া ডাকিত। উভয়ভারতী অল্প বয়সেই বিবিধগুণ-জ্ঞানে বিভূষিতা হইলেন। বিদ্যা সকল যেন স্বস্ব বাস ভূমির ন্যায় স্বভাবতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করিল। অথবা বিধাতা যাহার জীবনে যাহা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন, কে তাহা পরিহার করিতে সক্ষম? সাংখ্য পাতঞ্জল, বৈশিষিক ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র সকল, বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং সমস্ত কাব্য শাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত হইল। তাঁহার এইরূপ অলোক সামান্য বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল।

এদিকে মণ্ডন অথবা বিশ্বরূপও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অপর নাম সুরেশ্বর। বিশ্বরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য, তাঁহারও শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। উভয়ভারতী ও বিশ্বরূপ দুজনেই পরস্পরের গুণের কথা শুনিতেছিলেন। শুনিয়া দুজনেরই পরস্পর দর্শনের ইচ্ছা হইল। ক্রমে উভয়েরই মন সে জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। অবশেষে প্রণয়ী যুবকযুবতীর যাহা হয় তাঁহাদেরও তাহাই হইল। পরস্পরের শুভ দর্শন চিন্তা

করিতে করিতে নিদ্রা হইত। এবং স্বপ্নে পরস্পর দর্শন ও আলাপ হইত। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে,তাঁহারা আবার সেই সুনিদ্রার আহ্বান করিতেন। জাগিয়া থাকিলে সর্ব্বদা মন চঞ্চল ও কাতর হইত। দর্শনের ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু লজ্জায় কাহাকেও বলিতে পারেন না। কি করেন! মনাগুণে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ের আহার বিহারে বিরাগ জন্মিয়া, শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

কত কালই বা আর জ্বলন্ত বহ্নি যাপ্য ভাবে থাকিবে। বিশ্বরূপের প্রতি তাঁহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা একদা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাছা, তোমার শরার ক্ষীণ হইতেছে মনেরও আর সেরূপ তেজ নাই; কিন্তু কোন শারীরিক রোগ, অথবা ইহার অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। ইষ্টবিয়োগ অথবা অনিষ্টযোগে লোকের দুঃখ হয়, কিন্তু অনেক ভাবিয়াও, তোমার সম্বন্ধে সেরূপ কিছু দেখিতেছি না, অথচ বিনা কারণে কার্য্য হয় না। বিবাহের সময়ও তোমার অতীত হয় নাই, কেহ তোমার অবমাননা করিয়াছে এমনও নয়, দরিদ্রতার কষ্টও তোমার হইতে পারে না। দুর্ব্বহ কুটুম্বভার আমাকেই বহন করিতে হয়। বৎস, কৌমার বয়সে তোমার এরূপ কষ্টের কি কারণ হইতে পারে? মূর্খ বলিয়া যে দুঃখ, তাহাও তোমার নাই, কোন বিচারেও পরাজিত হও নাই; আজন্ম সৎকর্ম্মই করিয়াছ, স্বপ্নেও দুষ্কর্ম্ম কর নাই,অতএব পরলোকে নরকভয়ও তোমার নাই; তবে কেন তোমার মুখ ছবি দিন দিন ম্লান হইতেছে? এদিকে বিষ্ণুমিত্রও দিন দিন কন্যার মুখকান্তি, গ্রীষ্ম কালের সরোবরের ন্যায় শুকাইতে দেখিয়া, বার বার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বহু অনুরোধের পর উভয়েই স্ব স্ব মনের কথা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বরূপ বলিতে লাগিলেন:—"মনের কথা তোমাদিগকে বলা যাইতে পারে কি না, ইহা ভাবিলেও লজ্জা হয়। শোননদীর তীরে, বিষ্ণুমিত্র নাম একজন ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহার একটি কন্যা আছে; অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগের মুখে সেই কন্যার গুণের কথা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার রূপ ও বিদ্যার কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আমার তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ হইয়াছে।" পুত্রের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, হিমমিত্র অবিলম্বে সেই কন্যার উদ্দেশে দুই জন সুচতুর ঘটকব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহারা অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিষ্ণুমিত্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে উভয়-ভারতীও স্বীয় পিতার নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—রাজস্থানে বিশ্বরূপ নামে একজন ব্রাহ্মণ কুমার আছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তাঁহার পদসেবা করিবার জন্য আমার মনে সর্ব্বদা অভিলাষ হইতেছে; হে তাত, পার যদি তুমি আমার এই কার্য্যে সাহায্য কর।" হিমমিত্র-প্রেরিত ব্রাহ্মণদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে পর, বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের আগ-

মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—"বিশ্বরূপের পিতা, তাহার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। বিদ্যা, বয়স, চরিত্র, এবং কুল বিষয়ে তোমার কন্যা তাঁহার পুত্রের তুল্য জানিয়া তিনি তোমার কন্যা যাজ্ঞা করিতেছেন। এই রত্নদ্বয় মিলিত হইয়া পরস্পরের শোভা বর্দ্ধন করুক।" "হে বিপ্রগণ, তোমাদের প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে, কিন্তু একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। কন্যা প্রদানাদি বধুদিগের সম্মতিতেই হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পরে, কন্যার কষ্ট হইলে, বড় যন্ত্রণা সহিতে হয়"। এই বলিয়া বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যার নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রে কি করিব বল, তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া রাজস্থান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। ভাবিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, বল, আর যেন কথা ফিরাইতে না হয়।"

"দূর-দেশ। বিদ্যা, বয়স, কুল বা বিত্ত বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, অথবা এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র এবং সদ্বংশজ দেখিয়া কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

"হে অনঘে, যিনি দুর্জ্জয় বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বিশ্বরূপ সেই ভট্টপাদেরই শিষ্য। পাত্রের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব? ব্রাহ্মণের বিদ্যাই ধন, অপর ধন আবার কি? তাহাই ধন, যাহা সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে, তাহাই ধন, যাহার যশ দিগন্ত প্রসারিত হয়; তাহাই ধন, যাহা রাজা, চোর, অথবা কুলটা নারী হরণ করিতে পারে না। হে সুভগে, দিবা রাত্র যে ধনের রক্ষার জন্য ভাবিতে হয়, যাহা ব্যয় করিলে আর থাকে না, তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ। সর্ব্বত্র ধনবানের ভয়। পরন্তু, বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিতে নাই। অথবা, আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া, চল কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহার বর কে হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া উভয়ে কন্যাসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার নিকটে মনোগত কথা ব্যক্ত করিলেন। "হে, সুতনু, বিশ্বরূপের বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান জন্য তাহার পিতা দুই জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছেন, এখন আমাদের কি করিতে হইবে, বল।" এই কথা শুনিবামাত্র আনন্দে তাহার শরীর পুলকিত হইল; তাহাই তাহার পিতামাতার প্রশ্নের উত্তর হইল। বিষ্ণুমিত্র ব্রাহ্মণদিগকে আপন সম্মতি জানাইলেন। গণিতশাস্ত্রজ্ঞা উভয়ভারতী অন্তঃপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন, আজ হইতে চতুর্দ্দশ দিবসে শুভ যামিত্র লগ্ন হইবে। ব্রাহ্মণগণ, কন্যা পক্ষ হইতে অপর একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা হিমমিত্রের আলয়ে পহুছিয়া কার্য্য সিদ্ধি জ্ঞাপন করিলেন। কন্যা পক্ষীয় ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্ত-স্থিত পত্র প্রদান করিলে পর, হিমমিত্র তাহা পাঠ করিয়া সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে মহামূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বরূপকে সেই শুভ সংবাদ দিবার জন্য, পিতা

একজন ব্রাহ্মণকে শিখাইয়া দিলেন। শুনিয়া বিশ্বরূপের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিবাহের পূর্ব্ব কার্য্য সকল আরম্ভ হইল।

অনন্তর শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়া, বিশ্বরূপ শোন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া, স্বয়ং আসিয়া বহু বাদ্যসহকারে বরকে গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে আসন ও পাদুকা প্রদান করিলেন। বরকে অর্ঘ্য এবং বহুমূল্য পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিয়া তিনি কোমল বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আমি, আমার এই কন্যা,সকলেই তোমার, গো, ধন সমস্তই তোমার। অদ্য আমাদের কুল পবিত্র হইল। বিবাহ উদ্দেশে তোমার দর্শন লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম, নতুবা কোথায় তুমি, পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য, আর কোথায় আমি।" পরে, বর-পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্, এই গৃহে যাহা কিছু তোমার ভাল লাগে, সমস্তই তোমার হইল।" হিমমিত্র উত্তর করিলেন—"যাহা কিছু তোমার, সকলই আমার।" এইরূপে, তাঁহারা পরস্পরের মধুর আলাপে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। আত্মীয় পরিজন সকলই আহ্লাদসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এদিকে বর-কন্যা পরস্পরের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ রূপলাবণ্যে আর অলঙ্কারের প্রয়োজন রহিল না। তথাপি যেন করিতে হয় বলিয়াই কোন ভূষা করিতে লাগিলেন। গণকেরা জানিয়াও লগ্নের কথা উভয় ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তাহার উপদেশে বিবাহের মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বাদ্যের রোলে দিগ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। কন্যা ও বরের পিতা উপহার দ্বারা পরিজনদিগকে তোষণ করিতে লাগিলেন। বর, বিধি পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপিত করিয়া, তাহাতে হোম করিলেন; এবং বধূ লাজাহুতি প্রদান করিয়া ধূমগ্রহণ করিলেন। পরিশেষে বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। হোম শেষ হইলে পর সমাগত বন্ধু বান্ধবেরা চলিয়া গেলেন, এবং বিশ্বরূপ দীক্ষা ধারণ পূর্ব্বক বধূসহ—অগ্নিগৃহে চারিদিন বাস করিলেন।

বরের ফিরিয়া যাইবার সময় হইল। কন্যার মাতাপিতা তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন—"মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর; এই কন্যা নিতান্ত শিশু, কিছুই জানে না; এখনও বালকদের সঙ্গে মাটি লইয়া খেলা করিয়া থাকে, ক্ষুধায় কাতর হইলে গৃহে ফিরিয়া আইসে। এই আমাদের একমাত্র কন্যা, আজও গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করা হয় নাই। নিজের কন্যার ন্যায় তাহাকে সর্ব্বদা যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। দেখিও ইহার প্রতি মৃদুবাক্য ব্যবহার করিও; কটু কথায় কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবে না; এ কন্যা ক্রুদ্ধ হইলে কিছুই করে না। স্বভাবতঃই কেহ কেহ মৃদু বাক্যের বশ, কেহ বা কটু বাক্যের বশ, নিজের প্রকৃতি কেহই এড়াইতে পারে না। এই কন্যা আমাদের বড় আদরের পাত্রী। এক দিন একজন বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আসিয়া কন্যার লক্ষণ সকল দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন "ইনি যদিও

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয় কোন দেবতা হইবেন, তোমরা কদাপি ইহার প্রতি কোন কটূক্তি প্রয়োগ করিও না। ইহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বের সম্পূর্ণ লক্ষণ সকল রহিয়াছে, ইনি এক দিন বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের মধ্যস্থ হইবেন।” কন্যার শ্বাশুড়ীকে আমাদের হইয়া এই কথা বলিবে এই কন্যা এখন তোমার হাতে সমর্পিত হইল, অল্পে অল্পে গৃহ কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। তরলমতি শিশু কতই না অপরাধ করে, গৃহিণীর পক্ষে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত হয় না। আমরা সকলেই প্রথমে বুদ্ধি পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছি, পরে অল্পে অল্পে প্রবীন হইয়াছি। আমাদের সাধ্য নাই, যে নিজে যাইয়া, তোমার মাকে সব কথা বুঝাইয়া বলি। নিজের সংসার বাস ফেলিয়া, যাইতে পারি না। তথাপি আত্মীয়ের দ্বারাও এমন করিয়া বলা যায়, যাহাতে সাক্ষাৎ বলার ফল হয়।”

অনন্তর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন “বৎসে! আজ হইতে এক নূতন অবস্থায় প্রবেশ করিলে, যাহাতে গৌরবের সহিত সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পার, তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবে। বালকের ন্যায় আর ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে লোকে হাসিবে। তোমার বাল্যব্যবহার আমরা যেমন ভাল বাসিয়াছি, অপরে আর সেরূপ করিবে না। বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতাই কন্যার কর্ত্তা, বিবাহের পর পতি একমাত্র কর্ত্তা, অতএব অনন্যমনে তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা হইলে ইহপরলোকে ধন্যা হইবে। পতির আহার না হইলে আহার করিবে না। স্বামীর স্নানের পূর্ব্বে স্নান করিবে, কিন্তু তাঁহার আহারের পূর্ব্বে আহার করিবে না; এ বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠাদিগের আচরণ অনুসরণ করিবে। স্বামীর ক্রোধ হইলে, তুমি ক্রোধ করিয়া কোন কথা বলিবে না, সমস্ত ক্ষমা করিবে, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাহার ক্রোধের নির্ব্বাণ হইবে। হে বৎস, ক্ষমাতে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্বামীর সাক্ষাতেও, এমন কি তাঁহার মুখপানে চাহিয়াও, অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না; গোপনে করিবে না, সে আর কি বলিব? সন্দেহই স্বামিস্ত্রীর ভালবাসা নষ্ট করে। বৎসে, স্বামী যখন স্থানান্তর হইতে বাড়ি আসিবেন, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে পাদোদক প্রদান করিবে, এবং তাঁহার ইচ্ছামত সেবা করিবে। স্বামীর সুখে জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে, যদি গৃহে কোন সাধুর আগমন হয়, তাঁহার যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিবে, নতুবা তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে, তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। পিতার ন্যায় শ্বশুরের আদেশ পালন করিবে, সহোদরের ন্যায় দেবরেরও কথা শুনিবে; তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, দম্পতির মধ্যে যতই স্নেহ থাকুক, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইবে।” এই সকল উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং বন্ধুবর্গ হইতে নানা প্রকারে সমাদর লাভ করিয়া, বর কন্যা রাজস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

# মেস্‌মেরিজম্‌।

বা

## শক্তিচালনা।

তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনা, শক্তিচালনা দ্বারা পাত্রের স্থানবিশেষে অসাড়তা ;—

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনায় যেমন শরীর-অতীত মানসিকশক্তির একটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনা হইতে তেমনি মানুষের শরীর নিক্ষিপ্ত পূর্ব্বোল্লেখিত আকর্ষণ-আভার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত সমিতি ফ্রেড ওয়েলস্‌, হ্যারি ম্যানসন, এবং আরো অনেককে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পাত্রের কোন রূপ মোহ উৎপাদন না করিয়া তাহার দিব্য স্বাভাবিক অবস্থাতে ইচ্ছাকারী তাহার শরীরের কোন একটি অংশে হস্তচালনা বা হস্তের আঘাত দ্বারা সেই স্থানটী এমন অসাড় করিয়া দিতে পারেন যে তখন কাটিয়া, পুড়াইয়া এমন কি বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারাও সেস্থানটীতে সাড় করান যায় না।

এইখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত তোলা যাউক।

চোখ বন্ধ, ফ্রেড টেবিলের কাছে বসিয়া টেবিলের উপর দুই হাত ছড়াইয়া দিল, তার হাতের উপর হইতে মুখ পর্য্যন্ত আ-বার একটা এমন আড়াল দেওয়া হইল যে সে আড়ালের ও পারে তাহার আঙ্গুল লইয়া যাহা হইতেছে সে যেন কোন মতেই তাহা দেখিতে না পায়। কেন না শক্তি-চালিত আঙ্গুল তাহার চোখে পড়িলে বিশ্বাসের বলে সে সেই আঙ্গুলে অসাড়তা অনুভব করিতে পারে। এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া তখন এক-জন ফ্রেডের বিস্তারিত দশ আঙ্গুলের মধ্যে দুইটি আঙ্গুল্‌ স্মিথকে নীরবে দেখাইয়া দিলেন। স্মিথ আড়ালের দিকে দাঁড়াইয়া এত ধীরে ধীরে—এতটা সতর্কতার সহিত—সেই আঙ্গুল দুইটি হইতে এত তফাতে নিজের আঙ্গুল রাখিয়া হস্তচালনা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার হাতের বাতাস পর্য্যন্ত পাত্রের অ-নুভব করিবার সম্ভাবনা রহিল না। অন্ততঃ এই সমিতির তত্বাবধারকগণ—যাঁহাদের হাত ফ্রেড অপেক্ষা অনেকাংশে কোমল, তাঁহা-দের আঙ্গুলের উপর স্মিথ ঠিক সেইরূপ হস্তচালনা করায় তাঁহারা কিছুই অনুভব ক-রিতে পারেন নাই। কেবল ইহাই নহে, ইহার উপর আবার তাঁহাদের একজন স্মিথের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক স্মিথের অনুকরণে ফ্রেডের অন্য দুইটা আঙ্গুলের উপর দিয়া হস্তচালনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে আঙ্গুলে কিছুই হইলনা, অথচ দুই এক মিনিটের মধ্যেই স্মি-থের হস্তচালিত ফ্রেডের দুইটী আঙ্গুল

একেবারে এমন অসাড় হইয়া পড়িল, যে তাঁহারা সজোরে অনেকবার তাহাতে খোঁচা বসাইয়াও তাহার সাড় করিতে পারিলেন না। এতটা জোরে তাঁহারা খোঁচা মারিয়াছিলেন যে যত বড় স্থূলচর্ম্মী হউক না কেন সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না, এমন কি অতজোরে মারিতে তাঁহাদের নিজেরই বিশেষ রূপ মনের জোর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহাতেও কিছু হইল না—তখন দেশলাই জ্বালাইয়া সেই আঙ্গুলে দিয়া দেখিলেন, তাহাতেও ফ্রেড কিছুই সাড় পাইল না। অথচ এই একই সময় অন্য আঙ্গুলে একটু পিন ফুটাইতে না ফুটাইতে সে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। পরে সেই অসাড় স্থানে তাঁহারা ব্যাটারি বসাইয়াও সাড় করাইতে পারেন নাই।

কি জানি যদি স্বভাবতঃই কোন কারণে সেই অংশ তাহার পূর্ব্ব হইতেই অসাড় হয় তাহা দেখিবার জন্য পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহাতে তাঁহার খোঁচা দিয়া দেখিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেক বারেই এরূপ স্থলে পাত্র ব্যথা অনুভব করিয়াছে। একবার ফ্রেডের এইরূপ আঙ্গুল অসাড় করিয়া তাহাতে ১১। ১২ বার বেটারি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বেটারীর পূর্ণ প্রবাহিত বৈদ্যুতিক আঘাতেও ১০ বার ফ্রেড সেই অসাড় স্থানে কিছুমাত্র সাড় বোধ করিল না; ১১ র বারের বার সে অল্প অল্প যেন সাড় পাইল।

কিন্তু এইরূপ সময় আর একরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা গেল। পঞ্চম বারের বার যখন তাহার আঙ্গুলে পূর্ণ প্রবাহে তাড়িৎশক্তি অর্পিত হইল সে বলিল সে তাহার অন্য হাতে অল্প অল্প সাড় পাইতেছে। যখন তার বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুলে ও কড়ে আঙ্গুলে বেটারী লাগান হইল—সে সেই হাতের বুড় আঙ্গুলে একটু একটু সাড় পাইতে লাগিল। অন্য তিন বার অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে সেই হাতের চেটোয়, আর একবার অন্য হাতের চেটোয়, আর একবার দুই হাতের চেটোয়—সে সেই প্রবাহ অনুভব করিল।

শেষ চার বার ইচ্ছা-কর্ত্তা আর হস্তচালনা না করিয়া, ফ্রেডের আঙ্গুলের অভিমুখী করিয়া দুই ইঞ্চ তফাতে আপনার আঙ্গুল রাখিয়া দিলেন, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইল। অত তফাৎ হইতে স্মিথের আঙ্গুলের সামান্য উষ্ণতাটুকুও যে ফ্রেডের হাতের মত স্থূলচর্ম্ম দ্বারা অনুভূত হইবে ইহা একরূপ অসম্ভব।

এখানে ভাব প্রবলতা বা স্নায়ু উত্তেজনাজনিত বুদ্ধি বিবেচনায় অভাবত কিছুমাত্র দেখা যাইতেছেনা। তবে যদি কেহ বলেন, হস্ত চালকের হাতের বাতাসের গতি, কিম্বা তাঁহার এই হস্ত চালনার দ্বারা বাতাসে যে উষ্ণতার পরিবর্ত্তন জন্মিয়াছে—তাহা হইতেই পাত্রের অজ্ঞাত ভাবে তাহার হস্তের সেই বিশেষ স্থানটির স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া এইরূপ অসাড়তা উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে অন্য একজন যে তাহার অন্য দুইটী আঙ্গুলে সেই একই সঙ্গে হস্ত চালনা করিতেছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ হইত। দ্বিতীয়—যখন ইচ্ছাকারী হস্ত-

চালনা না করিয়া কেবল স্থির ভাবে পাত্রের আঙ্গুলের কাছে আঙ্গুল রাখিয়াছিলেন তখনও একথা খাটে না।

আর হাইডেনহেন যাহা বলেন—তাহার সহিতও ইহার মিল নাই, তাঁহার মতে ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ুর অনবরত অনুভবশীল-উত্তেজনা দ্বারা মস্তিষ্কের সমগ্র বুদ্ধি বিবেচনার স্থান অসাড় হওয়া চাই, কিন্তু এখানে পাত্র কোনরূপ উত্তেজনাই অনুভব করিতেছ না এবং তাহার জ্ঞানও পূর্ণ টনটনে আছে।

আমরা আগে অন্য দুই শ্রেণীর যে ঘটনা দেখিয়াছি তাহা পাত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় ঘটিয়াছে—কিন্তু পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতেও যখন শক্তি চালনার প্রমাণ পাওয়া গেল—তখন ইহার বিরুদ্ধে আর কি যুক্তি আছে? উক্ত সমিতি বলিতেছেন, অনেক এমন দৃষ্টান্তে পাওয়া গিয়াছে—যেখানে পাত্র পূর্ণস্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া এবং হস্তচালনা বা দৃষ্টি প্রয়োগ ইত্যাদির অধীন না হইয়াও ইচ্ছাকারীর অদম্য ইচ্ছার বলে, কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ পাইয়াছেন যে এক জন আত্মীয়ের স্বতঃ উৎসারিত গভীর বাসনার বল বিদেশস্থিত আত্মীয়ের উপর কার্য্য করিয়াছে।

শরীর নিক্ষিপ্ত উক্ত আভা যদিও জীবিত-শরীর হইতে নির্গত হইতেছে তথাপি ইহাকে জড় পদার্থের উপর কার্য্য করিতেও দেখা গিয়াছে। উক্ত সমিতি দেখিয়াছেন ইচ্ছাকর্ত্তা কোন দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দিলে কিম্বা তাহার উপর হস্ত চালনা করিলে অন্য সহস্র জিনিসের মধ্য হইতে তাহা ইচ্ছাধীন বাছিয়া লইয়াছে।

মানসিক শক্তির বিনা সাহায্যে—কেবল এই আভা দ্বারা উক্তরূপ ঘটনা সাধিত হয় কি না—তাহাও উক্ত সমিতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা হয় না। যদি অসাড়তা উৎপাদন করিতে মানসিক শক্তির কোন প্রয়োজন না থাকিত, শরীর-নির্গত আভার সংসর্গেই তাহা সাধিত হইত, তবে কিছু আর ইচ্ছাকারীর জানিবার আবশ্যক থাকিত না, তিনি কোন আঙ্গুলে শক্তি চালনা করিতেছেন, তাহা হইলে ইচ্ছাকারী অন্য দিকে মন রাখিয়া কেবল মাত্র পাত্রের হাত ধরিয়া থাকিলেই সেই ফল হইবার কথা। কিন্তু সেরূপ পরীক্ষায় কোন ফল হইল না। এদিকে আবার বিনা হস্ত-চালনায়—কিম্বা কোন রূপ শারীরিক সংশ্রবে না আসিয়া, কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাও স্থির পাত্রের কোন স্থানে অসাড়তা উৎপাদন করিতে পারেন নাই। (তবে মনের শক্তি দ্বারা মনের উপর কার্য্য করিতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।) এই শ্রেণীর ঘটনার দ্বারা শরীরস্থ আকর্ষণ-আভা এবং মানসিক শক্তি এই উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এই ত উক্ত সমিতির পরীক্ষায় যেরূপ মেসমেরিজম-ঘটনা ঘটিয়াছে, আমরা সকল গুলিরই কিছু কিছু নমুনা দেখাইলাম, ইহাতে কি মানসিক শক্তির পূর্ণ প্রমাণ

পাওয়া যাইতেছে না ? দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনারত কথাই নাই, এমন কি প্রথম শ্রেণার ঘটনার মধ্যে যদিও আমরা ভ্রান্তিময় মোহময় অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা রহিত কার্য্য পূর্ণ মাত্রায় দেখিয়া আসিলাম, তথাপি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে—কেবল ভাবপ্রবলতা বা প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া দ্বারা উহারও রহস্য ভেদ করা যায় না, তাহারও মূলে আরো কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ উক্ত দুই কারণই যদি স্বাপ্নিকতা ঘটনার একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে ব্রেডের প্রণালী অবলম্বনেই উক্ত সমিতি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি তাঁহারা শক্তিচালনা দ্বারা যেমন ফল পাইয়াছেন—ব্রেডের প্রণালী অবলম্বনে—কেবল পাত্রকে চকচকে জিনিসের প্রতি তাকাইয়া রাখিয়া সেরূপ ফল পান নাই। প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রকার ঘটনার সহিত যদি ইচ্ছাশক্তির কিছু যোগ না থাকিত তাহা হইলে এরূপ হইত না। ইহা হইতে বরং এই মনে হয় যে, ব্রেড যে উক্ত প্রণালী অনুসারে অতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—তাহার কারণ তিনি অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেন। স্বভাবতঃ তাঁহার ইচ্ছার এতই প্রভাব ছিল যে তাঁহার নিকটে লোকে অতি সহজেই মোহিত হইয়া পড়িত। অন্ততঃ ইচ্ছাশক্তি-নিপুণ ব্যক্তিগণ ত অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। আর চারিদিক দেখিয়া আমাদেরও ত এইরূপ মনে হয়।

তাহার পর আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে একই ব্যক্তিকে একজন অতি শীঘ্র মেসমেরাইজ করিতে পারেন, আর অপর একজন অনেক চেষ্টাতেও তাহা পারেন না।

যদি মোহিষ্ণু ব্যক্তির স্নায়ু বিশেষ-প্রণালীতে অস্বাভাবিক অবস্থাগত করা লইয়াই বিষয় হইত, তাহা হইলে যে সে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেই মোহিষ্ণু ব্যক্তির মোহ ঘটিত তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার তারতম্যের কোনই অর্থ থাকিত না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্থলবিশেষে এই ক্ষমতার প্রাচুর্য্য—স্থলবিশেষে অভাব দেখা যায় কেন ?

হাইডেনহাইন এ সম্বন্ধে কিছুই যুক্তিকর কারণ দেখাইতে পারেন নাই। *

---

* উক্ত সমিতি বলেন Nothing in Heidenhains's treatment of the subject is more unsatisfactory than his attempt to account for the existing defferences in the power of producing the result by differences of temperature, moisture, and style of movement, in the several operator's hands. All that is needed according to his own theory is gentle monotonous stimulation. The number of hands in the world whose moisture, temperature, and style of movement, are or can be made, such as to allow of this sort of stimulation, are clearly innumerable; and the fact of wholly exceptional operative powers is thus left quite unexplained.

তৃতীয়, ক্রেডের দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে, কখনো কখনো তাহাকে একটা কাজ করিতে বলা হইয়াছে—কিন্তু কোন মতেই তাহার করিতে ইচ্ছা নাই, অবশেষে কে যেন তাহাকে জোর করিয়া সেই কাজ করাইল, যেমন আগুণে কোট ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদি। এখানে ত বুদ্ধি বিবেচনার অভাব দেখা যাইতেছে না, সুতরাং ইহা কলের পুতুলের মত কার্য্য বলি কি করিয়া! অনেক সময় যখন ক্রেডের চোখ বন্ধ করা হইয়াছে—তখন তাহার পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে—সে চোখ খুলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে অথচ পারিতেছে না, সুতরাং এখানেও বুদ্ধির অভাব দেখা যাইতেছে না।

এ সম্বন্ধে উক্ত সমিতি বলিতেছেন যে শক্তি চালনা প্রদর্শনের—সাধারণ অভিনয় স্থলে—যেখানে তেমন খুঁটিনাটি করিয়া পরীক্ষা চলে না, সেখানেও এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যাহার কারণ ভাব প্রবলতা—বা প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া জনিত অজ্ঞাত অনুকরণ হইতে পারে না। যেমন অনেক সময় অভিনয়স্থলে কোন দর্শক বালককে বলা হয়—তুমি সভারিনটি কুড়াইতে পার ত তোমার হইবে। বালকটি তাহা কুড়াইতে বশেষ চেষ্টা করে—চেষ্টা করিতে করিতে সে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠে, অথচ তাহার যে, সে কথায় বিশ্বাস হইতেছে না, তাহার কুড়াইতে একটুও ইচ্ছা করিতেছে না, বরঞ্চ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুড়াইতে হইতেছে বলিয়া তাহার অত্যন্ত রাগ হইতেছে—তাহা তাহার মুখে প্রকাশ পায়। ইহা হইতে কি মনে করা যায় যে বালকের সমস্ত সময়টা বুদ্ধি অসাড় হইয়া গিয়াছিল? সে বুঝিয়াও যে আপনাকে অধীনে রাখিতে পারিতেছে না, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছে—তাহাকে দেখিলে আর তাহাতে সন্দেহ থাকে না।”

চতুর্থ, যে ব্যক্তি যাহাকে মুগ্ধ করে, কিম্বা অজ্ঞান করে সেই ব্যক্তি মাত্র—তাহার সে মোহ—সে অজ্ঞানতা ভাঙ্গাইতে পারে, অন্যে পারে না কেন?

একবার একজনকে মেসমেরাইজ করা হইলে যখন মনে হইল তিনি নিদ্রিত—তখন পরীক্ষকগণ তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া অন্য পাত্রদিগকে লইয়া পড়িলেন। খানিক পরে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া দেখিলেন—তাঁহার শরীর একেবারে অবশ—ইচ্ছাকারী যখন তাঁহার অসাড়তা ভাঙ্গিয়া দিলেন তখনই তাঁহার সে অবস্থা ঘুচিল। আর একবার মিশ স্মিথ (পূর্ব্বোল্লিখিত স্মিথের ভগিনী) ডাক্তার মায়ার্স ও মিষ্টার পডমোরের সাক্ষাতে তাঁহাদের একজন বন্ধুর উপর শক্তি চালিত করেন, এবং তাঁহাকে অজ্ঞান ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধেই নানা কথা কহিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু তিনি সব কথা শুনিতে পাইয়াও তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন, পরে যখন মিস্ স্মিথ বিপরীত দিকে হস্ত চালিত করিয়া তাঁহার সে অবস্থা দূর করিলেন—তখন তিনি সে কথা বলিতে পারিলেন।

কেহ বলিতে পারেন—ইহাও পূর্ব্ব গঠিত বিশ্বাস—কিম্বা ভাব প্রবলতা-প্রসূত।

ইচ্ছাকারী ছাড়া আর কেহ তাহার উপর প্রভাব খাটাইতে পারিবেনা, আগে হইতে এইরূপ বিশ্বাস থাকে বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে যে তাহা হইতেই পারে না। এখানে আমরা একটি দৃষ্টান্ত উঠাইয়া দিই।

এক দিন একজনের বাড়ী সন্ধ্যানিমন্ত্রণ ছিল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আমোদচ্ছলে আহারের পর আপনারা পরস্পরকে মেসমেরাজই করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা মেসমেরিজম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না। এইরূপ খেলা করিতে করিতে একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির হস্ত চালনায় একটি ছাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কেহই তাহাতে কিছুই মনে করিলেন না, খানিক পরে সেকথা সকলে ভুলিয়া গেলেন, যাঁর হাতে ছাত্রটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তিনিও একটু পরে বাড়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে ছাত্রটির পিতামাতা বাড়ী যাইবার সময় তাহাকে জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই পারিলেন না, ছাত্রটি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল—তাঁহারা যতই তাহাকে উঠাইবার জন্য বিরক্ত করিতে লাগিলেন—ততই আরো খারাব হইতে লাগিল। তাঁহারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া পর দিন আবার সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি আসিয়া তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু এই হেঙ্গামে ছাত্রটি এক হপ্তা ধরিয়া অসুস্থতা ভোগ করিল। শক্তি চালনার প্রমাণ ছাড়া ইহাতে আর একটি এই পাওয়া যাইতেছে যে, একজনের উপর ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তি বা আকর্ষণ আভা অর্পিত হইলে, তাহা প্রতিদ্বন্দীরূপে কার্য্য করে। অনেক সময় এইরূপ কারণে মোহিষ্ণু ব্যক্তির বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে*। এই ত প্রথম শ্রেণীর ঘটনা, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়া এবং ভাব প্রবলতার পূর্ণ আয়ত্তাধীন মনে হয়, বিশেষ দৃষ্টিতে তাহাই কেমন বিপরীতে সাক্ষ্য প্রদান করে।

তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনায়—ইচ্ছাকারীর নীরব ইচ্ছাপালন—তাঁহার মনের কথা বলা, তাঁহার সহিত একই রূপ অনুভূতি লাভ করা—ইত্যাদি ঘটনায় ভাব প্রাবল্য—বা স্নায়ু প্রণালীর প্রত্যাবর্ত্তিত ক্রিয়াজনিত অজ্ঞাত অনুকরণ বা অজ্ঞাত আজ্ঞা পালন, ইহার কোন সিদ্ধান্তই খাটি-

* মেসমারের এই আকর্ষণ আভার আবিষ্কার সম্বন্ধে এইরূপ গল্প আছে, যে একবার একজন রোগার শরীর হইতে রক্ত নির্গমন কালে তিনি দেখিলেন—তিনি রোগীর কাছাকাছি আসিলে আর রোগীর কাছ হইতে দূরে চলিয়া গেলে এই রক্ত উচ্ছাসের বিষম ন্যূনাধিক্য হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া তিনি বারম্বার পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন—যে মানুষ তাহার চারি দিকে একরূপ আকর্ষণ আভা নিক্ষেপ করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন লৌহ খণ্ড যেমন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের আকর্ষণ শক্তি ধারণ করে—মানুষেও তদ্রূপ সেই শক্তির পরিমাণের তারতম্য আছে। এবং এই আকর্ষণ আভার পরিমাণ তাঁহাতে অধিক আছে বলিয়াই উক্ত ঘটনাটি সাধিত হইয়াছে।

তেছে না, কেননা কথা বা ইঙ্গিত যেখানে নাই, সেখানে ভাবও জন্মাইতে পারা যায় না, বা তাহাকে কলের পুতুলের মত কার্য্যও করান যাইতে পারে না।

তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনাতেও যে উক্ত কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে পাঠকগণ দেখিয়াছেন। সুতরাং চারি দিক হইতেই দেখা যাইতেছে যে প্রত্যাবর্ত্তিত. ক্রিয়া বা ভাবপ্রবলতা স্বাপ্নিকতার প্রকৃত এবং সমগ্র কারণ নহে, আংশিক কারণ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্নায়ু উত্তেজনা এইরূপ মোহ ঘটাইবার একটি উপযোগী অবস্থা, এবং অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিই ইহার মূল কারণ তাহা অবশ্যই স্বাকার করিতে হইবে।

এই সমিতির একজন সভ্য ডাক্তার মায়ার্স এই শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এখানে তাহার স্থূল-অনুবাদ করিয়া আমরা প্রবন্ধটি শেষ করি। তিনি বলেন—"অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি শক্তি চালনা এবং দিব্য দৃষ্টি, ঘটনাদি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে এই যে জ্ঞানবান শক্তি—আত্মা—তাহা যে কেবল ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে এমন নহে, তাহা ইন্দ্রিয়ের অগম্যরূপে কার্য্য করিতে পারে, এবং ইহা রোগ, যন্ত্রণাদির অতীতরূপে নিজের স্বাধীন নিজত্ব প্রকাশ করিতে পারে, স্থূল পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এবং স্থূল পদার্থের সহিত ইহার যোগ যেন কেবল একটা দৈব ঘটনা মাত্র (Passing accident) এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারে"।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

---

# মাংসাদ উদ্ভিদ।

## ( দ্বিতীয় প্রস্তাব। )

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে মাংসাশী উদ্ভিদের একটিমাত্র উদাহরণ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আরো দুইচারিটির কথা বলিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সাহসী হইতেছি। মনে হয়, পাঠকেরা আমিষ-ভোজী উদ্ভিদের ব্যবহার দর্শনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইবেন।

সূর্য্য শিশির ছাড়িয়া এই মেলের মধ্যে আরও অনেকগুলি মাংসাশী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মক্ষিকাপাশ (Vemis's fly trap) একটি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় মক্ষিকাপাশ Dionœa muscipula নামে পরিচিত। ইহা উত্তর কারোলিনার পূর্ব্বাংশেই কেবল পাওয়া যায়। সূর্য্য শিশিরের ন্যায় ইহাও জল ভূমিতে উৎপন্ন হয়। (ওয়ে-

বেষ্টারে কিম্বা কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রচলিত পাঠ্য উদ্ভিদ বিষয়ক ইংরাজী পুস্তকে ইহার ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে।) ইহার পাতাগুলি মূল হইতে উঠিয়া থাকে। কাণ্ড আদবে নাই বলিলেই হয়। পত্র দুই ভাগে বিভক্ত; কিনারা খাঁজ কাটা কাটা। ইঁন্দুর ধরা জাঁতিকল পাতা দেখিলে মক্ষিকাপাশের পত্র গঠন কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। মুষিক পড়িলে জাঁতিকলের দুটিভাগ যেমন খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বদ্ধ হয়, মক্ষিকাপাশে পোকা মাকড় পড়িলে বিভক্ত পত্রের অংশদ্বয়ের কার্য্যও ঠিক সেইরূপ হয়। পত্রের প্রত্যেক অংশের উপরিভাগে তিনটি সূক্ষ্ম শুয়া ত্রিভুজের মত উত্থিত হয়। এই শুয়াগুলি সুধীরে একবার মাত্র স্পর্শ করিলেই পত্রটি তৎক্ষণাৎ ইন্দুর কলের মতন পড়িয়া যায়, অর্থাৎ বদ্ধ হইয়া পড়ে। সূর্য্য শিশিরের ন্যায় মক্ষিকাপাশের কার্য্য অল্পে অল্পে সম্পাদিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, সূর্য্যশিশিরের শুঁয়ার শিশির বিন্দু এক প্রকার নির্যাসের মতন; মক্ষিকা বা পতঙ্গ বসিলে সহজে উঠিতে পারে না। আটার দ্বারা বিজড়িত হইয়া থাকে। সুতরাং পত্র ক্রমে ক্রমে কুঞ্চিত হইলেও শীকার্য্য বস্তুর পলায়ন সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু মক্ষিকাপাশের শুঁয়াতে তেমন কোন নির্যাস থাকে না। উহা সূর্য্যশিশিরের শুঁয়ার ন্যায় কেবল তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি বিশিষ্ট। এই জন্য মক্ষিকা বা পতঙ্গের সূক্ষ্মতম চরণ বা ক্ষীণতম পক্ষ সংযুক্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ জাঁতিকলের মতন পড়িয়া যাইয়া শীকারকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সে বিষম কারাগার হইতে হতভাগ্য কীটের পলায়ন করিবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। আবদ্ধ কীট নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে পত্র দন্তের সম্মিলন পথের সূক্ষ্মতম ছিদ্র দ্বার দিয়া টানিয়া টুনিয়া পলায়ন করিতে পারে। কখন কখন কেহ কেহ পাতা কাটিয়া পলাইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটে না। কেননা পোকা মাকড়ের মৃদুতম সংঘর্ষণে পত্র খাঁজে খাঁজে বদ্ধ হইয়াই নিহিত কীটকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে। এবং পত্রের দুটি অংশ এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয় যে, বলপূর্ব্বক স্বতন্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার বেগে শব্দের সহিত বদ্ধ হয়।

শুঁয়ার কার্য্য সম্বন্ধে সূর্য্যশিশির ও মক্ষিকাপাশের ভিন্নতা এই যে, মক্ষিকাপাশ বারেক মৃদুতম স্পর্শনেই কার্য্য আরম্ভ করে, সূর্য্যশিশির সামান্যতম কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিকতর কাল স্থায়ী সংস্পর্শনে কার্য্যকারী হয়। মৃদুভাবে ক্ষণকাল ধরিয়া স্পর্শ কর মক্ষিকাপাশ কুঞ্চিত হইবে না; কিন্তু একবার মৃদুভাবে ছুঁইলেই পত্র কার্য্যারম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এক টুকরা চুল, যাহার দশমাংশের ভারমাত্র সংস্পৃষ্ট হইয়া সূর্য্যশিশিরকে কুঞ্চিত করিতে পারে, যদি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে মক্ষিকাপাশের শুঁয়ার উপর রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পত্র অকুঞ্চিতই থাকে। কিন্তু আবার যদি এক ইঞ্চ পরিমিত কেশ ভার দ্বারা একবার

মাত্র স্পৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ বিভক্ত অংশ পত্রদ্বয় পরস্পরের দিকে আনত হইবে।

মক্ষিকাপাশের পত্র যদিও সূর্য্যশিশির পত্রাপেক্ষা অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই মুদ্রিত হয়, তথাপি পুনঃ প্রসারণের সময় মক্ষিকাপাশ পত্র অনেক বিলম্ব করিয়া থাকে। কোন কীট পতঙ্গ না ধরিয়া অপর কোন প্রকারে একবার মুদ্রিত হইলেও পুনর্ব্বার প্রসারিত হইতে ৩৮ ঘণ্টা লাগে। একটি ছোট গোছের পোকা লইয়া পত্র বদ্ধ হইলে ৮।১০ দিবসের কম তাহা পুনরুন্মুক্ত হয় না। সাধারণতঃ, একটি পত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসহ একবার মুদ্রিত হইয়া আর পুনঃ প্রসারিত হয় না; ক্রমে শুকাইয়া যায়। সতেজ পত্র স্বদেশে দুই তিনবার মুদ্রিত ও প্রসারিত হয় এরূপ উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রিট নাম্নী জনৈক বিদুষী আমেরিকান রমণী বলেন মক্ষিকাপাশপত্র তৃতীয়বার মক্ষিকা বা পতঙ্গ পরিপাক কালে পরিশ্রান্ত ও হীন বীর্য্য হইয়া মরিয়া যায়।

মক্ষিকাপাশের পত্রের উপরিভাগ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আরক্তিম কোষে পূর্ণ। ইহাদেরি পরিপাক ও শোষণ ক্ষমতা আছে। ক্ষারদ পদার্থ সহ সংস্পৃষ্ট না হইলে কোষ বা গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হয় না। সূর্য্য শিশির যে কোন দ্রব্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই রস নিঃসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু মক্ষিকাপাশ তাহা করে না। যদি উহা কাষ্ঠ, প্রস্তর, শৈবাল বা কাগজের টুকরা সহ মুদ্রিত হয়, পুনঃপ্রসারিত হইলে দেখা যায় উহারা শুষ্কই রহিয়াছে। কিন্তু যদি এক টুকরা আমমাংস শুঁয়াতে না ছুয়াইয়া অমনি পত্রের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোষগুলি প্রবল রূপে রস নিঃসরণ করিতে থাকে। কেননা মাংস ক্ষারদ সামগ্রী, এবং ক্ষার সমক্ষেই কোষ গুলি কার্য্যশীল হয়, আর এরূপ স্থলে পত্রের পুনঃপ্রসারণও অনেক বিলম্বে সাধিত হয়।

সূর্য্য শিশির, মক্ষিকাপাশ ভিন্ন এই মেলের (Order) আরো একটি উল্লেখ যোগ্য গাছড়া আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Aldrovanda Visiculsosa. চলিত কথায় ইহাকে কি বলে আমরা জানিনা। পাঠকদিগের নিকট ইহার বৈজ্ঞানিক নামেই অর্থাৎ আল্‌দ্রবন্ধ, বলিয়াই উল্লেখ করি। এই আল্‌দ্রবন্ধ দেখিতে অনেকটা মক্ষিকাপাশের ন্যায়। তবে উহাপেক্ষা আকারে অনেক ছোট এবং সম্পূর্ণরূপেই জলজ। ইহার শিকড় আদবে হয় না। স্রোতবিহীন জলে নিজেই ভাসিয়া বেড়ায়। পাতাগুলি মক্ষিকাপাশেরি ন্যায় দ্বিভক্ত। ছুঁইলেই দুমুড়িয়া যায়। সময়ে সময়ে পাতার গায়ে বুদবুদ সংলগ্ন থাকে। পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন ইহারি জন্য গাছড়াগুলি জলের উপর ভাসিতে পারে। বুদবুদগুলি যেন ছোট ছোট শূন্য-গর্ভ কলসীর মতন জলের উপর ভাসিয়া পাতাগুলিকে ভাসাইতেছে। এস্থলে আমরা একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। আমাদের পানফলের গাছের পাতার গায়ে এমনি ফাঁপা ছোট ছোট ঠুলি থাকে, যে পানফল গাছ নিরেট ভারী ফলগুলি লইয়াও জলের উপরে

ভাসিয়া বেড়ায়। কলমির ডাঁটাগুলি ফাঁপা বলিয়াই উহা জলের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে যাহারা কেবল জলের উপরি ভাগেই জন্মায় যাহাদের শিকড় মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা প্রায় সকলেই এমনি একটি না একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবোল্লিখিত আল্‌দ্রবন্ধ সম্বন্ধে উক্ত বুদবুদগুলির ক্রিয়া ওরূপ নয়। ষ্টাইন সাহেব প্রথমে আল্‌দ্রবন্ধের পত্রের উত্যক্ততা পরিদর্শন করিয়া উক্ত বুদবুদের প্রকৃতকার্য্য নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে অধ্যাপক কোন্ (Cohn) বর্দ্ধিষ্ণু আল্‌দ্রবন্ধাভ্যন্তরে পোকামাকড় গেঁড়িগুগ্‌লির মৃতাবশেষ দেখিতে পাইয়া ষ্টাইনের অনুমান সমর্থন করেন। আল্‌দ্রবন্ধ পৃথিবীর অনেক দূর ব্যাপিয়া বাস করে। কিন্তু যেখানে জন্মায় তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে না। অষ্ট্রেলিয়া, য়ুরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতির স্থানে স্থানে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু যেখানে হয় সেখানে হয়ত দুটি চারিটি গাছ এক সঙ্গে; তারপর দু-হাজার পাঁচ-হাজার ক্রোশ অন্বেষণ করিলেও আল্‌দ্রবন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সমুদয় ফ্রান্সের মধ্যে দুটি স্থানে কেবল এ গাছড়া পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ভিদ জগতে ইহা একটি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ। ইহার সম্বন্ধে ভালরূপে জানিতে ও বুঝিতে অনেক অবশিষ্ট আছে। ইহার পত্রকার্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করা হয় যে, ইহা সূর্য্যশিশিরের ন্যায় কতক পরিমাণে অম্লরস নিঃসরণ করিয়া জীবন্ত পোকামাকড় বা ক্ষার সম্বলিত পদার্থকে হজম করে; কতক পরিমাণে অপরাপর পচাদ উদ্ভিদের মতন পচাইয়া গলিত পদার্থ শোষণ করে।

সূর্য্যশিশির, মক্ষিকাপাশ ও আল্‌দ্রবন্ধ ব্যতীত এই মেলের আরো অনেকগুলি মাংসাদ উদ্ভিদ আছে। অনেকেরই হয়ত একটু না একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু সে সবগুলির উল্লেখ না করিয়া অন্য দু-একটি মেলের দু একটি উদাহরণ পাঠকদিগকে এইখানে উপহার দিই। এই সব মেলের উদ্ভিদগুলি কতক পরিমাণে মাংসাদ কিন্তু ইহাদের কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য গঠন সম্বন্ধীয় উদ্ভাবন অত্যাশ্চর্য্য। Butterwort familyতে (ইহারা অনেকটা আমাদের পানফলের মেল) Pinguicula Vulgaris নামে এক প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায়। ইহারা পার্ব্বত্য জলাদেশে জন্মগ্রহণ করে। পত্রগুলি ১ ইঞ্চি ১॥ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্রোপরি কোষবিশিষ্ট কেশ বা শুঁয়া থাকে। শুঁয়াগুলি অত্যন্ত চটচট্যা রস নিঃসরণ করিতে পারে। এই রসেই অনেক ছোট ছোট পতঙ্গকে বিজড়িত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। পত্রের প্রান্ত অপেক্ষাকৃত স্থূল হইলেও নির্যাসবদ্ধ পতঙ্গের দিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া থাকে; সূর্য্যশিশিরের ন্যায় ইহাদেরও রস ক্ষারপ্রদায়ী জীবন্ত পদার্থ সংযোগে অম্লাক্ত হয়। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের পত্রের পুনঃপ্রসারণ অতি সত্বরেই হইয়া থাকে। সচরাচর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিমীলিত

পত্র পুনরুন্মীলিত হয়। ইহা দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন যে পত্র গুটাইবার ঈদৃশ শক্তি উদ্ভাবনের হয়ত আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। দুটি উদ্দেশ্য অনুমান করা হয়। একটি,—পত্র এই ভাবে কুঞ্চিত হইয়া নির্যাসবদ্ধ কীটোপরি এক প্রকার প্রণালীবৎ হয়। এই প্রণালী দিয়াই বৃষ্টি হইলে, জল গড়াইবার সময় বিজড়িত কীটের মৃতাবশেষ প্রধৌত হইয়া যায়। এবং পত্র-পৃষ্ঠ অনর্থক ভার হইতে অব্যাহতি পায়। আমরা এই অনুমানটির প্রকৃত যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিলাম না। পত্র গুটাইয়া প্রণালীবৎ না হইলে মৃতাবশেষ প্রধৌত হইবার কেন যে সুবিধা হইবে না, বুঝিতে পারি না। আবার, পত্র একবার মুদ্রিত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পুনঃ প্রসারিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত না হইতেও পারে। যদি বৃষ্টি জল দ্বারাই মৃতাবশেষকে পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ওরূপ কুঞ্চন-শক্তির উদ্ভাবনের কোন আবশ্যকতা নাই। কুঞ্চিতাবস্থাপেক্ষা প্রসারণকালেই ওরূপে পরিষ্কৃত হইবার প্রশস্ত ও সহজ উপায়। আর যে একটি উদ্দেশ্য অনুমান করা হয়, তাহাই আমাদের বিবেচনায় সংগত মনে হয়। এই অনুমানে বলা হয় যে পাতা ধীরে ধীরে গুটাইতে গুটাইতে প্রান্ত সংলগ্ন কীটকে পত্রের মধ্যস্থলে ঠেলিয়া লইয়া যায়। কীট মধ্যস্থলে নীত হইলে কৈন্দ্রিক কোষনিচয় হইতে প্রভূত পরিমাণে অম্ল নির্গত হইয়া কীটকে সহজে পচাইতে পারে। পণ্ডিতেরা যিনি যাহাই অনুমান করুন, সূর্য্য শিশিরের ন্যায় ইহাও যে জান্তব বা ক্ষারদ পদার্থ সংযোগে কুঞ্চিত হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আর উহার ঈদৃশ কুঞ্চন শক্তির মূলে যে উহার শরীর সাধনোপযোগী কোন মঙ্গলপ্রদ বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত—ইহা আমাদের স্থির ধারণা।

Utricularia orderএর অনেকেই মৃত্তিকার উপরে কিম্বা নিম্নে বদ্ধ পুষ্করিণী অথবা আবর্জ্জনাপূর্ণ খানার অভ্যন্তরে বা উপরিভাগে নানা প্রকারের পাশ বা ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া থাকে। জলজ utriculariaরা শিকড় বিহীন। পালকের মতন ইহার পাতার গায়ে স্বচ্ছ ঠুলি থাকে। এই ঠুলির অভ্যন্তর জলপূর্ণ। এই ঠুলি গুলিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীটদের মৃত্যুর কারণ। পাঠক! ঠুলির অদ্ভুত গঠন অবলোকন করিলে বিস্ময় রসে মগ্ন না হইয়া কি থাকিতে পার! যদি ইহারা উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া জীব হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাদের বুদ্ধির চমৎকারিতার জন্য ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে। দেখ, ঠুলিগুলি যেন আগাগোড়া মোড়া; ভিতরে প্রবেশ করিবার কোন পথই নাই। কিন্তু উপরে একবার মৃদুভাবে স্পর্শ কর, একটি ক্ষুদ্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। দ্বারটি এমনি কৌশলে স্থাপিত যে, ভিতর হইতে কোন মতেই খুলিবার যো নাই। কিন্তু উপর দিয়া খুলিতে পারা যায়। ঠুলির আভ্যন্তরিণ সম্মুখ দেশ ছুঁচলা-কেশে পূর্ণ। পরাক্রান্ত ও অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন কীট অনধিকারে

প্রবেশ করিয়া পাছে বন্ধের ফাঁদ ভাঙ্গিয়া দেয়, এই জন্য ছুঁচল কেশ গুলি উদ্‌ঘাটিত-ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখ দেশেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় সুসজ্জিত থাকিয়া দ্বার রক্ষা করে। বড় বড় কীটেরা প্রবেশ করিতে পারে না বটে কিন্তু ছোট ছোট কীটদের জন্য দ্বার অবারিত। দুর্ভাগ্যেরা ভাগ্যদোষে যদি একবার ঠুলিকে স্পর্শ করে, তখনি হয়ত ক্ষুদ্র দ্বারটি বহির্দ্দিকে খুলিয়া পড়ে। আর, ( যেমন আমাদেরও অভ্যাস আছে ) দুর্ভাগ্য কীট সেই উদ্‌ঘাটিতদ্বার-ঠুলির অভ্যন্তরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে নিবৃত্ত হয় না। অনধিকারে প্রবেশ আইনবিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ ও সহজ জ্ঞানানুমোদনীয় হইলেও আমরা কি অনেক সময়ে চিত্তের আবেগ সম্বরণ করিতে পারি? ঠিক সেই রূপ, ক্ষুদ্র কীটও অবারিত দ্বার ঠুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঠুলির আশ্চর্য্য গঠন কেমন, দেখ! পোকাটিও প্রবেশ করিল অমনি সেই আরব্যোপন্যাসের দস্যুদের অরণ্য মধ্যস্থ গহ্বর দ্বারের মতন দ্বারটিও তাহার পশ্চাতে বন্ধ হইয়া গেল। বরং সেই উপন্যাসের সেই গহ্বরের মধ্য হইতে "সেসাম" বলিলে দ্বারটি আবার উন্মুক্ত হইত, কিন্তু হায়! এই ঠুলির ভিতরে যাইয়া আবদ্ধ কীট যে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করুক না, দ্বার অনুন্মুক্তই থাকে। দুর্ভাগ্য কীট ঠুলির অভ্যন্তর হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না পাইয়া অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা অন্নজলাভাবে হাঁপাইয়া মরিয়া যায়।

রমণী ট্রিট বলেন যে, এই ঠুলিগুলি উক্ত উদ্ভিদের পাকস্থলী স্বরূপ। কিন্তু ডারউইন ইহা স্বীকার করেন না। ডারউইন ক্ষুদ্র মাংসের টুকরা এই ঠুলির মধ্যে রাখিয়াছিলেন। সার্দ্ধ তিন দিবস অতীত হইল কিন্তু ইহার পরিপাক ক্রিয়ার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত মহাত্মা ইহাও বলেন যে ঠুলিগুলির এমন রস সঞ্চার করিবার ক্ষমতা আছে যাহার সংযোগে মাংস শীঘ্র ও সহজে পচিয়া যায়।

আমরা বারান্তরে কলস উদ্ভিদের (Pitches plant) বিষয় লিখিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

শ্রী শ্রীপতিচরণ রায়।

# হুগলির ইমামবাড়ী।

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুন্নাজানের বাটীর দ্বারদেশে যেখানে কবরবাসী মুন্নাকে পৌঁছিল রাখিয়া গেলেন— মুন্না সেই খানেই নিজকে দাঁড়াইয়া থাকিল; গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার আর

পা উঠিল না। সে বাড়ী কি আর তাহার আপনার বাড়ী? সে বাড়ী কি আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে? এখানে থাকিতে আর কি খাঁজাহার হাত হইতে তাহার নিস্তার আছে—আজ তিনি না হয় বিফল হইয়াছেন কাল আবার সফল হইবেন—তবে জানিয়া শুনিয়া আগুণে ঝাঁপ দিতে কি করিয়া সে আবার ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে!

মুন্না দেখিল সেখান হইতে দূরে না গেলে আর উপায় নাই, যেখানে জন্মিয়া লালিত পালিত হইয়াছে, যেখানে তাহার জীবনের আশা বাসনা, স্নেহ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, ফুটিয়াছে, আবার ঝরিয়া পড়িয়াছে, যেখানে নদীর তরঙ্গে তাহার হৃদয় নাচিয়াছে, ফুলের সঙ্গে প্রাণ ফুটিয়াছে—শিশিরের সঙ্গে অশ্রু ঝরিয়াছে, যেখানকার গাছ পালা নদী পুষ্করিণী, পাখী পক্ষী সকলেই তাহার সুখের সুখী, দুঃখের দুখী, সকলেই তাহার আপনার—মুন্না দেখিল—তাহার সেই আপনার স্নেহময়, শত স্মৃতিময় নিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে আর উপায় নাই। পীড়িত ক্লান্ত নেত্রে মুন্না চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর কঠিন দেয়াল দরজা জানালা গুলা, বাগানের প্রত্যেক গাছের পাতাটি ফুলটি পর্য্যন্ত সে অতৃপ্ত আগ্রহের নয়নে দেখিতে লাগিল, তাহাদের যে সে এত ভাল বাসে তাহা মুন্না আগে যেন জানিত না। তাহার নয়নের শতধারার মধ্যে বাল্যের খেলাধূলা, কৈশোরের স্বর্ণ আশা, যৌবনের সুখ স্বপ্নমালা, স্মৃতির সহস্র ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া—মুন্নাকে বাঁধিবার জন্য চারিদিক হইতে তাহাদের স্নেহের শত বাহু প্রসারণ করিয়া দিল, মুন্না আর দাঁড়াইল না—তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাইবার আগে—ভোলানাথের কথা—ভোলানাথের সেই আত্মবিসর্জ্জী স্নেহ মনে পড়িল, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভোলানাথ এখন কোথায়? তাঁহার দেখা মুন্না এখন কোথায় পাইবে? আর যদিই বা এখন তাঁহার সহিত মুন্নার দেখা হয় তাহা হইলে তিনি কি তাহাকে একাকী যাইতে দিবেন? মুন্নার জন্য ভোলানাথ অনেক কষ্ট সহিয়াছেন, আর কেন নিজের ছিন্ন অদৃষ্টের সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া তাহার শেষ সুখশান্তির আশাটুকু পর্য্যন্ত মুন্না নষ্ট করে। মুন্নার আর সে ইচ্ছা রহিল না—মুন্না আর কাহারো জন্য অপেক্ষা না করিয়া একাকী চলিয়া গেল। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলের বালা একাকিনী অনাথিনী কেবল অশ্রুজল সাথী করিয়া সংসারের সমুদ্র তরঙ্গে আপনার অদৃষ্ট অন্বেষণ করিতে ভাসিয়া পড়িল।

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর একদিন একরাত্র চলিয়া গিয়াছে। আবার নূতন প্রভাত হইয়াছে, কাল রাত্রে যে রবি পশ্চিমে ডুবিয়াছিল—আজ আবার তাহা পূর্ব্বে উদিত হইয়াছে, ঘুমন্ত গাছ পালা, ঘুমন্ত ভাগিরথী ঘুমন্ত পৃথিবী সূর্য্যকর স্পর্শে হাসিমুখে জাগিয়া উঠিয়াছে, কেবল দীনবেশা অভাগিনী

মুন্না সমস্ত দিনের পর কাল সন্ধ্যাবেলায় যেরূপ শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লানমুখে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে আজও সেইরূপ ম্লানমুখে সেইখানে বসিয়া আছে—সে মুখে আর হাসির রেখা নাই। মুন্নার হৃদয় মধ্যে অগ্নিময় মরুভূমি, সে মরুর প্রজ্জলন্ত বালুকা-স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উচ্চে নীচে দিগ-দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া—তাহার চারিদিকে অসীম অপার ধূধূকারী নিরাশা সৃজন করিয়াছে, এ ক্ষুদ্র জীবনে এ অগ্নি সমুদ্র পার হইবার তাহার আশা নাই। তাহার মনে হইতেছে ইহার তুলনায় সে এতদিন চির-বিরাজমান বসন্তের নিকুঞ্জে বাস করিতেছিল—সুখের নিকুঞ্জে, বসন্তের মধু-সঙ্গীত তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারে নাই, সুখের ভোগে মুন্না সুখ চিনিতে পারে নাই, দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত্যায় যখন সে বসন্ত ঝরিয়া গেল, সে সুখগীতি থামিয়া গেল—তখন মুন্না তাহার জন্য হায় হায় করিতেছে। কিন্তু হায়! এখন আর সহস্র হায় হায়েও তাহা ফিরিবে না—যাহাকে একবার তাচ্ছিল্য করিয়া পদাঘাতে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে—সহস্র আহ্বানে সে আর কাছে আসিবে না। সেই যে একদিন পিতার প্রাণ-ঢালা-স্নেহ, মসীনের নিঃস্বার্থ সমবেদনা সুধার মত তাহার উপর বর্ষিত হইত, তাহার সে দিন কত সুখের দিন, আর সেই যে দিনান্তে একবার করিয়া স্বামীকে দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে মুন্না ফিরিয়া আসিত তাহার ভিতরেই বা তাহার কতখানি সুখ। তখনকার যাতনার দীর্ঘ নিশ্বাসে, অশ্রুজলে পর্য্যন্ত কি গভীর সুখ লুকাইয়া ছিল—মুন্না সে সুখ তখন বোঝে নাই, কেবল দুঃখ দুঃখ করিয়াছে, জগৎকে যাতনাময় ভাবিয়াছে, তাই জগৎ তাহাকে দুঃখ চিনাইয়া দিল, সুখ মুন্নার কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ হইল।

অতীতের মোহমায়ায় দুঃখের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুন্নার নিকট এখন সুখের। যাহার স্মৃতিতেও সুখ নাই, আলোক-রেখাশূন্য একটি অতলস্পর্শ আঁধার সমুদ্রে যে ডুবিয়া আছে সে দুঃখ কল্পনা করিতে কল্পনা স্তম্ভিত হয় হৃদয় অবশ হইয়া পড়ে—সে দুঃখ জগতে আছে কিনা জানি না—যদি থাকে তাহাই পাপী হৃদয়ের নরক ভোগ। পাপই স্মৃতিকে মুছিতে চায়, পাপের জীবনই অতীতের দিক হইতে সভয়ে চক্ষু ফিরাইতে চায়, কিন্তু পাপহীন হইলে অতীতের সহস্র দুঃখও সুখের বেশ ধারণ করিয়া হাসিয়া মনে উদয় হয়। তাই বলিতেছি পাপীই যথার্থ দুঃখী, তাহা ছাড়া জগতে যথার্থ দুঃখী বুঝি আর কেহ নাই।

ক্রমে অল্প অল্প রোদ উঠিল, এক দল ভিক্ষুক সেই গাছ তলার কাছ দিয়া জয় জয় করিতে করিতে ভিক্ষায় গমন করিল, মুন্না চাহিয়া দেখিল, মুন্নাও ভিখারিনী—তাহারো ঐরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে, প্রাণের ভিতর বেগে একটা ঝড় বহিয়া গেল। যখন হইতে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছে—মাঝে মাঝে ঐ ভাবনা আসিয়া তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিতেছে। মুন্না ভাবিল "হাগো তাহা

কি করিয়া করিব!—দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিয়া বেড়াইব কি করিয়া"? মুন্না কাঁদিয়া বলিল—"মৃত্যু-কোথায় তুমি, যাহার কেহ নাই—তুমিই তাহার আশ্রয়,—তুমি তাহাকে রক্ষা কর—তুমি তাহাকে শান্তি দাও—" এত দিন এত কষ্টে যাহা তাহার মনে আসে নাই—এখন ক্রমাগত তাহাই তাহার মনে আসিতে লাগিল। মুন্না দেখিল আত্মহত্যা ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই, মুন্না দেখিল সেই মহা পাপের বক্ষঃই এখন তাহার এক-মাত্র আশ্রয় স্থান,—মুন্না হাঁটুতে মাথা রাখিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল,—সে সারাজীবন এত কান্না কাঁদিয়াছে—কিন্তু এমন কান্না কখনো কাঁদে নাই—এই তাহার প্রথম পাপে প্রবৃত্তি,—জানিয়া শুনিয়া সে মহাপাপ করিতে যাইতেছে,—পাপ করিবার আগেই সে পাপের যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল—তাহার মনে হইল—তাহার দেহ মন পাপে জরজর হইয়াছে—অথচ তাহা হইতে ফিরিতেও যেন তাহার সাধ্য নাই,—এমনতর অবস্থায় মুন্না আগে কখনো পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার সে মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল—সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, চোখের জল মুছিয়া সে সংযত হইল, মনে মনে দৃঢ় স্বরে বলিল—"ছিছি এ কি ভাব? আত্মহত্যা করিব? মানুষ হইয়া—দুঃখকে পদানত করিতে পারিব না দুঃখের পদতলে দলিত হইব? দুঃখ আমাকে ভয় করিবে না—আমি দুঃখের ভয়ে আত্মহত্যা করিব, মনুষ্যত্ব হত্যা করিব? কখনই না। সহ্য করাই মনুষ্যত্ব—যখন মানুষ হইয়াছি সহ্য করিতে ডরাইব না—অনেক সহিয়াছি—আরো সহিব, চিরকাল দুঃখের ভ্রূকুটি সহিয়াছি—এখন দুঃখকে ভ্রূকুটি করিতে শিখিব"—মুন্না বুঝিল এ অবস্থায় ভিক্ষাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য,—যাহা বুঝিয়াছে—কাজে তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট বল চাহিতে লাগিল, প্রার্থনা করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিন্তু দুই এক পদ গিয়া তাহার সমস্ত বল—তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প সমস্তই যেন অবসান হইল,—আবার নিকটের একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

মুন্না আবার সে সঙ্কোচ সবলে দমন করিতে চেষ্টা করিয়া মনে মনে বলিল—"হাঁ ভিক্ষা করিব বই কি? কিন্তু একলা কোথায় যাইব, কেউ আসুক আগে—" একদল ভিক্ষুক যাত্রী তাহার কাছ দিয়া চলিয়া গেল,—এই ঠিক অবসর,—মুন্না উঠি উঠি করিল—অথচ উঠিতে পারিল না—ভিক্ষুকেরা অনেক দূরে চলিয়া গেল—ক্রমে অদৃশ্য হইল, মুন্না ভাবিল, আর এক দল আসুক"—এইরূপে এক দলের পর এক দল ভিক্ষায় যাইতে লাগিল, ভিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, একপ্রহর কখন চলিয়া গেছে, দ্বিপ্রহরও চলিয়া গেল—মুন্না তবুও সেই গাছতলায় বসিয়া রহিল, এখন না তখন করিয়া বেলা অবসান হইল, একজনও ভিক্ষুক আর রাস্তায় দেখা যায় না—দুই এক জন পথিক মুন্নার কাছে আসিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল—ভাল উত্তর না পাইয়া চলিয়া গেল, দুই একজন তাহার

কাছে গাছতলায় আসিয়া বসিল—মুন্না সেখান হইতে উঠিয়া আর একটি নিভৃত বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। বিকাল গেল—সন্ধ্যা আসিল—মুন্নার আর সেদিন ভিক্ষা করা হইল না—মুন্না সেই গাছতলায় অনিদ্রায় অনাহারে শুইয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন করিয়া আর কদিন চলিবে?—যখন ভিক্ষা করিতে হইবেই, তখন আর কিসের সঙ্কোচ—কিসের আর মান অপমান, কিসের এত লজ্জা। এক কালে রাজার মেয়ে ছিলাম—এখন আর তাহাতে কি? এখনত আর তাহা নাই। এক কালে স্বর্ণ-মুষ্টি ছড়াইতে পারিতাম বলিয়া এখন অন্ন ভিক্ষা করিতে লজ্জা করিবে? এক কালে ফুলের বিছানায় শুইতাম এখন যে কঠিন মাটিতেও আশ্রয় নাই। চিরদিন কাহার সমান যায়? এক কালে যাহা ছিল তাহা কি আর আছে, তবে আর কিসের সঙ্কোচ! মুন্না সমস্ত রাত ধরিয়া এইরূপে ভাবিতে লাগিল—সমস্ত রাত ধরিয়া হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিল, প্রাতঃকালে একদল ভিক্ষুক দেখিবামাত্র প্রাণপণে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র হৃদয়ে অপরিমিত বল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মলিন চাদরখানি দিয়া নাসিকা চক্ষু ছাড়া আর সকল ঢাকিয়া ফেলিল, তারপর ভিক্ষুক যাত্রীদের অনুগামী-হইল। ভিক্ষুকগণ জয় হউক বলিয়া এক গৃহ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল—এক পাত্র চাউল লইয়া একজন মুষ্টি বাটিতে লাগিল, সেই এক মুষ্টি চালের জন্য এক হাতের উপর দশটা করিয়া হাত পড়িতে লাগিল, একজনকে ঠেলিয়া দশজন সবলে ভিক্ষাদাতার সম্মুখে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—মুন্না সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইতে সাহস না করিয়া কিছু দূরে একজন দর্শকের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সকলে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল—ভিক্ষাদাতা থালা ঝাড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।—মুন্না দেখিল—সেখানে আর ভিক্ষা পাইবার আশা নাই—নিরাশ হৃদয়ে আবার সে ভিক্ষুকদের অনুগমন করিল। আবার আর এক ঘরে পহুছিয়া যখন ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা লইতে লাগিল, মুন্না পূর্ব্বাপেক্ষা সে দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া সাহস পূর্ব্বক দাঁড়াইল—কিন্তু যাচিঞা করিতে মুখ ফুটিল না—হাত উঠিলনা, একবার যেন হাতটি উঠাইয়াছিল কিন্তু তখনি তাহা পড়িয়া গেল—কেহ তাহা দেখিতে পাইল না—কেহ জানিলনা মুন্না ভিখারিণী। ভিক্ষা শেষ হইল, অন্য সকলে চলিয়া গেল, মুন্নার আর পা সরিল না—শূন্য হস্তে অধোবদন হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিধাতা! এত লোক ভিক্ষা লইয়া গেল মুন্নার এক মুঠা ভিক্ষা পর্য্যন্ত জুটিল না!

সংসারের নিয়ম মুন্না জানেনা। চীৎকার না করিলে, গলাবাজি করিয়া বেড়াইতে না পারিলে ভিক্ষুক হইতে রাজার পর্য্যন্ত কাহারো অন্ন নাই তাহা মুন্না জানে না, গলার জোরে ঝুটা সাচ্চা হইয়া যায়, আর তা না থাকিলে সাচ্চা কানা কড়িতে বিকায় না—তাহা মুন্না জানে না। মুন্না জানে—সাচ্চনায় পাত্রকে জগৎ আপনি চিনিয়া লইবে। লোক দেখাইয়া অশ্রুজল ফেলিতেছে, হয় তবে জগৎ মহা

আড়ম্বর করিয়া,সাত সমুদ্র তের নদী তোল-পাড় করিয়া এক মুষ্টি অন্ন দেয় তাহা মুন্না জানে না। মুন্না কখনো বাড়ীর বাহির হয় নাই—সে সংসারের ধার কিধারে? যখন বাড়ীর বাহির হইতে হইল তখন একেবারেই ভিক্ষা পাত্র লইয়া বাহির হইয়াছে। এতদিন ভিক্ষা দিয়া—একেবারে ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে। কি করিয়া ভিক্ষা লইবার কি ধারা তাহা সে জানে না—তাই সে ভিক্ষা পাইল না।

দুই-দ্বারে যখন মুন্না ভিক্ষা পাইল না, তখন সে দিন আর তাহার ভিক্ষা করা হইল না—সেখান হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া পূর্ব্বের গাছতলাটিতে গিয়া বসিল। দ্বিপ্রহর হইল রৌদ্র তাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল, পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তবু যেন এতটুক বল নাই—যে উঠিয়া নদী তীরে গিয়া জল পান করে—মুন্না শ্রান্ত ক্লিষ্ট অবসন্ন হইয়া সেই বৃক্ষতলে শুইয়া রহিল।

এই সময় বেহারারা একখানি পালকি এই বৃক্ষ তলে আনিয়া নামাইল। কোন ভদ্র মহিলা ইহার মধ্যে ছিলেন সন্দেহ নাই—কেন না সঙ্গে দাসী দ্বারবান চাকর অনেক। পালকি নামাইলে একজন দ্বারবান দাসীকে বলিল—আমাদের বোট ঠিক হইয়াছে কি না দেখি, ততক্ষণ মাঠাকরুণ এইখানে থাকুন"। দরোয়ান চলিয়া গেল—দাসী বলিল—"মা পালকির দরজা খুলিয়া দেওনা এখানে কেহ নাই"। পালকির দ্বার খুলিয়া রমণী পালকীর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিলেন, অমনি বৃক্ষ তলে মুন্নার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, দাসীকে বলিলেন "আহা দেখ দেখ কি রূপ দেখ।" দাসী তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"ও মা তাই ত গা, তা সাজে দেখছি কোন মোছরমানের মেয়ে হবে।" রমণী বলিল, "ওকি লো—মোছরমানের ঘরে কি অত-সুন্দরী আছে—না লো হিন্দুস্থানী খোট্টা"—রমণী আর না থাকিতে পারিয়া, পালকীর বাহির হইয়া মুন্নার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা কে তুমি?" মুন্না—অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—"আমি ভিখারিণী?" ভিখারিণী! এতরূপ একটা রাজার ঘরে নাই, ভিখারিণীর এতরূপ! রমণী অবাক হইলেন, সেই ম্লান সৌন্দর্য্যে যেন অভিভূত হইলেন—সেই সুন্দর মুখখানি ম্লান বিষণ্ণ শুষ্ক নলিনীর ন্যায় দেখিয়া তাঁহার যেন চ'খে জল আসিতে লাগিল—অতি করুণার স্বরে রমণী বলিলেন—"এই দুপুর বেলায় একটি গাছ তলায় পড়ে আছ, কোথায় যাইবে গা?" মুন্না বলিল—"গাছতলাই আমার ঘর।" রমণীর বড় দুঃখ হইল—বলিলেন, "আহা তোমার ঘর নাই—তবে রাত্রে কোথায় থাকিবে—বৃষ্টি হইলে কি করিবে।" মুন্নার চোখ দিয়া এক বিন্দু জল পড়িল—নিজের অবস্থা ভাবিয়া এ অশ্রু বাহির হইল না—একজন অজানা অচেনা পথের লোকের এত মমতা! তাই মুন্নার তাহা হৃদয় স্পর্শ করিল। মুন্না করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"যাহার এক মুঠা অন্ন জুটে না সে থাকিতে ঘর কোথায়

পাইবে ?" রমণীর কোমল প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, বলিল—"আমার সঙ্গে যাইবে ? আমার সঙ্গিনীর মত থাকিবে আর ভিক্ষা করিও না।" অতিক্ষীণ বিদ্যুতের মত হাসি হাসিয়া মুন্না বলিল—"আমি মুসলমান। জানিলে আমাকে কি তুমি স্পর্শ করিবে।"

"মুসলমান !" রমণী একটুখানি ভাবিল, তারপর বলিল—"আমি ভাবিয়াছিলাম খোট্টার মেয়ে। তা হোক হলেইবা মুসলমান, একটা আলাদা ঘর দেব—সেইখানে থাকবে, আমাদের অন্ন কত লোকে খায়—আর তোমার মত ভিখারিণী শুকাইবে ? চল।" একজন বিজাতি সম্পর্কহীন অপরিচিতের তাহার জন্য এই সমদুঃখ দেখিয়া মুন্না আশ্চর্য্য হইল—মনে মনে বলিল—"ধন্য তুমি হিন্দু কন্যা। আমার মত অভাগিনী তোমার এই মমতার কি প্রতিদান দিবে—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন"—এই সময় দ্বারবানের সহিত একজন চাকর এইখানে আসিল। চাকর রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এস মা, ঘাটে বোট আসিয়াছে। কতকষ্টে যে এই বোটখানি ঠিক করেছি—তা আর কি বলব।" রমণী বলিল—"কেনরে বেহারী বোট ঠিক করিতে এত কষ্ট কিসের ?" চাকর বলিল—"কোথা পশ্চিম মশ্চিম কোথা থেকে সেরজঙ্গ না কে এক ভারী নবাব এসেছে, তা আবার দেশে শীঘ্র ফিরে যাবে—তা এখন থেকে ঘাটের যত বোট ঘিরে ঘিরে বসিয়ে রাখছে।"

মুন্না শুনিয়াছিল সেরজঙ্গের কন্যাকে স্বামী বিবাহ করিয়াছেন—তাহার নাম শুনিয়া মুন্নার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা নবাব বাড়ী কোথায় গা ?" চাকর বলিল—"তা আমি জানি না, কিন্তু দুচার খান বোট ঘাটে দেখিলাম—নবাব বাড়াতেই আজ যাইবে—মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে।" মুন্না মনে মনে কি ভাবিল, বলিল—"যদি সে বোট নবাব বাড়ীতেই যাইতেছে, আমি যদি সেখানে যাইতে চাই ত সঙ্গে লইবে কি ?" রমণী বলিলেন—"তুমি সেখানে যাবে কেন ?" মুন্না বলিল—"সেখানে আমার চেনা শুনা আত্মবন্ধু আছে",

রমণী তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়া এস দেখি ; ইহাকে নৌকায় লইবে কিনা ?" ভৃত্য বলিল—আপনার পালকি ঘাটে আসুক, ঘাটে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" পালকি ঘাটে লাগিল,—দাসী দ্বারবান চাকরদিগের সহিত মুন্নাও ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার প্রাণে কি এক আশা হইয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি অবসাদ সে সকল ভুলিয়া গিয়া আশার বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। ঘাটে আসিয়া চাকর বোটওয়ালাদের ঐকথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল—"দাসী পাইলে লইয়া যাইবার হুকুম আছে, যদি দাসী হয় ত আসিতে বল"। মুন্না বলিল "বল হাঁ দাসী।" মুন্না রমণীর কাছ হইতে বিদায় লইল—রমণী তাহার হাতে কয়েকটী মুদ্রা দিতে গেলেন,

মুন্না তাহা না লইয়া বলিল—"বোন, রাজ-রাজেশ্বরী হও—তুমি আজ আমাকে যে ধন দিয়াছ তাহা অমূল্য, আর আমার কিছু আবশ্যক নাই, তোমার কাছে আর কিছু লইব না। সকল ভিখারিণী যেন তোমার মত হিন্দুকন্যার নিকট এইরূপ প্রাণঢালা সান্ত্বনা পায়—বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।' রমণী বুঝিল, মুন্না আপনার লোকের কাছে যাইতেছে, তাহার প্রাণে সুখের উচ্ছ্বাস জমিয়াছে। রমণী বলিলেন—"তুমি সুখী হ-ইলে, তোমার মলিন মুখখানি প্রফুল্ল হইলে আর একদিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে পাই,কিম্বা যদি দুঃখে পড়িয়া কখনো সান্ত-নার আবশ্যক হয় তখনো ভগিনী মনে ক-রিয়া আমাব কাছে আসিও।" রমণী তাহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন, মুন্না গদগদ কণ্ঠে বলিল—"যদি আর ভিক্ষা করিতে হয় আগে তোমার দুয়ারেই যাইব।"

রমণী নৌকায় উঠিলেন—মুন্নাও নৌ-কায় উঠিল। সেখানে গিয়া একটু জলপান করিয়া স্থির হইয়া যখন বসিল, যখন তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইল তখন মুন্নাব মনে হইল,"আমিত যাইতেছি, সপত্নীর দাসী হইয়াও যদি দিনান্তে একবার করিয়া তাঁ-হাকে দেখিতে পাই সেই আশায় যাইতেছি—কিন্তু যদি——" মুন্না শিহরিয়া উঠিল। "কিন্তু তা কি পারিবেন? আমিত আর কিছু চাহি না, কেন শত শত দাসদাসী পা-লন করিতেছেন, আর অভাগিনী মুন্নার—" আবার ঐখানে মনের কথাটা বাধিয়া গেল! মুন্নার প্রাণে আবার কেমন একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তকালের দিন, বিকালে যখন মেঘ করে তখন প্রায়ই হঠাৎ মেঘ করিয়া আসে, বাতাস উঠে, বৃষ্টি পড়ে, হঠাৎ পাখীদের গান থামিয়া যায়—সুকুমার বসন্ত ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। আজও তা-হাই হইল। নৌকা নবাবের বাড়ী পৌঁছি-বার অল্পক্ষণ আগেই আকাশে মেঘ করিল, জমাট বাঁধিল, ক্রমে আকাশ ঢাকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন আরম্ভ হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার সহিত গঙ্গার উভয় কূলের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের শোক সঙ্গীত উঠিয়া নদী বক্ষে তুফান তুলিতে লাগিল। প্রকৃতির ভীষণভাব দেখিয়া মুন্না ভীত হইল—তাহারি অমঙ্গল যেন জগৎ ভীম গর্জ্জনে সূচনা করিতেছে, তাহারি অদৃষ্টেব অন্ধকার যেন বিশ্বচরাচর গ্রাসিয়া ফেলিয়াছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা নবাবের বাটীর সমুখে গঙ্গাতীরে আসিয়া লাগিল। একজন মাঝি সঙ্গে করিয়া মুন্নাকে নবাব বাটীর দ্বারে লইয়া আসিল। নূতন দাসী আসিয়াছে খবর পাইয়া নবাববাড়ীর এক জন দাসী সেখান হইতে তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। যখন দাসী প্রথমে ঘরে আনিয়া দীপালোকে মুন্নার মুখ দেখিতে পাইল—সে চমকিয়া গেল—দাসীর এতরূপ!

অন্তঃপুরে পা দিবামাত্র মুন্না দেখিল বাহিরের ঝড়ের সহিত এখানে কত

প্রভেদ। এখানে চারিদিকে কি সুখের ভাব বিরাজমান! এখানে ঝটিকার রাক্ষসী-মূর্ত্তি নাই—ঝড় বৃষ্টির উৎপীড়ন নাই, বাহিরের ভীষণতাকে কোমল করিয়া ঝটিকার প্রাণের ভিতর দিয়া—নূপুরের রুনুঝুনু সঙ্গীতের মধুতান চারিদিকে উথলিয়া উঠিতেছে, বজ্র বৃষ্টি ভিন্নকণ্ঠে সে তানে যেন তান মিলাইতেছে।

মুন্নাকে সঙ্গে করিয়া একটি কক্ষদ্বারে আসিয়া দাসী বলিল—"তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি খবর দিয়া আসি।" দাসী চলিয়া গেল। হাসির তরঙ্গ, নৃত্যগীত গান বাদ্যের উচ্ছ্বাস গৃহ মধ্য হইতে সুস্পষ্টরূপে মুন্নার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল, মুন্না বুঝিল এ গৃহে স্বামী সপত্নীর সহিত উৎসবে মাতিয়া রহিয়াছেন, মুন্না এতক্ষণ অতি মৃদু যে আশা হৃদয়ে ধরিয়াছিল সহসা তাহা নিভিয়া গেল। এতদূর আসিয়া মুন্নার প্রাণ আবার ফিরিয়া যাইতে চাহিল। স্বামীর করুণার উপর অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল,—যদি চিনিয়া স্বামী নির্দ্দয় পদে তাহাকে ছুড়িয়া ফেলেন! পাংশু-আনন জ্যোতিহীন, হৃদয় স্তম্ভিত, অধর ওষ্ঠ মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল। এই সময় একবার গান, বাদ্য থামিয়া পড়িল, বামাকণ্ঠে কে বলিল—"আচ্ছা তাহাকে একবার নিয়ে এস, রূপটা কিরূপ দেখা যাক।" আর একজন স্ত্রীলোক তাহার উপর বলিল—"জোমন সাহেব, রূপ দেখিবার এতই যদি সাধ ত আয়না আর্শি সমুখে রাখলেই ত হয়, রূপের ভাণ্ডারে কি আর কিছু বাকী রেখেছ?" আর একজন বলিল—"তোমার সখীকে ঐ কথা বুঝাইয়া বল ত, আমার কথার ত বিশ্বাসই হয় না।" মুন্না শেষের স্বরে, স্বামীর কণ্ঠ চিনিতে পারিল, কতদিন পরে সে স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল—কিন্তু তবুও সেস্বর যেন এ স্বর নয়—এস্বরে আর সে স্বরে—কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। অমন সুস্পষ্ট, কোমল, সোহাগমাখা—প্রেমময় কথা স্বামীর মুখে কখনো মুন্না শুনে নাই। মুন্নার স্তম্ভিত হৃদয় দিয়া বেগে শোণিত বহিতে লাগিল—বুক দুর দুর করিতে লাগিল, হাত পা থর থর কাঁপিতে লাগিল—দাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল "ঘরে এস"—মুন্নার যেন সকল শক্তি অবসান হইয়াছে—মুন্নার মাথার মধ্যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, মুন্না কিছু না বুঝিয়া কিছু না শুনিয়া অজ্ঞানের মত দাসীর অনুসরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, আকুল নয়নে কাহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল রত্নালঙ্কৃতা যুবতীর পার্শ্বে স্বামী উপবিষ্ট। মুন্না দেয়ালে ঠেস দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—বুঝি রোসেনারার নিকট এইবার সব ফাঁশ হইয়া যায়! মুন্নার বেশ দেখিয়া রোসেনারার মায়া হইল—তিনি দাসীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা ওর অমন এলোথেলো বেশ কেন"? তাহার পর মুন্নাকে বলিলেন—"বাঁদী তোমার নাম কি?" সলেউদ্দীন বলিয়া উঠিলেন,—নাম! "কোথাকার রাস্তা থেকে কোন একটা ভিক্ষুকের

ধরে এনেছে—ওর আবার মান ? ও আবার দাসী ? ওকে কি দাসী রাখতে হবে নাকি ?” বজ্র হইতে অধিক বলে সে কথা মুন্নার বুকে বাজিল; তাহার হৃদয় শতধা হইয়া যেন ফাটিয়া গেল, এতক্ষণ বহু কষ্টে সে যে আত্ম সংবরণ করিয়াছিল আর পারিল না, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া মর্ম্মভেদীস্বরে বলিয়া উঠিল—“স্বামি গো বড় আশা করিয়া আসিয়াছি, শরণাগত দাসীকে পায়ে স্থান দাও—তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই—আমাকে তাড়াইওনা।” বলিয়া অস্ফুট আকুল স্বরে মুন্না কাঁদিয়া উঠিল। একজন সামান্য দীন হীন স্ত্রীলোকের এই ব্যবহার দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল, নবাব শা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না,হতবুদ্ধি হইয়া আকুবাকু করিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মুন্না কখনো যাহা করে নাই আজ তাহা করিল—মুন্না তাহার কোমল ঘর্ম্মাক্ত হাত দিয়া তাঁহার পা দুখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, “স্বামি, তোমার এই চরণই আমার আশ্রয়। এ আশ্রয় সরাইয়া লইয়া তুমি কোথায় যাইবে ? অন্য সৌভাগ্যবতী রমণীর বিবাহ করিয়াছ কর, তাহাতেআমার দুঃখ নাই। আমার সঙ্গের অশান্তি তোমাকে স্পর্শ না করুক ইহা আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটি ধূলিকণার মতও কি আমি ঐ চরণ তলে ঠাঁই পাইব না ? তুমি বিবাহ করিয়াছ, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পত্নী পুত্র সকলি পাইয়াছ—আরও পাইবে, সকলেই তোমার আপনার, কেবল কি এই আশ্রিত দাসীই তোমার আপনার রহিবে না নাথ” ? সলেউদ্দীন মুন্নার এই ক্রন্দনে, এই আচরণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, নবাবপুত্রী না জানি কি মনে করিবেন—মুন্নার হাত দুখানি পা হইতে ছাড়াইয়া দিয়া দাসীকে বলিয়া উঠিলেন—“দাসী যাও ইহাকে উঠাইয়া লইয়া যাও”—মুন্নার আর কাঁদিবারও সামর্থ্য রহিল না—পা হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী যেন গহ্বর হইয়া গেল—বিশ্ব চরাচর মাথার মধ্যে ঘূর্ণ-আবর্ত্তের মত ঘুরিয়া উঠিল, একবার অস্ফুট ক্রন্দন স্বরে মর্ম্মতল হইতে এই কথাগুলি ফুকরিয়া উঠিল “আমি কোথায় যাইব গো ? কোথায় আর এ অভাগিনীর স্থান আছে।” তারপর স্বামী ও সপত্নীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছু পরেই সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল—একজন দাসী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। উৎসব গৃহ শোকময় নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করিয়া মুন্না চলিয়া গেল।

থাকিয়া থাকিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, একটা একটা বড় বাতাসের দমকা সেই স্তব্ধ গৃহটাকে বলে নাড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, নীরব স্তম্ভিত ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ একটা গভীর গাম্ভীর্য ভীষণতা ঢালিয়া দিতেছে। সেই মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে কে যেন অতি করুণ-স্বরে—বজ্র হইতে হৃদয় ভেদী স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিতেছে—“কোথায় যাইব গো আমার আশ্রয় কোথায় !”

## ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সলেউদ্দীন যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাঁহার দুর্গতির আর সীমা রহিল না। মুন্নাকে লইয়া যাইবার পর সে রাত্রে তখনি রোসেনারা সখীদের সহিত মান গৃহে গমন করিয়া হুড়কা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া তারকেশ্বরের যাত্রীর ন্যায় প্রাণপণে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবী প্রসন্ন হইলেন না—দ্বার যেমন রুদ্ধ তেমনিই রহিল। নবাবশা দ্বারদেশে পড়িয়া ধন্না দিতে লাগিলেন, আর গৃহ মধ্যে মহা কমিটি আরম্ভ হইল। সখীদের কাছে যত যাহার কথার অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা সকলি বেচারা সলেউদ্দীনের উপর প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কোন সখী নাক তুলিয়া বলিলেন, "আমাদের সখীর কি যোগ্য—বানরের কাছে গজমুক্তার কি আদর আছে! এ রত্নের গৌরব তিনি কি বুঝিবেন?" কেহবা বলিল "আমাদের বেগমের কি আর বর জুটিত না—এমন সাধাসাধি করে কে বিয়ে করতে বলেছিল—আসুন না একবার মনের সাধে এ কথা শোনাই।" আর একজন অমনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সাধা সুরে বলিলেন—"মরণ নাই তোমার, তুমি আবার তাঁর সঙ্গে কথা কইতে যাবে, বেগম সাহেব কথা কইতে গেলে আমরা মুখ চেপে ধরব—ছি!" বেগম সাহেব এ অভিনয়ের নায়িকা, তিনি শয্যাগত হইয়া বালিসে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়াছিলেন, মনে মনে বলিতেছিলেন - "আমার মত দুঃখী আর জগতে কেহ নাই" সখীদের মমতার কথায় ধীরে ধীরে চন্দ্রকলার মত মুখের অর্দ্ধভাগ বালিসের বাহিরে প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সখি আমার মরণ হইল না কেন? আল্লা এখনি আমাকে নিন, এ দুঃখ আমার আর সহে না। আমার রূপ নাই, তাকি আর আমি জানিনে, যে আমাকে তাঁর রূপবতী স্ত্রীর রূপটা দেখিয়ে দিলেন—ভাল তাকে নিয়ে থাকলেই ত ভাল হোত—তখন তবে বিয়ে ভাঁড়াবার আবশ্যক কি ছিল।" রূপের গর্ব্বটা মনে মনে বড় অধিক ছিল বলিয়াই—একথা রোসেনারা বলিলেন। রূপটা যে রোসেনারার নেহাত মন্দ এমন আমরাও বলিতে পারি না। তবে রোসেনারাকে দেখিয়া যদি উপন্যাসের নায়িকা-প্রতিমা কাহারো মনে উদয় না হয় তবে দোষ আমাদের নাই। যাহা হউক রূপের প্রশংসা রাতদিন শুনিতে শুনিতে রোসেনারার কান বেদনা করিত, তাহার পর যখন তিনি আগাগোড়া গহনা পরিয়া সাজসজ্জা করিয়া আসিতেন—তখন সখীদের কেবল মূর্চ্ছা যাইতে বাকী থাকিত—কাজেই রোসেনারা আর্শিতে আপনাকে দেখিয়া নিজেও সে রূপে পাগল হইয়া পড়িতেন। কিন্তু মুন্নাকে দেখিয়া বুঝি সে গর্ব্বে একটুখানি আঘাত লাগিয়া থাকিবে, নিদেন আর একবার রূপের প্রশংসাটা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবার ইচ্ছাটা বুঝি আসিয়াছে।

রোসেনারার কথায় একজন সখী বলিল—"রূপ! ওরূপের কড়ে আঙুলের আগে বোসে [illegible] রূপের কথা

বলো।” রোসেনারা বলিলেন—“তোদের ঐ এক কথা। রূপ থাকলে কি আর এর মধ্যে এত পুরাণো হয়ে পড়ি যে সতীন এসে গায়ে পড়ে অপমান করতে সাহস পায়।” দুঃখের উচ্ছাস বড় বাড়িয়া উঠিল—বেগম সাহেব আবার বালিসে মুখ লুকাইয়া ফেলিলেন, বেগম সাহেবের দুঃখে সখীদের সকলের বুক ফাটিয়া উঠিল, চারিদিকে হা হুতাশ পড়িয়া গেল, নাক ঝাড়ার শব্দ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিব, কেহ কেহ সুর করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—যাহার মনে যত শোক আছে সব ঝালাইয়া উঠিল। সময় বুঝিয়া একজন সখী দরজা খুলিয়া দিল—এইরূপ কান্নাকাটি মহা শোচনীয় ব্যাপারের মধ্যে সলেউদ্দীন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সখীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“নবাবসা আসিয়াছেন”—তখন রোসেনারা বলিয়া উঠিলেন—“তোমরা উহাকে যাইতে বল এখানে আসিলে ভাল হইবে না।” সখীরা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল—সলেউদ্দীন সাহসে নির্ভর করিয়া তাঁহার পদতলে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, রোসেনারার পা মাথায় ধরিয়া অনেকক্ষণ হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, তবু সে দারুণ মান ভাঙ্গিল না, তখন হতাশ হইয়া তিনি বলিলেন—“তবে আমি চলিলাম, রোসেনারা আমার প্রতি বিমুখ—সংসারে আমার কি কাজ; আমি সব ত্যাগ করিয়া ফকীরী গ্রহণ করিতে চলিলাম।” তখন রোসেনারা বলিয়া উঠিলেন,—“সংসারে থাকিতে, সাধ নাই—তা আমি কি জানিনা, ও কথা আর কি না শোনাইলেই নয়। কার জন্য সংসার ছাড়িবে তা বুঝিয়াছি। ও মাগো! আমার অদৃষ্টে এত অপমানও ছিল।” সলেউদ্দীন মহা বিপদে পড়িলেন, বলিলেন—“তোমার হাতে আমি হৃদয় প্রাণ জীবন মরণ সব বিকাইয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব।” রোসেনারা বলিলেন—“ও আমার কপাল! এতর উপর আবার মিথ্যা কথা।” সলেউদ্দীন বলিলেন—“আমাকে পায়ে রাখ, অবিশ্বাস করিও না; সে কে আমি তাহাকে চিনিও না।” ‘তাহাকে চিনি না’! রোসেনারার অত্যন্ত রাগ হইল, বলিলেন—“মাগো আমার অদৃষ্টে এতও ছিল, এত প্রবঞ্চনা এত প্রতারণা এ ত স্বপ্নেও জানিনে” সলেউদ্দীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার কি দু এক কথা বলিতে গেলেন—কিন্তু কিছুতেই রোসেনারা বুঝিলেন না, প্রতি কথায় তিনি বিপরীত অর্থ বুঝিয়া রাগিয়া রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীন অবশেষে নিরুপায় হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তাহাতে আরো মন্দ ঘটিল, রোসেনারা কাঁদিয়া বলিলেন “ওরে আমার কেউ নেইরে—আমি মরিলে কার ক্ষতি” বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে অন্য গৃহে যাইবার জন্য বিছানা হইতে উঠিলেন। সলেউদ্দীন উঠিয়া তাহার পা ধরিয়া বলিলেন, “যাইওনা যাইওনা, এবারকার মত দোষ ক্ষমাকর।” রোসেনারা ছিনিয়া পা সরাইয়া চলিয়া গেলেন—একবার ফিরিয়া চাহিলেন না। সলেউদ্দীন পদানত মস্তক

উঠাইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন, কষ্টে দুঃখে মনের ভিতর মন যেন বসিয়া গেল। জোসেনারার জন্য মদ ছাড়িয়াছেন—বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়াছেন, দিবানিশি সাধ্যসাধনা ছাড়া আর জানেন না, কিছুতে তবু তাহার মন পাইলেন না, আর মুন্না ?” কত কথা একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল। কিরূপ নির্দ্দয় পদেই তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন! তাহার সহিত কিরূপ, পিশাচের মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন! হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া সলেউদ্দীন আজ অন্তের বেদনা বুঝিতে পারিলেন, সহস্র স্মৃতি এক কালে তাহার মনে জ্বলিয়া উঠিল। মুন্নার সেই আত্ম বিসর্জ্জী প্রেম, বিনীত ব্যবহার, সরলতাময় বিষণ্ণমূর্ত্তি, তাহার পর তাহার সেই দীন হীন ভিখারিণী বেশ—সেই হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দন আর নিজের সেই পিশাচ নির্দ্দয় পশু অধম ব্যবহার, তাঁহার মনে জ্বালামুখীর বিপ্লব আনিয়া ফেলিল। সলেউদ্দীন আর পারিলেন না, সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি বর্ষণশীল স্তম্ভিত আকাশের নীচে একটা বটগাছে একটা পেঁচা বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, যেন বলিয়া “উঠিল, পাষণ্ড নিষ্ঠুর পিশাচ, এই ভয়ানক নিশীথে তাহাকে তাড়াইয়া দিলি,” সলেউদ্দীন কানে আঙ্গুল দিলেন। আবার সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, অন্তরাত্মার প্রাণের মধ্যে সেই স্বর, সেই [illegible] “আমার আশ্রয় কোথা আমি কোথায় যাইব ?” [illegible]উদ্দীন পাগলের মত হইয়া ভাবিলেন—“কোথায় যাইব, এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি কোথায় গিয়া পাইব ?” কিন্তু তখনি বুঝিলেন, এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি আর নাই, চির জীবন তাঁহার মনে এ আগুন জ্বলিয়া রহিল ইহা হইতে আর মুক্তি পাইবেন না। জ্বালামুখীর অগ্নি উচ্ছাসের ন্যায় যখন এ আগুণ হৃদয় কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, চুরমার করিয়া বাহির হইতে চাহিবে তখনও হাসির আবরণে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, বিলাসের স্রোতে তাহা ডুবাইতে হইবে। হৃদয়ে এতটুক মনুষত্ব নাই, এতটুক তেজ নাই যে জীবনের স্রোত উলটাইয়া ফেলিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জীবন কাটাইতে পারেন। বিলাস তাহার শরীরের রক্ত শোষণ করিয়াছে হৃদয়ের বল পান করিয়াছে, পশু হইতেও তাঁহাকে অধম নীচ করিয়া তুলিয়াছে, জীবন থাকিতেও তিনি জীবনহীন। এই মনুষত্ব বিহীন নির্জ্জীব প্রাণ লইয়া অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁর ন্যায় দুর্ব্বল কাপুরুষের সাধ্য নাই, একটা মড়ার মত অদৃষ্টের তাড়নায় প্রবৃত্তি স্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গেভাসিয়া বেড়ানই এ জীবনের পরিণাম বুঝিতে পারিলেন।

## চতুঃ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই ঝটিকা তরঙ্গিত অন্ধকার নিশীথে অসহায় নিরাশ্রয় বালিকা, বাত্যাহত তৃণের ন্যায়, অন্তঃপুর তাড়িত হইয়া নদী তীরে আসিয়া অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল।

ভীষণ অন্ধকার [illegible] করালগ্রাসে নিশ্চরাচর গ্রাস করিয়া [illegible] বজ্র হুঙ্কার

ছাড়িতেছে। ঝটিকাবলে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নদী তরঙ্গিত করিয়া ভূলোক দ্যু-লোক কম্পমান করিয়া বিদ্যুতের অট্টহাসি হাসিতেছে। তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিতে যুঝিতে প্রকৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই প্রাণ সংহারক নিশায় দেবদানবেরা ভয়ে চমকিয়া যাইতেছে, কিন্তু ক্ষুদ্র এক বালিকার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। অন্ধকারে তাহার ত্রাস নাই, ঝটিকার প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মস্তক দিয়া অবি-শ্রান্ত বৃষ্টি ধারা বহিয়া পড়িতেছে, মুন্না তাহা যেন জানিতেও পারিতেছে না, বৃক্ষ শাখা দুমদাম শব্দে ভাঙ্গিয়া তাহার অতি নিকট দিয়া গায়ে লাগিতে লাগিতে ভূমে পড়িয়া যাইতেছে, সে একবার চাহিয়া দেখিতেছে না। গাছে বজ্র আসিয়া পড়িতেছে, ধূ ধূ করিয়া গাছ জ্বলিয়া উঠিতেছে, মুন্না তখনি তাহাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে সেই দিকে ছুটিতেছে, তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, মুন্নার আর মৃত্যুতে ঘৃণা নাই, মৃত্যুই মুন্নার শান্তি, মৃত্যুকে তখন মুন্না মনে মনে বরণ করিয়াছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তখন এমন আর কোনরূপ দুঃখ কষ্ট ভীষণতা নাই যাহা মুন্নাকে ভয় দেখাইতে পারে, মুন্না যে আঘাত সহ্য করিয়াছে, মুন্না যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছে, তাহার নিকট এ সকলি কিছুই নহে, সে আঘাত হইতে আর কি আঘাত আছে, যাহাতে আর মুন্নার ভয় হইবে? মুন্না বর্ম্মাবৃত নির্ভীক হৃদয়ে, শ্রান্তিহীন সবল চরণে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবি-রত চলিয়া যাইতেছে। যখন প্রভাত হইল, ঝড় জল থামিয়া গেল, জগতের আঁধার-অশান্ত-মুখ সূর্য্যের ভয়ে লুকাইয়া পড়িল, বিশ্বের যত আঁধার সমস্তই যেন ক্ষুদ্র বুকে আঁটিয়া লইয়া তখনো মুন্না চলিয়া যাই-তেছে, বিশ্রাম করিতে সে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কি এক শক্তি যেন তাহাকে স-জোরে চালাইয়া দিয়াছে থামিতে যেন আর তাহার সাধ্য নাই।

বেলা হইল, রোদ উঠিল, চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত ভাব লইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, মুন্নার চোখের সমুখে একটা অট্টালিকা আসিয়া পড়িল, মুন্না তখন চকিতের মত থামিয়া পড়িল, তখন চারি-দিকের সমস্ত তাহার নয়নে পড়িল, দেখিল যে বাড়ির সমুখে আসিয়া পড়িয়াছে, সে তাহাদেরি বাড়ি। দুই দিন আগে যে স্থান তাহার সহস্র মায়ার আধার ভুমি বলিয়া মনে হইয়াছিল, যাহার নিকট বিদায় লইতে সে কষ্টে মুহ্যমান হইয়াছিল—সেই বাড়ী, সেই বাগান, সেই নদী আবার তাহার চোখে পড়িল, কিন্তু আজ তাহা দেখিয়া মুন্নার হৃদয় একবার চঞ্চল হইল না, চোখে এক ফোটা জল পড়িল না, মুন্না অবিচলিত হৃদয়ে স্থির কটাক্ষে সেই বাটীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, সব মিথ্যা, সব মায়া, সব ভ্রান্তি! মুন্না আর চলিল না, সেই খানে একটি গাছ তলায় বসিয়া, চারি-দিকে চাহিয়া দেখিল, নদী বহিয়া যাই-তেছে, আর্দ্র গাছপালা নবীন সরসভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পশুপক্ষী নরনারী প্রাণের

আনন্দে চলিয়া বেড়াইতেছে, সকলি মুন্নার মায়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; জগৎ সংসার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলের দিকে মুন্না চাহিয়া দেখিল, সকলি মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া যাইতেছে, যুবতীরা হাসিয়া গঙ্গাস্নানে আসিতেছে—মুন্না ভাবিল, এগান কেন? এ হাসি কেন? চারিদিক দেখিয়া হতাশভাবে মুন্নার মন বলিতে লাগিল—জগতে সুখনাই জগতে সত্য নাই। জগতের পরপারে সুখের নিবাস, ইহার বাহিরে সত্যের রাজ্য, জগৎ মিথ্যা, জগৎ যন্ত্রণাময়"। মুন্নার হৃদয়ে আশা নাই, বাসনা নাই, সুখ নাই দুঃখ নাই, কি এক ঘোর বৈরাগ্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে—মুন্না শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য ভাবে, জগতের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমে মুন্নার শ্রান্তি অনুভব করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল, অবসন্ন দেহ শিথীল হইয়া পড়িল, মুন্না সেই বৃক্ষ তলে শয়ন করিল। ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

—:০:—

# ব্রহ্মে-ইংরাজ

প্রায় সার্দ্ধ দুই মাসকাল অতীত হইতে চলিল, মহারাজ্ঞীর ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি, লর্ড ডফারিণ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা স্বাধীন-ব্রহ্ম ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মাধিপতি থিব এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদভোগী হইয়া ভারতে বন্দী ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মবাসীগণ জাতীয় স্বাধীনতা হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায়,নগর গ্রাম, প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতেছে, ও সাধ্যমতে ইংরাজের কার্য্যে বাধা দিতেছে। এই উপলক্ষে ১৮৮৫ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে ব্রহ্মের শাসনকার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত এবং কত দিন হইতেই বা ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজরাজের বানিজ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে আমরা পাঠক বর্গকে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের আচার, ব্যবহার, ও শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবরণ প্রদান করিব।

আলোম্প্রা বংশের প্রথম ভূপতির সময় হইতেই স্বাধীন ব্রহ্মের উন্নতি আরম্ভ হয়। আলোম্প্রা বংশের পূর্ব্বে যে সমস্ত রাজবংশ ব্রহ্মে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা অতিশয় দুর্ঘট। যদিও বা সে সকল বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করা যায়, তথাপি তাহার ভিতর এত গল্প ও উপন্যাস ঢুকিয়াছে, যে তাহা হইতে সত্য, ও প্রকৃত ঘটনা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা আলোম্প্রা বংশের সময় হইতে ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

আলোম্প্রা বংশীয় প্রথম ভূপতি অতি সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যাধিকারী হন। ইনি প্রথমে বনে বনে শীকার করিয়া বেড়াইতেন ও মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষী দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।* কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হওয়াতে তিনি সেই সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যেশ্বর হন। ব্রহ্মের প্রাচীন রাজবংশ ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল, নূতন ভূপতি সময় বুঝিয়া সেই প্রাচীন রাজবংশের হস্ত হইতে স্খলিত রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। ইঁহারই সময়ে, ব্রহ্মদেশের সীমা শ্যাম ও চীনের প্রান্ত সীমা স্পর্শ করে। বাণিজ্যের বহুল বিস্তৃতি ও রাজ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা-নিবন্ধন ব্রহ্মরাজ্য তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। চারিদিকে নূতন পথঘাট ও নগরাদি নির্ম্মিত হয়,। এই সময়ে বর্ত্তমান রেঙ্গুন প্রথম স্থাপিত হয়।

আলোম্প্রা বংশীয় প্রথম ভূপতি ১৭৫২ খৃঃঅব্দে রাজ্যাধিষ্ঠিত হন ও আট বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজ্যকে লক্ষ্মীর নিবাস ভূমি করিয়া ১৭৬০ খৃঃঅব্দে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন।

আভা নগরী ব্রহ্মরাজগণের প্রিয় রাজধানী ছিল। আলোম্প্রা বংশীয় চতুর্থ রাজা ভোদনপ্রা, আভা হইতে অমরপুরীতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। আলোম্প্রা যে সমস্ত দেশ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন, ভোদনপ্রা সেই সমস্ত রাজ্য দৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিও আরাকাণ সীমান্ত প্রদেশগুলি ক্রমশ জয় করেন। ১৮১৯ খৃঃঅব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করাতে, ইহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ফাজিপ্রা ব্রহ্মসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

আলোম্প্রা বংশের প্রথম রাজার সময় হইতেই ইংরেজদিগের সঙ্গে ব্রহ্মরাজের পরিচয় হইয়াছিল। তখন ইংরাজ বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য বা ব্রহ্মরাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধন জন্য ব্রহ্মে মধ্যে মধ্যে দূত পাঠাইতেন। দূতও অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে ফিরিয়া আসিতেন। ফাজিপ্রা সিংহাসনাধিরোহণ করিলে একজন দূত তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়েন। এই সময়ে স্বল্প সংখ্যক ইংরাজ অনুমতি লইয়া বাণিজ্যোদ্দেশে ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছিলেন, ব্রহ্মের প্রান্তসীমাবাসীদিগের সহিত ভারতীয় ইংরাজদিগের বাণিজ্য চলিতেছিল। ফাজিপ্রা ইংরাজদিগের প্রতি মুখে সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি ইংরাজদিগের উপর বড় বীতশ্রদ্ধ হইলেন। ফাজিপ্রা আলোম্প্রা বংশের উজ্জ্বলরত্ন—তিনি বীর সাহসী ও কার্য্যকুশল। ব্রহ্মবাসীরাও তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা রাজাকে পাইয়া বর্দ্ধিত-তেজ হইতেছিল। ফাজি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দিক্‌বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ব্রিটিশ সীমান্ত প্রদেশ সকল তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। আসাম তখনও স্বাধীন—তিনি দৃঢ়হস্তে স্থির অধ্যবসায়ে আসাম

* শীকারী আংজায়া রাজা হইরা আলংপা নাম ধারণ করেন। আলোম্প্রা শব্দ, কেবল আলংপা'র পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র।

স্বরাজ্যভুক্ত করিলেন। তাহাতেও তাঁহার জয়েচ্ছা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি বঙ্গদেশের সীমান্ত প্রদেশ সকল আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুর ভারতের গবর্ণর ছিলেন। নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া তিনি ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরাজের সহিত ব্রহ্মবাসীর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কেহই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন না। এ যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় ভয়ানক ও শোচনীয়, ইহাতে প্রায় কুড়ি হাজার ভারতীয় সৈন্য বিনষ্ট ও প্রায় এক কোটি চল্লিশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এ যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যুদ্ধের পরিণামে এক সন্ধি পত্র প্রস্তুত হইল, ফাজিপ্রা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির মর্ম্মানুসারে ইংরেজেরা আসাম আরাকান ও টেনাসরিম প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই সন্ধির স্বত্বানুযায়ী ১৮৩০ খৃঃঅব্দে ব্রহ্মরাজের সভায় এক জন স্থায়ী ইংরাজ দূত প্রেরিত হয়েন।

এই ইংরাজ দূত বুদ্ধিকৌশলে ফাজিপ্রার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। ইহাঁর অবস্থান বশতঃ ব্রহ্মে ইংরাজের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ স্থায়ী ভাব ধারণ করিতেছিল, কিন্তু ঘটনা চক্রের অনতিক্রম্য পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মরাজ-সংসারে গৃহ-বিচ্ছেদানল জলিয়া উঠিল। সেই অনলের প্রচণ্ড প্রভাবে ফাজিপ্রার মানবলীলা শেষ হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা থেরাবদী নিজ দল বল সহায়ে রাজ্যেশ্বর হইলেন।

ফাজিপ্রার রাজত্ব কালে, কলে কৌশলে ইংরাজ যতটুকু করিয়া উঠিয়াছিলেন থেরাবদীর রাজত্বকালে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ইংরেজ-দূত ব্রহ্মরাজ-সভা ছাড়িয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইংরেজদূত ভারতে প্রত্যাগমন করিবার পর আরও দুইজন রেসিডেণ্ট ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের সহিতও ব্রহ্ম রাজ্যের বনিবনাও হইলনা। রাজা যদিও রাজধর্ম্মানুরোধে স্বীয় সভায় বৈদেশিক দূত থাকিতে অনুমতি প্রদান করিতেন, তথাপি মন্ত্রীদের কৌশলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে কাজ হইতনা। মন্ত্রীদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, ব্রহ্মের কথা যত দিন না বহির্জগতে বাহির হয় ততদিনই তাঁহাদের প্রভুত্ব অক্ষত ও জাতীয় চরিত্র অকলঙ্কিত থাকিবে। ফাজিপ্রার আমলে ইহাঁদের বড় প্রভুত্ব খাটিত না। এক্ষণে থেরাবদীকে পাইয়া তাঁহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে বসিলেন। ইংরাজরাজ যত দূত পাঠান কেহই ব্রহ্মে গিয়া তিষ্টিতে পারে না। এই সময়ে আবার থেরাবদী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অগ্রজ সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুযায়ী যে সমস্ত প্রদেশ গুলি ইংরাজকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এই যুদ্ধ দ্বারা সেইগুলি পুনরুদ্ধার করিবার বাসনা করিলেন। সৈন্যাবলী সজ্জিত করিয়া তিনি রেঙ্গুন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, অবশেষে কি

ভাবিয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৫২ খৃঃঅব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ঘটে। ইহার কারণ আর এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কয়েক জন বিশিষ্ট ইংরাজের উপর অত্যাচারের ছুতাই দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের মূল কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। লর্ড ডালহৌসী নানাবিধ অযথা উপায়ে দেশীয় রাজ্যগণের রাজ্য ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করিতেছিলেন। ব্রহ্মদেশও তাঁহার লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অন্যতম; সুতরাং এই সামান্য সূত্রে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের সমর বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানে ইংরাজেরাই প্রকারান্তরে জয়ী হইলেন ও ডালহাউসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধাবসানে, ইংরাজের ব্রহ্মপ্রবেশ-পথ সরল হইয়া উঠিল। ঘটনা পরস্পরাও আবার এই সময়ে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইল। ব্রহ্মরাজ তাঁহার ভ্রাতা মেন্দুনমেঙ্গ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই মেন্দুনমেঙ্গ ইংরাজের পরম আদরের। ইংরাজ আলোম্প্রা বংশের সমস্ত নৃপতিগণ অপেক্ষা ইহাঁকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। মেন্দুন তাঁহাদের মতে সুবিচারক, তীক্ষ্ণদর্শী ও রাজার মত রাজা ছিলেন। ইহাঁব রাজত্ব কালে ইংরাজের ব্রহ্মে বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল।

পেগু প্রদেশ পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজের অধিকারে ছিল—ব্রহ্ম-যুদ্ধের সন্ধির সত্বানুসারে পেগু ইংরাজের দখলে আইসে। পেগু ব্রহ্মরাজগণের প্রিয়নগরী; ইহা হস্তান্তরিত হওয়াতে মেন্দুন ইংরাজরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সময়োচিত শিষ্টাচারের সহিত একখানি বন্ধুতা সূচক পত্র লিখিয়া, অনুরোধ করা হইল যে পেগু যেন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কূটবুদ্ধি ডালহৌসী দূতকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন ও পত্রোত্তরে লিখিলেন "যতদিন সূর্য্য কিরণ প্রদান করিবেন পেগু ততদিন ইংরেজঅধিকারভুক্ত থাকিবে"। * আরও বলিয়া পাঠাইলেন, যে, ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য শীঘ্রই একজন দূত ব্রহ্ম রাজধানীতে প্রেরিত হইবে।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে কর্ণেল ফেরার দূত রূপে অমরাপুরীতে প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্ব সন্ধির কয়েকটী স্বত্ব সম্পূর্ণ রূপে পাকা করিয়া লইবার জন্য ও ব্রহ্ম রাজের সহিত সখ্যতা স্থাপন করাই এই দূত প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজার সহিত ফেরার সাহেবের অনেকবার দেখা হইল, তিনিও তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম রাজ এই নূতন সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে, বা এই বিষয়ে প্রকৃত উত্তর দিতে অসম্মত হইলেন। দূত প্রবর ফেরার আর কিছু পারুন বা নাই পারুন, ব্রহ্মের ঘরের কথা কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, ইংরাজ মহলে ব্যক্ত করিয়া দিলেন।

* As long as the sun shines in the heavens, so long will the British flag wave over Pagu.

(Despatches of the govt. 1854.)

ব্রহ্মে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা ইংরাজের প্রথম হইতেই বলবতী ছিল, বিশেষতঃ ব্রিটীশ-ব্রহ্মের সওদাগরগণ, এজন্য অতিশয় উৎসুক ছিলেন; সহযোগী বাণিজ্যকারীরা অনায়াসে ব্রহ্মে বাণিজ্য ব্যবসা করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের কিছুই হইতেছে না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। চাউল লবণ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ভিন্ন সেগুণ কাষ্টের ব্যবসা দ্বারা যে অধিকতর ধনাগম হইবে, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে অনেক বড় বড় সেগুণ কাষ্ঠের বন ছিল। সেগুণ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠও তথায় পাওয়া যাইত, এ লোভ ইংরাজ সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। আবার ১৮৬২ অব্দে ফেরার সাহেব দূত রূপে প্রেরিত হইলেন। †

ব্রহ্মরাজ এবারে তাঁহার প্রতি অপেক্ষাকৃত মনোযোগ প্রদর্শন করিলেন। ফেরারের উত্তেজনায় তিনি সীমান্ত শুল্ক (Frontier duty) উঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময় হইতে স্থির হইল, ইংরেজ বণিকগণ স্বাধীনভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিতে পাইবে, ও ব্রহ্মরাজসভায় একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট চিরস্থায়ী রূপে থাকিবেন।

ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যই রাজার একচেটিয়া। রাজসম্মতি বা রাজকীয় কর্ম্মচারীর অনুমতি ভিন্ন কোনও দ্রব্য দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। ব্রহ্মরাজ Free trade এর ধারেও যাইতেন না। যে সকল ইংরেজবণিক নূতন বন্দোবস্তের নিয়মানুযায়ী মধ্যব্রহ্মে বাণিজ্য করিতে চলিলেন, তাঁহারা প্রতি পদেই রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মের মন্ত্রী-সমাজ তাহাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা, রাজা তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত, সুতরাং ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্য সাধ পূর্ণ হইল না। সীমান্ত শুল্ক উঠান দূরে যাক্, নানা উপায়ে নানাবিধ শুল্ক আদায় করা হইত ও ইংরেজ দেখিলেই পীড়াপীড়ির চেষ্টা হইত। একবার এক জন ইংরাজ কোন রাজকর্ম্মচারীকে দেখিয়া সম্মান প্রদর্শন না করাতে সে প্রকাশ্য রাজ পথে অপমানিত হইল। অধিক বাড়াবাড়ি দেখিয়া ব্রিটীস রেসিডেণ্ট সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন।

উপরি-উক্ত দুর্ঘটনা সমূহের প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্রহ্মে পুনরায় দূত প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে ব্রহ্মে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে দূত প্রেরণ কার্য্য স্থগিত থাকে। বিদ্রোহ ব্যাপার শেষ হইলে, কর্ণেল ফিচ্ সাহেব, দূতরূপে, ব্রহ্মরাজের নিকট গমন করিলেন। ফিচের যত্নে এবার ব্রহ্মরাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, নিম্ন লিখিত কয়েকটী স্বত্ব ইংরাজ বনিকদিগকে দেওয়া হইল—(১) তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ও

† ইহার স্বল্পাংশ দৈনিক বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিনা বাধায় ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিতে পারিবেন। (২) ব্রহ্মরাজ ইংরাজ বণিকদের সুবিধার জন্য সীমান্ত-শুল্ক ও একচেটিয়া উঠাইয়া দিবেন। (৩) একজন স্থায়ী ইংরাজ-প্রতিনিধি ব্রহ্মে নিযুক্ত হইবেন ও তিনি ব্রহ্ম বিচারালয়ে বসিয়া ব্রহ্ম-বাসী ও ইংরাজদিগের সহিত মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। এই কয়েকটী স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া বস্তুতই ইংরাজ ব্রহ্মে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করিলেন। এই সময় হইতেই ব্রহ্মের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন, এই সময় হইতেই, ব্রহ্মের অদৃষ্টা-কাশে স্বল্প পরিমাণে কাল মেঘ উঠিল ও এই মেঘই, পরে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া, ভী-ষণ ঝটিকা উৎপাদন করতঃ ব্রহ্মের চিরো-জ্জল স্বাধীনতা-বহ্নি চিরকালের জন্য সম্প্রতি নির্ব্বাপিত করিয়াছে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রাচীন নৃপতি গতায়ু হইলে—উত্তরাধি-কারিত্ব লইয়া ব্রহ্মে বড় গোলযোগ উপ-স্থিত হয়—মহারাজা মেন্দুনমেঙ্গ কাহাকেও নির্দ্ধারিত রূপে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে যখন তিনি বুঝিলেন, যে, এবার আর তাঁহার রক্ষা নাই, তখন তিনি সর্ব্বজন প্রিয়, যুবরাজ নিয়ংযানকে প্রথম উত্তরাধি-কারী ও থিবকে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা সকলে শুনিতে পায় নাই। ভিতরে ভিতরে যে চক্রান্ত হইতেছিল, তা-হাই ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া শীঘ্রই চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করিল।

থিবর সহিত প্রথমা রাজকুমারীর পূর্ব্ব হইতেই প্রণয় সঞ্চার হয়। রাজ্ঞী এই প্রণয়ের বিষয় পূর্ব্ব হইতে জানিতেন ও থিবকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। থিব (তাঁহার ভাবী জামাতা) রাজ্যেশ্বর হইলে, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বাড়িবে, ও কন্যাটীও সুখী হইবে, এই আশায় উত্তেজিত হইয়া, তিনি, থিবকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কলে কৌশলে, প্রধান মন্ত্রীকে নিজ পক্ষে আনিয়া রাজ্ঞী আপনার বল দৃঢ় করিলেন। রাজার মৃত্যুর দিবসে, সমস্ত রাজকুমারকে এই বলিয়া আহ্বান করা হইল, যে মহা-রাজ তাহাদিগের মধ্যে হইতে উত্তরাধি-কারী নির্ব্বাচন করিবেন, সুতরাং সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া কুমারগণ প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবা মাত্রই ভীমকায় রক্ষীদিগের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কারানিক্ষিপ্ত হই-লেন, কুমার নিয়ংযান পূর্ব্বে এই ঘট-নার আদ্যোপান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি গোপনে, প্রাণভয়ে, রাজধানী ত্যাগ করিয়া কলিকাতার সন্নিহিত বারাকপুরে, ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞীর প্রথমা কন্যা সেলিনাসুপায়া একজন অবিবন্দ রাজকুমারী * ছিলেন।

* ব্রহ্মরাজ সংসারে এইরূপ নিয়ম প্রচ-লিত আছে যে, একজন রাজকুমারী রা-জার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিবেন। রাজার হঠাৎ মৃত্যু হইলে বা কালবশে জীব-লীলা ফুরাইলে যদি অন্য কোন রাজকুমার

থিব বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাবিন্দ রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে পারিলে, এককালে তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের পথ সরল হইতে পারে এই ভাবিয়া তিনি তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, রাজকুমারী "সেলিনা সুপায়া" কোন বিশেষ কারণে বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেন। † থিবও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি কনিষ্ঠা রাজকুমারী "সুপায়ালাত"কে বিবাহ করিলেন। রাজকুমারী সুপায়ালাতের সহিত বিবাহ হওয়াতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার উপায় হইল। সুপায়ালাতের মাতা বিধবা রাজ্ঞী অতিশয় কূট বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার কৌশলচক্রে প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীসম্প্রদায় পদানত হইয়া পড়িল, থিব বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে বিনা রক্তপাতে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। রাজ্ঞী "সুপায়ালাত" ও তাঁহার মাতা থিবকে ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন যে সমস্ত বন্দী রাজকুমারগণকে নিধন না করিলে তিনি নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে বসিতে পারিবেন না। থিব এই ভয়ানক প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় হত্যাকাণ্ডের নামে, কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্বভাবতঃই কোমল-প্রকৃতি ছিলেন; শত শত নিহত রাজকুমারের রক্তের উপর দিয়া সিংহাসনাধিরোহন করা তাঁহার আদৌ বাসনা ছিল না। তিনি একেবারেই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। আরও বলিলেন এই প্রকার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে তাঁহার প্রতিবাসী ইংরাজগণ সমস্ত জানিতে পারিবে ও তাঁহার বিমল নামে গভীর কলঙ্ক পড়িবে, কিন্তু রাজ্ঞী ও তাঁহার মাতা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা কৌশল করিয়া নিজহস্তে হত্যাকাণ্ডের সমস্ত ভার লইয়া অনেক জেদাজেদিতে থিবর সম্মতি গ্রহণ করিলেন। হত্যাকাণ্ড যে কি প্রকার নৃশংস উপায়ে সম্পন্ন হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া আর লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহিনা। রাজরক্তে কারাগার ভূমি প্লাবিত হইল, বন্দী রাজকুমার গণ শত শত অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারণ করিয়া জল্লাদের হস্তে নিহত হইলেন। মুমূর্ষুগণের কাতরোক্তি ও তৎকালোচিত কোলাহল হইতে থিবকে অন্য মনস্ক করিবার জন্য সেই হত্যাকাণ্ডের সময়ে বাদ্যকারগণ, বাদ্য আরম্ভ করিল। বস্তুত হত্যাকাণ্ডে থিব সম্পূর্ণ না থাকিলেও সমস্ত কলঙ্ক রাশি তাঁহার উপরেই অর্পিত হইল।

এইরূপে পথ নিষ্কণ্টক হইলে, থিব সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ধরিতে গেলে রাজ্য মধ্যে রাজ্ঞী সুপায়লাত ও তাঁহার মাতারই প্রভূত ক্ষমতা চলিতে লাগিল। থিব

---

বর্ত্তমান না থাকেন তবে এই রাজকুমারী মনোমত বিবাহ করিয়া সিংহাসনাধিকার করেন। এই প্রকার রাজকুমারীকে ব্রহ্মদেশে "তাবিন্দ" রাজকুমারী বলিয়া থাকে।

† কেহ কেহ বলেন, বিফল মনোরথ হওয়াতে থিব গোপনে লোক দ্বারা এই রাজকুমারীকে বিনাশ করেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব।

নিতান্ত স্ত্রৈণ হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মরাজদিগের চিরপ্রচলিত ও রাজধর্ম্মানুমোদিত বহু বিবাহ নিয়মও সুপায়ালাতের কৌশল প্রভাবে উঠিয়া গেল। সুপায়ালাতের সন্তানাদি না হওয়াতে থিব একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুপায়ালাত বিদ্বেষপরবশ হইয়া গোপনে সেই নিরপরাধ-বালিকার বিনাশ সাধন করেন। থিবর সম্বন্ধে বলিতে গেলে, অনেক বলিবার কথা আছে। কিন্তু ভারতীর ক্ষুদ্র কলেবরে সে সমস্তের স্থান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা এইস্থলে নিবৃত্ত হইলাম। সংবাদ পত্র পাঠকমাত্রেই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণাদি সমস্তই জানেন, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজের ব্রহ্মজয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মে কি প্রকারে বিচার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত, ইহাই এক্ষণে আমাদের বর্ণনীয়। পূর্ব্বে স্বাধীন ব্রহ্মে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মানুসারে বিচার কার্য্যাদি সম্পন্ন হইত। অতি প্রাচীন কালে কোন প্রকার বিচার প্রথার প্রচলনই ছিলনা, কেহ কোন অপরাধ করিলে, তিরস্কার ও চপেটাঘাতে শাসন হইয়া যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ বিচারালয় স্থাপনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হওয়াতে বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। প্রাচীন কিম্বদন্তী অনুসারে মহাত্তামদ বলিয়া একজন বিচারক সর্ব্বপ্রথমে নিযুক্ত হন। এই রাজার মনু নামে এক মন্ত্রী ছিলেন।* মনু প্রথমে গোচারণ করিতেন পরে স্বীয় বুদ্ধি বলে মন্ত্রীত্বলাভ করেন। ইঁহারই সময়ে রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য-পরিচালক কতকগুলি বিধি প্রচলিত হয়। তাহাই পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মে চলিয়া আসিতেছে। মনুর নিয়মাবলী সপ্তদশ অংশে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক অংশে পর্য্যায় ক্রমে ঋণগ্রহণ, অর্থ গচ্ছিত রাখা, বিবাদী জমীর সীমা নির্দ্ধারণ, অপরাধ নিরাকরণ, চুক্তিভঙ্গ ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি-নির্দ্ধারণ, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ ও স্বত্ব নিরূপণও উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে নানা কথা লিখিত হইয়াছে। মনুর নিয়মানুসারে, যে সে লোক ব্রহ্মদেশের বিচারক হইতে পারেন না। যাঁহারা আইনের গূঢ় মর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, সুবিচারক, সদ্বংশজাত, সুচরিত্র, ধর্ম্ম পরায়ণ ও সদুদ্দেশ্য পূর্ণ, তিনিই বিচারপতি হইবার উপযুক্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায়।

---

* এই মনুর সহিত আমাদের মনুর কোন সংস্রবআছে কিনা, ব্রহ্ম পুস্তকাবলী হইতে, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেলনা। ইহার 'নিয়মাবলীও আমাদের মনুর ন্যায়, ব্রহ্মবাসীদিগের প্রত্যেক কার্য্যের পরিচালক। আমাদের মনুর নিয়মাবলী, ভাষান্তরিত হইয়া ব্রহ্মে প্রচলিত হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

# নক্সা।

প্রফুল্ল কুসুম অধরে মধুর হাস,
কোমল কামিনী মেঘে সৌদামিনী
গরজে গভীর ভাস ;
তাতে
জোছনার রাশি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী
যমুনার সনে জড়ায়ে রয় ॥
প'ড়ে বিষয় তরঙ্গে তবু দেখ দেখি বঙ্গে
কত সুর কত তান পুলকে ছড়ায়।
বাধা কেন দাও তায়—তাই প্রেম উছলায়
গভীর নিশ্বাস আপনি বহে।
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা মরি কি মধুর
কোমল হৃদয়ে বিদ্যুৎ রহে ॥
কবি গাহিতেছে আজ কবির কাহিনী
টিপিয়া একটু হাসিয়া কহে—
বাধা কেন দাও তায়—তাই প্রেম উছলায়
গভীর নিশ্বাস আপনি বহে ॥

কবি। কবিতাটি কেমন হয়েছে ?

বন্ধু। বড় সুন্দর হয়েছে।

কবি। তবে ছাপতে দিই ?

বন্ধু। দেবে বই কি ?

কবি। সুন্দর বোধ হল কিসে ?

বন্ধু। অর্থ টুকু বুঝিতে পারি নাই বলিয়া।

কবি। একটু টীকা করিয়া দিলেই অর্থ বোঝা যায়।

বন্ধু। টীকা টিপ্পনি এখন করা হবে না। তুমি মরিয়া গেলে আমি টীকা করিব।

কবি। ছন্দটি কেমন হয়েছে ?

বন্ধু। ছন্দের দিকে কি আর আজ কাল লক্ষ্য রাখতে হয় ?

কবি। তবে ছাপতে পাঠিয়ে দিই।

বন্ধু। সে কথা আর কতবার বলব ?

কবি। কোন কাগজে পাঠাই ?

বন্ধু। যেখানে আলাপ আছে।

---

# জাগো।

জাগো, জাগো, মধু সখা,
প্রভাত শীতের-নিশি ;
তাড়ায়েছে রবিকর
কুয়াসার ধূমরাশি।

পাতার ঘোমটা তুলি
লাজুক নয়ন খুলি
করিছে কলিকা বধু
তব পথ নিরীখণ,

এস, বিকশিত কর
কুসুম কোমলানন।
জাগো, জাগো, মধু সখা
মুকুলিত উপবন।

পিকবধূ কুহু কুহু
ডাকে তোমা মুহু মুহু
পাপিয়ায় পিউ পিউ
আকাশে ভাসিয়া যায়,

এখনো তোমার ঘুম
ভাঙ্গিল না তবু হায়!

প্রেমের শ্যামল-লতা
বিছাইয়া তরু লতা
যতনে রচিছে দেখ
তোমার হরিতাসন।

জাগো জাগো মধু সখা
মুকুলিত উপবন।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

---

# রাজনৈতিক আলোচনা।

## ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভা।

গ্ল্যাডষ্টোন আয়ারল্যাণ্ডবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনে যতদূর অধিকার দিতে চাহেন শুনা যায় উদারনৈতিক দলের মধ্যে অনেকে তাহাতে নারাজ; চেম্বারলেন ও ট্রিবিলিয়ান নাকি এই জন্যই আগে থাকিতে মন্ত্রীদল হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। উদারনৈতিক দলের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণও যদি এই কারণে সরিয়া পড়েন তবে গ্ল্যাডষ্টোনও মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন; তাহা হইলে সম্ভবত বর্ত্তমান পারলেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং পুনরায় সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচন হইবে। এরূপ ঘটিলে তাহার ফল যে কি হইবে তাহা এখন কিছু বলা যায় না।

## বর্ম্মার বোঝা ভারতের ঘাড়ে।

যখন ভারত অণ্ডর-সেক্রেটরি বর্ম্মাযুদ্ধের ব্যয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ইংলণ্ডের উপর না চাপাইয়া ভারতের স্কন্ধে চাপাইতেছিলেন, তখন ভারতহিতৈষী ডাক্তার হণ্টার ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন না করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে বর্ম্মা যুদ্ধের ব্যয়-ভার ইংলণ্ডেরই বহন করা উচিত, কেন না ইংরাজ-বণিকদিগের জন্যই অন্যায় পূর্ব্বক বর্ম্মা লওয়া হইয়াছে। বাক্-পটু গ্ল্যাডষ্টোন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে ডাক্তার হণ্টরের কথা অমূলক।

যখন দেখাগেল যে ভারতবাসীগণের জীবনের শঙ্কার (!!) সম্ভাবনা, যখন দেখা গেল মহারাণীর ভারতরাজ্যের ক্ষতির (!!) সম্ভাবনা, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ভারতবাসীদিগের হিতার্থে বর্ম্মা রাজ্য হস্তগত করা হইয়াছে অতএব ভারতবাসীগণ এই ব্যয় ভার বহন করিবে!!!

মোট ৮২জন মেম্বর হণ্টরের মতের পোষকতা করেন এবং ২৯৭ জন তাঁহার মতের বিপক্ষ হওয়ায় সে কথা একেবারেই উড়িয়া গেল। লঙ্কায় যিনি আসেন, তিনিই রাক্ষস হন। গ্ল্যাডষ্টোন তোমার মুখে এরূপ অন্যায় ও মিথ্যা বাক্য আমরা কথনই প্রত্যাশা করি নাই। রাজনৈতিকগণ মিথ্যা কথাকে পাপ বিবেচনা করেন না, যখন যেমন সুবিধা হয় সেইরূপই কহিয়া থাকেন! রাম রাজাই হউন আর বনবাসেই যান ভারতের দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবেনা।

## পারলেমেণ্ট-কমিটি।

মহারাণীর নিজ হাতে আসার পূর্ব্বে ভারতের রাজ শাসনের ভার যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছিল তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর অন্তর আবার ৩০ বৎসর মেয়াদে তাঁহারা উক্ত ভার পাইতেন এবং প্রতিবারে এই নূতন বন্দোবস্তের সময় গত ৩০ বৎসর কিরূপে তাঁহারা এদেশের রাজ কার্য্য চালাইলেন সে বিষয়ে তাঁহাদের জবাব দিহি করিতে হইত। কোম্পানির হাত হইতে উক্ত রাজশাসন ভার ৩৪ বৎসর হইল মহারাণী নিজ হাতে লইয়াছেন কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীগণের হাতে এই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে এতদিন তাহার কোন অনুসন্ধান লওয়া হয় নাই। সম্প্রতি মাত্র এই অনুসন্ধান জন্য পার্লামেণ্টে এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এরূপ অনুসন্ধানে রাজকার্য্য প্রণালীর যে অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং দোষ বাহির হইলেই তাহার প্রতিকারের সূত্রপাত হয় সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনুসন্ধানের জন্য আমরা যতই ব্যগ্র হই না কেন পারলামেণ্ট কমিটির হাতে এ ভার দিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি, তাহার পরিবর্ত্তে এ জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

রয়াল কমিশন ব্যাপারটা কি—কেনইবা তাহা আমাদের প্রার্থণীয় তাহা স্থানাভাবে আমরা আগামী বারের জন্য রাখিয়া ঐ কমিটী সম্বন্ধে এখন কেবল আর দুই একটি কথা বলি। কয়েক দিন হইল তারে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ কমিটির মেম্বরদের নিযুক্ত করা হইয়া গিয়াছে এবং লর্ড নর্থব্রুক তাহার সভাপতি হইয়াছেন। মেম্বরদের মধ্যে লর্ড রিপন ডাক্তার হণ্টর প্রভৃতি কয়েক জন ভারত বন্ধু আছেন কিন্তু তাহার মধ্যে ভারত শত্রু অনেকগুলির নামও দেখিয়া আমাদের ভয় হইয়াছে। এদেশের লোকের সাক্ষ্য লওয়ার জন্য যাহাতে ঐ কমিটির কতক মেম্বর কিছু দিনের নিমিত্ত একবার এদেশে আসেন এবং আগন্তুকগণের মধ্যে যাহাতে এদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কেহ না থাকেন এই জন্য অবিলম্বে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। স্বদেশ-

বৎসল বোম্বাই নিবাসী দাদাভাই নৌরজি ঐ কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার অভিপ্রায়ে ইহার মধ্যেই বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এদেশের প্রতি খণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া প্রতিনিধি রূপে বিলাত পাঠাইতে এখন আমাদের কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। তবে বর্ত্তমান পারলেমেণ্ট যদি শাত্র ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে সেই সঙ্গে এ কমিটিও লয় প্রাপ্ত হইবে কাজেই এখান হইতে প্রতিনিধি প্রেরণেরও আর আবশ্যক থাকিবে না।

## ইংলণ্ডে হোমরুল।

ইংলণ্ডেও একটী হোম রূল সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য কাওয়েল, ডাক্তার ক্লার্ক, ও উইলফ্রেড্ বুণ্ট এই সভার প্রধান উদ্যোগী। যার ছেলে যত-খায় তার ছেলে তত চায়; ইংলণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসনের পরিসীমা নাই, অথচ স্বায়ত্তশাসন অধিকরূপে প্রচলিত হইবার জন্য সভার আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ নিতান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালা প্রদেশে যেরূপ জঘন্য স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অপেক্ষা উহার প্রচলন না হওয়াই উচিত ছিল। যদি একটু ভাল রকম স্বায়ত্তশাসন চাও, সহরে সহরে হোম রুল সভা স্থাপন করিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত কর। দেখ ইহার কি ফল ফলে।

## বাঙ্গালা ন্যাসন্যাল লিগ।

সম্প্রতি ইংরাজিতে Old man's Hope নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহাতে উপরি উক্ত কথাই—অর্থাৎ এদেশে, প্রকৃত স্বায়ত্বশাসনের কিরূপ আবশ্যক—এবং তাহা পাইবার প্রকৃত উপায় কি—ইত্যাদি বিষয় অতি বিশদ এবং হৃদয় গ্রাহীরূপে বলা হইয়াছে। লেখক যে আমাদের কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাহা তাঁহার পুস্তকের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। জানি না কি বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? এই পুস্তকখানি ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যাহাতে পড়িতে পারেন—এই উদ্দেশে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে, উহার অনুবাদ হউক এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। পুস্তকের প্রথমেই যে একটি কবিতা আছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহ আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

## জাগো।

১

কেনরে উদ্যম-হীন ভারত-সন্তান!
দেবতার মুখ চেয়ে আছ কি সকলে?
বাঁধো কটি, লাগো কাজে, হও অগ্রসর।
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

২

দাসের জাতি? না তোরা স্বাধীন মানব?
কেনরে লুটাস্ তবে অন্ধ রসাতলে,
আপনারি হাতে তব ভাগ্য-ফলাফল,
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে!

৩

নীরবে দিতেছ কর, নাহি কোন হাত!
যা-খুসি হতেছে ব্যয়, কথা নাহি চলে,
ওঠো! কর প্রতিবাদ। ধর্ম্ম চির জয়ী,
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে!

৪

তোমাদেরি ধন প্রাণ বাজি রেখে খেলা
খেলার বেলায় হায় অন্যে এসে খেলে,
কথা কি সরে না মুখে? চাহ অধিকার!
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

৫

কি হবে ঐশ্বর্য্যধন বিদ্যা-অভিমানে?
অসার খেতাব কেনা মানের বদলে!
সব চেয়ে মূল্যবান স্বায়ত্ত-শাসন।
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

৬

তোরা কি বাতুল, না কি তোরা সব শিশু,
ভয়ে সবে জড় সড় প'ড়ে ভূমি তলে!
শিশু-দশা যাবে নাকি, রবে চির দিন?
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

## AWAKE!

Sons of Ind, why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid?
Buckle to, be up and doing!
Nations by themselves are made!

Are ye Serfs or are ye Freemen,
Ye that grovel in the shade?
In your own hands rest the issues,
By themselves are nations made!

Ye are taxed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid?
Up! Protest! Right triumphs ever!
Nations by themselves are made!

Yours the land, lives, *all*, at stake, tho'
Not by you the cards are played;
Are ye dumb? Speak up and claim them!
By themselves are nations made!

What avail your wealth, your learning
Empty titles, sordid trade?
True self rule were worth them all!
Nations by themselves are made!

Are ye dazed, or are ye children,
Ye, that crouch, supine, afraid?
Will your childhood last for ever?
By themselves are nations made

৭

অন্ধকারে গুড়ি-সুড়ি চুপি চুপি কথা
ধূলায় লুকায়ে রয় কীট দলে দলে
অত্যাচার ঘুচাবার এ নহে উপায়
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

Whispered murmurs darkly creeping,
Hidden worms beneath the glade,
Not by such shall wrong be righted!
Nations by themselves are made!

৮

লাগে কি হৃদয়ে ব্যথা—বাজে অপমান?
মর্ম্ম দগ্ধ হয় নাকি হীনতা অনলে!
অসঙ্কোচে যুঝ তবে অন্যায়ের সাথে,
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

Do ye suffer? do ye feel
Degradation? undismayed
Face and grapple with your wrongs!
By themselves are nations made!

৯

দেব কিম্বা দানবের রেখো না প্রত্যাশা
কার্য্য সিদ্ধ হয় নিজ পৌরুষের ফলে,
দৃঢ়পণ আছে যার আছে তার সব
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

Ask no help from Heaven or Hell!
In yourselves alone seek aid!
He that wills, and dares, has all;
Nations by themselves are made!

১০

ভারত-সন্তান সবে উঠ, লাগো কাজে!
বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করি বেগে যাও চ'লে।
হের ওই পূর্ব্ব দিকে অরুণের ছটা,
স্বজাতি গঠিত হয় স্বজাতির বলে।

"একতা—"

Sons of Ind, be up and doing,
Let your course by none be stayed;
Lo! the Dawn is in the East;
By themselves are nations made!

UNION.

এই কবিতাতে লেখকের যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ পাইতেছে সেইরূপ উৎসাহের সহিত স্বার্থ শূন্য হইয়া আমরা ভারতবাসীগণ দেশের উন্নতি এবং সাধারণের উপকারের নিমিত্ত কখনো যে কাজ করিতে শিখিব এমন আশা যদিও দুরাশা মাত্র তথাপি বলিতে আহ্লাদ হইতেছে যে ভারতবাসীর হৃদয়ে এই দুরাশার অঙ্কুর যেন সঞ্চার দেখিতেছি। যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে—সেই, অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, অযোধ্যা, এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি স্থানের দেশানুরাগী কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের প্রতি নগরে এবং প্রধান প্রধান পল্লিগ্রামে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী আন্দোলন সমিতি সংস্থাপনে উদ্যোগ করিতেছেন। কলিকাতার ব্রিটীস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতাগণ একত্র হইয়া বাঙ্গালা নেসন্যাল লিগ নামে একটি নূতন সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন,

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেই যাহাতে ঐ সভায় যোগ দিতে পারেন এই উদ্দেশে উহার মেম্বরদিগের দেয় সাম্বৎসরিক চাঁদার ন্যূন সংখ্যা অতি অল্প করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। আমরা আশা করি যে এক বৎসরের মধ্যেই ঐ সমিতির মেম্বরগণের সংখ্যা দশ লক্ষের কম হইবে না।

## চৌকিদারি এবং পাটয়ারি আইন।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন একটি বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে কিম্বা কোন নূতন আইন প্রস্তাবিত হইলে তাহার দোষগুলি দেখাইয়া দিয়া সেই দোষ নিরাকরণ জন্য বিশেষরূপে আন্দোলন করার যে কত উপকার তাহার দৃষ্টান্ত এই চৌকিদারী এবং পাটয়ারী আইন। ঐ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত প্রথমে যে প্রস্তাব হয় তাহার দোষণীয় অংশ গুলিতে অনেক লোকে আপত্তি করায় সার রিবার্স টমসনও তাহা বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন করিয়াও এখন যাহা আইন হইয়া পড়িল এ আইনও যদি না হইত তাহা হইলে আরো ভাল হইত।

## বাৎসরিক আয় ব্যয়।

সমুদায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের যে আয় এবং ব্যয় হওয়া সম্ভব সেই আয় ব্যয়ের একটি হিসাব নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার আগেই সাধারণের গোচর করা হইয়া থাকে; এবং গত কিম্বা চলিত বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাবও সেই সঙ্গে প্রকাশ হয়। কিছু দিন হইল ঐ হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে চলিত বৎসর অর্থাৎ যে বৎসর আর কয়েক দিন পরেই শেষ হইবে— তাহার ব্যয় এষ্টিমেট অপেক্ষা প্রায় তিন কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। আগামী বৎসরেও এইরূপ বেশী খরচের দরকার, কাজেই আয় বৃদ্ধির জন্য পূর্ব্ব হইতে ইনকম্‌-ট্যাক্স বসান হইয়াছে। ঐ ট্যাক্স দ্বারা যত টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা সেই আয় ধরিয়া, এবং হিসাব প্রস্তুতের নানা কৌশল খাটাইয়া সর অকল্যাণ্ড কলভিন দেখাইতেছেন, যে আগামী বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা আয় যৎকিঞ্চিৎ বেশী হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় সম্ভবত তার উলটা দাঁড়াইবে। বিশেষ ব্রহ্ম রাজ্য শাসন জন্য কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না। উক্ত রাজ্য অধিকার করিবার ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা দিয়াই যে আমরা অব্যাহতি পাইব এমন নহে, প্রতিবৎসর সে দেশের আয় অপেক্ষা সেখানে যত বেশী ব্যয় হইবে তাহাও আমাদের পূরণ করিতে হইবে। এই হিসাবের ব্যয় আগামী বৎসরে সাড়ে আটলক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। যাহা হিসাবে ধরা হইয়াছে তাহার কম খরচ হওয়া সম্ভব নয়। তাহার বেশী কত লাগিবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে? রাজ মন্ত্রীগণ যখন আমাদের প্রতিকূল তখন বর্ম্মার সমস্ত খরচ আমাদের বহিতেই হইবে। তাই বলিয়া আমরা চুপ করিয়া যেন বসিয়া না থাকি। ক্রমাগত অধ্যবসায় সহকারে যদি আমরা এই অন্যায় কর-পীড়ণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চেষ্টা করি—তবে তাহার আশু ফল না ফলুক ভবিষ্যতে উপকার হইবেই হইবে।

## ঝিঙ্গার গাছা রায়ত সভা।

যশোহর জেলার অধীন ঝিঙ্গারগাছা গ্রামে সম্প্রতি শিক্ষিত অশিক্ষিত গ্রাম্য মণ্ডল এবং রায়তদিগের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। গতবৎসর ঐখানে প্রথম এরূপ সভা হয়। এবারে কলিকাতা সংবাদ পত্রের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং কলিকাতার অন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক ঐ সভা দেখিতে গিয়াছিলেন। গ্রাম্য এবং অশিক্ষিত লোকগণ আপনাদিগের হিতাহিত

... রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে ... বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। দেশের সাধারণ লোকে যখন রাজনৈতিক ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে এবং দেশের ভাল মন্দ বিচার করিয়া কাজ করিতে শিখিবে তখনি এদেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারিবে।

## চীন ও ইংরাজ।

চীনেরা সান্ রাজ্য (ইহা বর্ম্মা ও চীনের মধ্যভাগে স্থিত) অধিকার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। হ্যাল্ট হোলেট সাহেব যিনি বর্ম্মা হস্তগত করার একজন প্রধান উদ্যোগী তিনি বিলাতি টাইমসে লিখিয়াছেন যে যখন সানরাজ্য বর্ম্মারাজ্য ভুক্ত ছিল তখনও ... ... সানরাজ্যে আধিপত্য ... ... হোলেট সাহেব ... ... করিতে চাহেন। তিনি বলেন যে সান্‌রাজ্য দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উত্তর খণ্ড চীনদিগকে দেওয়া যাউক, কারণ তাহা হইলে ইংরাজগণ লাভবান হইবেন। চীনেরা সান্ রাজ্য পাইলে বাণিজ্যের নিমিত্ত চীন হইতে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবে এবং ইংরাজেরাও বর্ম্মা হইতে সান্‌রাজ্য পর্য্যন্ত রেল খুলিয়া চীনের রেলওয়ের সহিত মিলিত করিবেন, তাহাতে ইংরাজ বণিকদের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

এখনও ইংরাজেরা বলিতেছেন ... রাজ বণিকদিগের সুবিধার ... অধিকার হয় নাই!

---

# সমালোচনা।

## পদ্মাপুরাণ-প্রণেতা জীবন মৈত্র।

মহাকবি জীবন মৈত্র প্রণীত বিষহরী পদ্মাপুরাণ; প্রথম খণ্ড। শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীসারদানাথ খাঁ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য।০ চারি আনা।

এতদ্দেশীয় সাহিত্যে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে জীবন মৈত্রের নাম শ্রবণ করেন নাই। পরন্তু জীবন মৈত্রের নাম জনসমাজে তাদৃশ পরিচিত না হইলেও তৎপ্রণীত বিষহরী কাব্য "পুরাণ" বলিয়া উত্তর বঙ্গে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কোন সময়ে যে জীবন মৈত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন আর কোন সময়েই বা তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। যেখানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধীশ্বর পরশুরামের অনুপম রূপ লাবন্যবতী ও অসামান্য বুদ্ধি বীর্য্য সম্পন্না দুহিতা শিলাদেবী, পিতৃ বৈরী বি... যবনের সহধর্ম্মিণী হইয়া ... অপেক্ষা অরাতি নিধন পূ... ত্যাগ করাই শ্রেয় সিদ্ধান্ত করিয়া ... করতলে করালতম করবাল ধারণ ... শত্রু পরিবেষ্টিত দুর্গ মধ্যস্থিত ... হইতে বহির্গত হইয়া শাহসুলতানের ... সদনে প্রেরণ করণানন্তর করতোয়ার ... জীবনে স্বীয় পবিত্র জীবন বিসর্জ্জন ... সেই মহাস্থান দুর্গ সন্নিহিত '...' ঘাটের অনতি দূরে লাহিড়ী পাড়া গ্রামে জীবন মৈত্রের জন্ম হয়।

মহাস্থান দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হওয়ার পর তাহাদের ঘোরতর উপদ্রবে নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণ প্রায়ই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে, আর, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতিরা ধর্ম্মের জন্য দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া ...

[illegible] ... স্থানগুলি [illegible] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিম আবাস হইয়াও ক্রমশঃ ব্রাহ্মণশূন্য হইয়া উঠে, এবং লাহিড়ীপাড়া ব্রাহ্মণপাড়া প্রভৃতি মহাস্থান সন্নিহিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থান সকল এক্ষণে সেখ মোল্লা আবাস স্থান হইয়া সেখপাড়া, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি নামের যোগ্য হইয়াছে। যৎকালে জীবন মৈত্র বিষহরী পদ্মাপুরাণ প্রণয়ন করেন, তৎকালে এই সকল [illegible] যে একেবারে ব্রাহ্মণশূন্য [illegible] বহুতর নিদর্শন [illegible] গ্রন্থের [illegible] ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্য তিরোভাবের বহুদিবস পরে বিরচিত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের [illegible] বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন শত [illegible] জীবন মৈত্রের জন্ম হইয়াছিল।

জীবন মৈত্রের পিতার নাম অনন্তরাম [illegible] মাতার নাম কমলিনী দেবী ছিল। [illegible] শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। তদবধি তাঁহার পিতা [illegible] যত্ন সহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে এক মহামারী উপস্থিত হইল [illegible] তাঁহার পিতাও তাঁহাকে অকালে [illegible] করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। তিনি তখন উন্মত্তের ন্যায় একাকী [illegible] পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। [illegible] দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিজের আলয়ে আশ্রয় [illegible] প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইখানে থাকিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে মহাস্থান, যোগীর ভুবন, কালীদহ প্রভৃতি পরম রমণীয় স্থান সকল সন্দর্শন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইতেন। বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া এইরূপ নির্জ্জন [illegible] প্রকৃতির আরাধনা [illegible] মধ্যে ক্রমশঃ [illegible] ভাবের উদয় [illegible] কালের মধ্যেই [illegible] অমৃতের [illegible] সুধাময় রসে [illegible] হইলে তাঁ[illegible] প্রণয়ন [illegible] মসীপত্র অভাবে [illegible] আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর রচনা হইলে তাহার প্রতিপালক সেই দয়ালু ব্রাহ্মণ মসীপত্রাদি দিয়া তাহার অভাব দূর করিলেন। তখন তিনি সবিশেষ মনোযোগ সহকারে তাঁহার পুরাণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

এই বিষহরী পদ্মাপুরাণ দুই খণ্ডে বিভক্ত, দেবখণ্ড ও বেণিয়া খণ্ড। দেবখণ্ডে গণেশাদি দেবতার বন্দনা, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, সমুদ্র মন্থন, গৌরীর জন্ম, হরের বিবাহ ইত্যাদি বিষয় সকল বর্ণিত আছে। বেণিয়া খণ্ড পাঠে তৎকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। অবশিষ্ট খণ্ড সকল প্রকাশ বিষয়ে প্রকাশকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।